CUK-H4840-12-25885

12

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

প্রবর্তক

প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

এপ্রিল-মে, ১৯৬৫ ★ বৈশাখ, ১৩৭২

আনন্দ উৎসবে

কে,হোড়ের

প্রসাধন সামগ্রী

কনক স্নো

•

কনক সেন্ট

•

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

•

কনক টয়লেট পাউডার

•

জেস্‌মিন সুগন্ধি কেশতৈল

সুস্নিগ্ধ কমনীয় কান্তি, সৌন্দর্য্য ও
শ্রী সন্দীপনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপচার

কে,হোড়,২৩ কোং কলিকাতা ১৪

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

১নং মিল ঃ
কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

২নং মিল ঃ
বেলঘরিয়া (ভারত রাষ্ট্র)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই মিলের ধুতি সাড়ী প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে
ধনীর প্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের কুটীর পর্য্যন্ত
সর্ব্বত্রই সমভাবে সমাদৃত—

FURNITURE
FOR
HOUSEHOLD • OFFICE
COLLEGE • SCHOOL.
ALSO
DUNLOPILLO Stockist.

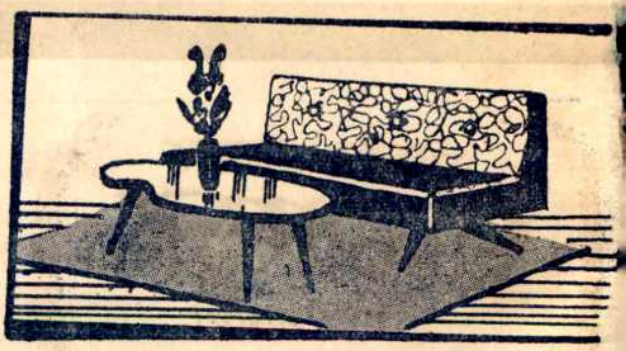

FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT a real Hom

PRABARTAK FURNISHERS L
61, BIPIN BEHARI GANGULY ST. CAL-12 (JUNC. OF CENTRAL
PHONE: 34-3088 (SHOWROOM) • 24-1536 (WORKSHOP)

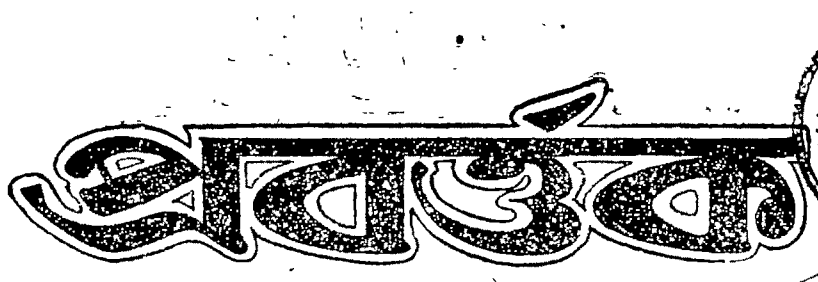

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বার্ষিক সূচীপত্র ঃ বৈশাখ—চৈত্র ঃ ১৩৭২

[লেখক-নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী ॥ প্রঃ=প্রবন্ধ ; নিঃ=নিবন্ধ ; গঃ=গল্প ; নঃ=নক্সা ; উঃ=উপন্যাস চিঃ=চিত্র ; কঃ=কবিতা ; জীঃ=জীবনী ; জীঃ চিঃ=জীবন-চিত্র ; কাঃ কাঃ=কাব্য-কাহিনী ; আঃ আঃ= আলাপ ও আলোচনা ; আঃ=আলোচনা ; ভ্রঃ=ভ্রমণ ; গীঃ আঃ=গীতি আলেখ্য ; নাঃ=নাটক ; গীঃ নাঃ=গীতিনাট্য ; সঃ=সমালোচনা ; রঃ রঃ=রম্য রচনা ; সঃ ঘঃ=সত্য ঘটনা]

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

ঋগ্বেদ (নিঃ) ২, ৫৮, ১০০, ১৪৪, ১৮৮, ২৮২, ৩২৪, ৩৬৮, ৪১২, ৪৪৮, ৪৮৪

শ্রীঅজিত সরকার

সমুদ্র শাসন (উঃ) ১৩, ৬৯, ১১৩, ১৫৩, ১৯৫, ২৪৩, ২৮৯, ৩৩৫, ৩৮০, ৪২২, ৪৫৮, ৪৯৭

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

প্রবর্ত্তকের কথা (প্রঃ) ৫৯

স্বামী চিদানন্দজী স্মরণে (স্মঃ কঃ) ২১৮

শ্রীঅজিত দাশ

ত্রিমূর্ত্তি (গঃ) ৭৯

ভূল (গঃ) ৩০৮

অন্তঃস্রোত (গঃ) ৪৭৮

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর দুর্গোৎসব (প্রঃ) ২৩৭

স্বামী প্রণবানন্দ প্রসঙ্গে (জীঃ) ৪২৭

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সনাতন গোস্বামী (কঃ) ২৭৬

শ্রীঅমল চৌধুরী

ভজন (গাঃ) ২৭৬

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

সৈনিক যদি শান্তি চাস্ তো (কঃ) ৩৪৪

শ্রীঅনিলকুমার সমাজদ্বার

এক বাড়ী, আট ঘর (গঃ) ৪০০

রাধামাধব (গঃ) ৫১৫

আনন্দ ভিক্ষু

একটি ভবিষ্যৎ (প্রঃ) ৩৪৫

আন্তর প্রস্তুতি (প্রঃ) ৪৫৬

আশ্রমী

শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর তিরোভাবোৎসব (বিবঃ) ৪০৩

শ্রীইন্দু গুপ্ত

দুই আর দুই-এ (গঃ) ৪৬৯

শ্রীউমাপদ নাথ

বাঙালী ওঠো (প্রঃ) ২০২

মাতৃ-মনন (প্রঃ) ২২৬

এম. ম্যাক্‌সিমোভা

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত শোলোকফ (প্রঃ) ৩৮৩

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

আমাদের বন্ধুভাই (জীঃ কঃ) ৪৬

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও অহিংসবাদ (প্রঃ) ৬৫

প্রাচ্যের জাগরণে চীন ও জাপানের ভূমিকা (অঃ) ৩৩১

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পূজনীয় (কঃ) ২২৮

শ্রীকালিদাস রায়

ফসলহারা ক্ষেত (কঃ) ২৬০

শ্রীকুন্তল মজুমদার

একটি স্মরণীয় মামলার বিচার (প্রঃ) ৩০৩

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়
তুমি মিতা শুধু আলো (কঃ) ৬৫০
শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত
জগদ্ধাত্রী (কঃ) ৩৫৩
শ্রীচিত্ত কর
চলচ্চিত্রের গতি ও প্রকৃতি (প্রঃ) ২০৬
শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়
জীবন-কাব্য (কঃ) ৩৩৯
শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী
মানুষ কি চায় (প্রঃ) ২৯৩
ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার
প্রবর্ত্তক-এর পঞ্চাশ বছর (সং) ৩৫, ৮৫, ১১৮, ১৭২, ২১১, ৩০৫, ৩৪৭, ৩৮৫, ৪৩৪, ৪৬৪, ৫১০
রামানন্দ শতবার্ষিকী (প্রঃ) ৯৪
দুর্গেশনন্দিনী প্রসঙ্গে (প্রঃ) ১৬৪
পাক-ভারত সমর সম্ভার (প্রঃ) ২৭১
চীন—যতটা হুমকি ততটা নয় (প্রঃ) ৩৫৩
লালবাহাদুর শাস্ত্রী (জীঃ) ৪৬৮
শ্রীতারাশঙ্কর
প্রভাতী (কঃ) ১৮৩
সত্যমেব জয়তে ! (কঃ) ২৮৮
তোমাদের প্রতি (কঃ) ৩৩৪
সংগ্রাম ও শান্তির নির্ভীক নায়ক (প্রঃ) ৪১৬
শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রী৺অর্দ্ধনারীশ্বর (প্রঃ) ২০৮
শ্রীদীপ্তোৎপল রায়
তুমি কী ? (কঃ) ২০৭
একটি মুখের রেখায় (কঃ) ২৫২
শ্রীদীপেন রাহা
বাংলার লোক-কলাশিল্প (প্রঃ) ২৬৯
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
তারুণ্য সংকট (আঃ) ৪৯
আলোর সন্ধানে (আঃ) ১৮১
নয়াভারতের শিক্ষা (আঃ) ২০৪
ক্ষমা নেই (প্রঃ) ২৫৫
মানুষের কাজ মানুষ করা (আঃ) ৩৯
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার
গতিশীল কর্ম্মে নিতি নব চেতনা (কঃ) ২০৭
ঠাকুর ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী
প্রসীদ দেবি (কঃ) ২২৪
শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্ধকারের গান (গঃ) ২
হার (গঃ) ৩৯
শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী
স্থান কোথা ? (কঃ) ৭২
শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত
পঞ্চাশ বছর আগে (সং) ৪২, ৮৯, ১৩৯, ১৭৮, ২১৭, ৩১৬, ৩৫৪, ৪০৫, ৪৪১, ৪৮০, ৫১৭
অক্ষয় স্মৃতি (জীঃ) ৪৭৪
শ্রীনরেন্দ্র দেব
বসন্তার্ত্তের প্রার্থনা (কঃ) ২২৮
শ্রীনরেন বিশ্বাস
বৃত্তপথ (কঃ) ৩০
শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার
শান্তিসেনা লালবাহাদুর (কঃ) ৪১৯
শ্রীনীতীশ মজুমদার
ইরাবতী (কঃ) ৪৩
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ
প্রশস্তি (কঃ) ৮
শ্রীদুর্গাপ্রশস্তিঃ (কঃ) ২২১
মহর্ষি প্রেমানন্দ
নববর্ষের প্রার্থনা (কঃ)
শ্রীশ্রীচণ্ডী ও সত্যপ্রতিষ্ঠা : রক্তবীজ বধ (প্রঃ) ২৩
সাধন বিজ্ঞানের মৌল তথ্য (প্রঃ) ৩৯
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
জীবনের পথে (কঃ সং) ৪০
শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়
প্রার্থনা (কঃ) ১৬

শ্রীপ্রবীর বিশ্বাস
অমর বাংলা (কঃ) ২৬১
ব পার্থসারথি
দ্বার খোলো (কঃ) ৪৭০
শ্রীপ্রবুদ্ধনাথ চ্যাটার্জি
একখানি পত্র (পঃ) ৫১৪
শ্রীপ্রমদাকান্ত আচার্য্য
গ্রাম্য-গবেষণা (গঃ) ৫০৭
ণিভূষণ বিশ্বাস
বনমহোৎসব (গীঃ আঃ) ২৬৫
সভ্যতা বনাম কাব্য (প্রঃ) ৪১৮
বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য
হিন্দু-সভ্যতা (প্রঃ) ৫
যুগধর্ম্ম (প্রঃ) ২৬২
ধ—
সম্পাদকীয় ৭, ৬০, ১০১, ১৪৫, ১৮৯, ২২৯, ২৮৩, ৩২৭, ৩৭১, ৪১৩, ৪৫১, ৪৮৫
প্রভাতী (গাঃ) ৪১
সমালোচনা ৫২, ৯৬, ২১৯, ৩১৯
সাময়িকী ৫৩, ৯৭, ১৪৫, ১৮৫, ২২০, ২৭৭, ৩২০, ৩৬৪, ৪০৭, ৪৪৩, ৪৮১, ৫২০
১৭ই আষাঢ় ১২৪
শুভবাণী ১৩০
পত্রসন্দর্ভ ১৪৪
একখানি চিঠি ১৭৭
ইংরেজ ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা ১৭৯
চিঠিপত্র ২১৫
রেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীঅরবিন্দ সরণি (স্মৃঃ কঃ) ২১, ৭৭, ১০৮, ১৫৭, ২০০, ৩০০, ৩৪৫, ৩৯২, ৪৬২
নয়ভূষণ দাশগুপ্ত
াগরণের গান (গাঃ) ২৩
াগমনী (গাঃ) ২২৫
ষ্ণ-প্রার্থনা (কঃ) ৪৮৪
বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
্যাত্মদৃষ্টিতে বিজ্ঞান (প্রঃ) ১৪৯
া মণ্ডল
া পারাবত ঘুমিয়েছে (কঃ) ১৫২
নসী (কঃ) ৪৯৬
াপাণি ভট্টাচার্য্য
র্ষ আশা (কঃ) ১৬২
শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য
স্বামী হরানন্দ সরস্বতী (জীঃ কঃ) ৫০৪
শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার
কেরল কথকতা (প্রঃ) ৭৩
ক্যারিবিয়ান সাগরে ঝড় (প্রঃ) ১৬৫
ভূস্বর্গ চঞ্চল (প্রঃ) ৩১৭, ৩৫১, ৪০২
সদ্গুরু শ্রীমতিলাল
বর্ষ-বন্দনা (প্রশঃ) ১
জীবনের আলো (প্রশঃ) ৫৭, ৯৯, ১৪৩, ১৮৭, ২৭৯, ৩২৩, ৩৬৭, ৪১১, ৪৩৭, ৪৮৩
আবাহন (প্রশঃ) ২২৩
এহি (সং) ২৮০
নির্বিশেষ জীবন (সং) ৩৬৯
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
ছুটির দুপুর (কঃ) ২০
রাঙার্দি (গঃ) ১৬৭
ছায়াজাল (গঃ) ২৯৬
শ্রীমতিলাল দাশ
তুচ্ছতার মহিমা (গঃ) ২০৯
শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস
মূর্ত্তি (গঃ) ২৪৭
শ্রীমানিক সরকার
সোনার কাঠির শিল্পী (গঃ) ২৭৩
মানসী গুপ্তা
ভিতরে বাহিরে (কঃ) ৩৮৯
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
তুলসীর বৌ (কাঃ কাঃ) ১৯
কান্তকবি স্মরণে (কঃ) ১৫৬
স্বাগত বিশ্বসমাজ (কঃ) ২৬০
৺রাজমোহন নাথ, বি. ই. তত্ত্বভূষণ
অহল্যা-জার ইন্দ্র (প্রঃ) ২৯
শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী
কে তুমি ? (কঃ) ৩৩
ধর্ম্মপ্রাণ ৺বিমলেন্দু গুপ্ত (জীঃ কঃ) ১৬৩
৺পূজায় বলিদান (আঃ) ৩১১
শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার
গৌহাটী ভ্রমণ ও দুইটি অজ্ঞাত শিলালিপি (প্রঃ) ৩৪

কুমারী রেণুকা ঘোষ, সঙ্ঘকন্যা
প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসব (বিবঃ) ৪৩
সঙ্ঘগুরুদেবের স্মৃতি-মন্দির ১৩৩
শ্রীরাজকুমার লাহিড়ী
দৃশ্য পরিচয় (কঃ) ৭২
শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য
বৈদিক যুগের সঙ্গীত (প্রঃ) ৩১৪
বাংলার শাক্তধর্ম্ম ও শাক্তগান (প্রঃ) ৪৫০
শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সৈনিক (কঃ) ৩৬০
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
জাতিগঠনে খাদ্য (প্রঃ) ৩৬১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতবর্ষ (সং) ৩৭৭
ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (প্রঃ) ৩৭৮
শ্রীরাধাবল্লভ দে
পিতার স্বর্গলাভ (গঃ) ৪৩৯
শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীর ধ্যান (প্রঃ) ৪৭১
শ্রীরমণ
মহাপ্রয়াণ (জীঃ কঃ) ৫১৮
শ্রীশশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য
আবদার (কঃ) ২০৫
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ
বোধন (কঃ) ২৪২
বাংলা শিশু-সাহিত্যের মূল্যায়ন (প্রঃ) ৪৩১
শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়
ইতিহাস ও বাংলা উপন্যাস (প্রঃ) ২৫৩
শ্রীসুধীর গুপ্ত
চরৈবেতি (কঃ) ৪
বামানন্দ তর্পণ (কঃ) ৯৫
মাতৃস্নেহ (কঃ) ২৪৬
পাকা পাতার বাণী (কঃ) ৪২৬
শ্রীসুষমা মৈত্র
ঋষি মতিলাল (কঃ) ৪
সেক্সপীয়র সনেট : ৩৩ (কঃ) ২৫২
শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী
প্রবর্ত্তক (কঃ) ৪
দেবী-বরণ (কঃ) ২২
শ্রীসুনীতি দেবী
কিশোরীর প্রতি (কঃ) ৮
শ্রীসন্তোষকুমার দে
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংকট (প্রঃ) ১
শ্রীসত্যেন জানা
মহাকাল (কঃ)
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
রণযাত্রা (কঃ) ২
শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলার স্বরূপ (প্রঃ)
শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
ভক্ত ও ভক্তবান (গঃ)
ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
রবীন্দ্রজয়ন্তী ও বাঙালীর কর্ত্তব্য (আঃ)
শ্রীহরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী
ভারত কোষ (সঃ) ৯১,
শ্রীহংস
প্রেতায়িত (গঃ)
কালজয়ী (গঃ)
সমারসেট্ মম (জীঃ কঃ)
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দ
শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত
চির-তৃষা (কঃ)

বিপদ-শৃঙ্খলের অপব্যবহার হচ্ছে···

···এই ট্রেনেই দিনে অন্ততঃ পঞ্চাশবার···

ফলে ট্রেনের দেরী অবধারিত। আপনার হয়ত আজ কোন তাড়াহুড়ো নেই, কিন্তু অন্য কেউ নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কেউ হয়ত পরীক্ষায় উপস্থিত হ'তে পারলেন না, কেউ চাকরী হারালেন, এমন কি ঠিক সময়ে ডাক্তার না আসায় কোন রোগীকে হয়ত বাঁচানো গেল না।

অন্যায়কারীদের ঠিক সময়ে বাধা দিয়ে থামাতে পারেন শুধু আপনিই, কারণ প্রত্যেক ট্রেনের প্রতিটি কামরায় পুলিশ মোতায়েন করা কোন রেলওয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়।

আপনার সহযাত্রীদের মতোই রেলওয়েও চায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে

আপনি সর্বদা সতর্ক থাকবেন

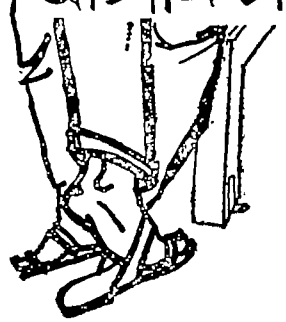

পূর্ব রেলওয়ে

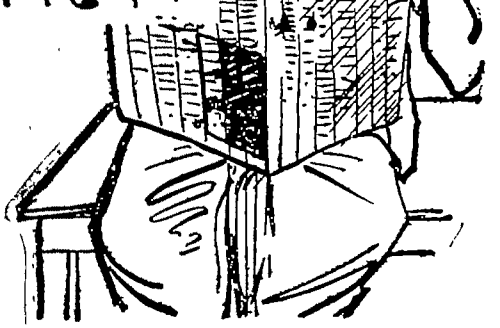

অভিজাত কেশ-তৈল

নগেন্দ্রনাথের

হিমকল্যাণ

বড়·মাঝারী·ছোট

তিন সাইজে

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্

প্রাঃ লিঃ • কলি-৪

UPCO

॥ সদ্গুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০ ; **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ। **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত : "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাব্‌লিশার্স : কলিকাতা-১২

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণাঙ্গ ; নির্ভরযোগ্য

বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

- পেটেন্ট ঔষধ
- সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ
- প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

বাংলার উৎসব
শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী
১·২৫

বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য
শ্রীমণি বর্ধন
২·৯০

বাংলার শিকার-প্রাণী
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৩·০০

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা
শ্রীআশীষ বসু
১·২৫

চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪·৬২

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব
২·০০

গান্ধী রচনাবলী
প্রথম খণ্ড (১৮৯৪—১৮৯৬)
দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৬—১৮৯৭)
প্রতি খণ্ড ৫·০০

॥ স্থানীয় বিক্রয়কেন্দ্র ॥

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র :
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

॥ ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ॥

প্রকাশন শাখা :
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা—২৭

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় ○ ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান পাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

সূচীপত্র : প্রবর্তক : বৈশাখ : ১৩৭২

বর্ষ-বন্দনা	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	১
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	২
প্রশস্তি	প্রশস্তি	স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ	৩
নববর্ষের প্রার্থনা	কবিতা	মহর্ষি প্রেমানন্দ	৪
চরৈবেতি	কবিতা	শ্রীসুধীর গুপ্ত	৪
হিন্দু-সভ্যতা	প্রবন্ধ	শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য	৫
সমুদ্রশাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	১৩
তুলসীর বৌ	কাব্য-কাহিনী	শ্রীষতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১৯
ছুটীর দুপুর	কবিতা	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২০
শ্রীঅরবিন্দ-সরণি	জীবন-চিত্র	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	২১
জাগরণের গান	কবিতা	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	২৩
অন্ধকারের গান	গল্প	শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪
অহল্যা-জার ইন্দ্র	প্রবন্ধ	৺রাজমোহন নাথ	২৯
কে তুমি ?	কবিতা	শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	৩৩
গৌহাটী ভ্রমণ ও দুইটি অজ্ঞাত শিলালিপি দর্শন	নিবন্ধ	শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার	৩৪
প্রবর্ত্তক-এর পঞ্চাশ বৎসর	ইতিবৃত্ত	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৩৫
প্রভাতী	গান	...	৪১
পঞ্চাশ বছর আগে	সংবাদ	...	৪২
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব	সচিত্র বিবরণী	কুমারী রেণুকণা ঘোষ	৪৩
আমাদের বঙ্কুভাই	জীঃ চিঃ	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ	৪৬
জীবনের পথে	কবিতা	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	৪৮

ঋষি মতিলাল : সুষমা মৈত্র ৪৯ ; প্রবর্ত্তক : সুদর্শন চক্রবর্ত্তী ৪৯ ; তারুণ্য-সংকট : ধীরেন্দ্রলাল ধর ৪৯
সম্পাদকীয় ৭ ; সমালোচনা ৫২ ; সাময়িকী ৫৩

নববর্ষের অগ্রগামী চলার পথে
আমাদের সেবা ও শুভেচ্ছা রইলো
প্রত্যেকটি দেশবাসীর প্রতি।

স্বাধীন দেশের শিল্প-সংগঠন-ব্রতী

মিলবোর্ণ এণ্ড কোং

২৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ :: ফোন ২২-৪৭২৫

একমাত্র পরিবেশক :

'রয়েল' ক্রুড অয়েল এঞ্জিন

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য : সবচেয়ে কম পাকবিশিষ্ট

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD.

Gram : 'PRABARTAK' Mg. Agents—PRABARTAK TRUST Phone : 34-3088 & 89

IMPORT :
Machineries
Papers, Boards,
Synthetic Resin
Milk products
Casein and Chemicals
and Sundry Goods.

Expert Buying Service available at a very Moderate Charge.

EXPORT :
Jute Manufactures
Shellac, Kapok,
Myrobalan,
Cattle foods.
Spices, Rosin and
other India Products

61, Bepinbehari Ganguly Street : : Calcutta-12

Codes used : A. B. C. 5th. 6th. & 7th. Edition ; Bentley's Complete Phrase, Western Union, Universal and 5-Letter, Acme and Com. Phrase with Supplement ; Schofields 3-Letter.

আর মিত্রের
ময়ূর মার্কা
তিল তৈল
বিশুদ্ধ ও সুপরিস্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃরোগ অব্যর্থ
অর্দ্ধশতাব্দীর ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স কলিঃ-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিঃ-৬

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ **শব্দ তত্ত্ব** ১৫-০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲
॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স : কলিকাতা-১২

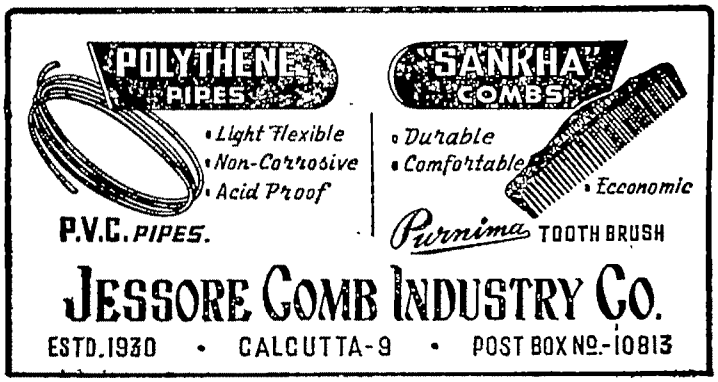

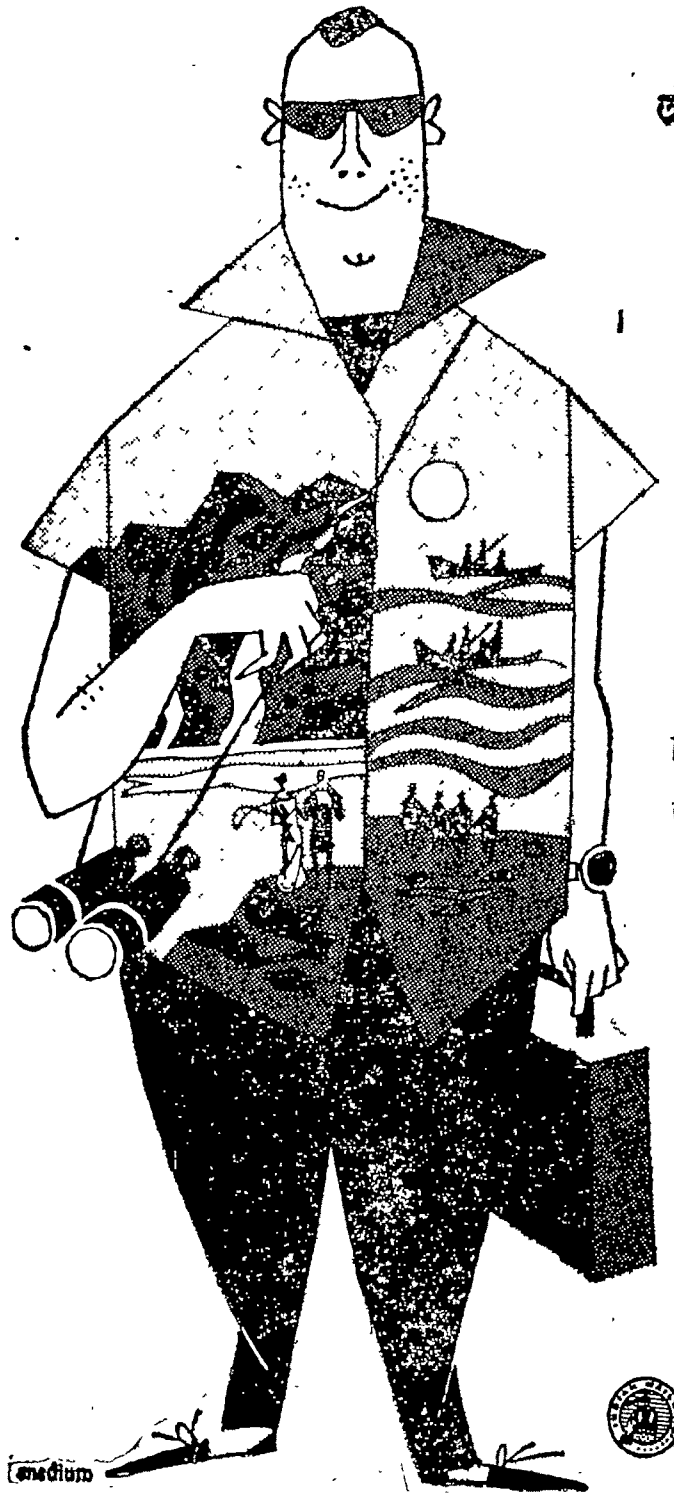

অপূর্ব রান্না

আর বাড়ীর মতো

স্বাচ্ছন্দ্য

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হোটেল

দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে

রাঁচী

হোটেল

স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন

টেলিফোন নং রাঁচী ৪৫

পুরী

হোটেল

স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন টেলিফোন নং পুরী ৬৩

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

Telegram : MASHINARIS

Telephone :
Office : 22-5275, 22-7372
Residence : 47-2915

S. K. BHATTACHARJEE & Co.

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

138 Canning Street, Calcutta-1.

AUTHORISED DISTRIBUTORS

for

- G. E. C. ELECTRIC MOTORS & STARTERS RANGING FROM ½ TO 250 H. P.
- GENERATING SETS.
- TRANSFORMER & SWITCH GEARS.
- BLACKSTONE & LISTER DIESEL ENGINES.
- SPARE PARTS.
- IRRIGATION & DOMESTIC PUMPING SETS.
- LISTER DIESEL PUMPING SETS.

Stockist for :

LUB.-OIL & MOLASES PUMPS

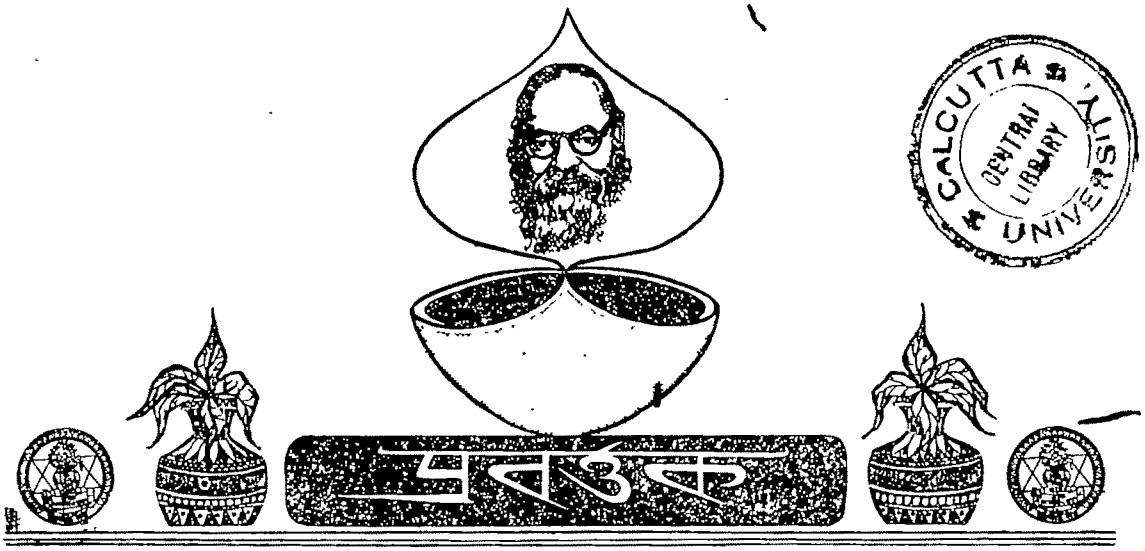

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৫০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা | সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৭২

বর্ষ-বন্দনা

বর্ষ তোমায় বিদায় দিই। বৎসর আরম্ভে যে উদ্যত প্রাণ নিয়ে তোমায় আহ্বান করেছিলাম, সেই উৎসাহ-প্রদীপ্ত প্রাণেই তোমায় বিদায় দিচ্ছি। সারা বর্ষে অবিরাম গতিই ছিল জীবনের আনন্দ। আজ তোমায় আনন্দের সঙ্গে বিদায় দিই। অনাগতকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি তোমার বিদায়ের সঙ্গেই আরম্ভ হোক। মহাভারতে যে অনাগত বিধাতার চরিত্র আছে, সেই চরিত্র নিয়ে বর্ষরক্ষা করায় কোথাও বিঘ্নে গতিভঙ্গ হয় নাই। প্রত্যুৎপন্নমতি ও দীর্ঘসূত্রী প্রায় একই পর্য্যায়ভুক্ত। দীর্ঘসূত্রীর কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। দীর্ঘসূত্রী একান্ত আসন্ন বিপদে রক্ষা পায়, কিন্তু অনাগত বিধাতা সর্ব্ব সময়ে নিরাপদ। কেননা, সে অনাগতকে লক্ষ্য করে প্রস্তুত হয়। * * নব নব বেশে কালের যেমন অভ্যুদয়, আমাদের আয়ুও যেন তেমনি অভিনব মূর্ত্তিতে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলে।

*

নববর্ষকে অভিবাদন কর। ত্যাগ ও তপস্যার আনন্দে এ জীবন যেন আপূর্য্যমান, অচল-প্রতিষ্ঠ হয়। বুদ্ধির জগৎ ছেড়ে জ্ঞানঘন চেতনায় যেন আমাদের নিত্যস্থিতি হয়। নিত্যের সন্ধান পায় সে-ই যে আত্মসংবিদে পরিপূর্ণ। কর্ম্ম নিত্য। অপরিত্যজ্য। কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ হয়। পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, কর্ম্ম নিষ্কাম আশ্রয়ে শোভার কারণ হয়, কর্ম্ম নিষ্কাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ করে। জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত যে অবধৃতি তাহাই অমিশ্র সত্য। তত্ত্বজ্ঞান হয় চৈতন্য সংযোগে—চৈতন্যযুক্ত হলে। যোগ একমাত্র পথ। যুক্তি লাভ হয় আত্মায়—প্রকৃতি বিকৃতি দিয়ে নয়। এইজন্য আত্মার আবরণস্বরূপ প্রকৃতি বিকৃতির লয় চাই। যোগাকাঙ্ক্ষার আগুনেই ইহা ছাই হয়ে স্বরূপ প্রকাশ হয়, এই স্বরূপের ধর্ম্মে নূতন সৃষ্টির সূচনা দিব্যজন্ম ও কর্ম্মের কারণ। নববর্ষে এই চেতনা সতত জাগ্রত থাকুক।

●

এস দেবতা—আজ এই মহাযজ্ঞের অধিবাসে। তুমি নিত্য চিরযুগ বর্ষে বর্ষে এসো। তুমি এসো শিল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে, ভাবুকতায়, দর্শনে। তুমি এস ধ্যানে, পূজায়, আরাধনায়। হে বৈশাখের সত্যযুগাদ্যা অক্ষয়তৃতীয়া, তোমার উৎসবমূর্ত্তি বুদ্ধপূর্ণিমা অবধি একদিন নিখিল জাতিকে নূতন প্রাণের সাড়া দিবে, মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে জাতির কণ্ঠে উদ্গান উঠবে—দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে কাতারে কাতারে তোমার এই উৎসব-মন্দির ঘিরে মানুষের ভীড় ও মেলা বসে যাবে। তীর্থযাত্রীর ন্যায় সাধক, কবি, যোগী, অবধূত, গৃহী, বিদ্যার্থী, আশ্রমী দলে দলে প্রণতি দিতে আসবে। আমি তোমার এই বিজয়শ্রী সন্দর্শনের প্রতীক্ষায় রইলাম। [১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসের দিনলিপি হইতে সঙ্কলিত]

সদ্গুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। অষ্টত্রিংশৎ সুক্তং।) পঞ্চমী ঋক্

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

মা বো মৃগো ন যবসে জরিতা ভূদজোষ্যঃ।

পথা যমস্য গা ছপ ॥৫

অন্বয়—"হে মরুতঃ" (হে মরুদ্দেবগণ) "বঃ" (আপনাদের) "জরিতা" (স্তোতা, পূজক) "মৃগঃ ন যবসে" (মৃগ যেমন ভক্ষনীয় তৃণে কখনও অসেব্য হয় না, তেমনি) "অজোষ্যঃ" (অসেব্য) "মাভূৎ" (না হয়) "যমস্য" (যমলোকের) "পথা" (পথে) "মা উপগাৎ" (যেন গমন না করে) ॥৫

সরলার্থ—হে মরুদ্দেবগণ! মৃগের নিকট তৃণ যেমন অসেব্য হয় না—সেই রকম আপনাদের পূজারীও যেন আপনাদের নিকট অসেব্য না হয়; যমলোকেও না গমন করে।

বিশদার্থ—"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাং স্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥"

—আর এক ঋষির অনুশাসন বাক্য। শ্রুতিরই নির্য্যাস বেদান্ত বা উপনিষদ্। উপনিষদের ঋষি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন—'দেখিও, যেন আত্মঘাতী হইও না। আত্মঘাতী ব্যক্তি মৃত্যুর পর আলোকহীন অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন লোকে গমন করে।' ইহারই যেন প্রতিরূপ বাক্য এই মন্ত্র। আত্মঘাতী না হওয়ারই আকুলতা এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। "আত্মানং বিদ্ধি"—শ্রুতি বাক্য। আত্মাকে জানিতে পারিলেই মানবত্ব দেবত্বে রূপান্তরিত হয়। ঋষি-মনে দেবতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই বলবৎ। পূর্ব্বমন্ত্রে তাহা আমরা পাইয়াছি। এই মন্ত্রে ঋষি দেবতাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন—হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের পূজারী যাহারা, যাহারা আত্মাকে জানিতে চাহে—আত্মঘাতী হইতে চাহে না—তাহারা যেন আপনাদের অসেব্য না হয়।

কেন এই কাতরতা? কেন দেবতাদের অনুগ্রহের ভিখারী হইতে যাওয়া? উপায় নাই। দৈবানুগ্রহ ভিন্ন আত্মানুভব সম্ভব নয়। গুরু যদি দয়া করিয়া চক্ষে জ্ঞানের কাজল পরাইয়া না দেন—জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে না।" "শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নং"—সৎ শিষ্য মাত্রকেই বলিতে হইবে। অন্যথা আত্মার জাগরণ যে হয় না। আত্মা যদি না জাগেন—মৃত্যুর পর যমলোকের পথ-প্রাপ্তি ভিন্ন আর কি উপায়? তাই তো ঋষি দেবতাদের অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন—'হে মরুতঃ! তব স্তোতা যমস্য পথা মা উপগাৎ"—আপনাদের পূজক যাঁরা, তাঁরা যেন মৃত্যুর অধীন হইয়া যমলোকের অধিবাসী না হয়।

পূজা করিলেই যে মানুষ, 'অমৃতস্যাৎ' দেবতা হইবেন এমন কোন কথা নাই। পূজাতো অনেকেই করেন। পূজা করিয়া কয়জন মানুষ দেবতাপদবাচ্য হইয়াছেন? কয়জন গদাধর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব হইতে পারিয়াছেন? এইখানেই আসে অধিকারবাদের কথা। ঋষি যেন সেই অধিকারই অর্জন করিবার অভিলাষে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—'যথা মৃগ ন যবসে, তথা জরিতা অজোষ্য মা ভূৎ' ॥

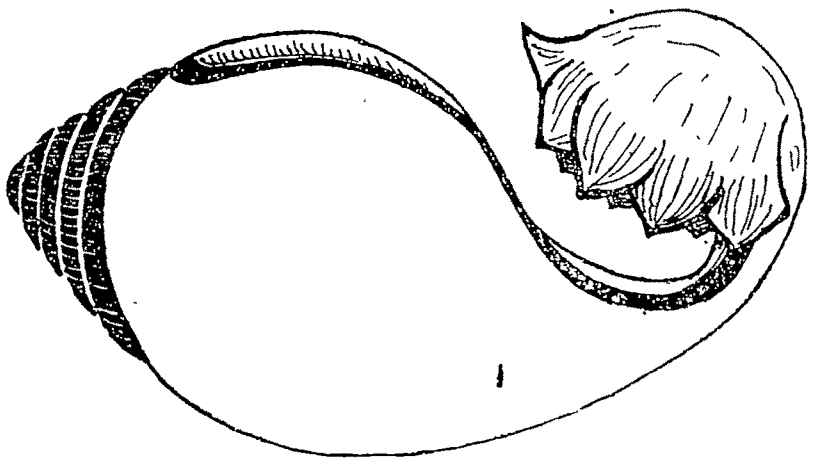

প্রশস্তি

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ

কোঽদ্ধা সিন্ধুতটোপলেষু চয়নাদ্ বর্য্যং মণিং প্রাপ্নুয়াৎ
কো বা ভোগবতীপয়াংসি খননাদ্ দোর্ভ্যাং বিলে দার্দ্দুরে।
নূনং স্পর্শমণির্যতোঽশ্মকনকং ভোগাম্বুনে (যোগাম্বুনে) যোঽর্জ্জুন
স্তস্মাৎ সঙ্ঘপিতুঃ প্রবর্ত্তকবরান্নান্যাশ্রয়ঃ সন্ততেঃ॥

সাগরসৈকতে তুচ্ছ উপলের মাঝে,
কে নিশ্চিত খুঁজে পাবে বরেণ্য মাণিক!
ভেকগর্ত্তে দুটি করের খননে,
কেবা ভোগবতী পয়োধারা পিয়ে তরপিত!
অসম্ভব হইল সম্ভব যবে—
তুমি স্পর্শমণি দিলে স্পর্শ, সোনা হ'ল
মলিন, নগণ্য স্ফটিক!

আর, অর্জ্জুনের মতো শরের সন্ধানে,
যোগে ভোগে গীতাগঙ্গা দুয়ে,
চির তৃষিতেরে করিলা তুষিত!
ওগো সঙ্ঘপিতা, প্রবর্ত্তকবর!
প্রেমস্পর্শে তব কত না পাষাণ হ'ল
নিকষ কাঞ্চন!
কত ক্লিন্ন বালুকায় বহাইলে অনাবিল ঝরী!

বল তোমা বই কেবা সঙ্ঘসন্তানের গতি সুহৃৎ শরণ!

নববর্ষের প্রার্থনা

মহর্ষি প্রেমানন্দ

হে মহাশবর !

বিস্ময় বিমূঢ় চিত, প্রজ্ঞাহত এ মহাজগৎ—
ধ্বংসের মিনার হ'তে মরণের শুনে নহবত।
নিরন্ধ্র আঁধার যাত্রী, কালরাত্রি পথে গণমন,
লাঞ্ছনা ললামে ক্ষিন্ন হ'ল নিত্য নরনারায়ণ।
বিজ্ঞান কি অজ্ঞানতা দিল বিশ্বে আনি ?
বর্ণ ও ধর্ম্ম দ্বন্দ্বে চলে হানাহানি।
মনুষ্যত্বে করি অপমান—
বিলুপ্তির রক্তঝরা পথে তার চলে অভিযান।

স্বীয় বক্ষ বিদারিয়া ইচ্ছার যে দিলে রূপায়ণ,—
ফিরায়ে নিবে কি তাহা, হবে কি তারি উৎক্রমণ ?
মরমী মানব মনে আজি শুধু জাগিছে জিজ্ঞাসা—
কখন প্রশান্ত হবে তব এই ভাব সর্ব্বনাশা।
উদয় অচল পানে চাহি প্রতীক্ষায়
কখন নামিবে প্রীতি এ ক্ষুব্ধ ধরায়।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, কম্পনে অধীর—
সংগ্রামী পৃথ্বির বুকে আর কত লুটাইবে শির ?

মানব অন্তরতলে জ্যোতির্ম্ময় হে মহামানব,
মুক্তির আবেশে চির তন্দ্রাতুর করিত দানব—
তোমার তুহিন স্পর্শে তা'রি ওকি ঘটিবে বিলয় ?
কণ্টকে ডরিবে কিগো অনুপম পুষ্পিত নিলয় ?
নীর বক্ষে মধুহীন শূন্য ইন্দিবর,
ভ্রমর আসঙ্গ ভ্রষ্ট, কাঁপে থর থর।
মমত্বের শান্ত অবদান—
ব্যক্ত বিশ্বে ব্যাপ্তি নিয়ে, পরমের মহা অভিজ্ঞান॥

হোম-হবি, তীর্থোদক যেই গেহ নিত্য যায় চুমি,
তপঃশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের এই লীলাভূমি ;
শঙ্কর ! শম কর তা'রে শর্ম্মদ সুশান্ত পরশে,
প্রাণেরে প্রভিন্ন কর প্রভাতের প্রসন্ন হরষে।
স্তব্ধ করি প্রলয়ের বিষণ্ণ বিষাণ,
জাগৃতি দাও বিশ্বে প্রণয়ের গান।
লুপ্ত করি রাজসী রৌরবে—
নবীন বরষে লভ মহোল্লাস মহান্ গৌরবে।

চরৈবেতি

শ্রীসুধীর গুপ্ত

গুরু-চিত্ত-সিন্ধু-ক্ষিপ্ত ভাব-সংবাহক
ঊর্ম্মিনাদী শঙ্খ আমি ; অর্দ্ধ-শতাব্দের
কালোত্থিত বহু-বাত্যা-ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের
অপরোক্ষ অংশভাগী ; শান্তির সাধক ;
শঙ্খ-শব্দে 'চরৈবেতি'-মন্ত্র-প্রচারক।
বিক্ষিপ্ত বিপদ-বিঘ্ন বন্ধুর বর্ত্মের,
প্রেরণা-বর্দ্ধক আরও দীপ্ত আদর্শের।
থাকি যেন, অবিশ্রান্ত তা'রই প্রবর্ত্তক।
অর্দ্ধ-শতাব্দের শেষ ঘণ্টা বেজে যায়,
নিরবধি-স্থানে-কালে বিসর্পিত-পথে
আশীর্ব্বাদবর্ষী শব্দ রোমাঞ্চ জাগায় ;
ব্রতী করে 'চরৈবেতি'-ভাব-চর্য্যা-ব্রতে।
মন্ত্রে মোর জনচিত্তে নিত্য যেন ভায় ;
বাণী-ব্রহ্ম-সাধনা যে সার্থক জগতে।

হিন্দু-সভ্যতা

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য, এম. এ.

ঊর্দ্ধমূল, অধঃশাখ অশ্বত্থ—সুপ্রাচীন অথচ অবিনশ্বর—জনারণ্যে বিশাল বনস্পতি—দিকে দিকে অসংখ্য শাখা ও ঝুরি—এখনও প্রাণরসে উচ্ছল—ইহাই হিন্দু সভ্যতা। কালের প্রবাহে, নানা জাতি, নানা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনেব ইহা সাক্ষী। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের এই মহিমময় ঐহিত্য ঋষি, মনীষী, সাধু-সন্ত, নরপতি ও দেবমানব পরম্পরাব প্রযত্নে রোপিত হইয়া বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। নানা জাতি, নানা ভাষা ইহার অবয়র—সর্বসমন্বয়ে গঠিত এ হেন অপূর্ব জাতি-পুরুষের অন্তরে নিখিলের সংস্পর্শে যে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিচ্ছবি জাগে—হিন্দু সংস্কৃতি তাহারই প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। পূর্ণ বিকশিত জাতীয় জীবনের সকল উপকরণে ইহা সমৃদ্ধ—পুণ্যতম বেদ, বিপুল ধর্মশাস্ত্র, বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার, মৌলিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান, সূক্ষ্মতম শিল্পকলা। নানা দার্শনিক সম্প্রদায়, সুসংহত সমাজ-বিন্যাস, বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান—সমগ্র মানব জাতির ইহা চিরন্তন সম্পৎ, শাশ্বত প্রেরণার উৎস। মহা-দেশের শীর্ষে বিরাজিত হিমাচলশ্রেণী যাহার সাক্ষাৎ প্রতীক—সেই ভূমা বা বিরাটের অনুভূতি ইহার ধ্রুব-তারা, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের স্বীকার ইহার প্রাণ-চ্ছন্দ, সকল অভ্যাগতে মুক্তদ্বার ইহার সমাজনীতি। যুগে যুগে আততায়ীর অভিঘাতে বিপন্ন ও কিছুকাল স্তম্ভিত হইলেও পুনরায় ইহা স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। বাণিজ্যিক কারবারে বা সামরিক অভিযানে প্রতিবেশী রাজ্যে অস্ত্রের ঝনঝনা ও অগ্নিপ্রয়োগে ইহা উদ্বেগ সৃষ্টি কবে নাই। নিজ বহু বিস্তৃত সাংস্কৃতিক উপ-নিবেশগুলির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাভক্তি ইহা অর্জন করিয়াছে ধর্মের গৌরব ঘোষণা করিয়া, সর্বত্র সান্ত্বনা ও সম-চিত্ততা বিতরণ করিয়া, শান্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়া। নিজ বৈশিষ্ট্যে ইহা অদ্বিতীয়—প্রাচীনতায় ইহা সকলকে অতিক্রম করিয়াছে, অজেয় প্রাণশক্তিতে সমকক্ষ ও সমকালীনদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে। অসীমের ও চরমতত্ত্বের সন্ধানে, সর্বসমন্বয়ী তথ্যের প্রতিপাদনে, জাতির ও ভূগোলের সীমারেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া আমিত্বের প্রসারে, জগদ্ধিতের সাথে আপন মোক্ষের সাধনায় ইহা অনুপম। অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় রক্ষা, এবং পুরুষার্থের সামঞ্জস্য বিধানে এই সাংস্কৃতিক আদর্শ মানবজাতির সেবা ও মানবিকতার মহিমাস্থাপনে প্রত্যাদিষ্ট। সত্যাবিষ্কারের ক্রমিক সম্প্রসারণে ইহার বিলক্ষণতা, একটিমাত্র স্ফুরণে নিজ চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া ইহা নিঃশেষিত হয় নাই—পর পর আবির্ভূত আপন প্রতিভূ সন্তানগণের মনন ও তপস্যার দ্বারা ইহা সত্যের বীথি প্রশস্ততর করিয়াছে। অখণ্ড বাস্তববোধকে প্রারম্ভ হইতে ইহা প্রজ্ঞার স্বরূপ জানিয়াছে—সত্য স্বীকাবের অকুণ্ঠতা ইহার প্রকৃতি—তাই 'ওঁ' শাশ্বত আস্তিক্যের প্রতীক—ইহার মূলমন্ত্র। ইহার প্রথম আবিষ্কার হয় ঋত বা বিশ্বনিয়মতন্ত্র এবং সত্য বা বাক্য-মন ও আচরণে বাস্তবের সহিত সঙ্গতি। প্রাণের ধর্ম সামঞ্জস্য রক্ষার প্রবৃত্তি ইহার ভিতরকার সকল সংস্কার ও পরিবর্তনের মূলে ছিল এবং তাহার বলেই ইহা নিজ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অংশভাক্ সকল সহধর্মিগণকে সংহত ও মিলিত রাখিয়াছে। কিন্তু সকল বাহ্য পরিবর্তন ও পরিবর্জনের মাঝে আপন অন্তরাত্মাকে ইহা কখনও হারায় নাই—তাই সনাতন হিন্দু ইহার আখ্যা। চিরন্তন ধর্মের উপাদান সত্য, শুচিতা, তপস্যা, ত্যাগ ও করুণা ইহার অবিচল প্রত্যয় ও নিষ্ঠার সামগ্রী হইয়াছে। প্রাণের সকল প্রকাশ—সর্বজীবের অলঙ্ঘ্য মর্যাদা ও মূল্য এবং মানবচিত্তের সকল সত্য অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা—ইহার বৈশিষ্ট্য। সৎ পদার্থ এক—জ্ঞানীগণ নানাভাবে উহাকে ব্যক্ত করিয়া থাকেন—ইহা ছিল আস্তিক্যের ভিত্তি। সকল জীব আমাকে যেন মিত্রের চক্ষে দেখে—আমি যেন সকল জীবকে মিত্রের চক্ষে দেখি—ইহা ছিল সমাজ-সম্পর্কের মূল সূত্র। এ হেন পরিবেশের মধ্যে যে সকল মহামনীষী উদ্ভূত হন তাঁহারা স্রষ্টার নিজস্ব লক্ষণ যে সামগ্রিক দৃষ্টি-

ভঙ্গী এবং সর্ব বিরোধের সমন্বয়—তাহার অনুশীলনে উদ্যুক্ত ছিলেন। এইজন্য হিন্দুর সংস্কৃতি রচনার লক্ষ্য হয় এ হেন চরিত নীতি ও জীবনচর্যা—যাহার ফলে বিশ্ব একনীড়ে পরিণত হইতে পারে; যাহাতে সকল মানব ভাই ভাই, সারা জগৎ স্বদেশ, বসুধাই কুটুম্ব-বৎ—এ আদর্শ বাস্তবে দাঁড়াইতে পারে। উদার সমীক্ষা ও বিশ্বজনীন মনোভাবে ইহার চিন্তার গতি নিয়মিত হয়। বহু কক্ষে নির্মিত ইহার মহাসৌধে নানা বিচিত্র সম্প্রদায়, বিশ্বাস ও মতবাদ স্বচ্ছন্দে প্রতিবেশিসুলভ সম্প্রীতিতে একত্রে বাস করিয়াছে।

হিন্দু সমাজের বক্ষে স্থান পাইয়াছে, একান্ত বিপরীত সিদ্ধান্তের অনুবর্তিগণ—অদ্বৈত, দ্বৈত ও নানাত্ববাদী, আস্তিক, অনীশ্বর এবং সর্বেশ্বরবাদী, চিন্মাত্রবাদী ও অচিৎ ও অনাদিসৃষ্ট জড়বাদী। ভক্তিমার্গী ও কর্মবাদী, যোগী ও সন্ন্যাসী, নীতিবাদী, জড়োপাসক এবং আদিম দেবপূজক। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আর্য, ব্রাহ্ম, প্রার্থনা সমাজী, বিভিন্ন যুগের সমাজ সংস্কারক যাঁহারা জন-সাধারণের কুটিরে ও অন্তরে চরম সত্য, অধ্যাত্ম আলোক ও পরমানন্দের বার্তা বহন করিয়াছিলেন, শৈব শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব—ভারতের পুণ্যভূমি এবং অধ্যাত্ম ভাণ্ডার হইতে যাঁহারা নিজ নিজ বিশ্বাস আহরণ করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলকে ইহা বাহুপাশে বদ্ধ করিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের তীর্থ, মন্দির, মঠ, আশ্রম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-নিকেতনের মুকুটস্বরূপ হইয়া হিন্দু মনে নিখিল সৃষ্টির পবিত্রতা-বোধের সাক্ষ্য দেয়। হিন্দুর মর্মগত নৈতিক ভাব নিয়ে—ধর্মে নিষ্ঠা, অহমিকার নিরোধ, সরল অনাড়ম্বের জীবনে শ্রদ্ধা—আত্মার অসীম বিভূতি, প্রপঞ্চের অন্তরালে বিভু সত্তার স্বীকৃতি তাহার বিশেষত্বের পরিচায়ক। এশিয়া মহাদেশের শস্যভাণ্ডার ছিল দীর্ঘ-কাল ধরিয়া ভারত এবং নিজ উচ্ছল অপর্যাপ্ত সত্তার হইতে দেশান্তরে ক্ষুধার অন্ন এবং প্রজ্ঞার আকর হইতে জ্ঞানের ভোজ বিতরণ করিয়াছে। মানবিকতার সর্বোচ্চ-আদর্শ এবং সমষ্টি জীবনে সংবিভাগ নীতি এবং চরম সত্য ও উদার ভাবপুঞ্জের কৃষ্টিবিস্তারে ভারতবর্ষ বীজ-ক্ষেত্র হইয়াছিল। মানববিগম্য এবং উহার অতীত তত্ত্ব-সমূহ—এই যজ্ঞবেদীর হোমাগ্নি হইতে শিখার মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিস্তৃত ভূভাগে বিসর্পিত হয়। প্রজ্ঞা ও পৌরুষ এবং নারীর পাতিব্রত্য ও আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ চিত্ররাজি বিশ্বের চিত্রশালা, এ দেশের ইতিহাস, পুরাণ ও মহাকাব্য দিয়াছে।

বহু শতব্দীর রাষ্ট্রীয় ঘুমঘোর এবং পার্থিব সম্পদে ঔদাসীন্যের পর ভারত এখন স্বাধীন ও স্বরাট্—আজ সে আন্তর্জাতিক ব্যবহার ও বিনিময়ের চতুষ্পথে দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক জগতের আহ্বান তাহার সম্মুখে। জাতীয় মর্যাদা ও সম্ভ্রম এবং যে আদর্শ ও মূল্যায়ন রীতির জন্য তাহার বৈশিষ্ট্য ইতিহাসে প্রমাণিত উহার প্রেরণায় পরি-পূর্ণ আত্মবিকাশের আকূতি তাহার অন্তরে। বর্ত্তমানে দেশকাল অতিক্রমে মানুষের নূতন কৃতিত্বের ফলে এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে পৃথিবীর পরিসর শীর্ণ ও সঙ্কুচিত, আত্মরক্ষার ব্যস্ততায় সকলে আজ দ্বন্দ্বপর এবং নূতন শক্তিবোধে অগ্রসর। অতীতের যে সকল সভ্যতা এখনও সজীব—যথা ইহুদী ও মঙ্গোলীয়, আরব ও আংলো সাক্সন, শ্লাভ, টিউটন ও লাটিন এবং সাথে সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্যোমুক্ত জাতিসকল—আজ আপন আপন গোষ্ঠীবন্ধন নবভাবে গ্রথিত করিতেছে সাধর্মের শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিতেছে এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য জগতে পরিস্ফুট করিতেছে। অখিল ইশ্লামীয় সংহতি, রোমীয় ধর্মগুরুর নায়কতায় ক্যাথলিক সমাবেশ, বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলন এসকল মানব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উদ্বুদ্ধ সচেতনতার লক্ষণ ও প্রকাশ এবং ধর্ম যে বিভাজক নহে কিন্তু সংগঠক শক্তি তাহার প্রমাণ। মানব মনোবৃত্তির এই নূতন পরিবেশের মাঝে বিশ্ব হিন্দু পরিষৎ লোকপালনী ও পোষনী ভারত-মাতার সন্তানসমূহকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর যে প্রান্তে তাহারা অচির প্রবাসী বা স্থায়ী নিবাসী হউন না কেন, তাহা-দিগের অন্তরে ঐক্যের আহ্বান ধ্বনিত করিতে এবং মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী। মহাভারতের স্মৃতি, বৃহত্তর এবং দ্বীপময় ভারতের সংযোগসূত্র, হিমবৎ প্রদেশের মিত্ররাষ্ট্র সকলের সহিত স্বাজাত্যগ্রন্থি নব জাগ্রত করার এবং হিন্দু সংস্কৃতির উদার আলোক ও উদাত্ত বাণীর যাঁহারা অগ্রদূত ও বার্তাবহ—তাঁহাদের

সম্পাদকীয়

'প্রবর্ত্তক'-এর আবির্ভাব ও অস্তিত্বের তাৎপর্য্য :

বর্ত্তমান বৈশাখ সংখ্যায় 'প্রবর্ত্তক'-এর ৫০-তম বর্ষ সুরু হইল। অর্থাৎ ১৩৭২ সাল 'প্রবর্ত্তক'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ।

বাংলা সাহিত্যের আজিকার ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি গৌরব করিবার যোগ্যতা রাখে। বিশ্বসাহিত্য-অঙ্গনে বাংলা সাহিত্যের স্থান ও দান গণনীয়; অথচ বাংলা সাহিত্যের আয়ুঃ বেশী দিনের নহে। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে গণ্য এবং ইহার আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইতেছে বর্ত্তমান ১৯৬৫ সালে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রবর্ত্তক'-এর অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ত্তি বাংলার পত্র পত্রিকা জগতে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এই পত্রিকাখানির নিগূঢ় তাৎপর্য্য আয়ুর হিসাবে নহে—অন্যত্র। প্রবর্ত্তক বাংলার ও বাঙালীর ভাব-ভাবনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। এই ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, বিচার-বিশ্লেষণ করাই হইবে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সার্থকতা। আমরা বিশ্বাস করি, এ জাতির সুস্থ স্বস্থ আত্মস্থ অভিব্যক্তির পথে প্রবর্ত্তক-এর আলো পথের সুনিশ্চিত নিশানা দিবে।

●

প্রবর্ত্তক কথাটি মন্ত্রের তাৎপর্য্য বহন করে। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল বর্ত্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি (১৯১৫) প্রবর্ত্তক পত্রিকার মাধ্যমে এই মন্ত্রের উদ্‌গান তোলেন। অর্দ্ধ যুগের মধ্যেই মন্ত্র রূপায়িত হইতে থাকে। 'প্রবর্ত্তক' প্রবর্ত্তক-প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে। 'প্রবর্ত্তক'-ই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ। মনীষী এমার্সনের কথায় "Institution is the projection of a personality." প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ 'প্রবর্ত্তক' মন্ত্রের তথা মন্ত্রবিগ্রহের চিন্ময় ভাব ও ভাবনার প্রলম্বিত কায়মূর্ত্তি।

প্রবর্ত্তকের আবির্ভাবকাল ১৯১৫। অগ্নিবিপ্লবের শিখা তখন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। বিপ্লবী মতিলাল বিপ্লবের পথ ত্যাগ করিয়াও, পুনশ্চ বিপ্লব বাধাইয়াছেন—সংগঠনের, নির্ম্মাণের। বাংলায় বিপ্লব যুগের ভাঙ্গার তাণ্ডবের মধ্যে একটা গভীর—পূর্ণাঙ্গ জীবনগঠনের স্বপ্ন ফল্গুধারার মতই তলে তলে প্রবাহিত ছিল। বাংলা ও বাঙলীর সাধনার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের তাৎপর্য্য ইহাই—এই পূর্ণ যোগ জীবনের, ব্যষ্টির ও সমষ্টির। মরমী বাঙালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, তার জাতীয়তাবোধ ও চিন্তা-ভাবনার মূলে একটা সার্ব্বজনীনতার বীজধর্ম্ম নিহিত আছে। বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া বাঙালীর এই মর্ম্ম-সত্তাটিই অভিব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে বহু এবং বিচিত্র আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া। বিগত দুই শতকে বাংলার বুকের উপর দিয়া যে সব জাগরণের অভূতপূর্ব্ব জোয়ার বহিয়া গিয়াছে

মহনীয় আদর্শ উদ্দীপিত করার এই অবকাশ। বিশ্ব-কবির ভাষায় ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান্ আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন—যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার। আকাশ পরিধি ব্যাপিয়া তাঁহার শাশ্বত আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে এবং উদ্বুদ্ধ করিতেছে—আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জানো। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য ববান্নিবোধিত—উঠ, জাগো, বরেণ্য গুরুমুখে শ্রেয়স্তত্ত্ব বুঝিয়া লও। সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং। সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রচয় বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি। এক হউক মন্ত্র, এক সমিতি, এক মন, এক আকূতি, এক মন্ত্রে তোমাদের অনুপ্রাণিত করি, এক আহুতি তোমাদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করি।

তার সমষ্টিগত ঋতিয়ানেব ফলশ্রুতিও ইহাই। বিগত শতাব্দীর জাগরণ-আন্দোলনের নিগূঢ় মর্ম্ম মনীষী বিপিনচন্দ্র পালেব কথায়: "From the very begining the modern movement in Bengal, though in its outer expression a movement of revolt against existing religious faiths and social institutions, was really in its soul and essence a movement of revival and return."

এই 'revival and return', এই আত্মস্থ হইবার, নিজেকে যুগোপযোগী করিয়া ফিরিয়া পাইবার যুগ-সঙ্কেত যে-সব যুগমানুষ দিয়া গিয়াছেন তাঁদেরই ক্রম-শৃঙ্খল ধরিয়া সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের আবির্ভাব। সেই ভারতের, বিশেষ বাংলার স্বকীয় সাধনা ও ভাবনার ঐতিহাসিক পথেবই অন্যতম যুগচিহ্নিত মানুষ ছিলেন প্রবর্ত্তক-এর প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলাল। বাংলার এই মর্ম্ম-সাধনার ইতিবৃত্ত বিস্তারের অবসর বক্ষ্যমাণ সম্পাদকীয় স্তম্ভে নাই। আমরা শুধু প্রতিনিধিস্থানীয় তিনজন যুগমানবের উল্লেখ এখানে করিতেছি যাঁদের মধ্যে এই খাঁটি ভারতীয় ধারাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই তিনজন হইতেছেন বিজয়কৃষ্ণ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ। বিগত শতকের শেষে সমগ্র শতাব্দীর জাগরণ আন্দোলনের তবঙ্গ-ভঙ্গে নাকানি-চুবানি খাইয়া যে যুগগুরু বাঙালীর এই জাগবণের স্রোতকে মৌলিক-খাতে মোড় ফিরাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে রুখিয়া দাঁড়াইলেন তিনি হইতেছেন গোঁসাইজী আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ। ঐ শতকেই আর দুইজন মহামানবের—বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মধ্যে নির্ভেজাল বাঙালী প্রতিভার বিকাশ হইতে আমরা দেখিয়াছি। প্রখ্যাত চিন্তাশীল সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন: "বঙ্কিমের সাধনায় বাঙালীর আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস ফুটিয়া উঠিয়াছে; বিবেকানন্দের প্রতিভায় বাঙালীর আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। উভয়ের সাধনায় একটা স্বতন্ত্র আদর্শের কল্পনা থাকিলেও, সে কল্পনায় কেবলমাত্র সংস্কার-প্রবৃত্তি বা misionary spiritই ছিল না, জাতির হৃদ্‌গত আশা- আকাঙ্ক্ষা... তাহার প্রাণের ভুল ও অভ্যাসের মোহ এ সকলের প্রতি তাঁহাদের একটি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ ছিল; এক কথায় তাঁহারা জাতিরই একজন হইয়া ভাবনার ভার লইয়াছিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-উত্তর বিংশ শতকে জাতির একজন হইয়া ভাবনার ভার লইয়াছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে শীর্ষতম ছিলেন অরবিন্দ-রবীন্দ্র। মনীষী বিপিনচন্দ্রের কথায়: "Rabindranath stood out here not as a successor of Keshab Chandra Sen, but rather as an inheriter of Swami Vivekananda." আর সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধনা মূর্ত্ত হইতে দেখি বিশুদ্ধ অমিশ্র জাতীয়তার ঋষি শ্রীঅরবিন্দে—যাঁর কাছে জাতীয়তা ছিল 'an article of faith—not a creed.' ধর্ম্ম ও পূর্ণ যোগকে তিনি সর্ব্বাঙ্গীন জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে নামাইয়া আনিবার সঙ্কেত দিয়াছিলেন। বাঙালীর সমষ্টিগত সাধনা ও সিদ্ধির এক পরমাশ্চর্য্য দিগ্‌দর্শন দিয়া গিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। বাঙালীর সাধ্য এই দিব্য জাতীয়তার মন্ত্র ও দিগ্‌দর্শন দিয়া ১৯১০ সালে (৩১শে মার্চ্চ) শ্রীঅরবিন্দ ফরাসী চন্দননগরের শ্রীমতিলালের গৃহবাসের আশ্রয় ও বাস্তব সংগ্রামময় জীবনক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন আর এক ফরাসী পণ্ডিচেরীর নিভৃত নিরালায়।

ধূর্জ্জটির মত যিনি এই অধ্যাত্ম-জাতীয়তার নির্ঝরিণী-প্রবাহ শিরোধার্য্য কবিয়া বিশ্বকর্ম্মার মত সমষ্টি জীবনে ইহার রূপ দিতে উন্মাদ হইলেন তিনি হইতেছেন এই প্রবর্ত্তক পত্রিকার প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলাল। তাঁর নিজেরই কথা: "এ দেশ চণ্ডীদাসের নিমাইয়ের (প্রেম)। এদেশ রামকৃষ্ণের (শক্তি)। শক্তি ও প্রেমের মন্দাকিনী-ধারায় সম্মিলিত হইয়াছে রঘুনন্দনের ন্যায়ের (জ্ঞান) বিধান। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া উঠিলেন দুই মহাপুরুষ। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ। আমাকে এই দুই ক্ষেত্রের ধূলি কুড়াইয়া মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে ঈশ্বর বিধানে। আজ এই দুই মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। তিন ক্ষেত্রেরই কর্ম্ম অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। আজ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘকে ত্রিবেণী তীর্থে স্নান করিয়া উচ্চ

কণ্ঠে বলিতে হইবে শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় এই ত্রিপ্রস্থানের উপর সনাতন ভারতের প্রতিষ্ঠা হইবে। হে উদীয়মান প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ! এই জন্যই তোমাদের জন্ম। তোমরা আমার জীবনে লভিয়া জীবন সফল করবে দেশ।"

ত্রিবেণী তীর্থ বলিতে শ্রীমতিলাল জ্ঞান, শক্তি, প্রেমের কথাই বলিয়াছেন। বাঙালীর স্বপ্ন যে পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তা তাহা এই ত্রি-স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জাতীয়তা রূপায়ণের দিক দিয়া শ্রীমতিলাল ছিলেন অসামান্যদের মধ্যেও অসামান্য। মনীষী সাহিত্য-সমালোচক অতুল গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন: "সে যুগ (বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক) কিছু মানুষকে গড়েছে যাঁরা অসামান্য, সকল দেশের অসামান্যদের মধ্যেও অসামান্য।...জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের কথা আমরা অতি সহজে বলি। কিন্তু সে সমন্বয় অতি অল্প মানুষের, এমন কি অল্প মহাপুরুষের জীবনেও প্রকৃত দেখা যায়। মতিলাল রায় ছিলেন সেই অল্প মানুষের একজন।"

বক্ষ্যমাণ সম্পাদকীয়ের প্রারম্ভেই আমরা মন্তব্য করিয়াছি যে, 'প্রবর্ত্তক'-এর সার্দ্ধশতবর্ষ শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, পরন্তু ইহা বাংলার ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ও বাঙালীর সাধ্য ও সাধনার ইতিহাসের মৌল ভাবের অভিব্যক্তির স্বকীয় ধারাটি টানিতে হইয়াছে। আজকের বিভ্রান্ত ভাব-অরাজকতার মধ্যে প্রবর্ত্তকের অস্তিত্ব ও 'মিশনে'র সত্য স্বরূপটি সাময়িকতার মাপকাঠিতে নিরূপিত না হইলেও, অনতিদূর অনাগত কাল ইহা নিশ্চয়ই অবারিত করিয়া ধরিবে। প্রবর্ত্তকের প্রতিষ্ঠাতার ত্রি-মন্ত্রাশ্রয়ী জাতি সাধনা ও প্রেরণার ধারক ও বাহক ছিল প্রবর্ত্তক পত্রিকা। বস্তুতঃ প্রবর্ত্তকের প্রাণপুরুষের ইতিহাসই প্রবর্ত্তক পত্রিকার ইতিহাস।

১৯১৫ সাল। অপস্রিয়মান অগ্নি বিপ্লবের এক সন্ধিক্ষণে প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব। বিপ্লবী মতিলালের জীবনের মোড় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভাঙ্গার উত্তেজনা হইতে মুখ ঘুরাইয়া তিনি হইয়াছেন নির্ম্মাণে স্বপ্নবিভোর। নির্ম্মাণের রূপটি তখনও প্রকট হইয়া উঠে নাই। পাক্ষিক প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় এই নির্ম্মাণের রাগিণীরই মূর্চ্ছনা তুলিয়াছেন। সে সময়কার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন: "আমি আত্মহারা উন্মাদ, এখনও আশ্রয় পেলুম না—দিব্য আশ্রয়। নির্ম্মাণের প্রেরণা এসেছে। আমি একটা সিদ্ধ ক্ষেত্র খুঁজছি। বাড়ী-ঘর নয়—হৃদয়। ব্যক্তির হৃদয় নয়, সমষ্টির হৃদয় চাই।" ভাবী সঙ্ঘসৃষ্টির গর্ভবেদনায় তখন তিনি অস্থির, উন্মাদ। এই সঙ্ঘ-সৃষ্টির প্রেরণায় তিলে তিলে নিজেকে উৎসর্জন করিয়া সৃষ্ট হইতে চাহিয়াছেন একটা মণ্ডলীর মধ্যে—ব্যাপ্তিতে নয়, সংক্ষিপ্ত বীজাকারে। প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় তাঁর এই সৃজনের গান শুনিয়াই দূর-দূরান্তর হইতে তরুণের দল চন্দননগরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথী তীরে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে এবং তাঁকে ঘিরিয়া একাত্ম হইয়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ মধুচক্র রচনা করিয়াছে। 'প্রবর্ত্তক' প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে-পরিপূর্ত্ত হইয়াছে। প্রবর্ত্তক পত্রিকা আত্মোৎর্গের প্রেরণা বক্ষে বহন করিয়াছে, মরমীকে টানিয়া আনিয়াছে, একত্রিত ও একাত্ম করিয়াছে। প্রবর্ত্তক এ দিক দিয়া অনন্য। বিশ্বে পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে এমন নজীর সম্ভবতঃ আর দ্বিতীয়টি নাই। ভলটেয়ার-রুশো, মার্কস-এঞ্জেল ফরাসী ও রুশ-বিপ্লবের ভাব বীজের অগ্রগামী প্রচারক, আর শ্রীমতিলাল ছিলেন একাধারে ভারতে ভাগবত জাতি-গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্রষ্টা।

প্রবর্ত্তক-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার অনুষ্ঠান পত্রে পত্রিকার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে 'চরিত্র গঠন'—ব্যষ্টি, সমষ্টি ও জাতির। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে প্রবর্ত্তকের কাণ্ডারী শ্রীমতিলাল রক্ত-বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া জাতির চরিত্রগঠনের পথে অগ্রসর হন। এই পথে চরিত্রগঠন-মূলক আদর্শকে রূপ দিতে গিয়া অনিবার্য্য ক্রমেই সঙ্ঘত্ব তাঁর উপলব্ধির আলোতে ভাসিয়া উঠে। তাঁর নিজেরই কথা: "শ্রীঅরবিন্দ চাহিয়াছিলেন সংগঠন। সে সংগঠনের ভিত্তি-রচনা 'তেল-নুন-লকড়ি' নহে, পরন্তু মানুষের সবখানি উৎসর্গ করিয়া দিব্য জন্মলাভ এবং এই উৎসর্গীকৃত মানুষ লইয়া সংহতি সৃষ্টি। আমি এই পথই

শ্রেয়ঃ করিয়াছি। বিপ্লব যুগের উপর যবনিকা ফেলিয়া তাই আজ এই মন্ত্রই উচ্চারণ করি—'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

এই সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে গিয়া বিপ্লব ত্যাগ করিয়াও, পুনশ্চ তাঁহাকে বিপ্লব বাধাইতে হইয়াছে। চন্দননগরের এক নিরালা কোণ হইতে প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় মাসের পর মাস তিনি এই নব বিপ্লবের আহ্বানই দিয়াছেন। "হত্যা কর, বিনাশ কর, বিধ্বংস কর"—রক্ত বিপ্লবের এই চীৎকারের মোড় ফিরাইয়া তিনি সঙ্ঘত্বের মধু রাগিণী ধরিলেন—'এক হও, সংহতিবদ্ধ হও, দিব্য সৃজনের সিদ্ধ উপকরণ হও'। প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায়ই তিনি আহ্বান দিলেন: "হে নব জাতির ভগীরথ, জীবনচক্রে গ্রহ-উপগ্রহের প্রভাব, লোক-সমাজ আত্মীয়স্বজনের আনুকূল্য সব অস্বীকার কর।" তিনি ইঙ্গিত করিলেন: "এখানে ব্রাহ্মণের উপবীতের মোট খসিয়া পড়ে, বৈশ্যত্ব শূদ্রত্বের বোঝা নামাইতে হয়।" প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায়ই প্রবর্ত্তকের প্রাণপুরুষ এক প্রীতি-নগরের আদরা টানিলেন: "এই দিব্য রাজ্যের দিব্য মানুষ এখানে নূতন বর্ণ, নূতন আশ্রম গড়িয়া একটা নব রাজ্য নির্ম্মাণ করিবে, এই নূতন দেশের প্রজারা দেবজাতি বলিয়া একটা নব সৃষ্টির দুয়ার খুলিয়া দিবে।"

প্রবর্ত্তক-প্রতিষ্ঠাতার নব সৃজনের এই প্রাণায়িত আহ্বান দূর-দূরান্তের সমাজের শান্ত নীড়ে কম্পন তুলিল। দিগ-দিগন্তর হইতে পুরাতনের ভিত্তি উপড়াইয়া, গৃহ-পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া সন্ধানীরা আসিয়া চন্দননগরের ভাগীরথী তীরে একত্রিতই শুধু হইল না, এই নব রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টার অনাবিল হৃদয়-উৎসারিত প্রেমপ্রীতির প্লাবনে ডুবিয়া-মজিয়া এক হইল। এই মধুচক্রই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বনিয়াদ। আর প্রবর্ত্তক পত্রিকা এই প্রীতি-রাজ্যের পতাকা।

১৯১৫ হইতে ১৯২১ এই ছ' বৎসর প্রবর্ত্তক পাক্ষিক পত্রিকাকারে প্রকাশিত। সপ্তম বর্ষ হইতে প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রিকায় পরিণতি লাভ করে। এই অর্দ্ধ যুগ প্রবর্ত্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠা সঙ্ঘ-সৃষ্টির স্বপ্ন-প্রেরণার আভাষ-ইঙ্গিতেই আকীর্ণ হইয়া ছিল। ১৯২১ সালে সংগঠন-মূলক সঙ্ঘ-সংস্থার বাস্তব রূপায়ণের যে সূচনা হয় তাহাই ক্রমশঃ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে পরিণত হয়। বিপ্লবী মতিলালের হয় সঙ্ঘগুরুত্বে প্রতিষ্ঠা। পূর্ব্বরাগের অনুরাগ ব্যঞ্জনায় পাক্ষিক প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠা ছিল রঙীন। তাঁহার ডাক শুনিয়া যে-সব তরুণের দল আসিয়া উপনীত হয় উৎসর্গের হোমানলে তাহাদের বাসনা-কামনা, ঐন্দ্রিয়িক প্রবৃত্তি, আর সমগ্র অতীতকে পোড়াইয়া শুদ্ধ সিদ্ধ করিয়া দিব্যাকার দিবার যে প্রযত্ন তিনি করেন তাহারই আভাষ পরবর্ত্তী মাসিক প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত। সঙ্ঘ সংস্থাকে দৃঢ় সংহতিবদ্ধ করার উদগ্র প্রেরণায় তিনি তাঁর হিয়াকে মুক্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন। সমাগতদের উদ্দেশ্যে সে-সময়কার তাঁর মরমের বাণী ছিল: "আমরা যত মানুষ এখানে একত্র হয়েছি তারা সত্যই যদি ভগবানের মানুষ হয়, আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘই অতীতের ধর্ম্মগুরুগণের যে মর্ম্মবাণী তা পূর্ণ করবে। সংসারবাসনা, মোক্ষাদি কামনার ন্যায় ভগবদ্ নারীপুরুষের দেবজন্ম লাভের কামনাও বিসর্জ্জন দিতে হবে। কামনা মাত্র হৃদয়ে স্থান পাবে না। শ্রীরাধার বুকের বসনটুকুও শ্যামচাঁদের স্পর্শের বাধা-স্বরূপ হয়েছিল। ভগবানে যার সবখানি ভরে যায়, তার বুকে কোন কামনার বীজ তো ঠাঁই পায় না। হে সঙ্ঘ, তেমন বৃন্দাবন সৃজনের সত্যই কি তুমি বীজমূর্ত্তি? কাজ কি আজ ঘরের কথায়, পরের কথায়, নিজের কথায় —এস না গো শ্যামের কথায় আজ ভুবন ভরাই। শুইতে খাইতে সর্ব্ব কার্য্যে সেই প্রিয়তমের অমিয় নিছানি রূপের রেখাই এস না আঁকিয়া যাই! কি হবে এ জীবনের, কি চাওয়া এ সাধনের—সব কি ধুয়ে মুছে নিঃসঙ্গ অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে আমরা ভগবানের হাট বসিয়ে যেতে পারি না—কেবলই আনন্দ, কেবলই আলো—ক্লান্তি দুঃখ সেখানে নাই! এমন একটুখানি বৃন্দাবনের ছবি যদি জীবন দিয়ে গড়া হয়, সেই লক্ষ্য ও আদর্শ সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব দুঃখ দূরের অব্যর্থ কারণ হবে।"

সঙ্ঘগুরুর এই হৃদয়বিগলিত আকুতি শুধু সাহিত্য-সম্পদেই অনুপম নহে, ইহার দিব্যজীবন গঠনের তাৎপর্য্য আরও গভীর, আরও ব্যাপক।

প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় সঙ্ঘগুরুর 'প্রেম বৃন্দাবন রচনার' আহ্বান দূর-দূরান্তের তরুণের প্রাণে সাড়া তুলিল। তাঁকে কেন্দ্র করিয়া চন্দননগরে ভগবানের হাট জমিয়া উঠিল। এই হাটের মুষ্টিমেয় অনুরাগী হাটুরিয়ার উপর ভর করিয়া তিনি ১৯২৩ সালে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব, জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর প্রবর্ত্তন করিলেন। ভারতীয় ভাব ও আদর্শের প্রচার, স্বদেশী শিল্পের প্রচলন এবং ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের প্রচার দ্বারা সমাজমানুষকে উজ্জীবিত করিয়া ধরাই ছিল এই জাতীয় অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের উদ্দেশ্য। এই সময় হইতেই মাসিক প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠা ভরিয়া উঠিল এক ও বহু রঙীন চিত্রে ও বাংলার লুপ্ত গৌরবের পরিচয়ে। এই সময়কার প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত সচিত্র 'ভাগীরথী চিত্রশালার বিবরণী' বাঙালীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিগত দেড়শো বছরে পশ্চিমী শিক্ষা ও সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, যুক্তি, চিন্তা ও চমৎকারিত্ব জাতীয় চিত্তে যে আত্ম-বিস্মৃতি আনে, ভারতীয় সব কিছুকে হেয় করার যে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে, যে বুদ্ধিভ্রংশতা তৎকালীন বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে, এই অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের মধ্য দিয়া সঙ্ঘগুরু উহারই নিরসন করিয়া জাতিকে আত্মচৈতন্যে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতেই চাহিয়াছিলেন। সঙ্ঘগুরুজী আকস্মিকই ইহা করার জন্য উদ্যোগী হন নাই। বিগত শতকের নব জাগরণ-আন্দোলনের বিধ্বংসী উত্তেজনার তলে তলে যে আত্মস্থ হইবার প্রবৃত্তিটি ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল তাহাই বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সঙ্ঘগুরুজীর মধ্যে বাস্তবায়িত হইতে দেখা যায়। ভারত ইতিহাসের স্বকীয় গতিপথেই সঙ্ঘগুরুর আবির্ভাব, জীবন ও কর্ম্ম।

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে সঙ্ঘগুরু যে উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করেন তাহার মর্ম্মই ছিল মূল জাতিসত্তার উদ্বোধন। সঙ্গীতটি এই :

বেদধ্বনি তোল, তোল সামগান,
কোটী কণ্ঠে তোল শিবের বিষাণ
মোহমুগ্ধ জাতি লভিয়া চেতন,
শির তুলি আজি জাগরে ॥
নাহি আজি ভয়, নাহিক সংশয়,
অমৃতের পুত্র, তোরা মৃত্যুঞ্জয়।
জ্ঞান, বীর্য্য, গতি সকলি অক্ষয়,
নব জন্ম আজি মাগরে ॥
হৃদয়ে-হৃদয়ে জাগ নারায়ণ,
প্রতি জীবে শিব হও সচেতন।
ঘরে-ঘরে ঘুরি ব্রহ্ম-নাম গাহি,
কত প্রেম-অনুরাগরে ॥
বল জয়-জয় ভারতের জয়,
মন্ত্র, গুরু, তীর্থ, দেবতার জয়
পুণ্য দেবভূমি, নমি তারে নমি,
ভাসিরে অমৃত-সাগরে ॥

জাতীয় ইতিহাসের অন্তর্সংবেগই সঙ্ঘগুরুর এই প্রচেষ্টার মাঝে চরিতার্থতা পাইয়াছে। মনীষী বিপিন-চন্দ্রের কথায় "To fulfil the moral end of modern Indian history and evolution, it was absolutely necessary that the spell which the European illumination had cast over educated India should be broken."

সঙ্ঘগুরুজীর সমগ্র জীবন ও কর্ম্মধারা এই জাতীয় মোহমুক্তি লক্ষ্যেই নিয়োজিত হইয়াছিল। 'প্রবর্ত্তক'-এর আবির্ভাব ও অস্তিত্ব প্রসঙ্গে এত কথা বিস্তার করিতে হইল এই জন্য যে, সঙ্ঘগুরুজীর ভাবময় আত্মপ্রকাশ প্রবর্ত্তকের মাধ্যমেই হইয়াছিল এবং এখানেই ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যমূলক প্রবর্ত্তক পত্রিকা ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।

১৯২৫ সালে সঙ্ঘগুরু সমাগত ছাব্বিশজন তরুণ-তরুণীকে দীক্ষা দেন। এই সময় হইতেই তিনি অতীতের সর্ব্ব সংস্কার, সকল গুরু ও নেতার প্রভাবমুক্ত হইয়া পূর্ণ আত্মস্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হন এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব ছন্দে সর্ব্বোৎসর্গীকৃত তরুণ-প্রাণ-সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া অর্থ, সমাজ, শিক্ষা জাতির আত্মবিকাশের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কৃতিসম্মত ভাব ও চরিত্রের প্রতিষ্ঠা দিতে প্রযত্নবান হন। ইহারই ফলশ্রুতি ১৯৩২ সালে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'প্রবর্ত্তক ট্রাষ্টে'র সংগঠন। কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা শুধু অভিনব নয়, অদৃষ্টপূর্ব্বও

বটে। "To fulfil the moral end of modern history and evolution"-এর ইহা অত্যন্ত বস্তুতন্ত্র পদক্ষেপ। ভারতীয় ইতিহাস ও অভিব্যক্তির মৌল সাংস্কৃতিক দিকটি বলিষ্ঠ বস্তুতন্ত্র-ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠে সঙ্ঘগুরুর জীবন ও কর্ম্মসাধনায় এবং প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় হয় তাহারই প্রতিফলন।

১৯৪০-৪১ সালে প্রবর্ত্তকের রজত জয়ন্তী বর্ষ। এই উপলক্ষে বাংলার বারটি জেলায় বারটি সভা করিয়া তিনি প্রবর্ত্তক তথা ভারত-বাণী প্রচার করেন। বৎসরান্তে প্রবর্ত্তকের বর্ত্তমান সম্পাদকদ্বয়ের উপর পত্রিকা-সম্পাদনার তথা তাঁর 'মিশন'-এর ধারণ ও বাহনের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর জ্ঞান, শক্তি, প্রেম এই ত্রিবেণীস্নানের যে পুণ্য ও সঞ্চয় তাহা তিনি অবিশ্রান্ত লেখনীচালনায় প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় পরিবেশন করেন। ভারতের সংস্কৃতি-সভ্যতার ত্রিস্তম্ভ—জ্ঞান-শক্তি-প্রেম, আর ত্রিপ্রস্থান—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ের যুগসম্মত বিশদ ব্যাখ্যা করেন প্রবর্ত্তক পত্রিকায়। তাঁর এই বলিষ্ঠ জীবন-ভাষ্য নূতন সৃষ্টি বলিয়া যুগমনীষীর নিকট অভিনন্দিত হইয়াছে। সঙ্ঘ-পতাকা প্রবর্ত্তক ও সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ভাবময় সঙ্ঘগুরু যুগনদ্ধ হইয়াই চলিয়াছে। ভক্ত, ভগবান, ভাগবত যেমন এক, তেমনিই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘগুরু ও প্রবর্ত্তক পত্রিকা অভেদ, অবিচ্ছিন্ন। এই তিনের ঐক্যেই এক অখণ্ড ভাব-সত্তা।

●

১৯১৫ হইতে ১৯৬৫ এই পঞ্চাশ বৎসরে ভারতে ও বহির্বিশ্বে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বাংলার অগ্নিবিপ্লবের শেষ অধ্যায়, মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ, নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র ভারতাভিযান, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, রুশের সাম্যবাদী বিপ্লব, চীনের গণ-আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠা, খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ, বিশ্বের বুকে এক নূতন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম, অ্যাফ্রোএ্যাশিয়ার বহু রাজ্যের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ-মুক্তি প্রভৃতি এই অর্দ্ধ শতাব্দীরই স্মরণীয় ঘটনা।

প্রবর্ত্তকের প্রাণপুরুষ পূজনীয় সঙ্ঘগুরু ছিলেন আজন্ম বিপ্লবধর্ম্মী। প্রবর্ত্তকের পাদপীঠে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি—সর্ব্ব বিষয়েই তিনি ভাঙ্গা-গড়ার মাঝে তাঁর রুদ্র নৃত্যের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই হেতুই প্রবর্ত্তকের জীবন-দর্শনের নবীনতা ও বৈশিষ্ট্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। প্রবর্ত্তক অতীতকে বর্জ্জন করে নাই, পরন্তু বিশুদ্ধ করিয়া যুগসঙ্গতি দিতে চাহিয়াছে। প্রবর্ত্তকের জগৎ ও জীবনবোধ, তার জীবন-দর্শন ও তত্ত্ব কোথাও চিরন্তন ভারতের শাশ্বত অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির মৌলিক সিদ্ধধারা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় পরিবেশিত সঙ্ঘগুরুজীর বিশাল আর বিচিত্র কাব্য-সাহিত্য-নাট্য সৃষ্টিতেও ভারত-সংস্কৃতির এই মূল সুরটিই অনুরণিত। কারণ, প্রবর্ত্তক এ শতাব্দীর দিব্যদর্শী ঋষিকবির সহিত বিশ্বাস করে: "জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ব্বাক তাহারই জয় হইবে।"

প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বৎসরে বিশ্বে মানবপ্রগতির যত ঘটনা, যত আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহার পরম পূর্ত্তি ও পরাকাষ্ঠা নিহিত এই অমিশ্র ভারতের অভ্যুদয়ে—এই উদার সার্ব্বভৌম ভারতেরই জয়ে। ভারতের এই পূর্ব্বদিগন্ত হইতেই এই বিশ্বজয়ের নব সূর্য্যোদয় হইবে। বাংলা ও বাঙালী হইবে এই বিশ্ব-জাগরণের মাধ্যম। বাংলার ঋষিকবি, বাংলার বিপ্লবী ও মনীষী, বাংলার গুরুমণ্ডলীর অভ্যুদয়, সাধনা ও সিদ্ধি এই সঙ্কেতই বহন করে। বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সাধনা, বাঙালীর চিন্তা-ভাবনা ও জাতীয়তাবোধের মূলে এমনি একটা সার্ব্বজনীনতার বীজধর্ম্ম, এমনি একটা ভৌম মানব-চেতনা, একটা সর্ব্বগ্রাসী সংবেদন বিদ্যমান। এবং বিদ্যমান বলিয়াই বিশ্বমানব-"সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে।" এবার সিন্ধু, দৃষদ্বতী, গঙ্গাতটের সিন্ধুসভ্যতা অথবা ব্রহ্মাবর্ত্ত বা আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতা নয়, এবার ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষে মানব সভ্যতার এক মহামহিমময় প্রকাশ প্রকট করিবার প্রস্তুতি ইতিহাসের নেপথ্যে তড়িৎ গতিতে চলিয়াছে। ঋষিকবি এ সংবাদ বাঙালীকে পূর্ব্বাহ্নেই শুনাইয়াছেন: "এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত

সমুদ্রশাসন

অজিত সরকার

…কে জানে কোন্ সুদূর অতীতে এই সুন্দর রহস্যময় বৈচিত্র্যপূর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি হোয়েছিল। কতো পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-উপবন, দুস্তর মরুভূমি, শ্যামল প্রান্তর…তরঙ্গময় মহাসমুদ্র-বিরাজিত এই পৃথিবী! আর এরই মধ্যে আছে অসংখ্য পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ-পরিপূর্ণ নানা শ্রেণীর প্রাণী। এই প্রাণীরা প্রতিক্ষণেই নিজেদের মধ্যে এবং প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ কোরে চলেছে—বাঁচার জন্য, আশ্রয়ের জন্য, বংশবিস্তারের জন্য। এই অবিরাম জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ-প্রাণী ধীরে ধীরে অন্য সকল প্রাণীদের পরাজিত কোরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কোরলো।

…কিন্তু যুদ্ধ থামলো না। যুদ্ধ চ'ললো মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির—বলের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, মস্তিষ্কের দ্বারা। এই তিনটি যে-যেখানে অপারক হোলো সেই সেইখানেই প্রকৃতিকে তুষ্ট করার জন্য সুরু হোলো স্তুতির। এই স্তুতি থেকে জন্ম নিলো পূজার্চনা। প্রকৃতির নব নামকরণ হোলো—ভগবান। এই ভগবানকে আশ্রয় কোরেই মানুষ তার পথচলা সুরু কোরলো,—থেমে থাকলে তো তার আর চ'লবে না। আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মজনও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চ'ললো; খাদ্যাভাব, স্থানাভাব হোতে লাগলো। তাই মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন হোলো।

…পরিশ্রমী সঞ্চয় সুরু কোরলো, আর অলস যে সেই সঞ্চয় অলক্ষ্যে আত্মসাৎ কোরতে লাগলো। এই অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য আবির্ভাব হোলো ক্ষমতা-শালী ব্যক্তির। আর এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্র কোরেই দল ও গোষ্ঠীর সৃষ্টি হোলো।…পরবর্তী যুগের এরাই তো রাজা বা সম্রাট্! এই রাজামহারাজারাই…

ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ…একটা করুণ আর্তস্বরে ইন্দ্রনীলের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হোলো। আকাশপথে উড়ে যাচ্ছিল একদল শ্বেতহংস, তার মধ্য হোতে একটি বাণবিদ্ধ হোয়ে অর্ণবপোতের পাটাতনের ওপর ঝট্‌পট্ কোরতে কোরতে প'ড়লো।—ধনুকহস্তে একটি কিশোর ছুটে তার

থেকে ইতিহাসের সে নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হবে মহা-প্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে।" তাই মরমী বাঙালী আসন্ন মহাপ্রলয়ের সূচনায় আশঙ্কিত নহে। ইহা নূতন ইতিহাস রচনার ঘনঘটা বলিয়াই সে প্রত্যয় করে। এ-যুগের এক মহামানব শুধু বিশ্ব মানব সভ্যতার দৈববাণীই শুনেন নাই, পরন্তু তিনি এই বিশ্বগগন-আলো-করা সভ্যতা-সূর্য্যের পদধ্বনিও শুনিয়াছিলেন। যুগপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় এই আগমনীর গানই শুনাইয়া গিয়াছেন। অমোঘ বিশ্বাস বুকে লইয়া তাঁরই আলোর ইশারা অনুসরণ করিয়া প্রবর্ত্তক অতীতে পথ চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব করিয়া তুলিবার তপস্যা করিয়া চলিবে।

দিকে এগিয়ে এল। সমবেত ক্ষুদ্র জনতা উল্লসিত হোয়ে শতকণ্ঠে কিশোরের প্রশংসা কোরতে লাগলো।

ক্ষণেকের তরে ইন্দ্রনীলের মন বিষণ্ণ হোয়ে ওঠে। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার উদ্দেশ্যে—ভাগ্যান্বেষণে এই হংসটি যাচ্ছিল কতো দূর হোতে কতো দূরে। কতো দেশ অতিক্রম কোরে সে তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এই বিশাল সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছিল—অতর্কিতে সব শেষ হোয়ে গেলো তার! ইন্দ্রনীলের জীবনও কি এমনিভাবে শেষ হোয়ে যাবে? কে জানে। এতো আশা, আকাংক্ষা, চেষ্টা, উদ্যম শেষ হোয়ে যাবে ঊর্মিমুখর সমুদ্রে—এই বাণিজ্যিক অর্ণবপোতে?···

স্কন্ধের ওপর পেছনে মৃদু করস্পর্শ অনুভব কোরলো ইন্দ্রনীল; বুঝতে পারলো এ দুর্দিনে এই একমাত্র রক্ষক, পরামর্শদাতা ও পরম মিত্র—কোদণ্ড। মৃদু হেসে ইন্দ্রনীল প্রশ্ন কোরলো,—এতক্ষণ কোথায় ছিলে, মিত্র?

—দন্তপুরের (দাঁতন) সেই সার্থবাহর (বণিক্) সঙ্গে আলাপ কোরছিলাম। দেখলাম, লোকটির শুধু গৌড় নয়—ভারতবর্ষের বহু রাজ্য সম্বন্ধেই বেশ জ্ঞান আছে।

—নোতুন কোন সংবাদ পেলে?

—তা নোতুন সংবাদ কিছু পেয়েছি বৈকি; কোদণ্ড বলে, দশ বছর পূর্বে আমি ভারত ত্যাগ কোরেছি; আর এই সার্থবাহ মাত্র দু'বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল শ্যামদেশে। দু'বছর পূর্বের যে-সব সংবাদ ও দিলো তাও তো আমার কাছে নোতুন। আমি চার বছর অধ্যয়নের জন্য সোমপুর বিহারে ছিলাম, তা তুমি জানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের মতন বিশাল দেশের কতোটুকুই বা জানা যায়।

—তা বটে।—ইন্দ্রনীল সায় দেয়।

—তা ছাড়া—কোদণ্ডদেব বলে, সেদিন যে-চোখে যে-কৌতূহল নিয়ে ভারতকে দেখেছি—তার লোকজন, রাজামহারাজাদের জেনেছি, আজ সে চোখও নেই, সে কৌতূহলও নেই—আছে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য, নিজের সুযোগ ও সুবিধার জন্য···হাঁ, যে কথা সেদিন হোচ্ছিল—ভাল মুক্তোর জন্য তোমাকে যেতে হবে পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী মাদুরায়। সেখানকার মুক্তো সত্যই বিখ্যাত। আসুন শ্যামদাস! এই আপনার কথাই হোচ্ছিল।

সার্থবাহ শ্যামদাস বলে, আপনাকেই তো খুঁজছিলাম, মিত্রদেব। আলোচনার মধ্যপথেই হঠাৎ আপনি চ'লে এলেন। হাঁ, মুক্তার কথা কি বোলছিলেন—পাণ্ড্য-রাজ্যের কথা? মুক্তার ব্যবসা অবশ্য পাণ্ড্যরাজ্যেই ভাল হয়; কিন্তু তাতে পাণ্ড্যরাজের কোন লাভ নেই—দুর্বল পাণ্ড্যরাজ তো কাঞ্চীর পল্লবরাজের অধীন। মুক্তার ব্যবসা তো পল্লবদেরই হাতে।

ইন্দ্রনীল প্রশ্ন করে, পল্লবরা তো ভারতে বিদেশী?

শ্যামদাস উত্তর দেয়, ভারতে কে-যে দেশী আর কে-যে বিদেশী—বলা শক্ত। প্রতিনিয়তই ভারতে বাইরে থেকে লোক আসছে, আর প্রতিনিয়তই ভারত থেকে লোক বাইরে যাচ্ছে। এই ধরুন না, আপনাদেরই কথা; আপনারাই তো বলেন, আপনার পাঁচছয় পুরুষ আগে কম্বোজে ব্যবসা কোরতে এসেছিলেন, তারপর ঐখানেই থেকে গেছেন। এখন আপনারা কম্বোজীয় না ভারতীয়?

ইন্দ্রনীল বলে, কথাটা মন্দ বলেন নি। আমরা বহু চেষ্টা কোরেই বৈবাহিক সম্বন্ধ ভারতীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছি; কিন্তু বহু ভারতীয় তো তা রাখে নি। কম্বোজীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বিবাহ একটা বিশেষ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাসতে হাসতে কোদণ্ডদেব বলে, হয়ত আরও কয়েক শতক পরে ভারতীয় পল্লবদের মতন আমাদের নিয়েও কম্বোজ জাতিতত্ত্বের গবেষণা চ'লবে।

সার্থবাহ শ্যামদাস বলে, আমি ভেতরে যাচ্ছি—এখানে বড্ড বাতাস; লোনা বাতাসে আমার ঠোঁট ফেটে ভীষণ জ্বালা কোরছে।

শ্যামদাস চ'লে গেলে ইন্দ্রনীল বোললো, কোদণ্ড, তুমি বাক্ সংযত কোরতে চেষ্টা করো—একান্ত নির্জন না হোলে, কখন নিজের মনোভাব প্রকাশ কোরবে না,—যদিও শ্যামদাস আসা মাত্রই তুমি কথার মোড় ঘুরিয়ে মুক্তার ব্যবসায়ে লেগে গেছলে, তবু···

—হাঁ, তুমি ঠিকই বোলছো, কোদণ্ড বলে, কিন্তু সমুদ্রে এই জল-জীবন আর ভালো লাগছে না।

—উপায় কি!

দু'জনে অর্ণবপোতের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়ালো। রাশি রাশি তরঙ্গ এসে সেই জলযানের গাত্রে আঘাত কোরে শুভ্র ফেনার সৃষ্টি কোরছিল। হু হু কোরে অশান্ত বাতাসে ওদের উত্তরীয় উড়িয়ে দিচ্ছিলো। পোতের সমস্ত পালগুলো পরিপূর্ণভাবে ফুলে উঠেছিল। একটানা একটা সোঁ সোঁ শব্দ কোরে তরীখানি এগিয়ে চ'লেছিল। অনুকূল বাতাসের জন্য ক্রীতদাস দাঁড়িদের দাঁড় টানা বন্ধ হোলো—তারা সাময়িক বিশ্রাম পেলো।

দূর দিক্‌চক্রবালের দিকে দুই বন্ধু তাকালো। গাঢ় নীলবর্ণের একটা বিরাট কড়া উপুড় কোরে জলের ওপর কে-যেন ফেলে রেখেছে। কিন্তু ঐ কড়ার বৃত্তাকার সীমানাই সীমানা নয়। যতো অগ্রসর হবে ততোই বর্ধিত হবে···এই বর্ধনের শেষ হবে দূরে—বহু দূরে তাম্রলিপ্ত বন্দরে। পেছনে ফেলে আসছে দুস্তর জলরাশি-প্রান্তে অবস্থিত শস্য শ্যামল সুসমৃদ্ধ এক জনপদ—নাম যার কম্বোজ। রত্নদত্ত ও মিত্রদেব এই দুই ছদ্ম নামে এবং মুক্তাবণিকের ছদ্মবেশে চ'লেছে কম্বোজের রাজ্যচ্যুত, পলায়িত যুবরাজ ইন্দ্রনীল আর তারই আবাল্য সখা বীরশ্রেষ্ঠ কোদণ্ডদেব।

কোদণ্ডেরই উৎসাহে ও পরামর্শে ইন্দ্রনীল চ'লেছে ভারতবর্ষে। এই ভারতবর্ষের অন্তর্গত গৌড়, পৌণ্ড্র-বর্ধন, বঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ ও গঙ্গাডিহির রাজারা ইন্দ্রনীলদের সগোত্র। ইন্দ্রনীলের পূর্বপুরুষ গঙ্গাডিহি রাজ্য থেকেই কম্বোজ গিয়ে রাজ্য বিস্তার কোরেছিল। সেই গঙ্গাডিহি বর্তমান সপ্তগ্রাম নামে পরিচিত। কিন্তু এখন আর সপ্তগ্রাম রাজ্যের সে গৌরব-গরিমা নেই। এখন সপ্তগ্রাম গৌড়ের অধীন। গৌড়ও বর্তমানে পর্যাপ্ত ক্ষমতাশালী নয়। যে-লৌহমুদ্গর (লগুড়) চালনায় অধিবাসিগণ সিদ্ধহস্ত ছিল বলে গৌড় (লগুড়-গুড়-গৌড়) জনপদের নামকরণ, যে-গৌড়জন কুরুক্ষেত্রে লৌহমুদ্গর-চালনায় অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন কোরে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন কোরেছিল, সে গৌড় আর নেই,—বহুদিন ধরে মগধের গুপ্ত রাজাদের অধীনে থাকায় সে গৌড় আর পূর্বের গৌড় নয়; তবে সম্প্রতি সে মগধের অধীনতা অস্বীকার কোরেছে,—এইটুকু নিশ্চয়ই মন্দের ভাল। কিন্তু বঙ্গ ও সমতটের রাজাদের নৌবাহিনী গুপ্তরাজাদের আমলে ধ্বংস হোয়ে গেছে। এখন তবে কোন্ রাজার কাছে ইন্দ্রনীল সাহায্যের জন্য যাবে? কোন্ পক্ষই বা সম্ভবতঃ তাকে সাহায্য কোরবে? অবশ্য কোদণ্ডর মতানুসারে তারা তাম্রলিপ্ত হোতে সোজা পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যেই যাবে। ঐ রাজ্যের অন্তর্গত সোমপুর বিহারে কোদণ্ড চার বৎসর কাটিয়েছিল। ওখানে তার পরিচিত অনেকে আছে—তাদের সাহচর্য ও পরামর্শই প্রথমে ওরা গ্রহণ কোরবে। তারপর...

যদি সত্যই আবার অর্থ, সৈন্য ও রণতরী সংগৃহীত হয়, তাহোলে ইন্দ্রনীল একবার ভাল কোরে দেখে নেবে চির শত্রু চম্পারাজ (অনোম) গ্রহবর্মাকে যে-পাষণ্ড অন্যায় যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার সহায়তায় তাহার পিতাকে বধ কোরে কম্বোজ অধিকার কোরেছে। শুধু কি তাই! তার প্রাণপ্রিয় ভগিনী শর্মিষ্ঠাকে জোর কোরে নিজের অঙ্কশায়িনী কোরেছে! ইন্দ্রনীল সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিতেই উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু কোদণ্ডই তাকে নিরস্ত করে। প্রতিশোধ! হাঁ, প্রতিশোধ নিতেই হবে। চম্পারাজ গ্রহবর্মাকে উচিত শাস্তি দিতেই হবে। চাপা উত্তেজনায় ইন্দ্রনীলের পেশী-বহুল সুদৃঢ় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কোরতে থাকে।

চম্পা ও কম্বোজ—পাশাপাশি দুটো রাজ্য। দুই রাজ্যের রাজারাই ভারতীয়। ভারতের গঙ্গাতীরবর্তী দুই রাজ্য থেকে বহু পূর্বে দুই ক্ষমতাশালী রাজা এই দুই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোরেছিল। গঙ্গাডিহি (হুগলী) থেকে এসেছিল কম্বোজরাজের পূর্বপুরুষ, আর চম্পানগর (ভাগলপুর) থেকে এসেছিল চম্পা-রাজের পূর্বপুরুষ। দুই রাজ্য পত্তনের সুরু থেকে বিবাদ চ'লে আসছে সমানে। কখন চম্পা কম্বোজ অধিকার করে, আবার কখন-বা চম্পা কম্বোজ-কর্তৃক অধিকৃত হয়।

অর্ণবপোত এগিয়ে চলে। একটার পর একটা দিন কাটে। আকাশ ও সমুদ্র দুই-ই স্বাভাবিক থাকে। পোতাধ্যক্ষ প্রসন্নমনে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে; সকলের সুখসুবিধার জন্য সচেষ্ট থাকে। জলযানের সর্বোচ্চ মাস্তুলের ওপরের শেষ অগ্রভাগে সর্বসময় একজন লোক পালা কোরে অবস্থান করে। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সে সর্বদা চারদিকে দৃষ্টিপাত করে। বিপদের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয় তাকে, কেননা প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েরই কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনা আছে। মধ্যে মধ্যে সমুদ্রবক্ষে জলদস্যুর আবির্ভাব হয়। আবার কখন-বা কোন ক্ষমতাশালী রাজার রণতরী-কর্তৃক আক্রান্ত হোতেও হয়। যদিও এই জলযান সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক তরী—কোন রাজার রণতরী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অনুচিত,—তবু অনেক সময় ঐসব রণতরীর নৃশংস লোভী অধ্যক্ষরা অসহায় অবস্থায় এইসব জলযান লুঠপাট কোরে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। তাই এই বাণিজ্য-তরীতেও আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকে, প্রয়োজন হোলে অনেক সময় ছোটখাটো যুদ্ধও চলে কিনা। সৈনিক না হলেও যাত্রীরাও সকলে আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত, ও সকলেই উহার প্রয়োগে পারদর্শী। যার যে-কোন পেশাই হোক-না-কেন, তাকে শারীরিক ক্ষমতাবান্ এবং অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ হোতেই হবে—সে যুগ ছিল মারামারি কাটাকাটির যুগ।

অন্ধকার রাত্রে আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলে ওঠে। কোলাহলমুখর যানখানির কোলাহল ক্রমে স্তিমিত হোয়ে আসে। যাত্রীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হোয়ে চক্রাকারে বসে নিম্নস্বরে কথাবার্তায় নিযুক্ত। কেউ-বা ওরই মধ্যে একটু নির্জনতায় নিজের ইষ্টদেবতার ভজনা কোরছে; কেউ-বা চিড়ে-গুড় কিংবা ছাতু লঙ্কা সহযোগে নৈশ ভোজন সমাপন কোরছে···। ইন্দ্রনীল একটা গরম কাপড় সর্বাঙ্গ ঢেকে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এক স্থানে অনেকগুলো পুরাতন পাল ও দড়িদড়া জড়ো করা ছিল। সে স্থানটা একেবারেই নির্জন ও অন্ধকার। তারই ও-পাশ থেকে চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ শব্দ ভেসে এল, ইন্দ্রনীল থম্‌কে দাঁড়ালো; শুনতে পেলে দুইটি নরনারী-কণ্ঠোত্থিত আলোচনা; নারীকণ্ঠ বলে: আমার বড় ভয় কোরছে।

পুরুষ কণ্ঠ আশ্বাস দিয়ে বলে, ভয় কিসের? আজই সব ভয় ও ভাবনা শেষ কোরে দেবো। তোমাকে যা-যা কোরতে বোলেছি, তাই করো। আমি আর আমার দল ঠিক সময়েই হাজির হবো।

নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, তা হোলে আমি যাই।

হাঁ, যাও; কোন ভাবনা নেই।

ইন্দ্রনীল নিজেকে পালের গাদার সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিলো—মেয়েটি তারই সামনে দিয়ে চলে গেল, পুরুষটির পদশব্দও অপর দিকে অশ্রুত হোলো। ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি পালের গাদা হোতে বার হোয়ে মেয়েটির সঙ্গে ব্যবধান রেখে তাকে অনুসরণ কোরলো। দেখলো তরীর শেষ প্রান্তে গোল হোয়ে বসে থাকা একটা দলের মধ্যে সে মিশে গেল। ইন্দ্রনীল একটু ঘুরে সেই দলটার নিকটবর্তী হোলো। আকাশের অন্ধকার তখন খানিকটা দূর হোয়েছে—পশ্চিম আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে, সেই চাঁদের আলোয় ইন্দ্রনীল দেখলো, মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী, সম্ভবতঃ বিদেশী। দলের সকলেই বিদেশী জেলে মনে হোলো। তাদের হাবভাব যেন কেমন রহস্যজনক।

ইন্দ্রনীল কোদণ্ডর কাছে এল; তখন কোদণ্ড তরীর চালকের সঙ্গে কথা বোলছিল। সে সময় পেলেই চালকের কাছে আসে তরী-চালনা সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করে, আবার সময় সময় হালও ধরে। ইন্দ্রনীল দেখলো, কোদণ্ড ও চালক ছাড়া সেখানে আরো একজন লোক রয়েছে। সেই লোকটি তখন চালককে প্রশ্ন কোরছিল।

—তা হোলে তুমি বোলছো আরো চার দণ্ড পরে চাঁদ ডুবে যাবে?

হাঁ। চালক উত্তরে বলে।

আজ কি সারারাত তোমার পালা?—লোকটি প্রশ্ন করে।

হাঁ, কাল সারাদিন বিশ্রামের ছুটি পাবো।

তোমাকে খুব পরিশ্রম কোরতে হয় তা হোলে?

চালক হাসলো।—কোন উত্তর দিলো না।

কোদণ্ড বোললো, পরিশ্রম কি বোলছেন—পরিশ্রমের সঙ্গে থাকা চাই সজাগ শ্যেনদৃষ্টি আর দিক্‌ভ্রম না হওয়ার জন্য প্রখর মস্তিষ্ক। কি খবর রত্নদত্ত?

কিছু নয়, ইন্দ্রনীল বলে, এসো মিত্রদেব। আমাদের বিশ্রামের সময় হোয়েছে।

কোদণ্ড কিছু বলার পূর্বেই ইন্দ্রনীল কোদণ্ডর হাত ধোরে তাকে টেনে নিয়ে যায়।

একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে এলে কোদণ্ড বলে, কি ব্যাপার হে? একেবারে টেনে নিয়ে এলে মনে হোলো?

ঐ লোকটা কে? ইন্দ্রনীল প্রশ্ন করে।

কোন্ লোকটা?—কোদণ্ড ঠিক বুঝতে পারে না।

চালকের সঙ্গে যে বিদেশী লোকটা, বোধহয় বলী কি যবদ্বীপবাসী, কথা কইছিল।

ও! কোদণ্ড বলে, ও একজন খুব ভাল লোক, খুব ধনী লোক। দেশবিদেশে ওর অনেক রকম কায়কারবার আছে। বোলছিল, চন্দ্রনাথ যাবে। লোকটি বৌদ্ধ।

আসল শয়তান!—ইন্দ্রনীল বলে।

তার মানে?

ইন্দ্রনীল কিছু পূর্বের সমস্ত ঘটনা কোদণ্ডকে বলে। সব শুনে কোদণ্ড বলে, ঐ ঘটনার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?

অন্ধকারে ঐ লোকটিকে আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আমি স্পষ্টই শুনেছি—সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তোমার এই ধনী সজ্জনটির কণ্ঠস্বর ঐকেবারে এক। কাজেই···আমার মনে হয়, আজ রাত্রে চাঁদ অস্ত গেলেই একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে।

কোদণ্ড বলে, আমাদের তা হোলে পোতাধ্যক্ষকে এখুনি সমস্ত জানানো দরকার।

হাঁ, কিন্তু তার আগে আমাদের আরো নিশ্চয় হোতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।

ওরা নিজেদের সশস্ত্র কোরে নিলো। তারপর সেই বিদেশী লোকগুলো যেখানে অবস্থান কোরছিল, সেখানে গিয়ে দেখলো, কেউ কোথাও নেই। আস্তে আস্তে ওরা তরীখানির আগাগোড়া অনুসন্ধান কোরেও ঐ লোকগুলোকে দেখতে পেলো না। ওরা বুঝতে পারলো, আপাদমস্তক আবৃত নিদ্রিত যাত্রীদের মধ্যেই লোকগুলো মিশে আছে। ধনী শয়তানটিরও কোন পাত্তা না পেয়ে ওরা দুজনে চালকের কাছে এল।

কোদণ্ড বোললো, বন্ধু, আজ একটু হুঁসিয়ার থেকো।

কেন? আকাশ তো বেশ পরিষ্কার।—চালক বোললো।

তবু···

হাঁ, হুঁসিয়ার আমাদের সব সময়ই থাকতে হয়।

এরপর ওরা দুজনে পোতাধ্যক্ষের ছোট কক্ষটির কাছে এল। কক্ষটির মধ্যে ছোট একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় ওরা দেখলো, অধ্যক্ষ সুরাপান কোরছে, আর সেই পূর্বদৃষ্ট মেয়েটি বিলোল কটাক্ষে তার সঙ্গে হাস্যপরিহাসে রত।

ওরা অন্তরালে দাঁড়ালো।

জড়িত কণ্ঠে অধ্যক্ষ বোললো, সুন্দরী। আ মরি! তুমি সত্যিই সুন্দরী! আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। এ সমুদ্রজীবন আর ভালো লাগে না। আমার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে আমি এক রমণীয় প্রাসাদ তৈরী করাবো—সে প্রাসাদের তুমিই হবে অধীশ্বরী।

সত্যি!—ছলনাময়ী সেই নারী অধ্যক্ষের কণ্ঠলগ্না হোলো। একটু পরে নারী বোললো, আমার কিন্তু বড় ভয় কোরছে!

ভয়?—জানো এই অর্ণবপোতের আমিই সর্বেসর্বা; আইন, কানুন, শৃংখলা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব সব আমারই। আমি এখানকার রাজা। তুমি যদি বলো তো কালই এই সমুদ্রবক্ষেই তোমাকে বিবাহ কোরতে পারি।

নারী ভৃঙ্গার থেকে সুরা ঢেলে দিলো, অধ্যক্ষ তা এক নিশ্বাসে পান কোরে নিলো। ক্রমে তার চক্ষু অর্ধমুদ্রিত হোয়ে এল,—বোললে, তুমিও পান করো সুন্দরী।

নারী নিজে খানিকটা সুরা ঢক্‌ঢক কোরে পান কোরলো; তারপর অতি সন্তর্পণে অঙ্গুরীয়ের ওপর থেকে উজ্জ্বল প্রস্তরটি খুলে ফেল্‌তেই ঝুর্ ঝুর্ কোরে খানিকটা গুঁড়ো পদার্থ সুরাপাত্রের ভেতরে পড়লো। নারী আংটির পাথরখানা আবার ঠিক কোরে বসিয়ে দিলো।

তার চোখেমুখে বিদ্যুতের গতিতে ক্রুর হাসি খেলে গেলো। সে লীলায়িত ভঙ্গিতে সেই সুরাপাত্র অধ্যক্ষের অধরে তুলে ধরলো, মুদিত নয়নে অধ্যক্ষ সেই পাত্রে সুরা পান করবার জন্য অধরোষ্ঠ পৃথক্ কোরতেই একটা চকচকে তরবারীর আঘাত হোলো সেই নারীহস্তধৃত সুরাপাত্রের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটি ঝন্ ঝন্ শব্দে প'ড়ে গেল। অধ্যক্ষ লাফিয়ে উঠে বোললো, কে এই অর্বাচীন।

নারী বোললো, অসভ্য! বর্বর।

ইন্দ্রনীল হা হা রবে হেসে উঠলো।

অধ্যক্ষ বোললো, একি! রত্নদত্ত, মিত্রদেব—তোমরা!

আপনি বিষ পান কোরছিলেন। —ইন্দ্রনীল বোললো। এই নারী বিষ দ্বারা···

—না, না। রমণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ কোরে উঠলো। অধ্যক্ষর চক্ষু বিস্ফারিত হোলো—নিমীলিত চক্ষু তার উন্মীলিত হোয়ে প্রজ্জ্বলিত হোয়ে উঠলো, ক্রুদ্ধ স্বরে বোললো, দুষ্টা!

চকিতে রমণী বস্ত্রমধ্য হোতে একটা ক্ষুদ্র বাঁশী বার কোরে তাতে ফুঁ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষদ্বারে কয়েকজন সশস্ত্র দস্যু এসে দাঁড়ালো। অধ্যক্ষ চীৎকার কোরে উঠলো, একি! আমার তরণীতে দস্যু! দস্যুদলপতি কর্কশ কণ্ঠে আদেশ কোরলো, অস্ত্র সংবরণ কোরতে। কোদণ্ড ঘুরে দাঁড়িয়ে বোললো, তুমি! তুমি!

ইন্দ্রনীল চকিতে কক্ষের আলোটা এক আঘাতে চূর্ণ কোরে দিলো—কক্ষ ঘন আঁধারে নিমগ্ন হোলো। সেই আঁধারের মধ্যে লেগে গেল একটা প্রচণ্ড হুটোপুটি। কতকগুলো আর্ত চীৎকারে চারদিক শব্দায়মান। একটু পরে দেখা গেল, ইন্দ্রনীল ও কোদণ্ড জলযানের মধ্যস্থলে একটা সুউচ্চ কাষ্ঠবেদীর ওপর দাঁড়িয়ে অমিত বিক্রমে দস্যুদের সঙ্গে অসিযুদ্ধ কোরছে। যাত্রীরাও নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে দস্যুদের আক্রমণ কোরতে বদ্ধ পরিকর।—তরঙ্গসঙ্কুল সাগর-বক্ষে ঘন আঁধারে সেই অর্ণবপোতে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও আর্তের চীৎকার বাতাসকে ভারাক্রান্ত কোরে তুললো। ক্রমে ধীরে ধীরে সব ঠাণ্ডা হোয়ে এল। বহুযুদ্ধে পারদর্শী ইন্দ্রনীল ও কোদণ্ডর সঙ্গে পারবে কেন ঐ দুর্বৃত্ত দস্যুরা! তরণীর সমস্ত লাল জলে উঠলো। দেখা গেল, সমস্ত দস্যুই আহত কিংবা নিহত হোয়েছে। রত্নদত্ত ও মিত্রদেবের জয়ধ্বনিতে যাত্রীরা আত্মহারা হোলো।

রক্তাক্ত তরবারি হস্তে, রুধির-স্নাত দীর্ঘদেহ এই দুই বীরপুরুষের দিকে তাকিয়ে তাহারা বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হোলো। অধ্যক্ষ আবেগভরে বীরদ্বয়কে জড়িয়ে ধ'রলো। ঈশ্বর-প্রেরিত রক্ষক বোলে সকলের হোয়ে অধ্যক্ষ দুটিকে অভিবাদন কোরলো।

আলুথালু বেশে সেই পাপিষ্ঠা দ্রুত এসে বীরদ্বয়ের পদতলে আশ্রয় নিলো। পশ্চাতে ছুটে এল সেই অব্যর্থলক্ষ্য অষ্টমবর্ষীয় কিশোর ধনুকে বাণযোজনা কোরে। রমণী চীৎকার কোরে ওঠে, আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও। সমস্ত জনতা শতকণ্ঠে ধিক্কার দেয়। অধ্যক্ষের মুখমণ্ডল হিংস্র-ভয়াল হোয়ে ওঠে,—চীৎকার কোরে বলে, বধ করো পাপীয়সীকে, বধ করো। সমস্ত জনতা সায় দেয়। মিত্রদেব হস্তধৃত রক্তরঞ্জিত তরবারি উত্তোলন করে। মশালের তীব্র আলোকে তার প্রজ্জ্বলিত শিখা লক্ লক্ কোরে ওঠে। আর্তস্বরে নারী ক্রন্দন কোরে উঠে সভয়ে ছুটে তরণীর শেষ সীমার দিকে ধাবিত হয়। ইন্দ্রনীল বলে, মিত্রদেব, ও নারী! মিত্রদেব তরবারি নামিয়ে নেয়। সহসা উঃ! কোরে একটা চীৎকার শব্দ ধ্বনিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, নারীর কোমল বক্ষ রক্তে রঞ্জিত, আর সেই রুধির মধ্যে আবক্ষোবিদ্ধ একটি ক্ষুদ্র তীর। নারী উল্‌টে জলের মধ্যে প'ড়ে যায়—কিশোর তার বাণশূন্য ধনুখানি সমুদ্রে নিক্ষেপ কোরে সহসা কোথায় যেন স'রে প'ড়লো।

তারপর আর কটা দিন স্বাভাবিক ভাবেই কেটে যায়—অর্ণবপোত অর্ণবের বুক চিরে গন্তব্যপথে অগ্রসর হোতে থাকে। শুধু নূতনত্বের মধ্যে রত্নদত্ত ও মিত্রদেবের খাতির-যত্ন অসম্ভব রকমে বেড়ে যায়। অধ্যক্ষর সহিত সমস্ত কর্মচারীরা—এমন কি সমস্ত যাত্রীরা পর্যন্ত—এদের সুখসুবিধার জন্য সব সময়েই তৎপর রইলো। ত্রেতাযুগে মেঘনাদ ইন্দ্রকে জয় কোরে ফিরেও বুঝি এত খাতির-যত্নের মুখ দেখেন নি!

(ক্রমশঃ)

তুলসীবুড়ি

শ্রী রতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

তুলসী মুচির বাড়ী ছিল ছাপ্‌রা জেলার গাঁয়,
ময়মনসিং এসে পেটের দায়
সাহাগঞ্জে বাঁধলো বাসা রাজকাচারীর কাছে।
সঙ্গে জরু আছে,
সেই যুবতীর কপাল মন্দ নয়,
খাওয়া-পরা বাদে মাসে শতেক টাকা রয়।
কাঁচা চামড়া শুকিয়ে রোদে পাঠায় সুদূর দেশে,
টাকাওয়ালা বনলো অবশেষে।

ক্রমে ক্রমে কিনলো গরু,
বাঁধলো টিনের ঘর,
হাঁস পায়রা পুষলো সে শূকর,
বাচ্চা ব্যাচে, ডিম সে চালান্ ন্যায়,
জুলুম করা জানতো না তো,
ন্যায্য মূল্য ন্যায়;
ব্যবসাটা বেশ চালায় চমৎকার!
বাড়লো তাদের সুখের সংসার!
একটি ছেলে একটি মেয়ে
জন্মগ্রহণ করে
মা-ষষ্ঠীর বরে!
দিনরজনী বড়ই সুখে থাকতো তারা
হায় আত্মহারা!
দুঃখ তাদের ছিল না তো মোটেই,
অর্থ তাদের নিত্য সে তো জোটেই।

হঠাৎ একদিন তুলসীর হোলো
পেটে ভীষণ ব্যথা,
কোঁকায় কেবল, কয় না কোনো কথা,
হোলো শয্যাশায়ী ;
মাথার কাছে বসে' বৌটা
ডাকতো কালী-মাঈ !
ঘোর পাড়াগাঁয় মরদ মারা যায়
বিনা চিকিৎসায় !
দাওয়াইখানা আছে সেথায়,
দাওয়াই কিছু নাই !
বলবো কি আর ভাই,
কম্পাউণ্ডার আছে একটি 'প্রসন্ন ডাক্তার',
ভিজিট্ পেলো তার !
স্বামীর বুকে মাথা রেখে
বৌটা কেঁদে মরে !
ছেলেমেয়ে কাঁদছে ভীষণ ডরে !
জুটলো ক্রমে মানুষ কয়েকজন,
খুড়লো কবর বাসার কাছেই
শক্ত করি' মন।

তুলসীকে হায় কবর দিয়ে
সবাই গেল চলি' !
কতই কি যে বলি'
তুল্‌সীর বৌ কাঁদছে সেদিন থেকে
কালী-মাঈকে ডেকে !
ছেলেমেয়ে গভীর আর্ত্তনাদে
ওই কবরের কাছে যেয়ে
বাপ্‌কে ডেকে কাঁদে !

কোলকাতাতে চৌদ্দ বছর পরে,
তুল্‌সীর সেই মৃত্যুস্মৃতি
আমায় আকুল করে !
আজকে আছি অনেক দূরে,
তবু তাদের কথা
অশ্রু ঝরায়, বাড়ায় ব্যাকুলতা !
না জানি আজ পাকিস্তানে বৌটা রূপবতী
কি ভাবে হায় বেঁচে আছে !
কি হোলো তার গতি !

ছুটির দুপুর

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত দুপুর ধরে তুমি তো দিয়েছ ঘুম।—
রাস্তা দিয়ে হেঁকে গেছে কত ফেরিওলা :
লজেন্স, টেঁপারি, তরল আলতা ও কুঙ্কুম···
সমস্ত দুপুর ধরে তুমি তো দিয়েছ ঘুম।

আমি কি করেছি শোনো।—হয়ে আত্মভোলা
লিখেছি দারুণ এক প্রেমের কবিতা।
তোমার ভাঙল ঘুম যখন সবিতা,
আমারও কবিতা শেষ, নাম 'হরবোলা'।

তুমি জেগে বলেছিলে সুপ্তিসুখী চোখে :
'একি তুমি ঘুমোওনি, বসে আছ ঠায় ?'
কী দেব উত্তর ? মনে কাব্য যার ঢোকে
ঘুম কি সহজে তার চোখে আসে হায় ?
সবই স্বপ্ন, মিথ্যা জানি এই মরীচিকা,
লেখাটা বেরুলে তবু পাব তো পত্রিকা !

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণ

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১৯৩৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আমি সর্ব্বপ্রথম শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করি। তাঁদের দর্শনলাভ আমার প্রথম জীবনে মোটেই সহজসাধ্য ছিল না; অথচ আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার পর সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষেরও অধিক কাল এই দর্শনাকাঙ্ক্ষা অন্তরের অন্তঃস্থলে অঙ্কুরিত, পুষ্ট ও দিন-দিন বর্দ্ধিত হ'য়ে এসেছে। স্বর্গীয় পিতৃদেব ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দের সহকর্ম্মিগণের অন্যতম ছিলেন; স্বদেশী বিপ্লবের আর্থিক রসদ বাবা যথেষ্ট যোগাতেন, তবে সে সব ছিল গুপ্ত ব্যাপার; যার ইতিহাস এখনও যথাযথভাবে রচিত হয় নি। কিন্তু প্রকাশ্যতঃ বাবার যে অমর কীর্ত্তি আজও বাংলায় ও ভারতে সুবিদিত, তা' হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রাথমিক গঠনে বাবার নেতৃত্ব ও সর্ব্বাধিক দান; তাঁর ও রাজা সুবোধ মল্লিকের আমন্ত্রণেই শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজের বিশিষ্ট অর্থকরী ও মর্য্যাদাযুক্ত পদ ত্যাগ ক'রে মোটা কাপড় ও চালের সংস্থানযুক্ত নামমাত্র বৃত্তি গ্রহণে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। জাতীয় শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বাবার সহিত শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ একদিকে যেমন স্থাপিত হয়, তেমনই পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলনে এই যোগাযোগ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী আদর্শ প্রচারোপলক্ষ্যে যাত্রাপথে শ্রীঅরবিন্দ দুইদিন বাবার অতিথিরূপে আমাদের গৌরীপুরের ভদ্রাসনে অবস্থান ক'রেছিলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক ও বিপিনচন্দ্র পাল। শ্রদ্ধেয় মদীয় অগ্রজ কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য তাঁদের আতিথ্যের ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন; অধুনা কলিকাতা-বাসী যতীন্দ্রপ্রসাদ সেই পুরাকাহিনীর বর্ণনা এখনও আমাদিগকে সাগ্রহে শুনিয়ে থাকেন। শ্রীঅরবিন্দের আহারের জন্য তখন গৌরীপুরের গোবিন্দবাড়ীর প্রসাদের ব্যবস্থা হ'য়েছিল। তাঁর ভাষণে ইংরাজী বিদ্যার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু আহারে ও আচারে তিনি ছিলেন একজন পরম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। বিপিন পাল তাঁর তুল্যই নিরাড়ম্বর ছিলেন ও বাঙালীসুলভ খাদ্যগ্রহণ ক'রতেন। পক্ষান্তরে রাজা সুবোধ মল্লিকের জন্য আমাদের ছিল রাজসিক্ আমিষ রাজভোগের ব্যবস্থা। বিপিন পালের উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় সারা পল্লী ও সহরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যেত। শ্রীঅরবিন্দ অধিকাংশ সময়েই মৌন থাকতেন, মাঝে-মাঝে সারগর্ভ দুই চারিটি কথা শোনাতেন। বক্তৃতামঞ্চে অনুচ্চ তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরেরও উন্মাদিনীশক্তি কম ছিল না। বিপিন পাল সবাইকে ডেকে শ্রীঅরবিন্দকে লক্ষ্য ক'রে ব'লতেন,—"ঐ যে নির্ব্বাক্ পুরুষটিকে তোমরা দেখ্‌ছ, বাহির থেকে ইনি অতি শান্তশিষ্ট ব্যক্তি, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাযজ্ঞে ইনিই অগ্নিমন্ত্রের পুরোহিত। আমরা হ'লাম তাঁরই ধ্বজাবাহী; ঢাক, ঢোল পেটানো ও উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতায় লোক মাতানোই আমাদের কাজ"।

এ কাহিনীটি লিখ্‌লাম আমার ব্যক্তিগত জীবনে আবাল্য শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি ও আকর্ষণের পটভূমিকারূপে। বাল্যকাল থেকেই পিতৃগৃহে স্বদেশী-যুগের আবহাওয়ায় আমরা বর্দ্ধিত হ'য়েছিলাম এবং আমাদের আত্মীয় ও শিক্ষকদের কাছে শ্রীঅরবিন্দের অলোকসামান্য জীবনকথা ও স্বদেশী যুগের ইতিহাস গল্পচ্ছলে শুনবার সুযোগ সর্ব্বদাই লাভ ক'রেছি। দৈব-বিড়ম্বনায় স্বদেশী আন্দোলন বৃটিশ সরকারের কঠোর শাসনে স্তিমিত হ'য়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে তাঁর ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ সাধনায় সম্পূর্ণ মগ্ন হ'লেন; অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দেশে গঠনমূলক কাজে মন দিলেন। বাবাও সাংস্কৃতিক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করলেন। চতুর্দ্দিক থেকে নানা বাধা ও অলীক আশঙ্কা শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমাদের এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা ক'রল। এ বিষয়ে আমাদের আত্মীয়গণ ও কর্ম্মচারিগণই প্রধানতঃ দায়ী। শ্রীঅরবিন্দের সহিত যোগাযোগ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট

ও পুলিসের সন্দিগ্ধতাবলম্বনে তাঁরা একটা অতিরঞ্জিত বিভীষিকা রচনা ক'রে রেখেছিলেন। আমাদের বিষয়-সম্পত্তির সংরক্ষণের অজুহাতে তাঁরা এই ভীতিপূর্ণ মনোভাব ছড়িয়ে রেখেছিলেন।

যাই হোক, প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আমি রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসে সম্পূর্ণ মগ্ন ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেও আমি অভিভূত ছিলাম। এরূপ এক মানুষ জগতে সত্যই দেখা যায় না; তথাপি নিষ্ঠাবতী সাধিকা মাতাঠাকুরাণীর প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বহির্ভূত পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রতিও আমার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যয়ন যথেষ্ট ক'রেছি; তবে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িনি। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর মাঝে-মাঝে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে নানা বই-সংগ্রহের জন্য ঘোরাফেরা ক'রতাম। তখন সরস্বতী লাইব্রেরীতে দেশনেতা শ্রীঅরুণ গুহের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। কথা-প্রসঙ্গে স্বদেশী যুগ ও শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধেও আলোচনা হ'ত। তিনি শ্রীঅরবিন্দের ও 'প্রবর্ত্তক-এর শ্রীমতিলালের দু-একটি বই আমাকে প'ড়তে দিলেন; তবে ব'ল্‌লেন,—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউসেই শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত বই পাওয়া যাবে।

আমার আই. এ. পরীক্ষার প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মহাত্মা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়; তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি শ্রীঅরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত স্বদেশী আন্দোলনের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলাম এবং দেশনেতা হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। ঐ সময়ে বাবা জমিদার-শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় আইন সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন, যেখানে দু'এক বৎসর পর চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে তাঁর স্বরাজপার্টি যথাযোগ্য স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়। অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথের নিকটেও তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করি। তিনি গান্ধীজির অলোকসামান্য প্রতিভা, তপোবল ও দেশপ্রাণতার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীল হলেও, গান্ধীজির কৃচ্ছ্রসাধনা, খদ্দরপ্রীতি প্রভৃতি আদর্শের সহিত একমত ছিলেন না। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউসে বাবা যতীনের অন্যতম চেলা শরৎদা (শরৎচন্দ্র গুহ) শ্রীঅরবিন্দের ও তাঁহার শিষ্যদের গ্রন্থ প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন। বারীনদা (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ) তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। চিত্তরঞ্জনের সহিত শ্রীঅরবিন্দের গভীর সখ্য ও রাজনৈতিক যোগাযোগ সর্ব্বজনবিদিত। বারীনদা যখন আন্দামান থেকে দেশে ফেরেন, তখন চিত্তরঞ্জন তাঁর "নারায়ণ" পত্রিকার সম্পাদনার ভার বারীনদার ওপরে অর্পণ করেন। বারীনদার সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বারীনদার উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ভাষায় লিখিত সুবিখ্যাত সুবৃহৎ পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রটি পাঠ ক'রে আমি যে প্রেরণা লাভ করেছিলাম, তা' এখনও আমার মনে জাগরূক র'য়েছে। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বিরাট্ আশাবাদী গুরু ও নেতা; তাঁর আদর্শের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। পৃথিবীর আশু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তিনি বিন্দুমাত্রও নৈরাশ্যের প্রশ্রয় দিতেন না। সম্মুখে বিপদের ঘনঘটা আমাদের যতই দমিয়ে দিক, তাঁকে এসব স্পর্শ ক'রতেও পারত না। আসন্ন মৃত্যুদণ্ড বীরের মত লঙ্ঘন ক'রে তিনি অগ্রসর হ'য়েছেন; কঠোর দারিদ্র্যের বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতাও তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত ক'রতে পারে নি। তিনি যখন পণ্ডিচেরীর অজ্ঞাতবাস থেকে ক্রমশঃ তাঁর নূতন যোগপীঠের পরিচয় দেশে প্রকাশ ক'রলেন, তখন চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল রায় তাঁর সাদামাঠা জীবনের ব্যয়ভাব যোগাতেন। বারীনদা মুক্তিলাভের পর চিত্তরঞ্জনের সহযোগিতায় নলিনীরঞ্জন সরকার, কুমার অরুণচন্দ্র সিং ও অন্যান্য কয়েকজন অনুরাগী ব্যক্তির নিকট হ'তে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর কয়েকটি শিষ্যের ব্যয়-ভার নির্ব্বাহের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বারীনদা বেশীদিন কল্‌কাতায় থাকলেন না। শ্রীঅরবিন্দের যোগের আকর্ষণে তিনি পণ্ডিচেরী চ'লে গেলেন—'নারায়ণ' পত্রিকাও উঠে গেল। কেননা ঐ সময়েই মতভেদ সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন মহাত্মাজীর

অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তাঁর ব্রতে ব্রতী হ'য়ে ঐ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে প'ড়লেন; তখনও স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়নি।

আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউসে কলেজের ক্লাসের অবসর মুহূর্ত্তে আমি প্রায়ই শরৎদার সঙ্গে আড্ডা দিতাম। তাঁর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গ, তাঁর যোগে শ্রীমায়ের সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ, বারীনদার কাহিনী, নলিনীকান্ত, বিজয় নাগ, সুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগের গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা অতিবাহিত ক'রতাম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আমার যোগসূত্র অটুট ছিল। আজীবন কোনদিনই এবং কোন কারণেই তিনি তাঁর অবারিত স্নেহ বর্ষণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন নি। একবার তাঁর বৈঠকখানায় কথোপকথন কালে তাঁর কাছে শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গ তুল্‌লাম। এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের সহিত শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে পুনর্মিলনের অনেক পূর্ব্বের কথা। শ্রীঅরবিন্দের কথা তুলতেই রবীন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন, "পাশ্চাত্য মনীষার সহিত ভারতীয় অধ্যাত্ম-প্রতিভার এতবড় সমন্বয় খুব কমই দেখা গেছে। আমি পিয়ারসন্‌কে দিয়ে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছি, শান্তিনিকেতনের ভার গ্রহণ ক'রতে; তাঁর মত যোগীকে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারলে পিতৃদেবের (মহর্ষির) স্বপ্ন সফল হবে।" আমি তারপর শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদিগের রচনার প্রসঙ্গ তুললাম। সে যুগে 'প্রবাসী' পত্রিকায় নলিনীকান্তের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। নলিনীবাবুর সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা, ভাষা ও ভাবের উচ্চ মান তাঁর লেখার প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বরাবরই উদ্বুদ্ধ ক'রেছে। তাঁর বাংলা ভাষা আমার বিশেষ প্রীতিকর। কেননা তাতে বঙ্কিমী রীতির সহিত আধুনিক ভাষার একটি সমন্বয় র'য়েছে। তা' ছাড়া নলিনীবাবু একাধারে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর তখনকার আদর্শেও আমি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলাম। আমি নলিনীবাবুর কথা তুলতেই রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত নাত্‌জামাই বিখ্যাত সাহিত্যিক মণিলাল গাঙ্গুলী আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন—"নলিনীবাবু পরিশ্রম ক'রে বিদ্যা অর্জ্জন ক'রেছেন, এখনকার অনেক লেখকের মত ফাঁকি দিয়ে সাহিত্যিক নাম অর্জ্জন ক'রতে চাননি, সাহিত্যিক হিসাবে তিনি আমাদের অভিনন্দনের যোগ্য।" এর পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব'ললেন—"নলিনী সুসাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, তবে সৃষ্টিপ্রতিভাযুক্ত বাক্‌শিল্পী হিসেবে অর্থাৎ লেখক ও কবি হিসেবে শ্রীঅরবিন্দের সকল শিষ্যদের মধ্যে সুরেশের (সুরেশ চক্রবর্ত্তী) লেখা প'ড়েই আমি সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি। লেখক হিসেবে সুরেশ শুধু পণ্ডিচেরীর কেন, তরুণ বাংলারই এক উজ্জ্বল রত্ন।"

(ক্রমশঃ)

জাগরণের গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

মুক্ত ভারত, স্বাধীন ভারত, শৃঙ্খল গেছে টুটি'
আমাদের হাতে আছে হাতিয়ার রয়েছে বজ্রমুঠি।
আমরা অমর, জীবন-সত্ত্বা
জ্ঞান গৌরবে বীর্য্যবত্তা
মোদের নয়নে দীপ্ত সূর্য্য উঠেছে আঁধার ফুটি'।

জীবনের লাগি' মৃত্যুঞ্জয়ের আমরা করেছি পণ,
দুর্জ্জয় তৃষা বক্ষে মোদের—দুর্ব্বল নহে মন।
দুঃখ-তিমির আমরা ভেদিব,
শঙ্কা ও ভয় সমূলে ছেদিব,
শত্রুভয়ের হীনমন্যতা ধূলায় পড়িবে লুটি'।

অন্ধকারের গান

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত চাৎলার গাঙ্‌টা যেন ফুলে উঠ্‌লো। বাঁধা নৌকোগুলো মোচার খোলার মতো আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে তীরের সংগে। একটার শিকল পলকের মধ্যে ছুটে গেলো—তারপরেই সেটা প্রবল স্রোতের ভিতরে ভেসে চল্‌লো। চুপ্‌ ক'রে রেলিংএর পাশ থেকে মতি সেই দিকে চেয়েছিলো। বল্‌লে, বাবা, ছাখো—।

মুকুন্দও চেয়েছিলো জলের দিকে, কিন্তু সে নৌকো দেখ্‌ছিলো না, দেখ্‌ছিলো চাৎলার গাঙে আবার সেদিনের মতো ঢেউ উত্তাল হ'য়ে উঠেছে; সেই রকম ফুলে ফুলে সাপের মতো অশ্রান্ত গর্জ্জনে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে প্রতিমুহূর্তে—পাতাল পুরীর নাগ-কন্যারা এদের দিয়ে নিমন্ত্রণলিপি পাঠালো নাকি মুকুন্দকে? আজ্‌কে, এই আশ্বিনের ভরা দুপুরে মনে পড়ে, এই রকম ঢেউয়ের মুখে আরেকবার অনেকদিন আগে প'ড়েছিলো মুকুন্দ। মতির মাকে বিয়ে ক'রে সেবার সে চাঁপাডাঙা ফিরছিলো। নদীর মধ্যে উঠ্‌লো ঝড়। নৌকো এই যায় তো সেই যায়—সকলে তো আশাই ছেড়ে দিলে। মুকুন্দ তেরো বছরের বউকে কাছে টেনে ব'লেছিলো ভয় নেই—এখুনি থেমে যাবে সব। হোলোও তাই! সেবারে ভীষণ রক্ষে ক'রেছিলেন ভগবান্‌! সে কথা মনে হ'লে এখনো গা কাঁপে। কিন্তু মুকুন্দ তো জানে। এবারে তাদের ভয় নেই—এ হ'চ্ছে কলের জাহাজ—এসব ঝড় ঝাপ্‌টা আর কিইবা করতে পারবে তাদের? তবু মনটাকে ঠিক ক'রে গুছিয়ে নিতে পারলো না, শেষ পর্যন্ত ভীত চোখেই সাম্‌নেব দিকে চেয়ে রইলো সে!

মতির মা আগাগোড়া একটা চাদর ঢাকা দিয়ে একপাশে শুয়েছিলো। দুপুরের দিকে একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিলো—কিন্তু ষ্টীমারের দোলা লেগে আবার জেগে উঠেছে। মুকুন্দ জিগেস্‌ করলো, কেমন লাগ্‌ছে শরীরটে বৌ?—মাথা কাম্‌ড়ায়? —উঁ-উঁহু!

মতির মা একটু মাথা নেড়ে আবার ভালো ক'রে সারা গায়ে চাদরটা টেনে দিলে!

একটা ছোক্‌রা গোছের খালাসী বার কয়েক সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেলো। মতির মাব এটা মোটেই ভালো লাগ্‌ছিলো না। ওদিকে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক আবার একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মতির মা এবার ডাক্‌লো, ওগো শুন্‌ছো?

মুকুন্দ ততক্ষণে বাইরে তাকিয়ে আবার সেই জলের ঢেউ শুন্‌ছে।—ওঃ কি শন্‌ শন্‌ ক'রে বাতাস—দু'দিকে টানানো পর্দাগুলো সব খুলে দিয়ে গেছে খালাসীরা একটু আগে। ডেকের উপর দিয়েই এবার ঝড় বইতে আরম্ভ কবলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা আশংকার ছায়া বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়লো—নীচে মেশিন ঘরে অনবরত ঘণ্টা পড়ছে ঢন্‌-ঢন্‌—ঢনন্‌ ঢনন্‌! পূর্ণবেগে ষ্টীমার চ'লেছে সেই ঢেউগুলিকে ছত্রখান ক'রে দিয়ে।

মতির মা আবার ডাক্‌লো, শুন্‌ছো?

ঝড়ের বেগে কোন কথা সহজে শোনাই যায় না—এবারে হঠাৎ যেন মুকুন্দ শুন্‌তে পেল, বললে, কি বৌ ডাক্‌ছো?

—হ্যাঁ, একবার এসো!

মুকুন্দ এগিয়ে এলো, বল্‌লে, চোখ কি তোমার একেবারে গেছে? দেখ্‌তে পাওনা ওই ছোঁড়াটার রকমসকম?

মুকুন্দ সিঁড়ির দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলে। বললে, অতো সব দিকে চোখ রাখ্‌তে গেলে চলে না বৌ। মুচির হাল হ'য়ে তো গাঁ ছাড়া হোলাম। এখন প্রাণ কটা নিয়ে যদি পৌঁছতে পারি তবেই ভাগ্যি ব'লে মেনো! মতির মা চুপ ক'রে শুয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলে না।

মুকুন্দ আবার বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলো। না, তার কোনো ভয় নেই, কলের জাহাজ এ, অতো

সহজে যদি ডুব্‌তো তা'লে কথা ছিলো না। ভাব্‌না তার জন্যে নয় মুকুন্দর, ভাব্‌না, আজ্‌কে যে অন্ধকার স্রোতে স্ত্রী আর আর পুত্রের হাত ধ'রে হঠাৎই ভাস্‌লো, শেষ পর্যন্ত তীরে গিয়ে উঠ্‌তে পারবে তো? কি জানি, বুকের মধ্যে থেকে থেকে কেবলি যেন গুর গুর ক'রে তার। কি অদৃষ্ট নিয়েই যে জন্মেছিলো মুকুন্দ!

জ্বরটা এখন কেমন? মুকুন্দ আবার মতির মায়ের দিকে চাইলো।

—খুব, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

—হাতটা ভালো ক'রে ঢাকা দিয়ে শোও—চার-দিকে যে কতো হাংগাম তা তো বোঝো না!

একটা ভীষণ ঝাপ্‌টা এসে লাগ্‌লো ষ্টীমারে, ডেকের লোকগুলো ঝাঁকানি খেয়ে এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে পড়লো। মতিও কাত হ'য়ে পড়লো।

দু'হাতে ছেলেকে সোজা ক'রে বসিয়ে দিলে মুকুন্দ, বল্‌লে, রেলিংটা শক্ত ক'রে চেপে ব'সে থাক্‌না বাঁদর—দেখ্‌ছিস্‌ না কি রকম দুল্‌ছে জাহাজ?

আশ্চর্য ব্যাপার, ঘণ্টা দুয়েক পরেই আস্তে আস্তে আকাশটা আবার পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। কোথায় যে গেলো সেই কালো দৈত্যের মতো মেঘগুলো। আর কোথায়ই বা সেই হা হা করা বাতাসের অট্টহাসি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত চাৎলার গাংটা ছোট্ট একটা ঘুমিয়ে পড়া শিশুর মতো শান্ত হ'য়ে এলো।

কিন্তু সত্যিই খালাসীটার হাবভাব ভালো লাগ্‌ছে না মুকুন্দর—কয়েক মিনিট আগেও মতির মার পাশ দিয়ে সে চাইতে চাইতে চ'লে গেলো। সুবিধে থাক্‌লে দিতো দু' ঘা পিটিয়ে লোকটাকে মুকুন্দ।

গাজিরহাট কাছে এসে পড়েছে। এবারে সাম্‌নে একটা মস্তোবড় বাঁক। প্রায় আধঘণ্টা থাক্‌বে এখানে ষ্টীমার। পাটের গুদাম আছে এখানে, তাছাড়া বড়ো একটা ব্যবসায়ের কেন্দ্রও এটা।

মতি বললে, ক্ষিদে পাচ্ছে বাবা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাবি—মুকুন্দ সাম্‌নের দিকে চেয়ে রইলো, একেবারে জাহাজ থেকে নেমেই খাবি এখন।

—না, এখুনি দাও।

এবারে মুকুন্দ চটে উঠ্‌লো। বল্‌লে, আমি কি তোর জন্যে খাবারের হাঁড়ি নিয়ে বেরিয়েছি নাকি রে হারামজাদা। বল্‌ছি, একটু সুস্থির হ'য়ে বোস্‌!

কিন্তু স্থির হ'য়ে ব'সবার অবস্থা মতির ছিলো না। গত রাত্রিতে মাত্র দুটি পান্তা খেয়ে সে বাপের সংগে বেরিয়েছে। তারপরে সকালের দিকে কয়েক মুঠো চিঁড়ে খেয়েছে, কিন্তু তাতে কি আর কুলোয়। পেটে তার এখন রাবণের চিতা জ্বল্‌ছে।

—উ-হুঁ-হুঁ, মতি কাঁদতে আরম্ভ করলো। বললে—ওই যে বিস্কুট র'য়েছে। ওই দাও না।

ডেকের মাঝামাঝি জায়গায় রুটি বিস্কুট আর চায়ের একটা ছোট্ট দোকান। অনেক রকম খাবারও আছে কিন্তু পয়সা কোথায় মুকুন্দর? কতো কষ্টে যে এই টিকিটের কটা টাকা জোগাড় ক'রেছে তা সেই জানে। এখন কোন রকমে ভালোয় ভালোয় কলকাতা গিয়ে পৌঁছতে পারে, তবেই হয়। কোন রকমে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখা এখন।

—দাও না বাবা!

—মতি এবার কাঁদতে লাগলো, বললে, সেই কখন থেকে না খেয়ে র'য়েছি।

শেষ পর্যন্ত পুঁটুলিটা খুলে আরো দুটো চিঁড়ে মুকুন্দ বের ক'রে দিলে মতিকে, বললে, আবার খেতে চাইবি তো এক চড়ে তোর ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে দেব রে হারামজাদা! তোর বাবা এখন রাজচক্কোত্তি হ'য়েছে না?

অতশত বুঝলো না মতি, গোগ্রাসে চিঁড়েগুলো সে মুখে পুরতে লাগলো।

—আহা, অতো মুখ করো কেন? ক্ষীণ গলায় মতির মা প্রতিবাদ জানালো। ছেলেমানুষ, অতশতই যদি বুঝতো—

খুব হ'য়েছে—চুপ ক'রে শুয়ে থাকো তুমি।

—বিরক্তিতে মুকুন্দর সমস্ত মন ভ'রে উঠেছে। অনেক পাপ ক'রেছিলো সে, তাই এইসব জঞ্জাল এসে তার ঘাড়ে চেপেছে। অনেক পাপ!

অথচ কি না ছিলো একদিন মুকুন্দর? ওই মতির

মাকে বিয়ে ক'রে যেবার সে চাঁপাডাঙায় ফিরে এলো, লোকে বললে, ভাগ্যিমানি বউ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের সংসারটা যেন আনন্দে, বৈভবে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো। মুকুন্দর বাবা শ্যামাদাস তখন বেঁচে, নিজেই সমস্ত জমি তদারক করতো। আর এম্‌নিতেই তার যা ফসল হোত তা দিয়ে প্রায় সমস্ত চাঁপাডাঙাকেই সে ছ'মাস খাওয়াতে পারতো। খাওয়াতও শ্যামাদাস। সারা বছরে তার বাড়ীতে প্রায়ই গ্রামের লোকের পাতা পড়তো। আজ দোল, কাল দুর্গোৎসব, পরশু অন্নপূর্ণা পূজা। শ্যামাদাসকে গ্রামের লোক বল্‌তো, অন্নপুন্নো'র বরপুত্তুর—যেমন ধন, তেমন মন!

তারই ছেলে মুকুন্দ। সেই অতিক্রান্ত কৈশোরের জ্যোতির্ময় দিনগুলিকে আজকাল যেন বড়ো বেশী ক'রে মনে পড়ে মুকুন্দর। সমস্ত বাড়ীর মধ্যে গোটা দশেক মরাই ছিলো। ভারে ভারে ধান আস্‌তো মাঠ থেকে। গরুর গাড়িগুলো সার দিয়ে এসে দাঁড়াতো বাড়ির পাশে, আর শ্যামাদাস হুঁকো হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করতেন, পাতুবায়েন এক এক করে সব গাড়িগুলি খালি করাতো। তারপরে তাদের ধান উঠতো গোলায়। পরের দিন ভোজ। বিরাট খাবার আয়োজন করতো শ্যামাদাস। তার ঘরে মা লক্ষ্মী এসেছেন, সকলে এসে দর্শন করে যাক্, প্রসাদ পেয়ে যাক্ কিছু কিছু।

তারপর শ্যামাদাস একদিন মারা গেলো। ব্যবসায়ের ভার সমস্ত এসে পড়লো মুকুন্দর হাতে। দিন চলছিলো মন্দ নয়। পিতার খ্যাতিকে সেও প্রাণপণে সমান মর্যাদা দিয়ে ব্যবসায়কে হয়তো আরো প্রসারিত করতেও পারতো, অন্ততঃ সেরকম ঐকান্তিক ইচ্ছাও ছিলো মুকুন্দর। কিন্তু ভোজবাজির মতো কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেলো, তা সে নিজেই ভালো বুঝে উঠতে পারলো না। যখন বুঝলো তখন সে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কলকাতার কন্‌ট্রোলের চালের জন্যে পা বাড়িয়েছে। সমস্ত জেলায় একটি কণা চাল নেই কোথাও। যুদ্ধ—যুদ্ধ!—কোথা থেকে যুদ্ধ এসে এক নিঃশ্বাসে মুকুন্দর গোলা ভরা ধান উঠিয়ে নিয়ে গেলো, তার কোনো ঠিকানা নেই—তারপরে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলে সে একা নয়, তার গরম নিঃশ্বাসে সমস্ত বাংলাদেশের সবকটা মরাই আর ক্ষেত পুড়ে গেছে!

শ্যামাদাসের যাবার সংগে সংগেই যে মা লক্ষ্মী বিদায় নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে মুকুন্দর কোন সন্দেহ ছিলো না! তবু যাবার সময়ে দু'দিকে যা তিনি ক্ষুদ্‌কুঁড়ো ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাতে মুকুন্দর এমনভাবে রাস্তায় এসে দাঁড়াতো না কোনদিনই।—কিন্তু এই যে কী সর্বনেশে লড়াই-ই লাগলো! মুকুন্দ গাজীর হাটের পাটগুদামের একটা চালার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। সব দিলে শেষ ক'রে—সব দিলে শেষ ক'রে।

যে খালাসীটা এতোক্ষণ ঘোরাঘুরি করছিলো, কাছে এসে ডাক্‌লো, ও মিয়াবাই!

মুকুন্দ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো, লোকটা ভুল ক'রেছে। মাসখানেক কি দেড়েক হবে সে দাড়ি কামায়নি, মুসলমান ভেবেছে তাকে নির্ঘাত।

খালাসীটা আরো কাছে এগিয়ে এলো, বললে, একটা কথা ছিলো মিয়াবাই!

মুকুন্দ বললে, কি?

খালাসীটা একটু হাস্‌লো, বল্‌লে, সাইরা সুইরা লইয়া চল্‌ছো তো—ইদিকে আমাগর চোখ্‌কে ফাঁকি দিতে চাও?

—সর্বনাশ, যা ভেবেছিলো মুকুন্দ, এখন কি উপায়?

মুকুন্দ বললে, হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়েছে কি করি বলো, এই খানিক পরে আমরা নেমে যাবো। দয়া ক'রে আমাদের আর নামিয়ে দিও না সাহেব!

কিন্তু সে ছাড়বার পাত্র নয়, বললে, হেইর লইগ্যা হক্কল লোকরে মারবা নাকি তুমি?

কথায় কথায় একটা কোলাহলের উপক্রম হ'য়ে উঠ্‌লো। মুকুন্দ দু'হাত জোড় ক'রে এই কটা ষ্টেশন পার করে দেবার জন্যে অনুরোধ করলো আবার। কিন্তু ছোকরা খালাসীটা এবারে রীতিমতো রেগে উঠ্‌লো, তারপরে হন হন্ করে চলে গেলো সারেঙের ঘরের দিকে। ওদের চেঁচামেচিতে ডেকের কয়েকজন

লোকও এদিকে উঠে এসেছিলো। একজন এসে জিজ্ঞেস করলে, হইছে কি মশায়—হইছে কি কয়েন তো?

এবারে সারেঙ সাহেব নিজেই নেমে এলেন, মতির মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, এক্ষুনি এইখানেই নাম্‌তে হবে তোমাদের—এ অসুখ নিয়ে জাহাজে চড়তে আমি দিতে পারি না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তে। জাহাজ শুদ্ধ লোকই এবারে মারতে এলো মুকুন্দকে, বললে, ছি ছি মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে তাই নিয়ে কিনা জাহাজে চ'ড়ে চলেছে। জানে না কি বিশ্রী রোগ ওটা?

একরকম জোর করেই সারেঙ সাহেব মুকুন্দদের গাজীরহাটে নামিয়ে দিয়ে ষ্টীমার চালিয়ে চলে গেলো।

অন্ধকার হয়ে আস্‌ছিলো, মুকুন্দর এবার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আর মাইল দশেক রাস্তা। কোনরকমে পার হতে পারলেই রেল ষ্টেশন। তারপরে যে-কোরে হোক এদের নিয়ে কলকাতা পৌঁছতে পারতো মুকুন্দ, কিন্তু তাও হোল না—আর যে হবে সে আশাই বা কোথায়?

মতির মা তখন যন্ত্রণায় কাতরাতে আরম্ভ করেছে, আর মতি অনেকক্ষণ একভাবে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে মুকুন্দর পাশে।

তবু শেষ পর্যন্ত মুকুন্দ আর একবার চেষ্টা করলো, যদি কোনওরকমে খালিশপুরে পৌঁছতে পারে। এখনো গোটা দশেক টাকা আছে তার সংগে। ঘাটের কাছে গিয়ে অনেক ডাকাডাকির পর একটা নৌকোও জুটলো। পরে এক টাকায় মাঝি রাজী হোল খালিসপুর যেতে। তবে বললে রাত দশটার আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে না। স্রোত উজিয়ে যেতে হবে, কষ্ট হবে অনেক।

তাই সই। মুকুন্দ তাতেই রাজী হ'য়েছিলো। কিন্তু তাও সইলো না তার কপালে। মাইল তিনেক আসবার পর মতির মা'ই অসম্ভব রকম চেঁচামেচি আরম্ভ ক'রে দিলে, গায়ের গুটিগুলো তার রীতিমতো পেকে উঠেছে। অসহ্য যন্ত্রণা—মতির মা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। শেষ পর্যন্ত মাঝিদের কাছেও ব্যাপারটা চাপা রইলো না। তখন চারদিকেই বসন্ত হচ্ছে। মাঝিরা আর দেরী করলো না। কাছেই যে ঘাট পেলে, সেইখানেই ওদের নামিয়ে দিলে, বললে, ছোটলোক তোমরা, নিজের সর্বনাশ তো হ'য়েইছে, আরো পাঁচজনকে বিপদে ফেল্‌তে চাও, এক্ষুনি নেমে যাও মালপত্তর নিয়ে—ভাড়া চাইনে আমরা।

সুতরাং আবার সেই স্ত্রীপুত্র আর কিছু মালপত্র নিয়ে মুকুন্দ নদীর তীরে এসে দাঁড়ালো। টিম্‌টিমে আলো জ্বালিয়ে নৌকোটা তাদের পৌঁছে দিয়ে অনেক দূরে চ'লে গেলো।

এবার মুকুন্দর চোখে সত্যিই জল এলো। অনেক আশা নিয়ে সে বেরিয়েছিলো চাঁপাডাঙা থেকে। হরিশ কাকার কাছে শুনেছিলো এই সময়ে ক'লকাতায় গিয়ে পড়তে পারলে একটা ব্যবস্থা হবে। সেই আশাতেই পথে নেমেছিলো মুকুন্দ। তা আর কপালে নেই।

চারদিক অন্ধকার। নদীর একটানা জলের শব্দ ভেসে আস্‌ছে, মুকুন্দ উঠে দাঁড়ালো, বললে, চলো—ওই দিকে কোথাও গিয়ে বসি। এ রোগী নিয়ে গেলে কেই বা জায়গা দেবে আমাদের? রাতটা রাস্তায় শুয়ে কাটাতে হবে বৌ!

মতির মা চুপ ক'রে সেই মাটির উপরে ঘাড় গুঁজে বসেছিলো, কথা বললে না। সত্যি, তার জন্যেই তো নৌকো থেকে নেমে আস্‌তে হোল সকলের। যদি একটু কষ্ট সহ্য ক'রে মুখ বুজে প'ড়ে থাকৃতো, তাহ'লে নিশ্চয় এতোক্ষণে খালিশপুরে পৌঁছে যেতো তারা।

কিন্তু মুকুন্দ এর জন্যে সামান্য অভিযোগও করলো না। যা তার ভাগ্যে আছে ঘট্‌বেই। ও কেউ বাধা দিতে পারবে না, সুতরাং নীরবে তাকে মেনে নেওয়াই তো ভালো।

মুকুন্দ উঠে দাঁড়ালো, বললে, এখানে পড়ে থাকৃলে হবে না, চলো ওদিকে একটা মস্ত বড়ো বাঁশঝাড় দেখ্‌ছি, ওরই তলায় গিয়ে রাতটা কাটাই, তারপরে কাল সকালে যা হ'বার তা হবে।

মাথাটা সেই দুপুর থেকেই মুকুন্দর টিপ টিপ

করছিলো। এখন বুঝ্‌লো আবার বেশ জ্বর এসেছে। পাঁচ দিন থেকে তারো জ্বর চ'লেছে। সেইখানেই কয়েকটা ছেঁড়া কাপড় বিছিয়ে মুকুন্দ শুয়ে পড়লো। মতির মা তার আগেই শুয়ে প'ড়েছে।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর আরো দুটি চিঁড়ে খেয়ে মতি একটু শান্ত হ'য়ে এখন ঘুমিয়েছে। রাত অনেক, কাপড়টা দিয়ে মতির গা ভালো ক'রে ঢেকে দিলে মুকুন্দ, একটু একটু ঠাণ্ডাও পড়ছে বেশ।

চুপচাপ শুয়ে মুকুন্দ আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। তারায় তারায় ভ'রে গেছে চারদিক। অনেক দূরে কোথায় যেন শিয়াল ডাক্‌ছে।

আজ বারে বারে তার বাবা শ্যামাদাসকে মনে পড়তে লাগ্‌লো মুকুন্দর। তারই ছেলে সে, শুয়ে আছে জংগলের মধ্যে, বাঁশঝাড়ের নীচে। হাসি পেলো। ভগবান!—সবই ভগবানের খেলা!

চোখ বুজ্‌লে সেই সব পুরোনো দিনের ঘটনাগুলি স্পষ্ট ছবির মতো দেখ্‌তে পায় মুকুন্দ। কি সংসার ছিলো তাদের! সব থেকে বেশী ক'রে মনে পড়ে, ধান ওঠানোর দৃশ্যগুলো। বাপের সংগে মুকুন্দই খাট্‌তো বেশী। একদিন বেশ মনে আছে—বিকেলের দিকে শ্যামাদাসের সংগে মাঠ পার হ'য়ে বাড়ী ফিরছিলো সে। হঠাৎ শ্যামাদাস একটা জায়গায় থম্‌কে দাঁড়ালো, বললে আর যাই করিস মুকুন্দ, এই মাটিকে ভুলিস্ নি—দ্যাখ দেখিনি মা লক্ষ্মী আমার কেমনভাবে আজ সেজেছেন—দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়।

মুকুন্দও চেয়ে রইলো। চেয়ে থাকবারই মতো দৃশ্য বটে। এখনো চোখ বুজ্‌লে মুকুন্দ দেখ্‌তে পায় সেই সব সবুজ ফসলে তাদের সমস্ত মাঠ ভ'রে র'য়েছে। বাতাসে দুল্‌ছে তারা। সবুজ আঁচল বিছিয়ে মা লক্ষ্মী তাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। ক্রমশঃ রাত বাড়ছে। মতির মা অনেকক্ষণ চেঁচামেচি ক'রে একটু ঘুমিয়েছে। মুকুন্দর মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়। চোখ বুজে সে পাশ ফিরে শুয়ে রইলো।

একটা কিসের যেন খস্ খস্ শব্দ হোল—মুকুন্দ এদিক ওদিক দেখ্‌লে, তারপরে আবার চুপ ক'রে শুয়ে রইলো। মতিটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার পাশে। চাঁদ পশ্চিম দিকে হেলে প'ড়েছে, কতো রাত কে জানে!

আবার বাঁশঝাড়ের মধ্যে সেই কিসের খস্‌খসানি। মুকুন্দ ঘাড় তুলে তাকালো, তাকিয়েই তার সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে এলো। দেখ্‌লে সেই অন্ধকারের মধ্যে আগুনের মতো চোখ দুটো জ্বল্‌ছে—সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো তার, একবার মনে হোল মতির মাকে ডাকে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের হোল না।

অন্ধকারের মধ্যে মুকুন্দ দেখ্‌লে কতোগুলি শানিত দাঁত যেন ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলছে।

তারপরে কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত পার হোলো। হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে সে আবার শিউরে উঠ্‌লো, কিন্তু উপায় নেই। সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো মুহূর্তে মতির মার উপরে এসে লাফ দিয়ে প'ড়েছে—আর তারপরে একটু অস্ফুট আর্তনাদ! সেই অন্ধকার স্তব্ধ আকাশের তলায় কতোটুকুই বা তার দাম!

মুকুন্দ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে বস্‌লো, মতিও ভয় পেয়ে উঠে ব'সেছে। বললে, মা কোথায় বাবা?—হাঁউমাউ ক'রে মতি এবারে কেঁদে উঠ্‌লো।

ছেলের হাত ধ'রে মুকুন্দ কোনরকমে উঠে দাঁড়ালো। দুই পা তার টল্‌ছে।

তারপরে ভোর হোল। এখানে ওখানে রক্তের আর পায়ের ছাপগুলো গভীর জংগলের মধ্যে ক্রমশঃ মিলিয়ে গেছে।

মতির হাত ধ'রে পাগলের মতো হন্ হন্ ক'রে হাঁট্‌তে লাগ্‌লো মুকুন্দ। তারপরে একটা ঘাটে নেমে পেট ভরে জল খেলো সে, তারপর মতিকে নিয়ে আবার হাঁট্‌তে লাগ্‌লো।

মতি বললে, ক্ষিদে পাচ্ছে বাবা!

মুকুন্দ উত্তর দিলে না।

অনেকটা পথ চল্‌লো তারা—তারপরে মুকুন্দ আর পারলো না। একটা গাছের তলায় ব'সে পড়লো। সমস্ত মাথাটায় তার যেন আর কিছু নেই। সারা শরীরে কেমন যেন একটা ক্লান্ত অবসাদ নাম্‌ছে। মুকুন্দ সেই সকালের আলোয় অবসন্ন হ'য়ে শুয়ে পড়লো।

অহল্যা-জার ইন্দ্র

[অপ্রকাশিত রচনা]

৺রাজমোহন নাথ, বি. ই., তত্ত্বভূষণ

দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক গৌতম-ঋষির পত্নী অহল্যাকে ঋষির ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক ধর্ষণ এবং সেইজন্য ঋষির শাপে প্রথমে ইন্দ্রের অণ্ডকোষদ্বয় স্খলন এবং তৎস্থলে মেষের অণ্ডকোষদ্বয় সংযোজন; এবং অতঃপর সোমকুণ্ডে স্নান করার ফলে ইন্দ্রের গাত্রময় সহস্র-যোনির আবির্ভাব এবং আরও পরে ঐ যোনিগুলির চক্ষুরূপ ধারণ—ইত্যাদি কাহিনী রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। গৌতমের শাপে অহল্যা পাষাণী হইয়া বহু সহস্র বর্ষ গৌতমের পরিত্যক্ত আশ্রমে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পরে দ্বাপরযুগে শ্রীরামের পাদস্পর্শে পুনর্জীবিতা হইয়া উঠেন এবং পুনরায় গৌতমের সহিত মিলিতা হন।

এই কাহিনীটি মোটামুটি ভাবে সর্বজনবিদিত; এবং নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে কাহিনীটির রহস্যার্থ ব্যাখ্যারও চেষ্টা হইয়াছে।

কাহিনীটির মূল শতপথব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি প্রাচীন কালীন প্রবচন মন্ত্র। মন্ত্রটি হইল:

"হরিবহ আগচ্ছমেধাতিথির্মেষ বৃষণশ্বস্যমেনে
গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জার ইতি"—(৩।৩।৪।১৮)

এই মন্ত্রটি ইন্দ্রের আহ্বানসূচক স্তুতিমূলক। ইহা ঐতরেয় আরণ্যক নামক গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে (১।১২।৪)

শ্লোকটির অর্থ হইল—যিনি হরিনামক অশ্বদ্বয়বাহী রথারোহণকারী; যাঁর মেধা বা ধীশক্তি অতিথিবৎ সময়াসময় বিচার না করিয়া সর্বদা নিকটে উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতি; যিনি স্বয়ং মেষস্বরূপ; যিনি বীর্যবর্ষণ ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্বশক্তিব (horse power) প্রকৃতি (dynamisus), যিনি গৌরমৃগদ্বয়কে পরাভূত বা স্তব্ধ করেন; এবং যিনি অহল্যার জার বা উপপতি,—সেই ইন্দ্র এখানে আগমন করুন।

শতপথ-ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থদ্বয়ে উপরোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃতি চিহ্নদ্বয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয় যে, ইহা প্রাচীন কালাবধি সাধক

ক্ষিদেয় অনেকক্ষণ থেকে মতির শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে, ডাক্‌লে, বাবা, ও বাবা! মুকুন্দ সাড়া দিলে না।

তারপরে আস্তে আস্তে বেলা প'ড়ে এলো। তবু মুকুন্দ উঠ্‌লো না—মাটির উপরে পাশ ফিরে যেমন সে শুয়েছিলো তেম্‌নি রইলো।

এবারে মতির যেন ভয় হোল একটু। আশেপাশে সেরকম লোকজনও নেই। সে আস্তে আস্তে নদীর ঘাট ধরে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

বেলা পড়ে আস্‌ছে। মুকুন্দ তখনো সেইভাবে শুয়ে রইলো। শ্যামাদাসের ছেলে মুকুন্দ। চাঁপাডাঙাকে যারা ইচ্ছে করলে নিজের গোলার ধান বের ক'রে ছয় মাস খাওয়াতে পারে, সমস্ত গ্রামের লোক যাকে অসীম শ্রদ্ধা করে।

সূর্য ঢ'লে পড়লো। পশ্চিম দিকটা লাল হ'য়ে উঠেছে—মনে হয় বিশাল দাঁত দিয়ে সমস্ত আকাশটাকে কে যেন টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে! তারই রক্ত ঝরছে চারদিকে।

ধরণীর অভ্যন্তরে মাতা জীবপালিনীর যে অনন্ত হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে, মাটির উপরে কান পেতে তাই শুন্‌ছে নাকি মুকুন্দ! যে ফসল তার গোলা থেকে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে একদিন, তাদেরই আবার ফিরে আসার পদধ্বনি?

তবু কই, কেউ তো এলো না মুকুন্দকে অভিনন্দন জানাতে, সমস্ত দিনই তো সে অপেক্ষা ক'রে রইলো—সমস্তটা দিন। কিন্তু না! যারা আস্‌বার তারা এসেছে। রীতিমত শোভাযাত্রা করে বসেছে তারা। লাইনের পর লাইন দিয়ে, একের পর এক, অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ভাবে। আমরা যদি তাদের সামান্য পিঁপড়ে ব'লে হেসে উড়িয়ে দিই, তাহ'লে অসম্মান করা হ'বে মুকুন্দকে—হ্যাঁ, অসম্মান করা হবে বৈকি!

জোরে বাতাস বইতে আরম্ভ করলো। আর সে বাতাসে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো কংকণা নদীর জল। ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক ক'রে জ্ব'লছে ঢেউগুলি।

দেখা গেলো সুদূর উচ্চতায় কয়েকটা শকুনের অন্ধকার ছায়া—আর নীচে সময়ের অনন্ত স্রোত! মুকুন্দ শুয়ে রইলো।

সমাজে প্রচলিত একটি প্রবচন মন্ত্র। কোনও বেদে এই মন্ত্রটি নাই। কিন্তু ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে মেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে—ঋ. ১।৫১।১,—৫২।১; আবার বলা হইয়াছে ইন্দ্র মেষরূপ ধারণ করিয়া মেধাতিথিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ঋ. ৮।২।৪০)। বৈদিক সাঙ্কেতিক ভাষায় —প্রজ্জ্বলনকালীন অগ্নির প্রাথমিক রূপের সংজ্ঞা—অজ (ছাগল); সেইজন্য ব্রহ্মের এক সংজ্ঞা—"অজ একপাদ"। প্রজ্জ্বলিত দীপ্তাগ্নির সংজ্ঞা—মেষ। অগ্নির সহিত সৃষ্টির প্রথম স্পন্দন বা বাকের অন্তর্নিহিতা শক্তি এবং প্রাণশক্তিও সংশ্লিষ্টা। সেইজন্য বলা হয়—"প্রাণাগ্নি"; "বাক্‌বৈ অগ্নিঃ" (শতপথ—৩।২।২।৩); "বজ্রৈব বাক্" (ঐত. ব্রা. ২।২১)। বাক্‌ই প্রাথমিক শুদ্ধজ্ঞান, প্রজ্ঞাপারমিতা—"প্রথমজা ঋতস্য, বেদানাং মাতা, অমৃতস্য নাভিঃ" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৮।৫)। আবার ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে ইন্দ্রের "জার" খ্যাতি প্রসিদ্ধ। এক মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন—"প্রবোধয় জরিত জারমিন্দ্রম্" (ঋ. ১০।৪২।২);—হে গায়কগণ! জার ইন্দ্রকে প্রবুদ্ধ কর। আর এক মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন—কামাতুরা যুবতীরা যেরূপ যুবকের প্রতি ছুটিয়া গিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়, আমাদের স্তুতিগুলিও সেইরূপ সুপুরুষ, বলবান্, যুবক ইন্দ্রের কাছে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরুক (১০।৪৩।১)। সমগ্র ঋগ্বেদের বর্ণনামতে ইন্দ্র-চরিত্রের বিশেষত্ব হইল—অন্য কর্তৃক অভেদ্য শত্রুর দুর্ভেদ্য পুরী ভেদ করা, সেইজন্য তাঁর নাম পুরন্দর (পুর+ভিন্দর); সর্ববিধ বাধাবরণ ভেদপূর্বক বৃষ্টিজল বর্ষণ ও নদীস্রোত প্রবাহিত করা, সেইজন্য তিনি বৃত্রহা বা বৃত্রঘ্ন। পণিগণ কর্তৃক দিবালোকহীন পর্বতগহ্বরে গুপ্তভাবে রক্ষিত চারটি দেবগাভীকে ইন্দ্রই বৃহস্পতি ও মরুদ্গণের সাহায্যে পর্বতবিদীর্ণপূর্বক গহ্বর সূর্যালোকোদ্ভাসিত করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদিক সাঙ্কেতিক ভাষায় —গাভী, গৌ বা ধেনু শব্দ বাক্ বা প্রজ্ঞাবাচক (অথর্ব ৯।২।৫)। চার গাভী—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামক শব্দ বা বাকের চার স্তর। জন্মিবা মাত্র জীবের বাক্ বা জ্ঞানস্ফুরণ হয় না; ইহা মস্তিষ্কের এক নালার গহ্বরে পঞ্জা বা পল্লা অসুরে লুকাইয়া রাখে। ইন্দ্র, বৃহস্পতি (বাক্‌পতি, বাচস্পতি) ও বায়ুগণের সমবেত চেষ্টায় এবং বহু যুদ্ধের পর উহা মুক্ত ও স্ফুরিত হয়।

গৌর মৃগ—চিত্রিত দেহ, এবং সদা শব্দায়মান ও সঞ্চরমান হরিণ—(spotted barking deer)। যোগশাস্ত্রে ইহা হৃদয়স্থ অনাহত চক্রের বাহক; বৈদিক রূপক মতে ইহা হৃদয়স্থ প্রাণাসান ক্রিয়ার প্রতীক। অথর্ববেদে বলা হইয়াছে—জীবের দেহটি অষ্টচক্র ও নবদ্বারযুক্ত দেবতাদেরও দুর্ভেদ্যপুর। সেই পুরে স্বর্গীয় জ্যোতিরাবৃত একটি স্বর্ণময় কোষ আছে। সেই কোষে তিনটি শলাকাবিদ্ধ একটি ত্রিভুজক্ষেত্রে ব্রহ্মবিদ্‌গণের জ্ঞাতব্য আত্মন্‌বৎ এক যক্ষ (যিনি সব ধন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখেন) থাকেন; এবং তাঁহার সহিত আছেন "যশা-সংপরিবৃতা, প্রভ্রাজমালা, অপরাজিতা হরিণী" (১০।২।৩৩)। ঐ মহদ্ যক্ষ ত্রিভুবনের সলিলপৃষ্ঠে তপে নিমজ্জিত এবং তাঁহাকেই বৃক্ষের স্কন্দ ও শাখাবৎ আশ্রয় করিয়া সর্বদেবগণ অধিষ্ঠিত আছেন। "—সর্বে গুহ্যঃ প্রজাপতিঃ"—তিনিই গুপ্ত প্রজাপতি, (১০।৭।৩৮।৪১)।

প্রাণ ক্রিয়ার যুগপৎ দুইমুখো গতি:—প্রাণ ঊর্ধ্ব-গতি, অপান—নিম্নগতি হৃদ্‌যন্ত্রে অনবরত দুই গৌরমৃগের (গৌরৌ) চীৎকার ও ছুটাছুটি। সংসারচক্রের গতির ক্রিয়ায়ও ঐরূপ দ্বিমুখী ক্রিয়ার, ঐ ক্রিয়ার অশ্বশক্তির (horse power) দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় যমজ ভ্রাতা, এবং তাঁরাও. "হরিণাবিব গৌরাবিব অনুষবসৌ" (ঋ. ৫।৭৮।২)—গৌর হরিণদ্বয়বৎ চঞ্চল।

উপরে বলা হইয়াছে,—বাক্ বা প্রজ্ঞার সাঙ্কেতিক পরিভাষা—গৌ। তিনি বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ—স্পন্দনের অন্তর্নিহিতা শক্তি। তিনি যখন বাস্তব সৃষ্টিক্রিয়া ব্যাপারে শক্তিরূপে ক্রিয়মানা হন, তখন রূপায়িকা শক্তি (transforming energy) অর্থাৎ অগ্নিশক্তি (বাচক অক্ষর=র)-যুক্তা হইয়া গৌ-রী হইয়া যান। তখনই তিনি অন্তরীক্ষ সমুদ্রের সলিল পাদ-মাত্রানুসারে মন্থন করিতে করিতে "সহস্রাক্ষরা ভবতি"; তাহা হইতে অক্ষর নির্গত হয়, সমুদ্রে তোলপাড় উঠে, চতুর্দিকে সর্ববিশ্বে প্রাণের সঞ্চার হয়—"তেন জীবন্তিপ্রদিশ্চতস্রঃ, তদ্বিশ্বমুপজীবতি" (ঋ. ১।১৬৪।৪১,৪২)।

কেনোপনিষদে উপরোক্ত যক্ষের কাহিনী আছে। অগ্নি-বায়ু আদি দেবগণ যক্ষের পরিচয় লাভে অসমর্থ হওয়ায় যখন ইন্দ্র যক্ষের নিকট গেলেন, তখন যক্ষ অন্তর্হিত হইয়া গেলেন এবং তৎস্থলে সেই আকাশে (অস্মিন্নেবাকাশে) আবির্ভূতা হইলেন উমা-হৈমবতী বহুশোভমানা এক— স্ত্রী (৩।১২)। সেই নারী ইন্দ্রকে খাতির করিয়া তাঁকে ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় দিয়া বলিলেন—এই যক্ষই ব্রহ্ম, যাঁর বলে সব দেবতারা বলীয়ান্।—কেনোপনিষদুক্তা বহুশোভমানা স্ত্রী উমা হৈমবতী উপরে উল্লিখিত অথর্ববেদোক্তা—গুহ্য-বৃহস্পতি-যক্ষসংলগ্না "যশসা সংপরিবৃতা, প্রভ্রাজমানা, অপবাজিতা হরিণী" বা গৌরী।

"আকাশ" শব্দটিও ব্রহ্ম এবং প্রাণবাচক—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ অতএব প্রাণঃ" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২৩-২৪)। জীবের হৃদয়াকাশ ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরীক্ষাকাশ একই সূত্রে গ্রথিত, প্রথমটি দ্বিতীয়টির হুবহু প্রতীক। উমা শব্দটি ওম্ ধাতু নিষ্পন্নে, অর্থ প্রসাদিতা, অবরক্ষিতা, ন্যাসভূতা (ঋ. ৪।১৯।১, ৫।৫১।১)। উমার সহিত যিনি বর্তমান তিনি সোম—রাজা, বিচক্ষণ-পঞ্চমুখ (কৌষীতকি উপনিষদ ২।৬)। সোম-গিরিক্ষিৎ (ঋ. ৩।৪৮।২, ৯।৮।১); ইন্দ্র ও সোম এবং তিনিও গিরিক্ষিৎ (ঋ. ১০।১৮০।২)। আবার রুদ্র—সোমধারী, গিরিশর (শুক্লযজু ১৬।২৯)। উমা শিব-পত্নী, কুমারজননী; আবার তৈত্তিরীয় সংহিতা-মতে তিনি অম্বিকা—রুদ্রের ভগিনী (১।৮।৬।৪)। রুদ্র যখন স্ববান্ বা আত্মকেন্দ্রিক, তখনই তিনি শিব (ঋ. ১০।৯২।৯); বামদেব (১।১৬৪।১); তিনিই তখন পূর্বোক্ত যক্ষ—গুহ্য-বৃহস্পতি, বা গুহ্য-বাক্‌পতি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মতে সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন শান্তাতীত—"অ-তম" অবস্থায় যখন সৎ-অসৎ বা দিবারাত্রির ভেদজ্ঞান ছিল না, তখনকার অবস্থার নাম "শিব এব কেবলম্" এবং ইহাই সৃষ্টিপ্রচোদনের মূলোৎস "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" এবং "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" (৪।১৮)। পুরাণী অর্থাৎ আদি প্রজ্ঞা তাহা হইতে প্রসৃতা হন। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত মতে ঐ অবস্থায় ছিলেন বায়ুহীন অবস্থায় স্থিত প্রাণগতি স্বধা বা প্রজ্ঞার সহিত একাঙ্গীভূত—"অনাদীবাতং স্বধয়া তদেকং" (১০।১২৯।২)। প্রাতিভসংবিৎরূপা বা বিবেকজ জ্ঞানের পূর্বরূপা উষা স্বধার সহিত একরথে চলেন (ঋ. ৭।৭৬।৪)।

"অতমঃ" অবস্থায়—সবই "গূঢ়মগ্রে অপ্রকেতম্" (ঋ. ১০।১২৯।১)—বিশ্বের সব ব্যাপারই গুহ্য, গুপ্ত ও অপ্রকট। "গৌ" ও তমসাশ্রিতা অর্থাৎ গৌতমে ন্যাসভূতা। রামায়ণে বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতি সর্ববৈগুণ্যরহিতা এক নারী সৃষ্টি করাতে, দেবগণ ভাবিলেন এই নারী ইন্দ্রভোগ্যা হইবে, কিন্তু প্রজাপতি ঐ নারীকে গৌতমের নিকট ন্যাস (গচ্ছিতা)-রূপে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে ঐ নারী বহুনির্যাতিতা হওয়ায়, পরে প্রজাপতি তাহাকে গৌতমের পত্নীরূপে নিয়োজিতা করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র একদা গৌতমের ছদ্মবেশে তাহার আশ্রমে গিয়া দীপ্তাগ্নিশিখাবৎ অহল্যার নিকট রতিপ্রার্থনা করেন,···বলাৎকার করেন নাই। অহল্যা "সহস্রাক্ষ"কে চিনিতে পারিয়াও স্বেচ্ছায় আত্মদান করিলেন, এবং ভোগান্তে ইন্দ্রকে বলিলেন—"আমি তৃপ্ত হইয়াছি, হে মানদ! এখন তোমাকে ও আমাকে রক্ষা কর।" ঠিক সেই সময় গৌতম মুনি আসিয়া উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে "বিফলত্বং ভবিষ্যসি" বলিয়া অভিশাপ দিলেন, এবং অহল্যাকে "বায়ুভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী, অদৃশ্যা সর্বভূতানাম্" হইয়া ঐ আশ্রমে পড়িয়া থাকিবার জন্য অভিশাপ দিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড—৪৮ অঃ)। "বিফলীকৃত", "অফল" ইন্দ্র দেবগণ ও ঋষিসঙ্ঘের নিকট গিয়া বলিলেন যে, তিনি "সুরকার্য" করিতে গিয়া মহাত্মা গৌতম কর্তৃক এরূপ "অফল" অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ মরুদ্‌গণ সহ পিতৃদেবতাগণের নিকট গিয়া তাঁহাদের "মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছত"—মেষের অণ্ডকোষদ্বয় আনিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন (ঐ. ৪৯।৮)।

উপরে ইন্দ্রের প্রতি প্রেমসম্পন্না কেনোপনিষদুক্তা উমা হৈমবতী নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীর কথা বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে বিশ্বভুবনরূপ শকটচালক রৈক্ক জানশ্রুতি রাজার সুন্দরী যুবতী কন্যাকে জায়ারূপে

গ্রহণ করিয়া সর্বদানী রাজাকে বলেন—"তুমি এই জায়ার মুখ দিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিবে—"অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা" (৪।২।৫)। আবার ঐ উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, জীবের মৃত্যুর পর তাহার শুদ্ধ আত্মা শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমাজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। তিনিই উত্তম-পুরুষ (গীতার পুরুষোত্তম)। তিনি স্বীয় স্বরূপে অবস্থান-পূর্বক পিতামাতা হইতে সম্ভূত এই দেহকে ভুলিয়া—হাস্য, ক্রীড়া, যানারোহণ করিয়া অথবা জ্ঞাতিগণ সহ বিচরণ করেন অথবা স্ত্রীগণ সহ রমণ করেন—"রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা" (৮।১২।৩)।—পরম মুক্তির পরও স্ত্রী-রমণ! রৈক্ক ও নির্বিকল্প-পরমপুরুষ,—তিনিও সুন্দরী জায়ার মুখে কথা বলেন।—ব্যাপার কি?

বৈদিক ঋষির ধারণামতে ঋতম্ভরা-বিশুদ্ধপ্রজ্ঞা—পরমা সুন্দরী, সর্বগুণান্বিতা যুবতী; উষার ঝলকের ন্যায় তাঁহার দেহের জ্যোতিঃ—"পূর্বরূপং বিবেকজ জ্ঞানস্য—উষা যথা রবেঃ" (যোগকারিকা)। পরম সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন—"তমসীত্তমসা গূঢ়ম্ অপ্রকেতম্" অবস্থায় নির্বিকল্প পরম-পুরুষের সহিত পরস্পরে পরস্পরকে ধ্যান ও আশ্রয় করিয়া একাঙ্গীভূত হইয়া থাকেন—"স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্যবর্ত"। সৃষ্টিক্রিয়ার প্রাথমিক ঋতের (Rythm) ফলস্বরূপ স্পন্দন বা শব্দসমুদ্ভূত হইতে, তিনি স্পন্দনের অন্তর্নিহিতা প্রকৃতিরূপে আবির্ভূতা হন। এই অবস্থায় তিনি গৌ, বাক্, বিরাজ নামে অভিহিতা হন। তিনিই দেবতা-মানুষাদি সর্বপ্রাণীকে প্রাণবন্ত করান, শব্দ করান ও বাক্য বলান। তাঁহার ইচ্ছামত তিনি কাহাকেও উগ্র, ঋষি, ব্রহ্মা, সুমেধাবান করেন (ঋ. ১০।১২৫।৫)। আবার তাঁর সাধককে কখনও "উত ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা" (ঋ. ১০।৭১।৪)—উল্লসিতহৃদয়া সুবেশা জায়া কর্তৃক দেহোন্মুক্ত করিয়া পতিকে আত্মদান করার ন্যায় নিজকে বিলাইয়া দেন। এবং তখন দুইজনে এমন ভোগাসক্ত হন যে, জোর করিয়া ঠেলিলেও কেহ কাহাকেও ত্যাগ করেন না—"উত্ব চং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু" (ঐ. ৫)। কিন্তু ক্ষণিক ভোগের পর সাধক দেখেন—তিনি "অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রু বাঁ অফলামপুষ্পাম্" (ঐ. ৫)—গাভী নাই, তাঁর শ্রুতিজ্ঞান সব অফলা-অপুষ্পা—একেবারে অকেজো।—ব্যাপার কি?

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বাক্-গাভীর চার রূপ—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। ঋগ্বেদের মতে পণিদের গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত চারটি গাভীর একটিকে বৃহস্পতি নিজের জন্য গুপ্ত করিয়া রাখিলেন, এবং অপর তিনটিকে যথাক্রমে দেবতা, ঋষি ও সর্বজনভোগ্যা করিলেন। প্রথমটি হইল পরা-জ্ঞান, চতুর্থ লোকের বা তুরীয় লোকের ব্যাপার। ইহাকে কেহই আয়ত্ত করিতে পারে না, এমনকি চতুর্থ লোক আছে কিনা, তাও সহজে বোধগম্য হয় না। বেদজ্ঞানত্রয়ী, ত্রিলোকের জ্ঞানাশ্রিতঃ চতুর্থী—অমিতমানসী—"অনদ্ধা বৈ তদ্দিমঁা-ল্লোকাপতি চতুর্থমস্তি বা ন বা"। বৌদ্ধরা বলেন—ইহা অরূপাবগোচর ভূমি, নৈব সংজ্ঞা, ন-অসংজ্ঞা। বেদ বলেন ইহা—"চিৎস্বোর্ধ্বচিত" (শতপথ ১।২।১।১২) মাণ্ডুক্যোপনিষদের মতে সর্বপ্রকার নেতি-নেতির চরম কেন্দ্র "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে" (৭); এবং ইহা "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ" (১২)। এই অব্যবহার্য চতুর্থ স্তরের, অতিমানসী তুরীয়া প্রজ্ঞা ও কাজে কাজেই অব্যবহার্যা, অকর্ষণীয়া, অহল্যা (unculturable)। ঋগ্বেদ ত বলিয়া রাখিয়াছেন, তাকে পাইলেও সাধক হন অফল,—রামায়ণোক্ত—বিফল—অফল।

জীবের দশ-ইন্দ্রিয়,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় দশেন্দ্রিয়ের রাজা—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ"। মনই ইন্দ্র; "মনঃ ইব হি প্রজাপতিঃ"। মনের স্বভাব সর্বদা অজানাকে জানা, অলভ্যাকে লভ্যা করা, অগম্যাতে গমন করা। মন স্বভাবতঃ পরকীয়া প্রেমাসক্ত এবং জারবৎ আচরণকারী। প্রজ্ঞা সুন্দরী যুবতী ও সর্বদা উশতী-সুবাসা জায়ার ন্যায় তার প্রণয়-প্রার্থীকে আত্মদান করিতে সমুৎসুকা। তিনি বিদ্যুৎকারা কুণ্ডলিনী সর্পিনীবৎ।

ইন্দ্র—মন অতিমানসী অহল্যা-প্রজ্ঞা-সুন্দরীকে গৌ-

-তমী অবস্থায় ধর্ষণ করিবার জন্য—দেহরথখানাকে জ্যোতির্ময় (হরি-হরিৎ) অশ্ববাহী করিল, প্রত্যুৎপন্নমতি হইল, প্রাণাগ্নিশিখা উদ্দীপ্ত (মেষ) করিল, বীর্যবর্ষণ শক্তির প্রকৃতি (মেলা) সাজিল। এবং তারপর প্রাণ-অপান ক্রিয়ারূপ গৌর-মৃগ দুইটিকে (গৌরৌ) পরাভূত বা স্তম্ভিত (অবস্কন্দ) করিল, অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছিয়া অতি-মানসী অহল্যা প্রজ্ঞাকে দেখিল—"দীপ্তাগ্নিশিখাবৎ" ; এবং তিনিও বচনমাত্র সাধ্যা হইয়া স্বেচ্ছায় মন-ইন্দ্রকে আত্মদান করিলেন। তখন ইন্দ্র অহল্যাকে বমণ করিয়া "সংবিশত্যাত্মনাত্মানং" (মাণ্ডুক্য-১২)—তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাই হইয়া গেলেন। লবণের পুতুল লবণত্ব চাখিতে গিয়া সমুদ্রের জলে মিশিয়া গেল। রমণের ফল কিছুই উপলব্ধি বা লাভ হইল না। অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধিতে সাধক পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ হইয়া যান, সেই জ্ঞানের কোন উপলব্ধি থাকে না। পরা-প্রজ্ঞার জারত্বের পরিণতি বিফলত্ব-অফলত্ব।

তবে "ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" হয়, নির্বিকল্প হইতে সবিকল্পে ফিরিয়া আসিলে সাধকের শত-সহস্র ক্রতু (creative will) জন্মে। তখন তিনি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের সামর্থ্য অর্জন করেন, অথবা "সর্বংহ পশ্য পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ" (ছান্দোগ্য—৭।২৬।২) সব দেখেছি, সব পেয়েছি ভাবাপন্ন হন। শক্তির ক্রিয়া সর্বদা ত্রিভুজাত্মক (triangle of forces)। সংকল্প-বিকল্পাত্মক শক্তি-ত্রিভুজের তিন বাহুতে যুগপৎ প্রসারণ ও সঙ্কোচন হয়, ইহার নাম যোনি, এবং ইহার চিত্র খেলার তাসের "চিড়তন"-এর ন্যায়। এই চিত্রই ক্রতুর কেতু (insignia) এবং ইন্দ্রের "তনূষু ভূরয়ঃ কেতবঃ সন্তি" (ঋ. ১।৫৫।৮)। ইহাই ইন্দ্রের গাত্রময় যোনি উদ্ভূত হওয়ার রূপক কাহিনী। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্বদেশের রাজাদের গাত্রাবরণে এই চিত্র অঙ্কিত থাকিত। আবার উপরোক্ত ছান্দোগ্য-উপনিষদের—"সর্বংহ পশ্যপশ্যতি" ভাব হইতে পুরাণকার ইন্দ্রের গাত্রের সহস্র যোনির স্থলে সহস্র চক্ষুর অবতারণা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে পরমপুরুষ "সহস্রাক্ষীঃ-সহস্রপাৎ"; রামায়ণে অহল্যা সমীপে সমাগত ইন্দ্রকে "সহস্রাক্ষ" বলা হইয়াছে। ইন্দ্র তথা মন—স্বভাবতঃ সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাৎ এবং পরকীয়া প্রেমাসক্ত জার।

অহল্যা-জার ইন্দ্রের কাহিনী আদি বৈদিক যুগ হইতে আর্য সমাজে প্রচলিত—যৌগিক সাধনপন্থার একটি রূপক বর্ণনা মাত্র।

কে তুমি ?

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

কে তুমি সহস্র সূর্য্যসমতেজোধারী
আমার হৃদয় দ্বারে রয়েছ বসিয়া
শক্তিময় সূক্ষ্মদেহ যেন নিরাকার ?
কেশাগ্রের শত ভাগ সূক্ষ্ম বটে মানি
তাহারও শতাংশসম অতিসূক্ষ্ম তুমি
তথাপি বিপুলতম শক্তির আধার ॥
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মোর হৃদয়ের দ্বার
তোমার আসন ; তাই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ
বর্ণিছেন ভারতের ঋষিরা তোমারে।
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড তুমি রয়েছ ব্যাপিয়া
আপনার অনুপম দিব্য শক্তি দিয়া
পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ বিশ্ব তোমার মাঝারে ॥
লঘিষ্ঠ হয়েও তুমি গরিষ্ঠ মহান্
সূক্ষ্মতম দেহ ধরে স্থূলের প্রধান
দশাঙ্গুল স্থানে আছ নরদেহ-মাঝে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একক নিদান !
অপ্রমেয় বেদবাক্য তোমারি বিধান।
এ হেন বিচিত্র কার্য্য তোমাতেই সাজে ॥

গৌহাটী ভ্রমণ ও দুইটী অজ্ঞাত শিলালিপি দর্শন

শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার

এবারে ১৯৬৭ সনে ২রা হইতে ৫ই জানুয়ারী আসামে গৌহাটীতে যে All-India Oriental Conference-এর দ্বাবিংশ অধিবেশন হয়েছিল তাতে যোগ দিয়েছিলাম। যাত্রাপথে উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ আসামে ট্রেনযাত্রীদের যে কি দুরবস্থা—তা বুঝলাম। পয়সা দিয়ে এই বিংশ শতাব্দীতে এদেশে যে এত কষ্ট করতে হয় তা পূর্ব্বে দেখি নি।

প্রথমে গমনাগমনের কথা একটু বলছি। কুলি মাল বয়ে থাকে এইটাই জানি, কিন্তু কাটিহারে যাত্রীকে তুলে ধরে জানালা দিয়ে গাড়ীর মধ্যে কুলি তুলে দিচ্ছে, ভেতর থেকে যাত্রীরা নূতন যাত্রীকে আক্রমণ করে বাইরে ঠেলে দিচ্ছে ও বুক বা পেটের উপর জানালার সার্শি বা কপাট নামিয়ে দিচ্ছে আর কুলিরা বাইরে থেকে তা প্রতিহত করছে ও কোনওরূপে যাত্রীকে প্রবেশ করাতে পারলে যাত্রীপিছু ২।১ টাকা উপায় করছে, তা দেখলাম ও শুনলাম। সৈন্য প্রভৃতির জন্য সিট্ রিজার্ভ বেশী, আর একটু দাঁড়াবার জায়গা থাকলেও ভেতরের যাত্রী নিজ স্বার্থে নূতন যাত্রীকে অসম্মান করে। এ সব কারণে আসার পথে উক্ত কন্‌ফারেন্সের গৌহাটীর কর্মীরা গাড়ীতে ২।১টী করে 'বগি' (সভ্যদের জন্য) রাখার সুব্যবস্থা করেছিলেন। এই অবস্থায় গৌহাটীতে এক মহিলা আমাদের নিকটে অবেদন করলেন—'নর্থ-বেঙ্গল ইউনিভার্সিটীতে আমার পরীক্ষা, আটদিন ধরে যেতে পারছি না, একটু স্থান দয়া করে দেবেন?' তাঁর আবেদনও পূর্ণ হয় নি।

এবারে দু'টি শিলালিপির কথা বলি। ৫ই জানুয়ারী গৌহাটী ষ্টেট্ মিউজিয়ম বন্ধ ছিল, তাই বাইরে থেকে প্রবেশপথেব চারিদিকে সাজানো মূর্ত্তিগুলি দেখছিলাম। সেগুলি পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হতে সংগৃহীত। দ্রষ্টার পিছনে একটী বাগান পড়ে। দ্রষ্টার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ২।১টী মূর্ত্তির পরেই এক মূর্ত্তি, তার উপরে আরবী বা ফার্সী অক্ষরে ৫।৭টী অক্ষর সামান্য মলিন অবস্থায় উৎকীর্ণ রয়েছে দেখলাম; খুব সম্ভবতঃ ভুল দেখিনি; মনে হ'ল ২টী স অক্ষর ও একটু পরে আ অক্ষর; আসাম, সাসারাম বা এই ধরণের কোন শব্দ হতে পারে; ওখানে ডাঃ মহেশ্বর নিওগ্‌কে এ কথা বলায় তিনি 'তা অজ্ঞাত ও অপরিচিত' বল্লেন। উক্ত শিলা আয়তনে প্রায় (১½ হাত)×।

এইদিনই ২।৩ মাইল দূরে কামাক্ষা বা কামাখ্যা মন্দির দেখলাম। মূল মন্দিরের প্রবেশ পথের উত্তর দিকের সোপান পথ-সংলগ্ন স্থানে (প্রায় অর্দ্ধসোপান বলা যায়) প্রায় হাত দুই উচ্চে একটী শিলালিপি অনাদৃত অবস্থায় (শৃগালাদির) ত্যক্ত আবর্জ্জনা-বেষ্টিত হয়ে আছে। এটী এঁকে নিয়েছি। এই চতুষ্কোণ পাথরের আয়তন প্রায় ১'-৬"×১'-৪"×১'-৫" ও আশে পাশে মন্দির-সুলভ পুরাতন ভাস্কর্য্যও আছে। প্রাজ্ঞদের দেখিয়ে জানলাম যে, এটী সম্ভবতঃ অ-ভারতীয় অক্ষরে লেখা। উৎকীর্ণ অক্ষরের যথাসম্ভব প্রতিরূপ দিলাম।*

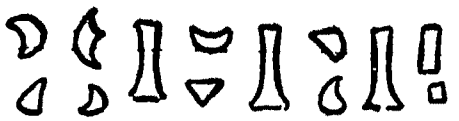

এটী কি কামাখ্যা শব্দ না অন্য কিছু?

নানা প্রকারের অদ্ভুত লিপি বা চিত্রলিপি বা সঙ্কেত-চিহ্ন সম্বন্ধে Ind. Ant. IV.-এ Mason's marks (মিস্ত্রির দেওয়া সঙ্কেত) প্রভৃতি ভারতের ও অন্য দেশের বিবরণ ও Ind. Ant. XXIV, p. 172-এ Lolo-written characters from Sz-Ch-Wan সম্বন্ধে দেওয়া বিবরণ হতেও আমার উদ্ধৃত লিপির রহস্য খুঁজে পাইনি। বোধ হয় কোন প্রকার তান্ত্রিক বা বহু পুরাতন লিপির প্রকারভেদ এটী। এর আশেপাশে ৩।৪টী অক্ষর বা লিপির কয়েকটা শিলালিপি ও প্রাচীন ভাস্কর্য্যযুক্ত স্তম্ভ বা ধ্বংসাবশেষও রয়েছে।

শেষে আর একটু বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। এই বাংলাদেশেই বহু অর্দ্ধজ্ঞাত ও অজ্ঞাত শিলা-লিপি বা ক্ষোদিত লিপি রয়েছে ও আবিষ্কৃতও হচ্ছে; আশুতোষ মিউজিয়াম, পঃ বঙ্গ সরকারের ও ভারত সরকারের কলিকাতাস্থ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগদ্বয় ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ও অন্যান্য জেলায় বহু ক্ষোদিত লিপি, মুদ্রার লিপি ও সীল মোহরের লিপি নানা কারণে অপঠিত রয়েছে; কেউ কেউ অবহেলিত হয়েও রয়েছে।

---

* এই প্রবন্ধের অধিকার আমার পূর্ণ থাকিবে।

প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর

শ্রীঃ অরবিন্দ সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

১৯০৬ সালের কথা।

তখনকার ফরাসী চন্দননগরে চিরবিপ্লবী কানাইলাল দত্তের উদ্যোগে একটি রবিবাসরীয় সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। চব্বিশ বৎসরের উদ্যতপ্রাণ যুবক শ্রীমতিলাল রায় (পরবর্ত্তীকালের সঙ্ঘগুরু) ছিলেন এই সভার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। স্কুল কলেজের বহু ছাত্র এই সংগঠনে যুক্ত ছিল। কানাইলাল দত্তের জ্ঞাতি-ভ্রাতা কিশোর অরুণচন্দ্র দত্ত (বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ-সভাপতি) এই সভার অন্যতম অগ্রণী ছাত্র ছিলেন।

এ বৎসরের স্মরণীয় ঘটনা "বন্দেমাতরম্" ও "যুগান্তর" পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। "সন্ধ্যা" ইতিমধ্যে নূতন ভাবধারা প্রচার করিয়া বাঙালীর প্রাণে আগুন জ্বালাইতে সুরু করিয়াছিল। সমগ্র ভারতবাসীর নিকট এই ভাবধারা পৌঁছাইতে হইলে ইংরেজি পত্রিকার আবশ্যক, সেইজন্য সুবোধ বসুমল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির অর্থে ১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে "বন্দেমাতরম্" প্রকাশিত হয়। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার "মটো" বা শিরোভূষণ ছিল "India for Indians"—ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ। বন্দেমাতরমের সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। অরবিন্দ ঘোষ কিছুকাল পরে সম্পাদক-মণ্ডলীতে যোগ দেন। শ্রীঅরবিন্দ ইহার পূর্ব্বেই প্রায় ১২ বৎসর বোম্বাইয়ে "ইন্দুপ্রকাশ" কাগজে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া কংগ্রেসের তখনকার কর্ম্মপদ্ধতির ব্যর্থতার দিকে স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 'বন্দে-মাতরমে' যোগদান করিয়া তিনি 'নিউ স্পিরিট' ও 'নিউ পাথ্' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া ভারত-বাসীর সম্মুখে নূতন আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি উপস্থিত করিলেন। সে সময়ে সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' কি সংবাদপত্র পরিচালনায়, কি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্লেষণে, বাঙালাদেশে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। 'যুগান্তর'-এর পরিচালক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম দেউস্কর, প্রজ্ঞানন্দ স্বামী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন যুগান্তরের লেখক। যুগান্তর ছিল তখনকার প্রগতিশীল তরুণদলের মুখপত্র। যুগান্তরের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। বাহু বলকেই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের একমাত্র উপায় বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। প্রায় সমসাময়িক কালেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভাণ্ডার' নামক মাসিক পত্রের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার নিগূঢ় অর্থ ও অভিসন্ধি কি, তাহা তাঁহার অনুপম সাহিত্যমণ্ডিত ভাষায় বাঙালীর নিকট পরিবেশন করিতে থাকেন।

এই স্বদেশী আবহাওয়ার মধ্যে যুবক মতিলালের যৌবনসংবেগ ক্রমশঃ সংগঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও মুক্তিসন্ধানী হইয়া উঠে। এই সকল পত্রিকা তিনি নিয়মিত পাঠ করিতেন ও তাঁহার সহচরবৃন্দকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

ইহা ব্যতীত বহু বৈপ্লবিক ইস্তাহারও তাঁহার নিকট আসিত। "তলোয়ার" নামক একখানা ইংরেজি কাগজও ছিল ইহার মধ্যে অন্যতম। তলোয়ারের সম্পাদক ছিলেন শ্যামজি কৃষ্ণ বর্ম্মণ। এই সকল ইস্তাহারে স্বাধীনতা সাধনার অনুকূলে যে সব মত ও পথের কথা পরিবেশিত হইত তাহা প্রায়শঃ পাশ্চাত্য ধরণ-ধারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। শ্রীমতিলালের চিন্তাধারার সঙ্গে এই সকল যুক্তিবাদ খাপ খাইত না। একটা মৌলিক ভারতীয় ভাব ও আদর্শের স্বপ্ন সেই যুগেই শ্রীমতিলালের তরুণ চিত্ত অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

যে সকল তরুণ ছাত্র শ্রীমতিলাল পরিচালিত সাহিত্য সভার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, তাহাদের মস্তিষ্ক যাহাতে পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত বৈপ্লবিক যুক্তিবাদে সংক্রামিত না হয়, তাহারই জন্য "দেবভূমি" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইল। পত্রিকাখানি ছিল পাক্ষিক ও হস্ত-লিখিত।

'দেবভূমি' পত্রিকার সূচনা সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল তাঁহার অনুপম গ্রন্থ 'জীবন সঙ্গিনী'তে উল্লেখ করিয়াছেন :

"এই কাগজখানির (দেবভূমির) চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এইজন্য গোপনে একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানা স্থাপন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। প্রেসের ব্যাপারে আমাদের কাহারও জানা ছিল না, কিন্তু কোন বিষয়েই আমাকে একজন পশ্চাৎপদ হইতে দিতেন না। সর্ব্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ না হইলেও, অভিজ্ঞতার্জ্জন হইতে বঞ্চিত হইতাম না। শিশু যেমন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে বার বার ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, আমার অবস্থাও বহুবার এইরূপই হইয়াছে। প্রেসের চিন্তাও আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। কিছু টাইপ খরিদ করিয়া একটি কাঠের যন্ত্রে "দেবভূমি" ছাপিতে চেষ্টা করিলাম। এক পৃষ্ঠা অতি ক্ষুদ্র "দেবভূমি" টাইপ সাজাইয়া ছাপিতে ১০।১২ দিন সময় কাটিয়া গেল। এই কর্ম্ম হইতে বিরত হইলাম।"

১৯১০-এর ১৩ই—৩১-এ মার্চ্চ শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর শ্রীমতিলালের আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস শেষ করিয়া পণ্ডিচেরী যাত্রা করেন। ইহার পর ১৯১১ ও ১৯১২ সালে শ্রীমতিলালের পরিচালনায় আর একখানা হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। পত্রিকাখানির নাম ছিল 'সনাতনী'।

এই সময়ে শ্রীমতিলালের কাঠের কারবারও ভাল-ভাবেই চলিতেছিল। নানা কর্ম্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে একখানা পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা মতিলালকে পাইয়া বসিল। অবশেষে ১৯১৫ সালের আষাঢ় মাসে এক রবি-বাসরীয় সাহিত্য সভায় একখানি পাক্ষিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সমস্যা দেখা দিল পত্রিকার নামকরণ লইয়া। 'খদ্যোত', 'সম্মার্জ্জনী', 'সনাতনী', 'দেবভূমি' প্রভৃতি অনেক নামেরই প্রস্তাব এবং নাম লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইল। এই নামকরণ লইয়া আলোচনা সারাদিন চলিল, কিন্তু ঐদিন আর মীমাংসা হইল না। পত্রিকার নামপ্রসঙ্গে শ্রীমতিলাল তাঁহার 'জীবন সঙ্গিনী' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন:

"পত্রিকা বাহির হইবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তাহার নাম কি হইবে, তাহা জানি না। তাহা ভগবান্ তখনও জানান নাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমার বুদ্ধি-যন্ত্র স্তব্ধ হইল। বন্ধুরা আলোচনার সুর রাখিয়া গেল। আমার বাহির ভিতর কিন্তু মৌন-নিথর হইয়া পড়িল।

"তার পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া ধ্যানে বসিলাম। রাত্রির শেষ অংশটি আমার নিকট অতি লোভনীয়।.....একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, নিস্তব্ধ সমাহিত চিত্তে অন্ধকারে বসিয়া আছি। অন্তর্জ্জগতের দুয়ার যেন উন্মুক্ত হইল। মুদিত চক্ষেই দেখিলাম—কয়েকটা অক্ষর। সেই অক্ষর কয়টা পর পর সাজান রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষর নহে, দেবনাগরী অক্ষরে, **'প্রবর্ত্তক'** এই শব্দটি আমি সুস্পষ্ট দেখিলাম। চমক ভাঙ্গিল। মনে হইল—আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু স্থির ঋজুভাবে বসিয়াছিলাম, একি স্বপ্ন, অন্তর্দ্দেবতার নির্দ্দেশ এইভাবেই আসিয়াছে—আমি সেইদিন সাময়িক পত্রিকাখানির নাম **"প্রবর্ত্তক"** হইবে জানাইয়া দিলাম, কথাটা সকলেরই ভাল লাগিল, নূতন মনে হইল।

"কথার সঙ্গে কাজ। স্বার্থের হিসাব করিয়া আজ পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারি নাই। এই হিসাব উহাই রহিল। 'রয়েল ৮ পেজী ১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ পাক্ষিক পত্র, বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাক মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য নগদ /০ আনা। অনুষ্ঠান পত্রটী বাহির করিয়া বলা হইল—ইহা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট বাহির হইবে। কিন্তু যথা সময়ে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না পাওয়ায়, উহা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বাহির হয়।"

প্রথম সংখ্যার অনুষ্ঠান পত্রে প্রবর্ত্তক পত্রিকার উদ্দেশ্য এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে:

"সাহিত্যই জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান। বাঙ্গালার নব জাগরণ কাল হইতে ইহার অদম্য উচ্ছৃঙ্খল মহাশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নেতার অধীনগত করিবার চেষ্টা সাহিত্যজগতে আজ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। দেশের অধিকাংশ মাসিক পত্র-পত্রিকা নিদারুণ সঙ্কটকালে মনোহারী দোকানের নয়নরঞ্জন দ্রব্যসম্ভারের মত চিত্তাকর্ষক গল্প-গুজবেই পরিপূর্ণ।... বাংলার এই সব অভাব দূর করিবার জন্য নূতন ভাবে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছি।

"ক্ষুদ্র প্রবর্ত্তক কি করিবে? নূতন ভাবের ভাবুক করিবে—নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে রাজা প্রজার সহানুভূতি থাকে না—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে—যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়—বিষের জ্বালা অনুভব করে—প্রবর্ত্তক সেই অমূল্য বস্তু গঠনে সহায়তা করিবে।

"সেটি কি? চরিত্র। এই চরিত্র অভাবেই আমরা এতটা নীচ হইয়া পড়িয়াছি।...এই চরিত্রের অভাব বশতঃই গুণীর আদর নাই—সর্ব্বত্যাগীর সম্মান নাই—উপযুক্ত লোকের কর্ম্মক্ষেত্র নাই। এই চরিত্র দেব-চরিত্র।... বাঙ্গালীর চরিত্র লাভ করিবে। এই চরিত্র সাধনার সামগ্রী। তাই হিন্দুর সর্ব্ব কর্ম্ম ধর্ম্ম-সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর চরিত্র পূর্ণাঙ্গ।...একেবারে পুরাতন বনিয়াদ তুলিয়া ফেলিতে হইবে—সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নূতন বনিয়াদ হইতে তাহার এই সুমহান চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই বাঙ্গালার বিচ্ছিন্ন মহাশক্তি কেন্দ্রগত হইয়া সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিবে।"

প্রবর্ত্তকের ২য় সংখ্যায় 'সনাতন সংরক্ষণ নীতি' শীর্ষকে শ্রীমতিলাল প্রথম সংখ্যার অনুষ্ঠান-পত্রের ভাবাদর্শ আরও বিস্তার করিয়া ধরিয়াছেন:

"ভারতবর্ষ সনাতন ধর্ম্মের লীলাভূমি। এইখানে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগোপযোগী ধর্ম্ম-বিপ্লবের দ্বারা এই সনাতন জাতির আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।...কিন্তু যে মূল নীতি এই আর্য্যসভ্যতাকে এতদিন ধরিয়া আসিতেছে, তাহাই ইতিহাসের প্রাণ। ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।.....ইতিহাস বলে যে মুসলমান রাজগণ অত্যাচারী ও ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারা এক হাতে কোরান ও এক হাতে তরবারি লইয়া সকলকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। প্রথমতঃ ইহা আমাদের অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। কেননা, ইহা যদি সত্য হইবে তাহা হইলে প্রথম অবস্থায় হিন্দু জাতি অতিশয় দুর্ব্বল ও মুসলমান জাতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেই সময় মুসলমান জাতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত। এবং অদ্য ভারতবর্ষ নিজের আদর্শ পরিভ্রষ্ট হইয়া একটি মুসলমানপ্রধান প্রদেশে পরিণত হইত। কিন্তু যখন তাহা হয় নাই, তখন মনে করিতে হইবে যে, হয় মুসলমান-রাজগণ সাধারণ বৈদেশিক রাজশক্তি যেরূপ হয় সেইরূপই ছিলেন, নতুবা হিন্দু জাতির সেই দুর্দ্দিনেও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি সুপ্তভাবে সমাজ-শরীরেই বর্ত্তমান ছিল।... ভারতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাণা প্রতাপ-সিংহকে আশ্রয় করিয়া সনাতন সংরক্ষণ নীতি কর্ম্মক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। রাণা প্রতাপ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণ করেন নাই। তিনি ভারতীয় আদর্শের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার যজ্ঞে নিজেকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার সাধনা ভারতের এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দু আদর্শকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে তখন আউরঙ্গজেব কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দু সমাজকে জর্জ্জরিত করিতে-ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে "পার্ব্বত্য মুষিক" শিবাজী হিন্দু জাতি-ধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাক্ষিণাত্যে মোগল শক্তি বিধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিল। শিবাজী রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের একত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।...এইভাবেই ভারতে ধর্ম্মক্ষেত্রে সনাতন সংরক্ষণ নীতি বিকাশ হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যুগোপযোগী ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যথাসময়ে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

১ম বর্ষ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ প্রবর্ত্তক পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হইত। শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক মহাশয়ের নাম ছিল সম্পাদক হিসাবে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে নেপথ্য হইতে শ্রীমতিলালের একক লেখনীপ্রসূত নূতন চিন্তা, নূতন ভাব ও নব নব প্রেরণায় ক্ষুদ্র প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠা পূর্ণ থাকিত। এই সময়ে কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন রামেশ্বর দে মহাশয়। পত্রিকা বোড়াইচণ্ডীতলা, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইত। বার্ষিক দক্ষিণা ছিল ২৲ টাকা মাত্র।

প্রবর্ত্তক ১ম বর্ষের ২য়, ১৭ ও ২২।২৩ সংখ্যা; ২য় বর্ষের ১৯শ সংখ্যা; ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে ১ম, ২য়, ১৫শ সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছিল।

প্রথম হইতে ষষ্ঠ, এই ৬ বৎসর প্রবর্ত্তকে বেদান্ত যোগ, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও চরিত্রগঠন প্রভৃতির উপর যে-সব লেখা প্রকাশিত হয় তাহা বাঙালীর ভাব ও ভাবনার নূতন দিগন্ত খুলিয়া দেয়। এই সময়ে রাউলাট বিল সম্পর্কে তীব্র আলোচনা, বাংলার রাজবন্দীদিগের মুক্তিপ্রসঙ্গ প্রভৃতি লইয়া "প্রবর্ত্তক" বিস্তারিত আলোচনা সুরু করিয়াছিল। প্রবর্ত্তকের বাণী যেমন দেশনেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনিই রাজকর্ত্তৃপক্ষদিগকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

রাউলাট আইন পাশ হইবার ফলে জনসাধারণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। যে গণ-বিক্ষোভের আগুন এতদিন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল তাহাই এবার লক্ষ শিখা বিস্তার করিয়া সারা ভারতে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভারতের জনগণ এবার নূতন শক্তিতে এক নূতন সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল।

প্রবর্ত্তকে শ্রীমতিলালের তীক্ষ্ণধার লেখনীপ্রসূত রচনাসম্ভার সে-সময়ে কিরূপ আলোড়ন আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কলিকাতা টাউন হলে রাউলাট বিলের প্রতিবাদে মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জ্জি রাউলাট বিলের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে তৎকালীন একখানা পাক্ষিক "প্রবর্ত্তক" বাহির করিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করেন—"এই কাগজখানির নাম "প্রবর্ত্তক"। বাংলায় এমন কাগজ আর একখানিও নাই। আমি পত্রিকাখানির বহুল প্রভাব কামনা করি।" তারপর প্রবর্ত্তকের ১৩২৫ সালের ১৫ই পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "আমাদের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধটি তিনি আগাগোড়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রবন্ধটি শ্রবণ করেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে বক্তা বলেন, "আমার বিশ্বাস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ লেখা আর কাহারও কলম দিয়া বাহির হয় নাই। এ লেখা শ্রীঅরবিন্দের।"

সংবাদ পত্রে ইহার পরদিন সভার বিবরণ এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল: "on the mention of Aurobinda's name there was loud and prolonged cheers which lasted for minutes together।".....সমস্ত লোক মুগ্ধ কর্ণে শুনিতেছিল প্রবর্ত্তকের বাণী।" ইত্যাদি।

পাক্ষিক "প্রবর্ত্তক"-এর ছয় বৎসরকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ ঘটে। এই সময়েই মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত বৃটিশ পার্লামেণ্টের যে আলোচনা চলে, তাহাতেও প্রবর্ত্তকের অভিমত স্থান পাইয়াছিল। টাউন হলের সভার পর দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ "প্রবর্ত্তক"-এর ফাইল শ্রীমতিলালের নিকট হইতে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি এবং নূতন শাসনসংস্কারবিধি প্রবর্ত্তনে প্রবর্ত্তকের এই নীরব সেবার বিষয় অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

১৯১৭ সালে ২০শে আগষ্টে ভারতসচিব মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক অধিকার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে আগষ্টে যুদ্ধজয়ী ইংরেজের নিকট হইতে ভারতের নেতৃবর্গ নূতন শাসনসংস্কার লাভের জন্য সচেষ্ট হন। অন্যদিকে তখন রাউলাট বিল লইয়া মহাত্মাজীর আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দিল্লী প্রবেশ গভর্ণমেণ্টের আইনে নিষিদ্ধ হয়। তিনি জাতির নিকট অগ্নিময় ভাষায় জাগরণের আহ্বান দেন (১৩২৫, ২য় বর্ষ)। এই সময়ে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের (১৯১৯) নৃশংস হত্যাকাণ্ড জাতির প্রাণে নিদারুণ আঘাত হানে।

বাংলার নরমপন্থী নেতারা মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার যথেষ্ট বলিয়া হাত বাড়াইতেছিলেন। অন্যদিকে চরমপন্থীদের উষ্মা ইহাতে বৃদ্ধিই পাইতেছিল। ইহা লইয়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মন কষাকষি ও দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। এই রাজনৈতিক সংঘর্ষাবর্ত্তের মধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তি প্রসঙ্গ

এক রকম চাপাই পড়িয়া গিয়াছিল। অপরদিকে মহাত্মাজীর অহিংস যুগোদয়ের সঙ্গে বিপ্লবের অগ্নিশিখা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের চিত্তে অগ্নিবিপ্লব ও বিপ্লবীদের স্মৃতি ম্লান হইয়া আসিতেছিল। রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলন জাগাইয়া রাখিয়া সেই সময়ে ক্ষুদ্র পাক্ষিক প্রবর্ত্তক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই রাজবন্দীর মুক্তি আন্দোলনে প্রবর্ত্তক অগ্রণী ছিল এবং পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল এজন্য অত্যন্ত সক্রীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সমসাময়িক কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে।

রাজবন্দী-মুক্তি সম্পর্কে প্রবর্ত্তকের অসীম সাহসিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজবন্দী শচীন্দ্র (সর্দার) আত্মহত্যা করেন এবং এ সম্পর্কে একখানি পত্র তিনি তাঁর পিতাকে লিখিয়া যান। পত্রখানি অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ এবং অনাবিল দেশাত্মবোধের সমুজ্জ্বল স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। প্রবর্ত্তকে (২য় বর্ষ, ১৩২৩।২৪) পত্রখানি 'একজন মুক্তিপ্রাপ্ত নজরবন্দীর আত্মহত্যা' শীর্ষকে প্রকাশিত হয়। 'প্রবর্ত্তক'-এর কৈফিয়ৎসহ নিম্নে পত্রখানির প্রায় সমগ্রই এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

"শচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত নামক একটি কলেজের ছাত্র পুলিসের সন্দেহভাজন হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে নজরবন্দী করে। তাহার পিতা রংপুরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত তাহার তত্ত্বাবধানের ভার লইতে রাজী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে তাহার পিতার গৃহেই নজরবন্দী করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দেয়। তাহার পর সে "মুক্তি"লাভও করে। কিন্তু ইহা নামমাত্র মুক্তি। সে গবর্ণমেণ্টের নিকট রংপুরের কলেজে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি চায়। অনুমতি পায় নাই। পুলিস তাহার কোন সমবয়স্ক সঙ্গীর সহিত খেলা করিতে নিষেধ করে, কথা কহিতে নিষেধ করে, সাধারণ পাঠাগারে গিয়া পড়িতে নিষেধ করে। এইরূপ মুক্তি তাহার পক্ষে অসহ্য হওয়ায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইবে না। অধিকন্তু তাহার পিতার বাড়ী পুনঃ পুনঃ খানাতল্লাসী হইবার আশঙ্কা থাকিবে এবং যাহাদের সঙ্গে সে মিশিবে তাহারাও সন্দেহভাজন এবং দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছিল। সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে, একজন পুলিস কর্ম্মচারীকে এবং পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া রাখিয়া যান। পুলিশ কর্ম্মচারীকে ইংরেজিতে লিখিত পত্রে আছে "আমি যে দেশে যাইতেছি, সেখানে তুমি কিম্বা কোন পুলিসের লোক আমাকে জ্বালাতন করিতে পারিবে না।"

"শচীন তাহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়া গিয়াছে আমরা তাহা পাইয়াছি। তাহার কোন কোন অংশ আমরা মুদ্রিত করিতেছি :

"শ্রীচরণেষু,

"বাবা, আমি যে আত্মহত্যা করিতেছি, তাহাতে আপনি যে কতদূর শোকে অভিভূত হইবেন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি যে কেন আত্মহত্যা করিতেছি তাহা জানিলে আপনি হয়ত আপনার শোকের কিছুটা উপশম হইতে পারে।

"আমি যে আজ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছি তাহাতে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট। এইরূপভাবে জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কাহারও সঙ্গে বেড়াইলে সেটি পুলিসের তদন্তের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। আমি সংশয়ে (সংসারে?) কাহারও কোন উপকার করিতে গেলে পুলিস ভাবিবে যে পরের উপকার করিতেছে দেশের লোকের sympathy পাইবার জন্য। পুলিস অথবা Govt. চায় যে আমি পশুপক্ষীর মত নিজের উদর পূর্ণ করিয়া আমার জীবনটি কাটাইয়া দেই। কিন্তু আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সংসারে যখন আসিয়াছি তখন শুধু নিজের জন্য আসি নাই। মানবের হিতার্থেই আসিয়াছি। আমার কোনদিন অনেক টাকাকড়ি উপার্জ্জন করিবার বা সম্মান অর্জ্জন করিবার আশা ছিল না। আমার চিরকালই ইচ্ছা ছিল যে আত্মার উন্নতি এবং পরের উপকার সাধন করিয়া জীবন অবসান করিব। কিন্তু এ জীবনে আর তাহা হইবার নহে। এ জীবনে প্রত্যেক কাজে আমাকে Govt.-এর বাধা

পাইতে হইবে। আপনারা আশা করিতেছেন যে Montagu সাহেব আসিয়া সব ঠিক করিয়া দিবেন, কিন্তু সে আশা বৃথা।.....

"আপনি বেশ জানেন যে সংসারে শুধু বাঁচিয়া থাকা উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ফুল যে ফুটে তাহার চরম সার্থকতা সেইখানে যেখানে সে আপনার গন্ধে দশ-দিক আমোদিত করে অথবা ভগবানে আত্মদান করে। আমাদেরও সেইরূপ। আমার মত এই বয়সে অনেক উচ্চ কথা মনে আসে। আর পরে তাহা সংসারের চাপে নষ্ট হইয়া যায়। তখন সমস্ত মনটুকু আপনার সংসারের চিন্তায় থাকে। অন্য কথা ভাবিবার অবসর হয় না। এমন কি আপন সংসারের উন্নতির জন্য অকাতরে অপরের অনিষ্টের জন্য প্রস্তুত হয়। আপনি কি আমাকে সেইরূপ জীবন যাপন করিতে বলেন? এইরূপ বাঁচিয়া থাকাই কি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে? আমার এই বয়সে ভাল মন্দ হইবার দুই পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে। যদি এইরূপ অলসভাবে আমাকে সমস্ত সৎসংসর্গ ছাড়িয়া কিছুদিন আরও কাটাইতে হয় তাহা হইলে আমি পশুত্বের স্তরে উপনীত হইব। আমি মনে করি যে আমি পবিত্র জীবন যাপন করিয়া আর এক জন্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, ইহা আপনার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আপনি সকলের সামনে মুখ উঁচু করিয়া বলিতে পারিবেন যে, আমার পুত্র অসৎ পথ ত্যাগ করিবার জন্যই মৃত্যুর পথে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছে। যদি আমি কোনরূপ পাপ করিবার অথবা কলঙ্কযুক্ত হইবার দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে পারিতাম তাহা হইলে বোধহয় আপনার পক্ষে দুঃখের বিষয় ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি জীবন ত্যাগ করিতেছি, এই উদ্দেশ্য লইয়া যে, আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারিব, হৃদয় লইয়া পরিমিত দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিব। ইহা হইতে আর উচ্চ আশা হয় না। আশা করি, আপনিও যেন ভগবানের নিকট আমার এইরূপ ভবিষ্যৎ জীবনের কামনা করেন। আপনার হয়ত আশা ছিল যে, আমরা কয় ভাই উপার্জ্জন করিলে সংসারের দুঃখ কষ্টের অবসান হইত। কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও ভাবিয়া দেখিবেন যে, এই ভারতবর্ষে ১০ কোটি লোক এক বেলার বেশী খাইতে পায় না। শীত ও বর্ষায় তাহারা বনের পশুর মতই কষ্ট ভোগ করে। আর কোনও দেশে এত সুজলা সুফলা হইয়া তাহার অধিবাসীদিগকে এত কষ্ট দেয় না। কিন্তু আমাদের কোন হাত নাই। আমরা তবুও অনেক পরিবার হইতে অনেক সুখে আছি। এইরূপ ভাবে যদি দিন কাটাইতে পারেন তাহা হইলে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

তাহার পর আমরা আট ভাই। সেই আটজনের মধ্য হইতে আজ আমি এক জন যাইতেছি যাহা দ্বারা সংসারের খুব বেশী কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আর সাতজন বাঁচিয়া থাকিলে আমার জন্য কোন কষ্ট থাকিবে না। এমন সংসার খুব কমই আছে, যে সংসারে সুখের ছায়া (দুঃখের?) স্পর্শ করে নাই। শান্তিবাবুর দাদার কথা মনে করুন। তাহা দ্বারা সংসারের কত উপকার হইত। কিন্তু অকালে তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল, আর আমার দ্বারা এখন কাহারও কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমি যদি এখন কোন ছেলের অসুখের জন্য ২।৩ রাত কাটাই, তাহা হইলেও আমাকে তারই জন্য শাস্তির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি কোন ভাল কাজ করি তাহা হইলেই C. I. D. আমাকে কুচক্ষে দেখিবে। এইরূপ ভাবে আমি আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সময় নষ্ট করিতে পারি না। তাই আমি জীবন বিসর্জ্জন দিয়া আবার নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জীবনের মহৎ আশাগুলি পূর্ণ করিব। এই সকল কারণে আপনি মোটেই শোক করিবেন না—জানিবেন যে আমার মৃত্যুকালের শেষ প্রার্থনা যে আপনি আমার জন্য বৃথা শোক করিয়া শরীর ক্ষয় করিবেন না। আপনার মুখের দিকে চাহিয়া এত বড় সংসাব বাঁচিয়া আছে। আপনার আশায় এই সংসারের ছোট ছোট শিশুরা দিন দিন বাড়িয়া উঠিয়াছে।

"আমি আজ বড়ই গৌরবান্বিত। আমি আজ আনন্দের সহিত মরিতে পারিতেছি যে এমন পিতা

আমার যাহার আদর্শে, যাহার শিক্ষায় আজ আমি অসৎ জীবন যাপন করিব না বলিয়া প্রাণ দিতেছি।

তারপর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, কোন Political ব্যাপারে মিশিব না। যে দিন আসিয়াছে, Politics ছাড়া কেহ উঠিতে পারিবে না। তবে যাহারা স্বার্থময় পশু জীবন যাপন করিতে চাহে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি আজ মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম। ··· ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখুন, ইটালি, Belzium, France, Russia এবং আজকাল Ireland-এর কথা মনে মনে চিন্তা করুন। Govt. আমাকে যে পড়িতে দেয় নাই, তাহাতে Govt. কোন আইন অনুসারে (কাজ) করে নাই। ····· তাহার পর আপনারা আমার অবস্থা লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন ও ভাবিতেন। আর কাহারও অবস্থা প্রাণের সহিত ভাবিতেন না। আজ আমার এই মৃত্যু আপনাদের দুঃখ বিশ্বজনীন করিয়া তুলিবে। আপনার প্রাণ আমার সমাবস্থাপন্ন সকলের জন্য কাঁদিয়া উঠিবে। ভগবান আপনাদের মন সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে বৃহৎ গণ্ডীতে লইয়া হইবে।

আমি দাদাকে, ইন্দুকে ও বৌদিদিকে আমার চিঠি সম্বন্ধে লিখিয়া যাইতেছি। আপনি সংসারের মধ্যে স্থির ধীর ও বুদ্ধিমান, আপনি তাহাদিগকে বুঝাইবেন। আপনি আমাকে কতদূর ভালবাসিতেন তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। আমি যে আপনার মত না লইয়া এ পথে যাত্রা করিতেছি সেজন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমার এ মৃত্যুতে দেশের মধ্যে একটি প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইবে। আমার এ মৃত্যুতে Govt.-এর আর এরূপ বেআইনী কাজ করিতে বেগ পাইতে হইবে। যদি আমার মৃত্যুতে আমার অবস্থাপ্রাপ্ত আর কাহারও কোন উপকার হয় তাহা হইলে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। আপনারা হয়ত বলিবেন যে আমি আত্মহত্যা করিয়া নির্ব্বোধের কাজ করিতেছি। কিন্তু আমি যে সকল কথা লিখিলাম সেই সকল কথা চিন্তা করিয়া দেখিবেন, সত্যই আমি নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছি কিনা। আমার মৃত্যুতে আপনাদের গর্ব্ব উচ্চ বই খর্ব্ব হইবে না। আমি আপনাদের কাছে এই মিনতি করিতেছি, আপনি যেন শেষে অত্যধিক কাতর না হন। আমার মৃত্যুকালীন শেষ প্রার্থনা আপনি রাখিবেন বলিয়া আমার ধারণা। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন এবং বড়মাকেও দিবেন। বড়মা যেন শোকে কাতর না হন। আপনি সকল কথা বুঝাইয়া বলিবেন। আমার সকল কথা বলা হইয়াছে। আপনার পদে আমার শতকোটী প্রণাম। নিবেদনমিতি।

সেবক 'সদা'। (ক্রমশঃ)

প্রভাতী

(ভৈরব—চৌতাল)

[প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে প্রভাত ফেরীর নগরসঙ্গীত। ১৩৩৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে গৃহীত। রচয়িতার নাম অনুল্লিখিত। সম্ভবতঃ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রচিত]

প্রাণারাম জ্যোতিঃ জাগে
জাগে নব নব রাগে।

নাম-রস সুধাপানে
ভাসে চিত আনন্দমগন।
যুগপ্রভাতী গাহি ঘরে ঘরে
শুনাই মোরা গান যত পুরজনে।
মহারাসে মিলি প্রাণে প্রাণে প্রাণে
জাগ জাগ রে নরনারায়ণ॥

ভক্তজন নিরবধি গাহে জয় জয় রব মহিমা
অন্ত নাহি নাহি পায় রে।
মাগে করুণা শ্রীপদে তব
দাও হে আস্বাদ নব নব নব
আনন্দঘন অমৃতনিলয় হে।
তুমি সকল দারিদ্র্যহরণ॥

পঞ্চাশ বছর আগে

পঞ্চাশ বছর আগের পুরোণো প্রবর্ত্তক হইতে সঙ্কলিত সংবাদ

অভ্যুদয় :

এলাহাবাদের হিন্দী সাপ্তাহিক "অভ্যুদয়" পত্রের সত্বাধিকারী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহুত হইয়া একটি আপত্তিজনক প্রবন্ধাংশের জন্য মুদ্রাযন্ত্র আইন অনুসারে জামিন দাখিল কবিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধাংশটী দক্ষিণ আফ্রিকার "Indian Opinion" নামক পত্রে 'Gold Coast Colony'র কোন পত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। "অভ্যুদয়ে" তাহার অনুবাদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী আমরা পড়ি নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা ভাল নহে। কিন্তু সকলেরই এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পণ্ডিত মালব্য মহাশয়ও যখন, কোন্‌টী আপত্তিজনক, কোন্‌টী আপত্তিজনক নহে তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ তখন অন্য সম্পাদকগণের ত কা কথা। এক্ষণে শুনিতেছি মালব্য মহাশয় টাকা জমা দেওয়া অপেক্ষা ছাপাখানা বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্টকে উহা জানাইয়াছেন।

পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ :

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লাহোরের নিম্নলিখিত দশখানি দৈনিকের প্রচার বন্ধ হইয়াছে। যথা—"অমৃত", "আজাদী", "হিন্দু", "ঝং শিখাল্", "শমসীর", "আমবীর", "পঞ্জাব", "দর্পণ", "খালসা", "সাহিদ"। উপরন্তু 'দীপক' সাময়িকভাবে এখন বন্ধ রাখা হইয়াছে। আবাব "নির্বলসেবক" সম্প্রতি উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই শেষোক্ত পত্রিকাখানির নিকট হইতে প্রেস এ্যাক্ট অনুসারে ১০০০৲ জামীন চাওয়া হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র আইনের বিভীষিকায় এতগুলি ভারতীয় দৈনিককে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে দেখিলে, বাস্তবিকই আমাদের কষ্ট হয়। তাহার উপর পাঞ্জাবের একমাত্র উর্দ্দু শিখ পত্রিকা 'শের-ই-পাঞ্জাব' অর্থাভাবে প্রচার বন্ধ করিয়াছে। এদেশে যাঁহারা লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা প্রায় ১২ জন মাত্র। এ হেন দেশে শিক্ষা-প্রচারের একটী প্রধান ও অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ এই পত্রিকাগুলি। বিশেষতঃ অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় আমাদেব দেশে দৈনিকের একান্ত অভাব। এইরূপ অবস্থায়, সাহিত্য জগৎ হইতে এতগুলা দৈনিককে বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে—দেশের দুর্ভাগ্য নহে কি?

ভারতে গোলাগুলী সরবরাহ :

মিঃ ভিক্টর বেলির তত্ত্বাবধানে কলিকাতার পাটকলসমূহে গোলাগুলী নির্ম্মাণের জন্য যে আয়োজন হইতেছিল তাহা প্রায়ই শেষ হইযাছে। শুনা যাইতেছে বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের শিল্পশাখাও এই শস্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। বাঙ্গালী ছাত্র আজ শুধু পরীক্ষায় পাশ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে না, আবশ্যক বুঝিলে দেশের জন্য, গভর্ণমেণ্টের জন্য যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেও কুণ্ঠিত নহে। বঙ্গীয় হাসপাতাল বাহিনী, বিলাতে ভারতীয় ছাত্রগণের ও বঙ্গীয় শিল্পশাখার ছাত্রগণের এই প্রচেষ্টা-সমূহ তাহারই সাক্ষ্য দিবে। তাঁহাদের সাধু চেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

বঙ্গীয় হাসপাতাল বাহিনী :

উক্ত বাহিনী এক্ষণে Tigris নদীর তীরে বসারো হইতে ১৫০ মাইল দূরে অমরা নামক স্থানে কার্য্য করিতেছেন। সেখান হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যুবকগণকে এখন খুব কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভারই বহন করিতে হইতেছে। ভগবান তাহাদের দেহমনের স্বাস্থ্য ও উৎসাহ অব্যাহত রাখুন। তাঁহারা যেন বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয়।

পাঞ্জাবে ফাঁসী :

অমৃতসরে সেতুরক্ষার্থে যেসব সৈনিক পাহাবা ছিল, তাহাদের হত্যা করার অপরাধে যে পাঁচজন শিখ ধৃত হইয়াছিলেন, লাহোরের বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক তাঁহাদের উপর ফাঁসীর হুকুম হয়। এই পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের উপর ইতঃপূর্ব্বেই সর্দ্দার আচর সিংকে হত্যা করার অপরাধে এবং আর একজনের উপর হুসিয়ারপুরের জেলদারকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসীর হুকুম হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলেই পাঞ্জাবের ছোট লাট ও বড় লাটের এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে। গত শুক্রবার ৬ই আগষ্ট তারিখে, আত্ম সিং, হারনাম সিং, কালা সিং এবং চানাম সিংএর লাহোর জেলে ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। বাঁটা সিং আর একবার ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আপীল করিয়াছিলেন; এবারও তাঁহার আপীল অগ্রাহ্য হইল। পঞ্জাবে এই পর্য্যন্ত রাজনৈতিক অপরাধে প্রায় ২০ জনের ফাঁসী হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

সঙ্ঘকন্যা কুমারী রেণুকণা ঘোষ

আজ থেকে ৪২ বৎসর আগে, ১৩৩০ সালে, অক্ষয়-তৃতীয়ার পুণ্যদিনে, চন্দননগরের গোস্বামীঘাটস্থিত প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ শ্রীমন্দিরে, ত্রিস্তর প্রস্তর বেদীর উপর মন্দির বিগ্রহরূপে সুবর্ণ-প্রণবসংযুক্ত রজত ঘট প্রতিষ্ঠা করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সঙ্ঘগুরুদেব। প্রতি বর্ষে এই বিগ্রহেরই বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। উৎসব উপলক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসবানুষ্ঠান, ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনী ও স্বদেশী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

চৌদ্দ বৎসর পর ১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসে—মন্দির বিগ্রহস্বরূপ রজত ঘট মন্দিরাভ্যন্তর থেকেই অপহৃত হয়। তার ৬ বৎসর পর 'ত্রিবৃৎ লিঙ্গ বা ব্রহ্মেশ্বর' বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়; আজও এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী।

এবার প্রদর্শনী বিভাগে "নবজাতির দীক্ষা" শীর্ষক একটি বিষয় অবলম্বনে জাতিগঠনের মূলতত্ত্ব, প্রকৃত উপাদান ও যথার্থ কলাকৌশলের বিবরণ মূর্ত্তি ও লিপি সহযোগে দেখান হইয়াছে।

উৎসবের দুটি অঙ্গ—একটি বহিরঙ্গ অপরটি অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ হিসাবে—চৈতালী পূর্ণিমা হতেই উৎসব-সূচনা। ঐ দিন প্রাতঃ ৫ টায় সমবেত উপাসনা ও পূর্ণিমা-সম্মেলন, তারপর উৎসব-পতাকা, পূজান্তে শ্রীমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় স্থাপন করা হয়। পরদিন কৃষ্ণ প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত ১৩ দিন ধরে সান্ধ্যোপাসনার পর সঙ্ঘাচার্য্য শ্রীসূর্য্যনারায়ণ তর্কতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। চতুর্দ্দশী থেকে শুক্লা-দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রভাতে "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" মন্ত্রের পুরশ্চরণ ও সন্ধ্যায় অপরাজিতা স্তোত্র পাঠ হয়।

অতঃপর শুভ অক্ষয় তৃতীয়া দিবস। এই দিনের পুণ্য প্রভাতে সঙ্ঘের সর্ব্বশ্রেণীর সভ্য-সভ্যা, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্ম্মী সমেত প্রায় দুই শতাধিক নরনারীর নগরকীর্ত্তন, সমবেত উপাসনা এবং শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুদেবের সময়োপযোগী একটি বাণী পাঠের পর শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণান্তে সাংস্কৃতিক পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর বৈদিক মন্ত্রে শ্রীবিগ্রহের মহাস্নান, ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমান্তে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অতঃপর বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান। এবার অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রাজ্ঞন বিচারপতি মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা ৭ টায় উদ্বোধন সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রবর্ত্তক নারী মন্দিরের বালিকাগণ কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের

উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী সঙ্ঘ প্রশস্তি উদ্গান করেন। সভাপতি মহোদয়কে মাল্যভূষিত করার পর, সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মেলা ও প্রদর্শনীর পরিচয় প্রদান করেন। সভার পুরোহিত শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর স্বভাব-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় বলেন—"ভারতকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আত্মবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে।" বহিঃশত্রুর আক্রমণের কথা

উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"এই আক্রমণেরও বুঝিবা প্রয়োজন ছিল এবং ইহারই ফলে লুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটিবে।"

সভান্তে তিনি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। দ্বিতীয় দিন হ'তে দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত যথানিয়মে সভাধিবেশন চলে।

দ্বিতীয় দিনের সভাধিপতি ছিলেন হুগলী জেলার সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীনীতীশচন্দ্র বাগচী মহাশয়। বক্তৃতা করেন সমাজ শিক্ষা বিষয়ে। তৃতীয় দিনের সভা-নেত্রীত্ব করেন প্রাক্তন লোকসভা সদস্যা শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী। তিনি তাঁর ভাষণে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নারী জাতির মহান্ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করেন। এইদিন প্রধান অতিথি হিসাবে আসেন হুগলী জেলার সমাজসেবিকা শ্রীমতী পারুল ভট্টাচার্য্য মহোদয়া। তিনিও সমাজের শিক্ষা ও সেবা সম্বন্ধে সুন্দর ভাষণ দেন। প্রবর্ত্তক নারীমন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের তিন জন শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী, শ্রীমতী অপরাজিতা ও শ্রীমতী শ্রীলেখা প্রদর্শনীরই দৃশ্য ও লিপিপটে উত্থাপিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে, ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে ও শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে ঘরোয়া বৈঠকের ভাবে কথোপকথন-প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। পরিশেষে কয়েকজন ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী মিলিত কণ্ঠে কয়েকটি স্বদেশী গান পরিবেশন করেন। সঙ্গীতে বাজনা ও সঙ্গৎ দিয়া সহযোগিতা করেন হুগলীর 'সুর-সাথী-সঙ্গীত-সমাজ'।

চতুর্থ দিনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ছায়াচিত্র সহযোগে "মহাবিশ্ব রহস্য" বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। পঞ্চমদিনে প্রবর্ত্তক সাহিত্য চক্রের পরিচালনায় 'রবীন্দ্র স্মরণ বাসর" অনুষ্ঠিত হয়। এই বাসরের সভাপতিত্ব করেন কবি ও সাহিত্যিক শ্রীভূপেন্দ্র-নাথ দাস এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ পাল। ষষ্ঠ দিবসে পুনরায় শ্রীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী "মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা" বিষয়ে ছায়াচিত্রযোগে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। সপ্তম দিনে ছিল হুগলীর "সুর-সাথী সঙ্গীত সমাজ" কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীসারদামণি বিষয়ে গীতি-আলেখ্য। অষ্টম দিনটি ছিল শিশুমঙ্গল দিবস—কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগবশতঃ ঐদিন কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয়নি। পরের দিন নির্দ্দিষ্ট উৎসব সূচী অন্তে এই দিনের সূচী পূরণ করা হয়। নবম দিনে বেতারের অন্যতম নাট্য-প্রযোজক শ্রীশ্রীধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "জনমানসে বেতার নাট্যের প্রভাব" বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর, ছাত্রছাত্রিগণ বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অনাবিল আনন্দ পরিবেশন করেন। দশম দিনে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি বিতর্কমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহসীন কলেজের দুটি ছাত্র—শ্রীমান্ সরিৎ ব্যানার্জ্জি ও শ্রীমান সাতকড়ি গাঙ্গুলী চমৎকার যুক্তি ও প্রাঞ্জল ভাষায় 'আণবিক অস্ত্রের প্রয়োজন ভারতের আত্মরক্ষার জন্য' বিষয়টির উপর বিতর্কে সপক্ষে ও বিপক্ষে অংশ গ্রহণ করেন। সমাহারে সুযোগ্য সভাপতি বলেন—"সকলের উপরে বড় কথা আমাদের বিপন্ন স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। এই বিতর্ক যদি সেই চেতনার উন্মেষ করে, তবেই সার্থকতা।"

৩১-এ বৈশাখ শুক্রবার উৎসবের প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতার স্মরণবাসর—'শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরু দিবস'। এই স্মরণসভায় পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস. কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং-র সত্ত্বাধিকারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সংস্কৃতিপ্রাণ শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য। সভাপতিকে মাল্যদান প্রসঙ্গে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণ-চন্দ্র দত্ত এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে সঙ্ঘগুরুর জীবন ও কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীহরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ও হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীমনুজ সর্ব্বাধিকারী হৃদয়গ্রাহী বাগ্মিতাময় ভাষণে সঙ্ঘগুরু ও তাঁর সৃষ্ট সঙ্ঘের প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য্য সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর সারগর্ভ এক ভাষণে বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামে পরাজিত বাঙালীর ছন্নছাড়া দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘগুরুর স্বাবলম্বন সাধনার চিত্রটি বিশদ করিয়া ধরেন। তিনি বলেন, সঙ্ঘগুরু

শ্রীমতিলালের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম জাতীয়তার আদর্শ ছাড়াও, আজকের দিনে তাঁর এই ধর্ম্মভিত্তিক অর্থনীতি সাধনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তটি বাঙালীর কাছে শুধু প্রেরণাপ্রদই নয়, অনুকরণীয়ও বটে।

১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার সমাপ্তি দিবস। এই দিন প্রাতঃ ৫ টায় সমবেত উপাসনান্তে সঙ্ঘবাসিগণ শ্রীমন্দির হইতে শোভাযাত্রা সহকারে বোড়াইচণ্ডী মন্দির, সঙ্ঘ মন্দির ও প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিক্রমা করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নীরে অবভৃথ স্নান সমাপন করেন। সন্ধ্যা ৭ টায় সুপণ্ডিত শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রী এম. এ., পি. আর. এস., পঞ্চতীর্থ সপ্তশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিকে মাল্যদান প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী আজকের পুরোহিতের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। সভাপতি দীর্ঘ শাস্ত্র-সম্মত ভাষণে হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রমই হিন্দু ধর্ম্মের মৌলিক ও সনাতন বৈশিষ্ট্য।

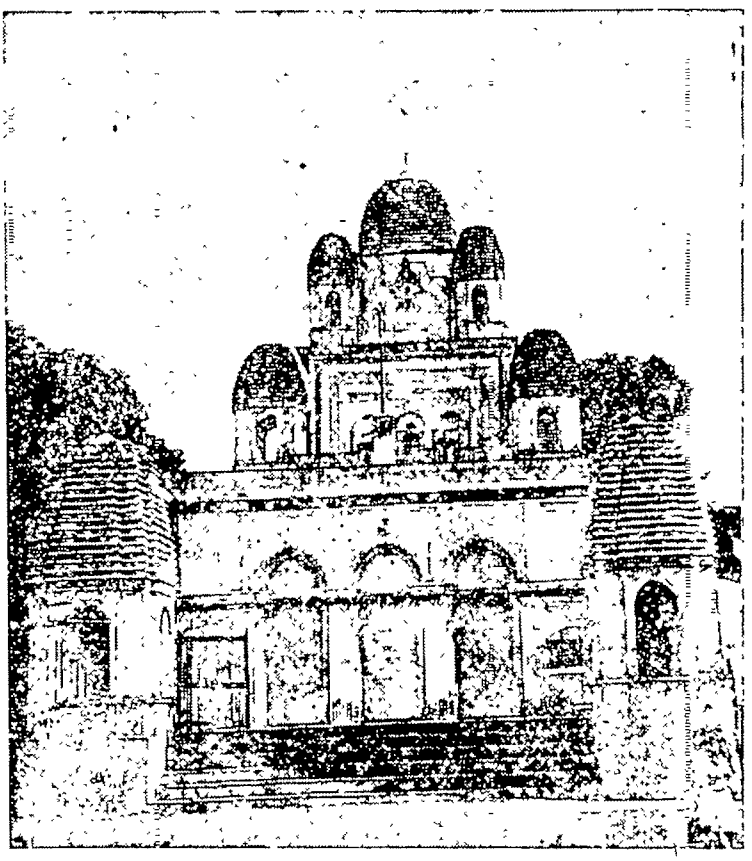

সঙ্ঘগুরুপ্রতিষ্ঠিত (১৯২৩ খৃঃ, ১৩৩০) যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির: এই জাতীয় মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অতঃপর সমাপ্তিসভা। সমাপ্তিসভায় পৌরোহিত্য করার কথা ছিল—হুগলীর জেলাশাসক শ্রী বি. এন. চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের। অনিবার্য্য কারণবশতঃ তিনি উপস্থিত হতে না পারায়, সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের পৌরোহিত্যে সমাপ্তি সভার অনুষ্ঠান হয়। উৎসব-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী এবারকার উৎসব বিবরণী পাঠ করেন এবং উৎসবের সহায়ককারী সকলকে ধন্যবাদ দেন।

সমবেত কণ্ঠে পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রোচ্চারণের পরে দ্বাদশ দিবসব্যাপী মহোৎসবের এবারের মত পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রাত্রি ১০টায় স্থানীয় "সুনীল-স্মৃতিসঙ্ঘ" কর্ত্তৃক দুইটি অভিনয় হয়। অভিনয় দুইটিই সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছিল। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

আমাদের বঙ্কুভাই

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

প্রতিবেশী, বাল্যবন্ধু, পরে গুরুভাই ছিল বঙ্কু আমার। গুরুভক্তি ছিল তার অনন্য।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বঙ্কু ছিল সার্ব্বজনীন বঙ্কুভাই।

সহজ সরল পল্লীর মানুষটি। হাওড়া-ভাস্কুড়ে ছিল তার নিবাস। নিঃসন্তান। নির্ঝঞ্ঝাট ভূমি-নির্ভর গৃহস্থ। পিতা স্বর্গত মতিলাল ঘোষ। বঙ্কুবিহারী ঘোষ—সংক্ষিপ্ত বঙ্কু নামেই ও-অঞ্চলে ছিল সুবিদিত।

●

বঙ্কু নাই!

রাত্রি পৌনে এগারটায় টেলিফোন-সংবাদ। অলক্ষ্যেই কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো চোখের কোণ বেয়ে।

গত ২২-এ এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ তিনটায় সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছে। হাওড়া সালকিয়ার মহাশ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে—সংবাদ জানলাম ফোনেই।

রাত্রে আর ঘুম হল না। কেবলই মনে হতে লাগলো কি যেন একটা প্রিয় বস্তু হারালাম।

পরদিন ভোরেই শ্মশানে উপস্থিত হলাম। সারি সারি ৩টি জ্বলন্ত চিতা। তার মধ্যে কোন্‌টি আমার বঙ্কুভায়ের, খুঁজতে বেশী সময় গেল না—পাশ থেকেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উঠল—"ওগো তোমার গুরুভাই এসেছে, কোথায় তুমি? একবার এস, একবার এসে কথা বলগো।"

চিনতে আর বাকী রইল না, এ আমার বঙ্কুভায়ের সদ্য বিধবা পত্নী। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শোকাবেগে সে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সান্ত্বনার ভাষা নেই। নির্ব্বাক সমবেদনায় সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকটা। তারপর গিয়ে দাঁড়ালাম প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর পাশে।

তখনও চিতাগ্নি জ্বলছে। তাকিয়ে আছি একদৃষ্টে। দৃষ্টি আছে শিখাতে, কিন্তু মন নেই। মন চলেছে অর্চ্চির আলোকে দেবযানের পথ ধরে বঙ্কুর আত্মার অনুসন্ধানে।

কোথায় চলেছে বঙ্কু? সন্ধানী দৃষ্টির আলো ফেলে যতদূর দেখা যায়, দেখছি—ঐ পূষা, ঐ একটি সূর্য্যের খর রশ্মিজাল বিদীর্ণ করে বঙ্কুর অবিনাশী আত্মা ধেয়ে চলেছে ইষ্টপদাভিসারে। গুরু চরণেই সে লীন হয়ে থাকবে। চিন্ময় গুরু পদেই তার অনন্ত গতি।

চিতাগ্নি নিভল। শোকাগ্নি দ্বিগুণতর হ'ল। বঙ্কুর নিঃসন্তানা বিধবা পত্নীর শোকোচ্ছ্বাস-ভরা কাতর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত হ'ল বঙ্কুর মৃত্যু-কালীন অবস্থা।

অসুস্থ সে ছিল কয়েক বছর ধরেই। কিন্তু তাই বলে কালই যে তার মৃত্যু হবে, এ ধারণা কারুরই হয়নি। বরং অন্যদিন অপেক্ষা সে ভালই ছিল। দুপুরে মাথা ধুয়ে, খেয়ে যথানিয়মে তার শয্যার উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে বসেছিল। সামনেই থাকত শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-গুরুদেবের ও শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর দুখানি ফটোচিত্র। বিছানায় বসে সে ঐ ফটো দু'খানির পানে চেয়ে থাকত। এটা ছিল তার নিত্যকালের অভ্যাস। বরাবরের মতই ঐ চিত্রের দিকেই সে সেদিনও চেয়েছিল। বৌমা (বঙ্কুর স্ত্রী) যথানিয়মে কাজকর্ম্ম খাওয়া-দাওয়া সেরে পুকুরঘাটে গেছেন বঙ্কুর মত নিয়েই—ফিরে এসে দেখেন বঙ্কুর চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে চেয়ে আছে একদৃষ্টে ফটো চিত্রের পানে। বৌমা প্রথম দু' চার বার ডাকেন, সাড়া পাননা—তারপরে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে দেখেন শক্ত মতন। ভয় পেয়ে তিনি চীৎকার করে ওঠেন। প্রতিবেশীরা চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখেন, চেয়ে আছে বটে, কিন্তু পলক পড়ে না। চক্ষু-তারকা স্থির। প্রাণবায়ু অক্ষিগোলক ভেদ করেই ইষ্টপদে লীন হয়েছে।

বেলা প্রায় ৮ টার সময় শেষকৃত্য সমাপ্ত হল। ক্ষীণ-কণ্ঠে কয়েকটি সান্ত্বনার বাণী বৌমাকে শুনালাম। তারপর শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে বাসায় ফিরলাম প্রায় ৯ টায়।

●

সারাদিন বিষণ্ণ মনে বঙ্কুর ভাবনাই ঘোরাফিরা করতে লাগলো। স্মৃতির পাতায় ভিড় করে আসে কত কথা, কত ঘটনা!

সেই ১৯১৯ সালের কথা।

নির্ম্মলদার (ভবিষ্যতে স্বামী চিদানন্দজী) প্রথম আগমন দফরপুরে। থাকতেন আমাদেরই বাড়ী। শীগ্‌গীরই নির্ম্মলদার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ার ছেলেদের কাছে নির্ম্মলদা একজন আদর্শনিষ্ঠ মহামানুষ। অভিভাবকরা পরম নির্ভরতার সঙ্গে ছেলেদের এনে দিয়ে যেতেন তাঁর কাছে। বিশ্বাস ছিল—তিনি ছেলেদের চরিত্রের যাবতীয় দোষ সংশোধন করে তাদের গড়ে তুলতে পারেন সৎ ও সুন্দরভাবে—ফুটিয়ে তুলতে জানেন ছেলেদের মধ্যে সৃষ্টিকরী প্রতিভা—জাগিয়ে দেন জাতীয়তাবোধ ও উত্তম নাগরিক-চেতনা।

দফরপুরে ছয় মাসের অধিককাল থাকার পর নির্ম্মলদা আস্তানা নিলেন পাশের গ্রাম ভাস্কুড়ে। বঙ্কু ভাস্কুড়েরই ছেলে। পিতামাতার একমাত্র পুত্র। অল্প বয়সে মাতৃ-হারা হওয়ায় পিতার অতি আদরের সে। পড়াশোনায় মন নেই; মন শুধু খেলার দিকে—আর কোথায় কার বাগানে ভাল আমটি আছে, কার গাছের পেয়ারা বড়—কোন ডাবের জল বেশী—নজর শুধু সেই দিকে। পিতার শাসনের বাইরে সে। উত্তরোত্তর দুষ্টামী তার বেড়েই চলে। বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, তাড়ি যখন যা পায় অবাধে খেয়ে চলে অপরিণত বয়সেই। বঙ্কু সংশোধনের বাইরে।

বঙ্কুর পিতা মতিলাল ঘোষ একদিন শুনলেন, তাঁদের গ্রামে এমন একজন লোক এসেছেন, যিনি দুষ্টু ছেলেদের ভাল করতে পারেন। শুনেই বঙ্কুর পিতা বঙ্কুকে এনে নির্ম্মলদার হাতে সঁপে দেন। নির্ম্মলদার মধ্যে কি মোহিনী শক্তি ছিল জানি না—বঙ্কুকে তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই বশ করে ফেল্লেন। লেখাপড়া আর হ'ল না বটে, তবে স্বভাব-চরিত্রের হ'ল আমূল পরিবর্ত্তন। সে বঙ্কু আর নেই। নেশা করার বদ্ অভ্যাস বঙ্কুর আর রইল না। পরের জিনিষ লুকিয়ে পেড়ে আনার আনন্দও সে ভুলল। বিনিময়ে সে পেল নির্ম্মলদার অপর্য্যাপ্ত স্নেহ। বঙ্কু একজন খাঁটি ভক্তে পরিণত হ'ল। হ'ল অত্যন্ত সৎস্বভাবের ছেলে। নির্ম্মলদার নির্দ্দেশে বঙ্কু তার পিতার ফলের দোকানে আত্মনিয়োগ করল। পিতার ব্যবসা পরিচালনা করে অর্থ ও সুনাম দুই-ই সে অর্জ্জন করল প্রচুর।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ দীর্ঘ দশ বৎসর বঙ্কু নির্ম্মলদার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিল। তাঁরই প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশে বঙ্কু মধ্যে মধ্যে চন্দননগর মাতায়াত করত। পূজনীয় সঙ্ঘগুরু-দেবেরও সে পরম স্নেহ আকর্ষণ করে। ছেলেদের বিবাহিত জীবন নির্ম্মলদার চাওয়া ছিল না—বঙ্কুর পিতা কিন্তু বঙ্কুর বিবাহ দেওয়ার জন্য নির্ম্মলদার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনিও সম্মতি দান করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কুর বিবাহ হয়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কু চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে এসে সঙ্ঘগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রে এবং সঙ্ঘের সহযোগী সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হয়। সেদিন থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়। গুরুর প্রতি তার কোনরূপ বিচার ছিল না, ছিল শুধু অব্যভি-চারিণী ভক্তি। কিছু না কিছু হাতে না নিয়ে বঙ্কু কখনও গুরুতীর্থে আসেনি। সমিৎপাণি হয়ে গুরুর কাছে আসার শিক্ষা তাকে কেউ দেয়নি—ইহা ছিল তার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি। দূর থেকে সে শ্রীগুরুকে দেখে আনন্দের আবেগে কেঁদে বলত—'ভগবান'। দু'হাত বাড়িয়ে শ্রীগুরুও বলতেন—"বঙ্কু এসেছিস? আয়, আয়। কি এনেছিস্ রে আমার জন্য, দে দে।" বঙ্কু যদি ফল আনত হাত পেতে ভগবান ফল নিতেন—যদি মালা আনত নিজেই গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে মালা পরতেন। বঙ্কুর সেই ভাববিহ্বল 'ভগবান' 'ভগবান' ডাক আজও কানে বাজছে।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দ। বঙ্কুর শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুদেবের মন্দির নির্ম্মাণোপলক্ষ্যে সকলেই আমরা ব্রতধারী। সে-ও। ব্রত—৫০ জন লোকের কাছে শ্রীগুরুর কথা বলা ও স্বতঃপ্রণোদিত অবদান সংগ্রহ করা। বঙ্কু এমনিতেই কথা বলত কম। কথার শিল্পও জানত না। ক্রমশঃ শরীরও তার ভেঙ্গে পড়তে লাগলো।

একদিন বঙ্কু আশ্রমে এসেছে। নিরালায় আমায় বললে বঙ্কু, একটু কথা আছে। আমায় ভগবানের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল বঙ্কু। তারপর ফতুয়ার পকেট

থেকে একটি চেক বার করে বল্ল—"ভাই কেষ্ট; শ্রীগুরু মন্দিরের জন্য আমি অন্য কিছু করতে পারব না—আমার এই যৎসামান্য অর্ঘ্যটুকু দিয়ে যাব।" তিন হাজার দু' টাকার একখানি চেক শ্রীভগবানের পটচিত্রের পদপ্রান্তে রাখলো। তারপর "জয় গুরু," "জয় গুরু"—বলতে বলতে ঝর্ ঝর্ করে কাঁদতে লাগল বঙ্কু। অভিভূত চিত্তে পাশে বসে ভক্ত-ভগবানের মিলন-মাধুর্য্য রস আস্বাদন করে আমিও সেদিন ধন্য হয়েছিলুম।

নিজেকে ও নিজের সবকিছুকে শ্রীগুরুর প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করাব চিন্তা বঙ্কুর মনে এসেছিল। এ মনোভাব সে আমার কাছে এবং অন্তরঙ্গ স্থানীয় গুরুভাইদের কাছে কখন-সখন ব্যক্তও করেছে। কিন্তু সে সদিচ্ছা তার এ জন্মে অপূর্ণই রয়ে গেল।

এরপর বঙ্কু আর বেশী আশ্রমে আসতে পারেনি। মাঝে মাঝে চন্দননগর আসার আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল হ'ত। সংবাদ পেয়ে ইন্দু ভাই (সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সভ্য) কয়েকবারই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে চন্দননগর নিয়ে আসার ব্যবস্থাদির জন্য। শেষে একবার গাড়ী নিয়ে তাকে আনবার জন্য যায়, কিন্তু আসতে কোন-মতেই পারে না—শরীর এতই অপটু হয়ে পড়েছিল। শুনলাম মৃত্যুর তিন চারদিন আগে থাকতে সে শুধু বলত: "চন্দননগর আশ্রমে যাব, আমায় ভাল কাপড় জামা পরিয়ে দাও।" এমন কি দু-চারবার নাকি বাইরে বেরিয়েও এসেছে চন্দননগরে আসবে বলে'। সান্ত্বনা দিয়ে বৌমা বলেছেন—"কলকাতা খবর দিচ্ছি, তোমাব ইন্দুভাই এসে তোমায় নিয়ে যাবে।" মৃত্যুর দিন সাতেক আগে আমি তাকে দেখতে যাই। দেখামাত্র তার প্রশ্ন—"ভাই কেষ্ট, গুরুমন্দির আমি দেখে যেতে পাবব ত?" অবস্থা দেখে মনে ভরসা পাই না, তবুও মুখ ফুটে বলি—"হাঁ, নিশ্চয়ই পারবে। এই তো দুবছরের মধ্যেই মন্দির হয়ে যাবে—দু'টো বছর তোমায় বাঁচতেই হবে।"

আজ মনে হয়—বঙ্কু কি সত্যই নেই? না কখনই না—সে আছে। দেহমুক্ত অবিনাশী আত্মা তাঁর শ্রীগুরুকে কেন্দ্র করে এই আশ্রম-তীর্থের রেণুতে রেণুতে মিশিয়ে আছে। যথাকালে নব কলেবর ধারণ করে সে আবার আসবেই। শ্রীগুরুর কায়ব্যূহের মধ্যে সে যে অন্যতম!

জীবনের পথে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

[প্রবর্ত্তক ১৩৩৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে]

জীবনের পথে, দেখা হল অনেকের সনে,
কেহ মনোরথে, দিনেক সাবথী,
নর্ম্মসখা কেহ একাসনে,
বিশ্রম্ভ আলাপে চির বাসন্তী মুরতি,
রেখে গেল মনে মূর্ত্তিমতী,
যার লাগি কুসুম আরতি,
জ্বলি ওঠে বর্ষে বর্ষে, প্রতি মধুমাসে,
নিভে যায় বাদলের উতলা বাতাসে॥
তোমার কোথায় ঠাঁই,
খুঁজিয়া ঠিকানা নাহি পাই,
শূন্য হেমন্তের সাথী, শীতের দোসর,
দীর্ঘ হিমরাতি পুষ্পহারা আঁধার বাসর
ললাট লিখন, জীবনের সব অনটন
মনের ভেঙ্গেছে যবে আশা;
তুমি নিয়ে এলে ভালবাসা;
কি আঁকিয়া দিলে আঁখি 'পরে
ক্ষণেকের তরে,
বসন্তের অকাল বোধন,
তাবপরে বিরহের অসাধ্য সাধন।
তপস্যার ক্ষীণ শীর্ণ তনু,
বাতাসে মিশায় অণু অণু।

ঋষি মতিলাল

শ্রীসুষমা মৈত্র

আলোকের দিশারী ঋষি মতিলাল
আলো হাতে নেমে এসো দেখাও আলোর
সন্ধান। সম্মুখে নেই আমাদের পথের
নিশানা কোন। অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি
যে স্বতঃই। ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হয়ে
অধৈর্য্য মাতা তাই শিশুকে আছড়ে
মারে। ন্যায় নীতির বালাই নেই কোথাও।
কতশত অঘটনই যে ঘটছে নিত্য হৃদয়বিদারক।
তোমার মুষ্টিযোগ-শিক্ষা, সংহতি ও অর্থের কর্ম্মযোগ
জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হই যেন
আমরা—সঙ্ঘগুরু, তোমার অমোঘ মন্ত্রশক্তি সেতো।
প্রাণভরা এ প্রার্থনাই রইল তোমার শ্রীপাদপদ্মে।

প্রবর্ত্তক

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী

ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষণে সন্ন্যাসীর দান
যুগে যুগে হ'য়ে আছে চিরস্মরণীয়;
নাই যার ব্যতিক্রম বিধাতার এ বিধান
বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ বরণীয়।
তাদেরি অনুজশ্রেষ্ঠ সঙ্ঘগুরু মতিলাল
প্রবর্ত্তক মাধ্যমে আহ্বান জ্যোতির্ম্ময় পথে.
ত্যাগ-নিষ্ঠা-তেজ নিয়ে বীরধর্ম্মে সুবিশাল
দেশ-আত্মা জাগরণের সাধনার রথে।
সাহিত্য, সংস্কৃতি-ধর্ম্ম মানুষের যথার্থ বিকাশ
সেবা-জ্ঞান-যুক্তি যেথা সবই সমন্বয়
প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টি করিবারে দারিদ্র্য বিনাশ
ভারতের শাশ্বত নীতি আদর্শনিচয়।

তারুণ্য-সংকট

[আলোচনা]

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আমরা দেশের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে সঠিক জানি না, তবে বাংলা রাজ্যে তরুণ-তরুণীরা এক সংকট কালের সম্মুখীন হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সংঘাত দেখা দিয়েছে। কিশোর কিশোরী শিক্ষালয়ে গিয়ে দাঁড়ালো, জবাব এলো—'সীট নেই'। 'ট্রান্সফার সার্টিফিকেট চলবে না, পরীক্ষা দিতে হবে', 'কোন সুপারিশ করার জন্য মুরুব্বি চাই'।

পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও আকার দেখে পাঠার্থী ভয় পেয়ে গেল, তার উপর শিক্ষালয়ের পঠনের রীতি তাকে বিভ্রান্ত করে তুললো।

বিকালে খেলাধূলা করবে, তেমন মাঠ কাছাকাছি নেই। তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর খেলাধূলার পরিবেশের কথা ভাববার অবকাশ প্রবীণদের নেই।

খেলা দেখে আনন্দ পাবে, সেখানেও টিকিটের দাম নিম্ন-মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়ের সামর্থ্য-সীমার বাইরে। তার উপর দীর্ঘ লাইন।

একটু হাত-পা ছড়িয়ে ঘরে বসবে, তারও স্থান নেই। ভাড়াটের পক্ষে দু'খানি ঘরের সংস্থান করতেই আর্থিক দিক থেকে প্রাণান্ত।

গ্রন্থাগার থেকে নাটক নভেল এনে পড়বে, তার অধিকাংশেই যৌন-আবেদন মুখ্য।

সিনেমায় যাবে, ফিল্ম যদি হিন্দী হয়, তাহলে তাতে বেহল্লেপনার একশেষ।

খবরের কাগজ খুলে পড়বে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা

অনেক ভাল ভাল কথা বলছেন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার পরিচয় সে কোথাও পাবে না। বাড়ীতে দেখবে, রেশনের চাল থেকে মা কাঁকর বাছছেন। তিন টাকার সর্ষের তেল চার আনার টিনে ভরে দিলেই পাঁচ টাকা দাম হয়ে যাচ্ছে। টাট্‌কা মাছ ডবল দামে বাজারের আড়ালে বিক্রী হচ্ছে। হাসপাতালে গরীবের চিকিৎসার সুবিধা নেই, সভা-সমিতির মানুষেরা সাধারণের টাকা জমাচ্ছে নিজের ব্যাঙ্কে।

যে তরুণ মন সুন্দরের সাধনায় নিজ আদর্শকে গড়ে তুলতে চায়, চারিপাশ তাকে বিভ্রান্ত করে আদর্শচ্যুত করতে চায়। এই বিভ্রান্তিকে প্রতিরোধ করার শক্তি সব মনের থাকে না, আদর্শচ্যুতি তখন স্বাভাবিক। ভাড়াটে বাড়ীর ১০'×১০' ফুট ঘরে, বাবা মা ভাইবোন ভীড় করেছে। কিশোর বেরিয়ে এলো পথে, বসলো পাড়ার কোন বাড়ীর রোয়াকে। সে একা নয়, আরো আছে, দল দলো, আড্ডা জমলো। মাথার মধ্যে উপন্যাসের কি ফিল্মের গল্প ঘুরছে। পথ চল্‌তি তরুণী দেখলেই সুরু হলো গান—বোল্ রাধা, বোল্!

যে মানসিকতা সুস্থ হতে পারতো তা ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে উঠলো। আইন, পুলিশ অথবা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় এই মানসিকতা সাময়িকভাবে দমন করতে পারে, কিন্তু নির্মূল করতে পারে না। সেজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান, এবং প্রত্যক্ষ আদর্শ উপস্থাপিত করা। তরুণ চিত্তে প্রত্যক্ষ আদর্শের স্থান সবার উপরে।

তারুণ্যের এই সংকট আজ বিশ্বব্যাপী।

ইংলণ্ডের কথাই যদি প্রথম ধরি, সে দেশে এই তরুণের দল যখন-তখন খেয়ালখুশিমত হল্লা তোলে। গত বছরে তারা সাধারণের সম্পত্তির ক্ষতি করেছে ৪ কোটি টাকা। গত বছর গুড ফ্রাইডের ছুটিতে ১২০০ ছেলেমেয়ে সমুদ্র তীরে বেড়াতে গিয়ে তিনদিন ধরে সে অঞ্চলে শুধু দাঙ্গা হাঙ্গামা করে এলো। তাদের বিচারের জন্য স্পেশ্যাল কোর্ট বসলো, অনেকের ১০০০৲ টাকা অবধি জরিমানা হলো। একবার একদল ইস্কুলের ছেলে মজা দেখবার জন্য, রেলপথের সিগ্‌ন্যালের তার কেটে দিল। দুটো ছেলে রেলের লাইন তুলে ফেলে দিল, ফলে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন লাইনচ্যুত হলো। তাছাড়া মদ খেয়ে মাতলামি করাটা সে দেশের তরুণ-তরুণীর পক্ষে একটা বাহাদুরী হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ।

ফ্রান্সের গতিকও খুব ভাল নয়। সেখানকার কিশোরেরা কিছুদিন আগে অবধি 'কালো জামা' পরে নিজেদের এক দলের মানুষ করে নিয়েছিল। গত নভেম্বর মাসে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে ছেলে-ছোকরারা পুলিশের সঙ্গে রীতিমত হাতাহাতি লড়ে গেল। স্পোর্টস্ প্যালেসের এক অনুষ্ঠানে ছ হাজার 'কালো কুর্তা' বিনা উত্তেজনায় সমস্ত আসনের গদী টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে, হাসতে লাগলো।

পশ্চিম জার্মানিতে এই ধরণের তরুণদল নিজেদের বলে 'রকার্স'। হল্লা ও হাঙ্গামা বাধাতে তাদের বড় আনন্দ। ১৭ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে জার্মান ছেলেকে মদ খেয়ে পথে মাতলামি করতে দেখলে আজ আর কেউ অবাক হবে না।

বেলজিয়ামে আবার এই উচ্ছৃঙ্খলতা আরেক পথে চলেছে। সেখানে ১৪ বছরের নিম্নবয়স্ক ছেলেমেয়ের মধ্যে যৌন আচরণ ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে।

সুইডেনের তরুণ-তরুণীদের নাম হয়েছে 'র‍্যাগারে'। দাঙ্গা করাটা এরা বিপ্লব বলে মনে করে। এরা দোকান লুঠ করে, বাড়ীতে আগুন দেয়, রাস্তায় মাতলামি করে, এবং মোটরের ছাদে উঠে অনেক সময় নগ্ন-নৃত্য করে। এদের কথাই হলো—বেপরোয়া চালিয়ে যাও!

সারা ইউরোপের তরুণদের মধ্যে রকার্স ও র‍্যাগারে ভাব সংক্রামিত হয়েছে। আমেরিকা এর প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি। ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে ইস্কুলের জিনিষ-পত্র ভাঙচুর করে আনন্দ পায়। ক্যানেডার টরেণ্টো সহরের ইস্কুলে ছেলেমেয়েরা যে ক্ষতি করে, বছরে তার পরিমাণ ১ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। ১৮ থেকে ২৬ বছরের ছেলেরা বাপ মাকে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করে। রাতে পার্কের মধ্যে নগ্ন হয়ে ছুটোছুটি করে। আর্জেণ্টাইনের কিশোর কিশোরীরা মদ খেয়ে মাতলামি করে। মেক্‌সিকোর কিশোরদল পথে ঘাটে ভাল মানুষ পেলে তাদেরকে ঘা-কতক পিটিয়ে দিয়ে আমোদ করে।

ব্রেজিলের তরুণদল কোন অন্যায় করতেই পিছ্-পা হয় না।

দক্ষিণ আফ্রিকার 'বুওর' রাজ্যগুলিতেও এই উদ্দামতা দেখা দিয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা এখনও অল্প।

অষ্ট্রেলিয়া অনেক দূরে আছে, কিন্তু এই তরুণ প্রগতি সেখানেও পৌঁছেছে। সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নাচের আসরে, সমস্ত ছাত্রের দল নগ্ন হয়ে নাচতে লাগলো—এমন ঘটনাও ঘটেছে। কিশোরীদের মধ্যে চরিত্রহীন-ভাবেরও প্রাবল্য দেখা দিয়েছে।

ইউরোপ আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার তরুণ প্রগতি দেখে মহাভারতের কথা মনে পড়ে। শাম্ব ও তার বন্ধুরা এই রকম উচ্ছৃঙ্খল মনোভাব নিয়ে মুনিদের সঙ্গে পরিহাস করেছিল, তারই পরিণামে যদুবংশ ধ্বংস হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই উদ্দামতাও কি সেইরূপ ধ্বংসের একটা পূর্বাভাস?

অবশ্য আমাদের দেশ হলে, এইটাই হতো শেষ কথা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেই আমরা শেষ করতাম। কিন্তু ওদের দেশে কোন কিছুতেই হাল ছেড়ে দেবার রীতি নেই। ওরা সব কিছুরই প্রতিকার করতে কোমর বেঁধে নামে।

ডেনমার্কের প্রবীণেরা উঠে-পড়ে লেগে গেল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করতে। দেখতে দেখতে ৬০০ ক্লাব গড়ে উঠলো। সেখানে খেলাধূলা, নাটক অভিনয়, দেশ-ভ্রমণের সুযোগ দিয়ে তরুণদের আকৃষ্ট করা হলো। তার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো অর্থকরী হাতের কাজ।

নরোয়েতে ওই উচ্ছৃঙ্খল দল থেকেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করা হলো, যাদের কাজ হলো উচ্ছৃঙ্খলতা দেখলেই সেখানে তদারক করা। আইন ভঙ্গ করে হল্লা করার চেয়ে আইনকে জোরদার করে শৃঙ্খলা রক্ষা করার মধ্যে তারা এখন বেশি গৌরবের সন্ধান পেয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা মেতে উঠেছে আর-সবাইকে সংযমী ও ভদ্র করার জন্য।

সুইডেন এইসব তরুণদের জন্য সমুদ্রতীরে করেছে ক্লাব ভবন, সেখানে গিয়ে মোটর ছোটাও, টেকনিক্যাল ট্রেনিং নাও, হাতের কাজ শেখো, সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াও।

ফ্রান্সে তরুণ উকিল, পাদ্রী ও ব্যবসায়ীরা দল গড়েছে, তারা পথে পথে এইসব উন্মার্গগামী ছেলেদের বোঝাতে সুরু করেছে।

জার্মানরা তাদের দেশে ছোটদের মদ খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে, নাচ ও স্পোর্টের ক্লাব খুলেছে। তারা বলছে খেলাধূলা ও নাচে ক্লান্ত করে তুলতে পারলে, তাদের আর অন্য কিছু করার মত শক্তি থাকবে না।

ওইসব দেশের চিন্তানায়কেরা বলছেন, গণতন্ত্র ও আদর্শচ্যুতিই এই রোগের মূল কারণ। এ যুগে অনেক দেশে বাপ-মা ও অভিভাবকেরা সারাদিনই উপার্জনের ধান্দায় সন্তানদের কাছ থেকে দূরে থাকেন, তাতে ছোটদের স্নেহাকাঙ্ক্ষী মন বিরস হয়ে ওঠে। তার উপর ছোটরা দেখে প্রবীণদের মধ্যে ব্যবসায়গত দুর্নীতি, আদর্শগত ভ্রষ্টাচার। প্রত্যক্ষ আদর্শ পরোক্ষ উপদেশের চেয়ে ছোটদের মনে অনেক বেশী প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। এজন্য সুসংযত পারিবারিক জীবন ও স্নেহশীল পরিবেশ ছোটদের চিত্তবিকাশে একান্ত প্রয়োজন, এই দুটি বস্তু যত দুর্লভ হয়ে পড়বে, ছোটদের অসংযম ততো প্রকট হবে। ইউরোপে বর্তমানে পারিবারিক পরিবেশ থেকে ছোটরা বহু ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছে, সেজন্য তারা ক্লাব-পরিবেশ তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আমাদের পারিবারিক পরিবেশ এখনও তেমনভাবে ভেঙে পড়েনি, আমাদের আগে থেকেই তৈরী হতে দোষ কি? রিফিউজি কলোনির ছেলেমেয়েদের জন্য এখনই তো ক্লাব-পরিবেশ সংগঠনের প্রয়োজন। কিন্তু কোনখানে তেমন চেতনা তো দেখি না। বাঙলায় কি আজ কোন চিন্তানায়ক নেই, না চিন্তাজগতে বাঙালী আজ দেউলিয়া হয়ে গেছে?

সমালোচনা

পল্টনের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা। প্রকাশক : যুগ-সাহিত্য মন্দির। ৬, বেনিয়াপুকুর লেন, কলিঃ-১৪।

বীর্যবান পৌরুষের শংখধ্বনি। কালের অমোঘ নিয়মে হালের কুটিল আবর্তে বেসামাল বাঙলা পুনর্বার স্বস্থানে ফিরে আসবে নতুন বিশ্ব-পরিবেশে। প্রত্যাবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে চক্রস্থিতিতে প্রত্যেক বাঙালীর শক্তি সংযোগ করতে হবে। চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অগ্নি-বাণী সেই মহা আগামীর উদ্বোধনা।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কল্যাণ—(ভগবদ্-নাম-মহিমা ও প্রার্থনাবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা)। শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী শাস্ত্রী, এম. এ. কর্তৃক সম্পাদিত এবং গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৭-৫০ টাকা।

'কল্যাণ' ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্র। পত্রিকাখানির হিন্দী ও ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনহীন কেবলমাত্র ধর্মপত্রিকা কল্যাণের আর তুলনা নাই। ভারতবাসী আজও যে ধর্মকে জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে তাহা কল্যাণের লক্ষাধিক প্রচার হইতেই অনুমান করা যায়।

আলোচ্য অঙ্কের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুস্তকের ভূমিকায় বলা হইয়াছে : "বর্তমান ভোগাভিমুখী পতনমুখী বিশ্বকে চেতনা দিয়া সত্যকারের সাধনপথে আনা ও ভগবন্মুখী বৃত্তি উদয়ের জন্য এই অঙ্ক প্রকাশিত।" সুনির্বাচিত সচিত্র বিষয়ের সন্নিবেশে গ্রন্থের এই উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত বলা যায়। এই অঙ্ক মুখ্যতঃ নাম ও প্রার্থনাবিষয়ক হইলেও, প্রাসঙ্গিক ক্রমে ইহাতে বিচারপূর্ণ রচনা সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস, নামপ্রেমিক মহাত্মাদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও সাধনার পরিচয় আলোচ্য অঙ্কের সৌষ্ঠব ও প্রয়োজনীয়তা সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহার সঙ্গে বিচিত্র মনোবাসনা পূর্ণ করার অনুকল্পে দেবী মন্ত্র-যন্ত্রের বর্ণনা পুস্তকখানিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

আলোচ্য অঙ্কে বহু-রঙা চিত্র ২৩, দুই রঙা ১, এক রঙা হাফটোন ছবি ৮ ও রেখাচিত্র ১২খানি সন্নিবেশিত। গ্রন্থ-ভূমিকার মন্তব্য "এই অঙ্ক আনন্দদায়ক, রুচিকর, পরম উপাদেয় ও পথপ্রদর্শক" আমরাও বিনা বিতর্কে ইহা সমর্থন করি।

কৃষ্ণা মৌলিক এম. এ.

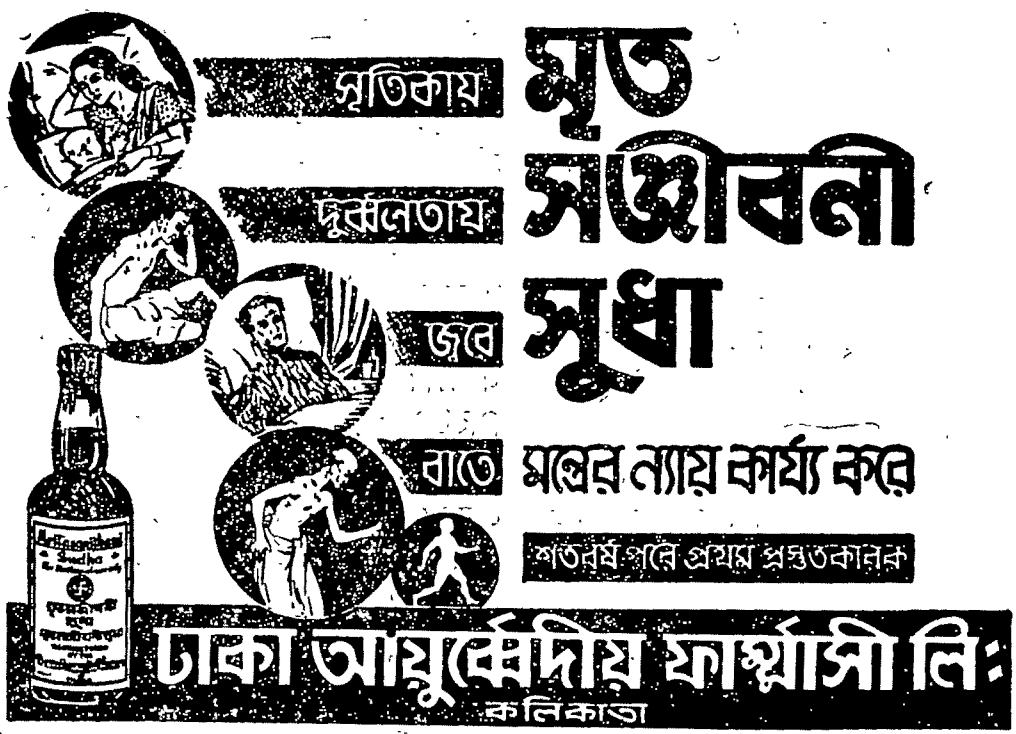

সাময়িকী

বিপ্লবী মাখনলাল সেন :

গত ২৭-এ বৈশাখ সোমবার রাত্রি ৭-৪০ মিনিটে প্রাক্তন সাংবাদিক ও বিপ্লবী মাখনলাল সেন তাঁর বালিগঞ্জ-কেয়াতলা রোডস্থ আবাসে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর। শ্রীসেনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া প্রাক্তন বিপ্লবী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মী অনেকেই তাঁর আবাসে উপস্থিত হইয়া শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন। পরদিন মঙ্গলবার সকালে শোক-শোভাযাত্রাসহকারে তাঁর শব কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নীত হয় ও শেষকৃত্য সমাপ্ত হয়।

বিপ্লবী ও সাংবাদিক হিসাবে বাংলাদেশে মাখনলাল সেন এতই সুবিদিত যে, কোন পরিচয়ের তিনি অপেক্ষা রাখেন না।

১৮৮১ সালে মাখনলাল জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার বিক্রমপুর-সোনারং গ্রামের বিখ্যাত বিশারদ বংশের সন্তান ছিলেন মাখনলাল। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পড়ার সময়েই তিনি ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রচার করেন। ১৯০৫-এর পর যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হয় তাহাতে এবং তাহার পর অগ্নিবিপ্লবে শ্রীসেন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ঢাকার বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমিতির নেতা পুলিন দাস বন্দী হইলে শ্রীসেনই উহার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে (১৯২৩) কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের উলকিন্‌স্ প্রেসের উপরতলার একটি ঘর হইতে তিনি অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই সময়ে ঐ অঞ্চলেরই ওয়াই. এম. সি. এ. ভবনের নীচের তলায় উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শ্রমজীবী সমবায় ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টির সভ্যেরা চন্দননগর ও উত্তরপাড়া, বাংলা তথা সারা ভারতের বিপ্লবীদের দেখাশোনার ও যোগাযোগের আড্ডা ছিল বলা যায় এই দুইটি কেন্দ্র। পরের বৎসর (১৯১৪) বর্দ্ধমানে যে 'দামোদর বন্যার' ভীষণ প্লাবন হয় তাহার ত্রাণকার্য্যে বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীরা দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হন। শ্রীসেন তাঁহার সহকর্ম্মিদের লইয়া এই বন্যাত্রাণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। চন্দননগর হইতে শ্রীমতিলাল রায়ের নেতৃত্বেও একদল কর্ম্মী এই বন্যাত্রাণ কার্য্যে অংশ গ্রহণ করেন। এই বন্যাত্রাণ উপলক্ষে বিপ্লবীদের মধ্যে অন্তরঙ্গ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে। শ্রীমতিলাল ও শ্রীসেনের এই সময়েই পূর্ব্বেকার ভাসা-ভাসা পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হয়—সে সৌহার্দ্দ্য বন্ধন উভয়ের জীবনে শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। ইহার পরের বৎসর (১৯১৫) যে ভারতরক্ষা আইনের প্রবর্ত্তন হয় তাহার কবলে পড়িয়া মাখনবাবুও অন্তরীণে আবদ্ধ হন এবং ১৯২০ সালে মুক্তি পান। এ সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের (১৯১৯) মর্ম্মন্তুদ ঘটনা লইয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে প্রচণ্ড অন্দোলন সুরু হয় তাহাতেও শ্রীসেন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাখনবাবুর স্থান ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে অগ্রন্থীদের অন্যতম হিসাবে মাখনবাবু চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বর্ত্তমানের প্রথম শ্রেণীর আনন্দবাজারের দৈনিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বনিয়াদ রচয়িতা, ধারক ও বাহক হিসাবে মাখন সেনের নাম পত্রিকাখানির সহিত চির বিজড়িত হইয়া থাকিবে।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতেই মাখনবাবু আনন্দবাজার পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া 'ভারত' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, কিন্তু রাজরোষ ইত্যাদি নানা কারণে তিনি পত্রিকাখানির স্থায়িত্ব দিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও বন্দী হন।

শ্রীসেনের মৃত্যুতে বাংলার বিপ্লবযুগের জীবন্ত স্মৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল বলা যায়।

লোকান্তরিত লেখক :

একদা অখ্যাতপ্রায় শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী নামে একটি বই বাংলা-সাহিত্য-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিস্ময়কর লেখকটি যেমন অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তেমনি অকস্মাৎ বিদায়ও

উৎসব অনুষ্ঠানে—
ইন্দ্রাণী সন্দেশ
অপরিহার্য্য!
৮৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিঃ ৯ ফোন-৩৫-১৩৮৩
৬, নটবর দত্ত রো, কলিঃ ১২ ফোন-৩৪-২৫৩৩

স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ্
করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের
বিদেশে মোহনবাগান—৪·০০
বিভিন্ন দেশে মোহনবাগান ক্লাবের রোমাঞ্চকর সফর কাহিনী। বহু চিত্র ও অজানা তথ্যসমৃদ্ধ। সহজ সাবলীল। রম্য-রচনার ভঙ্গী।
ফুটবল খেলার এ-দেশ ও-দেশের তুলনামূলক সমালোচনা-বই এই প্রথম। সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স : কলিঃ-১২

লইলেন মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে সুদূর পূর্ণিয়া জেলায় গত ৩০শে মার্চ। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ভাদুড়ী বংশের সন্তান ছিলেন সতীনাথ। পূর্ণিয়া জেলায় কিছুকাল আইন ব্যবসায় করিলেও প্রধানতঃ তাঁহার পরিচয় ছিল সমাজসেবীরূপেই। স্বদেশী আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীভাদুড়ী ১৯৪০ হইতে ১৯৪৪ সনের মধ্যে তিনবার কারাবরণ করেন। 'জাগরী'র সৃষ্টি সেই সময়েই।

স্বাধীনতার পর তিনি সাহিত্য সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫০ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার-এর প্রবর্ত্তন হয়। এই বৎসরই তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করেন। ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস—সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার লেখনী ছিল স্বচ্ছন্দ ও স্বতন্ত্র। শ্রীভাদুড়ীর শূন্য স্থান সহসা পূর্ণ হইবার নহে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় :

প্রখ্যাত কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে মার্চ ৬৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

সাবিত্রীপ্রসন্ন শুধু যে একজন সুকবি ছিলেন তাহা নহে—তিনি ছিলেন একজন স্বদেশ-প্রেমিক। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থাতেই তিনি ছিলেন প্রথম ছাত্র যিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনবার কারাবরণ করেন সাবিত্রীপ্রসন্ন। তিনি ছিলেন নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। সাবিত্রীপ্রসন্নের জন্ম হইয়াছিল নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হইল—মধুমালতী, পল্লীব্যথা, রক্তরেখা, অতসী প্রভৃতি। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সুবৃহৎ জীবনী তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত। বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকার সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে একটা দৈনিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং কবি ও সাহিত্যিকগণ এই স্বদেশপ্রেমিক কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

'ভারত-হৃদয়' :

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ডঃ মতিলাল দাশের 'ভারত-হৃদয়' নামক পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। রয়াল আট পেজী ৮০০ পৃষ্ঠায় এই বিপুলায়তন পুস্তকে বেদ, উপনিষৎ, গীতা এবং বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আধুনিক কালের একটী রসসমুজ্জ্বল সুন্দর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানির অর্দ্ধেক মুদ্রণব্যয় সদাশয় রাষ্ট্র বহন করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিতেছেন। পুস্তকখানি লেখকের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া বিবেচিত হইবে, এ আশা করা যায়।

জগদীশ্বরী দেবী রচনা-প্রতিযোগিতা :

চন্দননগর পুস্তকাগারের সম্পাদক শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রতিযোগিতার বিষয়:

বৈদিক ঔষধালয়-টাকা

চন্দননগর

জি, টি, রোড ঃ ঃ বড়বাজার

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে কয়েকটি :

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ : মহাদ্রাক্ষারিষ্ট : দশন সংস্কার চূর্ণ :
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিষ্ট : ব্রাহ্ম ঘৃত (ছাত্র বন্ধু) : মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

ঔষধের বিস্তৃত বিবরণী ও গুণাগুণের জন্য তালিকা দ্রষ্টব্য। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।

বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসে যে সকল বাঙ্গালী মহিলা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনকথা, কার্য্যধারা ও তাহার ফলাফল এবং কিভাবে তাঁহারা স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। বর্তমানে স্বাধীনতা-লাভের পর বাঙ্গালী মেয়েরা কিভাবে কার্য্যে যুক্ত থাকিয়া বাংলার মেয়েদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও দেশকল্যাণ প্রচেষ্টার সহায়ক হইতে পারেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

যে কোন বাঙ্গালী মেয়ে যোগ দিতে পারিবেন। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে রচনাটি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য। রচনার সহিত উহা যে রচয়িত্রীর নিজের রচনা তৎসম্বন্ধে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত-সম্বলিত একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে। পঞ্চাশ টাকা বা ঐ মূল্যের পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

সঙ্ঘতীর্থে শ্রীদিলীপকুমার রায়:

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের (২৩।২।৬৫) এক সন্ধ্যায় প্রখ্যাত সাধক-কবি, সাহিত্যিক শ্রীদিলীপকুমার রায় চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘতীর্থে অনাহূতই আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) ও জনৈক পাঞ্জাবী শিষ্য। সঙ্ঘসভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের সহিত তাঁর সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ হৃদয়-বিনিময় হয়। ইতিহাস-বিখ্যাত শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাস কক্ষে গিয়া সকলেই শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদনান্তে আশ্রম প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া প্রস্থান করেন।

৺তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রাপ্ত পত্র:

৺তারকেশ্বর মঠের শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায়ের এক পত্রে গত ফাল্গুন সংখ্যা প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত অনন্তশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিস্বামী জগন্নাথ আশ্রমপাদ সম্পর্কিত সংবাদটির দু' একটির বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁর পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশবিশেষ এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হইল: "তিনি (শ্রীমদ্ভক্তিস্বামী জগন্নাথ আশ্রমপাদ, মহাপ্রয়াণের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই সামান্য অসুস্থ হইয়া সজ্ঞানে দেহান্তরিত হইয়াছেন। ১৩০১ সালের আশ্বিন কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে তিনি আবির্ভূত হন, ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তারকেশ্বর ধামে মোহন্তরূপে পদার্পণ করেন। তখন তাঁহার দণ্ডী জীবন ৪৪ বৎসর, ৩৫ বৎসর নহে।"

নিঃ ভাঃ মূকবধিরদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:

সম্প্রতি নিউ দিল্লীতে ন্যাশনাল ষ্টেডিয়ামে নিখিল ভারতীয় মূক বধিরদের তিনদিন ব্যাপী একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। ১০টী রাজ্যের প্রায় ২০০ শত মূকবধির প্রতিযোগিগণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মূকবধিরদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। সাংকেতিক ভাষাবিশেষজ্ঞ শ্রীনলিনীমোহন মজুমদার প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার তাৎপর্য্য সাংকেতিক

সাংকেতিক ভাষা বিশেষজ্ঞ নলিনী মজুমদার ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী

ভাষায় মূকবধিরগণকে বুঝাইয়া দেন। মূকবধিরদের উৎসাহিত করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী সুন্দর একটি ভাষণ দেন।

ভারতীর মন্দিরে বিদেশী তীর্থযাত্রী:

বিগত এক বৎসরে একটি সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি একজন বিদেশী আত্মজিজ্ঞাসু বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাণকিশোর গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ ডেভিড মিলার সস্ত্রীক গবেষণা কাজের জন্য ভুবনেশ্বরে আসেন এবং

এক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। স্থানীয় মঠ-মন্দিরের আদ্যন্ত ইতিহাস ঐতিহ্যের গবেষণাব্যপদেশে তিনি স্থানীয় 'সদ্‌গুরু নিবাস' আশ্রমের সংস্পর্শে আসেন এবং কৌতূহলী হইয়া আশ্রমগুরু শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সহিত তাঁর কলিকাতা-সিমলা ষ্ট্রীটস্থ আবাসে আসিয়া বার বার সাক্ষাৎ করেন। আলাপ-আলোচনা এবং গোঁসাইজী সম্পর্কিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এমনই বিমুগ্ধ হন যে, মিঃ মিলার ব্রহ্মচারীজীর নিকট নাম-যোগ সম্বন্ধে উপদেশ চান। শ্রীমিলারের অজপা সাধন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যাখাদ্য ও আচার বিচারের বিষয় জানিয়া শুনিয়াও তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হন। এখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই বলিয়া ব্রহ্মচারীজী মিলার দম্পতিকে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে কিছু সাহায্য করেন। সম্প্রতি মিলার দম্পতি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া গিয়াছেন। জানা গিয়াছে এই গবেষণারত অধ্যাপক দলের মধ্যে আরও কয়েকজন এ দেশের মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল :

পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৪-৬১৮৬

সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

=শুভবিবাহের বিচিত্র বেনারসী শাড়ী=

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : ফোন ৩৩-২৩০৩

বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি বিচিত্র রুচিসম্মত শাড়ীর বিপুল সম্ভার।

আধুনিক ডিজাইনের হরেক রকম দেশী তাঁতের শাড়ী।

গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার প্রচুর আয়োজন।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৬২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই

গান্ধী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড (১৮৯৪—১৮৯৬) দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৬—১৮৯৭)

মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবনের ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে হ'লে এই রচনাবলী অপরিহার্য। মূল রচনার সহজ সরল সুন্দর বঙ্গানুবাদ।

প্রতি খণ্ড : পাঁচ টাকা

বাংলার উৎসব

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী

১·২৫

বাংলার শিকারপ্রাণী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

৩·০০

বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য

রচনা : নৃত্যবিদ্ শ্রীমণি বর্ধন

বাংলার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য সম্পর্কে এ-ধরণের গবেষণামূলক বই আগে কখনও বের হয়নি।

মূল্য : ২·৯০

॥ স্থানীয় বিক্রয়কেন্দ্র ॥

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র :

নিউ সেক্রেটারিয়েট

১, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা—১

॥ ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ॥

প্রকাশন শাখা :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ

৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা—২৭

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন)সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় ০ ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

সূচীপত্র · প্রবর্ত্তক : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭২

জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	৫৭
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	৫৮
'প্রবর্ত্তক'-এর কথা	নিবন্ধ	শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত	৫৯
স্বামী বিবেকানন্দ ও অহিংসবাদ	প্রবন্ধ	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়	৬৫
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	৬৯
স্থান কোথা ?	কবিতা	শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী	৭২
দৃশ্য পরিচয়	কবিতা	রাজকুমার লাহিড়ী	৭২
কেরল কথকতা	প্রবন্ধ	শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার	৭৩
শ্রীঅরবিন্দ-সরণি	জীবন-চিত্র	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৭৭
ত্রিমূর্ত্তি	গল্প	অজিত দাস	৭৯
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	পুরাতনী	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৮৫
কিশোরীর প্রতি	কবিতা	সুনীতি দেবী	৮৮
পঞ্চাশ বছর আগে	সঙ্কলন		৮৯
রবীন্দ্র জয়ন্তী ও বাঙালীর কর্ত্তব্য	নিবন্ধ	ডঃ হরগোপাল বিশ্বাস	৮০

"ভারতকোষ" (আঃ) ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ৯১ ; রামানন্দ-শতবার্ষিকী (নিঃ) ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ৯৪
রামানন্দ-তর্পণ (কবিতা) শ্রীসুধীর গুপ্ত ৯৫ ; সম্পাদকীয় ৬০ ; সমালোচনা ৯৬ ; সাময়িকী ৯৭

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড.: কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

G. GHOSH & Co.

NURSERY MEN

TOWEN END

DARJEELING

FOR

AZALEA, CAMELLIA, DAHLIA, GERANIUMS, GLADIOLUS, CACTI AND SUCCULENTS, ORCHIDS Etc.

GARDEN SEEDS.

Free Catalogue Avilable.

অভিজাত কেশ-তৈল

নগেন্দ্রনাথের

হিমকল্যাণ

বড়·মাঝারী·ছোট

তিন সাইজে

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ • কলি-৪

UPCO

॥ সদ্গুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০; **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ। **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত: "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাব্‌লিশার্স: কলিকাতা-১২

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক; সম্পূর্ণাঙ্গ; নির্ভরযোগ্য বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি, রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

উৎসব অনুষ্ঠানে-

ইন্দ্র সন্দেশ

অপরিহার্য্য!

৮৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিঃ ৯ ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলিঃ ১২ ফোন-৩৪-২৫৩৩

স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ্ করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের

বিদেশে মোহনবাগান—৪-০০

বিভিন্ন দেশে মোহনবাগান ক্লাবের রোমাঞ্চকর সফর কাহিনী। বহু চিত্র ও অজানা তথ্যসমৃদ্ধ। সহজ সাবলীল। রম্য-রচনার ভঙ্গী।

ফুটবল খেলার এ-দেশ ও-দেশের তুলনামূলক সমালোচনা-বই এই প্রথম। সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স: কলিঃ-১২

CALCUTTA

৫০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা | সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

জীবনের আলো

অন্তর আর বাহির লইয়া মানবাত্মার দুইটি দিক। বাহিরের পক্ষে দেহ, প্রাণ আর মন—বিদিত। অন্তরের সবখানি শক্তিই অবিদিত। দেহ, প্রাণ আর মনের নিত্য পরিবর্ত্তন অন্তর সংগ্রামেই সূচিত হয়। তাই বাহিরকে জয় করিতে পারিলেই অন্তরের মঙ্গলেচ্ছা স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বাহিরের প্রধান ইন্দ্রিয় মন। মনকে জয় করিতে পারিলেই অপর দুইটিও বিজিত হইবে। কিন্তু মন জয় সহজসাধ্য নহে। প্রাণের অফুরন্ত শক্তি ইহার সপক্ষে দণ্ডায়মান। দেহ প্রাণেরই অনুগত—সুতরাং দেহ, প্রাণ, মনের উপর অধিকার বিস্তার সময় সাপেক্ষ তো বটেই, অধিকন্তু কঠোর সাধনসাপেক্ষ।

এই সাধনা কি? হঠযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজযোগ, ত্রিমার্গ—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ হিন্দু-ভারতের অনবগত নহে। যোগই ভারতের সাধনা। যোগের অষ্ট সিদ্ধির কথা অন্যে কাল্পনিক বলিয়া অস্বীকার করিলেও, যোগাবলম্বী সাধকগণ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়। যোগ বীর্য্যস্বরূপ। যোগ অনন্ত শক্তির আধার। ব্যষ্টিজীবনে একদিন এই যোগ অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করিত। কালপ্রভাবে এই যোগ-বীর্য্য সুপ্ত হইয়া পড়িলেও লুপ্ত হয় নাই। প্রতি মানবের মধ্যেই উহা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। উহার পুনরাবিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? যাহা একদিন ছিল ব্যষ্টি সিদ্ধি, তাহাই সমষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে কোন্ সাধনায়? মানুষের মধ্যে আত্মার অখণ্ড অনুভূতি জাগিয়া উঠিবে কিসের প্রভাবে? সাধনা তো ইহাই আর এই সাধনাই যোগ-সাধনা। যোগ জীবে এবং পরমেশ্বরে। অন্তরাত্মাই পরমেশ্বর। সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধি দিয়াই এই যোগকে অবধারণ করিতে হইবে। তারপর অভ্যাস। অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধির অহং দূর হইলেই আত্মার স্বচ্ছ স্বরূপ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইবে। তখনই প্রজ্ঞার উদয়। প্রজ্ঞার আলোকে আত্মার অখণ্ড রূপ থরে থরে ফুটিয়া উঠিবে। বুদ্ধির এই জাগরণ শরীর, প্রাণ ও মনের উপর ক্রিয়াশীল হইবে। বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে যাহা অবধৃত হইবে—মনোজগতে তাহাই রূপ পরিগ্রহ করিবে—প্রাণ তার অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিবে, শরীর প্রাণেরই অনুগত থাকিবে। যে যোগশক্তি দেহ, প্রাণ ও মনের উপরে বুদ্ধির জগতে তুরীয় শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া অলক্ষ্যে জীবন পরিচালিত করিতেছিল—তাহাই এক্ষণে জীবনের মধ্যে নামিয়া আসিয়া জীবনকে দিব্য ও ভাগবতময় করিয়া তুলিবে। অন্তরের এই পরিবর্ত্তন, বাহিরেও স্বতঃ প্রকাশিত হইবে। বুদ্ধি ঈশ্বরযুক্তি লাভ করিলেই মন আনন্দরসে ভরপুর হইয়া থাকিবে, প্রাণে কামনাহীন কর্ম্মপ্রেরণা জাগিয়া উঠিবে, দেহ অপূর্ব্ব শ্রী ও স্বাস্থ্য লইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম সমাধা করিবে। যোগ তাই জীবনেরই। দিব্যজীবনই কাম্য। এইরূপ ব্যষ্টিজীবনই গুণান্বিত হইয়া সমষ্টিজীবনে পরিণত হইবে। সমষ্টি প্রাণ, সমষ্টি মন, সমষ্টি শরীরকে একে অন্বীত করিয়া দৈবী সমষ্টিজীবন লাভই এ যুগের সাধনা। (১৩২৬-এর প্রবর্ত্তক হইতে)।

সদ্‌গুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। অষ্টত্রিংশৎ সুক্তং।) ষষ্ঠী ঋক্

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

মো ষু ণঃ পরাপরা নিঋতির্দুর্হণা বধীৎ।

পদীষ্ট তৃষ্ণয়াসহ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—"হে মরুতঃ" (মরুদ্দেবগণ) "পরাপরা" (অতিবেগশালী) "দুর্হণা" (দুর্দ্দমনীয়া) "নিঋতি" (পাপপ্রবৃত্তি) "নঃ" (আমাদিগকে) "উষু" (আদৌ) "মা বধীৎ" (না বধ করিতে পারে) [সা নিঋতি—পাপবৃত্তি] "তৃষ্ণয়া সহ" (তৃষ্ণার সহিত) "পদীষ্ট" (বিনাশ প্রাপ্ত হউক) ॥ ৬ ॥

সরলার্থ—হে মরুদ্দেবগণ! অতি বলশালী দুর্দ্দমনীয়া পাপপ্রবৃত্তি আমাদের যেন আদৌ বধ করিতে না পারে। তাহারা যেন তৃষ্ণার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৬ ॥

বিশদার্থ—এই ঋকটিও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা দেবতার কাছে, দেবতা হওয়ার জন্য। সে কেমন? না, দৈবীগুণসম্পন্ন হইয়া দৈবীভাবে ভাবিত হইয়া দিবারাত্র অবস্থান করা। চিন্তা, চেষ্টা, কর্ম্ম, কিছুই নিজের জন্য নয়—পরন্তু সকলের জন্য, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, ভূমার আনন্দ লাভ করাব জন্য। ইহাই তো বলিষ্ঠ জীবনের ধর্ম্ম। ভারতের ঋষি জীবনকে কোথাও অস্বীকার করেন নাই—কর্ম্মকেও জীবন হইতে বাদ দেন নাই—জীবনেরই জয়গান গাহিয়াছেন সর্ব্ব সময়। জীবন কোথাও না অবনমিত হইয়া পড়ে সেই দিকেই তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি।

কেন এই সতর্কতা? মর্ত্ত্যবাসী আমরা। মর্ত্ত্যের ধূলি কাদায় আমাদের জন্ম। পার্থিব রস গ্রহণেই এই শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি—তাই পৃথিবীর মলিনতায় আচ্ছন্ন হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের ঋষি এইজন্যই এত সতর্ক। জীবন তো তাঁদের কাছে ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা মাত্র নয়। অবিনাশী আত্মার ন্যায় জীবনও অনন্ত। অনন্ত জীবনের জন্যই তাঁদের যাত্রা। সেইজন্যই তাঁরা ইহজীবনকেই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করার আকাঙ্ক্ষা রাখেন—পার্থিব রসসিঞ্চনে নয়—অপার্থিব উর্দ্ধলোকের অমৃতধারায়। তাই তো তাঁরা দেবানুগ্রহের প্রার্থী। তাই তো তাঁদের কণ্ঠে অনাহত প্রার্থনা-মন্ত্র উদ্গীত হয়—হে দেবতা! তোমাদের অনুগ্রহে আমাদের মন যেন পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়। যাহা অপবিত্র, অবিশুদ্ধ তাহাই তো পাপ। সেই পাপস্পর্শে আমাদের চিত্ত যেন মলিনতা প্রাপ্ত না হয়। উহারা যেন আমাদের মনকে স্পর্শও করিতে না পারে। তৃষ্ণার সহিত যেন তাহারা বিনষ্ট হয়।

গীতার 'ঊর্দ্ধমূলং অধঃশাখং' যে জীবন সেই জীবনের প্রতীক-দৃষ্টান্ত ভারতের আর্য্য ঋষিবৃন্দ। নিজেদের ত্যাগ-তপস্যা, নিজেদের আচারনিষ্ঠ জীবনের জন্য এতটুকু গর্ব্ব নাই, অহঙ্কার নাই, যেন সর্ব্বদাই দেবতাদের কৃপার ভিখারী। আমরা যেন দেবতাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই, তপস্যাজনিত দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় পাপবৃত্তিগুলি যেন পুষ্টিলাভ না করে; বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ না পায়; যেন অঙ্কুরেই ঐ পাপচিন্তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এমন না হইলে কি দেবতা হওয়া যায়?

দেবতা ও অসুরের মধ্যে পার্থক্য তো এইখানেই। অসুরদেরও তপস্যা আছে, ত্যাগ আছে। কঠোর তপস্বী তারা। তপস্যার দ্বারা চরাচর বিশ্বজগতে তাবা আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেবতারা সভয়ে তাদেব বর দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই তপস্যার মূলে থাকে একটি দুর্দ্দমনীয় অহং সত্তা। 'আমি বড় হব, সকলের প্রভু হব, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আমিই শাসন করব, আমার প্রতাপে সকলকে বশীভূত করে রাখব'—এই 'আমি' 'আমি' ভাব, এই অহংজাত অহঙ্কারই তো পাপ, আর এই পাপেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইজন্যই অসুররা মরণধর্ম্মী আর দেবতারা অমর। ভারতের ঋষির চাওয়া 'মর্ত্ত্যাসঃ স্যাতন্ অমৃতস্যাং'—দেবতাদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া অমর হওয়া। বৈষ্ণবদের ভাষায়—'আপনাকে ফুরাইয়া শ্যামাঙ্গে মিশিয়া যাওয়া'রই যেন সাধনা।

'প্রবর্ত্তক'-এর কথা

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের কথা—"Revolutionise the brain of the nation"—জাতির মস্তিষ্কে আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইবে। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনসাধনা—সেই পরিবর্ত্তনেরই সিদ্ধ কেন্দ্র-রচনা।

বিপ্লবী—শ্রীঅরবিন্দ। বিপ্লবী—শ্রীমতিলাল।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সৃষ্টি ও জীবন—এই বিপ্লবেরই ঐতিহ্য-প্রেরণা লইয়া।

রাষ্ট্রবিপ্লবেরও মূলে অধ্যাত্মবিপ্লব। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম-বিপ্লব ভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিপ্লবও সুসম্পন্ন হয় না। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাযজ্ঞ তাই এক প্রকার বিফলই হইয়াছে, বলিলে মিথ্যা বা অন্যায় হইবে না। অন্ততঃ, তাহা সর্ব্বত্যাগী মুক্তিসাধকবৃন্দের আশানুরূপ হয় নাই—যে দ্বিধাবিভক্ত স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি, তাহা আমাদের ধ্যান-ধারণার "স্বরাজ" নহে—অভীষ্ট রাষ্ট্র-স্বাধীনতাও নহে—পরন্তু আমাদের অতুলনীয় মুক্তিস্বপ্নের বিকৃত, খণ্ডীকৃত, ভগ্ন দেউল মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দের ঋষিদৃষ্টি যে অখণ্ড অন্তর-বিপ্লবের সন্ধান দিয়া গিয়াছে, সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল তাঁর রাষ্ট্রবিপ্লবোত্তর সঙ্ঘ-সাধন-যুগে সংগঠনসাধনার মধ্য দিয়া উহাকেই সিদ্ধ করিয়া তুলিতে তাঁর জীবনপাত করিয়া গেলেন।

ইঁহাদের অমোঘ স্বপ্ন ও প্রেরণা, অথবা অমর ভারতাত্মারই সাধ্য-সাধনার চিহ্নিত উত্তরসাধক রূপে প্রবর্ত্তক তথা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ এক আহ্বান দিতেছে—

এ আহ্বান—নব জন্মের—নব জীবনের।

গুরু—জাতির সত্য নেতা—দেন বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প। পার্থরূপী সাধক—বীরকর্ম্মী—আত্মসমর্পণযোগী—সে সঙ্কল্প বুকে লইয়া বলেন 'করিষ্যে বচনং তব'।

যে দেশে, যে যুগে এই গুরু-শিষ্যের উদয় হয়, সে দেশে, সে যুগে শ্রী, বিজয়, বিভূতি, সুনীতি ও সুমতি সব ধ্রুব-নিশ্চিত হইয়া দেখা দেয়।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতি র্মতির্মম॥

গুরু-সঙ্কল্প-সাধনের জন্যই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ—সেই সিদ্ধ সঙ্কল্পেরই বিগ্রহ। গুরুবিশ্বাসের অগ্নিবীর্য্যই এই সঙ্ঘশক্তির মূল। সাধন—প্রেম ও ঐক্যের অনুশীলন। লক্ষ্য—নবজাতি। এই জাতির দেশ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা, মন, প্রাণ—একসূত্রে গাঁথা—'সূত্রে মণিগণা ইব'—সে সূত্র মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বাসের মর্ম্মসূত্র।

'এক দেশ, এক ভগবান্,
এক জাতি, এক মন প্রাণ।'

এক মাতৃভূমি, এক মাতৃভাষা, এক সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও ঐতিহ্যের প্রবাহাশ্রয়ে অন্তর্নিহিত ঐক্যের ঘন-ভাবমূর্ত্তি লইয়া বাংলার বুকে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অভ্যুদয়। সঙ্ঘ তাই নবজাতিরই জন্মকেন্দ্র ও আশাকেন্দ্র।

ভারতে এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক সমাজ ও এক রাষ্ট্র—সঙ্ঘত্বের তপস্যায় সিদ্ধ হইবে। বহুর মধ্যে শুদ্ধ ও সিদ্ধ যোগসূত্রের আবিষ্কারেই ইহা দেখা দিবে।

বিপ্লবী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ সংগঠনধর্ম্মী। আমূল বিপ্লবেরই ইহা আজ সংগঠনী নীতি ও রূপায়ন। সংগঠন—জ্ঞান ও কর্ম্মে। জ্ঞানে—শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন ও প্রচার। কর্ম্মে আত্মশক্তির সৃষ্টি-প্রতিষ্ঠান। ধর্ম্মা-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নর-নারীই অন্তঃ-স্ফূর্ত্ত স্বতঃ-প্রেরণায় এই জাতিগঠন লক্ষ্যে সংহতিবদ্ধ হইতে পারেন। প্রথমেই ব্যাপকভাবে এই সংগঠন কার্য্যকরী না হইতে পারে। তাহার প্রয়োজনও নাই। জনবল ও অর্থবল চাই—অপরিহার্য্য গৌণ সহায়-রূপে। একটা অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন সমষ্টির নবজন্মের উপরই সঙ্ঘধর্ম্মী নবজাতির অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী।

বাংলায় এই সংগঠনযজ্ঞ সুরু হইয়াছে। দুঃখব্রতে আত্মপ্রাণ শুদ্ধ করিয়া বাঙালিই নবজাতিগঠনে অগ্রণী হইয়াছে। উৎসর্গের তপস্যায়, কাম-কাঞ্চন-কর্তৃত্বের ত্রিদোষ-শোধনে শুদ্ধ প্রাণ হইয়া, বাঙালি আবার অজেয় মহাশক্তির আধার হইবে। দুর্নীতির পাপমুক্ত সম্পূর্ণ এক নূতন জাতির আবির্ভাব হইবে এই বাংলায়। সে জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের সাধনায় স্বাবলম্বী হইবে। প্রতিভা, মূলধন ও শ্রমশক্তি সংযুক্ত করিয়া তাহারা সৃষ্টি করিবে অন্নবস্ত্র, সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্য, শিক্ষা ও উন্নত জীবনযাত্রার সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় উপকরণ।

বাংলার এই নবজাতি কল্পনার ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিবে না। তার জীবনচিন্তা স্বচ্ছ বিজ্ঞানময় হইবে। পরা বিদ্যা অপরাকে পূর্ণ করিবে, যেমন অপরাও পরারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া স্বীয় অপূর্ণতা দূর করিবে।

যে ভাষায় স্বরূপদ্রষ্টা ঋষিকুল দেবকৃপায় জন্মসঙ্কল্প-লাভ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছিলেন—"দেবায় জন্মনে"—সেই সংস্কৃত ভাষাই এই নবজাতির মূল মাতৃভাষা ও আদি জাতীয় ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষা হইবে।

সম্পাদকীয়

বাংলার পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য সমীক্ষা :

আজকের রবীন্দ্র-উত্তর কালের বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধি, বৈচিত্র্য ও বিকাশ ব্যঞ্জনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা অবিশ্বাস্যই মনে হইবে যে, বাংলা সাহিত্যের এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে মাত্র ১৮৭ বৎসরে—অর্থাৎ ৬৫ বৎসর হিসাবে এক পুরুষ গণনা করিলে মাত্র তিন পুরুষে। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে বাংলা হরফের মুদ্রণ-ব্যবস্থার ফলে।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হ্যালহেড সাহেব কৃত বাংলা ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ইহাই প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ। এই বাংলা হরফ তৈয়ারী করিয়া দেন চার্লস্ উইলকিন্স। শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকার প্রথম চার্লস্ উইলকিনস্ সাহেবের নিকট বাংলা হরফ তৈয়ারী করা শিখেন। শ্রীরামপুরেরই এক পাদ্রী উইলিয়ম কেরী পঞ্চানন কর্ম্মকারের বানানো বাংলা অক্ষরের সাহায্যে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেন। এই মুদ্রণ যন্ত্র পত্র-পত্রিকা-পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনে। ইহারই ফালে তালপাতা বা তুলোট কাগজে লেখা হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্কীর্ণ সীমা বিস্তারিত হইয়া ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ করে।

মোটামুটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আয়ুঃ হাজার বৎসর ধরা চলে। বাংলা ভাষার উৎসমূল একাদশ বা দ্বাদশ (মতান্তরে ৮ম-৯ম) শতাব্দীর চর্য্যাপদ ও দোহা কোষ (আংশিক অথবা সম্পূর্ণ)। হিন্দী ভাষার ও সাহিত্যের (মৈথিলী, নেপালী প্রভৃতিরও) উৎস মূলের দাবীও ইহাই। তথাপি বলা চলে, বাংলা ও বাঙালীর অফুরন্ত ভাব ও প্রাণপ্রাচুর্য্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আজিকার যে ঐশ্বর্য্য গৌরব ও বিশ্বগণ্যতা দিয়াছে তাহা তার স্বগোত্রীয় অন্য কেহ দিতে পারে নাই। বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ভাবনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এইখানেই। পদ্যময় আদি ও মধ্যযুগের অবসান হইয়া গদ্যের প্রবর্ত্তন হয় এই অষ্টাদশ শতকেরই নবযুগে। মুখে-মুখে প্রচলিত অথবা হাতে লেখা পুঁথির সীমিত গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া মঙ্গলকাব্য, ময়নাবতীর গান, নাথ-সাহিত্য প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী ও জনচিত্তে ব্যাপকতাই শুধু লাভ করে না, নূতন আবেদনও সৃষ্টি করে।

অষ্টাদশ শতকের অষ্টম দশকে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর হইতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্রমশঃ যৌবনে উপনীত হয়। এই সময় হইতেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর

আর সব ভাষা হইবে, তাহারই অনুগামিনী অথবা সহকারিণী বা উপকারিণী।

মস্তিষ্ককোষে ব্রহ্মণ্য প্রতিভা, হৃৎপদ্মে প্রেম ও পবিত্রতার শাসনবীর্য্য, স্বাধিষ্ঠানে সৃষ্টির প্রেরণা ও সেবাবিগ্রহ মূর্ত্ত শরীর—জ্ঞান, বীর্য্য, সৃষ্টি ও সেবাই এ-জাতির একাধারে চতুরঙ্গ জীবনধর্ম্ম হইবে।

অখণ্ড বাংলার এই নবোদীয়মান মহাজাতি মহা-ভারতে সনাতন-মানব-ধর্ম্মী অখণ্ড নব মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহা হইবে বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মসাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি—মানবমুক্তির গুরুতীর্থ।

গুরুতীর্থে—গুরুমন্দির নির্ম্মাণ তথা গুরুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—তাই আমাদের প্রথম মহাব্রত।

শ্রীঅরবিন্দেরই সিদ্ধ বাণী পুনরুচ্চারণ করিয়া বলিব—

"The time has come, when India can, should and will become a great, free and united nation. We have the strength and if we get the will, can create the means to be such a nation. * * We believe—fated hour of Indian unification has arrived.'

"লগ্ন আসিয়াছে—সেই নব ভারতের অভ্যুদয়-লগ্ন। শক্তিও আছে আমাদের—ইচ্ছা হইলেই সেই মুক্ত, মহান্, অখণ্ড জাতি হওয়ার উপায়ও সৃষ্টি করিয়া লইতে আমরা পারি। আমাদের বিশ্বাস—অখণ্ড ভারতের চিহ্নিত নবজন্ম-দিন আসন্ন।"

অসংখ্য ছোট বড় পত্র-পত্রিকা, পুস্তকাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা হইতেই এই সব পত্র-পত্রিকার বিস্ময়কর বিস্তার ও বৈচিত্র্য বুঝা যায়। বিগত উনিশ শতকে এই সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ চরমে উঠে। ইহার মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' মাসিক, ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ,' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রিকাকে উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায়। ইংরাজী পত্রিকা 'অমৃতবাজারের'ও জন্ম হয় এই সময়েই (১৮৬৮)। সাহিত্য, সমাজনীতি ছাড়াও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা সোমপ্রকাশের পরে অমৃতবাজারে বিশেষভাবে সুরু হয়। উনিশ শতকের অভূতপূর্ব্ব প্রতিভা বিকাশের অবকাশ মিলে এই সব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, "আমি নিজে প্রভাকরের (সংবাদ প্রভাকর) নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরগুপ্ত আমায় বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

বিগত উনিশ শতকের গগন-আলো-করা দিক্‌পালদের মধ্যে অনেকেই বাংলা পত্র-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। অপর পক্ষে তাঁদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এই বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্র-পত্রিকা।

●

গত শতকের শেষ দশকে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ও 'উদ্বোধন'-এর আবির্ভাব। 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার জন্ম বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯১৫)। এই শতাব্দীর প্রারম্ভিক ১৫ বছরে অন্ততঃ আরও পনেরখানি পত্রিকা প্রবর্ত্তকের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাসী (১৯০১), যমুনা (১৯০৯), ভারতবর্ষ (১৯১৩), নারায়ণ (১৯১৪), সবুজপত্র (১৯১৪) প্রভৃতি সাহিত্য-পত্র বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রবর্ত্তক প্রকাশের একই বৎসরে ভারতী এবং মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রকাশিত হয়। মহাপুরুষ কেন্দ্রিক এবং ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসাবে উদ্বোধন (১৮৯৮) ও আর্য্যদর্পণ (১৯০৭) বিশিষ্ট ভাবাদর্শ লইয়া বাংলার সাময়িক পত্রজগতে ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকার মান ও দান যে কত বলিষ্ঠ, কত উচ্চ ও নিরপেক্ষ হইতে পারে তার এক অনতিক্রমনীয় নজির প্রবাসী রাখিয়া গিয়াছে।

এই শতকের প্রথম দশকের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা—'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', 'ধর্ম্ম' ও 'কর্ম্মযোগিন্' (ইংরাজী ও বাংলা)। 'প্রবর্ত্তক' ইহাদেরই বিশেষ শেষোক্ত ত্রয়ীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ও ঐতিহ্যবাহী বলা চলে।

'প্রবর্ত্তকে'র পর এই শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশক বাংলা পত্র-পত্রিকার স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই কালের মধ্যে ধর্ম্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট পত্রিকার আবির্ভাব ও অবদান স্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯৩৯) সংঘটিত হওয়ার ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনীতিক ক্ষেত্রেই শুধু ওলোট-পালোট ঘটেনি, মানসিকতা ও মূল্যবোধেও বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভিক কালের বিশুদ্ধ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চ্চার প্রবৃত্তির অবসান হইয়া পত্র-পত্রিকা তথা বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় বিচিত্র ভাবাদর্শের সংঘর্ষ প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয় মহাসমর-উত্তর কালের পত্র-পত্রিকা তথা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি মতবাদের ভিত্তিতে গোষ্ঠিবদ্ধ হইয়া পড়িতে দেখা যায়।

●

বাংলা সাহিত্য ইদানীংকালে বিশেষ স্বাধীনতা-উত্তর কালে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাংলার কবিসাহিত্যিকের নাম করিতে হইলে আর করাঙ্গুলীতে কুলায় না। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে পাঠকসংখ্যাও বৃদ্ধি

পাইয়াছে। সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার যদি সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ না হয়, যদি জাতীয়তা বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে উদীয়মান জাতির মধ্যে মনোবৈকল্য আসা অনিবার্য্য। এবং এই বৈকল্য আসিয়াও গিয়াছে। সস্তা অর্থকরী অত্যধিক গল্প, উপন্যাস, সিনেমা-সাহিত্যের নির্ব্বিচার প্রচারেরই ইহা কুফল। মস্তিষ্ক নাই, বিচার-বিবেচনা নাই, শুধু আকণ্ঠ ভরিয়া সাহিত্যের গেঁজানো রসপান জাতির মধ্যে মেরুদণ্ডহীন জীবেরই প্রাদুর্ভাব ঘটাইতেছে। সাহিত্যক্ষেত্রের যুগ-প্রবৃত্তি দেখিয়া ইহা বিনা বিতর্কে বলা চলে যে, রাজনীতির দুর্নীতি ও ভাগ্যান্বেষণ আজিকার সাহিত্যক্ষেত্রে ঢুকিয়া সুস্থ জাতি-গঠনের মূল ভিত্তিকেই টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কথায় বলা যায় "নিকৃষ্ট কাব্য সাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোন সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না।" অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "গল্প, কবিতা, নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনের আনা আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়।" একদা বর্ত্তমান বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ভোগোন্মত্ত য়ুরোপীয় জীবন ও সাহিত্যের যৌন আবেদন-মুখর 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কলরবকে রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়াছিলেন, 'লালসার অসংযম ও দারিদ্রের আস্ফালন' বলিয়া। এই অসংযমী জৈবীধর্ম্মের প্রভাবেই বিগত শতকে মাইকেলের দৃষ্টিতে রাম অপেক্ষা রাবণ এবং লক্ষ্মণের চেয়েও ইন্দ্রজিৎ 'হীরো' হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সমসাময়িক কালের জনপ্রিয় সাহিত্য বলিতে যাহা বাজারে সর্ব্বাধিক আদৃত তাহাও সাহিত্যের নামে অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করার নির্ব্বিচার গণিকাবৃত্তি। সে যুগেও যে সাহিত্যে যৌন আবেদন ছিল না তা নয়, কিন্তু তা ছিল ভদ্রভাব-ভঙ্গীতে, কিছুটা শিল্পসম্মত সঙ্কোচের সহিত। বিবেক ও সমাজচেতনার কিছুটা কশাঘাত ছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তক পত্রিকার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান পত্রে উক্ত হয়: "দেশের অধিকাংশ মাসিক পত্রিকা দেশের এই সঙ্কটকালে মনোহারী দোকানের নয়নরঞ্জন দ্রব্যসম্ভারের মত চিত্তাকর্ষক গল্পগুজবেই পরিপূর্ণ। যে কয়খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে সেগুলি প্রাণহীন প্রস্তাবনা ও মন্তব্যে পরিপূর্ণ, ব্যবসা করাই ইহার ধর্ম্ম।" কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে আজকের মত উহা এতটা নগ্ন ও নির্লজ্জ ছিল না। এই যুগ-প্রবৃত্তির হেতু দেখাইতে গিয়া শনিবারের চিঠি (ফাল্গুন '৬৯) মন্তব্য করিয়াছে: "যুগের হাওয়া বদলাইয়াছে। নয়া সভ্যতার প্রবল ধাক্কায় পুরাতন সব ভাসিয়া গেল। গণিকালয়ে যাওয়া অথবা মদ্য পান আর প্রকাশ্যে করা চলে না। সামাজিক ও আর্থিক নানা অসুবিধার জন্য যাহারা উপরোক্ত দুইটি আনন্দ হইতে নিজেদের বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হইতেছেন তাঁহারা যে অবৈধ উপায়ে আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কী! এই অবৈধ পন্থাগুলির মধ্যে সিনেমা পত্রিকার রূপ লইয়া একটি বিকৃত প্রণালী তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। ছেলে, বুড়ো, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই এই পর্দ্দার আড়ালে মুখ লুকাইয়া আত্মরতিতে মাতিয়াছেন।"

●

এই হাল্‌কা সাহিত্য-পরিবেশক পত্র-পত্রিকার ব্যাপকতার মধ্যে অবনত পাঠক-মানসের প্রতিচ্ছবিও প্রতিফলিত। পাঠকসাধারণের মধ্যে সংযম ও সাধনার অভাবই ইহা সুনিশ্চিত সূচিত করে। তরল রসাস্বাদনের উত্তেজনার মধ্যেই এই নীতি-বিচ্ছিন্ন জীবন চরিতার্থতা খুঁজিয়া থাকে। যদি এই সাহিত্য রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে পাঠকমানসে বিচার-বিশ্লেষণের, জীবনের সত্যকার প্রয়োজন নির্ণয়ের শক্তি না জন্মে, তাহা হইলে জীবন-সমুন্নয়নকারী সৎসাহিত্যের ধারক ও বাহক পত্রিকা ক্রমশঃ লোপ পাইবে। বাংলা সাহিত্যে এই বিপদ সাম্প্রতিক কালে দেখা দিয়াছে। খাঁটি জাতীয় সাহিত্য-সমৃদ্ধির পথ এই হেতুই ক্রমশঃ দুর্গম হইয়া আসিতেছে। ইহাই এযুগে সাহিত্য-সাধনার বড় দুর্লক্ষণ। এইজন্যই দেখা যাইতেছে, আত্মরক্ষার খাতিরে কেবল টিকিয়া থাকিবার তাগিদেই বহু পুরানো শুদ্ধ সাহিত্যসেবী পত্রিকাকেও এই লঘু সিনেমা-সাহিত্য প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। বাংলা ও বাঙালীর এই তপস্যাবিমুখতাই

ক্রমশঃ তাকে মেরুদণ্ডহীন ও আজকের কঠোর জীবন-সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিয়া তুলিতেছে। গত শতকের সমুজ্জ্বল চিন্তা-ভাবনা ও সাধনার উত্তরাধিকার সত্ত্বেও, আজকের বাঙালীর বর্ত্তমান দুরবস্থার হেতুও এই সাহিত্যবিকৃতি। বর্ত্তমান শতকের গৌরব রবীন্দ্র-অরবিন্দ প্রমুখের সাহিত্যসাধনার সুফলও এই ব্যাপক বিকৃতির আবর্ত্তে ঘুলাইয়া গিয়াছে বলা যায়।

বাংলা সাহিত্যের এই তারল্য, এই ব্যবসাদারী মনোবিকলন ইদানীংকালে আকস্মিক সুরু হয় নাই। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সমাজ ও দেশ-কালের মধ্যে বিরাট পরিবর্ত্তন আনে। সাধারণভাবে লেখকগোষ্ঠীও এই পরিবর্ত্তনের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কিন্তু দেশকাল নিরপেক্ষও হইতে পারা যায় যদি চিরস্থির জীবন ও জাতিগঠনের কোন উচ্চমান সামনে থাকে। এমনি একটা সত্য মান চিরন্তনের ভারতবর্ষ দিয়া গিয়াছে। এই মান সাময়িকতার মোহাঞ্জন হইতে দৃষ্টিভঙ্গীকে অবিকৃত রাখে। গত শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এই অম্লান দৃষ্টিরই ফলশ্রুতি। আনন্দমঠে এই দেশজননীর কথাই তিনি বলিয়াছেন: "সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা মাতৃরূপা জন্মভূমির প্রতিকৃতির দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাক্‌নিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হায় মা, তোমায় উদ্ধার করিতে পারিলাম না, আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে'।"

বর্ত্তমান শতকের প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সহ-ধর্ম্মিনীকে লিখিত এক পত্রে এই 'মা'-এর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "প্রিয়তমা মৃণালিনী, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড়পদার্থ, কতকগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।"

ইহারও অনেক পরে স্যার আশুতোষ বাংলা ও বাংলা সাহিত্যের যে অপরূপ রূপরেখা আঁকিয়াছেন তাহা সত্যই অনবদ্য। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

"একবার ভাবিয়া দেখ, জন্ম-জন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, কত তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গলায় আসিতে পারিয়াছ। স্নিগ্ধ-শ্যামল কাননকুন্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্য-নবীন নীল নভশ্চন্দ্রাতপতলে শিশির-স্নাত দুর্ব্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুক-কোকিলের মধুর কাকলিতে যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুকাইবে কেন? বঙ্গবাসী, তোমার কিসের অভাব? তোমরা কাহার চেয়ে কম? কিসে দুর্বল? বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শ গ্রন্থ,—সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী,—রাম, যুধিষ্ঠির, শিবি, দধীচি, ভীষ্ম, অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ নায়ক,—ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা—তাহাদের আবার অভাব কিসের? অতীতের বিস্ময়পূর্ণ চিত্রশালা হইতে একবার এই দিকে তাকাও। ঐ দেখ, তোমাদের জন্য যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্লান্ত শ্রমে তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কত মনোহর পত্র-পুষ্প-পল্লবে বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণপাতী যত্নে রত্নমণ্ডপের রত্নবেদীতে আমার রত্নহার-বিভূষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, মায়ের মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তোমাদের এখন পূজায় বসিতে হইবে। রত্ন-সাহিত্যসেবিগণ, স্বভাব-চন্দনে মনঃপ্রাণ চর্চ্চিত করিয়া তোমাদের সাহিত্য-মণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও! একবার সাতকোটি বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে "মা" বলিয়া ডাক,—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌঁছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন।"

শত সহস্র বৎসরের বিপর্য্যয়ের মধ্যেও, এমন কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েও যে ভারতবর্ষ নিজেকে হারায় নাই তার একমাত্র কারণ স্যার আশুতোষ-বর্ণিত এই সমুজ্জ্বল জীবনাদর্শ। ভারতের বেদপুরাণ সাহিত্যে

এই আদর্শ চরিত্র ও জীবনাদর্শের ছবিই আঁকা হইয়াছে যাহা বংশানুক্রমে ভারতবাসীব চিত্ত প্রভাবিত করিয়াছে। সন্তানব্রতী বাঙালীর বর্ত্তমান সাহিত্য-সাধনার 'ট্রাজেডি' এই 'মা'-কে ভুলিয়া যাওয়া।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে অগ্নিবিপ্লব যুগে গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিপ্লবীরা হাসিতে হাসিতে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের গান গাহিয়া গিয়াছেন। ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামেও এই জীবনাদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের এই মহৎ জীবনাদর্শ ভাঙ্গার একটা অবাঞ্ছনীয় প্রবণতা প্রবল হইয়া দেখা দিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আমার কথা' শীর্ষকে (শনিবারেব চিঠি) লিখিয়াছেন : "রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর বিশ্বাসী মহাকবি। ভারত-সংস্কৃতি ও ভারত-ধর্ম্মের অক্ষয় অমৃতকুম্ভ জীবনব্যাপী তপস্যায় পুনরুদ্ধার করে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অমৃত কুম্ভের আধেয থেকে ঈশ্বর-মাহাত্ম্য অংশটুকু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিঃশেষে ছেঁকেফেলে দিবার চেষ্টা হয়নি বা হচ্ছে না কি ?"

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এই গতি ও প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন : "এই নেতিবাদ ও নাস্তিবাদ প্রক্রিয়া চলছিল দু'দিক থেকে। এক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা এবং দ্বিতীয় চলছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের উপাসক এবং সেই আদর্শে প্রবুদ্ধ আর একদলের দ্বারা—তাঁরা অ-মর্কসাবাদী। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবিদের এক অংশ উগ্রভাবে ভারতবর্ষের এই সনাতন জীবনাদর্শটি ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকব হয়ে উঠেছিলেন।" তিনি ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন খ্যাতনামা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের একটি রচনার উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, বাল্মিকী আশ্চর্য্যভাবে মধুসূদন অপেক্ষা অধিকতর মার্কসবাদী। কারণ, রাবণ সীতাকে হবণ করিয়া লইয়া যাইবাব পথে জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধের পব তিনি সীতাকে ধর্ষণ অর্থাৎ দেহগতভাবে ভোগ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা যে ভুল এবং বিকৃত ব্যাখ্যা তাহা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মূল রামায়ণ হইতে দেখাইয়াছেন।

স্যার আশুতোষ যে সীতা সাবিত্রীর কথা বলিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তীকালে বাংলা সাহিত্যে কিরূপ বিকৃতরূপে দেখানো হইতেছে তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায়।

পত্র পত্রিকা, গল্প উপন্যাস তথা বাংলা সাহিত্যে এই আদর্শ বিকৃতির প্রাবল্যের মুখে সত্যকার সাহিত্য-সেবী পত্রিকার অস্তিত্বই সঙ্কটময় হইয়া উঠিযাছে। ইহারই মধ্যে একটা সুলক্ষণ এই যে, বর্ত্তমান শতকের প্রতি দশকেই ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব পত্রিকা কোন না কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এবং উচ্চাদর্শমূলক মহাজীবন-কেন্দ্রিক। জনজীবনে এই সব পত্রিকার প্রভাবও কম নয়। এই জন্যই বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা জাগে যে, ভারতীয় আদর্শচ্যুৎ এই সব বিকৃত বুদ্ধিজীবি-সেবিত সাহিত্য পুণ্য ভারত-ভূমিতে স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারিবে না। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় "যে ভারত প্রাচীন, যাহা বৃহৎ, উদার, যাহা নির্ব্বাক তাহারই জয় হইবে,—আমরা যাহারা ইংরাজী বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে 'মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা।'

স্বামী বিবেকানন্দ ও অহিংসাবাদ

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন (১৮৬৩-১৯০২) ভারতাত্মার বাণীমূর্তি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যকে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে প্রচার করেছেন, সুদূর অতীতে সেই সমন্বয় একবার সত্য হয়ে উঠেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে, এ-যুগে সেই সমন্বয় আর একবার মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত ক্ষাত্রধর্মের এমন অপরূপ সামঞ্জস্য এ-যুগে আর কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায় নি।

স্বামীজী ছিলেন বীরযোদ্ধা; তিনি ছিলেন সিংহ-হৃদয়। তাঁর নিজের কথা, "আমি ধ্যান করি সিংহের হৃদয় সম্বন্ধে; তাতে আমি শক্তি পাই।" তিনি ছিলেন সংগ্রামী, লড়াই করতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি বলতেন, "হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হটে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ, কিন্তু না লড়েই হারব?" ঘুমন্ত জাতিকে তিনি ডাক দিয়ে বলেছিলেন 'জাগ বীর ঘুচায়ে স্বপন'। তাঁর অগ্নিগর্ভ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল :

পূজা তার সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।

স্বামীজির মতে ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ জাতীয় জীবনে রজোগুণের অভাব এবং তমোগুণের প্রাবল্য। দুর্বল তামসিকতার দ্বারা পরিব্যাপ্ত অনৈক্যের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থের দ্বারা তাড়িত অলস ও উদ্যমহীন দেশবাসীর কাছে স্বামীজী বজ্রনাদ করলেন 'অভিঃ'। তিনি বললেন, "বীর্য—বীর্যই সাধুত্ব, দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে উহা 'অভিঃ'; এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপাতের নিশ্চিত কারণ।" তরুণদের আহ্বান করে স্বামীজী বললেন, "যাহারা আমার উত্তরসাধক, সর্বাগ্রে তাহাদিগকে সাহসী হইতে হইবে।" স্বামীজির কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, "আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত।" এই নতুন মানুষ গড়বার জন্য তিনি যুবকদের বললেন, "তোমরা সবল হও, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে।" অর্থাৎ প্রয়োজন রজোগুণ—প্রয়োজন ক্ষাত্রবীর্য। স্বামীজির ভাষায়, "এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা—দেশে যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন……এখন দেশের লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুলতে হবে। নতুবা ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে—গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যাবে।" এই সর্বনাশা জড়ত্ব হ'তে জাতিকে মুক্ত করবার জন্য। স্বামীজী আমৃত্যু সাধনা করেছেন। জাতীয় উন্নতি ও স্বাধীনতার সর্বপ্রধান অন্তরায় হ'ল তামসিকতা। স্বামীজী তাই জাতীয় জীবনে রজোগুণের বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রজোগুণের অধিকার অর্জন না করে কেউ সত্ত্বগুণের অধিকারী হতে পারে না, মোক্ষসাধনার পথে অগ্রসর হ'তে পারে না—বিশুদ্ধ অহিংসাকে জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে পারে না। যারা সত্যি সত্যিই সত্ত্বগুণের অধিকার অর্জন করে নি, কর্মের দ্বারা যাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নি, তাদের পক্ষে অহিংসার নামে গদগদ হওয়া চরম কাপট্য ও ভণ্ডামিরই পরিচায়ক। এই ভুয়া অহিংসার উপর স্বামীজী ছিলেন খড়্গহস্ত। স্বামীজী বলেছেন, "ঐ যে দীনাহীনা ভাব—ও হ'ল ব্যারাম। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

স্বামীজী দেশবাসীর কাছে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তার মর্মকথা হলো শক্তিযোগ। তিনি দুর্বলতাকে বলেছেন পাপ, ধর্ম এবং ঈশ্বর বলতে তিনি বুঝেছেন অনন্ত শক্তি। ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি ছিলেন ব্রতবদ্ধ। জাতীয় উন্নতির জন্য ভারতবাসীর অন্তরে শক্তির উদ্বোধন করা তিনি প্রথম প্রয়োজন বলে

মনে করতেন। যুবক-ভারতের কাছে তাঁর নির্দেশ ছিল, "আমি তোমাদের মরতে দেখলেও বরং খুসী হব, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সেপাইয়ের মত আজ্ঞা-পালনে জান্ পর্যন্ত কবুল করে নির্বাণ লাভ বরং করতে হবে, তবু ভীরুতাকে আমল দেওয়া চলবে না।" স্বামীজির সাধনা ছিল বীর্যের সাধনা। তিনি স্বপ্ন দেখতেন দিগ্‌বিজয়ের। তিনি তাঁর জীবন-সাধনা দিয়ে সপ্রমাণ করেছেন, 'ভারত জেগেছে—শুধু বাঁচবার জন্য নয়, জয় করবার জন্য।' ১৮৯৭ সনে কলকাতার এক মহতী জনসভায় স্বামীজী ঘোষণা করেন, "We have to conquer the world, that we have to ! India must conquer the world and nothing less than that is my ideal. It may be very big, it may astonish many of you, but it is so. We must conquer the world or die. There is no other alternative." কিন্তু কেমন করে সম্ভব হবে এ বিজয় ? স্বামীজী বলেছেন, "মহাবলে সর্বজয়—বিশ্ববিজয়। ..... ভয় কি ? কাদের ভয় ? তোমাদের এক একজনের দাপটে ধরা কাঁপবে। Forward, Forward !···মহা বিজয়, মহালক্ষ্মী, মহাশ্রী তোমাদের। মাভৈঃ মাভৈঃ।"

যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যোদ্ধা সন্ন্যাসী, যিনি ছিলেন ক্ষাত্রবীর্যের জীবন্ত বিগ্রহ, তাঁকে কোন কোন মহল হ'তে বিশুদ্ধ অহিংসার পূজারী রূপে দাঁড় করাবার একটা সযত্ন প্রয়াস চলেছে। প্রচার করা হয়েছে, স্বামীজী অহিংস পন্থায় ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অহিংস পন্থায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আসল কথা হ'ল এই যে, স্বামীজী অহিংসপন্থী ছিলেন কিনা—ব্যবহারিক জীবনে তিনি বিশুদ্ধ অহিংসার প্রচারক ছিলেন কিনা। স্বামীজিকে অহিংসাবাদী রূপে প্রচার করার চেয়ে অধিকতর অন্যায় ও অশোভন আর কিছুই হ'তে পারে না। স্বামীজির জীবনবেদের বনিয়াদ ছিল শক্তিবাদ। এই শক্তিবাদই একদিন বাঙালীর সমগ্র সত্তাকে অগ্নিরসে উদ্বোধিত করেছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী যে তরুণদল বিপ্লব-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিল, তাদের আদর্শ ছিল স্বামীজির শক্তিবাদ। এমন কি ১৯৩০ সনের পরেও বাংলার বিপ্লবপন্থীদের মূল প্রেরণা ছিল স্বামীজির শক্তিযোগ। নেতাজীর জীবন-সাধনা স্বামীজির শক্তিবাদের জীবন্ত সাক্ষ্য।

বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্যের পন্থানুসরণ করে আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন এবং সেই সূত্র ধরে দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করা হয়েছে, অহিংসা পরম ধর্ম—অহিংসা ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে কিন্তু এই মতবাদের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। বৈদিক বা হিন্দুধর্মে অহিংসা নেই। বিশুদ্ধ অহিংসার আদর্শ আমরা পেয়েছি বৌদ্ধ-ধর্ম হ'তে। এই অহিংসাকে স্বামীজী আদৌ আমল দেননি, কারণ তাঁর মতে অহিংসা মানবজীবনের সমস্ত সত্য বহন করে না। প্রাচীন ভারত মোক্ষসাধনাকে মানবজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারত বলেছে, ধর্মসাধনাকে বাদ দিয়ে মোক্ষসাধনা সম্ভব নয়, সংসারসাধনাকে অস্বীকার করে অধ্যাত্মসাধনা হয় না—হতে পারে না। প্রাচীন ভারতে ধর্মসাধনার সহিত মোক্ষসাধনার যোগ ছিল নিবিড়। প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল চতুর্বর্গের সাধনা—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধনা। 'ধর্ম' শব্দটি স্বামীজী মীমাংসকদের মতানুসারে ব্যবহার করেছেন। ধর্ম হ'চ্ছে সেই বৃত্তি যা মানুষকে ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের জন্য দিনরাত কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং মোক্ষ-সাধনা মানুষকে শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই। একদিন ভারতবর্ষে ধর্ম ও মোক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। তখন একদিকে ছিলেন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম এবং কর্ণ; অন্যদিকে ছিলেন ব্যাসদেব, শুক এবং জনক। এরপর বৌদ্ধপ্লাবনে সামঞ্জস্য ভেঙে পড়ল, ধর্মসাধনা হ'ল বর্জিত, একান্ত হয়ে উঠল মোক্ষসাধনা। ধর্মের অভাবে—ইহনিষ্ঠা, জীবননিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠার অভাবে মানুষ হারাল বলবীর্য, এল নৈতিক পতন—ক্লৈব্যের অহিংসা দেশকে নিয়ে গেল সর্বনাশের পথে। ভারতের পতন ঘটল। যীশুখৃষ্টের প্রচারিত অহিংসাও ঠিক অনুরূপ কারণে গ্রীস

এবং রোমের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল। স্বামীজির নিজের কথা, "বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ !!!" স্বামীজী দেখিয়েছেন, বৌদ্ধধর্মের প্রবল সদাচার যখন মহা অনাচারে পরিণত হ'ল তখন সাম্যবাদের আতিশয্যে স্বগৃহে প্রবিষ্ট বিভিন্ন বর্বর জাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলে উঠেছিল। ইতিহাস বলে সেদিন অহিংসার বিকৃতি দেশের প্রতিরোধ শক্তিকে করেছিল পঙ্গু। ফলে অহিংসার নামে আত্মহারা হয়ে মানুষ দেশবৈরীকে বাধা দেয় নি, ভগবান তথাগতের নামে শত্রুসেনাকে রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিল, তাদের জানিয়েছিল আমন্ত্রণ। মোক্ষসাধনার নামে এই বিকৃত অহিংসার মোহ আজও আমরা ত্যাগ করতে পারিনি। স্বামীজী লিখেছেন, "এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই ; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। ……হিন্দুশাস্ত্র বলেছেন যে, 'ধর্মের' চেয়ে 'মোক্ষটা' অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্ম করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা ; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলেছেন তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।" তিনি মনুর বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নেই।'

বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। স্বামীজী আমাদের বলেছেন বীর্য প্রকাশ করতে, সাম-দান-ভেদ-দণ্ডনীতি প্রয়োগ করতে, পৃথিবী ভোগ করতে। কারণ তা'হলেই মানুষ হ'তে পারে ধার্মিক। ধার্মিকের লক্ষণ সদাকার্যশীলতা। এই কার্যশীলতা বা ধর্মনিষ্ঠার স্তর অতিক্রম করবার পরে মানুষ মোক্ষসাধনার পথে অগ্রসর হবার অধিকার অর্জন করতে হয় সক্ষম। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে মোক্ষ-সাধন পরধর্ম এবং পরধর্ম গ্রহণ করাকে গীতায় ভয়াবহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করচে। বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্যের অহিংসা সাধারণ মানুষ কখনও গ্রহণ করতে পারে নি—অহিংসার বিকৃতি তাদের করেছিল বীর্যহীন, তাদের করেছিল নপুংসক নীতিবাগীশ।

"বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্যের মতোই বীরের অহিংসা প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁর অতিমানবীয় অহিংসার আদর্শ মুষ্টিমেয় মানুষ ব্যতীত জনগণের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি, তাদের জীবনে গান্ধী-প্রচারিত বীরের অহিংসা রূপান্তরিত হয়েছে কাপুরুষের দুর্বল তামসিক অহিংসায়। এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকদিন পূর্বে (১৯৩৯-৪০) শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার সরকার লিখেছিলেন, "বীর্যহীন যে অহিংসা, তাহা তামসিক অহিংসা। উহারই এক নাম ক্লৈব্য। তার চেয়ে সাত্ত্বিক হিংসা শ্রেষ্ঠ। আমাদের আশঙ্কা হয়, মহাত্মা গান্ধী আজ সেই তামসিক অহিংসার বাণীই প্রচার করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন বটে যে, তিনি শক্তিমানের অহিংসার আদর্শ প্রচার করিতেছেন, কিন্তু আসলে তাঁহার প্রচারিত অহিংসা দুর্বল ও নির্বীর্যের তামসিক অহিংসা। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বীর্যবানের অহিংসা অথবা সাত্ত্বিক অহিংসার আদর্শই কীর্তন করিয়াছেন। এই সাত্ত্বিক হিংসা সমাজরক্ষা দেশরক্ষা লোক-কল্যাণার্থ যুদ্ধ করিতে ভয় পায় না।……মহাত্মা গান্ধী নানাদিক দিয়াই বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব। কিন্তু তিনি যে নিষ্ক্রিয় তামসিক অহিংসার আদর্শ প্রচার করিতেছেন, তাহা কখনই মানবজাতির কল্যাণ করিতে পারিবে না (ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, ১৯৪০, পৃঃ ১৮২-৮৩)।"

বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্যের অহিংসাবাদ মানবকল্যাণের পথকে বাধামুক্ত করতে পারে নি। সুতরাং এ যুগে মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত অহিংসাবাদকে মানবকল্যাণের ধ্রুব আদর্শ বলে প্রচার করা সম্ভব নয়। চীনা আক্রমণের পরেও গান্ধীজির ভাবশিষ্য বিনোবা ভাবে এবং জয়-প্রকাশ নারায়ণ গান্ধীজির অহিংসাবাদের আদর্শ প্রচার করে চলেছেন সত্য, কিন্তু ভারত-সরকার তথা জাতীয় নেতৃবৃন্দ বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞের মতই সোজাসুজি অহিংসাবাদ বর্জন করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, মানবসভ্যতা বিশুদ্ধ অহিংসাবাদের উপর গড়ে

উঠে নি, মানবপ্রগতিতে যুদ্ধ এবং হিংসার ভূমিকা নগণ্য নয়। এ যুগের একজন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী লিখেছেন, "The anatomy of history is furnished by war and blood shed"—ইতিহাসের মৌল উপাদান অহিংসা এবং মৈত্রী নয়, মৌল উপাদান হ'ল যুদ্ধ এবং রুধিরস্রোত। অহিংসা এবং শান্তির ললিতবাণী প্রচার করে অনেক সময়ই অন্যায় ও অবিচারকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়, কিন্তু হিংসার দ্বারা যে হিংসাকে ব্যাহত করা যায় তা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অহিংস হয়ে উঠে ততদিন পর্যন্ত বিশুদ্ধ অহিংসার অনুশীলন অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করবার প্রয়াস মানুষকে করে তোলে ক্লীব—ক্লৈব্য জাতীয় জীবনে আনে সর্বনাশ। এই সর্বনাশের গতিরোধ করে সাধারণ মানুষকে চরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার পথ প্রদর্শন করেছিল প্রাচীন ভারত। প্রাচীন ভারত মানবজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল অধ্যাত্মবাদের উপর—নীতিবাদের উপর নয়। প্রাচীন ভারতের সাধকগণ হিংসা এবং অহিংসার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হয়েছিলেন সক্ষম এবং এই সামঞ্জস্যকেই তারা মানুষের ধ্রুব কল্যাণের পথ বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই মহান আদর্শের সাক্ষ্য গীতা। আধুনিক কালে গীতার আদর্শকে আবার তুলে ধরলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠে', 'ধর্মতত্ত্বে' এবং 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে'। বঙ্কিমের পরে গীতার আদর্শকেই প্রচার করেছেন তিলক আর বিবেকানন্দ; বিবেকানন্দের প্রচারিত তত্ত্বকে জীবনের সত্য করে তুলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী, সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল প্রভৃতি।

গীতার চরম আদর্শ 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ', কিন্তু এ-আদর্শ মোক্ষকামের জন্য—যারা পরিপূর্ণ সত্যাশ্রয়ী, যারা প্রকৃত বীর তাদেরই জন্য। এ আদর্শ তো দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষের জন্য নয়। স্বামীজী লিখেছেন, "ঐ যে মিন্‌মিনে গিন্‌গিনে ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা, সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই ত ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—শেষ 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব'।"

সার্ধ শতাব্দীরও অনেক পূর্বে স্বামীজী গীতার যে বীর্যবান আদর্শ মুক্তিকামী পরাধীন জাতির কাছে তুলে ধরেছিলেন, আজ চীন প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে সেই আদর্শেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। স্বামীজী বলেছেন, "হিমালয় আমাদের পূর্বপুরুষগণের স্বপ্নভূমি। হিমালয় ভারতমাতা দেবী পার্বতীর মাতৃভূমি····· হিমালয়ের সহিত আমাদের শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিজড়িত। হিমালয়কে বাদ দিলে ভারতের ধর্মেতিহাসের অল্পই অবশিষ্ট থাকে।"

পার্বতী-পরমেশ্বর অধ্যুষিত হিমালয় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র—হিমালয় ভারতাত্মার প্রতীক। সেই হিমভূমি আজ বিধ্বস্ত, উপদ্রুত ও উৎপীড়িত; ভারতমাতা অবমানিতা—রক্তস্নাতা। তবু আমাদের ঘুম ভাঙেনি, মিথ্যা আদর্শের মুগ্ধ মায়ায় আজও আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। আজ প্রয়োজন রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা—প্রয়োজন ক্ষাত্রবীর্যের সাধনা। জাতির প্রতিরোধ শক্তিকে করে তুলতে হবে দুর্বার ও অপরাজেয়। তাই আজ জাতীয়-সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে স্বামীজির অগ্নিগর্ভ বাণী নতুন অভিধা লাভ করেছে, তাঁর কম্বুকণ্ঠের ডমরু ধ্বনি গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে আমাদের তন্দ্রালস হৃদয়ের দ্বারে করাঘাত করছে—উঠ, জাগ—"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"*

* প্রবর্ত্তক সাহিত্য-চক্রের ১২-১২-৬৪ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

সমুদ্রশাসন

অজিত সরকার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : বৈশাখ, ১৩৭২ সংখ্যার পর]

সূর্যকরোজ্জ্বল ঝক্‌মকে সুনীল পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রায় শান্ত সমুদ্রে তরণীখানি এগিয়ে চ'লেছিল তার লক্ষ্যপথে। হঠাৎ প্রধান মাস্তুলের ওপর কর্তব্যরত লোকটি এক দুর্বোধ্য ভাষায় চীৎকার কোরে উঠলো। অধ্যক্ষ ছুটে এল মাস্তুলের নীচেয়। ওদের দুজনের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় কি কথাবার্তা হোলো। অধ্যক্ষের মুখে চিন্তার ভাব ফুটে উঠলো। সে দূর দিক্-চক্রবালের দিকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো। ধীরে ধীরে দিগন্তে ফুটে উঠলো একটা ছোট্ট তরণী···আরো পরে ফুটে উঠলো আরো দুটো তরণী···পোতে বিপদ-সংকেতের ঘণ্টা ধ্বনিত হোতে থাকে। অধ্যক্ষ সকলকে নিজের নিজের হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হোতে বললো। রত্নদত্ত ও মিত্রদেব এসে দাঁড়ালো অধ্যক্ষের পাশে। সে বোললো, পরপর তিনখানি তরণী। ব্যাপার বিশেষ সুবিধার মনে হোচ্ছে না। কে জানে, হয়ত জল-দস্যুও হোতে পারে।

মিত্রদেব বোললো, কোন রাজার নৌবাহিনীও তো হোতে পারে।

হাঁ, হোতেও পারে, কিন্তু তাতেও বিশ্বাস নেই। এই অসীম সমুদ্রে আইন বা মনুষ্যত্ব বোলে কিছু নেই—সব কিছুর মাপকাঠি হোচ্ছে—বাহুবল।

অধ্যক্ষ দাঁড়টানা বন্ধ কোরতে আদেশ দিলো। মাস্তুলের ওপরের লোকটি চীৎকার কোরে আবার কি-যেন বোললো—অধ্যক্ষ জোর গলায় তার উত্তর দিলো।

রত্নদত্ত প্রশ্ন কোরলো, কি সংবাদ দিলো?

অধ্যক্ষ বোললো, তরণীগুলোর পতাকায় ত্রিশূল আঁকা দেখে মনে হয়, ওগুলো রণতরী ও সম্ভবতঃ সুবর্ণ-দ্বীপ-অধিপতি মহাপ্রতাপশালী মহারাজ শৈলেন্দ্রের।

তা হোলে আর আমাদের ভয়ের কি আছে? রত্ন-দত্ত বলে, শুনেছি মহারাজ শৈলেন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক।

তা বটে, অধ্যক্ষ বলে, তবে ঐ তরণীগুলোয় মহারাজ শৈলেন্দ্র নিশ্চয়ই নেই; আর তাঁর সমস্ত সেনাপতিরাই যে তাঁর ধর্মানুরাগী—এর কিছু নিশ্চয়তাও নেই।

এবার মিত্রদেব সায় দিয়ে বলে, তা বটে।

রত্নদত্ত কিছু চিন্তিত হোয়ে প'ড়লো। মহারাজ শৈলেন্দ্র শুধু সুবর্ণ দ্বীপের অধীশ্বর নন, আসলে তিনি ওদিককার সমস্ত দ্বীপের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ। প্রচণ্ড শক্তিশালী তাঁর নৌবহর। কম্বোজের সঙ্গে শৈলেন্দ্রের কয়েকটা ছোটখাটো নৌযুদ্ধ ইতিপূর্বেই হোয়ে গেছে। তাই কোন রকমে মহারাজ যদি জানতে পারেন—কম্বোজের পলাতক যুবরাজের সন্ধান, তবেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা!

রত্নদত্ত ও মিত্রদেব অর্ণবপোত রক্ষার সব আয়োজনের তদারক করবার অছিলায় যাত্রীদের মধ্যে মিশে যায়। দূরের ছোট ছোট তরীগুলো ধীরে ধীরে বৃহৎ রণতরীতে পরিণত হোয়ে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হোলো। অধ্যক্ষ সাংকেতিক পতাকা দ্বারা রণতরীগুলোকে অভিবাদন জানালো।

ক্রমে সেগুলো ওদের তরীর নিকটবর্তী হোলে তিনটির মধ্যে যে রণতরীটি সর্ববৃহৎ সেইটির সঙ্গে ওদের তরীটি একটা মোটা লম্বা ভারি তক্তা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হোলো; সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সুবেশী সৈনিক ওদের তরীতে বীরদর্পে নামলো। তারা অধ্যক্ষের সঙ্গে বাক্যালাপ কোরে সমস্ত তরীখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ কোরলো। তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে অধ্যক্ষকে সঙ্গে কোরে নিজেদের রণতরীতে নিয়ে গেল। অনেক পরে হাসিখুসী মনে অধ্যক্ষ ফিরে এল—সঙ্গে তার মিষ্টি জল ও প্রচুর আহার্য নিয়ে ভার-বাহী শ্রমিকগণ। প্রয়োজন নেই জেনেও রণতরীর প্রধান অধ্যক্ষ এই সব দ্রব্যসম্ভার তার শুভেচ্ছা-স্বরূপ যাত্রীদের উপঢৌকন দিয়েছে।

রত্নদত্ত ও মিত্রদেব এতক্ষণে আবার অধ্যক্ষের নিকটবর্তী হোলো। রত্নদত্ত প্রশ্ন কোরলো, বেজায় খুসী দেখছি যে?

হাঁ। অধ্যক্ষ বোললো, মহারাজ শৈলেন্দ্রের জয় হোক। তিনি নিজে যেমন ধার্মিক ও সজ্জন তাঁর লোকেরাও তেমনি সৎ ও ভদ্র।

রত্নদত্ত প্রশ্ন কোরলো, এই নৌবাহিনী কোথা থেকে আসছে?

ভারতবর্ষ থেকে। মহারাজের আমন্ত্রণে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান মহাদেবের আবাসস্থান বারাণসী থেকে একদল জ্ঞানী, গুণী, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ নিয়ে ওঁরা সুবর্ণদ্বীপে (সুমাত্রা) যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণেরা সপরিবারেই যাচ্ছেন, আর সুবর্ণদ্বীপেই তাঁরা বসবাস কোরবেন। মহারাজ স্বয়ং শৈব, তাই হিন্দুধর্মের শুদ্ধাচার রক্ষা ও প্রচারের জন্য এই ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণদের বহু সমাদরে নিজের নিজের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন।

ওরা তাকিয়ে দেখলো, রণতরীগুলোতে দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী, মুণ্ডিতমস্তক, দীর্ঘশিখ, উজ্জ্বল অথচ প্রশান্তচক্ষু ব্রাহ্মণদের। বাণিজ্যতরীর সমস্ত যাত্রী ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে নতমস্তকে প্রণাম জানালো। দূর থেকে ব্রাহ্মণেরাও হাত তুলে আশীর্বাদ কোরলেন। তরীগুলি নিজ নিজ গন্তব্যপথ-অনুসারে যাত্রা কোরলো।

আর কত দূর?

বেশি দূর আর নেই। দৃষ্টি ক্রমশঃই নিকটবর্তী হোচ্ছে। যাত্রীরা ব্যগ্র প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুণছে। কিছু দেখা যায় না। ঘন কুয়াশায় সমুদ্র ও আকাশ একেবারে এক হোয়ে গেছে। অর্ণবপোতখানি সেই রহস্যময় কুয়াশার মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে মন্থর গমনে অগ্রসর হোচ্ছিল। এক হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না।···বিপদসঙ্কুল ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, একটানা দাঁড় টানার ছপ্ ছপ্ শব্দ কোরতে কোরতে চলেছিল পোত।···হঠাৎ একটা হু হু কোরে দমকা দামাল বাতাস এল—পালের দড়িদড়া তাড়াতাড়ি শক্ত করা হোলো। মাস্তুলের ওপরের লোকটি চীৎকার কোরে বোললো, হাওয়ার দাপটে পাত্‌লা আবরণের মত কুয়াশা সরে যাচ্ছে, আর ভেসে উঠছে দূর দিক্‌চক্রবালে শ্যামল তীরভূমি। যাত্রীরা আনন্দের ধ্বনি তুললো—জয় শিবশম্ভু! হর হর মহাদেব! ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বার তাম্রলিপ্ত আর বেশি দূর নয়।···

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিক। ভারতের সুবর্ণযুগের রচয়িতা গুপ্তবংশের সম্রাট্‌গণের বিশাল সাম্রাজ্য ভগ্ন-প্রায়। শেষ সম্রাট্ বুধগুপ্তও পরলোকে। দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ সিংহাসন-রক্ষার্থ ব্যস্ত, কিন্তু তারা সাম্রাজ্য রক্ষায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। সর্বোপরি দুর্ধর্ষ হূণ-সম্রাট্ তোরমানের আক্রমণে রাজপাট ছিন্নভিন্ন। সাম্রাজ্যের অধীন সামন্ত রাজগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা কোরছে। বহিঃশত্রুর বার বার আক্রমণ ও ছোটবড় নানা রাজ্যের প্রতিনিয়ত উত্থান ও পতনের রক্তাক্ত ঘটনায় ভারত তখন রঞ্জিত।

গৌড়ের সিংহাসনে গুপ্তবংশীয় রাজা মাধবগুপ্ত অধিষ্ঠিত। পার্শ্ববর্তী রাজ্য পৌণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া) রাজ্যের উচ্চাভিলাষী রাজা স্থাণুদত্ত গুপ্তরাজকে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত কোরে স্বাধীনতা ঘোষণা-পূর্বক নিজের রাজ্যের সীমা বর্ধিত কোরতে সচেষ্ট।

পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী ভীমা খরস্রোতা করতোয়া

নদীর তীরে সুরক্ষিত ও সুরম্য মহাস্থান নগর অবস্থিত। মহারাজ স্থাণুদত্ত শুধু যে যুদ্ধ বিদ্যাতেই পারদর্শী তা নয়—তিনি শিল্প, কলা ও চারুবিদ্যার প্রগাঢ় অনুরাগী। হিন্দুধর্মের একান্ত অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। রাজধানীর অনতিদূরে বিখ্যাত সোমপুর ধর্মশালা-বিহারের (পাহাড়পুর) তিনিই পৃষ্ঠপোষক। এই সোমপুর বিহার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রসিদ্ধ ধর্মস্থানরূপে সুপরিচিত। সোমপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য বহু দূর দেশান্তর হোতে শিক্ষার্থীরা আসতো। বৌদ্ধ বিহারের নিকটেই ছিল জৈনদের বিশাল চতুর্মুখ মঠ। কথিত আছে, ভগবান বুদ্ধ ও তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দুজনেই এসেছিলেন এই সোমপুরে ধর্মপ্রচারার্থ। তাই এই স্থান মহাপুরুষদের চরণ স্পর্শে চির পবিত্র।

পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের সুউচ্চ মঠ, মন্দির, সঙ্ঘারাম আর রাজধানী মহাস্থানের সুদৃঢ় দুর্গের ওপর উড্ডীয়মান গৈরিক পতাকা রাজ্যের সমৃদ্ধি ও শৌর্যই ঘোষণা করে। প্রজারা স্বাস্থ্যবান্ ও সুদেহ—তাদের সাজসজ্জার মধ্যে সুরুচির ছাপ সুস্পষ্ট। জনসাধারণ মাথায় শোলা দিয়ে তৈরী এক প্রকার শিরোভূষণ ব্যবহার কোরতো। রৌদ্র ও বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য এই টুপি পাগড়ি অপেক্ষা অধিক উপযোগী ছিল। লোকের অবস্থানুপাতে এই টুপি নানা কারুকার্যে শোভিত হোতো। পরবর্তীকালে এই টুপিই টোপরে রূপান্তরিত হোয়ে আজও গৌড়বঙ্গে শুধু বিবাহাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

রাজধানী মহাস্থানে গগনস্পর্শী চূড়াসমন্বিত অবলোকিতেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরে সেদিন সন্ধ্যারতির সময় যখন রাজ্যের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য রূপবতী নৃত্যপটীয়সী উগ্রতারার সুললিত ছন্দের সুষমাভরা নৃত্য বিস্ফারিত নয়নে ও মুগ্ধ বিস্ময়ে রত্নদত্ত অবলোকন কোরছিল, ঠিক সেই সময় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরবর্তী সোমপুর বিহারের সর্বাধ্যক্ষ মঙ্গলভদ্রের নাতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠে মিত্রদেব মহাস্থবিরের সঙ্গে নিভৃতে কথা বোলছিল। নির্জন কক্ষ ক্ষুদ্র দীপালোকে মৃদু আলোকিত।

নীরবতা ভঙ্গ কোরে বয়োবৃদ্ধ সৌম্যদর্শন মঙ্গলভদ্র ধীর স্থির গম্ভীর স্বরে বোললেন, বৎস কোদণ্ডদেব, অত্যন্ত দুঃখের সহিত আজ আমি জানাচ্ছি যে, দীর্ঘ চার বৎসর আমার নিকট থেকেও তুমি কোন শিক্ষাই লাভ করোনি!

কোদণ্ড অস্ফুট স্বরে বলে, কেন দেব? অহিংসাই ছিল আমার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়।

তোমার সেই শিক্ষায়তনের সর্বাধ্যক্ষকে তুমি তোমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করণার্থ সাহায্যপ্রার্থী হোয়ে দুস্তর সাগরে পাড়ি দিয়ে এসেছ!

প্রভু! ধৃষ্টতা যদি ক্ষমা করেন তো একটা নিবেদন করি।

তোমার ধৃষ্টতা বহু আগেই ক্ষমা কোরেছি বোলেই তো এখনো তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ কোরছি, কোদণ্ড। তুমি তোমার বক্তব্য বলো।

কোদণ্ড বোলতে থাকে, এই ভারতবর্ষের এই বিখ্যাত সোমপুর বিহারের মহাজ্ঞানী মহাস্থবির মঙ্গলভদ্রের প্রভাব ভারতের বহু ক্ষমতাশালী রাজন্যদের ওপর আছে। আপনি আদেশ বা অনুরোধ কোরলে আমার ধারণা, অনেক রাজন্যই আমাদের সাহায্য কোরবে কম্বোজের হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধার কোরতে। আর যদি আমার মিত্র যুবরাজ ইন্দ্রনীল সেই সাহায্যে কম্বোজ অধিকার কোরতে পারে তো আমি যুবরাজ ইন্দ্রনীলের প্রতিনিধিস্বরূপ অঙ্গীকার কোরছি যে, কম্বোজ শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদেরই আবাসস্থল হবে। তারপর যদি ভগবান্ তথাগত সহায় হন তো বাহুবলে আমরা আমাদের ধর্মমত প্রচারের জন্য অভিযানে বার হবো।

মহাস্থবির মঙ্গলভদ্র বোললেন, আশা করি তোমার বক্তব্য শেষ হোয়েছে।

হাঁ, আর্যদেব।

ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠে বলেন মঙ্গলভদ্র, অন্য ধর্মের কথা আমি জানি না; তবে আমার ধর্ম, ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্মমন্ত্র ছলনা, কৌশল ও তরবারির দ্বারা প্রচার হওয়া

অপেক্ষা লুপ্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। সত্য, ন্যায় ও সৎ-এর একত্র নাম হোচ্ছে জ্ঞান বা বোধ। এই বোধ বা জ্ঞানলাভ কোরেই গৌতম 'বুদ্ধত্ব' অর্জন কোরেছিলেন। বুদ্ধত্বের সার অহিংসা—কোন প্রাণীকে কায়মনোবাক্যে হিংসা বা দ্বেষ বা ঈর্ষা না করা। সেই অহিংসার বাণী প্রচারে কৌশল ও অস্ত্রবল-প্রয়োগ! পরম কারুণিক তোমাকে করুণা করুন।...অদ্য অমাবস্যা, অদ্য রজনী বিহারেই অবস্থান কর,—প্রত্যূষেই গন্তব্যস্থানে যাত্রা কোরো।

কোদণ্ড গভীর শ্রদ্ধায় সাষ্টাঙ্গে বিহারস্বামীকে প্রণিপাত কোরলো—মঙ্গলভদ্র সস্নেহে তাকে আশীর্বাদ কোরলেন।

কোদণ্ড চিন্তান্বিত মনে সেই বিরাট্ সমচতুর্ভুজ সঙ্ঘারামের বাইরে এসে দাঁড়ালো। পার্শ্বে প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীর শিলাময় সোপানে উপবেশন কোরলো। সঙ্গে সঙ্গে অগাধ চিন্তাসমুদ্রে ডুবে গেল।...বহু আশা কোরে বহুদূর থেকে সে এসেছিল। জৈনমঠে গিয়ে কি সাহায্যপ্রার্থী হবে সে? না—তাতে কোন ফল হবে না। জৈনরা আরো নির্জীব, বেশি অহিংস। তবে? রাজধানী মহাস্থানেও আছে ভানুবিহার নামে আর এক প্রভাবশালী বৌদ্ধবিহার। সেখানকার মহাস্থবিরকে যদি সম্মত করা যায়? না—তাও হবে না, অন্য পথ ধোরতে হবে। মহারাজ স্থাণুদত্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই সমীচীন। বর্তমানে পূর্বভারতে স্থাণুদত্তই সর্বাপেক্ষা উচ্চাভিলাষী ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি। তাছাড়া মহারাজের নৌবাহিনীও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

কোদণ্ড পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, ত্রিতলবিশিষ্ট বিহারের দুই শতাধিক কক্ষ দীপালোকে উজ্জ্বল। মৃদুমধুর ধর্মালোচনা ও উপাসনার ধ্বনি ভেসে আসছে। জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোদণ্ড উঠে দাঁড়ালো। মহাস্থবিরের আদেশ মনে পড়লো—তিনি রাত্রে বিহারেই থাকতে বোলেছেন—সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি। কোদণ্ডের মুখে ক্ষণেকের জন্য মৃদু হাস্য ফুটে উঠলো। এই সামান্য অন্ধকার কি তার যাত্রাপথ রোধ কোরতে পারে? ক্ষুদ্র নদী পার হওয়ার জন্য জলে নামলো কোদণ্ড। (ক্রমশঃ)

স্থান কোথা?

নিবারণ চক্রবর্ত্তী

লিখেছি কতই গল্প হিসাব রাখিছে কেবা তার
পড়েছি ছাপান গান লুকান পাতায় পত্রিকার।
হারায়ে গিয়েছি আমি লোকারণ্যে নাই মোর নাম
সুরশিল্পী গীতিকার সুখ্যাতির পাই নাই দাম।
বন্ধুর প্রশংসা প্রীতি ফ্রেমে আঁটা আত্মপরিচিতি—
দেয়ালে শোভিত চিত্র স্বীকৃতির সঞ্চয়ন স্মৃতি।
হারায়ে গিয়েছি আমি কূলহারা সমুদ্র সুদূরে
নোঙর শিকল ছেঁড়া তরীডুবে ঘূর্ণাবর্ত ঝড়ে;
বন্দরে বন্দরে ফেরা শরণার্থী পরাস্ত নাবিক
আশ্রয় শিবির খুঁজে সঙ্গীহীন সংগ্রামী সৈনিক।
এতটুকু মৃত্তিকার দখলের স্বত্ব অধিকার—
মিলিবে না ভাগ্য যদি সেই কোন শক্তি অবতার?
পৃথিবীর পঞ্চভূতে প্রাপ্ত জন্ম রক্তমাংস প্রাণ
মৃত্যুশয্যা পাতিবার পাব কোথা শ্মশানের স্থান!

দৃশ্য পরিচয়

রাজকুমার লাহিড়ী

বিষণ্ণ সন্ধ্যায় শুনি সমুদ্রের গান—
শতক্ষিপ্ত তর্জন গর্জন
অণুপরমাণু হ'য়ে বিস্তারিত।
অবিশ্রান্ত প্রবাহেতে অনন্ত কাহিনী—
কোথায় সোনালী রোদ চিলের ডানায়
মাঠের ধানেতে মৃদু দোলা দিয়ে যায়,
আবার; ধূসর ছায়া বালির রঙেতে
ছায়া ফেলে, আঁধার ঘনায়।
দিগন্তের বেলা শেষে অতন্দ্র নয়নে
তোমারে খুঁজিয়া ফিরি বৃথা অন্বেষণে
মন ছোঁয়া দেহাতীত ক্ষণে।
অঙ্কহীন ছায়ানাট্যে দৃশ্য পরিচয়—
ঝিনুক খুঁজিয়া ফিরি সাগর বেলায়
সোনালী রোদেতে ছেয়ে আছে বেলাভূমি।

কেরল কথকতা

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

একটা বাঙলা প্রবাদ আছে, ন'মণ তেল পুড়ল কিন্তু রাধা নাচল না।

কেরলের অবস্থা হল ঠিক তাই। সারা কেরল জুড়ে কত হৈ-চৈ, কত জল্পনা-কল্পনা হল, রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা কত নরম-গরম বক্তৃতার ফুলঝুরি ছড়ালেন, কাগজে কাগজে কত লেখালেখি হল, দিল্লীর মসনদে আসীন কংগ্রেসী প্রধানদের চোখের ঘুম নষ্ট হল চিন্তায় ভাবনায়—সকলেরই মনে উদগ্র জিজ্ঞাসা কি হয়, কি হয়? এবারকার নির্বাচনে কোন দল জিনি লবে সরকারী গদি? কেরলের ভোটাররা কোনদিকে হেলবে? কংগ্রেসকে মাল্যভূষিত করবে, না কম্যুনিষ্ট দলকে? -প্রশ্নের সেখানেই ইতি নয়? দুটো দলই ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে বাম আর দক্ষিণ, কংগ্রেস আর কেরল কংগ্রেস। জয়লক্ষ্মী বামে হেলবেন, না ডানে?

গণতান্ত্রিক ফ্রেমে বাঁধান ভারত ইউনিয়ন। তার একটি অঙ্গরাজ্য কেরল। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের অনুমোদিত সংবিধানের ক্ষুরে সব কটী রাজ্যের মতন কেরল রাজ্যেরও মাথাটি মুড়ান। গণতন্ত্রসম্মত সংবিধানের পাঠ অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোন দল যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে তা আগে থেকে বলা যায় না। ভোটারদের মর্জির উপর সব নির্ভর করে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নিজের নিজের হিম্মত অনুযায়ী ভোটারদের কাছে আবেদন জানাতে পারেন। গীতার মহাপ্রবচনের মতন—ফলের আশা করো না, শুধু কাজ করে যাও, এই হবে তাঁদের আদর্শ। তারপর সবকিছু নির্ভর করবে ভোটারদের উপর। বিগত ৪ঠা মার্চ কেরলের অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ নির্বাচন (কারণ নিয়মমাফিক ভারত ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচন ১৯৬২ সালের পর আবার হবে ১৯৬৭ সালে) শেষ হয়েছে। যথাসময়ে তার ফলাফলও বেরিয়েছে। কেরলের সাধারণ মানুষদের রায়দানে ভারতের সমস্ত গণতান্ত্রিকপ্রিয় অধিবাসী চমকিত ও বিচলিত হয়েছেন—একি কোন দল ত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারল না! দলে দলে গাঁটছড়া না বাঁধলে ত কোন দলই সরকার গঠন করতে পারবে না। আর তার সম্ভাবনাও খুব ক্ষীণ। সুতরাং এত উৎসাহ-উদ্দীপনা, এত নিদ্রাহীন দিবস রাত্রির পরিশ্রম সবই তা'হলে বিফল হল। রাষ্ট্রপতির শাসন-ব্যবস্থাই তাহলে শেষ পর্যন্ত কায়েম থাকল কেরলের বুকে! সমাধিস্থ হবে সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য! এমন অবস্থায় নাস্ত পন্থাঃ—অনেক সুধীর তাই মত।

আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি হিসাবে উপরাষ্ট্রপতির এক হুকুমনামা প্রচারিত হয়েছে যে, সদ্য অনুষ্ঠিত কেরল নির্বাচন বাতিল। কেরলে আবার রাষ্ট্রপতি-শাসনই বজায় থাকবে। গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়েছে কেরলে? আর্তনাদে ভারতের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। তা হোক। যেখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভব নয়, সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন-ই শ্রেয়ঃ—সরকারী এই ব্যাখ্যায় কেউ সুখী নয়। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ কোথায়?

কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন: এ রাজ্যের ঘটনাবলীর গতি রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ সম্প্রসারণে এসে যে পরিণতি লাভ করল, কংগ্রেস তাতে সুখী হতে পারে নি। বামপন্থী কম্যুনিষ্টদের নেতা আরও তীব্র মন্তব্য করেছেন: সংসদীয় গণতন্ত্রের পূজারীরা এবার পরিষ্কার বুঝবে কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্র ধ্বংস করতে কতটা এগোতে পারেন। আমি নিশ্চিত, এরপর এই সরকারী মনোভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার হবে।

অন্যান্য নেতারাও এমনিভাবে সোচ্চারে তাঁদের আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। ছোট্ট কেরল রাজ্যটী তাই আজ উপেক্ষিত নয়—বহুল প্রচারিত ও আলোচিত একটি সংবাদ। সারা বিশ্বের সাংবাদিকরা আজ এই রাজ্যটী সম্পর্কে নানা আলোচনার অবতারণা করছেন।

কেরল—নারিকেল ছাওয়া-ঘেরা সুন্দরী কেরল!

আগে ছিল মহামহিম ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজার

রাজ্য হিসাবে বৃটিশ ভারতের একটি দেশীয় রাজ্য। বিলাস-ব্যসনে আর ইংরাজ রাজ-পুরুষদের তোষামোদ করে রাজা মহাসুখে রাজত্ব করতেন। তার খেসারত গুণত দরিদ্র অধিবাসীরা। অজস্র নারিকেল আর রবারের ছায়া-ঢাকা গ্রামগুলোতে মালয়িরা বাস করত। রবার, চা আর কফি বাগানে উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। আরব সাগরের জল তোলপাড় করে মাছ শিকার করত, নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়ে তৈরী করত নানা শিল্প-সম্ভার—আর সহ্য করত সামন্ত নৃপতিদের অত্যাচার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেমন ছিল না—তেমনি ছিল না স্বাধীনতা। শিক্ষার আলোও তাদের জীবনে সামন্তযুগীয় অন্ধকারের ভারী পর্দাখানা সরিয়ে দিতে পারে নি।

স্বাধীনোত্তর ভারতে দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত। সামন্ত-যুগীয় অনুশাসনের কাল সমাপ্ত। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলোর সীমা নির্ধারিত হয়েছে। ফলে পূর্বেকার ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য ভাঙতে ভাঙতে এবং পুনর্গঠিত হ'তে হ'তে আজকের কেরল রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আরবসাগরের নীল-জলরাশি বিধৌত মালাবার উপকূল। একদিকে সাগর আর একদিকে ধূসর পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালা। সঙ্কীর্ণ সবুজ সমতলভূমি—নারিকেল আর রবার গাছের ঘন অরণ্য পরিশোভিত কেরালা রাজ্যটী ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী রাজ্য। উত্তরে কাসার-গোড় থেকে দক্ষিণে ত্রিবান্দ্রাম পর্যন্ত প্রলম্বিত এই রাজ্যটীর দৈর্ঘ্য প্রায় চার শ' মাইল। পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূল থেকে পূর্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত প্রায় আশী মাইল বিস্তৃত। আয়তন প্রায় পনের হাজার বর্গ মাইল। আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা যথেষ্ট বেশী। বিগত লোক-গণনার হিসাবে প্রকাশ এই ছোট রাজ্যটির লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি ঊনসত্তর লক্ষ তিন হাজার সাত শ' জন। প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় এক হাজার এক শ' সাতাশজন অধিবাসী বাস করেন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির মধ্যে কেবল তাই সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ রাজ্য।

দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের মালায়ালামভাষী সমগ্র অঞ্চল, দক্ষিণ কানারা জেলার কাসার-গোড় তালুক এবং মাদ্রাজের মালাবার জেলাটী নিয়ে আজকের কেরল রাজ্যটী গঠিত হয়েছে। নূতন অঞ্চল যেমন কিছুটা সংযোজিত হয়েছে, তেমনি থতুলা, অগস্তিশ্বরম, কলকুলাম, ভিলাভানকোড এবং শেনকোট্টা (পূর্বাংশটুকু) তালুক-গুলি তামিলভাষী হওয়ায় কেরল রাজ্য থেকে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে—ও তালুকগুলো এখন প্রতিবেশী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

জনশিক্ষার দিক দিয়েও কেরল রাজ্য অন্যান্য ভারতীয় রাজ্য অপেক্ষা বেশী অগ্রগামী। শিক্ষার হার শতকরা প্রায় সাতচল্লিশজন। শিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য খুব কম।

কেরল রাজ্যটী কৃষিপ্রধান। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান, ট্যাপিওকা, নারিকেল, তৈলবীজ, মশলা, চা, রবার, কফি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উপত্যকায় গভীর রবার বন পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া চা আর কফিও প্রচুর জন্মায়। কেরলের লবঙ্গ ও দারচিনির চাষ বিখ্যাত। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯০·৯ ভাগ রবার কেরল রাজ্যে উৎপন্ন হয়। আরব সাগরের তীরবর্তী রাজ্য—সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষরা আরব সাগরে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করেন। কেরলের বনাঞ্চলে কেবল রবার নয়, নানা জাতের মূল্যবান কাঠ (Timber)-ও উৎপন্ন হয়। সেগুন, আবলুষ প্রভৃতি প্রায় ছ'শ রকমের কাঠ জন্মায়।

খনিজ সম্পদেও কেরল যথেষ্ট সম্পদশালী। ফলে নানা ধরণের শিল্প-কারখানা এখানকার শহরগুলোতে গড়ে উঠেছে। রবার, টেক্সটাইল, সার, চিনি, সিমেণ্ট, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্প। কুটির-শিল্পের মধ্যে নারিকেল ছোবড়ার (coir) জিনিষপত্র প্রধান—এই শিল্পে কেরল খুব অগ্রগামী।

প্রশাসনিক সুব্যবস্থার জন্য সমগ্র রাজ্যটিকে ন'টী জেলায় ভাগ করা হয়েছে—আলোপ্পি, ক্যানানোর, খোজিকোড, কোট্টায়াম, পালঘাট, এরনাকুলম, ত্রিচুর, ত্রিবান্দ্রাম ও কুইলন।

দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন পুনর্গঠিত কেরল

রাজ্যে পরিণত হয় বিগত ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর। সে সময় কেরল রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত ছিল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় কেরলে রাজনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হ'য়েছিল। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে পুনর্গঠিত কেরল রাজ্যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হল। কেরলে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস। তারপরই কম্যুনিষ্ট দল (তখনও কম্যুনিষ্ট দল অবিভক্ত)। দরিদ্র চাষী-মজুর এবং শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের উপর কম্যুনিষ্টদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। মার্ক্স-এঙ্গেলসের লেখা পড়েনি এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি এমন যুবকের সংখ্যা কেরলে এক সময় হাতে গোণা যেত। এ ছাড়া সোস্যালিষ্ট দল এবং আর-এস-পি দলেরও কিছু কিছু প্রভাব এখনও রয়েছে। কংগ্রেসের শঙ্কর পদ্মনাভন, কম্যুনিষ্ট দলের নাম্বুদ্রিপাদ, গোপালন—সোস্যালিষ্ট দলের থানু পিল্লাই এবং আর-এস-পি দলের শ্রীকান্তন নায়ার খুব জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। কেরলের জনসংখ্যার মধ্যে দরিদ্র ইজাভাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। স্বাভাবিকভাবে এদের উপর কম্যুনিষ্টদের প্রভাব তাই সবচেয়ে বেশী। নায়ার আর খৃষ্টানদের সংখ্যাও কম নয়। কেরলের নায়াররা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। নায়ারদের সঙ্গে ইজাভাদের তাই মিল খুব কম। একই হিন্দুধর্মের দু'টো শাখা হলেও বর্ণভেদের দরুণ রেষারেষির ভাব এদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা তেইশ ভাগ খৃষ্টান। এদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি অত্যন্ত তীব্রভাবে বর্তমান রয়েছে। তাই নায়ার এবং খৃষ্টানদের উপর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকদের খুব প্রভাব। কেরলে মুসলিমদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ষোল ভাগ। স্বাধীনোত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যথেষ্ট মুসলমান বাস করছেন। এক সময় এইসব মুসলমানদের উপর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের খুব প্রভাব ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ভারতের বুক থেকে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু কেরলে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে কেরলবাসী মুসলিমদের মধ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হল। আর জন্ম-মুহূর্ত থেকেই মুসলিম লীগ এবং তার প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতারা কেরলের সাধারণ মুসলমান জনতার উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল।

কেরল আইন সভায় মোট এক শ' তেত্রিশটা আসন। প্রথম নির্বাচনে ষাট্‌টি আসন লাভ করে কম্যুনিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। কয়েকজন নির্দলীয় সদস্যের সমর্থনে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কেরলে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হল। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে এমন কম্যুনিষ্ট দল পরিচালিত সরকার ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম কেরল রাজ্যে সংগঠিত হল। বলা যায় সারা বিশ্বে এ এক নূতন এবং বৈপ্লবিক ঘটনা। কেরল সরকার গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমতা সৃষ্টির জন্য ভূমি-সংস্কার আইন প্রবর্তন করলেন। জমির উপর জমিহীন ক্ষেতমজুরদের দাবীও স্বীকৃত করার এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেরলের সমস্ত প্রতিক্রিয়াপন্থীরা একজোট হলেন। যাঁদের জমি হারাবার আশঙ্কা সৃষ্টি হল সেইসব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রগতিকামী মানুষরাও মত পরিবর্তন করলেন। কেরলে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, পি-এস-পি এবং আর-এস-পি একজোট হলেন। দু'বছর তিন মাস ধরে কম্যুনিষ্ট দল কেরল রাজ্য শাসন করল। তারপরে কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। অরাজকতার অজুহাতে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন-ব্যবস্থা চিরকাল ধরে থাকতে পারে না। তাই ১৯৬০ সালে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।

এবার সব কটী কম্যুনিষ্ট বিরোধী দল একসঙ্গে জোট বাঁধল। মুসলিম লীগ দল সাম্প্রদায়িক দল হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনী আঁতাত গঠনের জন্য কংগ্রেস নীতিভ্রষ্ট হল। নির্বাচনে কংগ্রেস, পি-এস-পি—মুসলিম লীগ জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে হল জয়ী। সোস্যালিষ্ট দলের নায়ার নেতা থানু পিল্লাইয়ের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হল। কি এতে কেরলে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব হ্রাস হল না। শতকরা ৩৯'১৪ ভাগ ভোট লাভ করল এই দল—যদিও সেই তুলনায় আসন পেল না।

কেরলে রাজনৈতিক কোন্দলের কাল কিন্তু শেষ হল না। প্রথম মুসলিম লীগ জোট ভেঙ্গে সরে গেল। থানু পিল্লাই রাজ্যপাল হয়ে কেরল ছাড়লেন। আর-এস-পি দল জোট ছাড়ল। কংগ্রেস নেতা আর, শঙ্কর সরকার গঠন করলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেই ধীরে ধীরে বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। বিদ্রোহী কেরল কংগ্রেস সংগঠিত হল। ফলে ১৯৬৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর শঙ্কর মন্ত্রিসভার পতন ঘটল।

আবার কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন হ'বে সেই ১৯৬৭ সালে। তার এখন অনেক দেরী। ততদিন রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম রাখা নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাই আবার নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হল।

বড় দল দু'টীতে অন্তর্বিরোধ হওয়ায় কেরলের রাজনৈতিক অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিষ্ট দল দ্বিধাবিভক্ত। দলের মধ্যে আর সেই পূর্বের মতন শৃঙ্খলা ও ঐক্য নেই। কংগ্রেসও দ্বিধা-বিভক্ত।

কেরলের মানুষ যথেষ্ট শিক্ষিত ও প্রগতিকামী। কিন্তু তবু ধর্মীয় ভাব ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব এখনও তাদের মধ্যে অটুট রয়েছে। রাজনীতির চেয়েও বর্ণগত রেষারেষি তাদের মধ্যে বেশী প্রবল। এবারকার নির্বাচনেও সেই রেষারেষির পরিচয়টাই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। এতদিন দরিদ্র ইজাভাদের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। মূলতঃ তাদের ভোটের উপর নির্ভর করেই কম্যুনিষ্ট দল কেরলে নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হ'তে সাহসী হত। কংগ্রেস দল ইজাভাদের উপর প্রভাব বিস্তারের আশায় ইজাভা-নেতা শঙ্করকে সমর্থন করল। ফলে নায়ার ও খৃষ্টানরা বিদ্রোহী কেরল কংগ্রেসকে সমর্থন জানাল। কম্যুনিষ্ট দলের দু'টী শাখা আলাদাভাবে লড়াইতে নামল। বামপন্থী শিবির সোস্যালিষ্ট ও মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলাল। দক্ষিণপন্থীরা মিলিত হল আর-এস-পি দলের সঙ্গে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা গেল যে, কেরলের মানুষ একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের বিজয়ী করে নি তেমনি কোন সুস্থ ও জাতীয়বাদী রাজনৈতিক দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হ'তে সাহায্য করে নি। তার ওপর বন্দী বামপন্থী ও চীনাপ্রেমিক কম্যুনিষ্টদের নির্বাচিত করে এক মিশ্র ও অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ওদিকে দক্ষিণপন্থী সাম্যবাদীদের প্রভাব একেবারেই বিনষ্ট হয়েছে। বামপন্থী সাম্যবাদীরা লাভ করেছে মাত্র চল্লিশটী আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ছত্রিশটী। বিদ্রোহী কেরল কংগ্রেস তেইশটী এবং সোস্যালিষ্টরা তেরটি আসন পেয়েছে। মুসলিম জনসাধারণের উপর মুসলিম লীগের প্রভাব এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। লীগ লাভ করেছে ছ'টী আসন। দক্ষিণপন্থী সাম্যবাদী দল পুরাতন নীতির উপর ভিত্তি করে নির্বাচনে নেমেছিল। তারা মাত্র তিনটি আসন লাভ করেছে। পাঁচজন নির্দলীয় সদস্য লীগের সহায়তায় জয়ী হয়েছেন। তিনজন নির্দলীয় সদস্য বামপন্থী সাম্যবাদীদের সাহায্যে বিজয়ী হয়েছেন।

এমন অবস্থায় কোন একটি দলের পক্ষেই কেরলে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব নয়। সুতরাং কেরলে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়েছে। কেরলের রাজনৈতিক পটভূমির এই অবস্থা দেখে মনে হয় যে, অন্ধ সাম্প্রদায়িক আবর্তের মধ্যে কেরলের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিপন্থী সব মানুষ নিমজ্জিত রয়েছেন। সেই আবর্তের মধ্যে নাম্য মতবাদেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে—কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার কঠিন দেওয়ালে বারবার মতবাদের মানবিক আবেদন প্রতিহত হ'চ্ছে। যতদিন কেরল থেকে এই সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত বৈষম্যের এবং রেষারেষি ভাবের অবসান না ঘটবে ততদিন কেরলের বুক থেকে রাজনৈতিক জটিলতার কাল শেষ হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণ

শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

॥ ২ ॥

শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আমার আকর্ষণের ইতিহাসের পটভূমিকায় আবাল্য আমাদের বাড়ীর ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার স্থান ছিল। তা ছাড়া আমার ব্যক্তিগত স্বভাবের সহজাত প্রেরণা ও পারিপার্শ্বিক নানামুখী প্রভাব আমার মধ্যে অনেক পরিমাণেই কাজ ক'রেছে। আমার মাতৃদেবীর জীবন-কাহিনী বর্ত্তমানে অনেকের নিকট অজ্ঞাত; তবে তাঁর কীর্ত্তি পুরীধামের চক্রতীর্থে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে অক্ষুণ্ণ মহিমায় আজও বিরাজিত এবং বহু তীর্থযাত্রী সেই মন্দির ও স্বর্ণধাতুময় গৌরাঙ্গ মূর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে পারেন না। সংক্ষেপে মাতাঠাকুরাণীর জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মাতার বাল্য পার হ'তেই তিনি গৌরীপুর সংসারে গৃহিণীরূপে আবির্ভূত হন। শৈশবে পিতৃহীনা তাঁর জীবনে সংসারাশ্রম ঠিক খাপ খায়নি; সংসারে প্রবেশের পর হ'তেই নানা ব্যাধি তাঁকে জর্জ্জরিত ক'রে তুল্লো। আমাদের সাত ভাই-বোনের মধ্যে,—তিন পুত্র ও এক কন্যা তিনি হারিয়েছেন; তাঁদের মধ্যে তিনজনই এক মাসের বেশী বাঁচেন নি। যাঁরা বাঁচ্‌লেন—তাঁদের মধ্যে বড়দিদি শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীচৌধুরাণী সাহিত্যসমাজে সুপরিচিতা; তাঁর কনিষ্ঠা বসন্তবালা দেবী মায়ের সেবায় জীবন কাটিয়ে গেছেন এবং আমিই সর্ব্বকনিষ্ঠ। আধি-ব্যাধির তাড়নায় মায়ের পক্ষে গৌরীপুর সংসারের বিরাট দায়িত্বভার গ্রহণ অসম্ভব ছিল। বাবাও জোর ক'রে এতবড় সংসারের গৃহিণীপণার ভার তাঁর উপর চাপিয়ে দেন নি; কিন্তু মায়ের একটি পরম শান্তিময় আশ্রয়স্থল ছিল। সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের যিনি প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে যাঁর শুভ নাম এখনও বহুজনের স্মরণীয়, সেই বহু সাধন-সিদ্ধা সাধুমাতা ঠাকুরাণী আমার মায়ের জীবন ও সাধনার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন। সাধুমা ব'লেই আমরা তাঁকে ডাকতাম; মায়ের বাল্যকাল থেকেই সাধুমা'র সহিত তাঁর নিকটতম সাধন-সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে। সাধুমাও আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়া ছিলেন; তাঁর স্বামী ছিলেন এক বিশিষ্ট জমিদার এবং তন্ত্র-সাধনায় খ্যাতিমান পুরুষ। যৌবনে ভর্ত্তৃহীনা সাধুমা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তাঁর জীবন অনেকটা পরমহংসদেবের ভৈরবীমাতার অনুরূপ ছিল। তন্ত্র-শাস্ত্রের সকল আগম-নিগমে তিনি শুধু সুপণ্ডিতাই ছিলেন না; ক্রিয়াসিদ্ধাও ছিলেন।

মা বাল্যকাল থেকেই সাধুমা'র নিকট সকল পুরাণ, যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছিলেন; সাধনার ক্রিয়াও লাভ ক'রেছিলেন। তবে সাধুমা ও মাতা-ঠাকুরাণী উভয়েই সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে দক্ষিণাচারের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন। জীবহিংসায় মা যেরূপ অত্যন্ত কাতরা ছিলেন, সেরূপ আমিষ ভক্ষণেও তাঁর দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। বাবা স্বয়ং শাক্তকুলানুমোদিত আমিষান্ন গ্রহণ করলেও মাকে মায়ের স্বভাবের বিরোধী পথে টানতে চেষ্টা করেন নি। ফলে বাবার ও মায়ের আচারগত পার্থক্য চিরদিনই ছিল এবং এজন্য পরস্পরের মধ্যে মতান্তরের কোনও কারণ ঘটেনি। সাধুমা'র নিয়মিত উপস্থিতি ও আশীর্ব্বাদ মায়ের জীবনে রক্ষাকবচ স্থানীয় ছিল; নতুবা আমরা আমাদের যৌবনের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত মাকে জীবিত দেখ্‌তে পেতাম না। আমি মায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান এবং আমার জন্মের পর থেকেই মা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন ক'রতে থাকেন। গৌরীপুরেও নানাস্থানে বাবার সহিত এক-গৃহে বাস ক'রলেও, তিনি সন্ন্যাসিনীই ছিলেন; জপ, তপ, পুরাণ পাঠ প্রভৃতিতে তাঁর সময় অতিবাহিত হ'তো। তা ছাড়া হরিনাম সংকীর্ত্তন ও ভাগবৎ পাঠ তাঁর বিশেষ পরিতৃপ্তির কারণ হ'তো।

আমার শৈশবে যখন প্রথম বোধশক্তির উদয় হয়,

তখন আমি মাতৃক্রোড়েই লালিতপালিত হয়েছি। তখন তিনি গল্পচ্ছলে নানা পৌরাণিক কাহিনী আমাকে শোনাতেন এবং প্রত্যহ প্রাতরুত্থানের সময় দেবদেবীদের স্তুতি পাঠ করাতেন। বিদ্যারম্ভের পর ষট্‌চক্র ও যোগ সম্বন্ধেও নানা তত্ত্ব গল্পচ্ছলে শোনাতেন। আমার বাল্যকালেই স্বদেশী যুগের পূর্ণ আন্দোলন দেশে চ'লেছে; ঐ সময় মা আত্মিক চক্রে প্রায়ই ব'সতেন। মা দিদিদের সহ টেবিল চালন, প্ল্যানচেট্‌স্ ও স্বতঃলিখনে অনেকটা সময় দিতেন। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম প্রভৃতির আত্মাদের প্রায়ই আহ্বান করা হ'তো; শ্রীঅরবিন্দের প্রতি বাবার ন্যায় মা ও দিদিদেরও বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। আলীপুরে বোমার মামলার সময় শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র-কুমারের মুক্তি প্রার্থনা ক'রে মা বিশেষ পূজা ও জপের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ ক'রলেন। বারীনদা প্রভৃতি আন্দামানে নির্ব্বাসিত হ'লেন। এক বিরাট ঝটিকাবর্ত্তের পর বাংলার রাজনৈতিক গগন তখন থম্‌থমে ভাব ধরেছে। বাবা ক্রমশঃ গরমপন্থী রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের নানান গঠনমূলক কাজে মন দিয়েছেন; যদিও সরকারী শাসনতন্ত্রের শাস্তিতে নিপীড়িত গরমপন্থী যুবকগণ নানাভাবে বাবার অর্থ সাহায্য থেকে কখনও বঞ্চিত হননি। শ্রীঅরবিন্দ তখন "ধর্ম্ম ও জাতীয়তা" ও "কর্ম্মযোগীন" পত্রিকাদ্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সাধন-তত্ত্ব ও কর্ম্মযোগের সার্থকতা প্রচার ক'রছেন। বাবার সহিত শ্রীঅরবিন্দের তখনও যোগাযোগ ছিল; উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জীর পুত্র অগ্নিযুগের বিখ্যাত কর্ম্মী ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বা মিশ্রীবাবু এই যোগা-যোগের প্রধান সূত্রস্বরূপ ছিলেন। মিশ্রীবাবুই উত্তর-পাড়ার লাইব্রেরীর পাঠাগারে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সভায় পৌরোহিত্য উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উত্তরপাড়ার অভিভাষণ নামক বক্তৃতায় সনাতন ধর্ম্মের মহিমা ব্যক্ত করেন এবং আলীপুর জেলে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও বাণী দেন, তা নিঃসঙ্কোচেই শ্রীঅরবিন্দ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেন। মিশ্রীবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ও আমার প্রিয় সহাধ্যায়ী স্বর্গীয় অমরনাথ আমাকে তাঁদের রাজ-বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দ কোন ঘরে গিয়ে ব'সতেন ও কোন আসনে ব'সে ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সেবন ক'রতেন, তা দেখিয়েছেন। মিশ্রীবাবু শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁর অতিথিরূপে শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই উত্তর-পাড়ায় গমনাগমন ক'রতেন। মিশ্রীবাবুকে বাবাও বিশেষ শ্রদ্ধা ক'রতেন ও নিজের জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় তাঁকে দেখতেন। এ ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, স্বদেশী আন্দোলনে প্রবেশের পূর্ব্ব থেকেই ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে গঠিত ক'রে তুলেছিলেন। পিতা কে. ডি. ঘোষের সাহেবী সংস্কৃতিতে তাঁর আদৌ রুচি ছিল না; এমন কি মাতামহ স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর আদি ব্রাহ্মসুলভ সংস্কৃতিতে তিনি পূর্ণ তৃপ্তি পাননি। তাই পাশ্চাত্য নানা দেশের সাহিত্য, বিদ্যা ও সংস্কৃতিতে পূর্ণ অধিকার লাভের পর বরোদায় অবস্থান কালে সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, তামিল, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষা তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম ও সাধনার অন্তঃস্থলে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তাঁর আচার ব্যবহারও শাস্ত্রানুমোদিত পথই অবলম্বন ক'রে চলে। যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে তিনি হিন্দুমতে মাতা মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন; তবে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহিত জীবনেও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তাঁর আত্মীয়গণ অবশ্য অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি পোষণ ক'রলেও গোঁড়া হিন্দুয়ানীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের পক্ষপাতিত্ব কিছুতেই বুঝতে পারতেন না; শ্রীকৃষ্ণ দর্শন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। মিশ্রীবাবু ও বাবার সহিত শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধের মূল কারণ শুধু রাজনৈতিক নহে ধর্ম্মনৈতিকও বটে। শ্রীঅরবিন্দ কিভাবে চন্দননগরে তাঁর প্রিয় শিষ্য মতিলাল রায়ের মন্দিরে মাসাধিক অজ্ঞাতবাসে ছিলেন ও কিরূপে ছদ্মবেশে পণ্ডিচেরী প্রয়াণ করেন, সে ইতিহাস এখন বহু পুস্তকে প্রকাশিত হ'য়েছে। এ যুগে সেই ঘটনার সবচেয়ে

ত্রিমূর্তি

অজিত দাশ

প্রীতিলতাকে মনে পড়ে খুবই।

তার বিয়েতে নেমন্তন্ন চিঠি পাঠিয়েছিল। সে চিঠিটা এখনও আছে আমার কাছে। রেখে দিয়েছি। মনটা যখন খুব ক্লান্ত হয়, বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, নিঃসঙ্গতা বোধে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, তখন সেটা খুলে দেখি, পড়ি। তার নেমন্তন্ন চিঠি। ছাপান মামুলি চিঠি নয়। নিজের হাতে লেখা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চিঠি।

তার বিয়েতে যাইনি। ইচ্ছে করেই যাইনি। তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল, তাতে যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। বিশেষ করে একটি মেয়ের বিয়েতে।

প্রীতিলতা আমার সহপাঠিনীই ছিল। কলেজের প্রথম বার্ষিকীতে একই সঙ্গে ভর্তি হয়েছিলাম আমরা। এবং প্রথমেই নজরে পড়েছিল তাকে। ফ্রক পরে ক্লাশে আসা মেয়ে। সেকালের দিনে। চেহারা সুশ্রী, তার ওপর ওই পোশাক।

অতো ছোট্ট! খুকী!

প্রতিভা—প্রতিভা।

প্রতিভার পাশে সকলেই সমবেত হতে চায়। কিছু-দিনের মধ্যে অনেকেই ভীড় করে এলো ওর পাশে। মেয়েও আচ্ছা। অসঙ্কোচে আড্ডা দিত ওর পরিচিতদের সঙ্গে।

জানতাম না শম্ভুও পরিচিত হয়েছিল ওর সঙ্গে। সহপাঠী বন্ধু শম্ভু।

সাহিত্যচর্চা করতো সে। সেই সূত্রেই শম্ভুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

শম্ভুর সঙ্গে মিলে হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করা হোল। রচনা সংগ্রহের পালা তারপর।

শম্ভু বলল, চল একটা লেখা নিয়ে আসি।

কোত্থেকে?

প্রীতিলতার কাছ থেকে।

প্রীতিলতা?

হ্যাঁ। খুব ভালো লেখে। জীনিয়াস। কবিতা লেখে, গান গায়, নাচে, ছবি আঁকে।

বল কি?

প্রাঞ্জল বর্ণনা পাই প্রবর্ত্তক শ্রীসংঘগুরু মতিলালের "জীবন সঙ্গিনী" গ্রন্থে। বাবা মিশ্রীবাবু মারফৎ শ্রীঅরবিন্দের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য সহস্রাধিক টাকা গোপনে সাহায্য দিয়েছেন। স্বদেশীযুগের একটি বিরাট অধ্যায় এই সময় থেকেই পরিসমাপ্ত হয়। মিশ্রীবাবুর সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা থেকেই ক্রমে তাঁরই নেতৃত্বে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। মিশ্রীবাবুর সীমিত আয়ুঃ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এলো। তবে শেষ পর্য্যন্ত বাবা সর্বতোভাবে তাঁর সহযোগিতা দিয়ে এসেছেন; আচারে, ব্যবহারে মিশ্রীবাবু বাবার চেয়েও অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এবং বিলাত ফেরৎ দেশনেতারা এঁর বিদ্রূপবাণে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত হ'তো। আমি মাত্র একবার তাঁকে দেখেছি; আমার স্পষ্ট মনে আছে সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গরদের জোড় পরা তাঁর গৌরবর্ণ উজ্জ্বল আকৃতি; এঁর মুখমণ্ডল শ্মশ্রুশোভিত ছিল ও মাথার চুলও কিছু লম্বা ছিল। বাবাকে বলেন "কলের জল খাও কেন,—গঙ্গাজল খেতে পার না"? বাবা উত্তরে ব'ল্‌লেন, "গঙ্গাজলে নোংরা জিনিষ প্রায়ই ভাসে এ ক্ষেত্রে কি উপায়?" মিশ্রীবাবু প্রত্যুত্তরে ব'ল্‌লেন, "কেন, আমি মাঝগঙ্গায় নৌকো পাঠিয়ে জালা জালা জল ঘরে আনি, এবং সেই জলই ফিট্‌কিরি দিয়ে ব্যবহার করি"। এইসব ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই মিশ্রীবাবু বহুমূত্র রোগে ইহলোক ত্যাগ করলেন; তখন বাবা বিশেষ মর্ম্মাহত হন। কেননা মিশ্রীবাবুর প্রেরণা বহু বৎসর ধরে স্বদেশী ও ধর্ম্মে বাবাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে রেখেছিল। এঁরা উভয়েই পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং তাঁর সহযোগী ভারতবিখ্যাত সাধক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের উপদেশানুযায়ী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার ভিত্তি স্থাপন করেন।

(ক্রমশঃ)

হ্যাঁ। খুব কাল্‌চারড ফ্যামিলি। চল।

আমি যাব ?

তাতে কি ?

পরিচয় নেই।

তাতে কি ? পড় না একসঙ্গে ?

তাহলেও।

কিছু না। আমার সঙ্গে খুব খাতির। আমি কথা বলব। লেখা চাইব। তুমি পাশে থাকবে। তাছাড়া ওরা লোকজন খুব পছন্দ করে। ওর মা খুব আপ্যায়িত করেন। দেখবে আপন বাড়ি মনে হবে।

গেলাম।

দোতলা বাড়ি। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে শম্ভুর সঙ্গে ওপরে উঠলাম। প্রথমেই বারান্দা। বারান্দার পাশেই সুসজ্জিত ঘর। রুচিসম্মত, শিক্ষিত পরিবারের ঘরের মতোই বটে।

আমরা যেতেই একটি যুবক এসে দাঁড়াল সামনে। সিল্কের হাফসার্ট গায়ে। পিছন দিকে উল্টান মাথার চুল। শম্ভুকে নমস্কার করল। আমার দিকে তাকাল ভ্রূকুঞ্চিত করে। কোন প্রশ্ন করল না। সুসজ্জিত করে নিয়ে বসাল আমাদের। বলল, বসুন। প্রীতি চুল বাঁধছে। বসুন।

সে ভিতরে চলে গেল।

শম্ভুকে জিজ্ঞেস করলাম, কে ? দাদা ?

শম্ভু হাসল। বলল, না, প্রেমিক।

প্রেমিক ? প্রীতির ?

হ্যাঁ।

প্রীতি প্রেম করে ?

হ্যাঁ।

এই বাড়িতে বসে ? বাবা মার সামনে ?

শম্ভু বলল, বাবা এখানে থাকে না। ওর মা খুব ভালবাসেন ছেলেটিকে।

কি করে ছেলেটি ?

কিছুই করে না।

পড়ে না ?

না।

পড়া শেষ করে ফেলেছে ?

ম্যাট্রিক পাশও নয়। কিন্তু খুব বড়লোক।

বাস ?

হ্যাঁ। ওর সঙ্গেই বিয়ে হবে প্রীতিলতার।

প্রীতিলার তখনও চুল বাঁধা শেষ হয়নি। সেই অবস্থাতেই সে বেরিয়ে এলো। আমি সচকিত হলাম। সহপাঠী আমি। নিশ্চয়ই চিনবে। পরিচয় হবে।

কিন্তু প্রীতিলতা এলো ঝড়ের বেগে। নিজেই যেন ঝড়।

সে এলো। পিছনে তার সেই প্রেমিক।

প্রীতিলতা এসেই উদ্ধত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, শম্ভুবাবু, কি আরম্ভ করেছেন আপনি ? বাড়িটা কি আড্ডাখানা, যাকে খুশী বাড়িতে এনে তুললেই হোল ? একেবারে ওপরে এনে তুলবেন সকলকে এটা আমি পছন্দ করিনে। খুব আপত্তিকর। ওসব করবেন না আর। ভদ্রলোকের বাড়ির এটা।

প্রীতিলতা ফিরে গেল।

ঘরময় তখনও তার শব্দ-ঝঙ্কার বাতাসে দাপাদাপি করছে। আর সেই প্রেমিক যুবক যেন বিজয়গৌরবে বীরবেশে পাহারা দিচ্ছে তখনও আমাদের।

আমার তখন উত্থানশক্তি রহিত প্রায়। শ্রবণ বধির, বাক রুদ্ধ। শরীর ঝিম ঝিম করছে। রক্ত হিম হবার উপক্রম।

শম্ভু উঠে দাঁড়াল। কথা বলল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে-ই আমার গাইড। পথপ্রদর্শক। কাজেই কোনরকমে টেনে নিয়ে নিজেকে ওর পিছন পিছন নিচে নেমে এলাম।

পথে নেমেও কোন কথা হোল না।

খানিক দূরেই কলেজের এলাকা। ফাঁকা নির্জন মাঠ। সেখানে এসে শম্ভু আমার হাত চেপে ধরল। কেঁদে উঠল হাউ মাউ করে।

ফলে আমার যা-কিছু বক্তব্য নিজের মধ্যেই থেকে গেল।

অনেক কাঁদল শম্ভু। বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করল আমার কাছে।

বলল, ওকে আমি শোনাব। আচ্ছা করে শোনাব কিছু কথা। জব্দ করব। দেখে নেব।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, কিছু বলো না।

বলব না?

না।

কেন বলব না, নিশ্চয়ই বলব।

আস্ফালন করে উঠল শম্ভু।

বললাম, না। কিছুই না করে শুধু একটা কাজ কোর।

কি?

আর যেওনা ওর কাছে। ওর সঙ্গে সংস্পর্শ রেখোনা আর।

শম্ভু নীরব থাকল অনেকক্ষণ। তারপর এক সময়ে অভিসম্পাতের মতো বলে উঠল, ও মেয়ের কি পরিণতি আমি বুঝেছি।

কি?

বেশ্যা—বেশ্যা। ওই ছোঁড়াই ওকে ডুবাবে।

পরদিন শম্ভু শোনাল, বার বার ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল প্রীতিলতা। শেষে যেতে বাধ্য হয়েছিল। প্রীতিলতা নাকি খুব কেঁদেছে। নাকি পা চেপে ধরতে গিয়েছিল শম্ভুর। বলেছে, সারারাত ঘুম হয়নি। ওর মা বলেছেন, প্রীতি শুধু কেঁদেছে।

শম্ভু তারপর শোনাল, তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে প্রীতিলতা।

আমি বললাম, তোমার যাওয়া উচিত হয়নি।

ডাকল যে বার বার। শম্ভুর জবাব।

বললাম, যতই ডাকুক। তার ডাকের কি মূল্য আছে?

শম্ভু তারপর প্রীতিলতার কাছে যাতায়াত করত কিনা কে জানে। আমি শম্ভুর কাছ থেকে সরে এসেছিলাম। এমন বেহিসেবী সঙ্গী বিপজ্জনক। প্রকৃতপক্ষে, অতোবড অপমানটা হজম করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।

প্রীতিলতা আই. এ. পরীক্ষা দিয়েই শহর ত্যাগ করেছিল। শম্ভুও বি. এ. পরীক্ষা দেবার পর অকস্মাৎ যক্ষ্মারোগে মারা গেল।

*

সে পর্ব চুকে গিয়েছিল তার ফলে।

কে আর মনে রাখে লজ্জার কথা, বিড়ম্বনার কথা? আমারও তখন এগিয়ে যাবার কাল। সামনে সুদূর বিস্তৃত ভবিষ্যৎ।

সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম সে সব কথা। এম. এ. পাশ করে দেশে-ঘরে মাষ্টারী করছি। হঠাৎ প্রীতিলতার চিঠি।

আমার বিয়ে। শম্ভুবাবু জীবিত নেই। আপনাকে আসতেই হবে কিন্তু। জানবেন আপনিই আমার জীবন পথে, বিপদের দিনের ত্রাণকর্তা। আপনার স্মৃতিই আমাকে রক্ষা করেছে। কাজেই আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। পুরুষের ক্ষমাই অলঙ্কার, তাই না?

প্রীতিলতার চিঠি পড়ে মনে হোল, এতোকাল পরে সে আমাকে জব্দ করল। এতোদিনে প্রতিশোধ নিল সুযোগ পেয়ে।

কোন মুখে যাব প্রীতিলতার কাছে?

সে যা লিখেছে সে কি সত্যি? তার মনে অতোসব চিন্তার উদয় হয়েছে? আমার মনে ত নিবিড় অন্ধকার। কাজেই যাওয়া যায় না। যাইনি। এবং আবার ভুলতে বসেছিলাম।

সেই সময় একদিন সমরেন্দ্র আমার কাছে উপস্থিত। সে প্রায় প্রীতিলতার বিয়ের বছর তিন পর। সমরেন্দ্র তখন অধ্যাপক। দর্শনের অধ্যাপক হয়েছে। অনেককাল পরে দেখা। সহপাঠী বন্ধু।

সাদর অভ্যর্থনা জানালাম।

সে বলল, তোমার কাছে এলাম।

বেশ করেছ।

সে বলল, অনেককাল খিস্তী করতে পারিনি। সে জন্যেই চলে এলাম। দুজনে মিলে খিস্তী করব।

সে কী! সমরেন্দ্র তুমি অধ্যাপক।

আঃ জ্বালিও না আর। মারা গেলাম। অধ্যাপক—অধ্যাপক—অধ্যাপক। কলেজে সেজেগুজে ভদ্রলোক হয়ে রাঙামুলোর মতো যাও, বস আর জ্ঞান দাও। দুঃসহ। জানো, শিক্ষাদপ্তরটা একটা মানুষ-মারা কল।

মানুষকে দেবতার মতো আচরণ করতে বলে। যত ভণ্ডামি। অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী কেউ দেবতা নয়। সব মানুষ। আর খিস্তীবাজ মানুষ। কিন্তু তাকে চেপে রাখতে হয়, নাহলে চাকরী থাকবে না, বেতন মিলবে না। যাক গে, আমি এখন অধ্যাপক নই। তুমিও শিক্ষক নও। আমরা সেই সহপাঠী বন্ধু। সেই খিস্তীবাজ আমরা।

সমরেন্দ্র আরও বলল, প্রায় বছরখানেক খিস্তী করতে পারিনি। সহকর্মীদের অনেকেই আমার মতো বিপন্ন তবু সভ্যতার মুখোস খুলবার সুযোগ মেলেনি। তাই তোমার কাছে চলে এলাম। চল, আমাদের সেই জায়গায় যাওয়া যাক।

কোথায়?

নদীর ধারে। ব্রীজের তলায়।

সেই ব্রীজের পাশে বসে সমরেন্দ্র তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। খেয়াল ছিল না।

সেই সময়েই প্রীতিলতার প্রসঙ্গ উঠেছিল আবার। জানো, প্রীতিলতার বিয়ে হয়েছে। সেই প্রীতিলতা যে তোমাকে অপমান করেছিল। তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি?

হ্যাঁ।

তোমার ঠিকানাটা আমার কাছ থেকেই নিয়েছিল। বিয়েতেও গিয়েছিলাম। তোমাকে প্রত্যাশা করেছিল সে খুব। বিয়ের রাতেও তোমার কথা বলেছিল বার বার।

সমরেন্দ্রর কথা শুনে মনটা খারাপ হোল একটু। তবু বললাম, দূর, প্রীতিলতা—

না, না। সে প্রীতিলতা আর নেই। এখন একেবারে অন্যরকম। বেচারা খুব বেঁচে গেছে।

কি রকম?

সমরেন্দ্র বলল, বিয়ের আগেই সে একদিন আমার কাছে এসেছিল। হঠাৎ আমার মেস-এ এসে উপস্থিত। সোজা কলকাতা থেকে। বলল, আপনার সঙ্গে পরামর্শ আছে। সে তার জীবন-কাহিনী শোনাল।

তার মা তার জীবনটা নষ্ট করে দিতে চায়। সেই ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ার সময় এক ছোকরা ওর পাশে পাশে থাকত, সেটা ওর মার রিক্রুট। প্রীতিলতা তাকে ভালোবাসত না মোটেই। কিন্তু মা খুব আদর-যত্ন করত। ধনী সন্তান। খরচ পত্র করত। মা অভিভাবিকা। বাবা গৃহত্যাগী। মার ওপর বিরক্ত হয়ে। মার আচার আচরণের জন্যই।

মার আচার আচরণ বলতে আরও অনেক কথা বলতে হয়।

ওর মা খৃষ্টান। নার্স ছিল। বাবা ব্রাহ্মণ সন্তান। তখন ডাক্তারী পড়ত মেডিক্যাল কলেজে। দু'জনের ভিতর যোগাযোগ ঘটে যায়। তারপর প্রেম।

প্রেম যখন খুব জমজমাট, সেই সময় ওর মা অকস্মাৎ ওর বাবাকে বলে, টাকা দাও।

টাকা?

হ্যাঁ টাকা।

কি হবে?

আমি গর্ভবতী। ওটা নষ্ট করতে হবে।

কেন?

তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? তুমি আমাকে নিয়ে খেলা করছ। ডাক্তারী পড়তে এসে অনেক ছেলে যা করে। আমি জানি তুমিও তাই করবে। কখনই আমাকে বিয়ে করবে না। আর আমি নার্স। পেটের দায়ে আমাকে এ চাকরী করতেই হবে। কিন্তু এ সন্তানের জন্ম দিলে আমার সর্বনাশ হবে। শেষে হয়তো যার তার কাছে বিলিয়ে দিতে হবে আমাকে। তার চেয়ে তুমি টাকা দাও। আমাকে বাঁচাও। এইটুকু উপকার কর।

ওর বাবা তখন প্রকৃতপক্ষে নাবালক। জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। প্রেমিকাকে নিয়ে কতো স্বপ্নই দেখেছে। ওর বাবা বলল, টাকা কি হবে? আমি তোমাকে বিয়ে করব। তোমার গর্ভে যে সন্তান সে আমাদের প্রত্যাশার প্রথম ফসল।

এরপর ওর বাবা সংবাদটি বন্ধুদের মধ্যে এমনভাবে প্রচার করল আর তাদের কাছে সাহায্য চাইল যে একদিন সুষ্ঠুভাবেই বিয়ে হয়ে গেল দু'জনের। কিন্তু

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই ওর বাবা অবাক। স্ত্রী গর্ভবতী নয়।

ওর বাবা বুঝল, প্রণয়িনী অবিশ্বাস করেছিল তাকে। তাই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল নারী।

বাবার মন ভেঙে গেল। অপাত্রে আত্মসমর্পণ হয়ে গেছে। তারপর প্রীতিলতার জন্মের পর আরও নতুন খবর জানল ওর বাবা। হৃদয়-বিদারক সংবাদ।

প্রীতিলতার মা গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল আসলে। ওর বাবার সঙ্গে তখন প্রেম জমজমাট, তখন এক ধনী সন্তানের প্রতি নজর গিয়েছিল। তার সঙ্গেই জীবন জড়িয়ে নেবার ইচ্ছা। তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রীতিলতার বাবা যদি গণ্ডগোল করে? ওর বন্ধুরা জটলা পাকায়? তাই ছলনার আশ্রয় গ্রহণ। গর্ভের কথায় যদি ভয় পায় প্রণয়ী—নিশ্চয়ই ভয় পাবে সন্ততরুণ অনভিজ্ঞ ছেলে। এবং টাকা দিয়ে পলাতক হবে। তখন সে চলে যাবে তার আপন পথে, নির্বিঘ্নে।

প্রীতিলতার বাবা ক্ষুব্ধ।

এই মেয়ের জন্যেই সে আত্মীয় স্বজন ধর্ম সব ত্যাগ করেছে?

ওর বাবার মন ভাঙলো। নিজে ডিস্পেপ্‌সারী উঠিয়ে দিয়ে সৈন্যবিভাগে যোগ দিল। সেই থেকে প্রীতিলতার বাবা প্রবাসী। মাঝে মাঝে আসে, প্রীতিলতাকে স্নেহ করে। আবার চলে যায়।

প্রীতিলতা বলল, মা সেই অতৃপ্ত আত্মা। সেই ধনী পুরুষের প্রতি লোভ, ক্ষুধা। মা-ই সেই ধনী ছোকরাকে জুটিয়েছিল। সেই ছোকরাই সেদিন ওর মাকে বলেছিল, শত্রুটা আবার কাকে জুটিয়ে এনেছে। মা চেঁচিয়ে উঠেছিল, বাড়িটা হোল কি? আমরা ভিখিরী না বাঈজী?

প্রীতিলতা তাই ক্ষুব্ধ হয়ে সেদিন তোমাকে অপমান করেছিল। এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সে ছোকরাকে বিতাড়িত করেছিল বাড়ি থেকে।

কিন্তু মা। তার মার সেই ক্ষুধা, অতৃপ্তি। মার বেদনা, নিজের জীবনে সে পরাজিতা। অপাত্রে নিজেকে দান করে বসেছে। মেয়ের মাধ্যমে সেই ক্ষতিপূরণ চায় মা!

যাচাই করতে হবে। খুব ভালো করে যাচাই করতে হবে। হুট করে যাকে তাকে মন দেওয়া আর জীবনে গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। জীবনে একবারই সগৌরবে কাউকে গ্রহণ করার সুযোগ মিলবে। কাজেই সাবধান। ধনী, রূপবান, স্বাস্থ্যবান, মনের মতো যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ কোন কথা দেওয়া নয় কাউকে, কিছুতেই। তুই কাউকে কথা দিসনে প্রীতি। এ জগতে শয়তানের সংখ্যাই বেশি। আমার জীবনটা শেষ করে দিল।

ওর মা অনেক ছেলেকে জুটিয়ে এনেছে বাড়িতে। মার ক্ষমতাও আছে এ পথে।

সর্বশেষ এনেছে এক ধনী হোটেলওয়ালার ছেলেকে। ছ্যাবলা, মন্তপ, রুচিহীন এক যুবক। ওদের অনেক টাকা। বাবার একমাত্র সন্তান। মদ খায় খাক। জগতে বড় বড় মানুষ মদ খায়। রুচিহীনতা? ও কিছু নয়। স্ত্রীর কাজই হবেই স্বামীকে বশে আনা। নিজের মনের মতো করে চালিত করা।

এই সময়েই পালিয়ে এসেছিল প্রীতিলতা আমার কাছে।

আমাকে সাহায্য করুন সমরেন্দ্রবাবু।

কি সাহায্য করব? কি ভাবে?

প্রীতিলতা বলল, আমি মার পরামর্শ মানতে পারি না। আমি ও ছেলেকে বিয়ে করতে পারব না। মার সংগৃহীত কোন ছেলেকেই বিয়ে করতে পারব না। আমি ধন চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, যশ-খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই চাই না। আমি একটি মানুষ চাই। একজন পুরুষ মানুষ। বাবার মতো। সে আমার অভিভাবক হবে, বন্ধু হবে। শান্ত নিরুপদ্রব জীবন। শান্তির সংসার চাই একটা। সে অখ্যাত অবজ্ঞাত হোক, উচ্চশিক্ষিত না হোক, কিন্তু হৃদয়বান হয় যেন। যদি তেমন উপায়ক্ষম না হোক। আমি ত গ্রাজুয়েট। আমার পুরুষকে প্রতিপালন করতে পারব। আমি

বাঁচতে চাই। একটু শান্তি চাই। আমি ক্লান্ত। খুব ক্লান্ত।

মনে হোল, সে কি আমাকেই চায়? বললাম, আপনার বক্তব্য মতো মনে হয় একটা সাধারণ কাউকে চাচ্ছেন। তেমন একজন মিলবে। কতোজন ছুটে আসবে। আপনার মতো মেয়ে—

না, না। প্রীতিলতা আঁৎকে উঠল।

আমি কাঙাল চাই না। কোন কাঙালকে সইতে পারব না, বইতে পারব না। দেশে বোধ হয় কাঙালই বেশি, না সমরেন্দ্রবাবু? ধনী জ্ঞানী মানী শিক্ষিত—কতোজনকে দেখলাম মার দৌলতে। সবই কাঙালের দল। ওদের সহ্য করা যায় না।

এরপর খানিক নীরব থেকে সে বলল, একটা কথা বলব?

আমি চকিত হলাম।

সে বলল, সুখেনবাবু কেমন আছেন জানেন?

আমি হতাশ।

বললাম, ভালোই আছে।

কোথায়?

কেষ্টনগরে।

কি করছেন?

মাষ্টারী।

বিয়ে থা?

না।

প্রীতিলতা নীরব।

বললাম, কেন?

প্রীতিলতা উজ্জ্বল ভঙ্গীতে, গম্ভীর স্বরে বলল, একটি মানুষ। জীবনে একটি মানুষই দেখেছি। তিনি আমাকে কি ভাবেই অপমানিত করতে পারতেন। কিম্বা আমি যখন ডেকে পাঠিয়েছিলাম অন্য কেউ হলে ছুটে আসতেন। কিছুতেই ভুলতে পারি না তাঁকে।

প্রীতিলতা নত মস্তকে টেবিলের ওপর নখ খুঁটতে লাগল।

ওর মনোভাব বুঝলাম।

বললাম, সুখেনকে ভালোবাসেন? ওকে বিয়ে করতে চান?

প্রীতিলতা তাকাল। ওর চোখে কাঙালের দৃষ্টি। যে কাঙালকে সইতে পারে না সে নিজে কতো কাঙাল।

বললাম, কিন্তু সুখেন যদি সম্মত না হয়?

যতদূর জানি সে সম্মত হবে না।

কেন?

সে বিয়ে করবে না।

কেন?

হয়তো কোন দুঃখ আছে ওর মনে। হয়তো মেয়েদের প্রতি বিতৃষ্ণা।

কারণ?

হয়তো কোন ক্ষোভ। কোন দুর্ঘটনা।

আপনি জানেন না?

না। ঠিক জানি না।

প্রীতিলতা খানিক তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর বলে উঠল, শম্ভুবাবুর মৃত্যুটা খুব দুঃখজনক, না? সুখেনবাবুর খুব বন্ধু ছিলেন। আমি তোমার ঠিকানা দিলাম প্রীতিলতাকে। সে উঠে পড়ল।

বিদায় দেবার সময় শেষবারের মতো লোভে লোভে বললাম, কোন সঙ্কোচ করবেন না। প্রয়োজন হলেই খবর দেবেন।

ধন্যবাদ। সে চলে গেল।

কিছুদিন পরেই পেলাম তার নেমন্তন্ন চিঠি। গিয়ে দেখলাম, মার কাছ থেকে পালিয়ে নতুন বাসা করেছে সে। ওর বাবা এসেছে মেয়ের কাছে। ওর বিয়ে। পাত্র নিজেরই পছন্দ করা। কোন গ্রামাঞ্চলের ইস্কুল মাস্টার। বিয়ের পর ওরা গ্রামেই ফিরে যাবে।

পরে খোঁজ নিয়েছিলাম। সত্যিই গ্রামে গেছে। ছেলেমেয়ে হয়েছে। সংসারধর্ম করছে। ওর মা শেষ পর্যন্ত ধনী হোটেলওয়ালার ছেলেকে নিজেই গ্রাস করেছে। বিয়ে করেনি, কিন্তু সন্তানধারণ করেছে।

আর ওর বাবা কোথায় যেন আশ্রম খুলে বসেছেন।

সমরেন্দ্র সে রাত্রে এরপর আর কোন খিস্তী করতে পারেনি।

২

গত বৈশাখ সংখ্যা প্রবর্ত্তকে রাজবন্দী শচীন্দ্রের (সর্দার) যে পত্রখানি ('প্রবাসী' হইতে উদ্ধৃত) প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে তদানীন্তন Bengal Government-এর Political Department হইতে একখানি Communique বাহির করা হইয়াছিল। প্রবর্ত্তকে উহা অবিকল মুদ্রিত হয়। ২য় বর্ষ প্রবর্ত্তক হইতে সেই 'কমিউনিক'খানি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা বিপ্লব যুগের ইতিহাস রচনার সহায়ক হইবে। 'কমিউনিক'-এর বয়ান ছিল :

"The attention of Government has been drawn to certain news paper comments relative to the suicide of one Sachindra Chandra Das Gupta, which convey the impression. that the boy was a detenu under the Defence of India Act, and that he took his own life in consequence of the perescution to which he was subjected by the police of the Rungpure district. Investigation has accordingly been made into the facts. The deceased was arrested under the Defence of India Act on the 24th August 1916 and in September 1916 was interned in his father's house. He was released from all restraint under the Act on the 19th. December 1916, i.e. nine months before his death, when his father gave a gurantee of good behaviour. No police surveillance was ordered, no surveillance either by the local police or by the special police. Moreover this fact is admitted by a near relation ; the father of the deceased has no personal knowledge, of any shadowing, while an incident of this kind alleged by a brother has been shown to be with out foundation. Enquiry has also failed to establish any case of police persecution. It is correct that the boy was not allowed to study in the Rangpur College ; the order to that effect was passed by the local educational authorities after consulting Government, and was based on information showing that, in the interests of discipline, it was inexpedient that the deceased should enter the college."

অগ্নি-বিপ্লবের এক মধ্যাহ্ন মুহূর্ত্তে "সদা" ওরফে শচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত আত্মহত্যা করিয়া বৃটিশ-শাসনের নির্ম্মমতার তীব্র এবং প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই জাতীয় আত্মত্যাগের নজির বিরল নহে। এইরূপ আত্মত্যাগের চরম নজির স্বরূপ ১৩৩৬

সমরেন্দ্র এর পর জীবনের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরাজ-দুহিতাকে বিয়ে করেছে। খ্যাতিমান অধ্যাপক হয়েছে ; এখন সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যস্ত মানুষ।

তবু মাঝে মাঝে লেখে, দেশে ফিরতে ইচ্ছা। একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। একটু শান্তি—কি বল ? জীবনের সেই বোধ হয় পরম কাম্য। প্রীতিলতা যেমন চেয়েছিল, তাই না ? তুমিই ভালো আছ। বিজয়ী।

প্রীতিলতা ? সেও বোধ হয় ব্যস্ত। বেঁচে আছে ? তাই বা কে জানে ?

আমি তার চিঠিটাই পড়ি।

যখন ক্লান্ত, বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গতা বোধের মুহূর্তগুলো বিপন্ন করে তোলে, তখন তার সেই বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠিটাই পড়ি।

মনে হয় সে-ই বিজয়িনী।

কিম্বা হয়তো তা নয়। আমরা তিনজনই সমান। তিনটি মানুষ। ত্রিমূর্তি। মানুষের জীবন যা হয়ে থাকে তা-ই !

(১৯২৯ ইং) সালে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে অনশনে মৃত্যু বরণ দ্বারা যতীন দাস নিজেকে পূর্ণাহুতি দেন। এই সকল আত্মহত্যা সেই যুগে দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপক চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল। শচীন দাশগুপ্তের আত্মাহুতির সময়ে প্রবর্ত্তক পত্রিকার তখন সবেমাত্র ২য় বর্ষ চলিতেছিল। সে ছিল ১৩২৩ সালের কথা। প্রবর্ত্তকের ২য় বর্ষের ১৯শ সংখ্যায় 'সদা'র আত্মহত্যার পূর্ব্বে তাঁহার পিতার নিকট লিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২১শ সংখ্যায় এই সম্পর্কিত মন্তব্য প্রকাশ পায়। সমসাময়িককালে তাহাব সঠিক মূল্যায়ন না হইলেও, পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তকের মন্তব্যের দূরদর্শিতা প্রমাণিত হইয়াছে।

পাঠক সুধীজন যাহাতে আমাদের কথাব সত্যাসত্য সহজেই যাচাই করিতে পারেন এবং প্রবর্ত্তকের তৎকালীন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে পারেন, তজ্জন্য এখানে সমগ্র মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিলাম। প্রবর্ত্তকের মন্তব্যের শিরোনামা ছিল 'সদার আত্মহত্যা'।

"শচীন্দ্র চন্দ্র আত্মহত্যা করিয়াছে। জ্যোতিষচন্দ্রের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে—তিনি বহরমপুরে। আর যাহারা আত্মহত্যা করে নাই বা পাগল হইয়া যায় নাই অন্তরীণ অথবা কারাবাসের ফলে তাহাদের কেহই যে বিদ্যাবুদ্ধি হারাইয়া, মনের তেজ, শরীরের বল খোয়াইয়া, জড়ভরত বা পশুবৎ হইয়া পড়িবে না সেটাও খুবই অস্বাভাবিক। দেশের আশাস্থল যাহারা সেই যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এইরকম একটা মড়কের প্রাদুর্ভাব হইলে দেশেব যে কি ক্ষতি তাহা ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি। দেশের যুবকহৃদয়েই দেশের প্রাণ, দেশের ভবিষ্যৎ, সেখানে যদি এতটুকু পক্ষাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাই তবে অজ্ঞাতসারেই আমাদের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে চায়।

"কারণ আমরা বিশ্বাস করি না, এই যে আত্মহত্যাদি ঘটিতেছে তাহা এখানে ওখানে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধশূন্য দুই একটি ঘটনা মাত্র, শুধু একটা ব্যক্তিগত বিকৃত মেজাজের ফল। আমরা মনে করি, এ সকল ঘটনা একটী সাধারণ সুরের সাথে গাঁথা—দুই একটি বিচ্ছিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র নয়। ভগবান না করুন, দেশের অবস্থা, যুবক সকলের হৃদয়ের ভাব যদি বর্ত্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকে তবে এইটিই যে সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম হইয়া উঠিতে পারে তাহাও একেবারে অসম্ভব কিছুই নয়। তাই আমরা সকলকেই আহ্বান করিতেছি, যুবকদের অভিভাবক, দেশের নেতা ও গবর্ণমেণ্ট সকলকেই এই বিষয়টি বিশেষরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

"আমরা দেখিতেছি বাংলার যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি সদভিলাষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মপরতার এমন কি নিজের সংসাবখানি লইয়া যে গণ্ডী তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দশের, দেশের, বিশ্বের উদার কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে ছড়াইয়া দিবার অধীর আবেগ। হইতে পারে সেজন্য সৎপথটি ধবিতে পারে নাই, বিপথের কুপথের "মার" অনুচরবৃন্দ তাহাদের কাহাকেও ভুলাইয়া লইতে পারিয়াছে। কিন্তু যাহারা এইরূপে পথখানি ভুলিয়াছে তাহারা সেরূপ বোধ করে না। আর এমন অনেক আছে—আর ইহাদের সংখ্যাই বেশী বলিয়া আমরা মনে করি—যাহারা বাস্তবিকই সৎপন্থাটি ধরিতে পারিয়াছে; যাহারা চাহিতেছে মহত্তর উদারতর জীবন কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার পথে যাইয়া পড়ে নাই। তাই যখন তাহারা দেখিতেছে, জীবনের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ, তাহাদের প্রাণের খাদ্য মিলিতেছে না; কর্ম্মের উদার ক্ষেত্র জুটিতেছে না, একে একে আকাশকুসুম সব ঝরিয়া পড়িতেছে, ব্যর্থতার যবনিকা আসিয়া তাহাদের সব গ্রাস করিতেছে তখন নিরাশায় তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কেহ আত্মহত্যা করিয়া মুক্ত জীবন পাইতে চাহিয়াছে, কেহ পাগল হইয়া ব্যর্থতার বৃশ্চিকজ্বালা এড়াইয়াছে, আর কেহ পশু বা পাথর হইয়া শান্তি পাইয়াছে।

"তাই আজ যাহারা অন্তরীণে, কারাগারে, দ্বীপান্তরে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কর্ম্মপিয়াসা চরিতার্থের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত করিয়া —দেশের যুবকমণ্ডলীকে পিষিয়া নয়, ছাড়িয়া দিয়া, সৎপথে সৎকার্য্যে মহত্তর জীবনে চলিবার পূর্ণ অবকাশ

দিয়াই যে রাষ্ট্রের সমাজের দেশের মঙ্গল কিনা তাহা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ দেশনেতৃগণ অনুধ্যান করিয়া দেখিবেন। আমাদের সে সম্বন্ধে কিছুই বলিবাব নাই। গভর্ণমেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য, নেতাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা বুঝিবেন। বিষয়টি আমরা অন্যদিক দিয়া দেখিব এবং দেশের যুবকমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া কয়েকটি কথা বলিব।

"ব্যক্তির জীবনে যেমন সাধনা আছে, সমষ্টির জীবনেও তেমনি সাধনা আছে। ব্যক্তির সাধনায় যেমন উত্থান পতন প্রত্যবায় আছে, সমষ্টির সাধনাতেও তেমনি উত্থান পতন প্রত্যবায় আছে, ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর সমষ্টি জীবন একটা বিরাট কঠোর সাধনার মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। শচীন্দ্র তাহার পিতার নিকট যে পত্র লিখিয়াছে তাহাতে নব্য বাংলার অন্তরের সমস্ত চিত্রখানি প্রতিফলিত হইয়াছে। শচীন্দ্র যাহা লিখিয়াছে তাহা শচীন্দ্রের কথা নয়, তাহা আজকার নব্যবাংলার প্রাণের কথা; সাধনার যে সঙ্কটস্থলে সে দাঁড়াইয়াছে তাহারই যথাযথ প্রতিকৃতি। সে কথাটি কি? তাহা হইতেছে রাজসিক আবেগের ব্যর্থতা, ঘোরতমের মধ্যে অশুদ্ধ রজের পরিনির্ব্বাণ। বাংলা রাজসিক প্রবৃত্তি লইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কর্ম্মস্পৃহা জলিয়া উঠিয়াছিল এই রজঃশক্তির তীব্ররাগে। সে রাজসিক প্রবৃত্তিক্রমে হইয়া উঠিল আসুরিক। এই আসুরী উত্তেজনা পরিশেষে কিরূপে আপনাকে ব্যর্থ অসমর্থ নিরাশ বোধ করিতেছে তাহাই দেখাইতেছে শচীন্দ্রচন্দ্র। অশুদ্ধ রজঃশক্তির পরিণতি চিরদিনই তমঃ, নিধন, লয়। অশুদ্ধ রাজোশক্তির পীঠস্থান ইয়োরোপ আজ এই কথাই সাক্ষ্য দিতেছে, শচীন্দ্রচন্দ্রও বাংলার অশুদ্ধ রজের ভারখানির নীচে পিষিয়া গিয়াছে। রাজসিক আবেগের ধর্ম্ম এই যে, সে চায় বাহিরের একটা কিছু ধরিয়া চলিতে। আর বাহিরের এই আশ্রয়স্থলটি সে যদি কোনরূপে হারাইয়া ফেলে তবে সে আর থৈ পায় না, তাহার সব শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হয়—আর সে দাঁড়াইতে পারে না। শচীন্দ্র তাহার পিতাকে মণ্টেগু সাহেবের উপর কোন ভরসা করিতে নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু সে নিজেও আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে অতিমাত্র বাহিরেরই জিনিষের উপর। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তার মেলামেশা নিষেধ, লাইব্রেরীতে যাওয়া নিষেধ, কলেজে পড়া নিষেধ, লোকের চক্ষে সে অকর্ম্মণ্য, তাই না তার জীবন দুর্ব্বহ? কিন্তু এ সকলই যে বাহিরের! বলি না এ সকলের কোন দরকার নাই, মহৎ জীবনের সাধক যে তাহাকে এসব উপকরণ ত্যাগই করিতে হইবে, তুচ্ছই করিতে হইবে। মোটেও নয়। কিন্তু এসব সব নয়, এসব প্রধান নয়। "আত্মানং বিদ্ধি"। শচীন্দ্র তুমি বিত্তের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ, কিন্তু মৈত্রেয়ীর মত বলিতে পার নাই, "যে সকল জিনিষ আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারে না সে সব লইয়া আমি কি করিব?" কি আসে যায় বিশ্ব হইতে তুমি যদি বাহ্যতঃ পৃথক হইয়া পড়। আলো আকাশ বাতাস সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যরাজি যদি তোমার চোখে লুপ্ত হইয়া যায়, পৃথিবীর গভীর গহ্বরে তুমি সমাধিস্থ হও? জানিও সকল ঐশ্বর্য্য, সকল শক্তি, সকল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তোমার অন্তরেই। সেই প্রতিষ্ঠা সেই উৎস খুঁজিয়া পাও। তারপর দেখিবে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই, সবই চলিয়াছে সার্থকতার দিকে। আত্মার মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত হও তবে দেখিবে সব বন্ধন তোমার টুটিয়া গিয়াছে, অন্তরীণের বন্ধন ত তুচ্ছ স্থল—তবুও সময় আসিলে সে বন্ধনাটিও কাটিয়া তোমার ভাগবত কর্ম্মশক্তি বাহিরে ছুটিয়াছে।

"নব্য বাংলা চাহিয়াছিল শক্তি, চাহিয়াছিল বীর্য্য, চাহিয়াছিল কর্ম্মপ্রেরণা। সে শক্তি, সে বীর্য্য. সে কর্ম্ম-প্রেরণা অবতীর্ণ হইয়াছে। অবতীর্ণ হইয়াছে কিন্তু পুরাতন কত শতাব্দীর সংস্কারজীর্ণ আধারে। তাই দেখিতেছি অনেক স্থলে আধারটি সে শক্তির ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাংলার যুবকমণ্ডলীকে এখন শুদ্ধসত্ত্ব হইতে হইবে, তাহার আধারের চাই ধারণ সামর্থ্য। শুধু ব্যাপ্ত নয়, বিক্ষিপ্ত করিয়া নয়, নিজের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা পাইতে হইবে। আধার হইবে "আপূর্য্যমানং অচলপ্রতিষ্ঠং"। তবেই সে শক্তি সুপথে ধীর স্থির অটুট প্রেরণায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। অন্ধ-ভাবে ছুটিয়া চলিবার রোখ্‌টি সমাহিত করিতে হইবে,

বাহির হইতে টানিয়া তাকে ভিতরের দিকে চালিত করিতে হইবে। কর্ম্ম চাই, মহান আয়াস চাই, সুবিপুল জীবন চাই, কিন্তু সেজন্য সর্ব্বপ্রথম এইটি দরকার যে, এ সকলকে ক্ষেত্রের অন্বেষণে বাহিরে ছুটিতে না দিয়া তাহাদের মুখ ফিরাইয়া, তাহাদের রশ্মিপাতে অন্তরাত্মার নিগূঢ় প্রতিষ্ঠাকে, ভগবানেব দিব্য ভাবকে জাগরূক করিয়া ধরিতে পারি। দিব্য জীবনের গঠন আরম্ভ সেইখান হইতে—সেইটি ধরিতে পারিলে আর মোহ নাই, শোক নাই, ব্যর্থতা নাই।

"আদর্শ কর্ম্মী যিনি, জগতে বীরব্রত যাঁর তাঁহাকে একদিকে সন্ন্যাসীর মতনই হইতে হইবে নিরালম্ব, তিনি কিছুরই অপেক্ষা করিয়া রহিবেন না। বাহিরের জগত যদি তাহার সৃষ্টি হইতে মুছিয়া যায় তাঁহার কোন দৃকপাত নাই—এমনকি অন্তরের উপলব্ধি যদি ক্ষণতরে তমসাবৃত হইয়া আসে, ভগবানও যদি অন্তর্হিত হন, তবুও তিনি বিচলিত নহেন. অন্তরের বাহিরের সকল বিপর্য্যয়ের মধ্যেও কি একটা অপরূপ স্থৈর্য্যে, শান্তিতে, শ্রদ্ধায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, মন-প্রাণ-দেহ-বিধৃত এক দিব্য উদাসীনতায়। অন্তরের অন্তবে যিনি নিরালম্ব, যিনি উদাসীন তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহারই জন্মিতেছে অপার ধারণসামর্থ্য, পূর্ণশক্তি তাঁহারই মধ্যে প্রকট হইবার অবসর পাইয়াছে। যাঁহার আত্মরতি, কর্ম্মে যাঁহার তৃষ্ণা নাই, তাঁহারই বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্যলাভ, তাঁহারই কর্ম্মের জীবনের বিশুদ্ধ আপূর্ণ অবাধ তরঙ্গায়িত লীলা।"

প্রবর্ত্তকের এই মন্তব্যে তখনকার বিপ্লববাদের গতি ও প্রকৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিপ্লবের অসহায় নিবালম্ব ত্রিশঙ্কুর অবস্থা ও বলিষ্ঠ সুসংহত নেতৃত্বের অভাব যাহা বিপ্লবকে ঠিক লক্ষ্যপথে চালিত করিতে পারিতেছিল না তাহাও এই মন্তব্য হইতে বুঝা যায়। একদা বিপ্লবী মতিলালের মানস-পরিবর্ত্তনেরও ইহা ইঙ্গিত বহন করে। একটা বিশুদ্ধ জাতীয়তার স্বপ্নও যে এই সময়ে তাঁহাকে পাইয়া বসিতেছিল তাহারও আভাস এই মন্তব্যে মিলে। এই দিগ্দর্শন, এই চিন্তা ও ভাবনারই ফলশ্রুতি পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সৃষ্টি। প্রবর্ত্তকের মারফৎ তাঁর এই বৃহত্তর মহত্তর উদার জীবন-গঠনের ডাক বাংলার দিগ্ দিগন্তের তরুণদের প্রবর্ত্তকের পত্রিকাতলে জড় করে। শ্রীমতিলালের এই শুদ্ধ জাতীয় ভাবনার পশ্চাতে শ্রীঅরবিন্দের যে সমর্থন ও প্রেরণা ছিল তাহাও ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।

(ক্রমশঃ)

কিশোরীর প্রতি

সুনীতি দেবী

অনুপ তব নয়ন দুটি খোলো,
আলোর পানে কমল মুখ তোলো।
এই যে হেরি শিথিল অলসতা
বেড়িয়া আছে তোমার তনুলতা,
দু'হাত দিয়ে ইহারে ফেল ঠেলে,
বাহির পানে দৃষ্টি দাও মেলে।
সুপ্তিমাখা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
দৃপ্ত নবযৌবন যে ডাকে।

দেখ না তব ললাট পুরোভাগে
নবীন তেজে অরুণ লেখা জাগে।
বাহির হও তপ্ত পথ মাঝে,
বিশ্ব ডাকে শত কঠিন কাজে।
চলিতে পথে মিলিয়া গেলে সাথী
হাতটি ধরো এলে আঁধার রাতি।
না পাও সাথী ক্ষতি কি বল তায়?
একলা চলো দৃঢ় সবল পায়।

কৈশোরের কোমল কলি টুটে
যৌবনের আলোতে উঠ ফুটে।

পঞ্চাশ বছর আগে

পঞ্চাশ বছর আগের পুরোণো প্রবর্ত্তক হইতে সঙ্কলিত সংবাদ

(১ম বর্ষ প্রবর্ত্তক হইতে সঙ্কলিত)

নিউ ইয়র্কে ভূতপূর্ব্ব পার্লামেণ্ট সদস্য বন্দী :

ট্রিবিউনস্ লিনকলন্ নামীয় একজন কমন্স সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য ১২ই জুন নিউইয়র্কে অনেক কাগজপত্রে ছাপাইয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় লণ্ডনে অবস্থিতিকালে তিনি একজন জার্ম্মান গুপ্তচররূপে কার্য্য করিতেন। গ্রেট ব্রিটেনে জাল করার অপরাধে তিনি নিউ ইয়র্ক নগরে ধৃত ও অভিযুক্ত হইয়াছেন। আমেরিকা যাহাতে ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করেন, সেইজন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট প্রার্থনা করিবেন।

প্রবর্ত্তকের নিবেদন :

আমাদিগের এখানে সেন্সর (censor) থাকায় পত্রিকা তর্জ্জমা হইয়া অনুমোদিত হইতে বিলম্ব হয়। সেইজন্য আমাদিগের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমরা ২৪ সংখ্যা অবধি বাহির করিয়া প্রথম বর্ষ পূর্ণ করিব। আশা করি পাঠক এবং গ্রাহকবর্গ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি সন ১৩২২ সাল, ২৬-এ আশ্বিন। বোড়াইচণ্ডীতলা, চন্দননগর।

সমালোচনা :

আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত "পঞ্চ ব্যঞ্জনের আত্মকথা" সমালোচনার্থে পাইয়াছি। গ্রন্থকার কয়েকটি বিভিন্ন বর্ণের জীবনকাহিনী প্রকাশছলে অভিধানিক প্রায় সকল শব্দই সুকৌশলে বিন্যাস করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিচিত্র এই উপন্যাসের মত প্রতি বর্ণের কাহিনী চিত্তাকর্ষক এবং শব্দসংযোজন করা সত্ত্বেও কোথাও ভাবচ্যুতি হয় নাই। পুস্তকখানি আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, আমরা আর কি বলিব যাঁহারা বাংলাভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক তাঁহারা অসার উপন্যাস পাঠ না করিয়া এ পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক উপকার পাইবেন। নগেন্দ্রবাবুকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহ দিই তিনি অমর হইয়া বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করুন।

প্রবর্ত্তক পত্রিকার আবেদন :

[প্রবর্ত্তক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়ক—বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র]

প্রচলিত পত্রসমূহের মধ্যে প্রবর্ত্তক একখানি শ্রেষ্ঠ পত্র। ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক বহুতর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রবর্ত্তকের আকার ক্ষুদ্র কিন্তু বালুকারাশির অপেক্ষা স্বর্ণমুষ্টির গৌরব অনেক অধিক। প্রবর্ত্তকে সুবিখ্যাত একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লিখিতেছেন। সংবাদ-পত্রসমূহে বিশেষভাবে প্রশংসিত কেবলমাত্র বাঙ্গালীর অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভাবের ঘরে চুরি করিতে শিখিয়া আমরা চরিত্র হারাইয়াছি। যাহাতে ভণ্ডামী ত্যাগ করিয়া আমরা পূর্ণাঙ্গ হিন্দুচরিত্র লাভ করিতে পারি, যাহাতে বাঙ্গালী-চরিত্র দেবচরিত্রে পরিণত হয় "প্রবর্ত্তক" সেই মহা উদ্দেশ্য লইয়া বাণী পন্থায় অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালীর মনে প্রেম ও ভগবৎ পিপাসা জাগ্রত করিয়া সমষ্টিব পুরাতন চরিত্র ও ভাব বনিয়াদ শুদ্ধ তুলিয়া সম্পূর্ণ নূতনভাবে নূতন ছাঁচে বাঙালী চরিত্রকে ঢালিয়া বাঙ্গালীর বিচ্ছিন্ন মহাশক্তিকে কেন্দ্রগত করিবার প্রয়াস প্রবর্ত্তকের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। মানবের ব্যক্তিগত জীবনে যাহা ঘটে সমাজের জীবনসমষ্টিতেও তাহা ঘটিয়া থাকে : যৌবন বিকাশ শরীরে যেমন হয় আধ্যাত্মিক ও মানসিক জীবনেও ঐরূপ যৌবন দেখা দেয়, তখন তত্ত্বস্পৃহা, প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মতৃষ্ণা ও গভীর ধর্ম্মপিপাসা অন্তরে আবির্ভূত হয়। সমাজ ও জাতির ইতিহাসে যৌবন যুগের আগমন হয়। তখন চারিদিকে পরিবর্ত্তন স্পন্দন ও আন্দোলন সমাজ ও জাতির চিত্ত মন বুদ্ধি ও অহংকারকে বিচলিত করিয়া তুলে। প্রবর্ত্তক সে যুগের প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে।"

রবীন্দ্র জয়ন্তী ও বাঙালীর কর্তব্য

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

পঁচিশে বৈশাখ থেকে আরম্ভ ক'রে সারা বাংলার ছোটবড় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয় এবং এর মাধ্যমে জাতির জীবনীশক্তি ও দায়িত্বজ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় পরিলক্ষিত।

যাঁরা নানা কারণে কবিগুরুর অনবদ্য অবদানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান নাই তাঁরাও এই উপলক্ষে তাঁর গীত ও সুনির্বাচিত কবিতার আবৃত্তি শোনবার সুযোগ পেয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপম অমূল্য দান থেকে আগামী কালের বাঙালী সন্তানেরা যাতে বঞ্চিত না হন তার জন্য বাংলাভাষাকে আসন্ন অবলুপ্তির হাত থেকে সযত্নে রক্ষা করা এবং এই সর্বৈশ্বর্যময়ী ভাষার আরও সৌকর্য সাধন করা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই অবশ্য করণীয়। ভারতীয় পশ্চিমা ঝড়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায় সৃষ্ট বাংলাভাষার জগৎবিমোহন কমলকানন নিকৃষ্ট কচুরিপানায় পিষ্ট হয়ে বিনষ্ট না হয়, তার প্রতি বাঙালী মাত্রেরই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং প্রাণপণে এই চরম আঘাত প্রতিরোধ করতে হবে। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে এখন থেকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে—আমাদেব তরুণ তরুণীদের এবং বয়স্কদেরও শপথ গ্রহণ করা যে, তাঁরা অপবিচ্ছন্ন কোনও ভাষার ফিল্‌ম দেখবেন না এবং বিবাহাদি উৎসবে ঐরূপ কোনও ভাষার শালীনতা-বর্জিত বাজে গান সজোরে মাইকে বাজিয়ে রবীন্দ্রনগর কলকাতার শান্তি বিঘ্নিত করবেন না।

রবীন্দ্রপ্রতিভা সমাদৃত হয়েছে সারা পৃথিবীতে—তিনি সকল সভ্য জাতিরই প্রাণের ঠাকুর। পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশেই তাঁর গীত ও রচনাবলী অনূদিত ও আদৃত হয়েছে। পাশ্চাত্যের দু'একটি ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ প'ড়ে দেখেছি—তাতে ভাবের কঙ্কালটুকুই মাত্র সন্ধান পাওয়া যায়, বাংলাভাষার অপূর্ব ঝঙ্কার, অনুপম মাধুর্য ও শ্রুতিবিমোহন লালিত্যের কোনও আস্বাদই তাতে মেলে না। তাই বলি, বাঙালী জাতির এই অমূল্য সম্পদকে যেন আমরা কিছুতেই ম্লান হতে না দিই—বাঙালীর জীবনে কখনো যেন এমন দুর্দিন না আসে যেদিন বাঙালীর অপর কোনও ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্র রচনাবলী পাঠ করিতে বাধ্য হবে!

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে নাচগানের মাধ্যমে শুধু কবি রবীন্দ্রনাথেরই আমরা কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই—জাতীয় চরিত্র গঠনে, মনুষ্যত্ব বিকাশে ও কর্মপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের অবিনশ্বর দানের প্রতি আমরা ততটা অবহিত হই না। ফলতঃ তাঁর আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত হ'লে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের এতটা অধঃপতন ঘটত না। রবীন্দ্রনাথের মতই অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর মহাকবি গ্যেটের আবির্ভাবে (১৭৪৯-১৮৩২) জার্মান জাতি শুধু গৌরবান্বিত হয়নি, পরন্তু গ্যেটের কালজয়ী আবেগময়ী বাণী জার্মানদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল অসীম কর্মপ্রেরণা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে অদ্বিতীয় হবার দুর্বার প্রচেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি সম্বন্ধে যেমন বলেছেন—

"এখনও কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলি রহস্যপূর্ণ নেত্র নির্নিমেষ বিস্ময়ের শেষ
তল খুঁজে নাহি পায়—
এখনও তোমার কোলে আছি শিশুপ্রায়"—

গ্যেটেও অবিকল এইরূপ শক্তি ও বেগসঞ্চারিণী বাণীর উদ্‌গাতা এবং এ থেকেই জার্মান বিজ্ঞানী তাই জগজ্জয়ী হবার অদম্য অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এবং সকল ভাইবোন কবিগুরুর এই বাণী এবং নৈবেদ্য প্রভৃতি গ্রন্থের কবিতাগুলি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করুন—রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত ষোল আনা মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শে স্ব স্ব চরিত্র গঠন করে বাঙালীজাতিকে মহৎ থেকে মহত্তর ক'রে তুলুন—রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ভগবানের নিকট ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

"ভারতকোষ"*

শ্রীহরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী, এম. এ. (কলিকাতা), ডক্টর ফিল (বার্লিন), ধর্ম তত্ত্বাচার্য (বৃন্দাবন)

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটি বিশিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত 'ভারতকোষ' নামক একটি বিশ্বকোষ (কিম্বা বৃহৎ শব্দকোষ) প্রকাশিত করিয়াছেন। অধুনা কেন্দ্রীয় ও নানা উপরাষ্ট্রীয় সরকারগণের অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের বিশ্বকোষগুলি সংকলিত হইতেছে। তন্মধ্যে 'ভারতকোষ' একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষ; মাঝারি সাইজ। হিন্দী বিশ্বকোষ অপেক্ষা স্বল্পায়তন; ইহাতে স্থলে স্থলে রেখাচিত্রাদি আছে, ফলক নাই।

প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহাতে সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রয়াস অতীব শ্লাঘনীয় এবং প্রথম খণ্ডে যে সকল দোষ-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক রীতিতে আধুনিক বিশ্বকোষ সংকলনের প্রথম প্রয়াসরূপে অনেকটা উপেক্ষণীয়। কিন্তু ভারতকোষের রচনা পদ্ধতি, লিখন-ভঙ্গী এবং সম্পর্কিত বিষয়াবলীর বিন্যাসরীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে মুখবন্ধে কয়েকটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহা বাদানুবাদমূলক; ভারতকোষ সম্বন্ধে আলোচনার আগেই এই সকল মন্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য করা আবশ্যক। "বিষয়বস্তুকে কোনও প্রকারে **তরলীকৃত** না করিয়া ও সরল যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত ভাষায় উহার পরিবেশন **আধুনিক কোষগ্রন্থের আদর্শ**" [পৃঃ (৭)]; বিবরণগুলি যাহাতে অতি বিস্তৃত **অনাবশ্যকরূপে পাণ্ডিত্যবহুল** ও **নিতান্ত গুরুগম্ভীর** না হয়, সেদিকে সাধ্যমত দৃষ্টি রাখা হইয়াছে [পৃঃ (১১)] ইত্যাদি। আধুনিক 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া', জ্ঞানকোষ ও বিশ্বকোষাদি নানা শ্রেণীর এবং নানা ধরণের এবং ইহাদের কিরূপ আদর্শ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে এবম্বিধ কোন সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করা চলে না। অনাবশ্যকরূপে পাণ্ডিত্য বাহুল্য কি, তাহা নির্ধারণ করা অনেক স্থলে দুরূহ ব্যাপার। বিশ্বকোষটি কি ধরণের, 'সাইজ' কিরূপ, আলোচ্য বিষয়াবলীর গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া রচনাদির দৈর্ঘ্য ও মান নির্ণয় করিতে হয় এবং বহুসংখ্যক বিষয়ে পাণ্ডিত্যমূলক বিচার আবশ্যক হয় এবং যাহাতে আপেক্ষিক গুরুত্ব ও মাত্রা অতিক্রান্ত না হয় তাহাই লক্ষ্যণীয়। শুধু পাণ্ডিত্যের দম্ভ, পাণ্ডিত্যাভিমান ও পণ্ডিতম্মন্যতাই নিন্দনীয়। এই ভারতকোষের প্রথম খণ্ডেই নানাস্থলে অনাবশ্যকরূপে পণ্ডিতম্মন্যতার নিদর্শন রহিয়াছে এবং যেখানে অত্যাবশ্যক সেখানে পাণ্ডিত্যের অভাব দেখা যায়; তদুপরি গুরুত্ব-লঘুত্ব বোধ ও মাত্রা-জ্ঞানের অভাব প্রায় সর্বত্রই পরিস্ফুট। যথাস্থানে এইগুলি দেখান হইতেছে।

প্রথম শ্রেণীর বর্তমান এন্‌সাইক্লোপেডিয়াগুলি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের জ্ঞানকোষ বলা যাইতে পারে (যেমন, Encyclopædia Britannica, Das grosse Brockhaus, Larousse ইত্যাদি)। দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিল বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে সুস্পষ্টরূপে লিখিতে গেলে পরিভাষার আশ্রয় নেওয়া অনিবার্য হইয়া উঠে; এবং প্রথম শ্রেণীর জ্ঞানকোষগুলিতে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বিবরণ, টিপ্পনী ইত্যাদির মান বিশেষ লঘু করা হয় না। অবশ্য সাধারণের জন্য সঙ্কলিত নির্ভরযোগ্য ও মোটামুটি প্রামাণিক বিভিন্ন ধরণের নানাবিধ বিশ্বকোষ, শব্দকোষ প্রভৃতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Schweizer Lexikon, Encyclopædia Americana, The New Book of Knowledge, Everyman's Encyclopædia, New Universal Encyclopædia ইত্যাদি। তদুপরি বিশেষজ্ঞদের জন্য নানা মূল বিষয়ে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানকোষ আছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতকোষ সাধারণের জন্য অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ উঁচু দরের নহে।

ভারতকোষের প্রথম খণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রথমেই প্রতীয়মান হয় যে, ইহাতে নানা শ্রেণীর রচনাবলী

* প্রথম খণ্ড (সাহিত্য : ক্রাউন কুয়ার্টো পৃঃ ৬৬৯)। ৪ খণ্ডে সমাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা (বর্ষ অমুল্লিখিত, সম্ভবতঃ ১৯৬৪ খৃঃ)।

বিশেষতঃ পরস্পর সংশ্লিষ্ট নিবন্ধাদিতে আয়তনের দিকে কোন সামঞ্জস্য নাই, যেন গুরুত্ব-লঘুত্ব বোধ নাই এবং মাত্রাজ্ঞান নাই। মূল বিষয়, প্রকরণ, অধিকরণ ইত্যাদি বিচারপূর্বক তৎসম্পর্কিত রচনাবলীর আয়তন নিয়ন্ত্রিত হয় নাই; কোথায়ও গুরুতর বিষয়ক বিবরণাদি অতি স্বল্পায়তনে সীমাবদ্ধ, আবার কোথায়ও অপেক্ষাকৃত লঘু কিম্বা সাধারণের পক্ষে তুচ্ছ এমন কি অতি সামান্য বিষয়বস্তু দীর্ঘ কলেবরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আবশ্যক স্থলে পরিভাষার আশ্রয় না নিলে কিম্বা অসম্পূর্ণ ভাষায় লিখিলে রচনাগুলিতে কি রকম মারাত্মক ভ্রমপ্রমাদ ঘটিতে পারে তাহা ভারতকোষের প্রথম খণ্ডে বহু স্থলে জাজ্বল্যমান। আরেকটি বিষয় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের আয়তনের তুলনায় ইহাকে আধুনিক কালের পরলোকগত বহু ব্যক্তির জীবনচরিত অনাবশ্যক-রূপে সুদীর্ঘভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান অপেক্ষা নানা ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে যে-গুলির বিশেষ মূল্য নাই। দেখা যাইতেছে যে, ভারতকোষ একটি চরিতকোষও বটে; কিন্তু প্রথম খণ্ডেই ভারতের কয়েকজন মহামনীষী অনুল্লিখিত রহিয়া গিয়াছেন। যথাস্থানে ইহা দেখান হইতেছে।

বর্ত্তমানে ভারতকোষের পরিকল্পনা, কাঠাম ইত্যাদি সম্বন্ধে অত্যধিক কিছু না বলিয়া ইহাতে নিবদ্ধ রচনা-গুলি সম্বন্ধে ঈষৎ সমালোচনা করা হইতেছে। যদৃচ্ছা-ক্রমে আলোচ্য বিষয়গুলি বিন্যস্ত করা হইতেছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে দার্শনিক বিষয়াবলীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে; কেননা, সাধারণের উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত ভারতকোষে দার্শনিক গৌণ প্রশ্নাদির অবিদগ্ধ আলোচনা না থাকিলেও অসঙ্গত হইত না।

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' (সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী): অতি দীর্ঘ প্রবন্ধ (১০ পৃঃ, ১৮-২৭)। অন্যান্য দার্শনিক প্রবন্ধাদির তুলনায় ইহা মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। নানাবিধ বিষয়, মুখ্য, গৌণ এবং অনেক স্থলে অবান্তর প্রশ্নাদি উপস্থাপিত করা হইয়াছে; প্রমাণাদি যথারীতি উপন্যস্ত করা হয় নাই এবং বিষয়বস্তু আকর গ্রন্থাদির আশ্রয় না লইয়া স্বীয় মত এবং পদ্ধতি অনুসারে আলোচিত হইয়াছে।

'অজিতকেশকম্বলী' (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়): গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক দশজন "প্রচারক অপধর্মীয় (?) (heretic)"-দের অন্যতম "আদর্শ কুতার্কিক (sophist) (?) বলা হইয়াছে (প্রশ্নবোধক চিহ্ন সমালোচকের)। লেখকের সোফিষ্টদের সম্বন্ধে কোনই ধারণা নাই ইহা সুস্পষ্ট। একাধিক বিষয়ে দর্শন, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইঁহাদের মহৎ অবদান রহিয়াছে। লেখক হয়ত নব্য নৈয়ায়িকদেরও 'কুতার্কিক' বলিতে পারেন। প্রথমে 'বিজ্ঞানিক' (সুধী, জ্ঞানী) অর্থে তাঁহাদের 'সোফিষ্ট' আখ্যা ছিল; পরে কদর্থ হয়। **"অজ্ঞাবাদ"** (প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়): প্রজ্ঞার ন্যায় 'অজ্ঞা' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। 'gnostic'-কে 'জ্ঞানবাদী' বলা যায় না; গ্রীক শব্দ 'gnosis' সংক্ষেপে বলিতে গেলে অতীন্দ্রিয়বিষয়ক গুহ্য তত্ত্ব 'empiricism' ও প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ নহে। ইহাতে বৌদ্ধ দর্শনের অজ্ঞেয়বাদমূলক বিচার নাই; যদিও পাশ্চাত্যদর্শনের অন্তর্গত অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে এমন কি কাণ্ট সম্বন্ধেও আলোচনা রহিয়াছে। ভাষাপ্রয়োগ শ্লথ; নমুনা, "হার্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞানের (science) পূজারী হইয়াও শেষকালে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া একটি বিরাট শক্তির কার্য চলিতেছে" (পৃঃ ৩৩)। বিজ্ঞানের পূজারী হইলেই কি অজ্ঞেয়বাদী হইতে হয়? **"অদ্বৈতবাদ"** (সংযুক্তা গুপ্ত): শঙ্করাচার্যের জীবিতকাল ৭০০—৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে; কেন যে সাধারণতঃ গৃহীত ৭৮৮—৮২০ খৃঃ অস্বীকার্য তাহা আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। রচনাটি সুবিন্যস্ত নহে; বহু মন্তব্য অসম্বদ্ধ, সাধারণ ভাষায় 'এলোমেলো'। যেমন, "শংকরাচার্য অদ্বৈত-বাদের ভিত্তি মাত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, সুরেশ্বরাচার্যের শিষ্য সর্বজ্ঞাত্মা মুনি (সর্বজ্ঞাত্ম মুনি স্থলে) সংক্ষেপ শারীরক রচনা করেন" (বন্ধনীর অন্তর্গত মন্তব্য সমালোচকের)। শঙ্করের বহু পূর্বেই অদ্বৈতবাদের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। "শঙ্করাচার্য

পরমত খণ্ডনের জন্য যুক্তিতর্ক বিস্তার করিলেও আত্মার স্বরূপ স্থাপনে সম্পূর্ণ শ্রুতি প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।" ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বহু স্থলে শঙ্করাচার্য শ্রুতিনিরপেক্ষ প্রমাণ উপন্যস্ত করিয়াছেন। **"অনেকান্ত বাদ"** (সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়) : দীর্ঘ রচনা, আকর গ্রন্থাদির উল্লেখ নাই। স্যাদ্‌বাদের আলোচনা আছে, কিন্তু কোথায়ও মল্লিষেণের স্যাদ্‌বাদমঞ্জরীর উল্লেখ নাই। **"অনাত্মবাদ"** (প্রণবকুমার সেন) : কোথায়ও আকর গ্রন্থাদির উল্লেখ নাই। "পঞ্চস্কন্ধে"র অপব্যাখ্যার চরম নিদর্শন, "পঞ্চস্কন্ধ বলিতে রূপ [দেহের মৌলিক উপাদানসমূহ (?)], বিজ্ঞান (অহং বোধ (?)], বেদনা [সুখ ও দুঃখের অনুভূতি (?)], সংজ্ঞা [প্রত্যক্ষ (?)] এবং সংস্কার [প্রবণতা (?)] বুঝানো হইতেছে" (প্রশ্নবোধক চিহ্ন সমালোচকের)। "ন্যায় মতে প্রতিটি মানুষ (জীব স্থলে) দেহ এবং আত্মার মিলনে গঠিত" (বন্ধনীর মন্তব্য সমালোচকের)। কিন্তু ন্যায় মতে আত্মা দেহাশ্রয়ী হইলেও দেহাদিব্যতিরিক্ত সংসারী কর্তা। লেখক কার্ল মার্কসের জড়বাদ চার্বাক মতের সহিত এবং ডেভিড হিউমের মতবাদ বৌদ্ধমতের সহিত 'বহুলাংশে তুলনীয়' মন্তব্য করিয়াছেন ; কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও বহুলাংশে তুলনীয় একেবারেই বলা চলে না। **"আত্মা"** (কালিদাস ভট্টাচার্য) : সুদীর্ঘ রচনা, তুলনামূলক বিচার, কিন্তু আকর গ্রন্থাদির উল্লেখ না করিয়া কিছু বিশৃঙ্খলভাবে নিবদ্ধ ; এবং তাহা কালানুক্রমিক নহে। লিখনভঙ্গী ইংরেজী ধরণের ; যথা,'বৌদ্ধদের মতে আত্মা 'আশুবিনাশী মানসধর্মপ্রবাহ' 'মানসঘটনাপরম্পরা' 'আশু বিনাশী ক্ষণিক ব্যাপারসমূহ' ; অথচ ক্ষণিকবিজ্ঞান সন্ধান কিম্বা ক্ষণিকবিজ্ঞানপ্রবাহ ইত্যাদি পরিভাষা প্রয়োগ করা হয় নাই। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সাংখ্য ও যোগদর্শনের মতবাদ যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ভুলপ্রমাদ আছে। আত্মবিষয়ক বেদান্তমতবাদসমূহও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্যদর্শনমূলক কোন আলোচনা নাই। "অদ্বৈতশাস্ত্রে আত্মার স্বরূপত্ব (?) প্রধানতঃ শাস্ত্র-বাক্যের সাহায্যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে" (প্রশ্নবোধক চিহ্ন সমালোচকের)। শঙ্করাচার্যে বহু স্থলে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং পরবর্তী অদ্বৈতবাদিগণ বহু বিচার করিষাছেন। (আগামীবারে সমাপ্য)।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—গত ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা প্রবর্ত্তকে গ্রাহকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা এই নিবেদনই করিয়াছিলাম যে, "তাঁহাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দায়িত্ব-সচেতনতার উপর প্রত্যয়শীল বলিয়া আমরা প্রবর্ত্তকের দক্ষিণার জন্য যখন-তখন তাগাদা পত্র দিই না।" আমাদের এই প্রত্যয় সর্ব্বক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই। এই ঔদাসীন্য ও অসচেতনতা অত্যন্ত দুঃখের।

ব্যক্তিগতভাবে স্মারক-পত্র পাঠানো আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। এই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবর্ত্তক পাইবার পর দীর্ঘ মেয়াদী অনাদায়কারী গ্রাহকগণের নিকট হইতে পত্র বা কোনরূপ সাড়া না পাইলে আমরা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই প্রবর্ত্তক বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইব। প্রবর্ত্তক-এর মারফৎ সংযোগ রক্ষার সৌজন্যের কোন ত্রুটি আমাদের দিক হইতে হয় নাই, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। ইতি—

পরিচালক : **প্রবর্ত্তক**

বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

- পেটেন্ট ঔষধ
- সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ
- প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

রামানন্দ-শতবার্ষিকী

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শতবার্ষিকী বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একটি গৌরবময় স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মে তিনি বাঁকুড়া সহরে জন্মগ্রহণ করেন। আজ শত বৎসর পর বাঙ্গালীমাত্রই এই জন্মসনকে অতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

রামানন্দ বঙ্গবাসীর নিকট শুধু শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও সম্পাদক রূপে পরিচিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি ছিলেন সেবাব্রতী ও শিক্ষাব্রতী, স্বদেশপ্রেম, দেশসেবা ও সুনীতির উচ্চ আদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন।

রামানন্দের আদর্শ জীবন ছাত্রজীবনেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল লিখিয়াছেন :

"কলিকাতায় আসিয়া রামানন্দ আনন্দমোহন (বসু) সুরেন্দ্রনাথের (বন্দ্যোপাধ্যায়) ষ্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনে উদ্দীপনাপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিয়া এবং আনন্দ-মোহন, শিবনাথ (শাস্ত্রী) প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসমাজে যোগ দিয়া স্বদেশের ও সমাজের উন্নতি প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হইলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার নিকট একজন আদর্শ মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং সেবাকার্য্যে কঠোর পরিশ্রম ও তৎপরতা রামানন্দকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। অধ্যাপনাকালে তিনি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে কার্য্য করিতে থাকেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন হেরম্বচন্দ্র (মৈত্র)। ইণ্ডিয়ান মিররেও সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন। রামানন্দ ছিলেন সব্যসাচী। ইংরেজির মতো বাংলা সঞ্জীবনী এবং ধর্ম্মবন্ধুতেও তিনি প্রবন্ধ, রসরচনা ও মন্তব্যাদি সমানে লিখিতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ধর্ম্মবন্ধুর সম্পাদক হন।"

ধর্ম্মবন্ধু তখন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ছিল। ধর্ম্ম-বন্ধুর সম্পাদক হিসাবেই রামানন্দের সাংবাদিক জীবনের সূচনা।

রামানন্দ ছাত্রজীবন হইতে স্বদেশভক্ত ও স্বাধীন-চিত্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে কোনদিনই তিনি বড় করিয়া দেখেন নাই। সেই প্রসঙ্গে রামানন্দের জীবনকাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া শান্তা দেবী লিখিয়াছেন "চিত্রতে সগৌরবে প্রথম হওয়াতে রামানন্দ state scholarship পাইলেন এবং তাঁহার বিলাতে পড়িতে যাইবার কথা উঠিল।.....তিনি তখন আদর্শবাদিতায় তন্ময়। স্থির করিয়াছিলেন কখনও গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিবেন না। কাজেই গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিও পরিত্যাগ করিলেন।"

১৮৮৩ সালে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র "সঞ্জীবনী" নামে এক-খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। রামানন্দ ১৮৯০ সাল হইতে ঐ কাগজে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। সেই সময় তাঁহার রচনার প্রধান বিষয়-বস্তু ছিল নৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক অধিকার।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে কয়েকজন সেবাব্রতী যুবকের প্রচেষ্টায় দাসাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে রামানন্দ সেই সেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় রোগীদের এবং রাস্তা হইতে মরণাপন্ন রোগী সংগ্রহ করিয়া আশ্রয় দান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, রামানন্দ নিজের বাড়ীতেও ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দাসাশ্রমের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল পতিতা রমণীদের উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান ও শিক্ষিতা করিয়া তোলা। এই প্রথমোক্ত কাজের জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে সেবাপ্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন রামানন্দ। ঐ 'দাসাশ্রম'-এর মুখপত্র 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রামানন্দ ছিলেন তাহার পরিচালক ও সম্পাদক। ক্রমে 'দাসী' পত্রিকা একটি উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ-সম্পাদনায় (১৩০৪ সাল, পৌষ)

প্রদীপ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার পরিচালক ছিলেন বৈকুণ্ঠ দাস। সেই যুগে প্রদীপ পত্রিকার মত সাময়িক পত্রিকা আর দ্বিতীয় ছিল না। এই উপলক্ষে রামানন্দ জীবনীলেখিকা শান্তা দেবী লিখিয়াছেন, "প্রদীপ কেবলমাত্র গল্প, কবিতা ও সাহিত্যিকের প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাহির হইত না। তাহাতে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, জাতীয় সভ্যতা ও তাহার প্রসার, ভাষারহস্য, সমালোচনা, ছাত্রসমস্যা, নারীপ্রগতি, মহাজীবন জীবনী ইত্যাদি বহু বিষয়ের বিচিত্র রচনায় শোভিত। বহুক্ষেত্রে রামানন্দের প্রদীপই প্রথম নূতন আলোকপাত করিয়াছিল।"

১৯০১ সালে এলাহাবাদ হইতে রামানন্দ-চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশিত করেন। সেই প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "প্রথম যখন রামানন্দ বাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁহার কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাঙ্গালাদেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয়নি।"

জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হইতে দেখিলেই স্বদেশভক্ত রামানন্দ তাহার প্রতিবাদ প্রবাসীর মাধ্যমে জানাইয়া বরাবরই লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বভারতীয় বোধগম্য ভাষায় বাংলা তথা ভারতের মর্ম্মবাণী সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ইচ্ছা লইয়া ১৯০৭ সালে মডার্ণ রিভিউ অ্যাণ্ড মিস্‌সেলেনি প্রকাশ করেন। তাঁহার এই শুভ-প্রচেষ্টায় সর্ব্বভারতীয় নেতাগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পত্রিকাদ্বয়ের যে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে সে কথা অনস্বীকার্য্য।

রামানন্দের প্রতি ইংরেজ সরকার মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর সম্পাদকীয় মন্তব্য। যুক্তপ্রদেশ সরকার তাঁহার উপর নির্দ্দেশ জারী করিলেন যে, এলাহাবাদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তিনি সেই আদেশে ১৯০৮ (১৬১৫) সালে বৈশাখ মাসে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তখন হইতে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

দেশের প্রতি রামানন্দের মমত্ববোধ ছিল অপরিসীম। তাঁহার এই সুবৃহৎ মহৎ জীবন এত সংক্ষেপে আলোচনা অসম্ভব। পরাধীন ভারতে নির্ভীকচেতা সম্পাদকরূপে তিনি যে জাতীয় সেবা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা মিলে না, কিন্তু ১৯৪৩ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর যখন রামানন্দের মৃত্যু হয় তখনও দেশ স্বাধীন হয় নাই। মৃত্যুকালে সকল প্রকার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে পরাধীনতার গভীর বেদনা অন্তরে বহন করিয়া তিনি দেশবাসীর নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন।

আজ স্বাধীন ভারত রামানন্দের মত সত্যনিষ্ঠ, জ্ঞানতপস্বী, নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ সাংবাদিকের প্রয়োজন অধিকতর হইয়াছে। তাঁর মহৎ জীবনের আদর্শকে যদি বাঙালী আজ অনুসরণ করে তবেই রামানন্দ-শতবার্ষিকীর সার্থকতা।

রামানন্দ-তর্পণ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

স্বাধীন সাহিত্য-পত্র—শুভ্র ভারতীর
মহান মণ্ডপ সম, সাধক সবারে
সমাকৃষ্ট করে শুধু। যে ভাবে যে পারে
ধূপ - দীপ - পুষ্প - পত্র - পাত্রপূর্ণ নীর-
নৈবেদ্য বহিয়া আনে আগ্রহে অধীর
ভাবোদ্বেল বেদিকার দীপ্ত চারিধারে
সার্থক করিতে বিশ্ব - বাণী - বন্দনারে।
সম্পাদক রচে হেন আনন্দ - মন্দির।
সম্পাদকই সন্দীপক — সর্ব্ব - সূত্রধর।
সত্য - শিব - সুন্দরের সম্যক সেবায়—
স্থিপ্রজ্ঞতায় তা'র চলন্ত - অন্তর—
সাহিত্য - স্রষ্টারা শক্তি লভে সাধনায়।
রামানন্দ-সাংবাদিক এ রঙ্গে ভাস্বর।
মণ্ডিত মণ্ডপে তা'র রবি দীপ্তি পায়।

সমালোচনা

Protective Food in Health and Disease—By K. R. Mukherjee. Published by Kularanjan Mukherjee, 114/2 B, Hazra Road, Calcutta-26. Price : Rs. 8-00 only.

শ্রদ্ধেয় ও দক্ষ প্রাকৃতিক-চিকিৎসক শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত আলোচ্য গ্রন্থে 'Protective Foods in Health and Disease' পাঠ করিয়া অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবগত হইলাম। পুস্তকটির "Preface" Union Health Minister Sri D. P. Karmakar মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। গুণীজনের প্রতি দেশ-নায়ক ও বিজ্ঞজনের সমাদর নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় ও উৎসাহপ্রদ।

বর্ত্তমান বিশ্বে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের গুণাগুণ বিচার এবং রুগ্ন অবস্থায় পথ্যের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ গবেষণাও চলিতেছে। তাহা ব্যতীত দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া খাদ্য ও তথ্যবিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই সকল দিক হইতে পুস্তকখানি যে একটী অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য, ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। এই প্রকার খাদ্যবিষয়ক গ্রন্থ ইদানীং আরও প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাবধি যাহা অবগত আছি, উহা বিবেচনা করিয়া বলিতে পারি যে, এই পুস্তকখানা বিভিন্ন দেশের এবং ভারতের প্রাচীন মতবাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব জ্ঞানের সমাবেশে বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

প্রতিটি খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ভিটামিন নির্ণয়, ক্ষারধর্ম্মী বা অম্লধর্ম্মী গুণাগুণ, ব্যবহারিক বিশেষত্ব এবং শরীর গঠন, শক্তি উৎপাদন প্রভৃতির কথা ছাড়াও, রোগাবস্থায় ইহাদের বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ-বিধি, উপকারিতা এবং অপকারিতা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

খাদ্যবিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ, চিকিৎসকগণের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতাপূর্ণ যে সকল গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থে ঐ সকল তথ্যাদি ও মতবাদও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎসঙ্গে ভারতের মহান্ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাদি হইতেও নানাবিধ তথ্যাদির সমাবেশে পুস্তকখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশীয় প্রথায় "দুগ্ধ-কল্প", "দধি-কল্প", মধুর ও ঝোলা গুড়ের ব্যবহার, বিশেষ বিশেষ রন্ধনপ্রণালী ও অঙ্কুরিত মটর, যব প্রভৃতির গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া, সাধারণ খরচে অসাধারণ উপকারিতার যে নির্দ্দেশ গ্রন্থে রহিয়াছে উহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সায়াবিন হইতে দুগ্ধ ও নানাবিধ খাদ্যাদির প্রস্তুতপ্রণালী, উপকারিতা এবং নিম্নতম ব্যয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পথ্য পাওয়ার যে তথ্য অভিজ্ঞ গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আজিকার দিনে সকলেরই গ্রহণযোগ্য। মাছের লিভার কড়লিভারের ন্যায় উপকারী, তিল, বাদাম ও তজ্জাত তৈল, মটর ডাল, শাক আলু, শশা এবং অন্যান্য দেশীয় ফলের গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্তই উপযোগী।

পুস্তকখানি ইংরাজীতে লিখিত। তাই অনুরোধ, গ্রন্থকার যদি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণসহ বাঙ্গালীর আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া একখানা বাংলা পুস্তক তিনি লিখেন, তবে দেশের সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারে। বাঙালী আজ "খাদ্যের" ব্যাপারে বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছে। নিজ ঘরে স্বাস্থ্য খরচে কুটির-শিল্পের ন্যায় নারিকেল তৈল, বাদাম তৈল, সায়াবিনের খাদ্য, ফল সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণের পক্ষে পালনযোগ্য উপদেশাদির প্রয়োজন আজ সর্ব্বাধিক।

ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী

মন্দ-মধুর (উপন্যাস)—লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, প্রকাশক : এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, ৫০ নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

লেখক সম্ভবতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। কিন্তু গল্প বলার কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন ভালই। অমলার চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটেছে। কনে দেখার আসরে যে মেয়ে লজ্জা জড়ানো পায়ে মুখ নীচু করে ঢুকলো, সেই মেয়েই পাত্রীসুলভ লজ্জা-ভয় সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বাবলম্বনের সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। অমলার তপন নেই—কিন্তু বয়েসী নায়ক যদিও অমলাকে বিয়ে করলো না তথাপি সাহায্য করলো আগাগোড়াই। অমলা চাকরী পেলো তপনকে ভুললো। পরে অমলার সঙ্গেই অবশ্য নায়কের বিয়ে হোল এবং বিয়ের পর দেখা গেল তপন বিয়ে করেছে দীপা বলে একটি মেয়েকে এবং মেয়েটি হাসপাতালে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেছে।

বইখানা কৌতূহলোদ্দীপক। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়।

রত্নলিপি—(ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক ত্রৈমাসিক, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৩৭১) সম্পাদক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্যাচার্য্য। রত্নলিপি কার্য্যালয়, কৃষ্ণনগর সেসন রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত।

ত্রিপুরার এই জনপ্রিয় সংস্কৃতিমূলক ত্রৈমাসিকটি পড়ে আনন্দিত হলাম। লেখকসূচীতে দু'একজন ব্যতীত সকলেই সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন সুপরিচিত নহেন। তথাপি তাঁদের রচনাগুলি অপটু হাতের লেখা নয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের "ভারতে ভূমি সংস্কার নীতির ক্রমবিকাশ", শ্রীসত্যেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্তের "ত্রিপুরার আর্কিও", অধ্যাপক ডাঃ অমরেশ দত্তের "সেক্সপীয়ার চিন্তা" ও সম্পাদক মহাশয়ের "স্বামীজীর সন্ন্যাসীর গীতি" প্রবন্ধগুলি।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রত্নলিপি স্থায়ী আসন করে নিতে পারলে আমরা সুখী হব।

শ্রীইন্দু গুপ্ত

সাময়িকী

শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর আবির্ভাবোৎসব :

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননী রাধারাণী দেবীর ৭৫তম আবির্ভাবোৎসব গত ৬ই আষাঢ় ১৩৭২, রবিবারে বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত সঙ্ঘমন্দিরে সনিষ্ঠায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৫ই ও ৬ই আষাঢ় দুই দিবস যথারীতি ভাবধারা-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রবিবার, অপরাহ্ণে হুগলী জেলার চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনের পৌরোহিত্যে উৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রারম্ভে মায়ের আবির্ভাব-তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ভাষণ দিবার পর মায়ের দিব্যজীবনের বিভিন্ন দিক দেখাইয়া তিনটি ছাত্রী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি শ্রীসেন এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে মা ও সন্তানের সম্পর্ক ব্যক্ত করেন। সঙ্ঘের অনুরাগী, সুহৃৎ, ভক্ত ও ছাত্রছাত্রীগণ এই পুণ্যোৎসবে যোগদান করেন।

চির-বিপ্লবী উল্লাসকর :

বিগত ১৭ই মে ১৯৬৫, বাঙ্গালার বিখ্যাত বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত শিলচরে পরলোকগমন করেন। ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে উল্লাসকরের জন্ম হয়। এই পল্লী বহু বিপ্লবীর জন্মভূমি। উল্লাসকরের পিস্তল বোমার জ্ঞান ছিল প্রচুর। তিনি জার্ম্মান হইতে এ বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করেন। উল্লাসকর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হন আন্দামানে। আন্দামানে অবস্থানকালে সেখানে অবর্ণনীয় ও অসহ্য অত্যাচারের পর যখন তিনি ফিরিয়া আসেন তখন তাঁর উন্মাদ অবস্থা। আন্দামানের নির্য্যাতন-প্রসঙ্গে উল্লাসকর দত্ত দু' একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন : "আন্দামান-জেলে অন্যান্য কয়েদীদের মাসে মাসে পরিশ্রমের কাজ লাঘব করিয়া দেওয়া হ'ত। কিন্তু আমাদের বেলায় হ'ত তার ব্যতিক্রম। ঘানি টানার কাজটা প্রাণান্তকর পরিশ্রমে কোন রকমে রপ্ত করে এনেছি, এমন সময় একদিন নূতন হুকুম জারী হ'ল। একটা টিলার ওপরে একটা ফুলের বাগান ছিল, নীচে থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে সেই বাগানে দিতে হবে। বারীন, উপীনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হলো, আমরা এ কাজ করব না। কিন্তু পরের দিন দেখলাম, ওরা সবাই বাঁকে করে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাগ হলো ওদের ওপর। কিন্তু ঠিক করলাম আমি কিছুতেই এ কাজ করব না। যথাসময়ে রিপোর্ট পেয়ে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন এবং বললেন 'শুনলাম তুমি বলছ কাজ করবে না' বললাম, 'হ্যাঁ বলেছি। আমার বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ বাঁকে করে জল বয়নি। কী করে আশা কর আমি এ কাজ করতে পারব?' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বোধ হয় আমার ধৃষ্টতা দেখে বিস্মিত হলেন এবং বললেন 'কিন্তু কাজ করতে অস্বীকার করলে কী শাস্তি হয় জান?' প্রথম দিনে তোমাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে হাতকড়া পরে দুটি হাত ওপরে তুলে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং দ্বিতীয় দিনে তোমাকে ত্রিশ ঘা বেত মারা হবে। এই বেতের ঘা অর্থ জান? প্রত্যেক ঘায়ে এক ইঞ্চি করে পিঠের মাংস উঠে আসবে।' তার এই শাসানিতে রেগে গেলাম এবং নিজের হাতটা তার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—'you speak of thirty Lashes but you cut me into pieces still I refuse to work'.' "বেশ দেখা যাবে' বলে সাহেব গর গর করতে করতে চলে গেলেন এবং যথাসময়ে ওয়ার্ডাররা এসে হাতকড়া পরিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করে দিল। কাজ নেই, পরমানন্দে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন ছেড়ে দিল তখন হাত আর নামাতে পারিনে, রাতে হল ভীষণ জ্বর।"

এই প্রসঙ্গে স্বর্গত বিপিন পাল তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন "এই জ্বরের ঘোরে ব্যাটারী চার্জ্জ করে উল্লাসকরের ব্রেন শ্যাটার করে দেওয়া হল; সে পাগল হয়ে গেল।"

উল্লাসকর উন্মাদ অবস্থায় মুক্তিলাভ করিয়া কুমিল্লা গিয়া বাস করিতে থাকেন। দেশবিভাগের পর তিনি শিলচর চলিয়া আসেন। সেই-খানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

উল্লাসকর ছিলেন আপাদমস্তক বিপ্লবী। উল্লাসকরের মত মানুষের আবির্ভাব হয়, গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ারী করা যায় না। বাংলার বিপ্লবী-সত্তার একটা নিখুঁত রূপ আমরা দেখিয়াছি উল্লাসকরের জীবনে। উল্লাসকর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় :

বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বিগত ১৬ই মে ১৯৬৫ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

কেদারনাথ ছিলেন মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বড়ই পবিত্রতাপের বিষয় তাঁর পিতৃদেবের শতবার্ষিকী জন্মদিনের প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেই কেদারনাথ দেহত্যাগ করেন। কেদারনাথ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিটি কলেজ হইতে বি. এস্.সি. পাশ করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল কলেজ হইতে ভূতত্ত্বে বি. এস্সি ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

পিতার মৃত্যুর পর কেদারনাথ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক বিভাগ খোলার পর হইতে তিনি ঐ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাখনলাল সেন ও কেদার-নাথের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় দৈনিক 'ভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইতে বিয়াল্লিশের বিপ্লব পর্য্যন্ত ভারত যে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহার তুলনা মিলে না। সেই ইতিহাস চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

শিশু-সাহিত্য রচনায় কেদারনাথের প্রচুর দক্ষতা ছিল। তাঁহার চেষ্টায় 'মৌচাক' কাগজের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'জগন্নাথের দেয়াল খাতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেদারনাথের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থ রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'নিষিদ্ধ দেশে

সওয়া বৎসর'। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান ছিলেন কেদারনাথ। এ যুগে কেদারনাথের মত নির্ভীক, ন্যায়নিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা সাংবাদিক বিরল। বাংলার জীবনসাধনার ক্ষেত্রে কেদারনাথ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং আগামী কালেও থাকিবেন।

সাহিত্যিকের পুরস্কার লাভ :

বারাণসীস্থিত মীরাবাঈ প্রচার মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'আলোয়ার অণ্ডাল' (তামিল ভাষা হইতে সংগৃহীত বিষয়বস্তুর দ্বারা রচিত বাংলা গ্রন্থ) গ্রন্থখানির জন্য গ্রন্থকারকে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল ও স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী পুরস্কার প্রদানের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইতঃপূর্ব্বে মীরাবাঈ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও উত্তর প্রদেশ সরকার দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ-সভাপতি স্মরণে :

পরলোকগত সঙ্ঘ-সভাপতি ৺নলিনচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে চন্দননগর বিদ্যার্থী ভবনে তাঁর একটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। গত ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৪-তে অনুষ্ঠিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে শিক্ষক, ছাত্র ও জনসাধারণের এক সভায় প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। শ্রীনলিনচন্দ্র এই বিদ্যার্থী ভবনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের সুরু হইতে জীবনান্ত পর্য্যন্ত ইহার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

সম্মানিত চিকিৎসক :

ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, এম. বি., এম আর. সি. পি. আমেরিকার একাডেমী অফ্ ডারমেটলজির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ভারতে ডাঃ ব্যানার্জিই প্রথম এই সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ডাঃ ব্যানার্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ্ মেডিসিনের ডারমেটলজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। ডাঃ ব্যানার্জিকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

কাহাদের জন্য ? :

লবণহ্রদের জমি উদ্ধার করিবার কালে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল এই জমি শুধু মধ্যবিত্ত ও অল্প আয়ের লোকেদের মধ্যে বিলি হইবে। সম্প্রতি জানা যাইতেছে ঐ জমির দর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রতিশ্রুত কাঠা প্রতি দুই হাজার টাকা হইতে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই দামে জমি ক্রয় করা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে—লবণহ্রদের জমি কাহাদের জন্য ?

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

=শুভবিবাহের বিচিত্র বেনারসী শাড়ী=

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক ঃ উলের জিনিষ ঃ বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার ঃ ফোন ৩৩-২৩০৩

বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি বিচিত্র রুচিসম্মত শাড়ীর বিপুল সম্ভার।

আধুনিক ডিজাইনের হরেক রকম দেশী তাঁতের শাড়ী।

গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার প্রচুর আয়োজন।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

Gram. : "MASHINARIS" Office : 22-5275 22-7372

S. K. BHATTACHARJEE & Co.

(Electrical & Mechanical Engineers)

138, Canning Street, Calcutta-1 (1st floor)

For all sorts of Motors, Pumping sets, Starter Switches, Alternators and spare parts for Blackstone and Lister Diesel Engines.

Proprietor's Residence : 47-2915

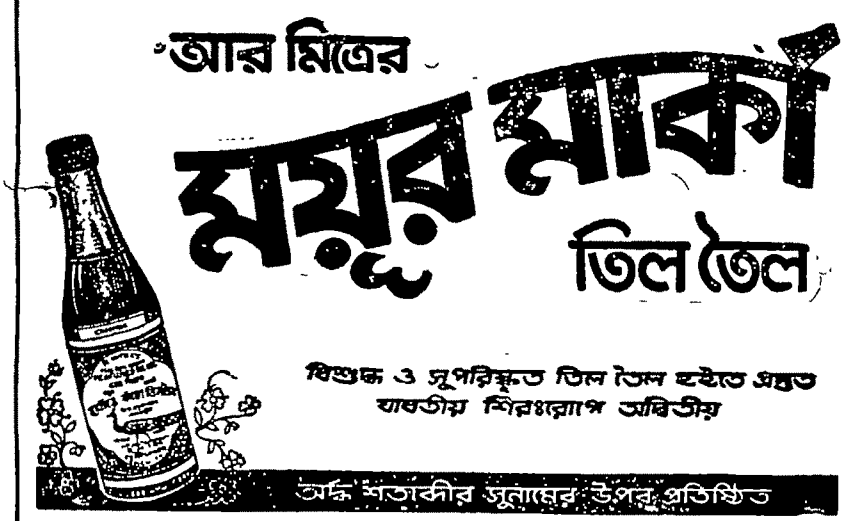

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স কলি:-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলি:-৬

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম এ. পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ **শব্দ তত্ত্ব** ১৫-০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲

॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০

॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স : কলিকাতা-১২

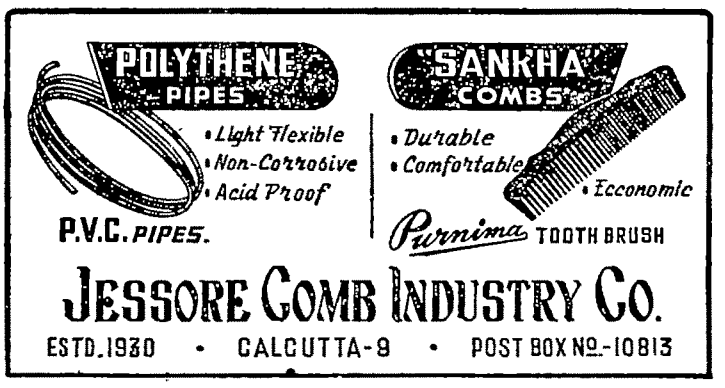

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি, টি, রোড ঃ ঃ বড়বাজার

উচ্চস্তরের ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে কয়েকটি ঃ

চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ঃ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ঃ দশন সংস্কার চূর্ণ ঃ
সারিবাদ্যারিষ্ট ঃ অশোকারিষ্ট ঃ ব্রাহ্ম ঘৃত (ছাত্র বন্ধু) ঃ মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

ঔষধের বিস্তৃত বিবরণী ও গুণাগুণের জন্য তালিকা দ্রষ্টব্য। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।

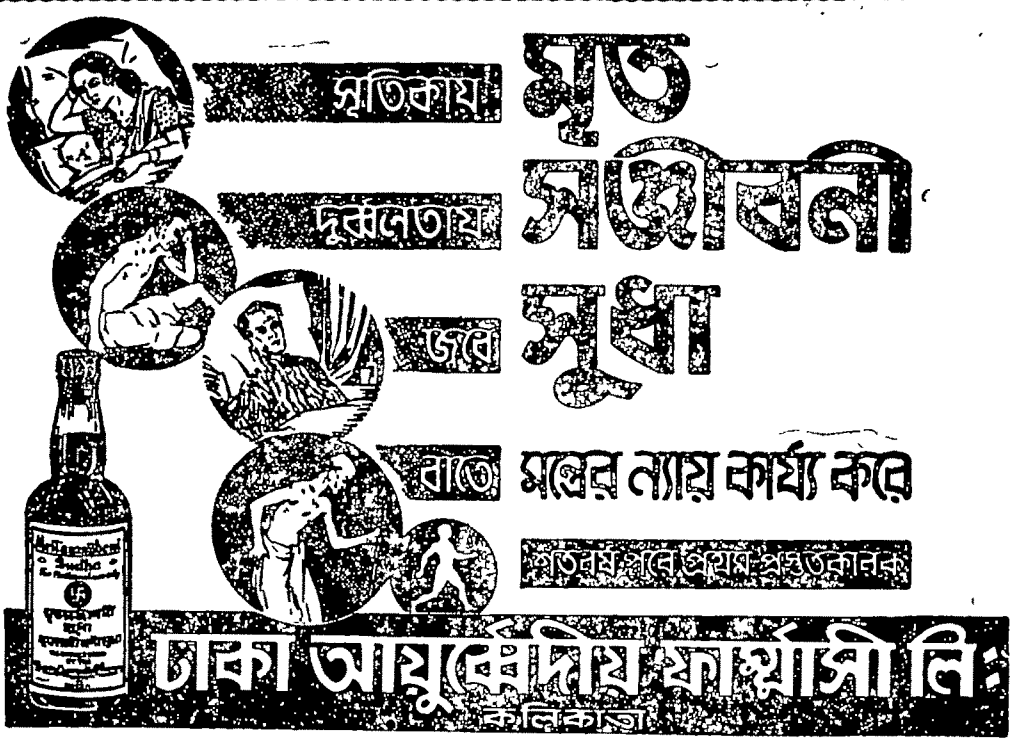

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD.

Gram : 'PRABARTAK' Mg. Agents—PRABARTAK TRUST Phone : 34-3088 & 89

IMPORT :
Machineries
Papers, Boards,
Synthetic Resin
Milk products
Casein and Chemicals
and Sundry Goods.

Expert Buying Service available at a very Moderate Charge.

EXPORT :
Jute Manufactures
Shellac, Kapok,
Myrobalan,
Cattle foods.
Spices, Rosin and
other India Products

61, Bepinbehari Ganguly Street : : Calcutta-12

Codes used : A. B. C. 5th. 6th. & 7th. Edition; Bentley's Complete Phrase, Western Union, Universal and 5-Letter, Acme and Com. Phrase with Supplement; Schofields 3-Letter.

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
ভারতীয় শিরঃরোগ অদ্বিতীয়

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স কলিঃ-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিঃ-৬

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ শব্দ তত্ত্ব ১৫-০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲
॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স : কলিকাতা-১২

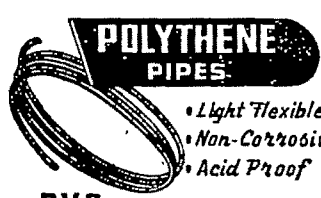

JESSORE COMB INDUSTRY CO.
ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO.-10813

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি, টি, রোড ঃ ঃ বড়বাজার

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে কয়েকটি ঃ

চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ঃ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ঃ দশন সংস্কার চুর্ণ ঃ
সারিবাদ্যারিষ্ট ঃ অশোকারিষ্ট ঃ ব্রাহ্ম ঘৃত (ছাত্র বন্ধু) ঃ মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

ঔষধের বিস্তৃত বিবরণী ও গুণাগুণের জন্য তালিকা দ্রষ্টব্য। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।

সূচীপত্র · প্রবর্ত্তক : আষাঢ় : ১৩৭২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	৯৯
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	১০০
সম্পাদকীয়	...	...	১০১
শ্রীঅরবিন্দ-সরণি	জীবন-চিত্র	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১০৮
"ভারত কোষ"	আলোচনা	শ্রীহরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী এম. এ,	১১০
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	১১৩
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	পুরাতনী	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	১১৮
শ্রীগুরু-মন্দিরের নক্সা-চিত্র	পরিচিতি	শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যাগানন্দ সরস্বতী	১২৩
১৭ই আষাঢ়	সভা-বিবরণী	প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-সভাপতি	১২৪
শুভেচ্ছা-বাণী	...	... ...	১৩১
সঙ্ঘগুরুদেবের স্মৃতিমন্দির	নিবন্ধ	রেণুকণা ঘোষ	১৩৩
প্রেতায়িত	গল্প	শ্রীহংস	১৩৫
পঞ্চাশ বছর আগে	সঙ্কলন	শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত	১৩৯
পত্র-সন্দর্ভ	সঙ্কলন	ডঃ হরগোপাল বিশ্বাস	১৪০
সাময়িকী	...	... ...	১৪১

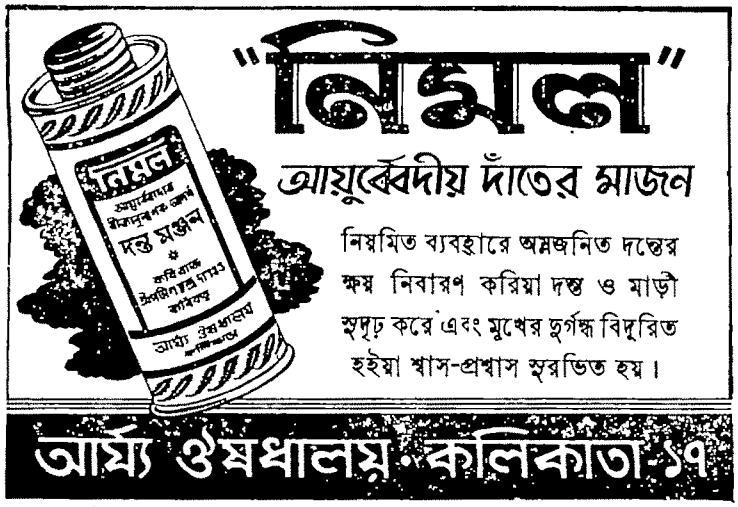

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥
স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২·৫০
জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪·০০
Living Knowledge 4.00
(যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি বিশ্লেষণ নৈপুণ্য। মুমুক্ষু নিশ্চয়ই সাধনার আলো ও পথ পাইবেন)
॥ শুভঙ্করের ॥
মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪·০০
(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)
॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ॥
প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সঙ্কলিত ॥
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩·০০
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

অভিজাত কেশ-তৈল

নগেন্দ্রনাথের

হিমকল্যাণ

বড়·মাঝারী·ছোট

তিন সাইজে

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্

প্রাঃ লিঃ • কলি-৪

॥ সদ্গুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০; **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ। **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত: "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাব্‌লিশার্স: কলিকাতা-১২

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক; সম্পূর্ণাঙ্গ; নির্ভরযোগ্য

বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ৬

ফোনঃ ৩৪-৩৭১১

উৎসব অনুষ্ঠানে-

ইন্দ্রর সন্দেশ

অপরিহার্য্য!

৮৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিঃ ৯ ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলিঃ১২ ফোন-৩৪-২৫৩৩

স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ্

করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের

বিদেশে মোহনবাগান—৪-০০

বিভিন্ন দেশে মোহনবাগান ক্লাবের রোমাঞ্চকর সফর কাহিনী। বহু চিত্র ও অজানা তথ্যসমৃদ্ধ। সহজ সাবলীল। রম্য-রচনার ভঙ্গী।

ফুটবল খেলার এ-দেশ ও-দেশের তুলনামূলক সমালোচনা-বই এই প্রথম। সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স: কলিঃ-১২

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

৫০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৭২

জীবনের আলো

কেবলই ভাবনা—শেষ নাই, সীমা নাই। আমার প্রাণ যেন বাংলার সুপ্তশক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। বাংলার আকাশে-বাতাসে আমার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সেই অফুরন্ত জীবনী-শক্তি লইয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। বাঙ্গালী জাতির আত্মা আমার আত্মার মধ্যে সংগোপিত—বাঙ্গালীকে আমি জাগাইব।

যোগময় দেবসাধক বাংলার জন্য ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে চক্ষু মেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বাংলার যে নূতন সৃষ্টি, উহাই আদর্শ সৃষ্টি; বিজ্ঞানের কল্পদৃষ্টি দিয়া উহাকে এইবার একেবারে নিখুঁত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। চাই জ্বলন্ত অনলপিণ্ডের মত সহস্রটি শক্তিধর আধার—যাহারা নূতন বিজ্ঞানমন্ত্রে বাংলায় অমর দিব্য-জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিবে—সহস্র যোগী, সহস্র আত্মনিবেদিত সন্ন্যাসী পাইব না কি? আমার এই প্রলয়ঙ্করী ক্ষুধা মহাকালী নিশ্চয়ই মিটাইবেন। অসীম ধ্যান সমুদ্র মন্থনে বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-চিত্র দিব্য নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছি! যোগকে আজ শরীরগত করিয়া তুলিবার সাধনা চলিয়াছে। দৃঢ় কায়া প্রতিষ্ঠান না পাইলে ঝটিকাবর্ত্তের মত বাংলার বুকে যুগান্তর আরম্ভ কেমন করিয়া হইবে? চাই কেবল বিশ্বাস—অটল, অচল শ্রদ্ধা—আর সব আপনি আসিবে। শ্রদ্ধাবান তরুণের দল! তোমাদের তো আজ কিছুরই জন্য ভাবনা নাই; অতি জঘন্য প্রাকৃত জীবনের মধ্যেও অসীম যোগ শক্তি প্রকাশ হইবে—ধর্ম্ম জীবন ও প্রাকৃত জীবন, স্বর্গ ও পৃথিবী ভিন্ন নয়, উভয়ের মূলেই সত্য আছে, আনন্দ আছে, কেবল সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন—সেই নিগূঢ় রহস্য দিন দিন স্ফুটতর করিয়া তুলিবার আদেশমন্ত্র পাইয়াছি। বাঙ্গালীকে পূর্ণ জীবন লাভ করিতে হইবে।

.... ওগো আমার জন্মজন্মের আপনার, অমর সম্বন্ধে চিরযুক্ত তরুণ জাতি! আজ আমি বি-জ্ঞানের হিরণ্ময় তোরণদ্বার হইতে ফিরিয়াছি। এবার একেবারে মহাকালী হইয়া আনন্দের তুফান তুলিতে চাই। আজ আর যুক্তি নয়, তর্ক নয়, আচার নয়, সংস্কার নয়, অনিরুদ্ধের মত শক্তিকে বিচার করিয়া তিল তিল করিয়া গ্রহণ করা নয়—একেবারে নির্ব্বিচারে সমাজ, ধর্ম্ম, জাতির শব-মূর্ত্তির বুকে পা দিয়া তাথিয়া তাথিয়া নৃত্য। ফেরুপালের বিকট চীৎকার তুচ্ছ করিতে হইবে, অন্ধকার চিরকাল পিছন হইতে ভ্রূকুটি করিয়া থাকে—মহাকালী কিছুই গ্রাহ্য করেন না। আজ বাংলায় মহাকালীর নৃত্যকে সম্ভব করিয়া তুলিবার বিপুল আয়োজন কর।

(৫ম বর্ষের প্রবর্ত্তক হইতে)

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। অষ্টত্রিংশৎ সুক্তং।) সপ্তমী ঋক্

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ।
মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাং ॥৭

অন্বয়—"সত্যং" (ধ্রুব) "ত্বেষা" (প্রদীপ্ত) "অমবন্ত" (তেজপূর্ণ) "ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ" (গতিশীল রুদ্রগণই) "অবাতং মিহং" (বায়ুরহিত বর্ষণের জন্য অর্থাৎ জল ভরা মেঘ সৃষ্টির কাজে) "কৃণ্বন্তি" (ক্রিয়াশীল থাকেন) ॥ ৭

সরলার্থ—ধ্রুবলোক প্রদীপ্ত তেজোপূর্ণ। গতিশীল রুদ্রগণই বায়ুরহিত বর্ষণের জন্য অর্থাৎ নবজলধর মেঘের জন্য অন্তরীক্ষলোকে ক্রিয়াশীল থাকেন ॥ ৭

বিশদার্থ—"ধন্বন্" পদের অর্থ মরুভূমি। সেইজন্য অনেকে ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়াছেন—'মরুসদৃশ হৃদয়'। তাঁহাদের মতে—ইহা সত্য যে, মরুসদৃশ আমাদের এই হৃদয়ে প্রদীপ্ত, তেজোপূর্ণ কঠোর ভাবাপন্ন মরুদ্দেবগণ সর্ব্বতোভাবে বিক্ষোভশূন্য হইয়া করুণাবারি বর্ষণ করেন।

কিন্তু বেদমন্ত্র যাঁহাদের কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছিল, সেই প্রণম্য আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ ঋষিদৃষ্টি-দ্বারা এবং সাধনসিদ্ধ অনুভূতির সাহায্যে আত্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-প্রপঞ্চের সৃষ্টিরহস্য যেভাবে দর্শন ও অনুভব করিয়াছিলেন—সেইভাবেই মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। সিদ্ধ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ বিনা সাধনায় উপলব্ধিগম্য হয় না। আধুনিক যুগেও এমন সিদ্ধ ঋষি আছেন, যাঁরা প্রকৃতই ঋষিদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং তাঁদের লব্ধ জ্ঞানও সাধনসিদ্ধ। আমরা এখানে সেইসব বরেণ্য ঋষির ধ্যানলব্ধ সত্যানুভূতির আলোকে এই মন্ত্রটির মর্ম্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করিব। তাঁহাদের মতে সৃষ্টিতত্ত্বে ত্রিবিধ জগৎ আছে। স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম-জগৎ, এবং কারণ জগৎ। স্থূল জগতের রূপ আমাদের এই বাস্তব পৃথিবী, সূক্ষ্মরূপ অন্তরীক্ষলোক এবং কারণরূপ জ্যোতির্ম্ময় মহাকাশ।··· "এই তেজোময় ত্রসরেণু ও ত্রসরেণুজাত ক্রমস্থূল পদার্থের সংহতিতে যে জগৎ গড়িয়া উঠে এবং প্রকাশশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও স্থিতিশক্তির দ্বারা যা বেঁচে রয়েছে, তার নাম স্থূল জগৎ। এর অপর নাম বিশ্ব।···ত্রসরেণুর উপাদানাত্মক পরমাণু যে জগতে উৎপন্ন হয়ে অবস্থান করে, যে জগৎ শুধু প্রকাশ শক্তি ও ক্রিয়া শক্তির দ্বারা বেঁচে আছে, তাকে বলে সূক্ষ্ম জগৎ। সূক্ষ্ম জগতের অন্য নাম ব্রহ্মাণ্ড বা হিরণ্যগর্ভাস্ত।···আর যে জগৎ সূক্ষ্ম জগতের বীজ বা উপাদান, যে জগৎ অবিদ্যার অর্থাৎ মায়ার শুধু প্রকাশ—শক্তির লীলাবিলাস মাত্র, তাকে বলে কারণ জগৎ। কারণ জগৎকে শাস্ত্রে অবিদ্যাও বলা হয়েছে।"···এই ত্রিজগতের ত্রয়ী দেবতার নাম যথাক্রমে বিরাট, ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বর।

মন্ত্রে যে "সত্যং" পদ আছে—আচার্য্যদেব তাহাব অর্থ করিয়াছেন 'ধ্রুবং'। উপরি উক্ত কারণ জগৎকেই আবার ধ্রুবলোক বা ধ্রুবদেশও বলা হয়। সূক্ষ্ম জগৎকে অধ্রুবদেশ এবং স্থূল জগৎ শুধু দেশ নামে অভিহিত। ধ্রুবদেশ বলিতে "এই স্থূল জগতের অবিমিশ্র আকাশ। অর্থাৎ যেখানে শুধুই প্রবাহশীল জ্যোতির্ম্ময় ত্রসরেণু ভিন্ন আর কিছু নাই—যাহা যোগীরা যোগের দ্বারা উপলব্ধি করেন বৃহৎ জ্যোতিঃরূপে। তখনই অনুভব হয় 'তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত'—এই সেই আকাশ-দেবতা, যিনি জন্মেছেন

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের পথে ভারত-জাতীয়তা :

জীবন ও জগৎবোধের বিশিষ্টতাই এ জগতে জাতি-চিত্রের হেতু। ভারতের বিশিষ্ট জীবনবোধটি তাকে অন্যান্য জাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে।

ভারতেব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বুঝিবাব দিগ্দর্শন শ্রীঅরবিন্দ দিয়াছেন :

"The true nature of Indian polity can only be realised if we look at it not as a separate thing, a machinary independent of the rest of the mind and life of the people, but as a part of and in its relation to the organic totality, of the social existence."

জাতি বলিতে শ্রীঅববিন্দের কথায় :

"A people, a great-human collectivitv, is in fact an organic living being with a collective or rather a common or communal soul, mind and body."

শ্রীঅরবিন্দের আরও নিগূঢ় ইঙ্গিত এই যে, "In each people there is a soul or life idea at work." প্রত্যেক জাতির এই প্রাণিক ও আত্মিক গভীরতার উপর তার আয়ুঃ নির্ভর করে। এ দিক দিয়া ভারতবর্ষ ও চীনেব সহিত অন্য কোন জাতিব তুলনা হয় না। ব্যষ্টি জীবনের যেমন বাল্য, কিশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য আছে তেমনি আছে জাতি-জীবনেরও। জাতি-সত্তার আত্মিক তথা প্রাণিক ভিত্তির গভীবতার পরিচয় মিলে তার এই বার্দ্ধক্যকে অতিক্রম করাব শক্তির উপর। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন বহু একদা প্রতাপশালী জাতির উত্থান-পতনের সাক্ষ্য মিলিবে।

ভারতীয় সভ্যতার এই 'soul' or 'life idea' বলিতে আমরা কি বুঝিব? সেই দিগ্দর্শনও শ্রীঅরবিন্দ দিয়াছেন :

"The master idea that has governed the life, culture, social ideals of Indian people has been the seeking of man for his true spiritual

---

চিন্মাত্রের অংশস্বরূপ আত্মা থেকে। আত্মবিৎ পুরুষেব কাছে ইনিই চিন্ময়, জ্যোতির্ময়, অমৃতময়, সর্ব্বময়স্বরূপ।" এই কারণ জগতে চিদাত্মাব মধ্যে যখনই কম্পন জাগে, তখনই সৃষ্টি হয় সূক্ষ্মলোকের—যাহা 'আলোক, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্রখচিত সৌরজগৎ বা অন্তরীক্ষ লোক। শাস্ত্রে যে কারণরূপী পরমেশ্বর নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টিচিত্র আমরা দর্শন করি তাহা এই কারণ ও সূক্ষ্মজগৎ সৃষ্টির যুগ্মরূপ। বেদমন্ত্রে এই কারণ জগৎকেই 'সত্যং' ধ্রুবং, 'ত্বেষা' প্রদীপ্তাঃ, এবং 'অমবন্ত' বলবন্তঃ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

তারপরে কাবণ জগৎ হইতে কিভাবে সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি হইল—'ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ'—মন্ত্রের এই দ্বিতীয়াংশে ঋষি তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

'ধন্বন্' পদটি গত্যর্থক ধাব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আর "রুদ্রিয়াসঃ" পদটির অর্থ হয় 'এই সকল রুদ্রের'। অন্তরীক্ষ লোকের গতিশীল ত্রসরেণুরাই স্থূল সৃষ্টির উপাদান। আর্য ভাষায় 'জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহের বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি ও প্রকাশ শক্তি অনুসারে ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বী প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যেও আবার নানা বিভাগ আছে। যেমন, অগ্নি—চার প্রকার; রুদ্র—একাদশ প্রকার; আদিত্য—দ্বাদশ প্রকার; বসু—অষ্ট প্রকার; অশ্বী—দুই প্রকার প্রভৃতি। প্রত্যেকের গুণ, কর্ম্ম এবং প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ঋষি বলিতেছেন 'ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ 'মিহং আবাতং কৃন্বন্তি'। এই সকল গতিশীল রুদ্ররাই বায়ু হইতে বৃষ্টিধাবা পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তবীক্ষ লোকে ক্রিয়াশীল থাকেন। কি জন্য? উদকবাহী, পর্জ্জন্য সৃষ্টির অনুকূলে বজ্র ও বিদ্যুতের সন্নিবেশ ঘটাইবার জন্য। পরবর্ত্তী মন্ত্রে তাহা আমরা পাইব॥৭॥

self and for man's ascent from the ignorant natural into the spiritual existence."

সমষ্টিগত, জাতিগত ভাবে ভাগবত জীবনে সমুন্নয়নই ভারতীয় সভ্যতার নিগূঢ় অভিসন্ধি বলিয়া শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দর্শনে উদ্ভাসিত হইয়াছে। অতীতে ব্যক্তিগতভাবে ইহা সিদ্ধ হইলেও, সমষ্টিগতভাবে এই ভাগবত-জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ভারত-জাতির যে 'life idea' তাহা নানা অবস্থার মধ্য দিয়া এই পরম লক্ষ্য সিদ্ধির পথেই গতিশীল। শ্রীঅরবিন্দের কথা : "It is perhaps for a future India, taking up and enlarging with a more complete aim that shall reconcile life and spirit, her ancient mission, to found the status and action of the collective being of man on the realisation of the deeper spiritual truth, the yet unrealised spiritual potentialities of our existence and so ensoul the life of her people as to make it the Lila of the greater self in humanity, a conscious communal soul and body of Virat, the universal spirit."

এই জাতিগত ভাগবত-জীবন সিদ্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন হইবে শ্রীঅরবিন্দেরই কথায় 'governance by the Dharma of India's social, economic and even her political rule of life, system, turn of existance."

একটা সমষ্টির, একটা জাতির জীবনবিকাশের সর্ব্ব পর্য্যায়কেই ভাগবত করিয়া তুলিবার ইঙ্গিত শ্রীঅরবিন্দের এই দিব্য জীবন ও জাতীয়তার মধ্যে নিহিত।

●

শ্রীঅরবিন্দ বিংশ শতকের প্রথম দশকে যে ভাগবত-জীবন ও জাতীয়তার কথা বলিয়াছেন তাহা আকস্মিক নহে, পারম্পর্য্য বিচ্ছিন্নও নহে। মানবের আদিমতম শাস্ত্রগ্রন্থ আর্য্য-বেদেই ইহার সূচনা দেখা যায়। 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্' প্রভৃতি ঋক অথবা অথর্ব্ব বেদের 'পৃথিবী' সূক্তের 'মহত সর্ব্বস্থং মহতী বিভূবিধ' (পৃথিবী একত্রিত হইবার জন্য এক মহান ভবন) প্রভৃতি হইতে উপনিষদের উপলব্ধি—

যস্ত সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥

ঐ একই ভারতীয় 'life-idea'র ক্রমবিকাশ। ঔপনিষদিক যুগে উপলব্ধির সামগ্রিকতা এবং শুধু মানুষে-মানুষে নয়, আব্রহ্ম জীবজগতের সহিত 'একত্বমনুপশ্যতঃ' ভাবটি আরও দৃঢ়মূল পাইয়াছে। পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে আকুমারী হিমাচল ভারতবর্ষের মহিম স্তুতি-বন্দনা স্বদেশ-প্রেমের এক পরমোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিষ্ণুপুরাণের 'যতো হি কর্ম্মভূরেষা হ্যতোঽন্যা ভোগভূময়ঃ' অথবা 'গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু তে ভারতভূমি ভাগে' প্রভৃতি শ্লোকে ভারতের যে জয়গান দৃষ্ট হয় তাহাতে পুণ্য ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণকারীকে স্বর্গের দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। পুরাণেরই ইঙ্গিত "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। ভারতের নদনদী, নগরনগরী পাহাড়পর্ব্বত, বহু-বিস্তৃত তীর্থসমূহ, একান্ন পীঠ—সবই এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত হইয়া বিশাল ভারতভূমির বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন এক অধ্যাত্ম-সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা দিয়াছে—যাহাই ভারতের স্বাদেশিকতা তথা জাতীয়তার বনিয়াদ বলা চলে। পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেম বা পেট্রিয়টিজম্ অথবা জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশন্যালিজম্ বলিতে যাহা বুঝায় তাহার কোন সঙ্গতি এ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে মিলিবে না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে এই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের কোন ধারণাই ভারতীয় এই সাংস্কৃতিক নির্ভেজাল ঐতিহ্যকে ম্লান করে নাই। ভারতবর্ষের জাতীয়তার সাধনা, ধ্যান-ধারণা ও করণায় ভেজাল ঢুকিয়াছে আধুনিক কালে, এ-দেশে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে, ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে —সেই যুগে যে-যুগকে আমরা নব জাগরণ বা রেনেসাঁ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। এবং ইহার সূচনা এই বাংলা দেশেই। ভারতের 'ancient mission' পুনঃ শুদ্ধ সিদ্ধ যুগসম্মত হইয়া পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে আবার ভারতের হৃদপিণ্ড এই বাংলা দেশেই। ইহাই ছিল সদ্যগুরু শ্রীমতিলালেরও দিব্য দর্শন (এবারকার 'জীবনের আলো' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ইহারই ভূমিকা বিগত দু'শোবছর বাংলায় রচিত হইতেছে। ভারতের ভাগ্যবিধাতারই বুঝিবা ইহা নিগূঢ় সঙ্কেত।

●

বাংলার এই নব জাগরণ-চাঞ্চল্যের পর্য্যালোচনা

যাঁরা করিয়াছেন তাঁরা প্রায়শঃই উহা একদেশদর্শী দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। যেন উহা পূর্ব্বাপর সম্পর্কবিহীন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কেও ঐ একই দৃষ্টি। ভারত-সত্তার অভিব্যক্তির সূত্রটি এই নব জাগরণ-জোয়ারে ঘুলাইয়া গেলেও যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই, এই সত্যটি খুব কম আলোচকের চোখেই ধরা পড়িযাছে। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বাংলার রেনেসাঁর মূল সূত্রটি ধরাইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছেন, 'revival and return'. ভারতের নিজস্ব ধারাটিতে ফিরিয়া আসিবার যে বিক্ষোভ-চাঞ্চল্য তাহাই নব জাগরণের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। এই পুনরাবর্ত্তনের স্রোতটি আজও চলিয়াছে এবং ভারতের জাতীয়তার মর্ম্ম, তার 'ancient mission' সুসিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত চলিবেও। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতটি বুঝিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর পরিক্রমা প্রয়োজন। বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়-র সংক্ষিপ্ত অবসরে মাত্র ইহার সূত্রটুকু উল্লেখ করা যাইতেছে।

বাংলা তথা ভারতের 'রেনেসাঁর' সূত্রপাতের সংবাদটি ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সরকার দিয়াছেন : "The ground was prepared for this revolution in thought by the change in our educational system which began in Bengal about 1810 and grew with increasing force from 1818 (Bengal will best serve as my illustration). Education through the English language was the lever which moved the medeaeval Indian world after centuries of inertia under Muslim rule."

ভারত-ইতিহাসের ইহা ছিল এক যুগসন্ধিক্ষণ। এ দেশের শিক্ষা-সাধনার, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার শেষ নির্ব্বাপিতপ্রায় স্মৃতি-চিহ্নটুকু বহন করিয়া চলিয়াছিল এখানে-সেখানের গোটাকয়েক হিন্দু পণ্ডিতের টোল-চতুষ্পাঠী আর মুসলমান মোল্লা-মৌলবীর মক্তব। ভারতের এই মুমূর্ষ প্রাণে বন্যার প্লাবন আনিল ইংরেজি শিক্ষা—পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, চিন্তা, ভাবনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবিক অধিকারবাদ, স্বাধীনতা, সাম্য মৈত্রীর আস্পৃহা। ভারতে, বিশেষ বাংলায় এই প্রবাহের ভগীরথ ছিলেন জন্, পিথরুস, ডিরোজিও প্রমুখ মানবতাবাদীগণ। ফরাসী বিপ্লব এবং তারও পূর্ব্বে আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জ্জন (১৭৭৬) ও ইহার মানব-মুক্তির ঘোষণা-বাণী ছিল ডিরোজিও (১৮০৯—৩১) প্রমুখের প্রেরণার উৎস। প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের উৎসাহবাণী এখানে স্মরণীয় : "আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি যে, সমস্ত মানুষই জন্মলাভ করে সমান অধিকার নিয়ে, এবং সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট থেকে তারা এমন কতকগুলি অধিকার পায় যা অবিচ্ছেদ্য, আর এরই মধ্যে রয়েছে—জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি লাভের অধিকার।" আমেরিকার এই মানব অধিকারের ঘোষণা পরবর্ত্তীকালে (১৭৮৯) ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের 'Liberty, Equality and Fraternity'-র জন্য সংগ্রামের ইন্ধন যোগাইয়াছিল। এই একই স্বপ্ন ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারত বিশেষ বাংলার মানসাকাশে নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে বিগত শতকের প্রারম্ভে।

রাজা রামমোহন ছিলেন এই নব জাগরণের বিরাট্ এবং প্রথম পুরুষ। স্যার যদুনাথ ভারতে এই পশ্চিমী আলোক-ঝরণার অনুপ্রবেশের তারিখ দিয়াছেন ১৮১০ সাল। তখন রামমোহন ৩৬ বছরের যুবক। ইহার দশ বৎসর পরে বিদ্যাসাগরের জন্ম। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধ রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রতিনিধিত্বকাল বলা চলে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের হিসাবে—"Raja Ram Mohan Roy presented the new aspirations and the earliest work of the first generation of his countrymen in the nineteenth century, Pandit Iswar Chandra Sharma reflected their ardous endeavours in the secend.

রামমোহন বৈদান্তিক নিরবয়ব অধ্যাত্মবাদের মধ্যে পশ্চিমী ভাবধারাকে সংহত ও সুসমঞ্জস করিতে চাহিয়াছিলেন, আর বিদ্যাসাগর পশ্চিমী মানবতাবাদের (humanism) আলোতে ভারতীয় সমাজ, সংস্থা, সংস্কারকে সংস্কৃত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ভাবাদর্শের পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জ্জন ও সংযোজনের যে উত্তরাধিকার ও ফলশ্রুতি তাহাই বাংলায় ব্রাহ্ম-আন্দোলন যাহা গত শতকের কয়েকটি দশকব্যাপী ইতিহাসের বিস্তৃত অধ্যায় অধিকার করিয়া বিদ্যমান।

উনিশ শতকের সপ্তম দশকে নব জাগরণের জোয়ার থিতাইয়া ও ইহার তরঙ্গ-ভঙ্গ খানিকটা শান্ত হইয়া স্বকীয় ধারাপথে মোড় পরিবর্ত্তন করিতে সুরু করে। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথায়—"হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রচারক রাজনারায়ণ বসু। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে তিনি বাঙালীকে পাশ্চাত্য আচার ও চিন্তাধারার মোহ দূর করতঃ ভাবে, ভাষায় এবং আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, সঙ্গীত, ক্রীড়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে বাঙালীর প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাবে দীক্ষিত হইবার জন্য এক পুস্তিকা প্রচার করেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একাধিক সভাসমিতি সৃষ্টি করেন। রাজনারায়ণ হিন্দুর প্রাচীন গৌরবের ভিত্তির উপরই এই জাতীয়তাবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন।"

'Return and revival'—রাজা রামমোহনের পরে স্বকীয়তায় প্রত্যাবর্ত্তনের ইহা প্রথম স্পষ্ট পদধ্বনি।

১৮৭২ সালে রাজনারায়ণ বসু "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতার উপসংহারে মন্তব্য করেন, "আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা-বুদ্ধি-সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।" অতঃপর তিনি এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন :

মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনঃপ্রাণ ;
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন : "রাজনারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত (মিলে সব ভারত সন্তান) ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

সত্য সত্যই ইহা ভারতবাসী বিশেষ বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। মনস্বী বিপিনচন্দ্র তাঁর 'Memories of my Life and Times' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন :

"Bankim Chandra was in a special sense the prophet of this renaissance. The 'Banga-darshan', started in 1873-74, was the organ of it. The 'Bengadarshan' school did for contemporary Bengalee thought and literature, what the French Encyclopeadiests did for 18th Century European thought and French literature."

বিগত শতকে বাঙালীর স্বকীয় স্বাদেশিকতাবোধ জাগানোর সহায়ক হইয়াছিল 'বঙ্গদর্শন' ছাড়াও আর দুইখানি গ্রন্থ—দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। শূন্যগর্ভ স্বাদেশিকতাকে বিগ্রহান্বিত করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃস্বরূপে। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন :

"The new intellectual idea of the mother-land is not in itself a great driving force..... it is not still she takes shape as a great divine and material power in a form of beauty that can dominate the mind and seize the heart ....Bankim wrote his great song—the Mantra had been given and in a single day the whole people had been converted to the religion of patriotism. The Mother had revealed herself....A Great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror."

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু মা-এর মূর্ত্তি রচনা করেন নাই, তিনি আধুনিক নবজাগরণের যুগান্তর ও দিক-পরিবর্ত্তনও আনিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালার রেনেসাঁর দুই দিকপাল রামমোহনের অধ্যাত্মবাদ ও বিদ্যাসাগরের মানবতা-বাদের সমন্বয় ও ভারতীয়করণ সাধন করিয়া গিয়াছেন সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যুগপৎ যোদ্ধা ও আদর্শ মানবরূপে খাড়া করিয়া ও গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যার মধ্যে জাতির কর্ত্তব্যের দিগ্‌দর্শন দিয়া। শ্রীঅরবিন্দের কথায় (Essays on the Gita) :

"The Great writer Bankim Chandra

Chatterjee first gave to the Gita this new sense of a Gospel of Duty."

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ-চাঞ্চল্যকে যাঁরা স্ব-খাতে, স্ব-ধর্মে, স্বকীয়তায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিতে পারা যায় রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রকে। রাজনারায়ণ যার সূচক বঙ্কিমচন্দ্র তারই প্রবর্ত্তক। একদা বাংলায় স্বাদেশিকতার উদ্বোধন ও উদ্দীপনে প্রচুর সাহায্য করিলেও পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের আঁধারে-হাতড়ানোর একরকম পরিসমাপ্তি (জের চলিলেও) ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রে। বঙ্কিম-উত্তর ব্রাহ্মসমাজানুরাগী বিবেকানন্দ (তখনও নরেন্দ্রনাথ) দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের পায়ে মাথা মুড়ান এবং গত শতকের শেষার্দ্ধের হিন্দু রেনেসাঁর বলিষ্ঠতম প্রতিনিধিত্ব করেন। শান্তিপুরের গোঁসাই বংশের কুলতিলক বিজয়কৃষ্ণ পৈতা ছিঁড়িয়া বিদ্রোহ করিলেও, নিরাকার নিঃসংস্কারধর্ম্মী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ ত্যাগ করিয়া ভারতের ঋষি, শাস্ত্র ও মহাজনের পথে ফিরিয়া আসেন। আর ব্রহ্মবান্ধব সত্যের সন্ধানে খৃষ্টান হইয়াও অবশেষে এই হিন্দু রেনেসাঁর স্রোতে আকণ্ঠ ডুবিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচারক হন।

রাজনারায়ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের, বিশেষ রাজনারায়ণ বসুর উত্তরাধিকার ন্যস্ত হইয়াছে আর দুইজন বলিষ্ঠ যুগ-মানবে। ইঁহাদের একজন হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ, অপর-জন অরবিন্দ। দু'জনই পরবর্ত্তী বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের গগন-আলো-করা যুগল-সূর্য্য। রাজনারায়ণের ভাবগুরু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'বাবা মহাশয়' গোঁড়া হিন্দু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর অরবিন্দের দাদামশায় ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। সুতরাং রাজনারায়ণের প্রভাব অরবিন্দ-রবীন্দ্রের উপর স্বাভাবিক।

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন-আলোড়নের মাধ্যমে পথ-হাতড়ানো চলিলেও, ইহার শেষ দশকে মাত্র জাতির চেতনাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। গ্রহণ-বর্জ্জন, সংস্করণ-সংযোজনের মধ্যে পথের সন্ধান চলিয়াছিল। শতাব্দীর গুরু রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে ভারত-ধর্ম্মের সবখানি স্বীকৃত, গৃহীত, সমাহৃত হইতে দেখা যায়। বিবেকা-নন্দের শক্তিবাদ, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত গীতার বীর্য্যবান আদর্শ (আনন্দমঠ, ধর্ম্মতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে) জাতিকে লক্ষ্য সিদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রবহ করিয়া চলে যাহারই ফলশ্রুতি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক অগ্নিবিপ্লব। উনিশ শতকের ধর্ম্ম ও জাতীয়তার জাগরণের উপর যবনিকা পড়ে রামকৃষ্ণ (১৮৮৬), বিজয়কৃষ্ণ (১৯০০) ও বিবেকানন্দের (১৯০২) মহাপ্রয়াণে।

বাংলায় বিংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান শতকের প্রভাত হইল অগ্নিবিপ্লব মুখে লইয়া। ধর্ম্ম ও জাতীয়তার সংজ্ঞা ও ধারণা ক্রমশঃ ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চলিল। শ্রীঅরবিন্দের কথা : "Religion always, in India, preceeds national awakenings". বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-প্রীতিকেই ধর্ম্ম আখ্যা (আনন্দমঠ ১৮৮২) দিয়াছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করিলেন : "It is the Sanatan Dharma which for me is nationalism and that nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith." বঙ্কিমচন্দ্রের কল্প-স্বপ্নের যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ মানব শ্রীকৃষ্ণ—আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দের কাছে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন বাসুদেব রূপে। মুক্তি পাইয়া উত্তরপাড়ার স্মরণীয় বক্তৃতায় তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন :

"The Hindu religion (Sanatan Dharma) is really the eternal religion because it is the universal religion which embraces all others."

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা অভিন্ন অবিচ্ছিন্ন রূপ পাইল। বিগত শতকের হিন্দু রেনেসাঁর নব রূপান্তর হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের গীতার নৈতিক ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দে আসিয়া বিংশ শতকের প্রথম দশকে অধ্যাত্মবাদে সমুন্নীত হইল।

পশ্চিমী দৃষ্টিতে জাতীয়তা ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। ভারতীয় দৃষ্টিতে জাতীয় চেতনা ও সনাতন ধর্ম্ম সমানার্থক। বর্ত্তমান শতকের প্রথম দুইটি দশকে এই ধর্ম্ম ও জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন চলিয়াছিল। এই জাতীয়তা-ভিত্তিক হিন্দু-রেনেসাঁর ফলেই বাংলায় বিপ্লব-উত্তর কালে বিপ্লবীদের দ্বারাই আধুনিক-যুগসম্মত বহু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এখানে উল্লেখ্য যে,

পরবর্ত্তীকালে এই সব প্রতিষ্ঠান (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে) গুরুপরম্পরা সাধন-ধারাটি ব্যষ্টিস্বরূপ সিদ্ধি লক্ষ্যে শিষ্য-পরম্পরা ধৃত হইলেও, সামগ্রিক জাতীয়তার সাধনা ও সিদ্ধি হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভারত-জাতীয়তার অভিব্যক্তি শুধু ভীষণভাবে আহত-ব্যাহতই হয় নাই, ছিন্নমূলপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে এই শতকের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে—গান্ধী-যুগে—একটা আগন্তুক জীবন-দর্শনের ফলে। 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' গ্রন্থে (১৯৪০) গ্রন্থকার প্রফুল্লকুমার সরকার এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন: "বীর্য্যহীন যে অহিংসা, তাহা তামসিক অহিংসা। উহারই একনাম ক্লৈব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বীর্য্যবানের অহিংসা অথবা সাত্ত্বিক অহিংসার আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। এই সাত্ত্বিক হিংসা দেশরক্ষা, সমাজরক্ষা, লোক-কল্যাণার্থ যুদ্ধ করিতে ভয় পায় না।.....মহাত্মা গান্ধী নানা দিক দিয়াই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব। কিন্তু তিনি যে নিষ্ক্রিয় তামিসক অহিংসার আদর্শ প্রচার করিতেছেন, তাহা কখনই মানব জাতির কল্যাণ করিতে পারিবে না।"

স্বামী বিবেকানন্দ একদা মহাত্মাজীর আদর্শ পুরুষ বুদ্ধের অহিংসা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন: "বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্ব্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস রোমের সর্ব্বনাশ।" গান্ধী-উত্তর যুগ হইলে ইহার সঙ্গে স্বামীজী নিশ্চয়ই গান্ধীজী ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের নামও সংযোজন করিতেন।

এই নিঃশেষিতপ্রায় ক্লৈব্যযুগের জের এখনও চলিয়াছে। অশেষ জটিলতার সম্মুখীন হইয়া রাষ্ট্র হইয়াছে ধর্ম্মনিরপেক্ষ। জাতীয়তা হইয়াছে আধ্যাত্মিকতা-বিচ্ছিন্ন। পরানুকরণতায় ভারত-জাতীয়তা স্বরূপভ্রষ্ট। ত্রিশঙ্কুর মত ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে ভারত শূন্যে ঝুলিতেছে—না হইয়াছে ইউরোপ, না ভারতবর্ষ। আজ সর্ব্বাঙ্গ তার অনাচার ও বিভ্রান্তির ব্যাভিচারে ক্ষতবিক্ষত।

মহাত্মাজীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ছিল ত্রিকোণ নেতৃত্ব দ্বারা পরিচিহ্নিত—গান্ধী-নেতাজী-জিন্না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন বাংলার বিশিষ্ট জাতিসাধনা তথা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের প্রতীক। গান্ধীজির জীবন ও জাতিদর্শন তিনি স্বীকার করেন নাই। নেতাজীরই কথা:

"In Gandhi there are two aspects—Gandhi as a political leader and Gandhi as a philosopher. We have been following him in his capacity as a political leader, but we have not accepted his philosophy."

অপর দিকে বাংলায় ভারত-জাতীয়তার উদার অধ্যাত্ম পরিপ্রেক্ষিতটি, তার সার্ব্বজনীন সর্ব্বগ্রাসী আবেদনটি সুপরিস্ফুট হইতে না হইতেই প্রবল বিধ্বংসী ধাক্কা খাইল মুসলিম লীগ-নেতা জিন্নার হাতে। অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হইল। ইতিপূর্ব্বে (১৯১৭) গিরীশ্বর বস্তুনিষ্ঠ সাম্যবাদী রুশ-বিপ্লব ইহাতে ফাটল ধরাইয়াছিল। ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব্ব কঠিনতম সঙ্কটময় পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে অখণ্ড ভারত-জাতীয়তার সম্মুখে।

●

এই শতকের অধ্যাত্ম-জাতীয়তার (Spiritual Nationalism) ঋষি শ্রীঅরবিন্দের চোখের সামনেই ভারত দ্বিখণ্ডিত হইল। ভারত-জাতীয়তার স্বপ্ন অসিদ্ধই রহিয়া গেল। সুপ্রাচীন কালের ভারতবর্ষে ভারত-সত্তার অভিব্যক্তির সূত্রটি বহুবার ছিন্ন হইয়াছে, বহুবার জোড়াও লাগিয়াছে। পণ্ডিচেরীর সাধনপীঠ হইতে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইল: "The fated hour of Indian unification has arirved." —অখণ্ড ভারতের জন্মদিন আসন্ন। তিনি দিগ্‌দর্শনও দিলেন: "A dozen men rendered invincible by a strong faith in their future, can spread the contagion of nationalism to the remotest corners of this vast country,"

এজন্য করণীয় যা সে সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দের কথা ছিল:

"Revolutionise the brain of the nation."

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালের ইহাই ছিল জীবন-সাধনা। এই বিশ্বাসীব সিদ্ধকেন্দ্ররূপে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের রচনা তিনি করিয়াছেন। বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ের প্রারম্ভে ভারত-জাতীয়তার চরম লক্ষ্যরূপে সমষ্টিগত ভাগবত জীবনের যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, সেই মহতী প্রেরণা লইয়াই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সৃষ্টি ও জীবন। সঙ্ঘগুরু

শ্রীমতিলাল বিপ্লবোত্তরকালে ভারত-জাতীয়তার নির্ভেজাল প্রতীক হিসাবে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে সংগঠিত করিয়া তুলিবারই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস নীরবে অনাড়ম্বরে করিয়া গিয়াছেন। এজন্য ১৯২৯ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম জাতীয়তায় বিশ্বাসী সঙ্ঘ-সাধনার বিজ্ঞান, অন্তর্গূঢ় রহস্য ও প্রায়োগিক রীতি-নীতি কৌশলমূলক প্রতিদিন যে প্রভাতবাণী তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা ভারত-জাতীয়তার বেদশাস্ত্র এবং শিখের গ্রন্থসাহেবের মতই পূজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহা এখনও অপ্রকাশিত। কলেবরও বিপুল। সমষ্টি সাধনার এ এক অপূর্ব্ব বিজ্ঞান। প্রকাশিত হইলে ভারতীয় তথা মানবতার অধ্যাত্ম সাহিত্য-সংস্কৃতিতে শুধু অমূল্য সংযোজনই হইবে না, চিন্তা-ভাবনারও নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিবে।

যুগে যুগে ভারতবর্ষ খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, হইয়াছে মুমূর্ষু ক্ষীণপ্রাণ। বার বার নবজীবন সঞ্চারেরও প্রচেষ্টা হইয়াছে প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও রাজনীতিক ভিত্তিতে—স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে। বাংলা ভিন্ন নিখিল ভারতে অখণ্ড জাতীয়তার অভ্যুত্থান লক্ষ্যে ইতি-পূর্ব্বে কখন কোন প্রচেষ্টা হয় নাই—হয় নাই সম্ভবতঃ নিখিল ভারত ঐক্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও সামগ্রিক জীবন দর্শনের অভাবে। মহারাষ্ট্র, পেশোয়া, পঞ্চনদের শিখ-খালসা ইহার দৃষ্টান্ত বহন করে। ইসলাম ও বেদান্তের সমন্বয়ে শিখ-খালসার অভ্যুত্থান সংবেগপূর্ণ ও শক্তিশালী হইলেও, এই সামগ্রিক দৃষ্টি ও দর্শনের অভাবে সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে ইহা প্রসারলাভ করিতে পারে নাই।

শুধু কবি-চেতনায় নয়, বাস্তবতঃও মহামানবের সাগর সঙ্গম হইয়াছে ষড়ঋতুর এই নৈসর্গিক লীলাভূমি সুজলা বাংলা দেশে। বাঙালীর চিন্তা-ভাবনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবন ও জগৎবোধ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, তার রক্তের সংমিশ্রণ, মানস-প্রকৃতি ও বিশ্ব-জাগতিকতার ধ্যান-ধারণা বাংলায় এমনি আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে যার আবেদন-সংবেদন সার্ব্বভৌম, সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বগ্রাসী। সংবেদনহীন বেদ-বিধি-নিষেধ মূলক শাস্ত্রের ধর্ম্মধারণা বিবর্ত্তিত হইয়া বাংলার উর্ব্বর চিত্তভূমিতে বিশ্বব্যাপ্ত বনস্পতিতে এক অপরূপ ভৌমরূপ পাইয়াছে যাহা এ শতকের ঋষিকবির কথায়—"ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম্ম। তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে। ধর্ম্মের মূলকে আর মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই। ধর্ম্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক ভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।"

জীবনই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, মানবতা, জাতীয়তা এখানে একাকার, অভিন্ন। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল এই জীবন-ধর্ম্মকেই (যাহা শ্রীঅরবিন্দের কথায় বিরাটের লীলা) একটা সমষ্টির মধ্যে বাস্তবায়িত করিয়া তোলার জন্য নীরবে সারা বিপ্লব উত্তর জীবনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যুগমানব সঙ্ঘগুরুরই স্বীকৃতি: "চাহিলে পাওয়া যায়, কিন্তু এক ভিন্ন তো বস্তু নাই। তবে এত চাওয়া কেন? একদল মানুষ যাহারা কিছু চাহে নাই, সেই দলের চিহ্ন, নিদর্শন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। চাওয়া নাই, পাওয়ার প্রতীক্ষা নাই সে কেমন জীবন? চাওয়া থাকিলেই প্রবঞ্চনা থাকিবে। চাহিবার বস্তু কেবল ভগবান। অমিশ্র, বর্ণহীন, নির্ব্বর্ণকার, অনন্ত—যাহা যুগে যুগে ফুরায় না—সেই ভগবানে অনন্তগতি! এই চরম সাধনা, নিষ্কাম জীবন, দূর ভবিষ্যতের ভারত—এক অসাধারণ জীবন প্রকাশের মহালীলা—সে বীজের সাধনা সুরু হয়েছে বাংলা দেশে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে। এ যে কি বিরাট যজ্ঞ তাহা অনেকে এখনও অবধারণ করে না।"

●

এই নবজন্ম ও জীবন-যজ্ঞের বেদীপীঠ সঙ্ঘগুরু-মন্দির—যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে গত ১৭ই "১৭ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার (এই সংখ্যার অন্যত্র প্রকাশিত আষাঢ়" সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) চন্দননগরের অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ভাগীরথী তীরে—প্রবর্ত্তক আশ্রমে। ভারত-জাতীয়তার যুগতীর্থ—উদীয়মান জাতির শুদ্ধ জাতীয় প্রেরণার উৎস হইবে এই গুরুমন্দিরের ভৌম চৈতন্যোজ্জ্বল ভাব-বিগ্রহ। বর্ত্তমান ভাব ও আচার-অরাজকতার মধ্যে ভারত-সত্তার পুনরুদ্ধারকল্পে এই সঙ্ঘ ও মন্দিরদেবতা আকাশ-প্রদীপের মতই দিকদিশারী হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅরবিন্দ-সংসর্গে

শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

॥ ৩ ॥

স্বদেশী আন্দোলনেব অবসানে বাবা শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাজে নয়, হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠনে বেঙ্গল জিম্‌খানা, টাউন ক্লাব প্রভৃতি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের খেলাধূলার উন্নতিসাধনে এবং সংগীত সমাজ, সংগীত সংঘ প্রভৃতি কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে নাট্য ও সংগীতের উন্নতিসাধনে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠলেন। ব্যক্তিগত আচারে ও আহারে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ হ'লেও বাবার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌গণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত বিলাতফেরৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভাব ছিল না; কুচবিহার পরিবার, কেশব সেনের বংশধরগণ, চৌধুরীবাড়ী ও ঠাকুর পরিবারের প্রধানগণ সকলেই বাবার বিশেষ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন; গরমপন্থী রাজনীতি যখন সরকারী কঠোর শাসনে বিপর্যস্ত, তখন স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরীর রাজনৈতিক উপদেশ ও স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থনৈতিক মনীষা বাবার বিশেষ অবলম্বন-স্থানীয় ছিল। অবশ্য বাবা স্বদেশী ঐতিহ্যের অবহেলা কখনও করেন নি; দেশবন্ধুর সহিত তাঁর সৌহার্দ্য যেমন অটুট ছিল, সেইরূপ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি গরমপন্থী নেতা ও বাঘা যতীন প্রভৃতি গুপ্ত বিপ্লবীগণ সর্বদাই বাবার গুপ্ত সাহায্য পেয়ে এসেছেন। বহু আদর্শগত বিবিধ এমনকি আপাতঃ-বিরোধী কর্মধারার মধ্য দিয়ে বাবাকে অগ্রসর হ'তে হ'য়েছে। সংসার ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল; তাই তিনি সর্বদাই ব'লতেন,—"আমার মা কর্মময়ী মা"। মা ব'লতে তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ যুগলকিশোরের প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী কালীকেই বুঝতেন। আমরা হ'লাম প্রাচীন বামাচারী শাক্তবংশীয়; আমাদের পূজা অর্চনা-আমিষ, পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত কখনও সাফল্য লাভ করেনি। সুতরাং মাতাঠাকুরাণীর আচার ও স্বভাব আমাদের বাড়ীর কুলাচারের সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। আমার উপনয়নের পূর্বে সাধুমা একবার কোল্‌কাতায় আমাদের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন; তিনি তখন পরমা বৈষ্ণবী; তান্ত্রিক পূর্ণাভিষেক গ্রহণের পর সাধুমা মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ভজনমার্গে তখন সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। মা ও দিদিদিগকে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবৎ প্রভৃতি গ্রন্থের সারমর্ম বুঝিয়ে দিলেন। সাধুমা'র ইচ্ছানুযায়ী এঁরাও শ্রীহরিনাম ও বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ ক'রলেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শ্রীঅরবিন্দ যখন তার অধ্যক্ষ হন, তখন তাঁর সহযোগীরূপে কয়েকজন সাধকও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বাবার বিশেষ ঝোঁক ছিল, জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় শুধু নেতাদের নিয়ে নয়, যোগী সাধকদের নিয়েও যেন গ'ড়ে ওঠে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ সকলেই সাধন-ভজন ক'রতেন। তাঁদের সহযোগীদের মধ্যে স্বনামধন্য স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ, তিনি আমাদের মধ্যে আজও বিরাজিত; সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ প্রাচীন ত্রিমার্গ সাধনায় বিলক্ষণ অগ্রসর ছিলেন। অপর একজন ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় ও বিবিধ দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত বহরমপুরের রাধাবল্লভ দাস শ্রীঅরবিন্দের যথার্থ সহযোগী ছিলেন। তাঁর বেশভূষা, আচার ও কথাবার্তা অনেকটা শ্রীঅরবিন্দের অনুরূপ ছিল। আমার বাল্যকালে যখনই আমাদের বাড়ীতে আসতেন, তখন আমাকে ছেলেদের রামায়ণ প'ড়তে ব'লতেন। শ্রীঅরবিন্দর জেলের মধ্যে কৃষ্ণ দর্শন ও পরে উত্তর-পাড়ার অভিভাষণের পর দেশে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একের পর এক নানা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে থাকে। রাধাবল্লভ

দাস সহসা একদিন তাঁর সুশিক্ষিতা পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে পরিব্রাজক অবস্থায় নানা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হ'লেন। অবশেষে সাধুমা তাঁকে পূর্ণাভিষেকান্তর মহাপ্রভুর সাধনা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রলেন। একদিন মা আমাকে ব'ললেন, "তোরা যাকে রাধাবল্লভ দাস ব'লে জানতিস্, তিনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ; তিনি কোল্‌কাতায় পুনরাবির্ভূত হ'য়েছেন"। জানতে পেলাম, সুকিয়া ষ্ট্রীট ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে অবস্থিত ব্রাহ্মণ ছাত্রদের একটি বাসভবনে সাধুমা, শ্রীমৎ কিশোরানন্দ (পূর্ব্বাশ্রমের নাম রাধাবল্লভ দাস) ও অন্যান্য শিষ্য ও শিষ্যাদের সহ কয়েকদিনের জন্য অবস্থান ক'রছেন। সাধুমা আমার শৈশব ও বাল্যকাল থেকেই আমার প্রতি অকুণ্ঠিত স্নেহ ও আদর বর্ষণ ক'রেছেন; যখন তাঁর উপদিষ্ট পথ ত্যাগ ক'রে অন্য পথ অবলম্বন ক'রেছি এবং বৈষ্ণবাচারেব পরিবর্তে পাশ্চাত্য আচার ও আহারে মন দিয়েছি, তখনও তাঁর সহিত আমার অন্তরঙ্গ ভক্তি ও স্নেহসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থেকেছে। শ্রীমৎ কিশোরানন্দকে দেখেই মনে হ'লো, তাঁর পূর্বেকার চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; ভক্তি ও প্রেমের আলো তাঁর সুন্দর বদনমণ্ডল ও সারা অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। তখন তাঁর ছিল কুঞ্চিত, আলুলায়িত দীর্ঘ কেশদাম; মুখ ছিল শ্মশ্রুশোভিত। বর্তমান সময়ের সুবিখ্যাত প্রেমিক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ মোহনানন্দজীর সঙ্গে তাঁর চেহারার খানিক-খানিক মিল ছিল। একদা প্রভাতে শ্রীমৎ কিশোরানন্দের উপদেশ লাভের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হ'লাম। তিনি সাধন আসনে ব'সে শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ বিষয়ক ও গৌরপ্রেম বিষয়ক স্বরচিত বাংলা কবিতা অতি সুললিত ও মার্জিত কণ্ঠে আবৃত্তি ক'রে শোনাচ্ছিলেন; আমি প্রণামান্তে তাঁর নিকটে আসন গ্রহণ ক'রলে, তিনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ঈশ্বরের কোন্ রূপ তোমার সবচেয়ে প্রিয়?" আমি তাঁর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না দেখে, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তুমি হরিকে অথবা হরকে দেখিতে চাও?" প্রত্যুত্তরে আমি ব'ল্‌লাম, "এ সম্বন্ধে আমি বেশী চিন্তা করিনি, তবে দু'জনকেই ভাল লাগে।" সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে সাধুমা ও শ্রীমৎ কিশোরানন্দ সমবেত শিষ্যগণসহ হরিনাম সংকীর্তন গেয়েছিলেন; তাঁদের অপূর্ব কণ্ঠে "হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর স্বরে"— গান গীত হওয়ার সময় সভার সকলে একান্ত অভিভূত হযে প'ড়েছিলেন। বহু ভক্ত প্রেমেব আবেগে নৃত্য ক'রতে ক'রতে মূর্ছিত হয়ে যান এবং রাস্তায় লোকজনের ভীড় জমে যায়।

শ্রীমৎ কিশোরানন্দ স্বয়ং কাকেও দীক্ষা দিতেন না, দীক্ষার ভার তাঁর অভিষেকগুরু শ্রীসাধুমার উপরেই দেওয়া ছিল। শ্রীসাধুমা আমার মাতৃদেবী ও দিদিদিগকে দীক্ষা দান ক'রেছিলেন এবং আমার উপনয়নের কয়েক বৎসর পর আমাকে শ্রীহরিনাম মন্ত্র দিয়েছিলেন। অভিষেক, দীক্ষা প্রভৃতি সাধন-ক্রিয়ায় তাঁর অনন্য-সাধারণ দক্ষতা ছিল। শ্রীমৎ কিশোরানন্দকে নিয়ে ক্রমে শ্রীসাধুমা একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে তোলেন; এক সময়ে বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী, উত্তর-পাড়ার রাজা যোধকুমারের পরিবারবৃন্দ ও বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের শ্বশুরালয়ের পরিবারস্থ মহিলাগণ শ্রীসাধুমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন; যদিও পুরীর সোনার গৌরাঙ্গ মঠে তাঁর প্রধান সাধনপীঠ, শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির আজও বিদ্যমান। শ্রীমৎ কিশোরানন্দ চিরদিনই যথাসম্ভব নিজ অধ্যাত্ম-প্রতিভা দশজনের নিকট হ'তে গোপনে রাখতেন; তাঁব কাব্য ও গদ্য রচনা দর্শন, সাহিত্য ও অধ্যাত্ম প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয়ে পরিপূর্ণ। এই সকল রচনা তিনি প্রকাশ করেননি, এখনও পুরীর মন্দিরে ভক্তগণ নিভৃত স্থানে সেগুলি পাঠ করে থাকেন; এগুলির মুদ্রণে তাঁর নিষেধ ছিল। সাধনজগতে শ্রীমৎ কিশোরানন্দ ও শ্রীসাধুমার অবদান সর্বসাধারণের নিকট অবিদিত। সাধন হিসাবে পূজা, জপ ও নাম সংকীর্তনের মহিমা অন্যান্য বৈষ্ণব আশ্রমের ন্যায় শ্রীসাধুমার আশ্রমেও প্রচারিত; কিন্তু কিশোরানন্দের অন্তরঙ্গ সাধনা ও ইষ্টতত্ত্ব প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্ব অপেক্ষা অনেক গভীর।

পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন

"ভারতকোষ"

শ্রীহরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী, এম. এ. (কলিকাতা), ডক্টর ফিল (বার্লিন), ধর্মতত্ত্বাচার্য (বৃন্দাবন)

(পূর্বানুবৃত্তি : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ সংখ্যার পর)

অস্তিবাদ (দেবব্রত সিংহ)—'অস্তিবাদ' পরিভাষা সাধু নহে; অস্তিত্ববাদ কিম্বা অস্তিত্বমূলক মতবাদ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। লেখকের বহু পরিভাষা দুর্বোধ্য; যথার্থ পরিভাষা না হইলে এই মতবাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলে না। পরিভাষার কয়েকটি নমুনা—'মূর্ত অস্তিত্ব' 'বিমূর্ত চেতনা', "বিষয়িতা (সাব্‌জেক্‌টিভিটি)-ই সত্য", 'অতিক্রমণ' (ট্র্যান্‌সেনডেন্স), "জ্ঞানবিদ্যাগত-ভাবে (অণ্টোলজিক্যাল"), "কালপ্রবাহ (টেম্পোরেলিটি), 'চৈতন্যের ক্রিয়া ও ব্যাখ্যান' ইত্যাদি। জ্ঞাতার যথার্থ উপলব্ধিতেই সত্যের রূপ কিয়োর্কেগার্ডের এই উক্তি ("বিষয়িতাই সত্য" স্থলে) সহজেই বোধগম্য। সার্তের অস্তিত্বের মূলসূত্র, "অস্তিত্ব তত্ত্বধর্মের (এসেন্স) পুরোবর্তী"; প্রথমে জীবের অস্তিত্ব, ক্রমশঃ সত্তা গড়িয়া উঠে, ইহাই সার্তের মতের ভাবার্থ ("L'existence précède l'essence"। হাইডেগারের মতবাদ একেবারে দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে; বস্তুতঃ এই মহা-মনীষীর মতবাদ জার্মান ভিন্ন অন্য ভাষায় সংক্ষেপে লেখা চলে না।

"ঈশ্বর" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়): নাতিদীর্ঘ রচনা, আকর গ্রন্থাদির উল্লেখ নাই। বিচারের নমুনা: "সাংখ্যকারের (?) মতে পুরুষ-প্রকৃতির প্রভাবে (?) জগতেব সৃষ্টি (?)" পরিণাম অর্থে সৃষ্টি শব্দের অপপ্রয়োগ মারাত্মক ভুল। মহামনীষী উদয়ন সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন "এই যুক্তিগুলি তাঁহার মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে মননের রূপ মাত্র (?)।" (প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলি সমালোচকের)। উদয়নাচার্য তাঁহার 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে ঈশ্বরাস্তিত্বসাধক অকাট্য প্রমাণ দেখাইতে প্রয়াসী;

সাধক বিভিন্ন অনুভূতিমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ্রীশংকর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়দিকেরই দিশারী ছিলেন; যদিও তাঁদের ব্যাখ্যা বিভিন্ন। এঁরা শ্রীরাধাকে জীবভূতাপরা প্রকৃতিরূপে বর্ণনা ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব'লেছেন :

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম।"

মহাভারতের কৃষ্ণ নিত্যবৃন্দাবনস্থ পরমেশ্বব কৃষ্ণেরই অভিব্যক্তি। তাই কৃষ্ণ অবতার নন, তাঁর মতে অবতারী। মহাপ্রভু এই কৃষ্ণের ত্রিশক্তির কথা ব'লেছেন। সম্বিৎ শক্তি, সন্ধিনীশক্তি ও হ্লাদিনীশক্তি। এঁরা পরা-প্রকৃতি হলেও জীবভূতা নন; মহাপ্রভু পুরীর গম্ভীরায় নিভৃত কক্ষে রায় রামানন্দ ও মাধবী দাসী সহ এই কৃষ্ণ ও হ্লাদিনী শ্রীরাধার সাধনা করেছিলেন। এই গুহ্যতম রসের সাধনা বাহিরে প্রকাশ্য নয়; নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে হরিনাম প্রচারই তাঁর সার্বজনীন সাধনা। পক্ষান্তরে কিশোরানন্দজী শেষ জীবনে পুরীর শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীসাধুমার সহযোগিতায় নিভৃত কক্ষে যে সাধনা ক'রেছিলেন, তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সম্পূর্ণ ঐক্য যেখানে, সেখানেই গৌরতত্ত্ব প্রকাশিত। এই তত্ত্বেরই মূর্তি বংশীধারী সোনার গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের এই মূর্তি ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই এবং এঁর অর্থও কেহ জানেন না। শ্রীসাধুমা ব'লতেন : "জগত প্রপঞ্চ অতি ভয়াবহ স্থান, নিত্য বৃন্দাবনের সহিত প্রপঞ্চের কোনও সম্বন্ধই নাই; সেখানে প্রাচীনগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা বা পুরুষোত্তম পরা প্রকৃতির অচিন্ত্য ভেদাভেদযুক্ত লীলায় যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আরও উপরে যিনি আছেন, তাঁকে আমরা গৌর বলি। তাঁর মধ্যে দুই তত্ত্বেব সম্পূর্ণ সঙ্গমে একতত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে; ভগবান ও ভগবতী সেখানে এক হয়ে গেছেন।" (ক্রমশঃ)

তিনি তাহা "মননের রূপ মাত্র" বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং বস্তুতঃপক্ষে সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে উদয়নাচার্যের অবদান অতুলনীয়। বিভিন্ন দর্শনে কিভাবে এবং কি প্রকার যুক্তিপ্রমাণউপন্যস্ত করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার করাহইয়াছে, এই নাতিদীর্ঘ রচনাতে তাহার কোন আভাষ নাই।

এখন দর্শন ভিন্ন অন্যান্য কয়েকটি বিষয়মূলক রচনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। বিষয়গুলি যদৃচ্ছাক্রমে নির্বাচিত হইয়াছে। **"অনার্য"** (রমেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রবোধ ভৌমিক): সাধারণভাবে আলোচনার নমুনা—"ভারতের যে প্রাচীন অধিবাসীগণ বেদ রচনা করেন, তাঁহারা আর্য নামে পরিচিত। * * * ইহা ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের বলা হয় অনার্য।" "আর্যগণ ভারতে আসিয়া এইসব প্রধান জাতিকে পরাজিত করেন এবং তাহাদের বাসভূমি দখল করেন।" কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় "মন্ত্রদ্রষ্টা" (বেদমন্ত্র-রচয়িতা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্রষ্টা) ঋষিগণ কিম্বা ঋষি-গোত্রসমূহকে আর্য বলিয়া নির্দেশ করা মারাত্মক ভুল। আর্যগণ যাবতীয় অনার্য জাতিগণকে কখনও পরাভূত করিতে পারেন নাই এবং ভারতের বহুলাংশ অনার্যাধ্যুষিত ছিল। আর্যগণের আদি বাসভূমিও বিতর্কমূলক। **"অন্নপূর্ণা"** (চিন্তাহরণ চক্রবর্তী): এই প্রসঙ্গে আদৌ কোন তাত্ত্বিক বিচার নাই। "দেবী রক্তবর্ণা বিচিত্রবসনা অন্নপ্রদাননিরতা স্তনভারনম্রা ভবদুঃখহন্ত্রী" ইত্যাদি বর্ণনা রহিয়াছে।

"অভিব্যক্তিবাদ" (আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়): পরিভাষা হিসাবে অভিব্যক্তিবাদ অপেক্ষা প্রচলিত ক্রম-বিকাশবাদই অধিকতর প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। 'অভিব্যক্তি' অর্থে 'মিউটেশন থিওরি' (অবস্থান্তরবাদ, আকস্মিক জননবাদ)-র কোন সামঞ্জস্য থাকে না। অভিব্যক্তিবাদ, পরিণামবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ—এই মতবাদগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। রচনা দীর্ঘ নহে বলিয়া হয়ত বহুবিধ অত্যাবশ্যক তত্ত্বাদি আলোচিত হয় নাই। **"আশ্রম"** (চিন্তাহরণ চক্রবর্তী): অতি 'মামুলী' রচনা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বৈদিক যুগে এমন কি প্রাচীন উপনিষদের যুগেও যে চতুর্বিধ আশ্রম প্রথা ছিল না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রথমে ব্রহ্মচারী অর্থে গুরু-কুলবাসী অধ্যয়ননিরত তরুণ শিষ্য বুঝাইত না। অথর্ববেদে (১১।৫) এবং অন্যত্র যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন এই অর্থে বর্ণনা আছে। (ব্রহ্মণি চরিতুং শীলমস্য—সায়নাচার্যের ব্যাখ্যা)। নানা শ্রেণীর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রথমে আর্য সমাজের বহির্ভূত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ আছে। **"ইতিহাস"** (বিনয় চৌধুরী): সুদীর্ঘ রচনা; নানা বিষয়ের আলোচনা আছে বটে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নহে। ইতিহাসের ব্যাখ্যা, বিশেষতঃ হেগেলের ব্যাখ্যা ভাল রকম করা হয় নাই; তদুপরি অপভাষার প্রয়োগ আছে।

এ যাবৎ শুধু দোষত্রুটি দেখান হইয়াছে। বস্তুতঃ যে সকল গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানের সম্প্রসারণ করা, বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই হউক কিম্বা সাধারণ্যেই হউক, সেই সকল গ্রন্থের সূক্ষ্ম বিচার আবশ্যক। ভারত কোষের প্রথম খণ্ডে বহু উৎকৃষ্ট রচনা আছে সন্দেহ নাই। যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি সুচিন্তিত রচনা এই স্থলে উল্লিখিত হইতেছে:—**'অর্থনীতি'** (ভবতোষ দত্ত), **'অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ'** (ধীরেশ ভট্টাচার্য) **'অলঙ্কারশাস্ত্র'** (বিভুপদ ভট্টাচার্য) **আপেক্ষিকবাদ'** (আপেক্ষিকত্ববাদ) (পরিমলকান্তি ঘোষ), **'অদিবাসী'** (প্রবোধকুমার ভৌমিক), **আর্য** (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) **'আলোক'** (বিমলেন্দু মিত্র), **'আলোকচিত্রণ'** (পরিমল গোস্বামী), **'উৎখনন'** (সুধীরঞ্জন দাশ—আলোচনা দ্রষ্টব্য), ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতকোষে বহু অবান্তর বিষয়, পারিভাষিক সংজ্ঞাদি সম্পর্কে অনেক স্থলে অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘায়তনে বহুল আলোচনা রহিয়াছে। সেইগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বহুবিধ গুরুতর বিষয়ের আদৌ উল্লেখ নাই। নিম্নে কয়েকটি নিদর্শন দেখান হইতেছে। দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি মূল বিষয়ের অন্তর্গত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা নাই; যেমন—অজ্ঞান, অদৃষ্ট, অধর্ম, অধ্যাস, অনবস্থা, অন্বয়ব্যতিরেক, অন্বিতাভিধানবাদ, অপরা বিদ্যা, অপূর্ব,

অপোহ, অপ্রমা, অভাব, অভিহিতান্বয়বাদ, অমৃত, অযুতসিদ্ধ, অর্থক্রিয়াকারিত্ব, অর্থাপত্তি, অবয়ব-অবয়বী, অব্যক্ত, অসৎকার্যবাদ, অস্তিকায়, অস্মিতা, অহঙ্কার, অহিংসা, আনন্দবাদ, আন্বীক্ষিকী, আপ্ত, আশ্রব, উচ্ছিষ্ট ('ভুক্তাবশিষ্ট' অর্থে যদিও আছে), উপমান, উপাধি, উপাসনা (উপাসন) ইত্যাদি। ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি মূল বিষয়ে—অনুদাত্ত, অনুপ্রাস, আবন্তী, আভীরী, উৎপ্রেক্ষা, **ইংরেজী সাহিত্য** (ইংরেজী ভাষা আছে), উদাত্ত ইত্যাদি। মনস্তত্ত্ব এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে—অঙ্কুর, অনিদ্রা, অনুভব (অনুভূতি), অন্তকরণ, অভ্যাস, অমাবস্যা, অর্থ (অর্থনীতি সংক্রান্ত) আনন্দ, উৎপাদন, উন্মাদ (মানসিক রোগ দ্রষ্টব্য এই মন্তব্য আছে)। বিবিধ বিষয়ক—অপ্সরা, আখ্যান, ইরাক, ইতিহাস-পুরাণ ইত্যাদি।

ভারতকোষের প্রথম খণ্ডে অপেক্ষাকৃত বহু নগণ্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ক্ষুদ্র-দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু ভারতের অনেক মহামনীষীদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই; যথা—অনিরুদ্ধ (সাংখ্যাচার্য, বল্লালসেনের কালের অনিরুদ্ধ ভট্টের কথা আছে বটে) আর্যদেব, ঈশ্বরকৃষ্ণ, উদয়ন, উদ্যোতকর। নানা প্রকার গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অনুল্লিখিত রহিয়াছে—অত্রি সংহিতা (আত্রেয় সংহিতা), অনুভাষ্য, আত্মবোধ, উত্তররামচরিত, উপবেদ (উপপুরাণ আছে), উপস্কার, অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা, অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ, অষ্টাধ্যায়ী ইত্যাদি।

এই স্থলে ভারতকোষের প্রথম খণ্ডে বৃথা পণ্ডিত-ম্মন্যতার কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা হইতেছে। বাংলা ভাষায় সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত ইউরোপ স্থলে 'ইওরোপ' (যদিও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম উচ্চারণ ও বানান প্রচলিত), 'এরিষ্টোটল'-এর নাম 'আরিস্তোতল—লিস, আরিস্টটল' (শেষোক্ত স্থলে 'ট'র সংযোগে 'ষ'র পরিবর্তে 'স'—তদুপরি অবিস্তোতলিস কি আরিস্তোতেলেস্)। "অ্যা" একটি স্বতন্ত্র স্বর হিসাবে গণ্য হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বররূপে বিবেচ্য হইতে পারে কিনা বিচার্য; "অ্যা" বর্ণাদ্যক বহু বিদেশী শব্দ ও নাম দেখান হইয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হিন্দী বিশ্বকোষে এই পদ্ধতি গৃহীত হয় নাই এবং অধিকাংশ স্থলে এইগুলি 'আ' বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মাত্রা জ্ঞানের অভাব সর্বত্র জাজ্জ্বল্যমান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখিত 'অসমীয়া ভাষা' সম্বন্ধে মাত্র আঠার লাইন, অর্ধেক পৃষ্ঠার চাইতেও কম। অন্যদিকে সাধারণভাবে লিখিত "অসমীয়া লোকনৃত্য" (প্রায় ৫ পৃষ্ঠা), "অসমীয়া লোকসংগীত" (প্রায় ৪ পৃষ্ঠা); "আসাম" (৮ পৃষ্ঠা) শীর্ষক প্রবন্ধগুলি রহিয়াছে। ভারতকোষের এই খণ্ডের রচনাবলীর মধ্যে আয়তনে দীর্ঘতম রচনা—"উৎখনন" (৫৬৩-৫৮০ পৃ. ৫৮১-৫৯৭ পৃ.। প্রত্নতত্ত্বের আলোচ্যমান বিষয়গুলি ভাগ করিয়া কয়েক স্থলে দেখাইলে সুশোভন হইত। "অদ্বৈতবাদ" সম্বন্ধে মোটামুটি দেড় পৃষ্ঠা অথচ "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" সম্বন্ধে প্রায় দশ পৃষ্ঠা (এই রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। "আত্মবাদ" সম্বন্ধে প্রায় সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা, "ঈশ্বরবাদ" সম্বন্ধে প্রায় দুই পৃষ্ঠা; 'অশ্বঘোষ' সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অবান্তর বিষয়ে ৭৪ পংক্তি কিন্তু তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হয় নাই। এবম্বিধ বহু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখান যায়; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে বিরত থাকা গেল।

উপসংহার—বক্তব্য এই যে শুধু তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে প্রকাশ্য তিনটি খণ্ড সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্কলিত হয়, সাধারণের জন্য অভিপ্রেত হইলেও যাহাতে রচনাগুলি যথাসম্ভব নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক হয়, তৎপ্রতি সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। কিছুকাল পরে প্রথম খণ্ডের একটি পরিশিষ্ট প্রকাশিত করা সম্ভব কিনা তাহাও সম্পাদকমণ্ডলী বিবেচনা করিতে পারেন। আশা করা যাইতেছে যে, অবশিষ্ট তিন খণ্ডের উৎকর্ষ সাধিত হইবে যাহাতে ভারতকোষ একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ রূপে পরিগণিত হইতে পারে।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ সংখ্যার পর]

কম্বোজের পর্বতমালায় বেষ্টিত ক্ষুদ্র উপত্যকায় সুরম্য রাজপ্রাসাদের প্রধান মহিষীর মনোহর মহলের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে শুভ্রবর্ণ হস্তিদন্ত-নির্মিত মণিমুক্তাখচিত পালঙ্কে বিদ্যুৎবর্ণা মহারাণী শর্মিষ্ঠা শায়িতা। তাঁর ঘন মেঘবরণ কেশরাজি পালঙ্ক অতিক্রম কোরে প্রস্তরের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। প্রকোষ্ঠটি প্রখর দীপাবলির আলোকে সমুজ্জ্বল। প্রাচীরগাত্র রতি ও রতিপতির নানা বর্ণাঢ্য চিত্রে সুশোভিত। কৃশাঙ্গী শর্মিষ্ঠার তনুলতার অর্ধাংশ কোমল শয্যার অভ্যন্তরে নিমজ্জিত। কয়েকজন পরিচারিকা চামর ব্যজনে নিযুক্ত। শর্মিষ্ঠার নেত্রদ্বয় মুদিত।

দ্বারপ্রান্ত হোতে একজন পরিচারিকা অনুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা কোরলো, মহারাজাধিরাজ অমিতবিক্রম মহাবাহু শত্রুদমনক বীরপুরুষ গ্রহবর্মা। ক্ষণমধ্যেই বীরদর্পে ভারি পায়ের আওয়াজ তুলে গ্রহবর্মা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কোরলো। পরিচারিকারা নতমস্তকে অভিবাদন জানালো। সশব্দে পালঙ্কের পার্শ্বে এসে দাঁড়ালো গ্রহবর্মা। শর্মিষ্ঠা চক্ষু উন্মীলিত কোরলো না। পদশব্দ কোরলো গ্রহবর্মা। শর্মিষ্ঠা নীরব। তার কাঁচুলিবদ্ধ পীনপয়োধর শুধু নিশ্বাসের সাথে সাথে ওঠানামা করে। চামরের বাতাসে তার অবেণীসাবদ্ধ কেশরাশি ফুলে ফুলে ওঠে। গ্রহবর্মার বীরদর্প কেমন যেন স্তিমিত হোয়ে আসে। রাজা যথাসম্ভব কোমল কণ্ঠে ডাকে, রাণী, রাণী, শর্মিষ্ঠা!

ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত কোরে সেই নবশষ্পবর্ণা শর্মিষ্ঠা সহসা চক্ষু উন্মীলিত কোরলো—তারায় তারায় তীব্র বেগে তড়িৎ খেলে গেল। রাজা ক্ষণতরে বিহ্বল হোয়ে প'ড়ে বোললো, কি জানি, কি আছে তোমার চোখে যার দিকে তাকাতে আমার মত নির্ভীকের হৃদয়েও আঘাত লাগে। আমাকে তোমার ঘৃণা করা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ঘৃণার মধ্যে কোথা থেকে পেলে ঐ চোখ-ঝল্‌সানো সূর্যরশ্মি। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আমি বীর—আমি তোমাদের রাজ্য অধিকার কোরেছি—তোমাকেও কোরেছি। সবলের নিকটে নারী সব সময়েই পরাজয় স্বীকার করে।

আমিও কোরেছি।—নির্লিপ্তভাবে শর্মিষ্ঠা উত্তর দেয়।

না—বিবাহ কোরেছি, কিন্তু তোমাকে পেয়েও পাইনি। আগ্নেয়গিরির মত তুমি জ্বলছো। তোমাকে দেখলে, তোমাকে স্পর্শ কোরলে—এমন কি তোমার সান্নিধ্যে এলেও আমি সেই অগ্নিজ্বালা অনুভব করি। আমি চাই তুমি শান্ত হও। তোমার জন্য আমি আমার অন্য সব মহিষীদের প্রেরণ কোরেছি চম্পানগরে—একমনে, একান্তভাবে শুধু তোমাকেই আমি পেতে চাই।

শারীরিক শক্তির দ্বারা তুমি তো তা করায়ত্ত কোরেছ—আমার যৌবনের সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ্ তুমি এক নিমেষেই আত্মসাৎ কোরে আমাকে নিঃস্ব, রিক্ত, ঐশ্বর্যহারা কোরেছ—আজ আমার দেবার তো কিছু নেই।

আছে, রাণী, আছে—তুমি আমাকে বাক্‌জালে প্রবঞ্চনা কোরছ।

অতি ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে শর্মিষ্ঠা বলে, আমি আজ পরিশ্রান্ত, রাজন্।

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর হয়, কিসের জন্য তুমি পরিশ্রান্ত? তোমার শ্রান্তির, তোমার অশান্তির কারণ কি?—কম্বোজের এই কণ্টকাকীর্ণ সিংহাসন যদি আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ কোরে ইন্দ্রনীলকে দান করি, তা হোলেও কি তোমার মন শান্ত হবে না?

গ্রহবর্মা! আমার মনস্তত্ত্বের দুর্ভাবনা তোমার বিবেচ্য নয়—আর আমার মনস্তুষ্টির জন্য তোমায় চিন্তান্বিত হোতেও হবে না। আমার ভ্রাতা ইন্দ্রনীলের ধমনীতে সূর্যবংশের রক্ত প্রবাহিত হোচ্ছে। সে বীর, সে তার ভগিনীর বিনিময়ে তার পৈতৃক হৃতরাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি চায় না। নিজের জন্মগত অধিকার কম্বোজের রাজত্ব সে স্বীয় বাহুবলেই পররাজ্য হরণকারীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, আর সেই সঙ্গে সে পিতৃহত্যার চরম প্রতিশোধও নেবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কর্কশকণ্ঠে গ্রহবর্মা বোলে ওঠে, স্ত্রী হোয়ে, সন্তানের জননী হোয়ে যে রমণী স্বামীর মৃত্যু-কামনা করে সে মাতৃনামের অযোগ্য।

শর্মিষ্ঠা নীরব, নিস্তব্ধ, নিষ্ক্রিয়—স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল, নিস্পন্দ!

গ্রহবর্মা পুনরায় প্রশ্ন কোরলো, আমাকে তুমি বিবাহ কোরলে কেন?

শর্মিষ্ঠা নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দেয়, বিবাহ আমি করিনি, আমার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য কোরে, আমার সে সব অনুনয় আকুতিতে কর্ণপাত না কোরে, তুমিই বলপূর্বক আমাকে নিজের কবলে বদ্ধ কোরেছ! সবলে নারীর যথাসর্বস্ব অপহরণ করার নাম আর যাই হোক—বিবাহ কখন নয়!

গ্রহবর্মা দৃঢ়স্বরে বলে, এতোই যদি তোমার মর্মজ্বালা তো আত্মঘাতী হোলো না কেন?

আবার নিষ্কম্পস্বরে শর্মিষ্ঠা বলে, সাময়িক দুর্যোগ জীবনে আসে, ইহলোকে দৈব-দুর্বিপাকে নানা দুর্ঘটনা ঘটে, তাই বোলে আত্মহত্যা কোরে যে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ কোরে চিরতরে শান্তি পাবো মনে করে, সে নর হোক, নারী হোক—সে মহাপাপী, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। যাও রাজা, তোমার কক্ষে যাও—আমি এখন বিশ্রাম কোরবো।

আজ আমি এইখানে নিশিযাপন কোরবো—গ্রহবর্মা পরিচারিকার দিকে ফিরে মাথা নিচু কোরতেই সে রাজার শিরোধৃত মুকুট খুলে নেয়।

পরদিন কোন্ এক অদৃষ্ট আকর্ষণে রত্নদত্ত সন্ধ্যার পর অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে হাজির হোলো। তখন সবেমাত্র বহুবিচিত্র বাদ্য-সমভিব্যাহারে উর্বশীতুল্যা উগ্রতারার নৃত্য সুরু হোয়েছে। অসংখ্য উজ্জ্বল দীপালোকে নৃত্যস্থল উদ্ভাসিত। সুবৃহৎ আসরে বহু বিত্তবান্ ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণ সেই অপূর্ব নৃত্য সমভাবে উপভোগ কোরছে। রত্নদত্ত বহু আয়াসে ধীরে ধীরে অগ্রসর হোয়ে আসরের প্রায় সম্মুখভাগে আসন গ্রহণ কোরে তন্ময়ভাবে নৃত্য দেখতে থাকে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও সুকুমার কলার এই অভূতপূর্ব সমাবেশ সে পূর্বে কখন দেখেনি। স্থান, কাল, পাত্র বিস্মৃত হোয়ে রত্নদত্ত উগ্রতারার মদিরাময় আঁখির চঞ্চল কটাক্ষ, মুক্তা-পঙ্‌ক্তি-সদৃশ দন্তরাজি, স্ফীত পীনপয়োধর, ক্ষীণ কটি, ঈষৎভারাক্রান্ত রম্য নিতম্ব, কদলীবৃক্ষসম গুরু উরু। ত্রস্ত হরিণীর ন্যায় দ্রুত পদসঞ্চালন বর্ষার অপগমে পলি মাটির মত পেলব হস্তদ্বয়ের চুম্বকসদৃশ অঙ্গুলির বিভিন্ন মুদ্রার অদ্ভুত প্রকাশগুলি অবলোকন করে, আর তার হৃদয় নৃত্যের তালে তালে স্পন্দিত হোতে থাকে—সারা দেহের সকল অবয়ব রোমাঞ্চিত হোয়ে ওঠে।

নৃত্য শেষ হোয়ে যায়,—বহু কণ্ঠের প্রশংসার মধ্যে নর্তকী উগ্রতারা বিদায় গ্রহণ করে। জনতাও ধীরে ধীরে স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রস্থান করে। উজ্জ্বল দীপাবলী নির্বাপিত হয়। শূন্যপ্রায় মন্দির হোতে বার হোয়ে রত্নদত্তা দেখে, রাজপথ যেন আরো অন্ধকার। তার মনে হয়, এতক্ষণ সে সত্যই অমরাপুরীর ইন্দ্রসভায় ···

কে?—রত্নদত্ত থমকে দাঁড়ালো। পশ্চাতের অন্ধকার হোতে কে যেন ধীর স্পর্শে তার হাত ধরেছে! রত্নদত্ত পেছন ফিরে দেখলো—সর্বাঙ্গ কালো-কাপড়ে-ঢাকা এক

নারী। নারী ফিসফিস কোরে বোললো, আমার নাম নয়নতারা—দেবী উগ্রতারার আমি প্রিয় সহচরী।

দেবী উগ্রতারা!—রত্নদত্তর কি এখনও স্বপ্নের ঘোর আছে!

হাঁ, আর্য!—নয়নতারা বিনয়নম্র বচনে বলে, সখীর আগ্রহেই আমি আপনার সন্দর্শন-অপেক্ষায় এখানে ছিলাম। সখী উগ্রতারা আপনাকে তার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে স্মরণ কোরেছে।

রত্নদত্তর সারা শরীরে সে কি শিহরণ, সে কি স্পন্দন, সেকি মৃদুমন্দ আলোড়ন! মুহূর্তের জন্য সে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হোয়ে গেল!

নয়নতারা অতি বিনীতভাবে বোললো, আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোরতে পারেন। আসুন আর্য, আমরা এইদিকে যাবো।—সে অতি সন্তর্পণে রত্নদত্তর হাত ধ'রে পার্শ্বের সরণিতে প্রবেশ কোরলো।

অনেকগুলি সর্পিল সরণি অতিক্রম কোরে ওরা দেবী উগ্রতারার গৃহদ্বারে উপনীত হোয়ে দ্বারে মৃদু করাঘাত কোরতেই দ্বার খুলে গেলো। রত্নদত্ত দেখলো, উজ্জ্বল দীপাবলি হস্তে দুইজন পরিচারিকার সঙ্গে স্বয়ং উগ্রতারা দ্বারদেশে উপস্থিত। উগ্রতারা নতমস্তকে রত্নদত্তকে অভিবাদন কোরলো। রত্নদত্ত উগ্রতারার পশ্চাদ্‌গামী হোয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরলে, পশ্চাতে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ হোলো। উগ্রতারা রত্নদত্তকে কোনো কথা না বোলে পরিচারিকার হস্ত হোতে দীপাধার নিয়ে, রত্নদত্তর সাম্‌নে তুলে ধ'রে গভীর সন্ধানী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কোরতে থাকে। এ যেন প্রদীপ তুলে ধরে দেবতার মুখ নিরীক্ষা! রত্নদত্ত যেন কিঞ্চিৎ চঞ্চল—উদ্বিগ্ন। উগ্রতারা দীপাধার নামিয়ে মধুক্ষরা কণ্ঠে বোললো, আমাব কৌতূহল মার্জনা কোরবেন, আর্যপুত্র! আসুন, দরিদ্রেব কক্ষে এসে উপবেশন করুন।

উগ্রতারা দীপাধার ধ'রে পথ দেখিয়ে অগ্রসর হোলো—রত্নদত্ত হোলো তার অনুগামী। প্রাঙ্গণ, সোপান, অলিন্দ ও পরপর কয়টি কক্ষ অতিক্রম কোরে একটি সুসজ্জিত কক্ষে এসে ওরা থামলো। রমণীয় কারুকার্যখচিত আস্তরণে রত্নদত্ত আসন গ্রহণ কোরলো।

তখন উগ্রতারা বোললো, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা কোরবেন—এভাবে আপনাকে নিয়ে এসে উচিত কোরলাম কিনা জানিনা।

রত্নদত্ত মৃদু হেসে বোললো, এভাবে আমাকে নিয়ে আসার মধ্যে উচিত অনুচিতের কথা না ভেবে, আমার ভাবনা সম্পূর্ণ দূর করুন, সুন্দরী।

আপনি কে?

একজন বিদেশী নগণ্য সার্থবাহ।

বিশ্বাস-করি না।

তাতে আমার ক্ষতি কি?

আমার নৃত্যের সময় আপনি সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিলেন কেন?

রত্নদত্ত হো হো কোরে হেসে উঠে বোললো, ঐ প্রাচীরগাত্রে বৃহৎ মুকুর স্থাপিত আছে,—ঐ মুকুরের সামনে দাঁড়ালেই আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

উগ্রতারার মুখের ওপর খুশীর আলো পড়লো, বোললো, আপনি আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছেন। আমার সন্দেহ হোচ্ছে আপনার এই দাড়ি কৃত্রিম বোলে।

না, কৃত্রিম নয়। টেনে দেখতে পারেন। যাই হোক আপনার ভুলের জন্যই আপনাকে ধন্যবাদ।

কারণ?

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা জগদ্‌বিখ্যাতা নর্তকীর সঙ্গে পরিচিত হোয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে কোরছি। রাত্রি অধিক হোলো এবার আমাকে বিদায় দিন।

পরিচয় না দিলে বিদায় পাবার উপায় নেই।

তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই, তবে আমার সাথী মিত্রদেব চিন্তিত হবে।

তিনি কোথায় আছেন?

ভানুবিহারের সন্নিকটে যাত্রিনিবাসে।

তাঁর নিকট আমি এখনই সংবাদ পাঠাচ্ছি।

উত্তম প্রস্তাব; তবে এই সংবাদবাহক আমি স্বয়ং হোতে চাই।

উগ্রতারা ক্ষুব্ধ হোয়ে বলে, মিথ্যাই আপনি আমার

রূপের প্রশংসা কোরছিলেন। আমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ কোরতে পারলেই আপনি বাঁচেন!

না, তা সত্য নয়,—রত্নদত্ত আবেগভরে বলে, একটু রাত তো তুচ্ছ···হাঁ, অনন্তকাল ধরে এই সৌন্দর্য-সুষমা দর্শন কোরেও নয়ন তৃপ্ত হয় না—অন্তর ভরে না। তবে সুন্দরী, মানুষ কর্মের দাস। আমাকে যাবার অনুমতি দিন—আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

রত্নদত্ত আসন ত্যাগ কোরে দাঁড়ায়। উগ্রতারা মস্তক অবনত কোরে বলে, সুঠাম, সুদর্শন, ছদ্মবেশী তরুণের প্রতীক্ষায় থাকবে আগামী রজনীতে প্রদীপ জ্বালিয়ে মহাস্থানের এক নগণ্যা নাগরিকা।

রত্নদত্ত ধীর কণ্ঠে বলে, বার বার আমাকে ছদ্মবেশী বলার হেতু কি জান্‌তে পারি?

হাঁ, উগ্রতারা দৃঢ় অথচ সংযত কণ্ঠে বলে, আমার কাছে আপনি ধরা পড়ে গেছেন, আর্যপুত্র। শুনুন, মন্দিরে আপনি যখন তন্ময় হোয়ে আমার নৃত্য দেখছিলেন, তখন সেই তন্ময়তার অসতর্ক মুহূর্তে আপনি আপনার রাজকীয় অভ্যাসমতে বার বার মুদ্রার জন্য—উপহারের জন্য পেছনে হাত বাড়াচ্ছিলেন,—যা উপস্থিত জনতার মধ্যে অন্য কোনজন করেনি। সুতরাং এ আমার অনুমান নয়—দৃঢ় বিশ্বাস আপনি···

বাধা দিয়ে রত্নদত্ত বলে, একটু আগেই তুমি নিজেকে নগণ্যা বোলেছিলে, কিন্তু তুমি তা নও—তুমি অনন্যা—অসামান্যা—অপূর্বা!

এরপর চঞ্চল চলমান যৌবনের স্বাভাবিক রীতি-অনুসারে রত্নদত্ত কলাশীলা প্রখর বুদ্ধিশালিনী উগ্রতারার বিলাস-ভবনে নিয়মিত গমন সুরু কোরলো, কিন্তু আত্মহারা হোলো না। সে নিজের প্রকৃত পরিচয় ও গভীরতম অন্তর্জ্বালা গুপ্তই রাখলো। তবে সুরুচিসম্পন্না বিলাসবতী মোহিনী উগ্রতারার স্নিগ্ধ শীতল সাহচর্য প্রলেপে তাহার বক্ষঃক্ষত অনেকটা উপশমিত হোলো। মিত্রদেব কিন্তু অশান্ত হৃদয়ে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অনন্যমনা হোয়ে রইলো—অতি প্রত্যূষে নিজ দেশ হোতে আনীত কতকগুলি পারাবত ও পক্ষীদের আহার্য দিয়ে বার হোতো পথে, আর গভীর রাত্রিতে পরিশ্রান্ত সে যাত্রি-নিবাসে প্রত্যাবর্তন কোরতো।

সেদিন রাত্রে মিত্রদেব যাত্রিনিবাসে প্রত্যাবর্তন কোরে বিস্ময়ে নির্বাক্ হোয়ে গেল—কক্ষে উপবিষ্ট রত্নদত্ত ও উগ্রতারাকে দেখে। মিত্রদেব যেন কিঞ্চিৎ বিব্রত।

উগ্রতারা বোললো, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, আর্য মিত্রদেব।

আমার সৌভাগ্য; আদেশ করুন, দেবী।

আমি আজ ভিক্ষার্থিরূপে আপনাদের দ্বারস্থ। আশা করি, ভিক্ষাদানে আপনারা আমাকে বঞ্চিত কোরবেন না। আপনার অংশীদার শ্রীযুত রত্নদত্তের সঙ্গে আমার পরিচয়ের বিষয় আপনি জানেন, আর আজই আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমি প্রথম লাভ কোরলুম।

মিত্রদেব বোললো, সম্পূর্ণ পরিচিত না হোলেও আমরা পরস্পর অপরিচিত নই।

সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই আজ আমি এসেছি আপনাদের কাছে আমার এক বিনীত আমন্ত্রণ নিয়ে—এই পান্থনিবাসের নানা অসুবিধার মধ্যে না থেকে, আসুন আপনারা আমার কুটিরে, আমি দু'জনকেই মাথায় কোরে রাখবো।

মিত্রদেব বলে, দেবী, আপনার এই সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমি স্তম্ভিত। কিন্তু দেবী, আমরা সার্থবাহ—দেশ বিদেশে ভ্রমণ কোরে বাণিজ্য করাই আমাদের রীতি, কাজেই পান্থনিবাসই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আশ্রয়। তাছাড়া পৌণ্ড্রবর্ধনের কাজ আমাদের শেষ হোয়ে গেছে। আমরা কল্য প্রাতেই রওনা হবো বঙ্গদেশ ও সমতটের পথে।

রত্নদত্ত একবার মুখ তুলে মিত্রদেবের দিকে তাকালো। মিত্রদেব তার মনোভাব বুঝতে পেরে বোললো, বন্ধু, তুমি কিছুদিন কার্যান্তরে ব্যস্ত ছিলে, তাই তোমাকে আমাদের এই কর্মসূচী জানানো হয়নি। ভেবেছিলাম, আজ রাত্রে বোললেই হবে।

রত্নদত্ত ধীর কণ্ঠে বোললো, তোমার কোন সিদ্ধান্তে কোনদিনই আমি অসম্মত হোই না, মিত্রদেব।

মিত্রদেব বলে, তা জানি রত্নদেব। রাত্রি গভীর হোয়েছে, দেবী উগ্রতারাকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে এসো।

উগ্রতারা উঠে বলে, বাইরে আমার অনুচররা আছে, আজ তবে আসি। বিদায় রত্নদত্ত, নমস্কার মিত্রদেব।—দ্রুতপদে উগ্রতারা কক্ষ হোতে নিষ্ক্রান্ত হয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য কক্ষ মধ্যে নীরবতা নেমে আসে। বাইরে একটা গাছে কি একটা পাখী হঠাৎ ঘুম ভেঙে ডেকে উঠলো। রত্নদত্ত ফুঁ দিয়ে প্রদীপ-শিখাটা নিবিয়ে দিলো। ঘরের মধ্যে নীরবতার সঙ্গে অন্ধকার ছেয়ে গেল।

পরদিন প্রত্যূষে মিত্রদেব রত্নদত্তকে জাগরিত কোরলো। অতি ক্ষিপ্রভাবে রত্নদত্ত শয্যাত্যাগ কোরে উঠে বোললো, আমি একটু বেশী ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম। মিত্রদেব, আমাদের যাত্রার সময় কি উপস্থিত?

হাঁ, তবে আমাদের যাত্রার সময় উপস্থিত নয়, শুধু আমার একার যাত্রার সময় উপস্থিত।

স্পষ্ট কোরে বলো মিত্রদেব! আমি তোমার কথার মর্ম বুঝতে পারছি না।

মিত্রদেব প্রসন্ন কণ্ঠে বলে, বহু চিন্তা কোরে আমি এই সিদ্ধান্ত কোরলাম যে, তোমাকে আমার সঙ্গে দেশবিদেশে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই। আমার প্রাণের চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য বহুগুণ বেশি। আর আমি তো অনিশ্চিতের পশ্চাতে ছুটে চ'লেছি—সফলতা কখন কিভাবে হবে তার নিশ্চয়তা কই! তাই এই মহাস্থানে যখন তোমার থাকার একটা বিশেষ সুবিধার আস্তানা পাওয়া গেছে, তখন তোমার এখানেই থাকা ভাল। যদি কোন সুযোগ ও সন্ধান ঐ সব দেশে পাই তো তৎক্ষণাৎ তোমাকে জানাবো আর দু'জনে সেইমত কাজ কোরবো।

মিত্রদেব, আমার সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য তুমি কৃচ্ছ্র-সাধন কোরবে, আর আমি নর্তকীর প্রমোদকুঞ্জে বিলাসে দিন অতিবাহিত কোরবো—এ অতি চমৎকার উপযুক্ত ব্যবস্থা!

বর্তমানে এই-ই উপযুক্ত রাজনীতি—তবে চমৎকার কিনা জানি না। আমাদের ধনরত্নের কিছু অংশ আমি সঙ্গে নিয়েছি, অবশিষ্ট তুমি সাবধানে সঙ্গোপনে রেখো। আর আমাদের এই পাখী ও পায়রাগুলো তুমি উগ্রতারার প্রাসাদে নিয়ে যেও। ওদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তুমি অপর কাউকে দিও না—কারণ কি, তা তোমার অজ্ঞাত নয়। আমি চলি·····

কিন্তু মিত্রদেব,—রত্নদত্ত বলে, নিজেকে বড় ক্ষুদ্র বোধ হচ্ছে।

তার জন্য ক্ষোভ কোরো না—শক্তির ও পৌরুষের দিন আসছে; সেদিনের জন্য প্রস্তুত হও। দেবী উগ্রতারাকে আমার নমস্কার দিও।

কক্ষ হোতে দুই বন্ধুতে বার হোয়ে অপেক্ষমান অশ্বের নিকট উপস্থিত হোলো। গভীর আবেগে দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হোলো। পূর্বগগনে তখন সবে স্বর্ণথালির ন্যায় অরুণদেবের আবির্ভাব হোয়েছে।

মিত্রদেব অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কোরে সহাস্যে বোললো, বিদায় বন্ধু! শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

শপাৎ কোরে একটা শব্দ হোলো, বেগবান্ অশ্ব নক্ষত্রগতিতে ধাবিত হোতে থাকে। (ক্রমশঃ)

'প্রবর্ত্তক'-এর পঞ্চাশ বছর

অঃ অন্নপ্রসন্ন সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

॥ ৩ ॥

প্রবর্ত্তকের জন্ম (১৯১৫) হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত। এই সময়ে প্রবর্ত্তকের গতি ও প্রকৃতিতে যে লক্ষণগুলি ক্রমস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই : বিপ্লব হইতে সংগঠনের দিকে মোড় পরিবর্ত্তন, তরুণের চরিত্রগঠন, শুদ্ধ অধ্যাত্ম-ভিত্তিক জাতীয়তার স্বপ্ন এবং বাহ্যতঃ রাজবন্দী ও অন্তরীণদের মুক্তি আন্দোলন। এই সময়কার রচনার মধ্যে রাজবন্দী-মুক্তি-আন্দোলন প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় প্রধান স্থান পাইয়াছে বলা চলে। এবং এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, সে-সময়ে পত্র-পত্রিকার মধ্যে এই মুক্তি-আন্দোলনে প্রবর্ত্তক অগ্রণী ছিল।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সাম্রাজ্যের বিপদের দোহাই দিয়া "ভারতরক্ষা আইন" নামে এক আইন প্রণীত হয়। বাঙ্গালার শত শত যুবক এই আইনের কবলে বিনা বিচারে যত্রতত্র আটক হয়। সেই সময় ভারত সরকার একদিকে শাসন সংস্কারের লোভ এবং অন্যদিকে রক্তচক্ষু দেখাইয়া জাতীয় আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করিতে চাহিয়াছিল। বাঙ্গালার সেই দুর্দ্দিনে প্রবর্ত্তক শুদ্ধ সংগঠনের প্রেরণা দিয়া যে সেবা দিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইবার নয়। এই প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তকের প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলাল লিখিয়াছন, "যুদ্ধকালীন অন্তরীণ আইনে এই চারি বৎসর যাহারা বন্দী তাহারা মুক্তি না পাইয়া কারাবন্দী থাকিবে, আর দেশ নূতন শাসন সংস্কার লইয়া তাহাদের ভুলিয়া যাইবে? আর আমরাও বাইরের রাষ্ট্রসংস্কারের প্রতি অনপেক্ষ হইয়া আত্মার গতি ধরিয়া চলিব? ইহা যেন বিসদৃশ মনে হইল।"

বাঙ্গালার রাজবন্দীর মুক্তির জন্য "প্রবর্ত্তক" শুধু আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, সক্রিয় অংশও গ্রহণ করিয়াছে। অন্তরীণদের মুক্তি আন্দোলনের সেই অপ্রকাশিত অধ্যায় আজ প্রকাশ না করিলে, বাংলার জাতীয় ইতিহাসের একটি অধ্যায় অস্পষ্ট বা মিথ্যারঞ্জিত হইয়া থাকিবে। তাই সে-যুগের এই ঐতিহাসিক অবস্থার কথা প্রবর্ত্তক-এর পৃষ্ঠা হইতে একটু সবিস্তারই বলিবার প্রয়াস করিব।

'অন্তরীণ' শীর্ষণায় প্রকাশিত (২য় বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা) প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"বাঙ্গালীর আজ বড় সমস্যার দিন। জানিনা ভগবান কেমন করিয়া এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা হইতে বাঙ্গালী জাতিকে উত্তীর্ণ করিবেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের শিক্ষিত জনসাধারণ বাঙ্গালীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অল্পাধিক মর্ম্মাহত হইয়াছেন। একজন মাদ্রাজী নেতা নাকি প্রবাসী সম্পাদককে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "Bengal has been terrorised by the internments", বাংলা অন্তরীণের ভয়ে দমিয়া গিয়াছে। কথাটা কি সত্য?

"ভারতের সকল প্রদেশাপেক্ষা বাংলার দমননীতি প্রবল। এই আড়াই বৎসরের (মধ্যে বাংলায় সহস্রাধিক কর্ম্মীযুবক আবদ্ধ হইয়াছে—এখনও যে বাঙ্গালীর বুকে উৎসাহের প্রদীপ জ্বলিয়াছে, ইহাই আশার কথা। এইরূপ আঘাত পাইলে অন্য প্রদেশ কিরূপ অবস্থা লাভ করিত তাহা বলা বড় দুঃসাধ্য।

"১৯০৫ সাল হইতে বাংলায় যে প্রচণ্ড আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অবিরাম গতিতেই ছুটিতেছে। এই খরতর প্রবাহে বাঙ্গালী নানা ভাবে ব্যথিত ও বিপর্য্যস্ত হইলেও যে ক্রমশঃ শক্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেবল রাজসিক ভাবের কর্ম্মপ্রেরণায় বাংলার যুবকমণ্ডলী যদি চিরদিন নিরত থাকে তাহা হইলে ক্রমশঃই তারারা শক্তিহীন হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে, এইজন্য তাহাদের গতির পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

"প্রবর্ত্তক শান্তি চাহে—রাজ্যে সুশাসনের পক্ষপাতী.

বাঙ্গালীর চরিত্রকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভগবৎ ইচ্ছার অনুগত করিবার সঙ্কল্প রাখে, পরন্তু হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি যাহাতে না হয় আর "প্রবর্ত্তক" সেদিকে চিরদিন দৃষ্টি রখিবে। "প্রবর্ত্তকের" ভাব ও ভাষাকে ইহার বিপরীত অর্থে যাঁহারা গ্রহণ করে তাঁহারা ভ্রান্ত এ কথা স্পষ্ট বলিয়া আমরা কয়েকটি কথার অবতারণা করিতে চাহি।

"বিধিসঙ্গত আন্দোলনে ভারতে "হোমরুল" প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমতী বেসান্ত যখন দুইজন সহচর সহ সহবন্দী হইলেন তখন ভারতের সকল প্রদেশের নেতাগণের মধ্যে একটা হা-হুতাশ ও আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গেল, বাঙ্গালী সে আন্দোলনে পূর্ণমাত্রায় যোগদানে অসমর্থ হইয়া উঠিল। টাউন হল সভায় নিষেধ পত্র অবলম্বন করিয়া সে যে লীলা অভিনয় করিয়াছিল তাহা সকল শিক্ষিত ভদ্রলোকই জানেন। পরে বাঙ্গালী নেতা সুরেন্দ্রনাথ যথা নামে নিত্যকর্ম্ম শেষ করিলেন। বেসান্ত ইংরেজ মহিলাই হউক, অথবা ভারতবর্ষের সকল নেতৃমণ্ডলীর কলরবেই হউক তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু মিষ্টার মহম্মদ আলী ও সাখাৎ আলী, তুমুল আন্দোলনের ফলেও মুক্তি পাইলেন না। কেননা তাঁহারা কেবল বাক্য সংযম করে নাই বলিয়াই যে বন্দী হইয়াছেন এরূপ নহে, পরন্তু রাজশত্রু জার্ম্মাণীর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান অবস্থায়ও তাহাদের মতের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। (Their attitude has not been materially changed), কিন্তু বেসান্তের মুক্তিতে কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, তাঁহাদের আন্দোলনের ফলেই ইহা সফল হইয়াছে, সেইজন্য অতঃপর সকল রাজনীতিক বন্দিগণের মুক্তির জন্য চতুর্দ্দিকে একটু একটু অস্ফুট শব্দ শোনা যাইতেছে। সেদিন মহিলা সভায় শ্রীমতী প্রতিমা দেবী বাংলার প্রকাশ্য সভায়, এই প্রথম হতভাগ্যদের মুক্তির জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তারপর শ্রীমতী বেসান্তের মুক্তির উল্লাস প্রকাশের "রাক্ষসী" সভায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ এই কথা পুনরুত্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সংবাদপত্রের মধ্যে 'নায়কেই' এতদ্ সম্বন্ধে দুই একটি কথা লেখা হইত। আজকাল সকল সংবাদপত্রই ইহার যৎসামান্য আলোচনা করিতেছে।

"অধুনা মধ্যে মধ্যে দুই একজন রাজনীতিক বন্দীর মুক্তির বার্ত্তা সংবাদপত্রে দেখিয়া থাকি। পুকুরে বেড়াজাল দিবার কালে মৎস্য নহে, এরূপ অনেক জীবই তাহাতে আসিয়া পড়ে, সুতরাং সেরূপ দু'একজন নিতান্ত নিরীহ ভদ্রলোকের মুক্তিতে দেশ আশান্বিত হইতে পারে না। মহম্মদ আলী ও সাখাৎ আলির জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজ আন্দোলন করিয়াও যদি সে পথে কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলে বাংলার নন্দদুলালগণের জন্য যে ক্ষীণ আবেদন করা হইয়াছে তাহা যে একেবারে নিষ্ফল হইবে এ কথা না বলিলেও চলে। 'নায়ক' সত্যই বলিয়াছেন, বাঙ্গালী অন্তরীণদিগের মুক্তি আশাও সুতরাং নিরাশায় পরিণত হইল।

"আশা-কুহকিনী এতদ্‌সত্ত্বে মানুষের আশা নিবৃত্তি হয় না। উপস্থিত ভারতসচিবের আগমনে ভারতে যদি প্রকৃত শান্তির ছবি প্রকৃষ্টতর করিয়া রাখিতে হয় তবে এই সহস্রাধিক যুবক দোষীই হউক আর নির্দ্দোষই হউক ইহাদের মুক্তি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। মহামতি চেম্‌স্‌ফোর্ড শান্তির পক্ষপাতী বুঝিয়াই আমরা এই কথাগুলি ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালী গৃহস্থগণের পক্ষ হইতে বলিতেছি। বেসান্তের মুক্তিতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ যে আন্দোলন সৃষ্টি করিতেছেন তাহাই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন —It is absolutely necessary that India should be perfectly quiet during Mr. Montagu's Sojurn in this country." অর্থাৎ মিষ্টার মণ্টেগু যতদিন ভারতে থাকিবেন ততদিন ভারতবর্ষে পূর্ণ শান্তি সাধন একান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা বাঙ্গালীর নয়নমণিদের মুক্তিদান করিয়া প্রকৃত স্থায়ী শান্তিস্থাপনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি।

"বাঙ্গালার শত শত যুবক যে যে কারণে বন্দী তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কেহ কেহ রাজনৈতিক হত্যাপরাধ সন্দেহে, কেহবা রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে, কেহবা এই উভয় কর্ম্মের

পোষকতা করিয়াছে বলিয়া, আবার অধিকাংশই হয়ত উপরোক্ত অপরাধীগণের সহিত নানা সংস্রবে জড়িত এইরূপ সংশয়ে অন্তরীণ হইয়াছে। বাংলার সনাতন চরিত্রে এই যে নরহত্যা ও চৌর্য্য অপরাধে আরোপ তাহা খুবই গুরুতর বটে, কিন্তু এই সকল যুবক বিপথগামী হইলেও ইহারা পরার্থজ্ঞানে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছে। এই সকল ত্যাগী কর্ম্মীযুবক যদি সমাজে যথার্থ কর্ম্ম করিতে পায় আমাদের মনে হয় তবেই অশান্তি চিরতরে বিদূরিত হইতে পারে। দিনাজপুরের রাজনৈতিক অপরাধী শচীন্দ্রনাথ মৃত্যুকালে যাহা লিখিয়াছেন, "I can not remain in bondage in Society....I can not live in Society without being a true member of it and without free activity....I pray to god that I may be born in Bengal with everything good in me." অর্থাৎ আমি মনুষ্যসমাজে বন্ধনদশায় থাকিতে পারি না। সমাজের প্রকৃত বন্ধু হইয়া থাকিতে না পারিলে, আমার কর্ম্মপ্রেরণা অবাধে সম্পন্ন করিতে না পারিলে বাঁচিতে পারি না। আমি সকল সদ্‌গুণ লইয়া আবার যেন বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ কবিতে পারি, হে ভগবান! ইহাই আমার প্রার্থনা। উহা কি এনার্কিষ্টের উক্তি! গ্রহচক্রে আজ জোর করিয়া এইরূপ সহস্র বাঙ্গালী এনার্কিষ্ট মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা বলি অমিতবিক্রমশালী ইংরাজ এই নিরস্ত্র সহস্রাধিক যুবকের ভয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহেন। অতএব যথারীতি বিচারপূর্ব্বক ইহাদের মুক্তি দেওয়া হউক, ইহাদেব অতীত জীবনের যতকিছু অপরাধ থাকে, তাহা মার্জ্জনা করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করুন। এই সকল রাজনৈতিক বন্দী যুবকগণ মুক্ত হইয়া যদি দ্বিতীয়বার অপরাধ করে তবে তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। ফরাসী রাজ্যে এইরূপ এক-প্রকার আইন আছে যে, প্রথম অপরাধীকে যথারীতি বিচার করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সে বিচারে যাহা শাস্তি হয় তাহার দ্বিতীয় অপরাধে প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের শাস্তি একত্র করিয়া তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আমরা এই একই উপায়ে বাঙ্গালার সকল রাজ-নীতিক বন্দীর মুক্তির আশা করিতে পারি।"

রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়া এবার প্রবন্ধে মুক্ত তরুণ বন্দীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই ইঙ্গিতে অধ্যাত্মভিত্তিক জীবনগঠনের প্রেরণা মিলে যাহা ভবিষ্যৎ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সৃষ্টিরই হেতু হইয়াছে: "বাঙ্গালীর জীবনে যে দেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। আজ এই সহস্রাধিক বাঙ্গালী অন্তরীণে বসিয়া বসিয়া রোদন করিলে চলিবেনা, বাংলার যুবকসঙ্ঘকে নির্ভয়েই পথ চলিতে হইবে। যে দেশের নেতৃমণ্ডলী সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশায় আত্মহারা হইয়া বিপদ সম্পদ এক করিতে পারে না, যে দেশের জননেতাগণ কর্ত্তব্যের জন্য ইহজীবনের সকল স্বার্থ পদাঘাতে দূর করিতে পশ্চাৎপদ হয় তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। একমাত্র ভগবানকে অবলম্বন করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। পথের বিভীষিকা সৎসাহসের অভ্যুদয়ে বিদূরিত হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে অতঃপর আমরা অস্পষ্ট সংশয় এবং জটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট নিঃসংশয়িত সরল পথেই পরিচালিত হইব। আমাদের গতিপথে যত বড় বাধাই আসিয়া উপস্থিত হউক না তাহাকে অতিক্রম করিবার জন্য আমরা কোনমতেই কুটিল পন্থা অবলম্বন করিব না। জানি, দেশব্যাপী সংশয় এবং কাপুরুষতায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মৃতপ্রায়, নতুবা মহাপ্রাণ শচীন্দ্রনাথ মানুষের বাধায় উপায়হীন বলিয়া আত্মহত্যা করিবে কেন? হরিদাস উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে কেন? বাঙ্গালী কি ভাবিয়া দেখিবে না "পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্ মূকং করোতি বাচালম"। ভগবান চরণাশ্রয় করিলে জীবন কি ভাঙ্গিয়া পড়ে; জনহিত-সাধনায় কি দুঃসাধ্য হয়? হায় হায় ভগবদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবে আবার নানা দুরবস্থার মধ্যে আজন্ম নিগৃহীত হইয়াও বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে বীরের মত চলিতে শিখিবে?"

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দবাবুর নিকট মান্দ্রাজের জনৈক নেতা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার বিপ্লবীগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার কারণ বাঙ্গালা হোমরুল আন্দোলনকে যথাযথ-

ভাবে গ্রহণ করে নাই। হোমরুল আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্র মাদ্রাজে। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতী এ্যানি বেসান্ত। ইনি ১৯১৪ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন।

এ্যানি বেসান্ত ছিলেন মাদ্রাজ থিওসফিকেল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী। ইনি ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করিয়া হোমরুল-এর (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন) পক্ষে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আয়র্ল্যাণ্ডে এই আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশ ভারতে ঔপনিবেশ স্বায়ত্ব শাসন লাভই ছিল এই আন্দোলনের মূলকথা। তিনি প্রথমে আয়র্ল্যাণ্ডের অনুকরণে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবং আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য "কমন উইল" নামক একখানা দৈনিক কাগজ প্রকাশ করেন। এই কাগজে ভারতবাসিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী প্রচার করা হয়। যাহাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দাবী গ্রহণ করে তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

তিলক কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯১৬ সালে এপ্রিল মাসে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা দক্ষিণ ভারতে হোমরুল লীগ আন্দোলনের ঝড় বহিতে লাগিল, কিন্তু উক্ত আন্দোলন পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট বিধায় বাংলার মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত বাংলা উক্ত আন্দোলনে সাড়া দেন নাই।

শ্রীমতিলাল "প্রবর্ত্তকে" (২য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা) উক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে যে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সমসাময়িক কালের বাংলার রাজনীতিক মানসচিত্রটি সুপরিস্ফুটই শুধু হয় নাই, প্রবর্ত্তকের ভারতীয় ভাবসম্মত ভাবী কর্ম্মপন্থারও আভাস পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর বিচিত্র আত্মপ্রকাশের ধারায় ভগবানকেন্দ্রিক ভাগবত জীবনগঠনের ইঙ্গিত প্রবর্ত্তকের এই রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যেও আকারে ইঙ্গিতে দেওয়া হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের জন্যই প্রবর্ত্তকের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "হোমরুল" প্রবন্ধটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"ভারতের বিধাতৃপুরুষগণ তাঁহাদের সত্ত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যখন বর্ত্তমান মরণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে দিতে প্রতি মুহূর্ত্তে সিদ্ধির প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের এই দারুণ উৎকণ্ঠার সময়ে প্রজার জাতি আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। বিদেশিনী বাসন্তী বিবি যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে হোমরুল আন্দোলন প্রকট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"সে আজ এক যুগের কথা—সেদিন বাঙ্গালী মাত্রেই বঙ্গভঙ্গে ব্যথিত হইয়া এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল—একই কেন্দ্র হইতে বিধাতার অমর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বদেশব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিল। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু এই স্বদেশ-প্রেমের খরতর প্রবাহ বাঙ্গালীকে বিভিন্নমুখী করিয়া তুলিল। ১৯০৭ সালে দেশনেতৃগণ সুরাট জাতীয় মহাসভায় দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল। পরলোকগত ফিরোজ শা মেটা ও দিনশা ওয়াচা, মদনমোহন মালব্য রাসবিহারী ঘোষ, দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের কতক শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া এলাহাবাদে কনভেন্‌শনের সৃষ্টি করিলেন।

"যে উৎসাহে যে ত্যাগের মহামন্ত্র লইয়া বাঙ্গালী জাতি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, নেতৃমণ্ডলীর অদূরদর্শিতার জন্য এবং পরস্পর মতবিরোধের গণ্ডগোলে তাহা লোপ পাইতে চলিল, দেশের শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত না হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিপ্লববাদ বা এনার্কিজমে দেশ ভরিয়া উঠিল, আজ বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য আমরা জ্ঞানতঃ কাহারও অপরাধ না দেখিলেও বস্তুতঃ দেশের নেতৃমণ্ডলীই যে তজ্জন্য অধিকতর দায়ী একথা নিঃসন্দেহে বলিব।

"অধুনা বাসন্তি দেবীর অন্তরীণ এবং কলিকাতা মহাসভার নিবারণে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে তরঙ্গের প্রবাহ বহিতেছে তাহা অভিব্যক্ত করিবার কি উপায় কবা যাইতে পারে। এতদ্‌সম্বন্ধে রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ মহা ভাবনায় পড়িয়াছেন—সেদিন শতাধিক হিন্দু মুসলমান নেতৃমণ্ডলী দুই ঘণ্টা বাকবিতণ্ডার পরও কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই।

"স্বদেশী যুগের প্রবল আন্দোলনে আমরা বাংলার ব্যক্তিগত চরিত্রের আভাষ পাইয়াছি। আজ রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল ঝটিকার উৎপত্তি হইয়াছে ইহার সুমীমাংসা করিতে হইলে আমাদের নেতৃগণের মধ্যে যে ত্যাগ, যে চরিত্র থাকা আবশ্যক তাহা আছে কিনা প্রকাশ না দেখিলে বলিতে পারি না। তবে বাংলার 'হোমরুল' সভার মেরুদণ্ড সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ, ব্যবহারজীবী ব্যোমকেশ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথেরই মুখপানে চাহিয়া আছেন। বৃদ্ধ মতিলাল জীর্ণ শরীর লইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে এই হোমরুল তরঙ্গে জাতির জীবন-তরণীর কর্ণধাররূপে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া ব্যথিত, চতুর পাঁচকড়ি "মামা"র জয় দিতেছেন। আজ মহা সমস্যা সুরেন্দ্রনাথের—রাজনীতিক্ষেত্র ক্রমাগত জটিলতর হইয়া উঠিতেছে—সুরেন্দ্রনাথ আজন্ম অনেক তরঙ্গ কাটাইয়া পথ চলিতেছেন, আজ তিনি বাঙ্গালীর কর্তব্য কিভাবে নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা দেখিবার জন্য অনেকেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে।

"বাঙ্গালীর এই কঠোর সমস্যা সমাধান কালে আমরা গোটাকয়েক কথা বলিয়া রাখি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী যে দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহার কারণ কি? এবং কাহারাইবা এই বিরাট আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন? জাতিগত আদর্শে বা উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা সে যুগে আমাদের পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য ভাবেরই উপাসক—পাশ্চাত্যের যে সাধারণতন্ত্র যার অনুগত হইয়া য়ুরোপ মনুষ্যজাতির মধ্যে সত্যযুগের (Millenium) প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট—তাহারই অনুকরণে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য য়ুরোপেরই মাল-মশলা লইয়া নেতৃগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সকল চেষ্টার চরম ফল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন—জাতীয় চরিত্রের উপযোগী অনুষ্ঠানের অভাবেই আমাদের এত বড় ত্যাগ ও কর্ম্ম একেবারে ব্যর্থ না হইলেও বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই।

"এই যে মন্ত্রীসভা লাটদরবারে আমাদের সমধিক বিস্তৃতি, রাজকার্য্য পরিচালনায় আমাদের কর্তৃত্ব, স্বায়ত্বশাসন সেইগুলির জন্য আমরা অমানুষিক পরিশ্রম ও অসাধারণ ত্যাগস্বীকার করিতেও দিন দিন প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছি, উহা পাশ্চাত্যেরই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী। পরন্তু প্রাচ্য উহাতে কতকটা শ্রেয়োলাভ করিবে সে বিষয়ে আমাদের নেতৃমণ্ডলীর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা য়ুরোপীয় অনুকরণে সাধারণতন্ত্র লাভ করিবার উপায়গুলি অথবা পাশ্চাত্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে জীবনের কেন্দ্র-স্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি, ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ড হইত, অষ্ট্রেলিয়া যদি ক্যানাডা হইত তাহা হইলে ইহাই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রাচ্যের কোহিনুর ইহার একটি স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলাই ভারতবাসীর তপস্যা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান রাজনীতিক ক্ষেত্রের যে জটিলতা, যে দুঃখকষ্ট, দ্বন্দ্ব তাহার নিবারণ হইতে পারে—যদি আমরা স্বায়ত্বশাসন পাই; যদি আমরা লাটদরবারে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারি, যদি আমাদের দেশের শাসন ব্যাপারে আমরা কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারি কিন্তু ইহাই তো ভারতের সবখানি নয়। য়ুরোপীয় প্রভাবের বাহিরে দাঁড়াইয়া একবার দেখ দেখি ভারতবর্ষের বিধাতার নির্দ্দেশ কোন্ উদ্দেশ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ যে সাধারণতন্ত্রের মোহন বাঁশী পাশ্চাত্যের রণ-প্রাঙ্গণে ধ্বনিত হইতেছে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিবে ভারতবর্ষ। সমগ্র জগৎ রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতির মধ্যে যে নূতন জীবন আরোপ করিবার বাসনা করিতেছে তাহা স্বাধীনভাবে সফল করিবে ভারতবর্ষ। ভারতই জগতের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যে সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিবে তাহার বিদ্যুৎপ্রভাবে অনন্ত কোটি পৃথিবীর প্রজা এক প্রেমের রাজ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিবে। আমরা বলি **ভারতবর্ষের যিনি নেতা, গুরু, পথপ্রদর্শক, তিনি পটান্তরালে অপেক্ষা করিতেছেন। পুরাতনের শেষাংশ অভিনয়ের অবসানে তিনিই প্রকট হইয়া ভারতকে নূতন পথে পরিচালিত করিবেন।**"

(ক্রমশঃ)

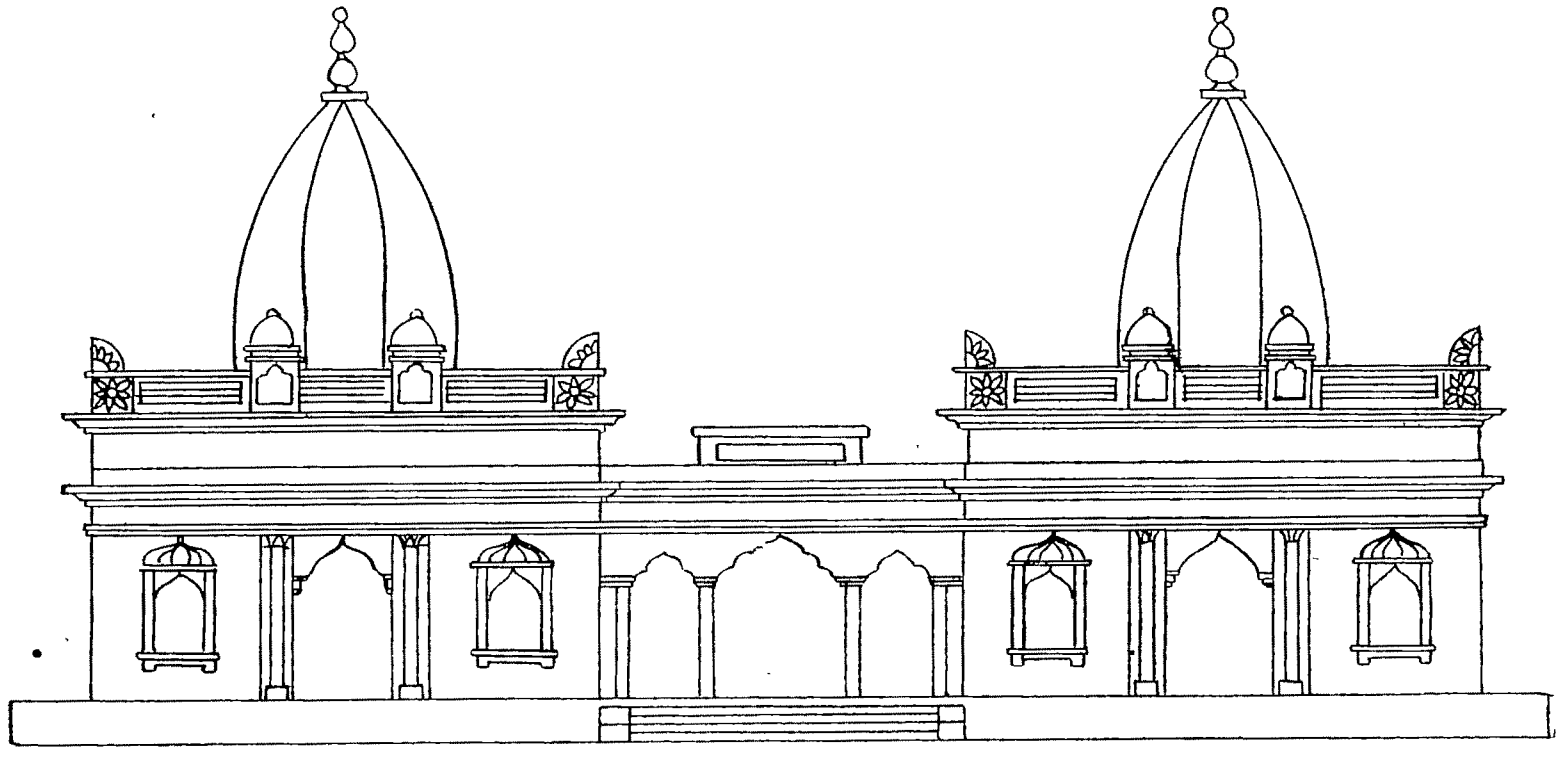

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ গুরুমন্দিরের পরিকল্পিত নক্সা-চিত্র :

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুকে সে-বার যখন দর্শন করি, তখন শরশয্যায় ভীষ্মদেবের মতই তাঁকে দেখেছিলাম। একাধারে ক্ষাত্রবীর্য্যের এবং ব্রহ্মণ্য তপোবীর্য্যের পরাকাষ্ঠা। মহাভারতে এ এক অতুলনীয় চরিত—

হে সাক্ষাৎ ত্রয়িতনু !
বাগদোহ প্রণব মূর্ত্তি হে পুণ্য পুমান্।
তুমি স্রষ্টা, তুমি দ্রষ্টা—
গুরুতত্ত্ব-মাতৃতত্ত্ব-ত্রিতত্ত্বের শক্তি মহীয়সী
অভয়-অমৃত-অশোক—
কর্ম্ম-ভাব-গুরু !

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

[১৭ই আষাঢ়, ১৩৭২ দিবসে এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ]

১৭ই আষাঢ়

[সঙ্ঘ-সভাপতির দিনলিপির একদিন]

আজ সেই ১৭ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার। পুষ্যা নক্ষত্র, তৃতীয়া জয়া তিথি। সেই পুণ্য মহাক্ষণ, যে ক্ষণে শ্রীগুরুমন্দিরের শিলান্যাসোৎসব চিহ্নিত হয়েছে। শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা—একটা নব যুগ, নব জাতির জন্ম-সূচনা!

ভোরেই ঘুম ভাঙ্গল। ভোরের আকাশ এখনও থম্‌থমে। কিন্তু পূর্ব্বাকাশে যেন কিছুর আলোর আভাস ফুটছে! অন্ততঃ মনের চক্ষে সেই রকমই আশার আলো! আজ মা ঠিক কি করবেন, তারই প্রত্যক্ষ দর্শন-প্রতীক্ষা। সকালেই প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান ও উপাসনান্তে প্রস্তুত। দ্রুত পদে আশ্রমে উপস্থিত হলুম। কয়দিন মুষলধারায় অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর আজ আকাশ ধরেছে যেন। মাতৃমন্দিরে মাকে ও সঙ্ঘগুরুভবনে ভগবান্‌কে প্রণাম করে' মনের প্রার্থনা জানালুম—উৎসব সার্থক হোক। তারপর, শুভাগত স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণতি জানিয়ে'—আলাপ। আলাপে উভয়তঃ তৃপ্তিরই সূচনা।

গোবিন্দগোপালবাবুকে ষ্টেষণ থেকে আনার জন্য লোক পাঠানো ভাল—যদি তিনি আসেন। নির্ম্মল ভাইই গেল—সঙ্ঘের মোটর নিয়ে। নির্ম্মল গোবিন্দ-বাবুকে সেদিন বর্দ্ধমানে গিয়ে চিনে' এসেছে।

উৎসবসূচীর বিভিন্নাংশের যার যা' ভূমিকা, তারা প্রায় সবাই এসে পড়েছে—বরণের মেয়েরা, সঙ্ঘাচার্য্য, স্বয়ং শিলান্যাসক, সঙ্ঘের ছাত্র-ছাত্রীরা, তারপর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা, প্রতিবেশী ও দূরাগত অতিথিরাও কিছু-কিছু। বিশাল বৃষ্টিরোধক চন্দ্রাতপমণ্ডিত মণ্ডপ—বেদী, শিলালিপিখণ্ড—সবই প্রস্তুত।

যথাসময়ে ঘণ্টার ঘোষণায় উৎসবের আরম্ভ হ'ল। পর-পর কর্ম্মসূচীপালন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণধনই সূচীধর পরিচালক। মঙ্গলাচরণ কে করবেন, যদি না গোবিন্দবাবু এসে পড়েন—এ-চিন্তাও চল্‌ছে। কৃষ্ণ-ধনের সুচিন্তিত বরণ-পরিকল্পনা। পঞ্চ কন্যার শঙ্খ-ধ্বনি, পুষ্প, দুর্ব্বাদল, গঙ্গাজল ও লাজবর্ষণের সঙ্গে ধীরে সমাধিক্ষেত্রে পরিক্রমণ। মেয়েরা প্রথমে প্রদক্ষিণে দিক্‌ভ্রম করেছিল—বামাবর্ত্ত না করে' দক্ষিণাবর্ত্ত—সঙ্ঘাচার্য্য উঠে' সংশোধন করে' দিলেন। একটী শঙ্খ বাজছিল না, নূতন শঙ্খ কে এনে দিল। সমাধিক্ষেত্রে পঞ্চ কন্যা প্রদক্ষিণ করলে পর, সঙ্ঘগুরুর প্রতিকৃতিতেও বরণ করল—মেয়েরা চন্দন-টীপ ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে। তারপর, স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী কর্ত্তৃক সমাধি-বেষ্টনীর চারি কোণে চারিটী নির্ম্মাল্য রাখার সঙ্গে ব্রহ্মযজ্ঞ বৈদিক উদ্গান—চারি বেদমন্ত্রে। এখনও মঙ্গলাচরণের গোবিন্দবাবু আসেন-নি। ফিরতি মোটরের হর্ণ বাজল, কিন্তু নির্ম্মল একাই ফিরল। গোবিন্দবাবু আসতে পারেন-নি—হয়ত-বা জরুরী টেলিগ্রামও ঠিক সময়ে পান-নি, কিম্বা ঝড়বৃষ্টির বাধাই সেখানে দুর্লঙ্ঘ্য হয়েছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীই প্রশস্তিমন্ত্র উচ্চারণ করলেন—সঙ্ঘ-প্রশস্তি। ইতিমধ্যে সহসা মাইক বন্ধ হয়ে গেছে—নিভে গেছে মণ্ডপের দিকে-দিকে আলম্বিত বিজলীর আলো—সহরের বিজলীতন্ত্রই তরঙ্গভঙ্গে এই ছন্দোভঙ্গ করেছে, কিন্তু তাতে উৎসবের ধারাভঙ্গ হয়নি।

সূচীর অনুবর্ত্তনেই স্বাগত-ভাষণ। ভূমিকায় পূর্ব্বানুভব নিবেদন করলুম—পুরোহিত মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপী-নাথ কবিরাজ মহাশয় আস্‌তে পারেন-নি, আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছেন—অনুভবে পাচ্ছি তিনি অধ্যাত্মভাবেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর এই অলক্ষ্য উপস্থিতির অনুভব পরে স্বামীজি মহারাজের ভাষণেও পেলুম। সে প্রসঙ্গে তাঁর মুখে ব্যাখ্যাও আরও বিশদ, আরও সুন্দর। দেহের উপস্থিতির চেয়ে আত্মার প্রভাব ও অনুভব আরও ব্যাপক, আরও মর্ম্মস্পর্শীই হয়। সিদ্ধ-ভাব-সাধক গোপীনাথজীর অলক্ষ্য অবস্থিতির কথা তিনিও ভাল করে'ই উপলব্ধি করেছেন নিশ্চয়ই—তার প্রকাশও করলেন তাই এত সুন্দর করে'।

তারপর 'নবসঙ্ঘে' ইতঃপূর্ব্ব প্রকাশিত 'স্বাগত ভাষণ পাঠ করলুম—

"স্বাগত সুধী ও সজ্জনমণ্ডলি,

চারি চৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি ও আমাদের অগ্রসজ্ঞ, সর্ব্বজনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয় নলিনদার সভাপতিত্বে অখণ্ড প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যে শ্রীগুরুমন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পব্রত গ্রহণ করেন, আজ তার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপনের শুভদিন সমাগত—এই শুভদিনে, শুভোৎসবে সমায়াত আপনাদের সকলকে সাদর অভিবাদন জানাইতেছি—আপনাদের শুভাগমন ও শুভকামনা আমাদের এই উৎসবকে সর্ব্বশুভময়, সিদ্ধিপূত ও সার্থক করুক।

আমাদের এই পুণ্যযজ্ঞে বহু সৌভাগ্যক্রমে মহাপুরোহিতরূপে আমরা পাইয়াছি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ পদ্মবিভূষণ মহোদয়কে—পরম পূজ্যপাদ যোগাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী একদা যাঁহাকে যুগভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরাজ বলিয়া অবিস্মরণীয় অধ্যাত্মস্বীকৃতি দিয়া গিয়াছেন। তাঁর এই প্রায় অশীতিপর পরিণত বয়সে, এমন একান্ত আপনজনরূপে আমাদের মধ্যে পাইব—ইহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। সঙ্ঘের আহ্বান জানানো মাত্র তিনি সানন্দ হৃদয়ে তাঁর সম্মতি দিয়াছেন—তাঁর অসুস্থ, অপটু শরীরে এত পথক্লেশ সহ্য করিয়া আসিতে না পারিলেও, এই যজ্ঞের পৌরোহিত্যপদে অধ্যাত্মভাবে সমাসীন হইয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের সঙ্ঘের ও প্রণিপাত জানাইতেছি।

প্রণিপাত জানাইতেছি—আরও বর্ষীয়ান্, পঞ্চাশীতি-পর মহান্ দর্শনাচার্য্য ও সিদ্ধ সন্ন্যাসী, পরমহংস প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজকেও—এ যুগের বেদাচার্য্যের মত তিনি মন্ত্রবিজ্ঞানবিৎ হইয়া স্বতঃস্ফূরিত মন্ত্ররহস্য উদ্ঘাটন ও তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহাকেই আজ আমাদের নবমন্দিরের শিলান্যাসক-রূপে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। তাঁহার স্বরচিত মন্ত্রক্ষরা সঙ্ঘগুরুবন্দনা এই শ্রীমন্দিরের ভিত্তিগাত্রে শিলাঙ্কিত থাকিয়া চিরদিন গুরুমহিমা ও সঙ্ঘমাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে।

সচল তীর্থস্বরূপ বরণীয় যুগাচার্য্যদ্বয়ের মহিম-স্পর্শে পবিত্র সঙ্ঘতীর্থ আজ আরও তীর্থীকৃত হইল।

শ্রীতি-নমস্কার জানাইতেছি আজ আগত ও অনাগত সকল সঙ্ঘমিত্র-মিত্রাগণকেও—যাঁহাদের শুভমতি, সহৃদয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের সঙ্কল্পপথে উৎসাহ দিয়াছে—পাথেয় যোগাইয়াছে—সহায় হইয়াছে। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি প্রসারিত হইয়া, আমাদের আজিকার শুভারম্ভকে 'সুসমাপ্তিতে লইয়া চলুক—ক্ষিপ্র ও পূর্ণাঙ্গ হউক সংযুক্ত তপস্যায় আমাদের নবতীর্থরচনা।

সে তীর্থ—সঙ্ঘমাতা ও সঙ্ঘগুরুর যোগতীর্থ। 'গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা, মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ'—ইহা প্রেম ও ঐক্যেরই পুণ্যতপোভূমি। সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘমাতৃকার জীবনযোগে—শিবসত্তার ও সতীশক্তির মহামিলনে—সঙ্ঘশক্তিরই কল্পস্বপ্ন নিহিত ছিল। চিহ্নিত লগ্নে ও অনুকূল-প্রতিকূল ঘটনাশক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় পর্ব্বে-পর্ব্বে তার উন্মোচন। বিপ্লবে-সংগঠনে—সঙ্ঘসাধনায়—এই কুণ্ডলিত মহাশক্তির ক্রমপ্রকাশ। আগামী যুগপ্রভাতে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ত্রিপ্রস্থানে—উহারই নবজন্ম হইবে অভিনব জাতিরূপে। বাংলায় ভাগীরথীপশ্চিমকূলে, দ্বিতীয় কাশীক্ষেত্রস্বরূপ শিবধাম চন্দননগরে, আজিকার এ গুরুমন্দির-শিলান্যাসে সেই পূর্ণযোগতীর্থেরই নবতর উদ্বোধন হইল।

যোগভূমি ভারতবর্ষ বেদ, বর্ণাশ্রম ও কর্ম্মসিদ্ধির মহাপীঠ। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, ঋষি, বিভূতি বা দেবকল্প যুগাবতারগণই ইহার জীবনশাসনে চিরদিন যথার্থ অধিকারী। তাই যোগানুশাসিত জীবনের প্রবাহেই—কখনও সিন্ধুস্রোতে, কখনও ফল্গুধারায়—যুগে-যুগে এ জাতির ঐতিহাসিক তীর্থপরিক্রমা।

'হরি-হর-বিধিবেদ্যং'—ত্রিযোগশক্তির যুগাবতার পূর্ণযোগমূর্ত্তি ভগবান্ দত্তাত্রেয়। তাঁরই বরপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তিযোগী শ্রীমৎ বিষ্ণুভাস্কর লেলে দেবাদেশে গিরি গীর্ণার হইতে বরোদায় আসিয়া, নবজাতির রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীঅরবিন্দকে দীক্ষা দিলেন—গীতার আত্মসমর্পণযোগে। শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর কারাগারে সুদুর্ল্লভ বাসুদেব দর্শন

পাইলেন। পরে ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত্তে, 'যাও চন্দননগর' অমোঘ আদেশ-বাণী শুনিয়া তিনি আসিলেন চন্দননগরে —এইখানেই গোপন অজ্ঞাতবাসে তিনি করিলেন মহাশক্তিদর্শন। তাঁহারই চরণে জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ত্রিমার্গযোগের পূর্ণাহুতি দিয়া, অধ্যাত্মমহাযোগের সিদ্ধ ভিত্তির উপর সঙ্ঘগুরু প্রতিষ্ঠা করিলেন তাঁর সৃষ্টিশতদল —প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। নবজাতিসাধনার তাহাই প্রতীক বা বিগ্রহমূর্ত্তি।

গুরুপরম্পরাগত যোগবীর্য্যের অমর গঙ্গোত্রীধারাই ধূর্জ্জটীর ন্যায় ধারণ করিয়াছে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। সঙ্ঘাধারে তাহাই জাতির মর্ম্মসত্তা। দেবভাব, দিব্যভাষা তার জন্মাধিকার। নবমেধা, নবমস্তিষ্ক লইয়া তার আবির্ভাব। মস্তিষ্ককোষে ব্রহ্মণ্যপ্রতিভা, হৃৎপদ্মে প্রেম ও পবিত্রতার শাসনবীর্য্য, স্বাধিষ্ঠানে সৃষ্টির প্রেরণা, সেবাবিগ্রহ শুদ্ধশরীর—জ্ঞান, বীর্য্য, সৃষ্টি ও সেবাই সে নবজাতির চতুরঙ্গ জীবনধর্ম্ম হইবে।

এই যোগতীর্থে মহাগুরুস্মরণে আমরা গড়িয়া তুলিব সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। পরা ও অপরা বিদ্যার পূর্ণ সমন্বয়ে সেখানে হইবে বিজ্ঞানময় গুরুস্বরূপেরই অনুশীলন ও আবির্ভাব। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়—সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা, দর্শন, পুরাণ—অষ্টাদশ বিশ্ববিদ্যার প্রাণময় আরাধনায় ভারতে নূতন সারস্বতনিকেতনের প্রতিষ্ঠা এই গুরু-মাতৃমন্দিরকে লক্ষ্যে রাখিয়াই সম্পন্ন হইবে। জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, স্বাধিকারের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করিয়া, মুক্ত, মহান্, অখণ্ড মহাভারতের অভ্যুদয়ই আমাদের পরম লক্ষ্য হইবে।

সঙ্ঘের চতুরঙ্গ বিগ্রহে—আজ স্তুতিমন্ত্র উচ্চারিত হউক। জাতির শ্রেষ্ঠ মহাজনগণ—গুরু ও আচার্য্যবৃন্দ —আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। ঊর্দ্ধাকাশের বিভিন্ন স্তর হইতে দেবগণ, ঋষিকুল ও গোত্রপতি বিদেহ পিতৃমণ্ডলী তাঁহাদের প্রসন্ন সুধাময় স্বস্তিধারা বর্ষণ করুন।

গুরুতত্ত্বের, গুরু-দীক্ষার, গুরুর আজ্ঞাসিদ্ধ সমষ্টি-জীবনের তথা অমর মহা-ভারতজাতীয়তার জয় হউক। ওঁ স্বস্তি !!

শিলান্যাসোৎসবের আজকের সভাপতিরূপেই স্বামীজি প্রত্যগাত্মানন্দ মহারাজকে একটী মেয়ে মাল্য দিয়ে বরণ করলে পর, তাঁকে প্রণতি জানালুম—সঙ্ঘের পক্ষে সঙ্ঘাচার্য্যকেও একটী মাল্য দেওয়া হল।

সঙ্ঘাচার্য্য পণ্ডিত সূর্য্যনারায়ণ তর্কতীর্থের সঙ্গে তাঁর সহকারী সহচর পণ্ডিতদ্বয়—শ্রীকালিদাস কাব্যতীর্থ ও শ্রীহরিচরণ সাংখ্যতীর্থ অতঃপর বাস্তুপূজায় বসলেন—স-মন্ত্র যথাবিধি বাস্তুপূজা গম্ভীর বিধিমহিমায় সুসম্পন্ন হল।

তারপর স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের রজত খনিত্র হাতে নিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন—তিনি করলেন শিলাক্ষর - লিপিরও বস্ত্রাবরণ - মোচন।

পরমহংসজী শিলান্যাস করিতেছেন

আলোকচিত্র নেওয়া হ'ল এ দৃশ্যের। কত শ্রদ্ধা ও অনুরাগভরা আনন্দপ্রসন্ন মনে স্বামীজি এ-সব করে' চলেছেন। সভাসন থেকে ইতঃপূর্ব্বেই একবার উঠে, তিনি সঙ্ঘগুরুর প্রতিকৃতিপটে মাল্য দিয়ে' গেছেন— এবার দ্বিতীয়বার উঠে এসে বসেছেন ভূতল-ন্যস্ত শিলান্যাসকের আসনে—কি সস্মিত তন্ময়তায়, দিব্য উৎসাহে তিনি তা' সম্পাদন করলেন—এক সমুচ্চ অধ্যাত্মচেতনায় যেন অধিরূঢ় হয়ে'।

অতঃপর অস্পষ্ট আলোতে শিলাক্ষর লিপি পাঠ করে শোনালুম সকলকে।

শিলাক্ষর-লিপি

রক্ত-গৈরিক-রুক্মাভাস্তিস্রঃ শিখা অরাজিষুঃ।
বীর্য্য-বৈরাগ্য-বিদ্যাখ্যা যস্যাগ্নৌ চরিতাধ্বরে ॥
কর্ম্মনিষ্ঠা সমিদ্ যত্র হবিস্ত্যাগো ভুবঃ শ্রিয়ৈ।
প্রেম্না পূর্ণাহুতির্যস্য দিব্যজীবনমন্দিরে ॥
তস্য শশ্বন্মহিম্নেয়মস্তু শিলা ধ্রুবাস্মৃতিঃ।
শ্রীমতিলালরায়াজ্ঞি-নখমৌক্তিকদীপিতা ॥

১৮৮৭ শকাব্দে, ১৩৭২ বঙ্গাব্দে আষাঢ়ে মাসি ১৭শ দিবসে তৃতীয়ায়াং জয়াতিথৌ সনাতনসঙ্ঘগুরোঃ সন্ততিভিঃ শ্রীমন্দিরপ্রতিষ্ঠাকল্পে শিলান্যাসোহয়মকারি ॥

মহামোহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌গোপীনাথ - কবিরাজ - পদ্মবিভূষণ - মহোদয়ানাম্ অধ্যাত্মপুণ্যপৌরোহিত্যে শিলান্যাসকঃ পরমহংস-শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মনানন্দ-সরস্বতী-মহোদয়াঃ ॥

শিলান্যাসান্তে শিলাস্তুতি পাঠ করলেন সঙ্ঘাচার্য্য—১১টী শ্লোকে, তাঁব স্বরচিত—

যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ
তথা ত্বমচলা তিষ্ঠ শিলে শ্রীগুরুমন্দিরে ॥১॥

শিলে ত্বং যতিবিন্যস্তা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ
আদর্শব্যঞ্জিকা ভূত্বা দিব্যজীবনমন্দিরে ॥২॥

বিরাজতাং স্থিরা চাত্র স্থিরো ভবতু নঃ সদা
প্রবর্ত্তক-গুরোঃ পুণ্যো দিব্যাদর্শো গৃহে গৃহে ॥৩॥

প্রত্যগাত্মানন্দনায়ঃ সন্ন্যাসিপ্রবরস্য চ
শিলে ত্বয়ি সদা ভাতু সিদ্ধা শক্তিঃ সুসংহতা ॥৪॥

শিলে ত্বং সুদৃঢ়া শুভ্রা সুস্থিরা নির্ম্মলা যথা
শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরোঃ পুণ্যা সন্ততী রাজতাং তথা ॥৫॥

ভারতীয়া জনাঃ সর্ব্বে শিলান্যাস-মহোৎসবে
লভন্তাং চেতনাং দিব্যাং পুণ্যেঽস্মিন্ ক্ষণবাসরে ॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণভগবৎ-প্রোক্তং দিব্যজীবনভাসকম্
গীতাযোগং সমাশ্রিত্য ক্লৈব্যহীনা ভবন্তু তে ॥৭॥

মহামহোপাধ্যায়পদভাক্ পদ্মবিভূষণঃ
গোপীনাথ-কবিরাজো মনীষিণাং শিরোমণিঃ ॥৮॥

স্বাগতং তস্য ধীরস্য সর্ব্ববিঘ্নবিনাশকং
কার্য্যসাফল্য-সম্পত্ত্যা অস্তু কল্যাণকৃৎ সদা ॥৯॥

মনীষাপ্রতিভা তস্য বিদ্বত্তা সর্ব্বতোমুখী
সঙ্ঘসন্তানচেতঃসু রাজতাং বিশ্ববন্দিতা ॥১০॥

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ
শ্রীগুরোরাশিষা সর্ব্বে ভবন্তু দিব্যজীবনাঃ ॥১১॥

পরে ভারতেব রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, ঐতিহাসিক ডক্টব রমেশচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শ্রীঃটুক-নাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখের প্রেরিত শুভ-বাণী, শেষোক্তের ছন্দে বঙ্গানুবাদসহ সংস্কৃত শ্লোকত্রিতয়ে সঙ্ঘগুরুবন্দনাও পাঠ করা গেল। পঠিত ও অপঠিত শুভ লিপিগুলি অংশবিশেষে বা সম্পূর্ণতঃ সন্দর্ভশেষে উদ্ধৃত হ'ল।

অতঃপর, সঙ্ঘাচার্য্য আবেগভরে দেব-ভাষায় তাঁর শ্রদ্ধাবাণী উচ্চারণ কবলেন—সুন্দর, সরল, হৃদয়োত্থিত হৃদয়স্পর্শী প্রাঞ্জল ভাষণে তাঁর হৃদয়ের সশ্রদ্ধ মর্ম্মকথাই নিবেদিত হ'ল।

ইহার পব, সভাপতির ভাষণ। আজ স্বামীজির শুদ্ধ সন্ন্যাসবিগ্রহে যুগপৎ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অধ্যাত্মসত্তাও যেন বিমিশ্রিত হয়ে একাসনে পৌরোহিত্যে সমাসীন। তাঁর সহজ, সরল অন্তবের কথা—জাতীয়াত্মারই মর্ম্মসত্তার কথা। স্বামীজি বললেন—"সঙ্ঘ-সভাপতি সভায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের যে অধ্যাত্মোপস্থিতির কথা বলেছেন, উহা ঠিকই। এই অশরীরী আবির্ভাব সমধিক ভাবময় ও প্রভাবময় স্থূল উপস্থিতির চেয়ে"—তাঁর সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

তিনি আরও বললেন—"গোবিন্দবাবুর কণ্ঠে অপূর্ব্ব সংস্কৃত ছন্দের ঝঙ্কার শোনারও সুযোগ আমাদের হ'ল

না। না হোক, কিন্তু আজ স্বাগত ভাষণের শেষ দিকে সঙ্ঘসভাপতি যে সারস্বত নিকেতনের কথা বলেছেন, উহা আমার মর্ম্মস্পর্শ করেছে। এই চাওয়াই – ভারতের চাওয়া—ভাবতের মর্ম্মনিহিত চাওযা। সংস্কৃত ভাষায়-সাহিত্যে ভাবতের মর্ম্মপ্রকাশ হয়েছে—সেই দিব্য সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারই ভারতের সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রয়োজন। ভারতের জাতীয়তা বলতে ভাবতের স্বকীযতাকেই আমরা বুঝেছিলুম, আর এমনি একটা চাওয়া নিযেই আমরা দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিলুম একদিন, কিন্তু ভারতেব বর্ত্তমান স্বাধীনতায় আমাদেব সে চাওয়া পূর্ণ হয়-নি। এই চাওয়াই ভারতের স্বকীয়তার

সভাসনে প্রত্যগাত্মানন্দ সবস্বতী মহাবাজ

চাওয়া। স্বকীয়তার চাওয়া অর্থে জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই প্রেরণা।"

বলে' চল্‌লেন তিনি, "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘগুরুর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ দেখা হয়েছিল, আর একবার যখন এই আশ্রমে আমি এসেছিলুম সঙ্ঘের আহ্বানে। সঙ্ঘগুরু তখন বোগশয্যায়—ভীষ্মের ন্যায় যেন শবশয্যায় শয়ান। কিন্তু তাঁব রোগজীর্ণ দেহ হলেও, তাঁর মুখে-চোখে সেদিন যে জ্যোতিঃ দেখেছিলুম, তাতে আমার মনে সত্যকাম জাবালেব মতই প্রশ্ন উঠেছিল—'কথং ব্রহ্মবিদেব ভাসতে' এ-যে ব্রহ্মবিদের মতই মুখের আভা—এ জ্যোতির্ম্ময় বিভা কেমন করে' তাঁতে ফুটল? সত্যই সঙ্ঘগুরুর মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্যই উদ্ভাসিত হয়েছিল—এই কথাই সে-বার সভায় আমি ব্যক্ত করেছিলুম—আজও আবার তাই বলছি। শিলাক্ষবের শ্লোকত্রয়ের মধ্যে সঙ্ঘগুরুর জীবনাগ্নির ত্রি-শিখার কথাই তাই আমি বলেছি—বীর্য্য, বৈবাগ্য ও বিদ্যা—সঙ্ঘগুরুর আধারে ক্ষত্রিয়বীর্য্য, নির্লিপ্ত বৈরাগ্য ও ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা, এই অগ্নিত্রযেরই প্রকাশ হয়েছিল।"

ভারতের মর্ম্মপ্রেরণাই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাধ্যপ্রেরণা—স্বামীজি ইহাই যেন উপলব্ধি করে' তাঁর অন্তরের অন্তরে পরম প্রীতিলাভ করেছেন। সেই অন্তরের উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাণীই তাঁর মুখে ঝরল—সঙ্ঘপ্রেরণার সাফল্যকামনায়।

চিরসঙ্ঘ মিত্র শ্রীবতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও সর্ব্বোদয়ী শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীরকুমার লাহাব শুভভাষণেও কি সুন্দর, স্বচ্ছ প্রীতি ও শ্রদ্ধার নির্ঝর ও সঙ্ঘসম্বন্ধীয় আশার কথাই ব্যক্ত হ'ল!

হৃদয়ের কৃতজ্ঞ ব্যাকুলতা অশ্রুপুলকিত উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠল—পরবর্ত্তী কার্য্যসূচীপালনেব পূর্ব্বেই ক্রমভঙ্গের অনুমতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম—সঙ্ঘপ্রেরণারই মর্ম্মকথাপ্রকাশের আকুতি-মুখে। আমাদের চতুর্ব্যূহী গুরুধারার ইতিকথা, মায়েরই শক্তি ও সাধনায় গুরুমন্দিব-প্রতিষ্ঠা—"তার অর্থ গুরুভাবের ভিত্তিতে সঙ্ঘযুগ, তথা নব যুগ ও নব জাতিরই প্রতিষ্ঠার মহাকল্প-সূচনা—রাজসিক সমারোহ আমাদের মন চেয়েছিল, তাই রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী প্রমুখকে আনার প্রয়াস—তাঁরা আসবেন প্রত্যেকেই, কিন্তু এসময়ে কেহই আসতে পারলেন না – এলেন পরমহংসজী—আজীবন জাতীয়াত্মার সাধক, অধ্যাত্মসাধনায় শুক-সনাতনাদি চতুঃসন-পরমহংস-মহাকোটীর তত্ত্বের যথার্থ উত্তরাধিকারী—এ সবের মধ্যে কি গূঢ় ইঙ্গিত ইহাই নয় যে, এ গুরুমন্দির-প্রতিষ্ঠা সাধারণ এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুরুস্মরণে মন্দির বা বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা নয়, পরন্তু একটা খাঁটী, বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম-যুগ ও মহাভাবেরই প্রতিষ্ঠা। ব্যষ্টিজীবনের শুদ্ধি-সিদ্ধি বা সম্প্রদায়বিশেষের প্রচার ও ব্যাপ্তিই নয়—এক নবধর্ম্ম, নব সমাজ, নব রাষ্ট্ররূপ ত্রিপ্রস্থানের অধ্যাত্মবেদীতে এক নবজাতিরই অভাবনীয় জন্ম-সূচনা। এ জন্ম—কারণ-

সলিলে—'অপ্রকেতং সলিলং' বলে' যাকে বেদে বলা হয়েছে—সেখানেই, সেই দিব্যমাতৃকার গর্ভেই অভিনব জাতকের বা জাতিকার—জন্মের—আবির্ভাবের -ভূমিষ্ঠ-করণের ইহা সূচনা। এমনই সূতিকাগারে—প্রাবৃটের ঘনঘটাময়ী প্রলয়ঝরণার মধ্যবর্ত্তী আজিকার এই অপ্রাকৃত অবকাশটুকুতে—তাই আমাদের এই শিলান্যাসোৎসব সম্পন্ন হচ্ছে—বাইরের আলো, হাওয়া, আধুনিক মাইকের শব্দের আওয়াজটুকু তোলাও বুঝি আজ নিষিদ্ধ, তাই সব বন্ধ হয়ে গেল। একেবারে নিগূঢ়ে, নিভৃতে, যেন দৈবকল্পিত এই অপূর্ব্ব পরিবেশে-পরিমণ্ডলে, আমাদের এই সুন্দর, ভাবঘন, বিপুল সম্ভাবনাগর্ভ ভবিষ্যতের দ্যোতনাময় এই আয়োজন।

সংস্কৃত বিদ্যায়তন—ভারতীয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে সাংস্কৃতিক সারস্বত তীর্থপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও পরিকল্পনা সঙ্ঘগুরুর কাছে তাঁর স্বপ্নকল্পের উত্তারাধিকারী রূপে আমরা পেয়েছি—উহার রাষ্ট্রীয় অনুমোদন আমরা হয়ত শীঘ্রই পাব—কিন্তু সৌধগঠনের টাকা এখন আমরা পাব না, বর্ত্তমান জাতীয় সঙ্কটের অবস্থার দরুণ—তা'ই যদি হয়, তবু আমাদের কি ভাবনা! ভারতের ঋষিপ্রতিভার স্ফুরণ নগরনগরীর ঐশ্বর্য্যক্রোড়ে নয়, অট্টালিকায় নয়, তপোবনে, নৈমিষারণ্যে, ঋষির আশ্রমে, কুটীরেই তার সনাতন তপস্যার বিভূতিপ্রকাশ, তার পূত যজ্ঞাগ্নির উদ্বোধন হয়েছিল—আজও আমরা আমাদের আশ্রমে, তপোবনেই সেই সাংস্কৃতিক মহাবিদ্যালয় সংগঠন করব—পরে প্রয়োজন হলে আসবে বাহিরের ঘোষণা, বহিরঙ্গ সমারোহ—এই অভিনব আয়োজনের চিন্তিত মাতৃপ্রেরিত পুরোহিতকে তাই আমরা আজ হৃদয়ের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি—নর্ম্মদাপ্রপাতের মত আমাদের প্রণতির অর্ঘ্য-ঝরণা ঢেলে দিই তাঁর চরণে—এই আকুমার ব্রহ্মচারী, জাতীয়-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন আচার্য্য দার্শনিক সাধক, না—সিদ্ধ পরমহংস—একাধারে জাতীয়াত্মার ও আধ্যাত্মিক প্রতিভার, সংযুক্ত প্রতীক-স্বরূপ স্বামীজি মহারাজ—আশীর্ব্বাদ করুন আমাদের এই বিশুদ্ধ মর্ম্মস্বপ্ন ও কর্ম্ম-প্রেরণাকে—শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘগুরুকে যে T. S. M.—(True Spiritual Movement) খাঁটী অধ্যাত্মা-ন্দোলনের যুগপ্রবর্ত্তনের সঙ্কেত দিয়ে গেছেন—এ বুঝি সেই মহাযুগেরই আরম্ভ—আজিকার শিলান্যাসের অপরিসীম দ্যোতনাময় সম্ভাবনা ও তাৎপর্য্যকেই আমার ভাষাভিব্যক্তির মধ্যে ব্যক্ত করার চেষ্টা করলুম। পরমহংসজী ও অভ্যাগত আপনারা সকলেই আমার ও সঙ্ঘের অন্তরের নমস্কার গ্রহণ করুন।"

৮৫ বৎসরের আয়ুঃ-ভার নিয়ে স্বামীজিকে আর তৃতীয়বার উঠতে দিতে চাইলুম না—তাঁর ছোঁয়া ফুল-দুর্ব্বাদল মুঠায় নিয়ে সমাধিক্ষেত্রে অর্ঘ্য দিলুম—তারপর নিজেও দিলুম—সকলেই দিল সমাধিক্ষেত্রের চারিদিকে। বড় নির্ম্মলা সঙ্ঘ-বোন—ইতঃপূর্ব্বে সমাধিক্ষেত্রে প্রদীপ জ্বেলেছিল। সকলের পুষ্পার্ঘ্যনিবেদনের পর, সমবেত সঙ্ঘোপাসনা—পরিশেষে দণ্ডায়মান হয়ে তার-স্বরে, উদাত্ত সুরে পূর্ণপ্রশস্তিমন্ত্রোচ্চারণ।

উৎসব—গুরুমন্দির শিলান্যাস—নূতন গুরুসিদ্ধ অধ্যাত্মসঙ্ঘযুগের আবির্ভাব-তিথি—কালজয়ী মহাকল্প-বীর্য্য নিয়ে আজ গুরুবারে, গুরুজ্যোতিষ্কাধিষ্ঠিত পুষ্যানক্ষত্রে, ১৭ই আষাঢ়ের জয়া তিথিতে সুনিষ্পন্ন—সুসিদ্ধ—সুসমাপ্ত হল। আবার বলি—

শ্রীশ্রীগুরুব্যূহায় নমঃ॥

শুভবাণী

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের গুরুতীর্থ রচনায় যুগপৎ ভারতের অধ্যাত্মমর্ম্মের ও জাতীয় হৃদয়ের যে সাড়া পাওয়া গেছে, তার পরিচয় দেয় বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রেরিত বহু মহাজনের শুভেচ্ছাপত্রগুলি। উহার যথামর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হ'ল।

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রী সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ মহোদয়ের পত্র :

Rastrapati Bhawan
New Delhi
June 14, 1965

Dear Shri Arun Chandra Dutt,

I am glad that you are having the ceremony of laying the foundation.stone of the Memorial Temple at the Prabartak Ashrama in the near future.

Great names have been associated with this organisation and it is my earnest hope that it will continue to do constructive work for the building up of this country.

Yours sincerely
S. Radhakrishnan

●

ভারতের মান্যবর উপরাষ্ট্রপতি জনাব জাকির হোসেন সাহেবের লিপি :

Vice-President
India
New Delhi
June 26, 1965

Dear Shri Dutt

I send my best wishes for the success of the Foundation-stone-laying Ceremony of the Memorial Temple of your Samgha-Guru to be held on the 1st. July.

Yours sincerely
Zakir Hus-ain

●

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র :

Prime Minister's House
New Delhi
April 10, 1965

Shri Matilal Roy played a notable role in our struggle for independence. Free India should certainly honour his memory. I am, therefore, glad that a temple is being built at Chandernagore in his name and wish the organisers all success.

Lal Bahadur

●

প্রখ্যাত ইতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের (২৫।৬।৬৫) পত্রাংশ :

"সঙ্ঘগুরুর মহান্ আদর্শ ও সাধনার প্রতীকস্বরূপ এই মন্দিরটি যাহাতে দেশের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করিতে পারে—তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। আশা করি—আপনাদের শুভ অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে মন্দিরটি দেখিবার সৌভাগ্য হইবে। ইতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার"

●

দেশশ্রী শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়ের শুভেচ্ছা :

"প্রবর্ত্তক আশ্রমে শ্রীগুরুমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উৎসবের সুসমাপ্তি ও সাফল্য কামনা করি।"

●

পণ্ডিতবর শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রশস্তিপত্র (২৮।৬।৬৫) :

"১লা জুলাই তারিখের পুণ্যানুষ্ঠানোপলক্ষ্যে বাঙ্গলা ছন্দোনুবাদ সহ প্রশস্তি শ্লোক তিনটী পাঠাইলাম—উৎসবের পূর্ণ সাফল্য কামনা কবিয়া।

(১)

ক্ষাত্রং পূর্বজ-গৌরবং হৃদি বহন্ ন্যস্তাসুভিঃ সঙ্গিভি-
র্মুক্তাং ম্লেচ্ছবশাচ্চকার সুচিরং সংসেব্য জন্মাবধি।
আর্য্যাবর্ত্তমহিম্নি বিশ্বজয়িনি ধ্যানেন লীনান্তরঃ
সংস্কৃত্যা নবয়া প্রবর্ত্তকগুরুর্লোকস্য জীয়াদসৌ ॥

(২)

মূর্ত্তিস্তস্য বিরাজতামভিনবে নির্মীয়মাণে গৃহে
শ্রদ্ধাবিগ্রহ-ভারতীবরসুতৈঃ প্রারব্ধভিত্তিক্রিয়ে।
কীর্ত্তিস্তস্য চ ভাস্বতী দিশি দিশি স্বান্তং জনানাং জয়-
স্বাকল্পং হিতসাধনে শুভমতিং প্রোর্জ্জাবয়ন্তী ধ্রুবাম্ ॥

(৩)

শ্রীল-শ্রীমতিলাল-রায়বিহিতঃ সঙ্ঘোঽপ্যসৌ বিশ্রুতো
স্বধুন্যাঃ শিবধামবৎ বরতটে পুণ্যাশ্রমেঽধিষ্ঠিতঃ।
সদ্ভাবপ্রচয়ৈরুদাত্তমনসৈঃ শ্রদ্ধান্বিতৈঃ কর্ম্মভিঃ
বার্ত্তা শিল্পকলার্থরক্ষণময়ৈঃ শ্রেয়স্তনোত্বক্ষয়ম্ ॥

(১)

ক্ষত্রিয় পূর্বজ সবার গৌরব স্মরিয়া, প্রাণপণে
সেবারত হিয়া,
বীর সঙ্গিবৃন্দে মিলি' করিলা মোচন ম্লেচ্ছাধীন দশা হতে
পুণ্য নিকেতন।
বিশ্বজয়ী আর্যাবর্ত মহিমার ধ্যানে মগ্ন মন, সংস্কৃতির
নব রূপায়ণে
জাগাইলে সুপ্ত দেশে আদর্শনিচয়, লোকমান্য
প্রবর্ত্তকাচার্য্য! তব জয়।

(২)

শ্রদ্ধামূর্তি, ভারতীর বরেণ্য সন্তান দোঁহে মিলি' ভিত্তি-
শিলা করিলা স্থাপন
আজি যার, হবে তাহা অপূর্ব নির্মাণ। সে মন্দিরে
বিরাজিবে বিগ্রহ মহান্।
সমুজ্জ্বল কীর্তি তব জনচিত্ত জিনি কল্যাণসাধনে হবে
হবে কল্পান্তস্থায়িনী,
দিকে-দিকে বিতরিবে চির সত্য জ্ঞান মরলোকে
অনির্বাণ আদর্শ-নিধান।

(৩)

গঙ্গার পশ্চিমে পুণ্যাশ্রমে অবস্থিত বারাণসী সমতুল
কূলে সংগঠিত
প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অগ্নিমন্ত্রে সুদীক্ষিত, বিস্তারিয়া মহাভাব
লোকে সুবিদিত।
শ্রেয়োমূল কর্মধারা করিয়া প্রচার শ্রদ্ধাসহ শিল্পকলা
বার্তা ব্যবহার,
অক্ষয়কল্যাণরাশি করি বিতরণ চিরধন্য সঙ্ঘগুরু
জাগায়ে চেতন॥"

●

ভট্টাচার্য্য শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ, এম এ., পি. আর. এস. মহোদয়ের সঙ্ঘগুরু-মতিলাল-প্রশস্তি :

পৃথ্বী যদা দনুজ-দণ্ড-নিপীড্যমানা
ত্রস্তা যযৌ শরণমচ্যুতমাদিদেবম্।
ত্রাতুং তদা নিখিল-বিশ্ব-মনুষ্যসঙ্ঘান্
স্বপার্ষদায় মধুহা নিদেশং দদৌ দ্রাক্॥ ১॥

রক্ষাং বিধাতুমনিশং শুভবুদ্ধিভাজাং
চক্রে পুরা মধুরিপুর্বিপুলাং প্রতিজ্ঞাম্।
তেনার্থিতঃ সুমতিভির্জ্জগতামধীশো
বিঘ্নান্ নিহন্তি তরসা কৃপয়া সদাসৌ॥ ২॥

হৃত্বা তু মানবতনুং ভগবন্নিদেশাদ্
বৈকুণ্ঠনাথনিলয়ং দ্রুতমেব হিত্বা।
দৈত্যারিপার্ষদবরঃ স বিহারিলালং
সুক্ষত্রিয়ং পিতৃপদে বৃতবান্ ধরায়াম্॥ ৩॥

বস্বষ্টনেত্রচন্দ্রাব্দে বঙ্গীয়গণনাত্মকে।
চৌহানানাং শুভে বংশে পৌষে দ্বাবিংশ-বাসরে॥৪॥

চন্দননগরপ্রান্তে বোড়াইচণ্ডীতলাহ্বয়ে।
জাতবান্ পূতলগ্নেঽসৌ প্রদীপ্তপ্রতিভান্বিতঃ॥ ৫॥

নিঃসৃত্য জঠরান্মাতুঃ শিশুঃ শশিনিভাননঃ।
ভস্মরাশিং সমীপস্থং প্রবিশ্য ভূতিভূষণঃ॥ ৬॥

বভূব লীলয়া মৌনী লীলাবিধৃতবিগ্রহঃ।
প্রকাশয়িতুমদ্ধাসৌ ত্যাগব্রতমিবাত্মনঃ॥ ৭॥

লালয়িষ্যতি মত্যাসৌ দুর্ব্বলান্ মানবোত্তমান্।
জ্ঞাত্বেব জনকশ্চক্রে নামৈতং মতিলালকম্॥ ৮॥

স চ রসমিতবর্ষে ব্যাধিনা ভীষণেন
ভুবনমিব বিহাতুং জাতবান্ ক্ষীণদেহঃ।
অথ নিশি শয়নস্থঃ শুদ্ধপীযূষধারাম্
যতিজন-করদত্তাং পীতবান্ প্রাণদাত্রীম্॥ ৯॥

বয়সি তিথিমিতেঽসৌ কামবানাহতোঽদ্ধা
ধৃতপরিণয়সূত্রঃ কন্যকাং ভোগিবর্ষাম্।
বিধৃতগুরুজনাজ্ঞঃ শুদ্ধশীলাং সগোত্রাং
শ্রুতিবিহিতবিধানৈঃ স্বালয়ং দ্রাঙ্ নিনায়॥ ১০॥

ফণিশশিমিতবর্ষে যৌবনোদ্ধগুতেজাঃ
পতিরতনিজপত্ন্যাং লব্ধবান্ দৈবযোগাৎ।
দুহিতরমতিপুণ্যাং কান্তকায়াং মনোজ্ঞাম্
অচিরসময়মধ্যে প্রেতলোকং গতা যা॥ ১১॥

মনুজনিবহমধ্যে মানসো দুঃখরাশিঃ
প্রভবতি সততং দ্রাঙ্ নির্দ্দয়ঃ ক্লেশহেতুঃ।
তনুজমরণজন্মা যস্তু তাপঃ প্রগাঢ়ো
ন খলু ন খলু লোকে তুল্যতা তস্য দৃষ্টা॥ ১২॥

অথ সুবিপুল-দুঃখৌ দম্পতী শুদ্ধচিত্তৌ
কৃতবিবিধবিচারৌ ব্রহ্মচর্য্যং বিধৃত্য।
বিজিতনিখিলখেদৌ দেশসেবাং বিধাতুং
বিগতসকলশঙ্কৌ দত্তবন্তৌ স্বচিত্তম্॥ ১৩॥

সন্ন্যাসিনং শম্ভুসমং কদাচিদ্
দৈবাৎ সমাসাদ্য নিজে নিকেতে।
আনন্দভাগান্তমসৌ মহান্তং
রাম্যাদিসংজ্ঞং গিরিশব্দযুক্তম্॥ ১৪॥

যোগাদিশাস্ত্রেষু বিধিং বিলোক্য
সাহায়কেনাস্য সদা সষত্নঃ।
প্রাণান্নিয়ন্তুং বিবিধান্ প্রয়োগান্
নৈপুণ্যযুক্তো ধৃতবান্ স ধীরঃ॥ ১৫॥

অন্যাংশ্চ সম্প্রাপ্য স সাধুবর্য্যান্
যোগান্ বিচিত্রানুপদেশযুক্তান্।
তেভ্যঃ সমাসাদ্য যুবা মহাত্মা
গার্হস্থ্যধর্ম্মাপি বভূব যোগী॥ ১৬॥

বৈদেশিকা জলনিধেরপরান্তভাগাদ্
বাণিজ্যবদ্ধহৃদয়াঃ সহসৈত্য দেশম্।
স্বর্ণাকরং মনু-যুধিষ্ঠির-রামসেব্যং
সাম্রাজ্যমত্র বিদধুর্বত দুঃখহেতুঃ॥ ১৭॥

নির্য্যাতিতাস্তু মনুজাঃ ধনলুব্ধকৈস্তৈঃ
ত্রাতারমেত্য মতিলালমমুং মহান্তম্।
নির্দ্দেশমস্য শিরসা ব্যচরন্ বিশ্বস্ত্য
বিস্ফোরকৈঃ রিপুগণান্ বিনিপাতয়ন্তঃ॥ ১৮॥

অথ বহুবলযুক্তা বৈরিণঃ ক্রূরভাবাঃ
তরুণসমিতিসংস্থান্ সৈনিকান্ শান্তচিত্তান্।
নরপতিপুরুষৈর্দ্রাক্ কৌশলান্ মারয়ন্তো
ব্যপগতবলমেতং সঙ্ঘমেষাং প্রচক্রুঃ॥ ১৯॥

অথ শুভদিবসেঽদ্ধা কীর্ত্তিমান্ শুদ্ধচেতাঃ
রিপুনয়নপথেভ্যস্ত্রাতুমিচ্ছুঃ স্বদেহম্।
অতিমতিররবিন্দশ্চন্দনাখ্যানপুর্য্যাং
রহসি মতিনিকেতে বাসমাসাদ্য তস্থৌ॥ ২০॥

অতিমতি-মতিলালং শাসকৈর্যোদ্ধুমিচ্ছুং
ধনজনবলশূন্যং সম্যগাজ্ঞায় ধীরঃ।
মধুরস-পরিপূর্ণৈর্যুক্তিগর্ভৈঃ স্ববাক্যৈঃ
সুপথমনয়দেনং ত্যাজয়িত্বা বিমার্গম্॥ ২১॥

অথ বিলসতি কালে সঙ্ঘনেতা কদাচিৎ
মধুর-কুশলবাগ্ভিঃ সেবকান্ বোধয়িত্বা।
জনগণকুশলার্থং স্থাপয়ামাস তূর্ণং
বিধৃতসদয়ভাবং সঙ্ঘবর্য্যং স্বকীয়ম্॥ ২২॥

ততঃ প্রভৃতি দেশেঽস্মিন্ সঙ্ঘঃ প্রবর্ত্তকো হ্যয়ম্।
শিল্পবাণিজ্যমার্গেণ রক্ষতি দুর্ব্বলান্ সদা॥ ২৩॥

বিদ্যালয়ান্ প্রতিষ্ঠাপ্য নিরাময়ালয়াংস্তথা।
মৌর্খং ব্যাধীংশ্চ বিদ্রাব্য রাজন্তে সঙ্ঘসেবকাঃ॥ ২৪॥

জয়তু সাধনা পুণ্যা সঙ্ঘভর্ত্তুঃ সদা ভুবি।
জয়তু জনসেবা চ জয়তু সাধকোত্তমঃ॥ ২৫॥

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় পত্রে লিখেছেন (২৮।৬।৬৫): "মহাবিপ্লবী এবং বিরাট্ মহাপুরুষ সঙ্ঘগুরুর ছিল organic personality. আশা করি—স্মৃতিমন্দির নূতন কর্ম্মীদের আকর্ষণ করে' এই মুমূর্ষু জাতির মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করবে। আরও আশা করব—গুরুমন্দির সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন করে' আমাদের ছেলেমেয়েদের নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে।"

●

ত্রিবেণী, ঋতম্ভরা আশ্রমের শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজির প্রীতিলিপি (১৪।৩।৭২):

"পরম শ্রদ্ধেয় সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের রস-সম্ভর প্রাণের সিসৃক্ষাময়ী এজনা থেকে যে বহু প্রাণ দানা বেঁধে উঠেছে, সেই প্রাণসংহতি পরিমণ্ডলের মূর্ত্ত হৃৎকেন্দ্ররূপে শ্রীগুরুমন্দির নির্ম্মিত হতে চলেছে। আগামী ১৭ই আষাঢ় এ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনানুষ্ঠান বিঘ্নজয়ী সিদ্ধিকে বরণ করুক। সর্ব্বগত শুভেচ্ছার সঙ্গে আমার এই অন্তরতম শুভেচ্ছাকে আজ নির্ব্বিশেষে মিলিয়ে দিলাম। ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দ।"

●

বারাণসীধাম, অযাচক আশ্রমের অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজের শুভেচ্ছা-বাণী (১।৭।৬৫):

"আপনাদের বহু-বাঞ্ছিত শ্রীগুরুমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনোৎসব—শুভানুষ্ঠান প্রত্যাশাতীত সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হউক এবং আপনাদের মূল লক্ষ্যের এবং ত্যাগ-ব্রতের উদ্‌যাপনে পূর্ণ সহায়ক হউক, ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা করি। ইতি—স্বরূপানন্দ"

●

গোরক্ষপুর, গোরক্ষনাথ মন্দির হ'তে মহাসাধক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভলিপি:

"আজ এখন আপনারা সকলে ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্ঘগুরুর শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনোৎসবে ব্রতী আছেন। আমিও অন্তরে-অন্তরে এই শুভ অনুষ্ঠানে ভক্তিনম্র চিত্তে যোগদান করছি। আপনারা ভক্তবৃন্দ সকলে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

সঙ্ঘগুরুদেবের স্মৃতিমন্দির

রেণুকণা ঘোষ

১৩৭২ সালের ১৭ই আষাঢ়; বৃহস্পতিবার, চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে পুণ্য পুষ্যানক্ষত্রে শ্রীগুরুমন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠাকর্ম্ম সুসম্পন্ন হল। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রখ্যাত দর্শনাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ।

বাংলা যেমন সমগ্র ভারতের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ, তেমনি হুগলী জেলা আবার বাংলার হৃৎপিণ্ডবিশেষ। চন্দননগর এই হুগলী জেলারই অন্তর্গত। একদা ইহা ফরাসীদের অধিকৃত উপনিবেশ ছিল। সাম্প্রতিক কালে ইহা অখণ্ড বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থিত এই চন্দননগর সম্বন্ধে মনীষীদের উক্তি—"ভাগীরথীর পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল"। বারাণসীতুল্য এই চন্দননগরে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কেন্দ্রতীর্থ। পূজ্যপাদ সঙ্ঘগুরুদেবের স্বপ্ন ছিল—অখণ্ড বঙ্গের পঞ্চ বিভাগে পঞ্চ কেন্দ্রতীর্থ-প্রতিষ্ঠার। কালের কুটিল গতিতে, রাজনীতির কূটচক্রে অখণ্ড বঙ্গ আজ পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিভক্ত। তথাপি পশ্চিম বঙ্গের এই মূল কেন্দ্রতীর্থে পূজ্যপাদ সঙ্ঘগুরুদেবের এই স্মৃতিমন্দির অদূরভবিষ্যতে তাঁর কল্পস্বপ্নকে এক অভিনব রূপ দান করবেই—বিশ্বাসী হৃদয়ে এ প্রত্যয় সদা জাগ্রত।

কেন্দ্রতীর্থই সঙ্ঘগুরুদেবের জন্মক্ষেত্র। বাংলার হৃৎপিণ্ডস্বরূপ হুগলী জেলার অন্তর্গত এই চন্দননগর কেন্দ্রেই তাঁর বাস্তুভিটা। যদিও তাঁর রক্তধারার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তাঁর পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন অবাঙ্গালী—অযোধ্যা প্রদেশের ময়ানপুর গ্রাম হ'তে তাঁরা আগত—তথাপি তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। শুধু বাংলা তাঁর জন্মভূমি বলে'ই যে তিনি বাঙ্গালী তাই নয়—তাঁর সত্তার মধ্যে বাঙ্গালীত্ব অনুস্যূত। তাঁর নিজেরই কথা—"আমি বাঙ্গালী। আমি হিন্দুস্থানী নহি, মাদ্রাজী নহি,

---

সত্য-শিব-সুন্দরের কৃপায় আপনাদের সাধনা সফল হোক, লক্ষ্য সিদ্ধ হোক, দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হোক।"

●

কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় আকুতি জানিয়েছেন (৩০।৬।৬৫):

"একান্ত ইচ্ছা যোগদানের, কিন্তু প্রাতঃকালে হওয়ায় বাধা পড়িতেছে। যাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দির, তাঁর অবদান অসাধারণ, কিন্তু সে প্রেরণা যদি কারও মধ্যে আসে, তবেই মন্দির সার্থক হইবে। আমি সেই প্রার্থনাই করি।"

●

রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুরের শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের পত্রাংশ (৩০।৬।৬৫):

"উৎসবে উপস্থিত হতে পারলে আনন্দিত ও ধন্য হতাম। সে সৌভাগ্য হচ্ছে না। শুভ উৎসব সুসম্পন্ন হোক, সার্থক হোক ও লোকহিতকারী হোক, এই প্রার্থনা শ্রীভগবানের চরণে জানাই।"

●

"ভারতবর্ষ"-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রার্থনা (৩০।৬।৬৫):

"ঠাকুরের কৃপা আপনাদের সকল কাজকে সাফল্য দান করুক—এই প্রার্থনা জানাই।"

●

উত্তর পশ্চিম, কোঙ্ক থেকে শ্রীজীবনভূষণ বাগচীজীর তারবার্ত্তা ও পত্রমর্ম্ম (৩০।৬।৬৫):

"I have firm conviction that Shree Guru-Mandir shall serve humanity as God's living image to attain godliness and supramental consciousness."

●

কাটিহারের শ্রীকিশোরীলাল কুণ্ডুজীর প্রার্থনা (৩০।৬।৬৫): "শ্রীশ্রীভগবানের নিকট উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি।"

পাঞ্জাবী নহি, উৎকলী নহি—আমি বাঙ্গালী। এই সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা মায়ের ছায়াশীতল ক্রোড়েই আমার জন্ম, তাঁরই অন্নে, তাঁরই আকাশে, তাঁরই বাতাসে আমি লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি। বাংলায় আমার ঘর, বাংলায় আমার বাড়ী, বাংলায় আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবই—আর তাঁরা সবাই আমারই মত বাঙ্গালী। বাংলাই আমার ভাষা, বাঙ্গালীই আমার আশা। প্রতি শিরায়-শিরায়, প্রতি মজ্জায়-মজ্জায় আমি বাঙ্গালী।" তাঁর এই বাঙ্গালীত্ব যে কত গভীর ছিল, তারই একটি দৃষ্টান্ত :

এক সময়ে যারবেদা জেলে মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্ঘগুরুদেব দেখা করতে যান। পথে পুণা সহরে তিনি জনৈক শেঠজীর অতিথি হন। শেঠজী সঙ্ঘগুরুদেবকে আন্তরিক আকূতি জানান—তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সবকিছু তিনি দানপত্র লিখে দেবেন—তাঁর নামে। এই সবের বিনিময়ে তিনি ঐস্থানে সঙ্ঘের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে' তুলুন। সঙ্ঘগুরুদেব শেঠজীর আকুলতা অন্তরের সহিত অনুভব করে'ও তাঁর প্রস্তাবগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান—ঐ একই কারণে—তিনি বাঙ্গালী, বাংলাই তাঁর জন্মভূমি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। যদিও তিনি মনেপ্রাণে বাঙ্গালী, তথাপি বাঙ্গালী হয়েও তিনি ছিলেন ভারতবাসী। প্রাদেশিকতার উৎকট মোহ তাঁর ছিল না। তাঁর চাওয়া ছিল—প্রতিটি মানুষ, সে যে-দেশ, যে জাতি, যে-সমাজেরই হোক না কেন, প্রত্যেকে নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যেই বৈশিষ্ট্যবান্ হোক। তাঁর নিজেরই ভাষায়—"আমি চাই প্রত্যেকে নিজ-নিজ স্বভাব, স্বধর্ম্ম লইয়াই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। প্রত্যেকে নিজের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস, আত্মমহিমাবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিবে। যাহার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, জন্ম-মৃত্যু-জীবনের রহস্য যেখানে যুগে-যুগে লীলায়িত, সেই ধরিত্রী জন্মভূমির প্রতি প্রত্যেকে শ্রদ্ধাশীল হইবে। দেশ-মহিমার মহিম্নস্তুতি প্রত্যেকের কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিবে। প্রত্যেক মানুষ যদি স্ব-কে উপলব্ধি করিতে পারে—'স্বে-মহিম্নি'—স্ব-মহিমাতে অবস্থান করার অধিকার অর্জ্জনে ক্ষম হয়—তবেই তো সে হইতে পারে যথার্থ স্বাধীন। যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও প্রকৃত বীর যেমন বীরের সম্মান, বীরের মর্য্যাদারক্ষায় যত্নবান্ হয়—ঠিক তেমনই প্রকৃত স্বাধীন মানুষ বা স্বাধীন জাতি কখনও স্বাধীন মানুষের প্রতি, স্বাধীন জাতির প্রতি হানাহানি করিয়া বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া তুলিতে পারে না। আত্মচৈতন্য, আত্মসম্বিৎহারা হইলেই প্রত্যেক মানুষ বা প্রত্যেক জাতির যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তাহা লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। সৃষ্টির উৎস শুকাইয়া ধ্বংসের অগ্নিক্রীড়ায় তখনই মানুষ মাতিয়া উঠে। ছিন্ন-মস্তার রাক্ষসী প্রবৃত্তি নিজেদেরই কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া আত্মশোণিত-পানের বীভৎস প্রচেষ্টা সৃষ্টি করে।"

সঙ্ঘগুরুদেবের এই বাণীর মর্ম্ম আজ সকলেরই গভীর ভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে।

আজ যে মানুষে-মানুষে কলহ, দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ—তার কারণ ঐ "আত্মচৈতন্যের" অভাব নহে কি? এই চেতনাকে জাগ্রৎ করার জন্য সঙ্ঘগুরুদেব বাংলার তরুণদেরই আহ্বান দিয়াছেন—সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন, "এইজন্য সহস্র যোগী, সহস্র আত্ম-নিবেদিতসন্ন্যাসী পাইব না কি?" আজও তাঁর ডাক বাংলার আকাশে-বাতাসে মর্ম্মরিয়া ফেরে—কে আজ তাঁর ডাকে সাড়া দেবে? আছে কি বাংলায় তেমন প্রাণ? সঙ্ঘগুরুদেবের স্মৃতিমন্দিরপ্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে বাংলার তরুণ প্রাণের কাছেই তাঁর আর্ত্ত আবেদন জানিয়ে রাখলাম।

প্রেতায়িত

শ্রীহংস

সাবেক ডায়মণ্ডহারবার রোডের প্রান্তে প্রাচীন খালপুল। ভার বহনে অসমর্থ। তাই সংপ্রতি টাউনের গা ঘেঁসে গড়ে উঠেছে আধুনিক প্লানের শক্ত কংক্রিট ব্রীজ। এই ব্রীজকে সংযোগ করে নতুন মাইলখানেক সুপ্রশস্ত পাকা রাস্তা এসে মিশেছে সাবেক রাস্তার সাথে একটি সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে।

ঐ কোণে দাঁড়ালে দেখা যাবে একখানা অসমাপ্ত একতলা বাড়ি। জীর্ণ শেওলা-পড়া দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়া রাস্তার গা ঘেঁসে। আর একটু কাছে গেলে দেখা যাবে চতুর্দিকে ইট পাটকেল ছড়ান, খোয়ার গাদা, বালুর স্তূপ, চুণের টিপি এখানে-ওখানে। বাইরে প্লাষ্টারিং-এর ছোঁয়াও লাগেনি। ভিতরের প্লাষ্টারিং অসমাপ্ত। মেঝগুলিতে এবড়ো-খেবড়ো মাটির টিপি। সিঁড়ির ধাপগুলি অর্ধপথে থেমে আছে। আবার ফাটলও ধরেছে কোন কোন দেওয়ালের কোণে। দরজা জানালার চৌকো ফোকোরগুলি খা খা করছে, ফ্রেম বসেনি। সেইসব ফোকোর দিয়ে অবাধে জল ঢুকে মেঝগুলিতে এখানে সেখানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে সাপ-খোপ থাকা বিচিত্র নয়। গজিয়ে উঠেছে প্রচুর জংলা ঘাস ঘরের মধ্যেই। গোটাকয়েক গরু ছাগল অবাধে অসঙ্কোচে ঘরে ঘরে চরে বেড়াচ্ছে।

বাড়িটার ভিতরে ঢুকলে কিন্তু একটু বিস্ময় জাগে। এই শহরতলিতে মাঠের মধ্যে এত উন্নত ধরণের একটু যেন বিদেশী ছাঁচের প্লানটা। এটা অভাবনীয়। একটা হিসেবী মনের, একটা সূক্ষ্ম শিল্পরুচির পরিচয় রয়েছে প্রতিটি অংশে। শুধু বসবাসের মত বাড়ি নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার মত একটা শিল্প-নিদর্শন তৈরী হতে যাচ্ছিল। কিন্তু থেমে গেছে অকস্মাৎ। আরও বিস্মিত হতে হবে যখন শুনবেন হরিমোহনবাবু যদিও নিজে পাশকরা ইঞ্জিনীয়ার নন, ওভার্সিয়ারও নন অথচ এই আশ্চর্য প্লানটা তাঁরই একান্ত নিজস্ব।

১৯৩৭-এ চাকরির গোড়ার দিকে এসেছিলেন ডায়মণ্ড হারবার। সরকারী প্রয়োজনে বাড়ি রিকুইজেশন করতেন। তাঁর অফিসার। তিনি রিপোর্ট কপি করতেন, যোগ বিয়োগ করতেন। বাসা নিয়েছিলেন নদীর ধারে পাঁচ টাকার এক বস্তী বাড়িতে। থাকতেন সস্ত্রীক। বিয়ে করেছেন কেবল বছরখানেক। চাকরিরও সুরু, সংসারেরও সুরু। সেই ক্ষুদ্র টালির ঘরে শুয়ে শুয়েই তিনি স্বপ্ন দেখতেন পুত্রকন্যা-পরিবৃত একটি বৃহৎ সংসারের। সুন্দর একটি নিজস্ব বাড়ির। বাড়ি রিকুইজেশন করতে সাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পরিচয়ও হয়েছিল দু' একজন বাড়ির মালিক-এর সাথে। তাদেরই একজনের কাছ থেকে প্রায় বিনামূল্যে কিনে রেখেছিলেন এই বিঘে দুই ধান জমি। পাকা সড়কের উপর দাঁড়িয়ে এই সদ্যক্রীত জমিটির দিকে যখনই তাকাতেন হরিমোহন-বাবু, একটি সবুজ ধানের ক্ষেতের ছবি জাগেনি সেদিন ওঁর মানস চক্ষে, জাগত একখানি ছোট্ট সুন্দর বাড়ির ছবি। সামনে ঘাটলা বাঁধান পুকুর আর চারচালা টালির ঘরখানিকে ঘিরে ফুল ফলের বাগান।

তারপর কর্মব্যপদেশে ঘুরতে হয়েছে তাঁকে ছোট বড় নানা সহরে। সাহেবের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন নানা প্লানের নানা বাড়ি। তারই এক একটি থেকে একটু একটু করে জোড়া দিয়ে সুদীর্ঘ বিশটি বছর ধরে গড়ে তুলেছেন তাঁর নিজের বাড়ির প্লান। চাকরিতে যতোই উন্নতি হয়েছে, মনের মধ্যে প্লানটা ততোই উন্নত হয়েছে। সন্তান সংখ্যা যতো বেড়েছে রুমের সংখ্যাও বেড়ে গেছে তদনুপাতে। টালির ঘর ঢেকে ফেলেছে একতলা বাড়ি। একতলার উপর চড়েছে দোতলা।

বিশ বছর পরে ১৯৫৭-তে রিটায়ারের মুখে আবার এলেন ডায়মণ্ড হারবার। তখন সেই কোণে দাঁড়িয়ে পরম বিস্ময়ে দেখলেন যে জায়গাটার চেহারাই বদলে গেছে সম্পূর্ণ। শহরটি ক্রমোন্নতির পথে ক্রমেই এগিয়ে এসেছে হরিমোহনবাবুর ঐ জমিটার দিকেই যেন। নতুন পুল, নতুন রাস্তা, নতুন নতুন বাড়ি ঘর, বাজার ঘাট সবাই যেন সমস্বরে বলে উঠল ও জায়গাটা আর এখন খালি রাখা চলে না। দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে, নতুন

বাজারের ধারে, বাস্ স্টপেজের কাছে চমৎকার একটি বাড়ি না হলে মানাবে কেন।

এতদিন পরে আবার ডায়মণ্ড হারবার বদলি হওয়াটাও যেন একটা বিধাতার ইঙ্গিত।

মনের প্লানটায় আবার সুরু হল অদল বদল। দেশী বিদেশী অনেক প্লান ব্লক এনে ফেল্লেন। রাতের পর রাত জেগে আবার সুরু হল গবেষণা।

আগে ছিল পশ্চিমে সাবেক রাস্তাটা শুধু। এখন পূব পশ্চিম উত্তর তিনদিকেই রাস্তা হয়ে গেছে। দক্ষিণে একেবারে নয়া পুল পর্যন্ত অবাধ উন্মুক্ত। এই বর্তমান চেহারার সাথে প্লানটাকে খাপ খাওয়াতে হবে তো। যে কোন দিক থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়েই যেন দেখা যায় একখানা ছবির মত বাড়ি।

শেষ পর্যন্ত সাবেক প্লানটাই টিকে রইল কয়েকটি আধুনিক সংযোজনের পর। বিশ বছরের ভালবাসা প্লানটা আধুনিক পোশাক পরে একেবারে মনোহরণ করে বসল হরিমোহনবাবুর।

বাঃ! চমৎকার সেট হবে প্লানটা। মনে মনে একটা আশ্চর্য আনন্দের ঢেউ চঞ্চল করে তোলে হরিমোহন-বাবুকে যখন তখন। মন বসে না অফিসের কাজে। ঘুম আসে না রাত্রে। স্ত্রী মনোরমার চোখে ধরা পড়ে এ অস্থিরতাটা।

—কী হয়েছে তোমার বলো তো?

—কেন? কি হবে আবার।

—আমায় লুকিও না। দিনরাত অত কি ভাব আজকাল বলো তো?

—কয়েকটা বাড়ি রিকুইজেশন নিয়ে মামলা চলেছে। সরকারের হার হলে কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান। ভারি ভাবনায় আছি।

কথাটা মিথ্যে বলেন নি হরিমোহনবাবু, কিন্তু সত্যি কথাটাও বলেন নি।

মামলা প্রসঙ্গে অবশ্য কলকাতা যাতায়াত করতে হয় প্রায়ই। যতক্ষণ না কোর্টে থাকেন, কিংবা জি. পি.-র সঙ্গে পরামর্শরত থাকেন তার চেয়ে বেশীক্ষণ ঘুরে বেড়ান রাস্তায় রাস্তায়। ঘুরে ঘুরে দেখেন নতুন নতুন প্লানের নির্মীয়মান বাড়ি। আর মনে মনে ছক আঁকেন নিজের বাড়ির। কি এক নেশায় পেয়ে বসেছে যেন। চলতে ফিরতে কাজকর্মের মাঝে মনের প্লানটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

—কতো কাল্ আর আমায় ভ্রূণ মধ্যে রেখে দেবে? বলে যেন প্লানটা।

—সবুর কর না আর কটা দিন। রিটায়ার করে নি।

কিন্তু সবুর করতে চায় না প্লানটা। অস্থির হয়ে বলে, —তুমি যে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছ। শেষে সময় থাকবে তো? থাকবে তো সামর্থ্য?

—সারা জীবন ধরে কঞ্জুষ অখ্যাতি কুড়োলুম, গালাগাল খেলুম গৃহিণীর, কান দিলুম না কতো বায়নায়, নিজেরই বা কতো সখ-সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল শুধু তোরই মুখ চেয়ে। তবু তোর……

তবু প্লানটা ছাড়তে চায় না হরিমোহনবাবুকে। আঁকড়ে ধরেছে যেন অক্টোপাশের মত। নাঃ, ওকে মুক্তি না দিয়ে আর মুক্তি নেই হরিমোহনবাবুর।

জি. পি. ফাণ্ড থেকে তুলতে হল হাজার দশেক। একটা ইন্‌সিওর ম্যাচিওর করায় হাতে এল আরও হাজার ছ'য়েক। সে টাকাও জমা হল না ব্যাঙ্কে। পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণে শুভদিনে স্থাপিত হল ভিত্তি। অনেক সন্ধান করে মেদিনীপুর আর মুর্শিদাবাদ থেকে দুই দল পাকা রাজমিস্ত্রী আনালেন হরিমোহনবাবু। পুরো একটা দিন লেগে গেল প্লানটা ওদের বোঝাতে। ওরা বলে একজন ওভার্সিয়ার দিয়ে প্লানটা আঁকিয়ে দেন না বাবু। হরিমোহনবাবু হেসে বলেন,—আঁকব কিরে। আমি তো রয়েইছি, আর প্লানও রয়েছে আমার চোখের উপর। তাছাড়া, বড় মিস্ত্রীর কানে কানে যেন গোপন কথা বলছেন,—এ প্লানের বাড়ি এদেশে এই একটিই থাকবে। তাই ওসব আঁকাআঁকি করে জানাজানি করতে চাই না আগে থেকেই।

ভিত সুরু করল দু'ধার থেকে দুই দলে।

দেখি কার হাতের কাজ কত পরিষ্কার। যে জিতবে কাশ্মীরি শাল বকশিষ দেব তাকে। পাল্লা দিয়ে দুই দল প্রাণ মন দিয়ে কাজ করে, কিন্তু মন

পায় না কেউ হরিমোহনবাবুর। ডুরমোজটা আরও একটু কড়া হলনা কেন, এক নম্বর থাকতে কেন দু' নম্বর গাঁথা হল দু' চারখানা, চুন সুরকী কেন আরও ভাল করে মাখা হল না, পয়েন্টিং-এর দাগ কেন হয় না জ্যামিতিক সরল রেখা, ড্রইং রুমের ঐ কোণটা ষাট ডিগ্রী না হ'য়ে কেন হল উনষাট, ওদিকের প্যাসেজ কেন আধ ইঞ্চি কম···এমনি নিত্যনতুন ভুলচুক ধরা পড়ে। ক'দিনেই দুই মিস্ত্রী একেবারে নাস্তানাবুদ।

ওরা বলে, কাজটা শেষ করতে দিন না বাবু আগে। চক্ষুদান হলেই প্রতিমা, তার আগে তো খড় মাটি।

—গোড়ায় গলদ থাকলে বাপু শেষে আর সামলান যায় না। নরম থাকতে মসলা, শুকোলেই কংক্রীট। তাই গাঁথনি শুকোবার আগেই নিজ হাতে ফিতে, ওলন, মাঠাম, পারদ-লেভেল নিয়ে সন্ধানী চোখে খুঁৎ খুঁজে বেড়ান হরিমোহনবাবু।

পোতা অবধি উঠেছে গাঁথনি।

স্ত্রী মনোরমা একদিন এলেন দেখতে। কোঠা বারান্দা, বাথরুম ইত্যাদি নিয়ে প্রায় গোটা কুড়ি খোপর। মনোরমার তো চক্ষুঃস্থির।

—ওমা, একি কাণ্ড করছ? এ যে এক রাজবাড়ীর ব্যাপার! কী হবে এত কোঠা দিয়ে? এত টাকাই বা আসবে কোথা থেকে?

—আরম্ভটা তো করে যাই ঠিকমত। শেষ না হয় ছেলেরাই করবে।

—থাকবার মধ্যে তো মেঝো ছেলে আর তার বৌ ছেলে মেয়ে। বড়টি বিদেশে বিদেশেই কাটাল। ছোটটিও শুনেছি পাশ করে কলকাতাই ডিসপেনসারী করবে। বিয়েও নাকি ঠিক হয়ে আছে কলকাতায়।

—প্রবাসী ছেলে মাঝে মাঝে আসবে না বাপ মার কাছে? তাছাড়া ডাক্তারী কি কলকাতায় ছাড়া জমে না? মফঃস্বলে ডাক্তারী করে কতো লোকে লাখপতি হয়ে গেল। প্রবীর পাশ করলে এখানেই প্র্যাকটিস্ শুরু করবে। সে সব ব্যবস্থাও হয়ে আছে এই প্লানে। তাছাড়া মেয়ে-জামাই রয়েছে, আত্মীয়কুটুম্ব রয়েছে। তাদের কথাও ভেবে দেখতে হবে না।

ঘণ্টাখানেক অনর্গল বক্তৃতা করে প্রতিটি কোঠার পরিচয় শোনালেন মনোরমাকে। মনোরমা কতোটা বুঝলো কে জানে। শুনতে শুনতে এক সময় বলে বসল,—রোদে দাঁড়িয়ে এসব আকাশ-কুসুম নিয়ে তুমি ভাবতে থাক। আমার এখন কাজ আছে। তাছাড়া অত বুঝিও না। দু' তিনখানা কোঠা, খোলামেলা একটু রান্নার জায়গা, পরিষ্কার একখানি উঠোন আর বেশ বড় বড় দরজা জানালাগুলি হলেই আমার চলবে। এ এলাহি কাণ্ড বাপু মাথায় ঢোকে না আমার।

উদার হাসি হাসেন হরিমোহনবাবু।

ড্যাম্প-প্রুফের সময় দরজাগুলি পজিশন বুঝিয়ে দিতেই ছুটি নিতে হল তিনদিন। প্যাসেজের ইকনমি, আলোহাওয়ার যাতায়াত, অনেক কিছু ভাববার আছে দরজার পজিশন ঠিক করতে।

গাঁথনি উঠল জানালা লেভেলে। সবচেয়ে চিন্তার কাজ এবার জানালার পজিশন। একটা দুটো নয়, ষাট সত্তরখানা জানালা। প্রতিটির সঙ্গে অন্যটির সম্বন্ধ, দরজার সম্বন্ধ, আলো হাওয়ার প্রশ্ন, সর্বোপরি সৌন্দর্যের প্রশ্ন। তারপরই লিণ্টাল, সান্‌সেড, সেলফ্, ওয়াল-আলমীরা, বীম্, ছাত। প্রতিটি স্তরে চিন্তা, সূক্ষ্ম হিসেব-কিতেব। না, এক মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে যাওয়া চলবে না আর। ছুটি নিতে হল দু' মাসের। আর চার মাস বাদেই রিটায়ার। দরকার হলে এই ছুটিই না হয় বাড়িয়ে নেবেন রিটায়ার পর্যন্ত।

এগিয়ে চল্ল কাজ দ্রুতগতিতে আর সংসার থেকে ক্রমেই পিছিয়ে পড়লেন হরিমোহনবাবু। চান করতে যেতে সাতবার ডেকে পাঠাতে হয়। বিশ্রাম বলে রইল না কিছু। রইল না আর সঞ্চিত অর্থও কিছু। যেখানে যা ছিল সব টেনে নিল এই বাড়ি।

মাথায় এক বালতি জল ঢেলে, মুখের মধ্যে কিছু খাদ্যবস্তু গুঁজে দিয়ে আবার ছোটেন হরিমোহনবাবু।

পেছন থেকে ধমকে ওঠে মনোরমা, বেরুতে পারবে না এই দুপুর রোদে। বিশ্রাম করো একটু।

—বিশ্রাম নেব নতুন বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসে। সামনে প্রায় এক মাইল খোলা মাঠ। লনে

ঝাউএর ছায়া। ঝাউ লাগিয়ে দিয়েছি। দু' বছরেই চেহারা খুলবে ওদের। কী সুন্দর ভাবো তো। স্বপ্নাবিষ্টের মত মৃদু হেসে বলেন হরিমোহনবাবু।

—কিন্তু তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে যে···। চেয়ে দেখেছ শরীরের দিকে?

—শরীরটা একটু নরম হয়েছে বটে। কিন্তু এই কটা দিন যে···বাক্যটি অসমাপ্ত রেখেই বেরিয়ে পড়েন হরিমোহনবাবু।

একতলার কাজ যদিও অনেক বাকী। কাঠের কাজ তো ধরাই হয়নি। অর্ডার দেওয়া আছে কলকাতার এক বিখ্যাত ফার্মে। এসে যাবে লরী ভর্তি হয়ে। তাদের কাজ তারা করবে। ইতিমধ্যে একদল ককক ভিতরের প্লাষ্টারিং আর একদল সুরু করুক দোতলার গাঁথনি। একতলার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দোতলার গাঁথনি বেশী কঠিন হবে না। তাছাড়া মিস্ত্রীরাও একদিনে প্লানটা প্রায় বুঝে ফেলেছে, চিনে ফেলেছে হরিমোহনবাবুকেও। এখানে ফাঁকি চলবে না।

আবার অফিস যেতে সুরু করেন হরিমোহনবাবু। সত্যিই বিশ্রামের প্রয়োজন এবার। মানুষ ছুটি নেয় বিশ্রামের জন্য; হরিমোহনবাবু কাজে জয়েন করলেন বিশ্রামের জন্য। অফিসের ঐ ক'ঘণ্টাই যেন বিশ্রাম। সকাল দশটা পর্যন্ত থাকেন মিস্ত্রীদের সাথে, আবার অফিস থেকেও সোজা চলে আসেন এখানে। খুঁটে খুঁটে দেখেন, ভুলচুক ধরেন, পরামর্শ দেন। কোন-কোনদিন রাত বেশী হয়ে গেলে হ্যারিকেন দিয়ে লোক পাঠায় মনোরমা।

একদিন দুপুর বেলায় হরিমোহনবাবু যখন অফিসে, একদল আমিন আর দু' তিনজন প্যাণ্টপরা অফিসার এসে হরিমোহনবাবুর বাড়ির চারদিকটা যেন টেনে টেনে ঘণ্টা দুই ধরে মেপে-জুপে গেল।

পরদিন সকালে মিস্ত্রীদের কাছে খবরটা পেয়ে চমকে উঠলেন হরিমোহনবাবু। আমিন তো তিনিই পাঠিয়ে-ছিলেন হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের অফিসারদের সাথে তাদের নব পরিকল্পিত হাসপাতালের প্লানটা সরেজমিনে মিলিয়ে নিতে। তা এখানে কেন? সে তো নয়া রাস্তার ওধারে। কোথাও কিছু ভুল ঘটেছে নিশ্চয়। আর সেই ভুল প্লানই তিনি হাতে হাতে এপ্রুভ্ করে দিয়ে এলেন কালই!

মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটে এলেন বাসায়। বাক্সের তলা থেকে খুঁজে বের করলেন বিশ বছরের প্রাচীন দলিল। এইতো ৭৩২ দাগ। এ দাগটাও কি রিকুইজিশনড্ এরিয়ার মধ্যে? দাগনম্বরটা অবশ্য মনে ছিল না হরিমোহনবাবুর। মনে রাখেও-না কেউ। মনে রাখে, চিনে রাখে শুধু জমিটা।

সেই বেশেই ছুটে এলেন অফিসে। ধুতি গেঞ্জি পরা সাহেবকে অসময়ে অফিসে দেখে স্তম্ভিত বিস্ময়ে ডবল সেলাম করলে দারোয়ান।

একটানে ড্রয়ার থেকে বের করলেন এপ্রুভড্ প্লানের অফিস কপি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো। ৭৩২ দাগও যে রয়েছে। না না, ভুল তো নেই কিছু প্লান-এ। এখনও যে জ্বল জ্বল করছে হরিমোহন সামন্তর স্বাক্ষর 'Approved' কথাটার নীচে।

* * *

৭৩২ দাগের উপর হরিমোহনের বিশ বছরের স্বপ্নটা আর মূর্তিমতী হয়ে উঠবে না কোনদিন। ঐ যে একখানা অসমাপ্ত বাড়ির কঙ্কাল দেখছেন ওতো নয় যে সে স্বপ্নসৌধ। ও একটা স্বপ্নের প্রেতাত্মা।

হরিমোহন সামন্তর স্বপ্নটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে ওখানে একদিন গড়ে উঠবে শত-শয্যার বিরাট হাসপাতাল। তার ভিতের তলা থেকেও কি গুমরে উঠবে একটা প্রেতাত্মার আর্তনাদ।

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

গম্ভীরা :

দ্বৈমাসিক পত্র, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার, কালিগ্রাম, মালদহ, বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা মাত্র। তৃতীয় খণ্ড বৈশাখ ১৩২৩ সাল ১ম সংখ্যা। বর্ষ আবাহন, বিবিধ প্রসঙ্গ, বাণী প্রশস্তি, বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা, জন রাস্কিন্, বিবর্ত্তনবাদ ও তাহার প্রামাণিকতা, যাত্রা-সাহিত্যের অবনতি প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা ও প্রবন্ধে এই সংখ্যা পরিপূর্ণ, সুখ-পাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা অতি উপাদেয় প্রবন্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধটির ভাষা যে শুধু চমৎকার এবং প্রাঞ্জল তাহা নহে, পরন্তু লেখকের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয়ও ইহাতে যথেষ্ট আছে, যথা "পুরুষ তপস্বী। সংযম শান্তি নিরাভরণতা সদা সন্তুষ্টি—এ সকল পুরুষেরই। পুরুষ চিন্তাশীল ধ্যানী আত্মস্থ। জগতের সহিত দ্রষ্টার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ" ইত্যাদি গভীর অন্তর্জ্ঞানেরই কথা। তারপর উপনিষদের সারমর্ম বোধ করিয়া লেখক বলিতেছেন—"সত্যের মুখে যে হিরণ্ময় পাত্রটী রহিয়াছে তাহারই কিরণজাল আমাদের চক্ষুকে ঝল্‌সাইয়া দেয়, মূল প্রদেশের গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি না—সত্যধর্ম্মটী সদাই আমাদের কাছে আবরিত রহিয়া যায়"। আমরা গম্ভীরার বহুল প্রচার কামনা করি, আর এখানি মাসিকে পরিবর্ত্তিত হইলে আরও সুখী হইব।

ভলান্টিয়ার প্রসঙ্গ :

চন্দননগরের ভলান্টিয়ার আন্দোলনের সকল সংবাদই সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রবর্ত্তকে সে সকল সংবাদ প্রদান করা অনাবশ্যক। তবে বাঙ্গালী সেনাদল যখন মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নী, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল—সে করুণ চিত্র যে দর্শন করিয়াছে, যুগপৎ তাহার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর সংসারে এমন নূতন ঘটনা বহুশত বৎসর ঘটে নাই। হাসিমুখে মৃত্যুস্থলে যাত্রা করিবার জন্য সহোদরা সহোদরকে, পিতামাতা পুত্রকে, স্ত্রী স্বামীকে, এমন গর্ব্বভরে যে বিদায় দিতে পারে তাহা ধারণার অতীত ছিল, এ দৃশ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। ভলান্টিয়ারগণ আমাদের আত্মীয়, আমাদের ঘরের ছেলে, যেন তাহারা বিজয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া সগর্ব্বে পুনরাগমন করিয়া আমাদের আনন্দ-বিধান করে, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

লাহোর ষড়যন্ত্রের জের :

অমৃতসর জেলার টার্ণ টার্ণ নামক স্থানে কর্পূর সিং নামক এক ব্যক্তিকে কাহারা হত্যা করিয়া গিয়াছে। কর্পূর সিং নাকি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার একজন সাক্ষী ছিল।

ডাকাতি ও গ্রেপ্তার :

সোমবার ২রা আগষ্ট আগড়পাড়া ষ্টেশনের নিকট জনৈক বিল সরকার কয়েকজন ডাকাইত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, কিন্তু লোকজন আসিয়া পড়ায় ডাকাইতেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। শুনা যাইতেছে, একজন নাকি ইহার পরে রিভলবার হস্তে ধরা পড়িয়াছে। যুবকের নাম বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, হালিসহরের অঘোর গাঙ্গুলীর পুত্র। তাঁহার কলিকাতাস্থ বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া কিছু পাওয়া যায় নাই।

সমালোচনা :

অমৃতবার্ত্তা : শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য এক আনা। শ্রীশ্রীজগবন্ধু সেবা ভাণ্ডার কর্ত্তৃক উয়াড়ী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার নবযুগের অমৃতবার্ত্তা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। তিনি অনেক আশার কথা কহিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এত অধিক অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন যে, সেগুলি বাদ দিলেই পুস্তকখানির শ্রী থাকে।

শ্রীভগবান কথিত গীতার "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য" ইত্যাদি শ্লোকটির মর্ম্ম সেই যুগেরই উপযোগী 'যে যুগে মানুষ মানুষের মাংস আহার করিত' এরূপ কথাও গ্রন্থকার সাহস করিয়া বলিয়াছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞের সময় সমাগত ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করেন, এই আখ্যান এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যীশু ও শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু প্রেম ও বিনয়ের জন্যই দেশে দেশে শ্রীভগবানরূপে পূজিত। গ্রন্থকার ক্ষাত্রশক্তির বিরোধী তাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ চরিত্রের ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভিমতের অনুকূল ভাবটুকুই পত্রস্থ করিয়াছেন। মোট কথা, নগেনবাবু সনাতন ভাবের পরিবর্ত্তে পুরাতন খণ্ডধর্ম্মই প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছেন, এইজন্য বৃন্দাবনের রসময়ী শ্রীরাধা বিশ্বনায়িকা রূপে আবির্ভূতা হইবেন এইরূপ আশা করিয়াছেন।

যাহা হউক তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ এবং পুস্তকখানিতে অনেক ভাল কথা আছে।

—শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত

পত্র-সন্দর্ভ

(ডঃ হরগোপাল বিশ্বাসের পত্র হইতে সঙ্কলিত)

[অশেষ প্রীতিভাজন ডঃ বিশ্বাস বেঙ্গল কেমিকেলের রসায়ন-গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। একদা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতে-গড়া সহকর্ম্মী ছিলেন। জার্ম্মান-ভাষাবিদ্, চিন্তাশীল। সর্ব্বোপরি দেশদরদী ও মনুষ্যত্বের পূজারী। প্রবর্ত্তক পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ও লেখক। দেশের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়া প্রায়ই পত্র লিখিয়া থাকেন। পত্রগুলি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। এখানে প্রবর্ত্তক সম্পাদককে লিখিত তাঁর ৪।৬।৬৫ তারিখের ব্যক্তিগত পত্র হইতে সংশ্লিষ্ট অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল। —প্রঃ সঃ]

এবারের (বৈশাখের) প্রবর্ত্তক চমৎকার হয়েছে। অনেগুলি ভাল জিনিষ পেলাম। প্রবর্ত্তকের নিরপেক্ষ, কারও মুখ-না-রাখা চিন্তার বলিষ্ঠতা প্রশংসনীয়। ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকারের 'প্রবর্ত্তক-এর পঞ্চাশ বছরে' বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। রচনার আরম্ভটিও সুন্দর। লেখাটি একটা বহু পুরানো স্মৃতি জাগিয়ে দিল বিশেষ করে ৩৯নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রাজবন্দী শচীন দাশগুপ্তের পত্র। তাঁর ঠিক পরের ভাই আমার সহপাঠী ছিল রাজশাহীতে ও কলকাতায়। তিনিও এখন জীবিত নেই। তাঁর নির্ম্মল স্বভাব ও দেশাত্মবোধ ও পরোপকার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। আমার সহপাঠী (কুষ্টিয়ার) প্রফুল্ল দাশগুপ্ত ওঁদের বাড়ী থেকে রংপুর কলেজে আই. এস্‌সি পড়তেন। আমিও ওঁদের বাড়ীতে গিয়েছি। শচীন দাশগুপ্তের এক ভাই সুরেশ দাশগুপ্ত পানিহাটিতে আমাদের কেমিষ্ট। আমার বন্ধু জ্যোতির্ময় শচীন দাশ গুপ্তের ঐ চিঠি ১৯২০।২১ সালে বের করেছিল। তখন Proscribed হয়ে যায়। কাজেই নানা দিক থেকে এ চিঠিখানি পুরোনো স্মৃতি উদ্রেক করল।

এই বৈশাখ সংখ্যা প্রবর্ত্তকের ৪৯ পৃষ্ঠার 'তারুণ্য সঙ্কট' প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, উহা ছেলেমেয়েদের চোখে পড়লে অহিত ঘটাবে বেশী বলে মনে হয়। অপরিণত মনে কৌতূহল জাগাবে। এইসব বিদেশী আবর্জ্জনা কুড়িয়ে চোখের সামনে ধরা ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষার পথ নহে। তারা তো কোন জিনিষ বিচার করে নিতে পারে না। উত্তেজনায় চলে। Adventure-এর প্রবণতাই অপরিণত মনে কাজ করে বেশী। তার চেয়ে উচ্চাদর্শ, দায়িত্ববোধ, পরিশ্রমশীলতা যেমন 'Selfhelp' 'Character' ইত্যাদি বই যা আমরা পড়েছি তা চরিত্রগঠনের প্রতি তরুণ তরুণীদের মন সজাগ করে তোলে। লেখক শ্রীধর সুসাহিত্যিক, তিনি নিশ্চয়ই শিক্ষাদানের এই মূলসূত্রটি বুঝবেন।

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রাতঃস্মরণীয় অশ্বিনী দত্তের 'ব্রহ্মচর্য্য' বই পড়ে অনেক ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করার প্রবণতা উগ্র হয়ে উঠেছে। ১০।১২ বছর আগে বঙ্গবাসী কলেজ হষ্টেলের ছাত্রদের আমন্ত্রণে এই সমস্যার আলোচনা করতে হয়েছিল। আলোচনা করেছিলাম অন্যভাবে—কু আদর্শের কুফলের কথা না বলে সু-আদর্শের সু-ফলের মহিমা কীর্ত্তন করে।

বিলাতের কয়েকটি ছাত্র আমাকে একখানি পত্র লিখেছে। পত্রখানি এই সঙ্গে পাঠালাম। পত্রে এদের জ্ঞানান্বেষণের অদ্ভুত পরিচয় পাবেন। প্রবর্ত্তকে ছাপতে পারেন। এদের অনুসন্ধিৎসার আদর্শ এ দেশের ছাত্রদের অনুপ্রাণিতই করবে। ইতি—

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

লক্ষ্মীলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

সাময়িকী

পুনরাবর্ত্তন :

মরক্কো আফ্রিকার শীর্ষে একবারে জিব্রল্টর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজ্য। পরিমাণ ১৭০ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা এক কোটী। মরক্কোর প্রশাসন ব্যবস্থা বৃটেন-স্পেন ফ্রান্সের হাতে ছিল। একাংশ বিদেশী অধিকৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের পর বিদেশী শাসনের অন্ত হয় এবং রাজা হাসান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। রাজা পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্ত্তন করেন এবং ইংলণ্ডের রাজার মত নিয়মানুগ রাজা মাত্র থাকেন। আত্মকলহে পার্লামেণ্ট প্রায় অচল হইয়া পড়ে। কর্ম্মের অভাব, খাদ্যের অভাব, কালোবাজার, যাবতীয় দুর্নীতি দেখা দেয়। ছাত্র ও জনতার বিক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। ফলে সম্প্রতি রাজা হাসান পার্লামেণ্টারী শাসন অবসান করিয়া নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন। দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

এ সম্পর্কে 'রাষ্ট্রবাণী'তে প্রাজ্ঞ দেশদরদী শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন : "এই পরিবর্ত্তনে আমাদের খেদ নাই যে মরক্কোতে রাজতন্ত্র আবার ফিরিয়া আসিল। যখন ডিমোক্রাসী অচলপ্রায় হয় তখন কোনও শক্তিশালী শাসকের হাতে শাসনকার্য্য যাওয়া ভাল। ভারতবর্ষেরও প্রায় সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।"

কথাটি বিবেচনাযোগ্য।

বেকার বাঙালী :

বাংলা ও বাঙালী আজ সবদিক দিয়াই সমস্যা-জর্জ্জরিত মুমূর্ষু। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার কর্ম্মসংস্থান সংস্থার এক হিসাবে প্রকাশ, গত মে মাসে পশ্চিম বঙ্গের সংস্থান-কেন্দ্রগুলিতে ৪৯৫,০০০ জন কর্ম্মপ্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত ছিল। এপ্রিল মাসে এই সংখ্যা ছিল ২৮,৬০০। মহিলা বেকারের সংখ্যাও ক্রমবৃদ্ধির পথে। এই কর্ম্ম-সংস্থান কেন্দ্রে সব বেকারই নাম লিখান, এমনও নহে। অবাঙালী কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালীর ঠাঁই নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নব নব পরিকল্পনার উল্লাসে-উৎসবে মাতিয়া আছেন। বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে, আর সবাই তাকে কোণঠাসা করিবে। তরুণের প্রাণ না জাগিলে এ সমস্যা বিদূরিত হইবার নহে।

সমবেত উপাসনা :

প্রকাশ, গত ২৯-এ জুন রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিংশতিতম সাম্বাৎসরিক উৎসব সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ইউ. থাণ্টের নেতৃত্বে ১১৮টি জাতির প্রতিনিধিরা একই গৃহে সমবেত হন এবং দেশ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সবাই একত্র উপাসনা করেন। প্রায় দু' হাজার কণ্ঠে বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার উদ্গান উঠে "হে আমাদের সকলের প্রভু, তুমিই ধন্য ধন্য। Now Thank Thee All our God."

অবশ্য সংবাদে প্রকাশ পাই নাই, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী কম্যুনিষ্টসদস্যগণ তখন কি করিতেছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার :

সম্প্রতি ফরিদকোটের আট মাইল দূরে অবস্থিত হিজদলিয়া গ্রামের সমাধিস্থল খনন করিয়া উক্ত গ্রামবাসিগণ একটি শ্বেতমর্ম্মর মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছে। অনেকে মনে করিতেছেন, এই মূর্ত্তিটি সম্রাট অশোকের পিতা বিম্বিসারের। রাজা এই মূর্ত্তিতে সাধকবেশে রূপায়িত হইয়াছেন।

বিদেশে বাঙালী শিল্পীর কৃতিত্ব :

সংবাদে প্রকাশ শিল্পী রঞ্জন সেন কানাডার মানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচিলার অব্ ফাইন আর্টস পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। এই সাফল্যের জন্য তিনি স্বর্ণপদক ও গেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসিস্ট্যাণ্টশিপ্ বৃত্তি পাইয়াছেন। বিদেশী ছাত্রছাত্রিগণের মধ্যে শ্রীসেনই প্রথম এই গৌরবমণ্ডিত হইলেন। কমনওয়েল্থ বৃত্তি লইয়া তিনি কানাডায় শিল্প শিক্ষার্থে গমন করেন। কানাডায় আণবিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে শ্রীসেনের 'মৃত্যু ও জীবন' 'ধ্বংস ও সৃষ্টির' পরিকল্পনামূলক একটি চিত্র বিশ্বের প্রশংসা অর্জ্জন করে। প্রদর্শিত চিত্রগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ শিল্পী সেন বিশ্বশান্তি তহবিলে দান করেন। শ্রীমান রঞ্জন বর্ত্তমান দিল্লীপ্রবাসী শিল্পী অবনী সেনের পুত্র। দিল্লীতে শঙ্করের আন্তর্জাতিক শিশু-চিত্র প্রদর্শনীতে বহুবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষিত হয় এবং রাজধানীতে 'Boy-prodigal' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। শ্রীমান রঞ্জনের পিতাও একজন খ্যাতনামা বলিষ্ঠ শিল্পী। একদা প্রবর্ত্তকের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ ছিল।

পাক-ভারত আত্মীয়তা :

ভারত-পাক কচ্ছ সহমত স্বাক্ষর কার্য্য দিল্লীতে উভয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির মধ্যে নিষ্পন্ন হয়। স্বাক্ষরকারী দুই প্রতিনিধিই হাসেন নামধারী—মিঃ আজিজ হাসেন (ভারত গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী) আর মিঃ আরসাদ হাসেন (পাক গবর্ণমেণ্টের ভারতস্থিত হাই কমিশনার)। এই দুই মহোদয়ই একই পরিবারের। উঁহারা পরস্পর খুড়তুত জ্যেঠতুত ভাই। আবার বৈবাহিক সম্পর্কেও পাক-প্রতিনিধি হাসান সাহেব ভারত প্রতিনিধি হাসানের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছেন। এমন মধুর সম্পর্ক যেখানে সেখানেও প্রায় যুদ্ধ বাধে-বাধে হইয়াছিল। (রাষ্ট্রবাণী হইতে)।

অক্সফোর্ড ভারত লাইব্রেরী :

প্রকাশ, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির সহিত সংযুক্ত ভারত-লাইব্রেরী-গৃহটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে এবং উহা বোডেলিয়ান লাইব্রেরীর উপর-তলায় স্থানান্তরিত হইবে। সংবাদটি উদ্বেগজনক। এ কাজটি অবাঞ্ছনীয় হইবে, ইহা সংস্কৃতি-অনুরাগী যাঁরা তাঁরা মনে করেন। ইংরাজ-ভারত, শাসক-শাসিতের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক আজও বিদ্যমান তাহা পারস্পরিক সংস্কৃতির পরিচয় ও বিনিময়ের মাধ্যমে এবং উহার পাদপীঠ ছিল এই ভারত লাইব্রেরী। ইহার মূল্য ও মহত্ব প্রচুর। দেবস্থানের মতই ইহা

পবিত্র। ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ইহা গবেষণাকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা আশা করিব, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ ইংরাজেরা নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী হইতে দিবেন না।

চট্টল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ-সংবাদ :

সম্প্রতি বিভাগীয় কমিশনার জনাব আলি হাসান সাহেবের পৌরোহিত্যে প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ ও শিশু সদনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা সাড়ম্বরে চট্টল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মৈত্রেয়ী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, মিসেস নেলী সেনগুপ্তা, বিভাগীয় ইনস্পেক্ট্রেস এবং সহরের বহু সুধী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে জাতীয় সঙ্গীতের পর বেদ, কোরাণ, ধর্ম্মপদ ও বাইবেল হইতে আবৃত্তি করা হয়। সভাপতি 'Unique Institution' বলিয়া বিদ্যাপীঠের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। সভার শেষে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' ছাত্রীগণ সাফল্যের সহিত অভিনয় করে। সভাক্ষেত্রে সঙ্ঘ-সম্পাদকের সাহায্যের আবেদনে বিপুল সাড়া (নগদ ও প্রতিশ্রুতিতে কিঞ্চিদধিক ৮৫০০৲ হাজার টাকা) পাওয়া যায়। পাকিস্তান রেডিওর চট্টগ্রাম কেন্দ্র একদিন এই সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বক্তৃতা; সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রচার করিয়াছেন।

পুণ্যশ্লোক বরদাকান্ত বাচস্পতি :

একদা পূর্ব্ব বাংলার নৈমিষারণ্য কোটালিপ'ড়ার অন্যতম দিকপাল পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিশারদ শ্রদ্ধেয় শ্রীবরদাকান্ত বাচস্পতি মহাশয় বর্ত্তমানে পাকিস্তান হইবার পর বিরাটির সন্নিকট নিমতা পল্লীতে বসবাস করিতেছেন। ফলে একদা এই অজ্ঞাত পল্লী বহু যাত্রীসমাগমে তীর্থে পরিণত হইয়াছে। শুধু শাস্ত্রানুশীলনই নহে, বংশ-পরম্পরায় বিশিষ্ট এক জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চ্চার অধিকারী এই বাচস্পতি বংশ। এই বংশেরই কুলতিলক শ্রীনারায়ণ ঠাকুর আজ বহুবিদিত ও শ্রদ্ধার্হ। এই বংশের বিশিষ্ট জ্যোতিষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাটি শ্রীনারায়ণ ঠাকুর রক্ষা করিয়াই শুধু চলেন নাই, আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীবাচস্পতি মহাশয় প্রায় শতাব্দী উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছেন।

গত দোল পূর্ণিমায় বহু দূরদূরান্তের অগণিত ভক্ত-অনুরাগী সমাগমে শ্রীবাচস্পতি মহাশয়ের পুণ্য জন্মতিথি সনিষ্ঠায় পালিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা
=শুভবিবাহের বিচিত্র বেনারসী শাড়ী=
॥ বিভাগীয় বিপণি ॥
[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : ফোন ৩৩-২৩০৩
বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি বিচিত্র রুচিসম্মত শাড়ীর বিপুল সম্ভার।
আধুনিক ডিজাইনের হরেক রকম দেশী তাঁতের শাড়ী।
গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার প্রচুর আয়োজন।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

দেশভাগের ফলে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। চোদ্দ বছরের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের সুফল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক-উন্নয়ন, বিদ্যুৎশক্তি-সরবরাহ এবং সর্ব্বোপরি খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট।

॥ চালের উৎপাদন ॥

১৯৪৭-৪৮	১৯৬৩-৬৪
৩৫ লক্ষ ৫ হাজার টন	৫২ লক্ষ ৪৯ হাজার টন

॥ শিক্ষা ॥

	১৯৪৭-৪৮	১৯৬২-৬৩
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—	১৫ লক্ষ ৬ হাজার	৩৭ লক্ষ ১০ হাজার
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা—	১৫০০০	৩৫,৬৭৮
কলেজের সংখ্যা—	৫৫	১৩৬
কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	৫৮,১৪০	১,৩৩,৫৯২
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	১	৭

॥ স্বাস্থ্য ॥

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্‌পেনসারি, ক্লিনিক প্রভৃতি চিকিৎসা-সংস্থা—	১,২০১	২,০৮১
রোগীশয্যার সংখ্যা	১৭,৫৪৯	৩২,৫১০

॥ সড়ক-উন্নয়ন ॥

১৯৪৭-৪৮ সালে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য (জাতীয়-সড়ক ও রাজ্য-সড়ক সহ)—	১,১৯০ মাইল
১৯৬৬ সালের সম্ভাবিত দৈর্ঘ্য—	৩,৭৪০ ,,

॥ বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ ॥

প্রধান পরিকল্পনার সুরুতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ—	৩৪৬ মেগাওয়াট
১৯৬৪-৬৫ সালে উৎপাদিত শক্তি—	৫৫৪ ,,

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ভারতের-ই অগ্রগতি

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD.

Gram : 'PRABARTAK' Mg. Agents—PRABARTAK TRUST Phone : 34-3088 & 89

IMPORT :
Machineries
Papers, Boards,
Synthetic Resin
Milk products
Casein and Chemicals
and Sundry Goods.

Expert Buying Service available at a very Moderate Charge.

EXPORT :
Jute Manufactures
Shellac, Kapok,
Myrobalan,
Cattle foods.
Spices, Rosin and
other India Products

61, Bepinbehari Ganguly Street : : Calcutta-12

Codes used : A. B. C. 5th. 6th. & 7th. Edition; Bentley's Complete Phrase, Western Union, Universal and 5-Letter, Acme and Com. Phrase with Supplement; Schofields 3-Letter.

"আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ অভিনব

অর্দ্ধ শতাব্দীর ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স কলি:-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলি:-৬

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ শব্দ তত্ত্ব ১৫-০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲

॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০

॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

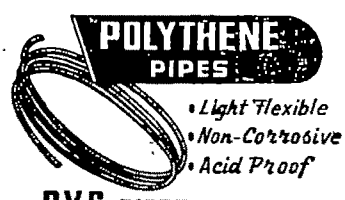

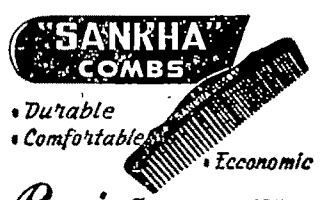

JESSORE COMB INDUSTRY CO.
ESTD.1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO.-10813

সূচীপত্র . প্রবর্ত্তক : শ্রাবণ : ১৩৭২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	১৪৩
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	১৪৪
সম্পাদকীয়	...	...	১৪৫
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিজ্ঞান	প্রবন্ধ	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী	১৪৯
দুটো পারাবত ঘুমিয়েছে	কবিতা	শ্রীবংশী মণ্ডল	১৫২
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	১৫৩
কান্তকবি স্মরণে	কবিতা	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১৫৬
শ্রীঅরবিন্দ-সরণি	জীবনী	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৫৭
দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সঙ্কট	প্রবন্ধ	শ্রীসন্তোষকুমার দে এম. এ.	১৫৯
প্রার্থনা	কবিতা	শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়	১৬২
ব্যর্থ আশা	কবিতা	শ্রীমতী বীণাপাণি ভট্টাচার্য্য	১৬২
ধর্ম্মপ্রাণ ৺বিমলেন্দু গুপ্ত	জীবন-চিত্র	শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	১৬৩
'দুর্গেশনন্দিনী' প্রসঙ্গে	আলোচনা	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	১৬৪
ক্যারিবিয়ান সাগরে ঝড়	প্রবন্ধ	শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার	১৬৫
বাঙাদি	গল্প	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১৬৭
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	পুরাতনী	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	১৭২
একখানি চিঠি	পত্র	শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়	১৭৭
পঞ্চাশ বছর আগে	সঙ্কলন	শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত	১৭৮
ইংরেজ ছাত্রের পত্র	পত্র	বিউট্রিক উইকিন্‌স্	১৭৯
আলোর সন্ধানে	আলোচনা	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	১৮১
প্রভাতী	কবিতা	শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৩
সাময়িকী	...	... ...	১৮৫

"নিমন"

আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অম্লজনিত দন্তের ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সুরভিত হয়।

আর্য্য ঔষধালয় কলিকাতা-১৭

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥

স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২·৫০

জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪-০০

Living Knowledge 4.00

(যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি বিশ্লেষণ নৈপুণ্য। মুমুক্ষু নিশ্চয়ই সাধনার আলো ও পথ পাইবেন)

॥ শুভঙ্করের ॥

মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪-০০

(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)

॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ॥

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সঙ্কলিত ॥

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

অভিজাত কেশ-তৈল

নগেন্দ্রনাথের

হিমকল্যাণ

বড়·মাঝারী·ছোট

তিন সাইজে

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ • কলি-৪

UPCO

॥ সদ্‌গুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০ ; **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲ ; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ। **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত : "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণাঙ্গ ; নির্ভরযোগ্য

বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি, রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

উৎসব অনুষ্ঠানে-

ইন্দ্র সন্দেশ

অপরিহার্য্য!

৮৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিঃ ৯ ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নুটবর দত্ত রো, কলিঃ১২ ফোন-৩৪-২৫৩৩

স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ্

করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের

বিদেশে মোহনবাগান—৪-০০

বিভিন্ন দেশে মোহনবাগান ক্লাবের রোমাঞ্চকর সফর কাহিনী। বহু চিত্র ও অজানা তথ্যসমৃদ্ধ। সহজ সাবলীল। রম্য-রচনার ভঙ্গী। ফুটবল খেলার এ-দেশ ও-দেশের তুলনামূলক সমালোচনা-বই এই প্রথম। সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিঃ-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৫০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৭২

জীবনের আলো

অপদার্থ জীবন আমাদের। অমর, অখণ্ড আত্মাকে বুকে ধরিয়াও স্ফূর্ত্তিহীন, বীর্য্যহীন, ঘোর সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ—প্রকৃতির কঠোর পরিহাস বটে !···ভাঙ্গিয়া ফেল জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী। আত্মাকে বিকশিত হইতে দাও। দেহাত্মবোধ চূর্ণ করিয়া ফেল। নশ্বর দেহ আত্মা নহে। যদি আধার শুদ্ধ শক্তিশালী হয়, যদি আত্মার বিমল পুলকে, অলৌকিক শক্তিতে ইহা সুষমামণ্ডিত হয়, তবে বিশ্বের বুকে দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া সকল মানুষের মধ্যে আত্মাকে জাগাইয়া তোল। এই মহাব্রতে উদ্বুদ্ধ হও। আমার মধ্যেও যেমন আত্মা আছেন, তোমার মধ্যেও তেমনি আছেন—আত্মার জাতি, ধর্ম্ম, লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নাই। আমি, তুমি, সে, সকলে সমভাবে আত্মা কর্ত্তৃক বিধৃত। একটি অবিভাজ্য আত্ম-সত্তা সকলকে ভরিয়া থরে থরে সংসার সাজাইয়া তুলিয়াছেন। আত্মাই ব্রহ্ম। তাই আমিও ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, আর্য্য, অনার্য্য সমস্তই ব্রহ্ম—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ভারতের ইহাই শিক্ষা। এই শিক্ষা ভাবালুতায় সিদ্ধ হয় না—ইহার জন্য চাই বস্তুতন্ত্র জীবন।···ভাবের ঘরে আগুন জ্বালাইয়া তোল। মানুষের ভাবশুদ্ধি না থাকিলে, কর্ম্মসিদ্ধি আসিবে না। ভাবের কথায় উদর পূরণ হয় কি ? ভাব যেখানে স্বপ্ন, প্রহেলিকা, সেইখানেই প্রলাপ। যেখানে বস্তুতন্ত্র, সেইখানেই জীবন।···জীবনকে জাগাও। জাগ্রত জীবন হইবে উৎসর্গের প্রদীপ ; কর্ম্ম হইবে আনন্দের হিল্লোল। তবে তো বিশ্বের আনন্দ ও শক্তি ভাব হইতে কর্ম্মে অবতরণ করিবে ! অস্পষ্ট নীহারিকাপুঞ্জ হইতে যেমন কোটী কোটী জ্যোতিষ্কপুঞ্জ গড়িয়া উঠে—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, শূন্যমণ্ডল পরিশোভিত করে—অস্ফুট ভাব, তেমনই করিয়া ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।···ব্রহ্মই যাহাদের জীবনসর্ব্বস্ব—এমন সহস্র সাধকের চিন্তায়, কর্ম্মে, জীবনে শক্তির খেলা লীলায়িত হইয়া উঠুক। মানুষ আনন্দের সন্তান। আত্মাকে না জানিলে, না পাইলে অখণ্ড আনন্দের অনুভূতি আসিবে কেমন করিয়া ? অখণ্ড ভাগবত অনুভূতিসম্পন্ন সহস্র জীবন যদি গড়িয়া না উঠে—ভারতের আকাঙ্খিত স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা কঠিন হইবে।—(৫ম বর্ষের প্রবর্ত্তক হইতে)

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। অষ্টত্রিংশৎ সূক্তং।) অষ্টমী ঋক্

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি ।
অদেষাং বৃষ্টিরসর্জ্জি ॥ ৮ ॥

অন্বয়—"বাশ্রেব" (বাশ্রা শব্দ গুণাশ্রয়ী কিরণসমূহ অর্থাৎ বজ্রের সহিত) "বিদ্যুৎ" (বিদ্যুৎ) "মিমাতি" (বিকশিত হয়) "মাতা" (জননী) "ন" (যথা) "বৎসং" (সন্তানকে) "সিষক্তি" (সেবা করেন) "যৎ" (সেইরূপ) "এষাং" (ইহারা) "বৃষ্টিঃ" (বারিধারা) "অসর্জ্জি" (বর্ষণ করে) ॥ ৮ ॥

সরলার্থ—নভোমণ্ডলে শব্দগুণাশ্রয়ী কিরণসমূহের অর্থাৎ বজ্রের সহিত বিদ্যুতের বিকাশ হয়। মাতা যেমন সন্তানকে স্নেহে অভিষিক্ত করেন, অনুরূপ স্নেহে ইঁহারাও পরস্পর মিলিত হইয়া বারিধারা বর্ষণ করেন ॥ ৮ ॥

বিশদার্থ—"বাশ্রা" অর্থাৎ আকাশের শব্দগুণকে আশ্রয় করিয়া যেসকল কিরণ প্রবাহিত হয়—যাহারা বজ্র নামে অভিহিত। সেই বজ্রের সহিত বিদ্যুৎও আকাশে বিকশিত হয়। সপ্তত্রিংশৎ সূক্তের দশমী ঋকে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবা হইয়াছে। নভোমণ্ডলে উদকবাহী পর্জ্জন্যের উৎপাদিকা শক্তি এই বজ্র ও বিদ্যুৎ। নবজলধর মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইলে বজ্র ও বিদ্যুতের মিথুনরূপ আমরা দেখিতে পাই। ইহা কিরূপ? বড় সুন্দর কবিত্বপূর্ণ উদাহরণ দিয়া ঋষি বলিতেছেন—মাতা যেমন সন্তানকে স্নেহের সহিত সেবা করেন—সেইরূপ। পরস্পর এই সেবা—এই প্রীতি-বিনিময়ের ফল রস-সৃষ্টি। মাতা সন্তানকে স্নেহ করেন, সন্তানও মাকে ভালবাসে, পরস্পর এই স্নেহ-ভালবাসার বিনিময়ে যেমন বাৎসল্য বসের সৃষ্টি—ঠিক তেমনি, আকাশের বুকে যখন বজ্র ও বিদ্যুতের পরস্পর ভাববিনিময় হয়, তখনই সৃষ্টি হয় রসের অর্থাৎ জলের। আর সে রস শুধু নভোমণ্ডলকেই আপ্লুত করে না—ধারাবর্ষণে তাহা মাতা পৃথিবীকেও অভিষিক্ত করে ॥ ৮ ॥

"ভারতবর্ষের ইতিহাসের উষাকাল সুরু হয়েছে বৈদিক যুগ দিয়ে। তার আগের কথা আমাদের ভাল জানা নাই। এর চাইতেও প্রাচীন কোন বিশিষ্ট সংস্কৃতি এ দেশে যদি থেকেও থাকে, তা' বৈদিক সাহিত্যের মাঝে জীর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, বেদের মাঝেই ভারতবর্ষ যেন সর্ব্বপ্রথম সমগ্রভাবে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। আর এই আত্মসচেতনতা রূপ নিয়েছে অধ্যাত্ম ভাবনায়। বৈদিক যুগের ইতিহাসের পুরাতত্ত্বীয় উপাদান বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু তাব চাইতেও মূল্যবান উপাদান আছে বৈদিক সাহিত্যে। সাহিত্যে পাই জাতির অন্তরেব ইতিহাস, তার যথার্থ আত্মপরিচয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসকে বোঝবার পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা এবং তার ভাবনার অনুশীলন তাই অপরিহার্য্য। এই সাহিত্যের আয়তন অতি বৃহৎ। একটা জাতির বহু সহস্রব্যাপী অধ্যাত্ম-চিন্তাব ধারাকে এর মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। আজও যে সে চেষ্টার বিরাম হয়েছে, তা' বলা চলে না। কালক্রমে মানুষের ভাষা বদলায়, তার আচাব-ব্যবহারেরও অদলবদল হয়। কিন্তু ভাবের অন্তর্নিহিত সত্যের ক্রমিক অভিব্যক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে, কোনও জাতির অন্তরপ্রকৃতির খুব যে বদল হয় তা নয়। নিজের সম্পর্কে, বিশ্বের সম্পর্কে, বৈদিক ঋষিরা যে ধারায় চিন্তা করতেন বা এই রহস্যকে বোঝবার চেষ্টা করতেন, সে ধারাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন আজও আমাদের ফুরিয়ে যায়নি। তবে হৃদয়ের আকূতিকে তাঁরা যে ভঙ্গিতে প্রকাশ করে গেছেন, আমরা আজ তা' সব সময় ব্যবহার করি না। কালের ব্যবধানে এখানে বাইরে একটা ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে, তাইতে তাঁদের অনেক কথা আজ হয়তো আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ মনে হয়।"

—'বেদ-মীমাংসা'—শ্রীঅনির্ব্বাণ।

সম্পাদকীয়

তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্ :

"তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্"—তা'দিগকে নিশ্চিত অসুর বলিয়া জানিবে।

কাহাদিগকে ?

তাহাদিগকে—যাহারা দম্ভ-দর্প-অভিমান-আসক্তি ও বলসমন্বিত—যাহারা পদলিপ্সু, ক্ষমতালোভী, অদূব-দর্শী, আপাতঃ সুখপিয়াসী। যাহাদের আচার-অনুষ্ঠান কামকারতঃ,—শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

ইহা গীতার শ্রীভগবানের প্রজ্ঞাবাণী।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল তাঁর গীতাভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই বাণীর একটা চমৎকার যুগসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন যাহার আলোকে আমরা মিলাইয়া লইতে পারি যে, আজকের সমাজে কাহারা অ-সুর। তিনি লিখিয়াছেন : "যাহা দুঃসাধ্য, সুকঠিন, সেই আচার সাধন করিয়া দুর্ব্বার ভোগশক্তি অর্জ্জন ও লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ-পূর্ব্বক লোকমান্য হইবার জন্যই ইহাদের (অর্থাৎ এই অসুরদের) তপস্যা।"

'কামকারতঃ'—অর্থাৎ কাজ-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান স্বকপোলকল্পিত না হইয়া, শাস্ত্রসঙ্গত করিবার কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। এই শাস্ত্র বলিতে আমরা কি বুঝিব ?

সঙ্ঘগুরুজী তাঁর গীতাভাষ্যে তাহারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন : "যাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহা হইতে বিরত করিয়া বিধিমার্গে 'পরম গতি'র দিকে আগাইয়া দেওয়ার বাণীমন্ত্র যাহাতে তাহাই শাস্ত্র।"

এই বাণীমন্ত্র, মানুষের পরম গতির এই দিগ্দর্শন সার্ব্বজনীনভাবে সর্ব্বদেশ ও কালের জন্য দেওয়া হইয়াছে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়ী গ্রন্থরাজ গীতাশাস্ত্রে। নিরপেক্ষ সংস্কারশূন্য মনীষার আলোকে বিচার করিলে এই সত্য নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে।

অ-সুর অর্থাৎ সুর-বিযুক্ত। যে কামমলিন আহঙ্কারিক ও দাম্ভিক বোধে বিশ্ব ধারণ করিয়া নিত্য বিদ্যমান বিরাট্ ব্যাপক চৈতন্য অবধারিত হয় না, সেই বুদ্ধি-বিবেচনা ভাবনাই আসুরী। এ বিষয়ে গীতার অনুপম অপূর্ব্ব উক্তি :

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

এইরূপ 'কামকারতঃ' অ-যুক্ত অ-সুর যাহারা তাহাদের বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধি, তাহাদের ভাবনা দুর্ভাবনা। ইহাদের বস্তুতঃ শান্তি নাই, সুখও নাই। যাহা আছে তাহা সুখ-শান্তির নামে কেবলই উত্তেজনা আর উন্মাদনা। ইহাদের 'ব্যামিশ্র' বড় বড় বাক্য জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া পরম গতির পথ পিচ্ছিলই করিয়া থাকে।

আজকের স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের চিত্র ইহাই।

●

প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বর্ত্তমানের সমস্যার উপর কোন অভিমত দেওয়া হয় না, এইরূপ অনুযোগ আমরা প্রবর্ত্তকের সহৃদয় পাঠকদের নিকট হইতে মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি।

সমালোচনা বা বিশ্লেষণের হয়তো প্রয়োজন আছে। এবং ইহা করার অধিকারও গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের আছে। কিন্তু গঠনমূলক কোন দিগ্দর্শন দিতে না পারিলে কেবল কাদাযাঁটাই সার হইয়া থাকে। মানুষের অন্তর ও বহির্জ্জীবন গঠন করিতে হইলে দিগ্দর্শনটি 'কামকারতঃ' হইলে চলিবে না—হওয়া চাই পরম গতিমূলক। স্ব-ভাব প্রকৃতির আমূল রূপান্তর না হইলে দিব্য সৃষ্টি সম্ভবপর নহে। সে ক্ষেত্রে এক আবর্ত্ত হইতে আর এক আবর্ত্তে পড়িয়া পুনশ্চ হাবুডুবু খাইবারই সম্ভাবনা থাকে। 'দল' বা 'বাদ'-এর পরিবর্ত্তনে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত সুখ শান্তি আসিতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না—শোষণ-পীড়নের খানিকটা সাময়িক সুরাহা হইলেও। মানুষের, বিশেষ নেতা-নিয়ন্তাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হইলে যথাপূর্ব্ব দুর্ব্বুদ্ধির প্রত্যাবর্ত্তন

অনিবার্য্য। যারা মানুষেব পরম গতির অর্থাৎ জন্মগত পশুত্ব হইতে মানবত্ব বা দেবত্বে উজ্জীবনের ধারায় অবিশ্বাসী অর্থাৎ যারা একান্ত ইন্দ্রিয়জ ভোগসর্ব্বস্ব সুখান্বেষী তারা নিরন্তর দ্বান্দ্বিক (dialectic) সংগ্রামের মধ্যে সমাধান খুঁজিতে গিয়া শোনিতলিপ্ত আবর্ত্তের পর আবর্ত্তই সৃষ্টি করিয়া পথ চলে। ইহাই সভ্যতার ইতিহাস। এই হিংস্র রক্তাক্ত ইতিহাসের পথে ভারতবর্ষ ব্যতিক্রম। সুপ্রাচীন কালের ভাবতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতি, তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সভ্যতার মূল ও মৌলিক সুরটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝিবেন কেন ভারতবর্ষ বিশ্ব-জাগতিক ধারার মধ্যে ব্যতিক্রম। দীর্ঘ চলার পথে এত আগন্তুক আবর্জ্জনার আবরণ পড়িয়াছে যে, ভারতবর্ষের এই অন্তঃপ্রকৃতি, তার স্বরূপ-সত্তাটি আজ গবেণার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বমানুষের মধ্যে জাতি-বৈচিত্র্যেই আসিয়াছে এই অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে। সব এক করিয়া দিব বলিলেও একাকার করা যায় না। সৃজন-পরিকল্পনার অভিসন্ধিও তাহা নহে। মানব-ইতিহাসের এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য-মহিমা সর্ব্বগ্রাসী, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বোদয়ের অনুকূলপন্থী।

'প্রবর্ত্তক-এর প্রাণপুরুষ যিনি তিনি এই চিরকালের ভারতের প্রাজ্ঞদর্শী আচার্য্যপরম্পরার উত্তরাধিকারী সূত্রে এই চিন্ময় ভারতবর্ষের মূল ও মৌলিক সুরটিব যুগপূজারী ছিলেন। প্রবর্ত্তক পত্রিকার সম্পাদকীয় এই সুরেরই বিন্যাস-ব্যঞ্জনার প্রচেষ্টায় আবর্ত্তিত।

অবিচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ সম্পর্ক। উপায় এবং উপেয় ভিন্ন ফলপ্রসূ হইবে, এমনটি হইতে পারে না। আজকের সমাজ, শিক্ষা, অর্থ, রাষ্ট্রে যে বিষবৃক্ষের চেহারা প্রতিদিন প্রত্যক্ষিত হইতেছে তাহার উৎসমূল রহিয়াছে বীজে—নিয়ন্তাদের অ-সুর ধর্ম্ম-প্রাবল্যে—জগৎ ও জীবনবোধের কামকারতায়। ইহাব একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে আমরা উল্লেখ করিব এবং ভারতীয় স্বকীয় ভাবালোকে উহা পরিক্রমা করিব। এবং এই পরিক্রমায় দেখা যাইবে যে, আজকের স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ মাত্র সতর বছরে নির্ব্বিচার পরানুকরণতায় ভারতের এই সর্ব্বকালের সত্য ভাবাদর্শ হইতে কতখানি দূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

●

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—ভ্রূণহত্যা আইন-সম্মত বলিয়া ঘোষণা করা উচিত হইবে কিনা, এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ কবিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিতেছেন। জাপান প্রভৃতি কোন কোন দেশে না কি ভ্রূণহত্যা আইনসম্মত করা হইয়াছে। দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধ কবিবার উদ্দেশ্যেই নাকি জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন; সুতরাং যেভাবেই হউক তাঁহারা এ দেশের লোকসংখ্যা কমাইতে চান।

ভাবতে লোকসংখ্যা কমাইবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাল্যবিবাহ-নিরোধ, হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট, এবং কণ্ট্রে-সেপ্টিভের (জন্মনিয়ন্ত্রণের ঔষধ ও উপকরণ) প্রচারই অন্যতম। বাল্যবিবাহ-নিরোধ-আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার সম্ভাবনার রহিত করিয়াছেন। ফলে যৌবনারম্ভের পর তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়া মেয়েকে পাত্রস্থ করিতে করিতে তাহাব বয়স অনেক ক্ষেত্রেই ২০।২৫ বৎসর, এমন কি তাহার চেয়েও বেশী হইয়া যায়। এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত 'অবিবাহিত' থাকিয়া অধিকাংশ মেয়েই নানারূপ যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হন, এবং বিবাহেব পর দেখা যায়, ইঁহাদের অনেকেরই প্রজননশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকে আবার রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়া অদূব ভবিষ্যতে যক্ষ্মা-হাসপাতালগুলিকে ভাবাক্রান্ত করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেছেন।

হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট নামে যে সর্ব্বনাশা আইনটি রচিত হইয়াছে, তাহা হাজার হাজার সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পবিবারকে ধ্বংসেব পথে লইযা যাইতেছে। ভারতের লোকেরা কোনদিন বিবাহ-বিচ্ছেদের কল্পনাও করিতেন

না; কিন্তু আজ বিদেশের অনুকরণে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং এইভাবে বিচ্ছিন্ন বিবাহিতা নারীর পুনর্বিবাহ আইনসম্মত হওয়ায় বিদেশী ভাবধারায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা অনেক ক্ষেত্রেই আদালতের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতেছেন। এইভাবে বিচ্ছিন্ন দম্পতীদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষতঃ মেয়েরা পুনরায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইয়া সারা জীবন নিঃসন্তান থাকেন এবং মনঃকষ্টে কাটান। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির রোধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। অনেক স্থলে আবার এইভাবে বিচ্ছিন্ন দম্পতীরা অবৈধ যৌনসম্পর্কে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন। কুমারী মেয়েদের মধ্যেও অনেকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া যৌনক্ষুধার তাগিদে অবৈধভাবে পুরুষসঙ্গ করেন। এই সব কর্য্যের ফলে দেশে জারজ-সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। ইহা সরকারের অভিপ্রেত নহে। সমাজের ভয়ে কুমারী মেয়েদেরও নহে। এ ক্ষেত্রে গোপনে ভ্রূণহত্যার চেষ্টা স্বাভাবিক। এই ভ্রূণহত্যাকে আইন-সঙ্গত করিতে পারিলে লাঠিও ভাঙ্গে না, অথচ সাপও মরে। ভ্রূণহত্যা নির্ভয়ে অবাধে চলিতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়—তাঁহাদের রচিত বিধানের ফলে এ দেশের যুবক-যুবতীদের মধ্যে যে নৈতিক অধঃপতন ঘটিতেছে, ইহার জন্য তাঁহাদের বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নাই। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে দেখিয়াই তাঁহারা আনন্দিত। বস্তুতঃ কয়েক হাজার লোক এইভাবে নির্ব্বংশ হইলেও গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। পূর্ব্বে বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ হইত না, এবং ফলে তাঁহারা সন্তান প্রসবও করিতে পারিতেন না। সম্প্রতি বিধবা-বিবাহের প্রচলন করিয়া গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ বিধবাকে সন্তান-উৎপাদনের সুযোগ দিয়া নিজেদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিতেছেন। শাস্তির ভয় না থাকিলেই যে, কুমারী ও বিধবাদের মধ্যে জারজ সন্তান সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হইবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—জন্মনিয়ন্ত্রণের ঔষধ ও উপকরণ ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। মোটের উপর সরকারের প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য এই যে, যুবকযুবতীরা বৈধভাবেই হউক আর অবৈধভাবেই হউক কামলীলায় প্রবৃত্ত হউক অথচ তাহাদের কোন সন্তান না জন্মে। এমনি উপায় বাহির করার প্রয়োজন-বোধেই জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ভ্রূণহত্যার পরিকল্পনা। ভ্রূণহত্যা এতদিন আইনসম্মত ছিল না। ইহা করিবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তাবিত কমিটি নিয়োগ। আমাদের নাক-কাণ কাটা সরকার চক্ষুলজ্জার ধার ধারেন না। নীতি-দুর্নীতি লইয়াও মাথা ঘামান না। জনমতেরও তোয়াক্কা রাখেন না। একটিমাত্র লক্ষ্য গদী বজায় রাখা। সামনে নির্ব্বাচন। তাই সরাসরি আইন না করিয়া এই কমিটি নিযুক্তির ভান। ভদ্র-মন ইহাতে শিহরিয়াই উঠিবে।

এইভাবে কমিটি বা কমিশন নিয়োগের ফল কি হয়, তাহা কাহারও অজানা নহে। যথার্থ প্রতিভাশালী নীতিবাদী লোকদিগকে কমিটি বা কমিশনের সদস্য করিলে অনেক ক্ষেত্রেই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না; সুতরাং সাধারণতঃ নিজেদের পছন্দমত লোক দিয়াই ঐরূপ কমিটি ও কমিশন গঠিত হইয়া থাকে এবং ইঁহাদের সিদ্ধান্ত কর্তাদের ইচ্ছার অনুরূপই হইবার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে উহা না হইলে, সিদ্ধান্ত ধামাচাপা পড়িতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা অভিজ্ঞতা হইতে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

●

ভ্রূণহত্যা সম্বন্ধে স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের জনগণের অত্যন্ত বিরূপ ধারণা ছিল এবং এখনও ইহা একেবারে লোপ পায় নাই। এ দেশের আইনেও ভ্রূণ-হত্যা বিশেষ অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল। যদিও ইদানীংকালে অ-স্বধর্মী ও অদূরদর্শী নেতৃগণ ক্ষমতার আসনে বসিয়া অনেক সময়ে অবিরাম অপপ্রচারের মাধ্যমে গুরুতর অপরাধকেও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়া থাকেন।

ভারতীয় দৃষ্টিতে নরহত্যা অপরাধের জন্য যে শাস্তি আইনে বিহিত ছিল, তাহাতে নিহত ব্যক্তির বয়সের কমবেশী বিচার্য্য ছিল না। অভিযুক্ত ব্যক্তি যথার্থই নরহত্যা করিয়াছে কিনা, শুধু এইটুকুই বিচার করা হয়। পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুকে হত্যা করিলে যে শাস্তি

বিধেয়, ২০ বৎসরের যুবক বা ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধকে হত্যা করিলেও ঠিক সেই শাস্তিই বিহিত হইয়া থাকে। সকল দেশে সকল কালে ইহাই সভ্য জগতের আইন। মানবীর গর্ভে যে ভ্রূণ উৎপন্ন হয়, সেও মানুষ; অতএব ভ্রূণহত্যা করিলে নরহত্যা অপরাধের জন্য বিহিত দণ্ড বিধান না করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বয়স্ক লোক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু শিশুরা তাহা পারে না; সুতরাং শিশু হত্যার শাস্তি স্বভাবতঃই বেশী হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে দেখা যায় বিচারকেরাও শিশুহত্যাকারীদিগকে চরম দণ্ডই দিয়া থাকেন। শিশুরা তথাপি আত্মরক্ষার জন্য কিছুটা চেষ্টা (পলায়ন ইত্যাদি) করিতে পারে; কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণ তাহাও পারে না। অতএব ভ্রূণ-হত্যার জন্য শিশুহত্যার চেয়েও অধিক শাস্তি ন্যায্য কারণেই বিধেয়।

এই হেতুই স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে ভ্রূণ-হত্যা জঘন্যতম অপরাধরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। মানবধর্ম্মশাস্ত্রের (মনুসংহিতার) মতে সাধারণ মানুষকে হত্যা করিলে যে অপরাধ হয়, বিদ্বান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি-দিগকে হত্যা করিলে তাহার চেয়ে বেশী অপরাধ হইয়া থাকে। এই কারণেই মনুসংহিতায় ব্রহ্মহত্যার জন্য কঠোরতম দণ্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে। মনুর মতে ভ্রূণহত্যার অপরাধ কোন অংশেই ব্রহ্মহত্যার অপরাধের চেয়ে ন্যূন নহে; অতএব তিনি ভ্রূণহত্যার জন্য ব্রহ্ম-হত্যার অনুরূপ শাস্তিরই বিধান করিয়াছেন: "হত্বা গর্ভমবিজ্ঞতেমেতদেব ব্রতঞ্চয়েৎ" অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে ভ্রূণহত্যা করিলেও অজ্ঞাতসারে কৃত ব্রহ্মহত্যার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ভ্রূণহত্যারূপ অপরাধ কত জঘন্য, তাহা বুঝাইবার জন্য মনু বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ভ্রূণহত্যাকারীর নিকট হইতে কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করে, সেও ভ্রূণহত্যার অপরাধে লিপ্ত হয় (অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি)।

মহাভারত, সৌপ্তিক পর্ব্ব (অধ্যায় ১৬) হইতে জানা যায়—দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অভিমন্যুপত্নী উত্তরার গর্ভস্থিত ভ্রূণটিকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা হত্যা করিবার ফলে শাস্তিস্বরূপ সমাজচ্যুত হইয়া তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন অরণ্যে উন্মত্তবৎ বিচরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কোন মনুষ্য তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিত না। তাঁহার দেহে বিবিধ উৎকট ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গ পচিয়া গিয়া পূঁজ ও রক্তের দুর্গন্ধে তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। এই কঠোর শাস্তি মহাভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামানব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

'তিন সহস্র বৎসর' কথাটি অতিশয়োক্তি হইতে পারে, কিন্তু অশ্বত্থামার প্রতি দীর্ঘকাল কঠোর নির্ব্বাসন দণ্ডের বিধান হইয়াছিল—এ কথা যুক্তিসঙ্গতভাবেই মানিয়া লওয়া যায়। অশ্বত্থামা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই যুগে ব্রাহ্মণদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত না। অন্যথায় অশ্বত্থামাকে সম্ভবতঃ মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত করা হইত।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব (২৫৬।৫০) হইতে জানা যায়—সম্রাট্ নহুষ ভ্রূণহত্যারূপ অপরাধের ফলে ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অপরাধ ক্ষালনের জন্য যজ্ঞ করিতে চাহিলেও কোন ঋষি তাঁহার পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হন নাই—ভ্রূণহং নহুষং স্থাহুর্ণ তে হোষ্যামহে হবিঃ।"

আর্য্য ভারত-শাস্ত্রের সর্ব্বত্র ভ্রূণহত্যা উল্লিখিত প্রকারে নিন্দিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য কঠোরতম দণ্ডের বিধানও রহিয়াছে। কালের কুটিল গতিতে আর্য্য-ঋষিদের পবিত্র চরণধূলি দ্বারা যে দেশের আকাশ-বাতাস পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল, সম্প্রতি সেই দেশেরই জননায়কেরা এইরূপ একটি জঘন্যতম অপরাধকে বৈধ কার্য্যরূপে ঘোষণা করিতে উৎসাহী হইয়াছেন।

●

আমাদের নেতৃবৃন্দের জনকল্যাণের উৎসাহ উদ্দীপনার ফল মধ্যবিত্ত জনগণেরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ স্বল্পকালের মধ্যে চোর-জোচ্চোর-বাটপাড়, কালোবাজারী, মিথ্যাবাদী, অনাচারী, ব্যভিচারী, চরিত্রহীনের অবাধ লীলাভূমিতে

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিজ্ঞান

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি।
বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তীতি।

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।৫

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগুবাণী থেকে জানা যায়—

বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।
বিজ্ঞান হ'তে ভূতবর্গ হয় জাত।
বিজ্ঞানের দ্বারা হয় বর্দ্ধিত।
বিজ্ঞানের অভিমুখে গমন করে বিনাশকালেও
বিজ্ঞানেই হয় বিলীন।

আবার বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন—

বিজ্ঞানামানন্দং ব্রহ্মরাতির্দাতু পরায়ণং
তিষ্ঠমানস্ত তদ্বিদ ইতি।

—বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮।৭

বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই
ধনদাতার ব্রহ্মসংস্থ ব্রহ্মবিদের পরম গতি।

সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ বিজ্ঞান বিষয়ে উদাসীন নন। আবার কেবল আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম নিয়ে সমুগ্ধ নন। তাঁরা বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলেই অবগত হ'য়ে বিজ্ঞান সাধনায় সিদ্ধ। তার সফল ফসল দেখা যায় জ্যোতির্বিদ্যায়, গণিতে, রসায়নে, চিকিৎসায়, প্রাণিতত্ত্বে, মনস্তত্ত্বে, দেহতত্ত্ব প্রভৃতিতে। বর্তমানের প্রতীচ্যের বিজ্ঞানিগণ এ কথা স্বীকার করুন অথবা না করুন তা নিয়ে আলোচনা করা ব্যর্থ শ্রম মাত্র। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখবো প্রাচীন ঋষিদের পরাবিজ্ঞানী নেত্রে মানব দেহস্থ সূক্ষ্ম নাড়ীগুলি ধরা পড়েছিল। মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্রার চক্রের যে অপূর্ব ঝিল্লি বর্তমান তার স্বরূপ ক্রিয়াকৌশল তাঁদের অজানা ছিল না। প্রাণময় এই জগত প্রাণের স্পন্দনে নিয়ত স্পন্দিত প্রতিষ্ঠিত তাও তাঁরা অবগত হ'য়েছিলেন। অথর্ববেদের অন্তর্গত প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হ'য়েছে—

পরিণত হইতে চলিয়াছে। স্বল্প সৎ ও সাধু ব্যক্তিগণ অনাদরে কোণঠাসা হইয়া অবজ্ঞাত হইতেছেন। একটা জাতির মহত্ত্ব-গৌরব গাড়ী-বাড়ী, ঐশ্বর্য্য-উত্তেজনার মধ্যে নহে, প্রাসাদে বা বিলাস-আয়োজনে আবরিত পশু (শ্রীঅরবিন্দের কথায় highly inflated and magnified animal) বিচরণের মধ্যেও নহে, পরন্তু তার চরিত্রবত্তা, ত্যাগ-তপস্যা আর অসাধারণ প্রজ্ঞা-প্রতিভার দীপ্তিতে। ভারতের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এই নির্বিচার অন্ধ পশ্চিমী অনুকরণ ভারতের পবিত্র সংযম-পূত সমাজের অবসান তথা দিব্য প্রতিভাসম্পন্ন মহা-মানবের আবির্ভাব সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করিতেছে। ঋষি-কবির কথায় 'ইহা না হইবে ভারতবর্ষ, না হইবে ইউরোপ'—যাহা হইবে তাহা জারজ, অ-সুর, মানবতার অভিশাপ। গীতারই কথা—"যদ্‌যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, জনসাধারণও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। তথাকথিত আজকের ভারতরাষ্ট্রের মতিচ্ছন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অবিমৃষ্যকারিতা, ব্যবসায়ম্বিক বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ভারতবর্ষকে যে অবর স্তরে আনিয়া ফেলিতেছে তাহাতে আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সুর মিলাইয়া জিজ্ঞাসা জাগে :

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ বেসেছ তাদের ভাল।"

না—ক্ষমা তাদের নাই। এই অ-সুরদের দু' দিনের চঞ্চল উন্মাদনা 'লহরী সমানা' কালস্রোতে মিলিয়া-মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, ইহাদের ক্ষণিকের ফেলা পদচিহ্ন দেবভূমি ভারতের বুক হইতে মুছিয়া যাইবে—যাইবে বিস্মরণের অতলে তলাইয়া। আমরা শুধু বিশ্বাস করি না, আমাদের অমোঘ অনুভব, ভারতের অন্তঃ-প্রকৃতির অধিদেবতা বিশ্বমানবতার শিবসুন্দর অভিব্যক্তির জন্যই আত্মস্থ হইয়া আবার অনতিদূর আগামীকালে স্ব-মহিমায় জাগ্রত হইবে।

"প্রাণস্যেদং বশেসর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।"

—প্রশ্ন ২।১৩

গাছগাছড়া যে জড় সামগ্রী নয় তা ভারতের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ কবেছেন। তেমনি জগতের ধূলি বালুকণাও জড়বস্তু নয়, তারাও প্রাণময় চৈতন্যসত্তায় পরিপূর্ণ। প্রতীচ্যের জডবিজ্ঞানী তা স্বীকার করেন কি?

ঐ যে অনন্ত আকাশ, আলোক, অনিল, সলিল, পৃথিবীর ধূলিকণাও প্রাণে পবিপূর্ণ এদের প্রাণ আছে বলেই তারই উপরে প্রাণের স্পন্দন সম্ভব হ'য়েছে। মৃত শুকনো গাছে ফুল ফল ধরে না, তেমনি এই মাটি, এই জল এই অনিল আকাশ যদি নিষ্প্রাণ অচৈতন্য হ'ত তাহ'লে আমরাও নিষ্প্রাণ হ'য়ে যেতুম। এই যে প্রাণের স্মবণ চিন্তন এ আজকের কথা নয় সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে ভারত এই কথা জেনেছে, উপলব্ধি করেছে—প্রাণে, মনে, বোধিতে।

জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রগতি যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি 'সূর্য' নামটি। যখন প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীরা বলছে স্থির তখন আমরা অবধারিত জানি যে সৃ+কপ সূর্য্য অর্থাৎ যিনি গমন কবেন, যাঁর আছে গতি তিনিই সূর্য।

লীলাবতীর অঙ্কশাস্ত্র, খনার গণনা, চরক সুশ্রুতের চিকিৎসা-পদ্ধতি, পাতঞ্জলি ও কপিলের দর্শন তথা দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব অতল গভীব গবেষণাপূর্ণ যা জগতের বিস্ময় স্বরূপ।

আবার পুরাণের কাহিনীগুলো আলোচনা করলে পাবো প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিচয়। দধীচি অস্থিদান করলেন দেবতাদের বিজয়ের জন্যে। যার দ্বারা নির্মিত হ'ল বজ্র। তা নৈলে বৃত্রাসুরকে বধ করা যেত না। এ কথার অর্থ—দধীচি বজ্র নির্মাণের সূত্র, নিয়ম, প্রক্রিয়াটি (Formula) সারা জীবন গবেষণা করে আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সূত্রানুযায়ী (বিশ্বকর্মা) একজন শ্রেষ্ঠ কর্মকুশলী নির্মাণ করেছিলেন বজ্র। মহাদেবের হাতে ত্রিশূল, শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন চক্র এগুলি যে এক একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী আয়ুধ তা বলা নিপ্রয়োজন। মহাভারতে স্যমন্তক মণির খবর পাওয়া যায়—সেটি যে দেশে থাকতো সে দেশ ঐ মণির প্রভাবে শস্যশ্যামলা হ'য়ে উঠতো, কারণ সুচারুভাবে হ'ত বৃষ্টি। এটি যে বিশেষ বিজ্ঞানবলে নির্মিত হ'য়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। উৎকলে গরুড় স্তম্ভ যে একটি লৌহ-শিল্পের আশ্চর্য সৃষ্টি তা প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীরা কি অস্বীকার করবেন? রাবণ পুষ্পকরথে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন লঙ্কায়। হনুমান এক রাতেব অন্ধকারে হিমালয় গিয়ে ফিরে এলো লঙ্কায়—সে কি মন্ত্রবলে? কিম্বা দৈববলে অথবা হাওয়াই জাহাজে? ভীষ্ম শর-শয্যায়—কাতর পিপাসায়। অর্জুন মাটিতে শর নিক্ষেপ করলেন। গব্ গব্ করে জলধারা বয়ে চললো—পিতামহ বারি পান করে তৃপ্ত হলেন। এটি যে একটি নলকূপ বিশেষ ধারণা করা কি অসম্ভব? দূর দর্শন। হস্তিনার প্রাসাদকক্ষে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয় পাশে বসে। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের ঘটনাবলী বর্ণনা করছেন—একটি যে বর্তমানের টেলিভিশন যন্ত্র সেখানে ছিল তা সহজে বুঝা যায় না কি? ভারতে প্রায় শতাধিক অস্ত্রোপচার কৌশল প্রচলিত ছিল এ কথা কে না জানে? এইভাবে ভারতের বিজ্ঞানচর্চার বিবিধ হিসাব দেওয়া যেতে পাবে, কিন্তু দিয়েও বা কি লাভ? পুরাতনকে স্মরণ করে শোকের বারিধিতে ভাসলে কূল পাওয়া যাবে না—কিন্তু ঐ পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপরই এব সৌধ নির্মাণ করতে হবে, কারণ স্থানটা মজবুত হয়ে আছে। তবে একথা স্বীকার্য যে, ভারত এককালে চৈতন্যবিজ্ঞানে এবং জড়বিজ্ঞানেও চূড়ান্ত সীমায় উঠেছিল। দ্রব্যশক্তি, মন্ত্রশক্তি প্রভৃতিই সর্বশক্তিই ছিল করায়ত্ত। এখনো তন্ত্রের মাঝে ঐ দ্রব্য ও মন্ত্রশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কালের গতি স্তব্ধ হ'য়ে নেই। মহাকালের স্রোতে জগতের এক কূল ভাঙ্গছে অন্য কূল গডছে। সুতরাং ভারতের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হ'য়েছে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আবিষ্কৃত বিষয়গুলি, আর তার সূত্র, প্রক্রিয়া-গুলোও হয়েছে অপহৃত, বিধ্বস্ত। শুনা যায় বৈদেশিক আক্রমণের ফলে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ এদেশ থেকে হয়েছে অপসৃত। সে সব শাস্ত্রের থেকে আধুনিক মারণাস্ত্রের মালমশলা পেয়ে আবিষ্কৃত হ'য়েছে মারণাস্ত্র। জানি না এ কথা কতদূর সত্য, তবে নিশ্চিত স্বীকার্য যে, ভারতের

জ্ঞান বিজ্ঞান আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ছাড়িয়ে উত্তুঙ্গ সীমায় উঠেছিল যার থেকে তাঁরা জেনেছিলেন এই সব প্রবৃত্তি-ধর্মী জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে মানবের জগতের সুখের আশা, শান্তি লাভের চেষ্টা দুরাশা মাত্র—ফলে তাঁরা এ সবের থেকে গতি ফিরিয়ে নিলেন। অতলান্ত সাগরে ফেলে দিলেন প্রবৃত্তির আস্পৃহাকে যেমন করে বর্তমানে চলছে একটা নিরুত্তাপ আলোড়ন মারণাস্ত্র ত্যাগের। মানবের অন্তরে ভয় জাগলে হাতে ধরে লাঠি, রাইফেল উঁচিয়ে ধরে। এই ভয় হয় তখনি যখন একজন অন্যকে করে অবিশ্বাস, যখন হ'য়ে উঠে স্বার্থপর, প্রভুত্ব বিস্তার করার জন্য হয় উদ্‌গ্রীব, নিজেকে নিয়ে হয় ব্যস্ত। কিন্তু এই ভাব বর্জন করে যখন মানুষ সমপ্রাণ, সমজ্ঞান, সমবোধে হয় প্রতিষ্ঠিত, আত্মতুল্য মনে করে জীবজগতকে তখন পরার্থ-পরতাগুণে হয় অন্বিত। পরের কারণে উৎসর্গ করে জীবনে পায় অতুল আনন্দ। সেইকালে অভয়ব্রহ্মে স্থিত হয়ে হিংসার মূলে করে কুঠারাঘাত। তৎকালে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। দিব্যগুণে, দৈবীসম্পদের অধিকারী হয়ে অবগত হয় বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, ঈশ্বরই একমাত্র সর্বকারণ কারণম্ (ব্রহ্মসংহিতা)। সে ক্ষেত্রে মর্ত্যভোগ্য সামগ্রী তুচ্ছ, জাগতিক সুখসমৃদ্ধিকারী জড়বিজ্ঞান অনাসৃষ্টি, সুতরাং যা অনাসৃষ্টি, যা অল্প, যা দুঃখের নিদান তাকে আগলে রেখে কি লাভ?

তাই বুঝি প্রবৃত্তির পথ ত্যাগ করে নিবৃত্তির পথকে বেছে নিলেন। চুম্বন করলেন দৈবীসম্পদের অমিত সুধা। সেখানে এক অতল আনন্দময় জগত প্রতিভাত হল। সেই মনোরাজ্যে আছে দূর ও দিব্য শ্রুতি, দৃষ্টি, স্পর্শ, আস্বাদ, আঘ্রাণ। সে লোকে দেশজয়ের মারণাস্ত্র হ'ল প্রেম, মৈত্রী, ভালবাসা, স্নেহ। জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় ব্রহ্মচর্য। বিচারশালা হ'ল ত্যাগ ও সত্যের আশ্রয়, বিবেক হ'ল সৈন্য-প্রহরী, ব্যবসায় হ'ল পরতত্ত্ব বস্তু, মন জয়ই পরম জয়, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম হ'ল অমূল্য সম্পদ—এসব ত্যাগ করে কোন্ মূঢ়জন হিংসা, ঘৃণা, লোভের রাজ্যে বাস করতে চায়? বর্তমানের বিজ্ঞানীরা কর্তৃত্বাভিমান ও অহংএর দাস, ঈশ্বর আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে পরাঙ্মুখ। আকাশ জয় করেছি, রোগ নিরাময়ের ঔষধ আবিষ্কার করেছি, মারণাস্ত্র নির্মাণ করেছি, এই-ভাবে হরেক রকম সামগ্রীর সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করে। এ কথা ভ্রমেও স্বীকার করে না যে, এ সবের মূলে রয়েছে এক অতীন্দ্রিয় শক্তি, দিব্য পুরুষের ইশারা। কেনোপনিষদে একটি গল্প আছে—একদা দেবতারা অসুরদের পরাস্ত করে ভাবলো আমাদেরই চেষ্টা যত্নে সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হাসলেন। দেবতাদের সভাস্থলের অনতিদূরে যক্ষ রূপ ধরে দাঁড়ালেন ব্রহ্ম। বরুণ অগ্নি তাঁর স্বরূপ জানতে গিয়ে হলেন পরাভূত। অগ্নির দাহিকাশক্তি, বরুণের গ্রাহ্য শক্তি নিশ্চেষ্ট হল। ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু অন্ধ হ'ল জানতে গিয়ে। অর্থাৎ যক্ষ, দেবদুহিতা মহামায়া রূপ ধরে বললেন, ইনিই ব্রহ্ম। তাঁরই বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমান্বিত মনে করছো

"ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।

ততোহৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।—কেনোপনিষৎ ৪।১

সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানের বিজয় বৈজয়ন্তী ধ্বজা তা ঈশ্বরেরই মহিমা। একথা যদি অস্বীকার করা যায় তবে তাতে প্রকাশিত হবে অন্ধ-তামসিকতা। যদি বলো এসব আমাদেরই কীর্তি মহিমা তবে বলবো—তৈরী করতো একটুকরো মাটি, এক বিন্দু হাওয়া, একটি ঘাস, একটি ফুল, প্রজাপতি, প্রজাপতির রঙ্গীন পাখা। গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাণের স্পন্দন—কিন্তু প্রাণ যে সর্বত্রই বর্তমান যা ইতি-পূর্বেই বলা হয়েছে; সুতরাং তা এমনকি আশ্চর্য! পরন্তু কৈ একটি মৃতের প্রাণে প্রাণদান করো তো? একটি পিঁপড়ে তৈরী করতো? পুরাণে কিন্তু পাওয়া যায় বাল্মীকি লবের ভ্রাতা কুশকে নাকি তৈরী করেছিলেন। বিশ্বামিত্র তৈরী করেছিলেন নারকেল। ঐতো সেদিন বিশুদ্ধানন্দজী কাশীক্ষেত্রে সূর্যালোক সাহায্যে পাখী বাঁচিয়েছেন, নানা গন্ধের সৃষ্টি করেছেন। দক্ষিণেশ্বরে একই ডালে লাল আর শ্বেতজবা ফুটিয়েছেন। সুতরাং প্রতীচ্যের বিজ্ঞান প্রাচ্যের বিজ্ঞানভূমির উপর যে প্রতিষ্ঠিত তা অস্বীকার করলে দোষ দেব অবিদ্যাকে; কারণ অবিদ্যাই মানবের শুদ্ধ বিদ্যা বুদ্ধি ও হৃদয়কে তমসাচ্ছন্ন করে রাখে।

ঈশোপনিষদে এই বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা জানতে পারি—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ঈশোপনিষৎ ১১।

অর্থাৎ যেজন বিশেষভাবে হ'য়েছে বিদিত
বিদ্যা অবিদ্যা এই উভয়ের তত্ত্ব—
অবিদ্যাবলে মৃত্যু অতিক্রম করে—
বিদ্যার প্রভাবে লভে অমৃতত্ব।

বিদ্যা—জ্ঞান, ব্রহ্ম বিজ্ঞান। আর অবিদ্যা—জাগতিক জ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, অর্থাৎ জাগতিক ভোগ বিলাস, সাম্রাজ্য বিস্তার হেতু সে জ্ঞান ও বিজ্ঞান। এই শেষোক্ত জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে আধুনিক সমাজ পরিচালিত যার সাহায্যে মানবের অন্তরে জাগে সন্ত্রাস, যার ফলে শঠতা, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা ভেদবুদ্ধিগ্রস্ত সমাজের সৃজন, অন্যপক্ষে প্রথমোক্ত বিদ্যা বা পরাজ্ঞান বিজ্ঞান হ'ল সত্যে উপনীত হওয়ার অভীপ্সা, চেষ্টা, নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা। এই চেষ্টা, নিষ্ঠা, রতি, গতি, মতি হ'ল পরাজ্ঞানের সাধন। এই পরাজ্ঞান লাভ করে তাকে জীবনে, জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়ে। প্রয়োগ্য মানুষ সত্য ও ত্যাগের মহিমাময়গুণে ভূষিত হয়। যার ফলে জনগণ মঙ্গলহেতু আত্মনিয়োগ করে বিজ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হয়। জ্ঞান হ'ল ভগবতী দৈবী সম্পদের মৌলসূত্র আর ঐ সূত্রের প্রয়োগ হ'ল বিজ্ঞান যা আচরণে ব্যবহারে প্রকাশিত হয়। এর ফলে সমাজে একটা দিব্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে—মর্ত্যভূমি হ'য়ে উঠে দেবভূমি।

পরন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত যে জ্ঞান বিজ্ঞান তাতে মানুষ তামসধর্মী হ'য়ে উঠে। আসুরিক সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলার অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা জাগে, তাতে জগতের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই সাধিত হয় অধিকতর। অগ্নিকে রান্নার কাজে ব্যবহার না করে গৃহদাহের কাজে ব্যবহার করা তামসিকতা, আসুরিকতা নয় কি? অতএব প্রতীচ্যের ভাবে ভাবিত হ'য়ে অন্ধতামস প্রবৃত্তির স্রোতে মন বুদ্ধি ভাসিয়ে দিলে আমরা এক অনিশ্চিৎ পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পৌঁছবো যাতে আমাদের বৈদিক আদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ রাষ্ট্র, সভ্যতা সাধনা অনন্ত অন্ধকারের অতল তলায় তলিয়ে যাবে—সুতরাং উপনিষদের বাণীটি স্মরণ করা দরকার—

বিজ্ঞানং ব্রহ্মচেদ্বেদ তামাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্বান কামান সমশ্নুতে ॥

যিনি বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন এবং উক্ত উপাসনা বিষয়ে অবহিত হন তিনি কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়ে বিজ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হন এবং নির্লিপ্ত চিত্তে সমুদয় কাম্যবস্তু ভোগ করেন এবং অবশেষে পরাসুখও লাভ করে কৃতকৃতার্থ হন। ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

দুটো পারাবত ঘুমিয়েছে

শ্রীবংশী মণ্ডল

দুটো পারাবত ঘুমিয়েছে নড়বড়ে ছাদের কানাচে
কাল থেকেই। যন্ত্রণার হাত হতে ছাড়া পেতে গিয়ে
সেঁকো বিষ খেয়েছে—আরশুলা ইঁদুরেরা,
—ঘরে বেঁচে আছে
তারা মরবে না বলেই তুলে অজাতশত্রুর ছাপ নিয়ে।

ওদের বাগানে যন্ত্রণা; পুঁইশাক বকুলের চারা মরে গেছে।
বৈজ্ঞানিকের কাছে গেছে ইঁদুর মারবে ব'লে!
অবুঝ বালক না বুঝে তর্ক ক'রে কি ফল পেয়েছে!
ও জানে না;—চাঁদের আগুনে কেন ঘর বাড়ী
মানুষেরা জ্বলে।
কি আশ্চর্য্য; দুটো কাক পারাবত ডিমকে
ফেলেছে মাটিতে
দুপুরে পড়ে আছে বাচ্চাটা কি বললে ও সূর্য্যকে ডেকে
কে আসবে সাহস করে ওর মুখে একটু জল দিতে
যাক ও বাঁচল আজ। শুধু একটি জীবনের ঋণ থেকে।
তাই তো। ওরা স্বামী স্ত্রীতে মুখ তুলে চাইল আকাশে
বলে: ডিম মরুক আর বাঁচুক কুচপরোয়া নেই
আমরা তো বেঁচে আছি। কি লাভ শুধু দীর্ঘশ্বাসে
মানুষেরা জ্ব'লে মরে। যাক্ গাছ থাকলে ফল ধরবেই।
দুটো পারাবত ঘুমিয়েছে নড়বড়ে ছাদের কানাচে
কাল থেকেই—চেয়ে দেখ কেমন ওরা বেঁচে আছে।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : আষাঢ়, ১৩৭২ সংখ্যার পর]

রাজ্যের অদ্বিতীয় সুন্দরীশ্রেষ্ঠা উগ্রতারার প্রাসাদে অলস-মন্থর গতিতে রত্নদত্তর দিনগুলো কাটতে লাগলো। শুধু উগ্রতারা ও রত্নদত্ত—রত্নদত্ত ও উগ্রতারা। যে প্রাসাদে নিত্য নূতন সৌম্যদর্শন ধনাঢ্য-জনের শুভাগমন হোতো তা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হোলো। রত্নদত্তর জন্য বহুবল্লভা উগ্রতারার বহুমুখী প্রেমধারা কেন্দ্রীভূত হোয়ে একমুখে প্রবহমান হোলো। নৃত্য, গীত ও কলহাস্যের মধ্যে রত্নদত্তকে ডুবিয়ে দিলো উগ্রতারা। রত্নদত্ত বিভোর হোয়ে যায়। তবু তারই মাঝে···নটীর রুনুঝুনু নূপুরধ্বনির মধ্যে, নর্তকীর অলঙ্কার শিঞ্জিতের মধ্যে ভেসে আসে, দ্রুতগামী অশ্বপদধ্বনি-হ্রেষারব ; ভেসে ওঠে হয়গ্রীব, কর্তব্যে অটল প্রিয় বন্ধুর স্বেদসিক্ত মুখচ্ছবি! মন তার চঞ্চল হোয়ে চ'লে যায় দূরে—বহুদূরে চলোর্মি-সংক্ষুব্ধ অর্ণব পার হোয়ে ওপারে তার সেই হারানো দেশে—যেখানে সে ফেলে এসেছে তার জীবনের অমূল্য সম্পদ! প্রিয় ভগিনী শর্মিষ্ঠার জলভরা আঁখি রত্নদত্তকে বিমনা কোরে তোলে।

নৃত্য থামিয়ে উগ্রতারা ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন কোরলো, রত্নদত্ত, আমার নৃত্যে কি তোমার অরুচি ধ'রে গেল ?

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কম্পিতস্বরে রত্নদত্ত বলে, আমাকে মার্জনা করো উগ্রতারা,—আমি একটু অন্যমনস্ক হোয়ে পড়েছিলাম।

পায়ের নূপুর খুলতে খুলতে উগ্রতারা বলে, আমি লক্ষ্য কোরেছি, তুমি সময়ে সময়ে কি এক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হোয়ে পড়ো। শত প্রশ্ন কোরেও তুমি তার যথার্থ কারণ নির্দেশ করো না। এতো কাছে কাছে থেকেও তুমি সাগরের ওপারেই র'য়ে গেলে—বহু আয়াসেও আমি সেতু-বন্ধন কোরতে পারলাম না। আমাকে ধিক্!

রত্নদত্ত ধীরে ধীরে বোললো, উগ্রতারা, তুমি প্রখর বুদ্ধিশালিনী, তবে তোমাকে মনে কোরিয়ে দিই, উষার অরুণের কাছে মধ্যাহ্নের তেজোবহ্নি আকাঙ্ক্ষা করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। অপেক্ষা করো, উপযুক্ত সময়ে মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড তেজে মার্তণ্ডদেবের আবির্ভাবে সব কুহেলিকার অন্তর্ধান হবে। প্রিয় উগ্রতারা ধৈর্য ধর।

উগ্রতারা বোললো, দেব, সেই প্রচণ্ড মার্তণ্ডতেজ আমি সহ্য কোরতে পারবো কিনা কে জানে। তার চেয়ে আমার এই উষার অরুণ-রাগই ভাল।

বোলতে বোলতে উগ্রতারা অগ্রসর হোয়ে তার তুষারধবল কোমল মৃণাল-ভুজদ্বয় দ্বারা রত্নদত্তকে নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গ কোরে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বোললো, হে সুন্দর, হে সুহৃদ্, তোমার রহস্য তোমাকে আরো সুন্দর কোরেছে!

হেসে রত্নদত্ত উত্তর দিলো, হে সুন্দরী, তোমার রহস্যেরও তো অন্ত নেই!

নিরাশ কণ্ঠে উগ্রতারা বলে, হায়! আমার আর কি রহস্য আছে যা আজও তুমি ভেদ কোরতে পারোনি!

রত্নদত্ত পরিহাসচ্ছলে বলে, নারী মাত্রই রহস্যময়ী,—তার ওপর সেই নারীজাতির তিলোত্তমাসদৃশা তোমার রহস্য ভেদ কোরতে এ কটা দিন তো তুচ্ছ—সারা জীবনব্যাপী অন্বীক্ষণও যথেষ্ট নয়।

সারি সারি মুক্তোর ন্যায় দন্তরাজি বিকশিত কোরে সেই বহুজন-আকাঙ্ক্ষিতা নারী হেসে উঠে বলে, রত্নদত্ত, তুমি অতি চতুর!

সেদিন মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে রাজধানী মহাস্থান নগর দগ্ধ হোচ্ছিল। পথের লোক চলাচল স্তিমিত হোয়ে এসেছিল। নিতান্ত জরুরী কাজ ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে কোন লোকই যখন সহজে রাজি নয়, তখন অবগুণ্ঠনে মুখশ্রী আচ্ছাদিত কোরে অতি সন্তর্পণে দেবী উগ্রতারা তার প্রাসাদের পশ্চাতের ছোট দ্বার দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হোলো। ঠিক এমনি ঘটনা রত্নদত্ত পূর্বেও কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু আজ আর সে শুধুই নীরব দর্শক হোয়ে রইলো না—সেও অতি সন্তর্পণে সকলের অলক্ষ্যে উগ্রতারাকে ধীর পদক্ষেপে অনুসরণ কোরলো।

নগরীর সীমানা পার হোয়ে উগ্রতারা বনমধ্যে প্রবেশ কোরলো। অদম্য কৌতূহলে রত্নদত্তও উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রেখে এগিয়ে চললো।···কিছুক্ষণ চলার পর বনভূমির নিবিড়তা কিছু তরল হোয়ে এল, শেষে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে ওরা উপস্থিত হোলো। প্রান্তরের মধ্যস্থলে একটা বিরাট গগনচুম্বী নির্মীয়মাণ মন্দির—সম্পূর্ণপ্রায় বোলেই মনে হয়। মন্দিরের প্রবেশ পথে কয়েকজন রক্ষী অবস্থিত। রত্নদত্ত একটা বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরালে নিজেকে অদৃষ্ট কোরে দেখলো, উগ্রতারা দ্বারের নিকটবর্তী হোতেই রক্ষীরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো, উগ্রতারা মন্দিরের সরণি অতিক্রম কোরে অভ্যন্তরে প্রবেশ কোরলো।

রত্নদত্ত বহু চিন্তা কোরেও ঘটনাটির কূলকিনারা নির্ধারণ কোরতে পারলো না। রক্ষীদের অবস্থান-জন্য মন্দিরে প্রবেশ করাও অসম্ভব; অথচ প্রবেশ না কোরতে পারলে এই রহস্য ভেদও হবে না। অবশ্য রত্নদত্তের পক্ষে ঐ চারজন রক্ষীকে পরাভূত কোরে মন্দিরে প্রবেশ করা দুরূহ নয়, কিন্তু অহেতুক রক্তপাত করাও সমীচীন নয়। তবে? চিন্তা কোরতে লাগলো রত্নদত্ত। হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দী এসে হাজির।—কিছুদিন হোলো এই বনভূমিতে এক সিংহের আবির্ভাব হোয়েছে। মধ্যে মধ্যে নিশীথে ঐ সিংহ নগরে প্রবেশ কোরে বেশকিছু লোককে ঘায়েল কোরেছে। নগরের সবাই ঐ সিংহ সম্বন্ধে বেশ সজাগ আছে এবং সম্ভব হোলে ওটাকে বধ কোরতেও তারা প্রস্তুত—সুতরাং.....

রত্নদত্ত আচম্‌কা বৃক্ষের অন্তরাল হোতে 'সিংহ—সিংহ' চীৎকার কোরতে কোরতে ছুটে রক্ষীদের নিকটবর্তী হোলো। রক্ষীরাও আকস্মিক বিপদে দিশাহারা হোয়ে ছুটে মন্দিরের সংলগ্ন এক সমাপ্তপ্রায় কক্ষে ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রত্নদত্তও দ্রুতগতিতে সরণি অতিক্রম কোরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ কোরলো।

অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে একটা বড় প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে নিস্তব্ধভাবে কতকগুলো মুহূর্ত রত্নদত্তর কাটলো। রক্ষীরা তরবারি উঁচিয়ে, ধনুকে তীর সংযোগ কোরে সতর্কতাবে সিংহ ও অপরিচিত লোকটির সন্ধানে হতাশ হোয়ে নিজেদের বিশ্রামস্থানে ফিরে গেল। রত্নদত্ত অন্ধকারে হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে মন্দিরের গভীরতম অভ্যন্তরের দিকে এগিয়ে চ'ললো। একটা মৃদু ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ শুনতে পেয়ে লক্ষ্য কোরে সে এগোতে লাগলো। সামনে স্তূপীকৃত সমমাপের প্রস্তর-খণ্ডের অল্প ফাঁকে আলোকরশ্মি দেখতে পেলো। সেই ফাঁকের ওপর রত্নদত্ত চোখ রেখে যা দেখলো তা তার কল্পনাতীত দৃশ্য! সে দেখলো, কতকগুলি উজ্জ্বল দীপের আলোকে আলোকিত সেই স্থানে লীলায়িত বঙ্কিম ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় উগ্রতারা দণ্ডায়মান····· আর সেই দেবচিত্তহরণকারী মূর্তির প্রতিমূর্তি প্রস্তর

প্রাচীরগাত্রে খোদিত কোরছে এক মধ্যবয়স্ক শিল্পী। তন্ময় শিল্পী মধ্যে মধ্যে মহাশিল্পীর এই অপরূপ শিল্পসৃষ্টি অপলক নেত্রে নিরীক্ষণ কোরছে আর বাম হস্তধৃত ছেদনী ও দক্ষিণহস্তধৃত ক্ষুদ্র লৌহমুদ্গর প্রাচীরে পাষাণে নির্মায়মাণ শিল্পের ওপর অতি সাবধানে সযত্নে চালনা কোরছে। শিল্পীর মুখমণ্ডলে একলব্যের একাগ্রতা ও নেত্রদ্বয়ে মানসসরোবরের প্রশান্ততা যুগপৎ বিরাজিত। দুইটি প্রাণ পরিপূর্ণভাবে স্তব্ধ—মৌন—নির্বাক্!—মহাকালের বিশ্বচক্রের গতি যেন সেই অপূর্ব সৃষ্টির সৌন্দর্য মোহিত হোয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে! শিল্পীর উত্তরীয় যে ধূল্যবলুণ্ঠিত—সেদিকে তার দৃষ্টি নাই। সৃষ্টির পরমানন্দে শিল্পী তখন পাষাণ মূর্তির পীনোন্নত পয়োধর রচনায় বিভোর···

হঠাৎ শিল্পীর হস্তস্থিত ছেদনী ভূমে ঠন কোরে প'ড়ে গেল; শিল্পী একটু নিচু হোয়ে তা তুলে নিয়ে উগ্রতারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরেই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হোয়ে বোললো, তোমাকে যেন চঞ্চল বোধ হোচ্ছে।

উগ্রতারা স্বাভাবিকভাবে খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে বোললো, আমাকে মার্জনা কোরবেন। আমার মনে হোচ্ছে নিকটেই কোন তৃতীয় প্রাণীর আগমন হোয়েছে।

সে কি!—শিল্পী বোললো, বাইরে রক্ষীরা রোয়েছে!

তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস···

রত্নদত্ত অন্তরাল হোতে আলোকিত অংশে বার হোয়ে এল—উগ্রতারা চকিতে বস্ত্রদ্বারা নিজের অঙ্গ আবৃত কোরলো। শিল্পী বিস্ময়ে হতবাক্। রত্নদত্ত কয়েক পদ অগ্রসর হোয়ে অতি শ্রদ্ধার সহিত বিনম্রভাবে শিল্পীর প্রতি মস্তক অবনত কোরলো।

শিল্পী বিরক্তভরা স্বরে প্রশ্ন কোরলো, কে তুমি?

রত্নদত্ত। অনধিকার প্রবেশের জন্য আমি সত্যই অপরাধী; তবে যে একাগ্রতা, যে একনিষ্ঠতা, যে তন্ময়তা আমি আপনার প্রতি অঙ্গে অবলোকন কোরলাম তা আমার অচিন্তনীয়পূর্ব। হে শিল্পী, উগ্রতারার গোপন অভিসারের অনুসরণকারী হোয়েই আমি এখানে এসেছিলাম; এসে দুটি মহাপ্রাণের সন্ধান পেয়ে আমি ধন্য হোয়েছি। দেবী উগ্রতারা, তুমিও আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো।

উগ্রতারা হেসে বোললো, তুমি সন্দিগ্ধ চিত্তে এখানে এসেছ, না রত্নদত্ত?

সন্দিগ্ধ না হোলেও রত্নদত্ত বলে, কৌতূহল যে ছিল তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এভাবে শিল্প ও শিল্পীর মাধ্যমে মহাশিল্পীর সন্ধান পেয়ে আমি ধন্য, কৃতকৃতার্থ, তাঁরই উদ্দেশে প্রণত!—বলিয়াই রত্নদত্ত দুই বাহু ঊর্ধ্বে উত্থিত কোরে অনন্তের উদ্দেশে প্রণাম জানালো।

শিল্পী প্রশ্ন কোরলো, উগ্রতারা, তোমরা কি পূর্ব হোতে পরিচিত?

হাঁ। ইনি আমার প্রিয় বান্ধব সার্থবাহ রত্নদত্ত।

রত্নদত্ত নির্মায়মাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে বোললো, উগ্রতারা, মহাস্রষ্টা বহুতর সুষমাভরা উপকরণ দিয়ে তোমাকে নির্মাণ কোরেছেন—এ অবিসংবাদী সত্য; কিন্তু পাষাণগাত্রে শুধু প্রস্তর-উপাদান থেকে যে সৃষ্টি রচিত হোতে চ'লেছে তা যে মহাস্রষ্টা-নির্মিত মানবী মূর্তি চাইতে আরো উন্নত, আরো···

শিল্পী বাধা দিয়ে বোলে ওঠে, স্তব্ধ হও, আগন্তুক, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবানের সৃষ্ট জীবের সঙ্গে আমার রচনার তুলনা কোরে তাঁকে হীন, তুচ্ছ, অক্ষম প্রতিপন্ন কোরো না—আমি তাঁর ক্ষীণ অনুকরণ কোরছি মাত্র।

উগ্রতারা বোললো, রত্নদত্ত, তুমি কি জানো কোন্ মহান্ শিল্পী তোমার সম্মুখে বিরাজ কোরছেন?

রত্নদত্ত জিজ্ঞাসু নেত্রে উগ্রতারার দিকে তাকালেন। উগ্রতারা বলে, কেদারী বাংলার হূন সম্রাট্ তোরমান-এর নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। অত্যাচারী সম্রাট্ শেষ বয়সে হিন্দুধর্মে আস্থাবান্ হোয়ে গোপগিরির (গোয়ালিয়র) বিখ্যাত সূর্যমন্দির নির্মাণ কোরিয়েছেন। সেই মন্দির-গাত্রের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিগুলি ক্ষোদিত কোরেছিলেন প্রসিদ্ধ ভাস্কর ও তক্ষণক্রিয়াবিশারদ শ্রীজনার্দন; সে সময়ে যে কিশোর শিল্পী তাঁর প্রধান সহকর্মিস্বরূপ কর্মরত ছিল, তিনিই বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য কলাবিদ্ শিল্পীপ্রধান পৃথুল তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

শিল্পী ও শিল্পের দিকে গভীর সম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত কোরে

রত্নদত্ত করযোড় কোরলো। উগ্রতারা তাকে মহা-শিল্পীর সৃষ্ট মূর্তিগুলি দীপ হস্তে একটির পর একটি দেখাতে লাগলো। রত্নদত্ত বিস্ফারিত নেত্রে শুধু বোলতে থাকে—আশ্চর্য, অদ্ভুত, অপূর্ব!

উগ্রতারা বলে, এই রচনাবলীর মধ্যে একটা যে ধারা-বাহিকতা আছে তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য কোরছো, রত্নদত্ত?

হাঁ।—এই শৃঙ্খলাপূর্ণ ধারাবাহিকতা দৃষ্টে আমি বিস্মিত।

উগ্রতারা বোলতে থাকে, স্কন্দদেবের অর্চনার জন্য এই মন্দির নির্মাণ হোচ্ছে। স্কন্দদেবেরই জন্মবৃত্তান্ত হোতে দেবসেনাপতি হওয়া পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তের আলেখ্য সমতল প্রস্তরগাত্র হোতে উত্থিতভাবে ক্ষোদিত আছে মন্দিরের সমগ্র প্রাচীর গাত্রে। মহাকবি কালিদাস ভূর্জপত্রে শুধু কার্তিকেয়ের জন্মকথা লিপিবদ্ধ কোরে-ছিলেন, কিন্তু মহাশিল্পী পৃথুল আজ স্কন্দদেবের শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পর্যন্ত শিল্প সন্নিবেশিত কোরে বিখ্যাত হোয়েছেন। স্কন্দ-মন্দিরের এই শিল্পসম্ভার কেবল পাষাণের বুকে ভাস্কর্যশিল্পে কুমারসম্ভবের অনুলিখন নয়, এ একাধারে কুমারের বীরত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শিল্প-চাতুর্যের অসামান্য নিদর্শন, যা শিল্পীকে অনন্তকাল অমর কোরে রাখবে।

পৃথুল বোললো, উগ্রতারা, সন্ধ্যা হোয়েছে, গৃহে যাবার সময় উপস্থিত।

দেব, রত্নদত্ত শিল্পীকে প্রশ্ন কোরলো, আপনার অদ্যকার কার্য কি শেষ হোয়েছে? আপনি কখন গৃহে প্রত্যাবর্তন কোরবেন?

মহাশিল্পী কোন উত্তর দিল না; উগ্রতারা বোললো, আরব্ধ কলা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী ও শিল্প একত্রই অবস্থান করেন। এস রত্নদত্ত, আমরা যাই।

ওরা শিল্পীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মন্দিরের বাইরে এল। রক্ষীরা অবাক্ হোয়ে রত্নদত্তর প্রতি তাকালো, কিন্তু উগ্রতারার উপস্থিতির জন্য নীরবে মস্তক অবনত কোরলো। উগ্রতারা রক্ষীদের উদ্দেশ্যে বোললো, আজ আমার সঙ্গীর প্রয়োজন নেই।

আবছা সন্ধ্যার আঁধারে প্রান্তর অতিক্রম কোরে লঘু পদক্ষেপে ওরা বনপথে অগ্রসর হোলো। (ক্রমশঃ)

কান্তকবি স্মরণে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঈশ্বরনির্ভর ভক্ত, কান্তকবি, সঙ্গীত তোমার
পুলকবিহ্বল করে অবিশ্বাসী মানবের প্রাণ!
বাঙালীর কোটি বক্ষে বহায়েছ গীতিসুধা-বান!
উচ্ছলিয়া পড়ি' তাহা করিয়াছে আপ্লুত সংসার!
স্বল্পায়ুঃ জীবনে যাহা প্রদানিলে, তুলনা তাহার
হবে না কাহারো সঙ্গে, অপূর্ব্ব তোমার অবদান!
কালের কলুষে কভু কোনোদিন নাহি হবে ম্লান!
লভিয়াছ অমরত্ব, সঙ্গীতের মাধুরী অপার!
অতুলন ভক্তিগীতি সর্ব্বস্তরে লভি' সমাদর
মাতালো অখণ্ড বঙ্গ! ভারতের মুক্তির সংগ্রামে
আত্মনির্ভরতা তুমি দিলে আনি' দেশের ভিতর!
অটল আশ্বাসে সবে ধেয়ে চলে, পথে নাহি থামে!
শত শত শতাব্দীর ভক্ত কবি, সাধক সজ্জন!
ভারতীর পাদমূলে তুমি পেলে শাশ্বত আসন!
হে কবি, নির্ভীক চিত্তে, সুনিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে
ছিন্নকণ্ঠ পিক সম গুণগান করেছ বিভুর!
মানব-আত্মার শান্ত হেরিলাম প্রশান্তি প্রচুর!
ধাতার চরণ দুটি দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছ বুকে
রোগের দারুণ দাহে! ছাড়ো নি দুর্দ্দান্ত তীব্র দুখে!
তোমার হৃদয় কভু যাতনায় হয়নি বিধুর!
অভিমানে অভিশাপে বিধাতারে বলোনি—নিষ্ঠুর!
মৃত্যুপথযাত্রী তুমি, বরিলে মৃত্যুরে মহাসুখে!
তুমিই সাধক কবি, যশঃ অর্থ করো নাই দাবী!
গেয়েছ আপন মনে, বিমুগ্ধ হয়েছে দেশবাসী।
কী ধনে হইলে ধনী, বারংবার সেই কথা ভাবি!
নিষ্কাম সাধনা তাই মনঃপ্রাণে সবে ভালবাসি!
অটল বিশ্বাসে তুমি মৃত্যু জয় করিয়া রভসে,
ধ্রুবতারকার মতো আছ নরচিত্তের নভসে!*

* প্রবর্ত্তক সাহিত্যচক্রে পঠিত।

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণে

শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

॥ ৪ ॥

স্বর্গীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাধক রামদয়াল মজুমদার কলিকাতার রক্ষণশীল অভিজাত ও গৃহস্থ সমাজে এক সময় একজন আদর্শ সাধক পুরুষরূপে সম্মানিত ও পূজিত ছিলেন। তবে তিনি স্বয়ং কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। তিনি নিজে যেরূপ তাঁহার কুলগুরুর নিকট হতে দীক্ষা-লাভ করেছিলেন, সেইরূপ তাঁহার গৃহী ভক্তদিগকেও নিজ নিজ কুলগুরুর নিকট হতে দীক্ষা লাভের জন্য উপদেশ দিতেন। তবে সাধনার উৎকর্ষের জন্য সাধু-সন্তদিগের সঙ্গলাভ একান্ত আবশ্যকরূপে বিবেচনা করতেন এবং তাঁহার ভক্তগণকেও সৎসঙ্গের জন্য উৎসাহিত করতেন। বহুবাজার ষ্ট্রীটে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নিকট তিনি একটি দোতলা ঘরে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছিলেন। প্রতি রবিবার বৈকালে তাঁহার অনুরাগী ও ভক্তগণ তাঁহার উপদেশ লাভের জন্য সমবেত হতেন। ঐ একই স্থানে তাঁহার সম্পাদিত "উৎসব" নামক একটি ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো; বহু বৎসর ধরে এই পত্রিকার পরিচালনা ও প্রকাশ তিনি ক'রে গেছেন। এখনো অনেক পুরানো বাড়ীতে ও লাইব্রেরীতে পুরানো "উৎসব" মাসিক পত্রিকা বাঁধানো রয়েছে। এই পত্রিকায় তিনি গীতার ব্যাখ্যা, হিন্দুধর্মের তত্ত্ব, পৌরাণিক পুরুষদিগের কাহিনী অবলম্বনে নানা গল্প ও সমসাময়িক সমাজ ও মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করতেন। তাঁর নিজ রচনাগুলিই এই পত্রিকায় প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়রূপে বিবেচিত হতো। তাঁর একান্ত সহযোগী ছিলেন ময়মনসিংহবাসী গৌরীপুরের দ্বারপণ্ডিত অধুনা নবদ্বীপ প্রবাসী মদীয় সংস্কৃত অধ্যাপক ও গুরু-কুলের অগ্রণী স্থানীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের লিখিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও কয়েকটি পৌরাণিক উপন্যাস গ্রন্থ উৎসব অফিস থেকে প্রকাশ হ'য়েছিল। তাঁর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তাঁর গল্পগুলিও ছিল অতি সরস ও হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্য হিসাবে তাঁর রচিত "ভদ্রা" উপন্যাস একটি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও বাংলা সাহিত্যের এক সমুজ্জ্বল রত্ন। অর্জুনের সহিত সুভদ্রার প্রণয় ও পরিণয় কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ও উৎসব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বিবিধ উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের মতের উপরে তাঁর সকল ব্যাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর লিখিত ছান্দোগ্য উপনিষদ একটি অতি মূল্যবান ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এই ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণীয় যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ পদ্মবিভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথের নিকট আত্মীয়, তবে কবিরাজ মহাশয়ের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ হতে কিছুটা বিভিন্ন। কবিরাজ মহাশয় শৈব আগমের এক অতি প্রামাণিক পণ্ডিত; যদিও সকল দর্শনেই তাঁর সমান অধিকার।

স্বর্গীয় রামদয়ালবাবু ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ অধ্যাপক ও বক্তা হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন। টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী কলেজে রামদয়ালবাবু অধ্যক্ষ ছিলেন এবং কেদারনাথ সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মদীয় পিতৃদেবের অভিপ্রায় অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর সংস্কৃতের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন। এখানে তখন শ্রীঅরবিন্দ অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ কেদারনাথ লাভ করেছিলেন। তখন শ্রীঅরবিন্দ শুধু দেশের স্বাধীনতার পুরোহিত ছিলেন না, তিনি জাতীয় শিক্ষা ও শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারেও ব্রতী ছিলেন। তখন তাঁর জীবন গীতার আদর্শে পরিচালিত হতো। বিলাত প্রত্যাগত ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার বিরাট প্রতিভূ শ্রীঅরবিন্দকে সমাতন ধর্মের এক নিষ্ঠাবান সাধকরূপে লাভ করে পণ্ডিতমণ্ডলী ও

রক্ষণশীল হিন্দুগণ শ্রীঅরবিন্দের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হন। উত্তরপাড়ার জমিদার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী (মিশ্রীবাবু) সেই সময়কার রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। মদীয় পিতৃদেব তাঁকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখতেন। রামদয়াল মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূগণ মিশ্রীবাবুকেই রক্ষণশীল সমাজের নেতারূপে বরণ করেছিলেন। মিশ্রীবাবু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার প্রতিষ্ঠাতা। রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি উগ্রপন্থী ছিলেন এবং অগ্নিযুগের এক প্রধান ঋত্বিকরূপে কাজ করেছেন। ইনিও শ্রীঅরবিন্দের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। রামদয়ালবাবু ও কেদারনাথ পণ্ডিত মহাশয় উভয়েই অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে স্বদেশী শিক্ষান্দোলনের সহিত জড়িত থাকার ফলে উগ্র তেজস্বী ব্রাহ্মণরূপে বিদেশী ভাবধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের মহিমার পুনরুদ্ধার ছিল তাঁর প্রধান ব্রত। পক্ষান্তরে রামদয়ালবাবু রাজনীতি থেকে কিছু দূরে থাকতেন। তিনি শিক্ষিত সমাজে সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে একই সঙ্গে নানা সভায় বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বক্তৃতাতে রসিকতার অভাব ছিল না; তবে পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজ সংস্কারকদিগের বিষয়ে আলোচনার সময় মাঝে মাঝে তাঁর প্রশান্ত ও সরসতার কিছু ব্যতিক্রম ঘটতো। তিনি কোনো কোনো দেশখ্যাত সংস্কারকদের উদ্দেশ্যে সহসা ব'লে উঠতেন—"তুমি কে হে বাপু"? তুমি কি পরাশর, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের সোদর ভাই, তোমার ক্ষমতার কতটা দৌড় যে ব্যাস, বশিষ্ঠের উপরে কথা চালাতে এসেছ? তিনি অনেক বক্তৃতাতেই সহসা সহিষ্ণুতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে এইভাবে সংস্কারকদিগের তিরস্কার ক'রে ছাড়তেন। তবে তাঁর অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে এতই শ্রদ্ধা ছিল যে, বেদান্ত প্রচারের জন্য রাজা রামমোহন ও বিবেকানন্দের প্রশংসা ক'রতেন; এমনকি অদ্বৈত এক ঈশ্বরের তত্ত্ব-প্রকাশের জন্যে কোরান শরিফেরও তারিফ ক'রতেন। রামদয়ালবাবু ও পণ্ডিত মহাশয় পাঠ্যজীবনে আমার অভিভাবক স্থানীয় ছিলেন। তাঁরা কলিকাতাবাসী বারেন্দ্র সমাজের বিশিষ্ট কয়েকটি জমিদার ঘরের যুবক ছাত্রদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। প্রতি মাসেই এই সমিতির সভা বসতো; তাঁরা আমাকেও এই সভার সভ্য ক'রেছিলেন। অন্যান্য জমিদার-পুত্রদের মধ্যে আমার বৈবাহিক বলিহারের কুমার শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু রায়, চৌগাঁয়ের কুমার স্বর্গীয় রাজেশকান্ত রায়, নাটোরের ছোট তরফের কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায় ও তাহিরপুরের কুমার স্বর্গীয় শক্তিশেখরেশ্বর রায়ের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য এই সমিতি দু'এক বৎসরের বেশী কার্যকরী হয়নি; কেননা অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন কলেজের ছাত্র। বি. এ. উপাধি লাভের পর জমিদার-বংশীয় যুবকগণের সংসারাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের অভিভাবকগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সভ্যগণ দার-পরিগ্রহের পর তাঁদের নবীন সংসার গোছাতেই অধিকতর মনোযোগী হ'লেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতি নিয়ম রক্ষা করলেও, গীতা, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠে এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য যে অবসর প্রয়োজন, তা তাঁদের ঘটে উঠলো না। রামদয়ালবাবু ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক এবং ছাত্রদের নিকটেও একাগ্রতা তাঁর বিশেষ কাম্য ছিল। জমিদারপুত্রগণের উড়ো উড়ো মনোভাব দেখে তিনি বুঝলেন যে, এদের নিয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠন সম্ভবপর নয়। তিনি এই সমিতি ছেড়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এর অস্তিত্বও লুপ্ত হলো।

(ক্রমশঃ)

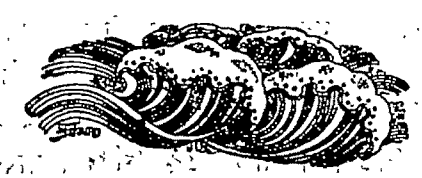

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্কট

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ., এইচ. ডিপ. এড. (ডাবলিন)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপদ যে ঘনিয়ে এসেছে সে কথা আজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের কাছে কেন, সাধারণ শিক্ষিত লোকের কাছেও অজানা নয়। মনে হয় লালচীন সমগ্র এশিয়ার সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার জন্যে উদ্যত হয়েছে। তার এই দম্ভ ও সাহস রাতারাতি গজিয়ে ওঠে নি। ভাল করে ভেবে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাতে পেয়েই মাও-সে তুং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আপন প্রভাব বিস্তার করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত লালচীনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, তার প্রথম চ্যালেঞ্জ আরম্ভ হয় কোরিয়ার যুদ্ধে। তারপর ১৯৫১ সালে মাও-সে তুংর চেষ্টায় ও সামরিক সাহায্যের ফলে ভিট্‌নাম ভাগাভাগি হল, আর তাঁবেদার হো-চিন-মিন হলেন উত্তর-ভিটনামের রাষ্ট্রপ্রধান। মাও-এর লালসার নিবৃত্তি এখানেই শেষ হল না; সে লালসা আরও বেড়ে গেল এবং তারই ফলে কমিউনিষ্ট পরিচালিত বিপ্লব ঘটল ব্রহ্মদেশ, মালয়, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়ায়; লাওস, কম্বোডিয়াও এ ছোঁয়াচ থেকে বাদ পড়ল না। ১৯৫০ সালে ব্রহ্মদেশের সীমান্তে চীন সৈন্যের সমাবেশ দেখা দেয়, যার ফলে ব্রহ্মদেশ চীনের সঙ্গে সীমানা বিরোধ মিটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম ভারতবর্ষ, নেপাল, ভূটান ও সিকিমের সীমান্তে চীন সৈন্য দেখা যায়। তারপর দখল হল তিব্বত। তিব্বত দখলের পর যে অবশ্যম্ভাবী পরিস্থিতির আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চুপিসারে ভারতের কয়েক হাজার মাইল ভূভাগ দখল করে নিয়ে রাস্তা, ঘাট, সাঁকো, বিমানঘাটি প্রভৃতি তৈরি করে ১৯৬২ সালে প্রকাশ্যে চীন হিমালয় প্রদেশ আক্রমণ করল। আমাদের ঘুমের ঘোর যেন একটু কাটল। দিল্লীর প্রাসাদকুটে যেন একটু চেতনার সাড়া মিলল; কিন্তু সে নিতান্ত সাময়িক।

১৯৫০ সালে যে মস্কো-পাইকিং মিত্রতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আজ তাতে খানিকটা চির খেলেও এশিয়াবাসীর তাতে উল্লসিত হবার কোন কারণ নেই; কারণ তাদের মিতালিতে ফাটল ধরলেও একেবারে ছিন্ন হতে পারে না। পররাষ্ট্র সচিব রাস্কের মত, পাশ্চাত্যের স্বার্থ যেখানে জড়িত রয়েছে, সেখানে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা শুধু সম্ভবপর নয়, তা অবশ্যম্ভাবী। চীনের লোকবল আর রাশিয়ার অস্ত্রবল, পরস্পরের পরিপূরক। আজ বিপদ তাই শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার—যেটিকে রাষ্ট্রনৈতিক ভাষায় বলা হয় "নরম তলপেট"।

১৯৪৯ সালে যখন মাও চীন দখল করলেন, তখন শুধু মেলেনকভই নয়, এশিয়ার অনেক বুদ্ধিজীবী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁরা মাও-এর সৈন্যদলকে মুক্তিফৌজ বলে ভুল করেছিলেন, ভেবেছিলেন চীনা কমিউনিষ্টরা নিরাসক্ত, নির্লোভ ও বিশ্বাসযোগ্য; মনে করেছিলেন তারা য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে রাজনৈতিক চেতনাশূন্য, বিচ্ছিন্ন দঃ পূঃ এশিয়াকে চিরদিন রক্ষা করবে। অদৃষ্টের পরিহাস! সে আশা ধূলিসাৎ হল, সে সাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। শিগ্‌গির এশিয়াবাসীরা বুঝতে পারল, কমিউনিষ্ট চীন সমগ্র দঃ-পূঃ এশিয়াকে পদানত করে তাকে আপন ছত্রছায়াতলে আনতে চায়।

মনে হয় দঃ-পূঃ এশিয়ার দেশগুলি যারা এখনও পর্যন্ত নিরপেক্ষতা রক্ষা করে চলেছে, তারা লাল চীনের লুব্ধদৃষ্টি থেকে আর বেশীদিন আত্মরক্ষা করতে পারবে না; কারণ এদেশগুলি কোন শিবিরভুক্ত না হওয়ায়, না পাবে তারা কারও কাছে সময়মত পর্যাপ্ত সামরিক সাহায্য, না পারবে নিজেরা কোমর বেঁধে লড়াই করতে। লুপ্ত ক্যাথে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চীন শুধু আজ নয়, বহুকাল হতেই দেখছে। মৃগ যেমন আপন মাংসে বৈরী, তেমনি চা, চাউল, রবার, টিন, টংগস্‌টাইন, কাঠ, কেরোসিন প্রভৃতি বহুবিধ খনিজ, বনজ ও কৃষিজাত সম্পদে গরীয়ান দঃ-পূঃ এশিয়া লাল

চীনের কাছে লোভের ও লাভের সামগ্রী—এ সম্পদ আহরণে চীন যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পিছ্‌পা হবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়েই চীনা কমিউনিষ্টরা সমগ্র দঃ-পূঃ এশিয়ায় (১·৬ মিলিয়ন বর্গমাইল স্থান) ১৯৪৮ সাল থেকে দলে দলে অনুপ্রবেশ আরম্ভ করেছে, আর মাও-মার্কা সাম্যবাদ প্রচারে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে। ধনীদরিদ্র ভেদাভেদহীন, নিষ্পেষণ ও শোষণশূন্য এক নতুন সমাজের কল্পিত রঙীন চিত্র এইসব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, দরিদ্র, নির্যাতিত, সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের মানসে অত্যন্ত লোভনীয়ভাবে এঁকে দেবার চেষ্টা করছে; আর এ কাজে অনেক স্থলে সফলও হচ্ছে। উদ্দেশ্য হল, আগে জনগণের হৃদয় হরণ করতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে তাদের পায়ে পরাতে হবে শৃঙ্খল।

ঐ কাজ মাও করবেন বেশ সুপরিকল্পিত উপায়ে। মনে হয় নিম্নলিখিত উপায়গুলি তিনি অবলম্বন করবেন—

(১) ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়, নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি দেশগুলির সীমান্ত চীনের গায়ে হওয়ায়, এই সব দেশে কমিউনিষ্ট তৎপরতা তীব্রতর করে তুলবে এবং মাও-মার্কা সাম্যবাদ এইসব দেশের যুব-সম্প্রদায়ের অপরিণত মস্তিষ্কে নিপুণভাবে এঁকে দেবার চেষ্টা করবে।

(২) যেসব দেশে লাল চীন আসন গেড়ে বসেছে, সেইসব দেশ থেকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মদেশ, নেপাল, ভূটান, সিকিম ও নেফার দিকে আস্তে আস্তে থাবা বাড়িয়ে দেবে। এইসব দেশে স্থানীয় কমিউনিষ্ট দলের সাহায্যে কখনও ধর্মঘট, কখনও নাশকতা, কখনও বা সশস্ত্র বিদ্রোহের সাহায্যে স্থানীয় সরকারকে বিপর্যস্ত করে চীন আপন মুষ্টি দৃঢ় করবার চেষ্টা করবে।

(৩) স্থানীয় চীনাপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি যাতে গ্রাম-রক্ষী দল, গ্রাম-পঞ্চায়েত, সীমান্ত রক্ষীদল, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির পরিচালক সমিতিতে, পৌর প্রতিষ্ঠানে, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, চেম্বার অব্ কমার্স, শ্রমিক সংস্থা প্রভৃতি যত রকম প্রতিষ্ঠান আছে, সর্বত্র যাতে অনুপ্রবেশ করতে পারে তার জন্যে লাল চীন মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করতে থাকবে। এইসব প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করে তাদের কাজ হবে, সভ্যদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করে সমস্ত রকম জনহিতকর কাজে বাধা দেওয়া।

(৪) জনসাধারণের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবার জন্যে সমগ্র দঃ-পূঃ এশিয়ায় কমিউনিষ্ট দলের লোক দিয়ে ছোট বড় নানারকম দোকান খুলবার চেষ্টা করবে। এইসব দোকান চীনের অর্থসাহায্যে পুষ্ট হওয়ায় কম দামে কমিউনিষ্টদের এবং কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকদের জিনিসপত্র বিক্রী করতে থাকবে। এর ফলে অ-কমিউনিষ্ট ব্যবসাদাররা অনেক ক্ষেত্রে মার খাবে। এইসব দোকানে বেচা-কেনার ফাঁকে ফাঁকে রাজনৈতিক আলোচনা ও মতবাদ প্রচারের ব্যবস্থা থাকবে। হিমাচল প্রদেশ আক্রমণের আগে কলকাতায় রাতারাতি গজিয়ে উঠা অসংখ্য চীনা ডাইং-ক্লিনিং-এর কথা এখানে মনে করা যেতে পারে।

(৫) স্কুল-কলেজের ছাত্র-সংসদগুলি স্থানীয় কমিউনিষ্টরা দখল করবার চেষ্টা করবে; যাতে এইসব অপরিণত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের কমিউনিষ্ট মতবাদ প্রচারে ও রাজনৈতিক কাজে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। চীন এই কৌশলটি সর্বত্র ব্যবহার করছে; কারণ সে জানে, অপরিণত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের দোষত্রুটী সর্বদেশের কর্তৃপক্ষেরা ক্ষমার চোখে দেখেন। চীনা ভাষায় এই কৌশলটির নাম হল 'নান-ইয়াং'।

(৬) দঃ-পূঃ এশিয়ায় চীন সর্বত্র সচিত্র ও সুন্দরভাবে ছাপাই ও বাঁধাই করা কমিউনিষ্ট প্রচার-সাহিত্য সুলভে বিক্রয় বা বিনামূল্যে বিতরণ করতে থাকবে। এইসব পুস্তকে কমিউনিষ্টদের জীবনযাত্রা, তাদের ধরণধারণ ও সমাজজীবনের মনোজ্ঞ কাল্পনিক চিত্র ফুটিয়ে তোলা হবে। আর প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলি যদি এদের আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেটাকে "ডলার তোষণ" নীতি বলে ব্যাখ্যা করা হবে।

(৭) পরিশেষে দঃ-পূঃ এশিয়ার দেশগুলি যারা চীনকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন না জানাবে, তাদের দেশে বেতারে তীব্র লড়াই চালাবে চীন। যত রকম কুৎসা, মিথ্যা, অপপ্রচার করা সম্ভব তা করবে; তবে এগুলি

একটানা ভাবে করবে না। এইসব দেশের প্রতি প্রথমে জানাবে শুভেচ্ছা ; স্থানীয় ভাষায় কিছু সংগীত ; দেশবিদেশের খেলার খবর, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিবরণ বিতরণের মধ্যে মাঝে অপপ্রচার ও মিথ্যার বেসাতি চালাতে থাকবে।

কেন এটা সম্ভব হল ?

এই যে সমস্ত দঃ-পূঃ এশিয়া জুড়ে লাল চীন বাঁদরামি আর বদমাইসি চালাচ্ছে, কোথাও চোখ রাঙাচ্ছে, কোথাওবা তোয়াজ করছে, আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে, কোথাওবা সৈন্য সমাবেশ করে দুর্বল দেশের মনে ভয়ের সঞ্চার করছে ; এটা সম্ভব হল কি করে ? চীন বিরাট সামরিক শক্তির অধিকারী আর তার লোকসংখ্যা ৭০ কোটি এইজন্যেই কি এইসব কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব, না অন্য কোন কারণ আছে ? সত্যই চীনের অনেকগুলি সুবিধা আছে ; যা অত বড় দেশ রাশিয়াতেও নেই। সুবিধাগুলি হল এই—

(ক) চীন এশিয়ার একটি ভূভাগ ; তাই এশিয়াবাসীরা চীনকে যত বিশ্বাস করে রাশিয়াকে তত বিশ্বাস করে না। এশিয়াবাসীরা মনে করে, চীন বহু শতাব্দীর য়ুরোপ-আমেরিকার সমকক্ষ হয়ে এশিয়ার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করছে।

(খ) সমস্ত দঃ-পূঃ এশিয়ায় চীনের সঙ্গে সীমানা সংযোগ থাকায় চীনের প্রচারকার্যে ও সামরিক সাহায্য দানে যতটা সুবিধা আছে, রাশিয়ার ততটা নেই—য়ুরোপের ত কথাই নেই। চীনের এই সকল প্রচারের ফলে প্রাচ্যের বহু বুদ্ধিজীবী চীনের শিবিরে প্রবেশ করতে দ্বিধা করছে না।

(গ) ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিটনাম প্রভৃতি দেশে অসংখ্য চীনা বসবাস করায়, চীনের মস্ত বড় সুবিধা হয়েছে। এ সুবিধা রাশিয়ার নেই। এইসব চীনাদের সামরিক ভাষায় "ট্রয়ের ঘোড়া" বলা হয়। এদের আনুগত্য মূল চীনের প্রতি, তাদের জন্মভূমি বা কর্মভূমির প্রতি নয় (আমাদের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে) এরা নিয়মিতভাবে মূল চীনে যাতায়াত করে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে, গেরিলা যুদ্ধে, নাশকতা, সন্ত্রাসবাদ ও গুপ্তচরের কাজে নিয়মিত শিক্ষালাভ করে। এরা এক বিরাট পঞ্চমবাহিনী। দঃ-পূঃ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাস করে নাগরিকত্ব লাভ করে দলে দলে লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, পৌরপ্রতিষ্ঠান, বিধান-সভা প্রভৃতি সর্বত্র সভ্য নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় সরকারকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করছে। দলে ভারী হওয়ায় এদের জন্যে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কোথাও কোন সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন না। সমস্ত দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, পাইকারি ও খুচরা দোকানে তাদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় রাষ্ট্রের রাজস্বও তারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করছে। ব্রহ্মদেশে চীনাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ, মালয়ে তাদের সংখ্যা ৪০ %, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিটনামে তাদের সংখ্যা বিপুল। বিশেষজ্ঞদের হিসাবে দঃ-পূঃ এশিয়ায় দুই কোটির উপর চীনা বাস করে। মাও-সে তুং এইসব প্রবাসী চীনাদের উপর অত্যন্ত আস্থাশীল। তাঁর মতে বাহির হতে সশস্ত্র আক্রমণ অপেক্ষা এদের প্ররোচিত অভ্যুত্থান বেশী কার্যকরী হবে। ১৯৬০ সালে মালয় থেকে তাড়িত চীনা কমিউনিষ্টরা থাইল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করায়, মালয় বিপদমুক্ত হয়েছে ; কিন্তু থাইল্যাণ্ডের বিপদ সেই পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। থাইল্যাণ্ড সিয়াটোর সভ্য হয়েও মনে হয় শীঘ্র অথবা বিলম্বে লাল চীনকে বরণ করে নেবে। ফিলিপাইনে কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। কম্বোডিয়া, লাওস হয় স্বেচ্ছায় নয়ত বাধ্য হয়ে লাল চীনের সঙ্গে হাত মেলাবে। সমস্ত দঃ-পূঃ এশিয়া যেন ফুটন্ত অবস্থায়—যে কোন মুহূর্তে যে কোন স্থানে অঘটন ঘটতে পারে।

যদি সমগ্র বা বেশীর ভাগ দঃ-পূঃ এশিয়া চীনের কবলস্থ হয় বা চীনের আশ্রিত হয়, তাহলে যে ঘোর সঙ্কট দেখা দেবে, সে শুধু এশিয়ারই সঙ্কট হবে না—সে সঙ্কট থেকে য়ুরোপ-আমেরিকাও বাদ পড়বে না। সমস্ত এশিয়ার বাজার থেকে পশ্চিম জগৎ তাড়িত হবে ;

এশিয়ার কাঁচামাল তাদের কাছে পৌঁছাবে না, অথবা পৌঁছাবে চীনের মর্জ্জি ও সুবিধা অনুসারে। ভারতবর্ষ আর জাপানের বিপদের কথা না বললেও চলতে পারে। এই দুই দেশের অগণিত জনসাধারণ সমগ্র এশিয়ার সঙ্গে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে, তার সুবিধা ভোগ করছে। সে সুবিধা চলে যাবে, দুই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে, আর তার ফলে যে কি হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

দঃ-পূঃ এশিয়ার এই যে সঙ্কটময় অবস্থা; এর থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই? আছে। যদি সমগ্র দঃ-পূঃ এশিয়া নিজের স্বার্থে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা ভুলে একাত্ম হয়ে এক বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করে তবে এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবে। আমেরিকা-ইংলণ্ডেরও বেড়ার উপর বসে মজা দেখবার সময় নেই। তাদেরও আপন স্বার্থে এশিয়াবাসীর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, দরকার হলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সঙ্কটকে রুখতে হবে। তাদের মনে রাখা উচিত, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে রাশিয়া কমিউনিষ্ট বনে যায়, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে চীন হয়ে যায় কমিউনিষ্ট। সমগ্র এশিয়ায় কমিউনিষ্ট মতবাদ দ্রুত প্রসারলাভ করছে। একে রুখতে হবে প্রচার-যন্ত্রের সাহায্যে, প্রয়োজন হয় অস্ত্র সাহায্যে; নচেৎ বিপদ শুধু এশিয়ার নয়, সমগ্র বিশ্বের। কমিউনিষ্টদের কাছে ভারতের আত্মসমর্পণ মানে হবে সারা এশিয়ার আত্মসমর্পণ, এ কথা আমেরিকা যেন ভুলে না যায়। এশিয়ার কমিউনিজমকে রুখতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ—পাকিস্তান নয়। কাজেই কমিউনিজম প্রসারের প্রতিরোধে আমেরিকা যেন দ্বিধাহীন ভাবে ভারতবর্ষকে সাহায্য করে—অর্থ দিয়ে এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে; নচেৎ ক্রমবর্ধমান চীনা কমিউনিজম নীতি শুধু সমগ্র এশিয়া বা আফ্রিকাকেই নয়, পৃথিবীর স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত স্থানে বিস্তারলাভ করবে—ভক্তিতে বা আসক্তিতে না হোক অন্ততঃ ভয়ে। এ ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে এশিয়া আফ্রিকাকে। সঙ্কোচের কল্পনাতে ম্রিয়মাণ হবার সময় আর নেই।

প্রার্থনা

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

জাগ্রত হও ওগো নিদ্রিত দিনটি
ঝঙ্কৃত হোক পুনঃ জীর্ণ এ বীণটি।

দক্ষিণ কর রাখি রুক্ষ এ অলকে,
নির্ব্বাণ দীপ জ্বালো বক্ষের ফলকে;
অন্তর মাধবীর মূর্চ্ছিত কুঞ্জে
পুষ্পিত কর ঘন পল্লব-পুঞ্জে।

অতীতের ছবি আঁকো চিত্তের মুকুরে
তন্দ্রার গতি চলে অনন্ত সুদূরে।

বিষণ্ণ, বিবর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি,
শ্রান্ত দু'চক্ষের নিষ্প্রভ দৃষ্টি
উজ্জ্বল করে দাও স্তিমিত এ জীবনে
সঙ্গীত সুধা ঢালো যাত্রার লগনে,
প্রত্যূষে নিয়ে চির ক্লান্ত প্রণাম
নিঃশেষে মুছে দিও চিহ্ন ও নাম।

ব্যর্থ আশা

শ্রীমতী বীণাপাণি ভট্টাচার্য্য

আমি যেন কাঁটা সবার জীবনে,
কোন ঠাঁই মোর নাই;
কেহ মোরে কভু চায় না তো হেথা
চেয়ে চেয়ে দেখি তাই।
ফুল সে তো ফোটে মোর প্রাণরসে
রিক্ত করিয়া মোরে
আমার যা-কিছু বিলায়ে দিয়েছি
ফুলের বুকটি ভরে।

শুধু অবহেলা সহিয়া সহিয়া
এক পাশে আছি তাই,
কাঁটা-গাছ হয়ে উষর মরুর
বক্ষে নিয়েছি ঠাঁই।
ফাগুনের ফুল শেষ হয়ে গেল—
শুধু দুটো দিন বাকী,
সবাই আমায় দিল অবহেলা—
আমিও দেব গো ফাঁকি।

ধর্ম্মপ্রাণ ৺বিমলেন্দু গুপ্ত

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভার সম্পাদক ও বিশিষ্ট সেবক, কলিকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের জামাতা, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিচক্ষণ বাগ্মী ডাক্তার বিমলেন্দুচন্দ্র সেনগুপ্ত আর ইহজগতে নাই। বিগত ২৮শে মে তারিখের সাপ্তাহিক Truth পত্রিকায় তাঁহার আকস্মিক মহাপ্রয়াণের সংবাদ দেখিয়া মর্ম্মাহত হই। ইহার দিন-কয়েক পূর্ব্বেও তাঁহাকে সুস্থ ও সবল দেখিয়াছি। সহসা হৃদ্‌রোগের আক্রমণই তাঁহার অমূল্য জীবন নাশের হেতু। যিনি নিজে আধুনিক চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী, যাঁহার শ্বশুর দ্বিতীয় ধন্বন্তরিসদৃশ, ঔষধ, চিকিৎসার উপকরণ বা অর্থ—কোনটারই যাঁহার অভাব ছিল না; তাদৃশ মনস্বী ব্যক্তি অকালে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে হৃদ্‌-রোগের আকস্মিক আক্রমণে দেহত্যাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়—নিয়তির উপর কাহারও হাত নাই। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে—

"মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ, পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুঃ রণে শেতে; নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?"

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার মাতুল এবং বিশ্ববিজয়ী ধনঞ্জয় যাঁহার পিতা, সেই মহাবীর অভিমন্যুকেও অকালে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। নিয়তিকে কেহই খণ্ডন করিতে পারে না।

ডাক্তার বিমলেন্দু ১৯১১ ইংরেজীতে গয়াধামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ ইংরেজীতে পাটনা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯৩৬ ইংরেজীতে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি. বি. এস্. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। এই বৎসরই তিনি কলিকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক ভারতবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। সান্ত্বনার বিষয় এই যে, ডাক্তার গুপ্ত মৃত্যুকালে ৮টি পুত্র ও চারিটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ২টি পুত্র উপযুক্ত শিক্ষালাভান্তে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং দুইটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বিমলেন্দু শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন না; হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর তিনি তাঁহার শ্বশুরের ৯১ চৌরঙ্গী রোডস্থিত বাড়ীতে শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভার সেবকরূপে সাপ্তাহিক আলোচনা-সভায় নেতৃত্ব করিতেন। কত নাস্তিক লোকের শাস্ত্রবিরোধী কুযুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়া এই সভায় তিনি তাঁহাদের অন্তরে আস্তিক্য বুদ্ধির বীজ বপন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দিল্লী হইতে নাস্তিকমতাবলম্বী একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও সাধ্বী সীতা-দেবীর চরিত্র সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করিলে ডাক্তার বিমলেন্দু ইংরেজী ভাষায় একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইহার উপযুক্ত উত্তর দেন। শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভার সাপ্তাহিক ইংরাজী মুখপত্র Truth-এ ডাক্তার গুপ্তের উক্ত পুস্তকখানা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে ডাক্তার গুপ্তের প্রগাঢ় শাস্ত্র-জ্ঞান এবং শাস্ত্রোজ্জ্বলা বিচারবুদ্ধি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

বিগত ১৯৬২ ইংরাজীতে ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী আগরতলা সহরে স্থানীয় হরিসভার উদ্যোগে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করা হয়। ডাক্তার বিমলেন্দু পুত্রহীন বৃদ্ধ শ্বশুরকে একা যাইতে দেন নাই; তিনি নিজেও সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমি তখন আগরতলা মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও যোগদান করি নাই)। সভার উদ্যোক্তাগণ উক্ত সভার উদ্বোধন করিবার সম্মান আমাকে দিয়াছিলেন; সুতরাং সভার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ডাক্তার

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রসঙ্গে

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

শতবর্ষ পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হয়। "দুর্গেশনন্দিনীর" প্রকাশকাল সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়—

(১) রামগতি ন্যায়রত্নের—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৩)।

(২) রমেশচন্দ্র দত্তের—Literature of Bengal (Revised Edition 1895)।

(৩) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪)।

(৪) স্বদেশীযুগের স্মৃতি—শ্রীমতিলাল রায় (১৯২৪)।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম সংস্করণের Title page-এ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ উল্লেখ আছে। সেই যুগের বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকাসমূহের সমালোচনাসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়—

(১) ১৪ই এপ্রিল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা প্রথম প্রকাশিত হয়।

(২) ২৪শে এপ্রিল (১৮৬৫) দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা আর একখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেই পত্রিকাখানির নাম ছিল "হিন্দু পেট্রিয়ট্"।

অবশ্য এই সকল পত্রিকায় আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশ-কাল উল্লেখ না থাকিলেও, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিলের পূর্বে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩০৬ সালের প্রকাশিত আষাঢ় সংখ্যা "প্রদীপ" পত্রিকায় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের একটি স্মৃতি-কাহিনী প্রকাশিত হয়। স্মৃতি-কাহিনীতে তিনি লিখিয়াছেন:

"১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে ফিরিয়া আসেন, সেই সময়ের কথা।

"এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। সেই সময়ে সর্ব্বদাই তাঁহাকে অন্য-মনস্ক দেখা যাইত। এমনকি সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন। এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার Study Room-এ প্রস্থান করিতেন। চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।"

দুর্গেশনন্দিনীর লেখার স্থান সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম জীবনী'তে উল্লেখ করিয়াছেন—

"বোধ হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানির লেখা শেষ হয়। তখন তিনি খুলনায়। রচনা শেষ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না, উপন্যাসখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কিনা। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইয়া-ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন।"

পক্ষান্তরে বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"নব প্রকাশিত "সংকল্প" মাসিকপত্রে কোন প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের "রাধারাণী" গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস

বিমলেন্দু প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দু সংস্কৃতির গৌরব প্রকাশ করিয়া যে ভাষণটি দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সেই সভায় উপস্থিত বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে শাস্ত্র-ধর্ম্ম প্রচার সভার প্রচারকরূপে তিনি বহু সারগর্ভ ভাষণ দিয়াছেন। ডাক্তার গুপ্তের আত্মার উন্নতি কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গ, বিশেষতঃ ডাক্তার নলিনীবাবুর প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ক্যারিবিয়ান সাগরে ঝড়

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

রাতের অন্ধকারে একখানা যুদ্ধজাহাজ এসে থামল সান্তো ডোমিনগোর সমুদ্র উপকূলে। একে একে দেড় হাজার নৌসেনা তীরে নামল। তারিখটা এ বছর আটাশে এপ্রিল। শহরের মানুষ অন্ধকারেও সৈনিকদের চিনতে পারল। ওদের হেলমেটের সোনালি ঈগল ওদের পরিচয় বহন করছিল।

সেদিন রাতে ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে ভাবল, সোচ্চার প্রশ্ন করল: মার্কিন নৌবাহিনীর সৈনিকরা এখানে এল কেন?

তার জবাব শুনল ওরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের কণ্ঠে: গৃহযুদ্ধের ফলে সান্তো ডোমিনগোর মার্কিন নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। তাদের নিরাপদে মাতৃভূমির বুকে ফিরিয়ে আনার জন্য সেনা-বাহিনী পাঠান হয়েছে।

ক্যারিবিয়ান সাগরের কিউবা থেকে মার্কিনদের প্রভাব ঘুচে গেছে। কিউবা আজ স্বাধীন সাম্যবাদী রাষ্ট্র। ধনতান্ত্রিক আমেরিকার ঘরের দরজায় সাম্যবাদী ভূত (Spectre of Communism) তার কাছারি বসিয়েছে। কিউবা থেকে সেই ভূতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ডোমিনিক্যান রিপাবলিকে—রাজধানী সান্তো ডোমিন-গোতে। তাই আমেরিকানদের জীবন বিপন্ন। কাস্ত্রো-মতাবলম্বী সাম্যবাদের প্রসারলাভের আশঙ্কাকে তাই রোধ করবার জন্যই এই মার্কিন প্রয়াস সুরু হয়েছে। এর জন্য প্রস্তুতি চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকেই।

ক্যারিবিয়ান সাগরে ছোট্ট দ্বীপ-রাজ্য ডোমিনিক্যান রিপাবলিক। আয়তন মাত্র আঠার হাজার সাত শ' বর্গ মাইল। পশ্চিমে কিউবা। পোর্টোরিকো পূর্ব্বদিকে। আর দুদিকে সুনীল জলধির বিস্তৃতি। ভারতবর্ষে আসবার পথ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে কলম্বাস ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের মাটিতে

দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই কথাটি সম্পূর্ণ অমূলক। .....বঙ্কিমচন্দ্র যখন দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তখন সঞ্জীবচন্দ্র সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামা-চরণও পরে উহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।"

"দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হওয়ার পরই নানাপ্রকার সমালোচনায় দেশ বেশ মুখর হইয়া উঠে।

স্বর্গত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পরিচালিত 'রহস্য-সন্দর্ভ' এবং গিরিশ ঘোষ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় দুর্গেশনন্দিনীর ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয়।

"ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র" লেখক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশিত হয়।

সুতরাং গ্রন্থখানির স্থান ও সঠিক প্রকাশকাল সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও সন্দেহের নিরসন হয় নাই।

বাংলা-সাহিত্যের যথার্থ ও প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ-নন্দিনী"র শতাব্দীকাল পরে আজ মনে জাগে উপন্যাসটির প্রকৃত রচনাকাল নির্ণয়ের দুর্ব্বার জিজ্ঞাসা। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী লইয়া আলোচনা সমালোচনা-সিন্ধুতে উঠিয়াছে তরঙ্গ। কিন্তু তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসটির প্রকাশকাল সঠিক নির্ণীত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণ এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারো মন্তব্য অতীব স্পষ্ট, কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ নহে, যুক্তি কিছুটা থাকিলেও তাহা এতই দুর্ব্বল যে, ভিত্তিহীন বলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। ইহা নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যিক ও সমালোচকের পক্ষে গৌরবের নহে।

পদার্পণ করেছিলেন। নূতন মহাদেশের বুকে এই দেশটী তাই এক ভাস্বর মহান স্মৃতি বহন করছে। মার্কিন মেনল্যাণ্ড থেকে ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের দূরত্ব মাত্র আট শ' মাইল।

লাটিন আমেরিকার অন্যতম এই ছোট রাজ্যটী কৃষি-সম্পদে সম্পদশালী। চিনি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এ ছাড়া কফি, তামাক, কলাও প্রচুর উৎপন্ন হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সোনা-তামা-বক্সাইট আর লৌহ প্রধান। কিন্তু রাজ্যটির আর্থিক ব্যবস্থার উপর মার্কিন ধনীকগোষ্ঠীর প্রভাব প্রবল। চিনির কারখানাগুলো মার্কিন ব্যবসাদারদের হস্তগত—আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যও মার্কিনদের হাতে। ফলে ত্রিশ লক্ষ সাড়ে তের হাজার ডোমিনিক্যানবাসীর জীবন দারিদ্র্যের অন্ধকারে আবৃত। শতকরা সত্তরজন অশিক্ষিত এবং বেকারের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। প্রদীপের নীচে যেমন অন্ধকার বিরাজ করে তেমনি উন্নত আমেরিকার একান্ত নিকটের এবং মার্কিন প্রভাবাধীন এই রাজ্যটিতে গভীর দুরবস্থা বিদ্যমান।

ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের রাষ্ট্রীয় জীবনে মার্কিন ধনিক স্বার্থের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মার্কিন-ধনিকদের পৃষ্ঠপোষক সর্বাধিনায়ক ট্রুজিলো (Trujillo) ছিলেন ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট। তারপর ১৯৬১ সালের ২৭শে মে পর্যন্ত রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জোয়াকিন বালাগর (Joaquin Balaguer)। ইনিও ছিলেন মার্কিন-ধনিকদেব কট্টর সমর্থক। বিপ্লবীদের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এখানে ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়াশীল ট্রুজিলো-পরিবাব এবং তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠ্ছিল। একটার পর একটা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল। ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের সেনাবাহিনীতে মার্কিন:সমর্থকদের সংখ্যা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও, ১৯৬৩ সালের নির্ব্বাচনে ডোমিনিক্যান বিপ্লবী দলের প্রার্থী ডক্টর জুয়ান বশ্ (Dr. Juan Bosch) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ল্যাটিন আমেরিকার এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে নূতন জীবন সুরু হল।

নূতন প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকের রাজনীতিকে মার্কিন প্রভাবমুক্ত করতে চাইলেন। এখন থেকে ওয়াশিংটন নয়, সান্টো ডোমিনগো-তে রিপাবলিকের ভাগ্য নির্ধারিত হ'বে—ডক্টর জুয়ান ঘোষণা করলেন, এর উপর সাম্যবাদী দলের উপর থেকে বিধি-নিষেধ তিনি তুলে নিলেন।

মার্কিন ধনিকগোষ্ঠী বুঝতে পারলেন যে, ক্যারিবিয়ান সাগরে ঝড়ের মেঘ উঠেছে। এখন বাধা না দিলে ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের বুকে দ্বিতীয় কিউবা সৃষ্টি হবে। সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল ওয়েসিন (Wessin) ওয়াশিংটনের বিশ্বস্ত মানুষ। তাঁরই সাহায্যে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ সংগঠিত হল।

সেটা ১৯৬৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরের কথা! ডক্টর জুয়ান বশ্ দেশ ছেড়ে পালালেন। পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হল।

তারপর থেকেই অগ্নিগর্ভ ডোমিনিক্যান রিপাবলিকে গৃহযুদ্ধ ধীবে ধীরে তীব্র হয়ে উঠছে। মার্কিন সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হচ্ছে। জনতার দাবী ডক্টব বশকে দেশে ফিরিয়ে এনে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হোক। এদিকে কাস্ত্রো-মতাবলম্বী ডোমিনিক্যান সাম্যবাদী দল গৃহযুদ্ধের সুযোগে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিউবা থেকে তারা সব রকম সাহায্য লাভ করছে। ডোমিনিক্যান রিপাবলিকে সশস্ত্র সংঘর্ষ তাই আজ প্রবল হয়ে উঠছে।

গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দ্বারা ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের বুকে জাতীয় ঐক্য ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে না পারলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার অতি নিকটে আর একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠিত হবে।

রাঙাদি

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

রাঙাদি ঘরে জল রেখে গেলেন।

বললেন. রাতে পিপাসা পেলে খাস।

একটু থেমে চারধারে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। বোধহয় দেখলেন, সব ঠিক্‌ঠাক্ আছে কিনা ···· আমার যাতে কষ্ট না হয়।

সব ঠিকঠাকই ছিল। দুগ্ধফেননিভ বিছানা, দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেওয়া ক্যালেণ্ডার, ড্রেসিং টেবিল, আয়না—কিছুরই অভাব ছিল না ঘরে। কতদিন আগে সেই ফটোটা দেখেছিলাম। রাঙাদি আর তাঁর বর—বিয়ের পর জোড়ে তোলা। সেটিও তেমনি সাজানো আছে।

রাঙাদি বললেন, আর পান চাই?

বললাম, না রাঙাদি, তুমি শোয়গে যাও, অনেক রাত হয়েছে।

আচ্ছা, বরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়।—

রাঙাদি বেরিয়ে গেলেন। তাঁর শূন্য হাতদুটোর দিকে চেয়ে দুঃখ হল। এককালে তবু দুগাছা করে চুড়ি ছিল, আজ তাও ঘুচে গেছে। মাথায় সিঁদুর ছিল, আজ তাও নেই।

সত্যই রাত হয়েছিল। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজে। কাশীর রমাপুরা অঞ্চলটা এখন নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। রিক্‌শ, গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও স্তিমিত।

শোবার আয়োজনে ব্যস্ত হতে হল।·· ····

এরই মধ্যে কুড়ি বছর কেটে গেছে! আশ্চর্য।

সময় যাচ্ছে—না জল?

সেই কুড়ি বছর আগের এক জুন মাস। আই. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর শখ চেপেছিল—লাহোর যাব। তখন যুদ্ধের সময়। কিছুতেই সরাসরি টিকিট জোগাড় করা যায়নি। বুকিং বন্ধ। অতএব কাশীর একখানা টিকিট কাটি। ইচ্ছেটা, কাশী হয়ে লাহোর যাব। কাশীতে এসে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এক বোর্ডিং-হাউসে উঠেছি। খাই-দাই আর ঘাটের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করি। সহসা দেখা একদিন সকালে রাঙাদির সঙ্গে।

রাঙাদি গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছিলেন তাঁর বাড়িতে ভিজে চুলে। পড় তো পড়—একেবারে তাঁর সামনে!

আরে, অতু না?

স্বীকার করতে হল, হাঁ অতুই।

ভালো নাম আমার আতর। ডাকনাম অতু। রাঙাদি তা জানতেন।

কোথায় উঠেছিস এখানে?

জবাব দিলাম, হোটেলে।

আব জায়গা পেলি না? হোটেলে? কেন, আমরা কি মরে গেছি?

কী কবে জানব বলো তোমরা এখন কাশীবাসী?

রাঙাদি আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বাড়িতে। ক্ষীরের সন্দেশ দিয়ে জল দিয়েছিলেন। চা করে খাইয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এখনি তুই এখানে চলে আয়। যেন দেরি না হয়। ঘরের অসুবিধা নেই। কোনো কিছুরই অসুবিধা হবে না তোর। পয়সা না থাকে—তাও নিয়ে যা·····

রাঙাদির কথা ঠেলব, সে-ক্ষমতা আমার ছিল না। আমাব এক দূরসম্পর্কের মাসীমার মেয়ে এই রাঙাদি। যখন বয়েস আমার খুব কম, তখন এই রাঙাদিদের বালিগঞ্জের বাড়িতে কতবার গিয়েছি। রাঙাদি আমাকে কত রকমের যে চকোলেট কিনে খাওয়াতেন! সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতেন। রাঙাদির বক্স ক্যামেরা ছিল। আমার ছবি তুলতেন। রাঙাদির বাবার মোটর ছিল। সেই মোটরে করে কতবার নিউমার্কেটে গিয়েছি। তখন নিউমার্কেট ছিল আমার কাছে স্বর্গ। স্বপ্নের মতোই অপরূপ। অনির্বচনীয়। রাঙাদি আমাকে গোলাপ-কাঠের তৈরি হাতি কিনে দিয়েছিলেন। মহীশূর থেকে আসা চন্দনকাঠের বাক্সও। সে-বাক্স থেকে সত্যসত্যই

চন্দনের গন্ধ বেরুত। কিনে দিয়েছিলেন দমদেওয়া মোটর গাড়ি। লাইনদেওয়া রেলগাড়ি। ছবির বই। আরো কত কি!

সেই রাঙাদিরই আমন্ত্রণে পরে গিয়েছিলাম উটকামণ্ড। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০০ ফুট উঁচুতে নীলগিরি পাহাড়ের সেই অপূর্ব স্বাস্থ্যনিবাস। যেখানে যেতে গেলে অনেক ট্যানেল পার হতে হয়। অনেক পাহাড়, অনেক ঝর্ণা, অনেক জলাভূমি, অনেক খাদ। চোখে পড়ে যথেষ্ট বন—যে বনে আছে সেগুন, বাঁশ, গোলাপকাঠ আর স্যালভিয়াস্তবক। স্যাশপাতি, চা, কফিগাছ আর কমলালেবু। শিরিষ, তুন, রেডি, ক্যাকটাস, আকন্দ আর নারকেলকুঞ্জ। রাত্রে যে উটকামণ্ড ওরফে 'উটিতে' লেপ গায়ে দিতে হয় বছরের অধিকাংশ মাসই। দিনেও যেখানে গরম কাপড়ের পোশাক না পরলে শীত করে। কেমন মরা-মরা রোদ্দুর। কী বিরাট রেস-কোর্স। থিক থিক করছে পার্বত্য শহরের বাড়িগুলি। অধিকাংশ বাড়ির চালই টালির, নয়তো অ্যাসবেষ্টাবের। উঁচু-নিচু রাস্তায় মোটর, ঘোড়ায়টানা টাঙ্গা। গোচারণ-ভূমিতে টোডা উপজাতিদের বিরাট লোমষ মোষ। কোনোদিকের উপত্যকা কালো হয়ে আছে অচেনা গাছ-গাছড়ায়। কোনোদিকের—ঝাউগাছ-ইউক্যালিপটাসে। কত মন্দির, মসজিদ আর সেই বিখ্যাত গির্জা সেণ্ট ষ্টিফেন্স। রেলের স্যারোগেজ লাইন চলে গেছে এঁকে-বেঁকে দৃষ্টির সীমানার বাইরে। স্টেশনে দু'তিনখানা মালবগী থাকে সাইডিংকরা। যেন উত্তাল সমুদ্রের শত শত ঢেউ স্তব্ধ হয়ে আছে পাহাড়েব রূপ নিয়ে সমস্ত শহরটা জুড়ে। পাহাড়ের মাথায় আশ্চর্য ইলেক্ট্রিক পোস্ট, জলের কল, হোটেল, পার্ক, কবরভূমি, তার সুপ্রাচীন প্রস্তরস্তূপ, বনালয়, কুয়াশা……

রাঙাদিকে তখন কী সুন্দর দেখতে হয়েছে! তাঁর গালদুটো সত্যই রক্তগোলাপ, কি লাল আপেলের মতো। চমৎকার স্বাস্থ্য। জ্যোৎস্নার মতো গায়ের রঙ। রাঙাদি ঘোড়ায় চডতে জানতেন। কতদিন আমাব সামনেই রেকাবে পা গলিয়ে ঘোডার পিঠে উঠে বসতেন। আমাকে চড়াতে চাইতেন। আমি ভয় পেতাম বলে নিজেই একাকী ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতেন দূরে। ফিরে আসতেন হয়তো মৃদুমালাই আর বন্দিপুর হয়ে। মাঝে মাঝে ট্রেনে চড়ে কয়েম্ব্যাটোরের বাজারে আমাকে বেডাতে নিয়ে যেতেন। ফিরে আসতেন মোটরে। রাঙাদি দূরবীন ব্যবহার করতেন। দেখাতে চাইতেন আমাকে তাঁর বাড়ি থেকে ল্যাম্ব্টোন পর্বত-শ্রেণীর মেঘচুম্বী চূড়া, মহীশূরের উপমালভূমি, মালাবারের নিঃসীম অরণ্য। নিয়ে যেতেন লেক, বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাতে। আমাকে সাথী করে ব্যাডমিণ্টন খেলবাব চেষ্টা করতেন। আমি পারতাম না বলে রাঙাদি মোটেই দুঃখিত হতেন না। বরং হাসতেন। কখনো ভৎর্সনা কবতেন না।

রাঙাদি তখন বি. এ. পডছেন স্থানীয় মিশনারী কলেজে। তাঁর বাবার চাকরি ও প্রতিপত্তি ওখানেই তখন স্থায়ী আসন নিয়েছে। মাসীমাও দিন কাটাচ্ছিলেন মহা আনন্দে। মাংসের যাবতীয় জিনিস তৈবির উপর তাঁর যেমন লোভ ছিল, কাটলেট বানাতেও তিনি ছিলেন তেমনি সিদ্ধহস্ত। মেশোমশাই মাসীমার আর-এক নামকরণ করেছিলেন: কাটলেট-এক্সপার্ট।

তারপর অনেকদিন আর কোনো খবরাখবর রাখতে পারিনি রাঙাদির।…

মাঝে শুনেছিলাম, তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী হচ্ছেন ডাক্তার। আর রাঙাদির অমন কৃতী বাবা মানে আমার মেশোমশাই আর বেঁচে নেই। থ্রম্বসিস-আক্রমণে পরলোক গমন করেছেন।

আগেই বলেছি, রাঙাদির কথা ঠেলব—সে ক্ষমতা আমার ছিল না।

তাই বোর্ডিং থেকে জিনিস-পত্র আনতে দেরি করলাম না। রাঙাদির বাড়িতেই উঠলাম।

কত যত্ন করে রাঙাদি খাওয়ালেন। তাঁব হাতের রান্নাও অতি সুস্বাদু। সেই কবে খেয়েছিলাম—প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ফের নূতন করে যেন পটলের দোলমা, মাংসের শামি কাবাবের আস্বাদ গ্রহণ করলাম।

রাঙাদির দু' মেয়ে। কুহু আর কেকা। কুহুর বয়েস চার। কেকার বয়েস তিন। ওরা যেন ছিনে-জোঁকের মতো আমার সঙ্গে লেগে রইল সর্বক্ষণ। ছবি দেখাতে আসে। গান শোনায়। রেডিও চালায়। খেলনা দেখায়। গল্প শুনতে চায়। নানা বায়না। নানা ফরমাস।

রাঙাদির ডাক্তার-স্বামীকে দেখলাম না। তিনি বাড়ি নেই। শুনলাম, সপ্তাহে সবদিন নাকি তিনি থাকতে পারেন না। যান এলাহাবাদ, কানপুর, আরো কত জায়গায় সরকারি কাজে। এই নাকি তাঁর চাকরি। ওদিন যে বাড়ি আসবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না।

কিন্তু সেদিনই জামাইবাবু বাড়ি এসে দাঁড়ালেন অতর্কিতে সন্ধ্যার দিকে। আমার দিকে একটা বিরক্তি-পূর্ণ দৃষ্টি হেনে রাঙাদিকে প্রশ্ন করলেন, এ কে?

রাঙাদি বললেন, আমার আত্মীয়।

কী যেন অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করে জামাইবাবু তাঁর উপরের ঘরে অদৃশ্য হলেন।

আমার সঙ্গে কথাই বললেন না।

জামাইবাবুটিকে দেখলাম। যেন অর্ধ অপ্রকৃতিস্থের মতো চেহারা। রোগা, কালো, লম্বা। পরণের প্যাণ্টের ক্রীজ বলে কোনো পদার্থ নেই। গলার টাইটা বিবর্ণ। ও-টাই যে কোনো রুচিবান লোক ফেলে না দিয়ে ব্যবহার করতে পারে—এ আমার ধারণার অতীত ছিল। কিসে আর কিসে! রাঙাদির পাশে ওই বর? সত্যই হতাশ হবার মতো!

কিন্তু জামাইবাবু সেই যে অদৃশ্য হয়েছিলেন তাঁর ঘরে, সে রাত্রে আর তাঁর দেখা পেলাম না।

দেখা পেলাম না বটে কিন্তু রাত্রে তাঁর কণ্ঠ থেকে যে অব্যক্ত ক্রমবর্ধমান গর্জনধ্বনি উঠতে লাগল, তার আভাস পেতে লাগলাম ক্ষণে ক্ষণে। ভয়ে বুক দুরদুর করতে লাগল। রাঙাদি যত তাঁকে চুপ করাতে চান, তিনি যেন শতধাবে শিখায়িত হয়ে ওঠেন। বিস্ফোরিত হতে চান মুহুর্মুহুঃ।

ব্যাপারটা কি, বুঝে উঠতে পারলাম না। হয়তো আমারই প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো বাক-বিতণ্ডা—এমন অনুমান করাটা অন্যায় নয়।

শেষ পর্যন্ত মারের আয়োয়াজ। মনে হল বুঝি চেলা কাঠ নিয়ে ডাক্তারবাবু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর শিউরে শিউরে কেঁদে উঠতে লাগলেন রাঙাদি: ওরে বাপ রে···ওরে বাপ রে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি। যা ভেবেছ সত্যি নয়, সত্যি নয়। ও ছেলেমানুষ···

ছেলেমানুষ! কচি খোকা! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! তাই তাকে আমার অসাক্ষাতে ধরে এনেছ বাড়িতে!

ডাক্তারের গলা থেকে তীব্র কামান গর্জন।

মেজাজ ঠিক রাখা দায়। ভাবলাম, দৌড়ে একবার উপরে উঠি। ডাক্তারকে নিরস্ত করি। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া—সেখানে কি নাকগলানো উচিত?

কিন্তু রাঙাদি-ই বা কী? তিনি তো ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলেন, বি. এ. পড়েছিলেন, হয়তো পাশও করেছিলেন। দিতে পারছেন না ঘা পাঁচ ছয় কষিয়ে অমন স্বামীকে? দুটো লাথি মারলেই তো লোকটা কাত! রাঙাদির দৈহিক শক্তির কাছে ডাক্তারের জোর! লোকটা মাতাল নয় তো?

কিন্তু না, রাঙাদি কেঁদেই চললেন। প্রতিবাদ নয়—প্রতিবোধ করতে করতেই হয়তো ক্লান্ত হয়ে কোন্ ফাঁকে চুপ করে গেলেন! কি, শেষ হয়ে গেলেন—বুঝতে পারলাম না।

পরদিন রাঙাদির বাড়ির ঝির সঙ্গে দেখা রাস্তায়। ব্যাপার যা শুনলাম, তাতে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম।···

ফের রাত এল। আব এ এমন একটা রাত—যা আমার জীবনে অভূতপূর্ব।

তখন ঘড়িতে কটা কে জানে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, সহসা কে যেন আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলল। চোখ চেয়ে দেখি, একটা বিকট মূর্তি। মুখটা মানুষের নয়। মুখোশ। মূর্তিটা ডান হাতে আমার গলার

কলার চেপে আছে। বাঁ-হাতে তার চকচকে একটা ধারাল ছোরা!

টাকা-পয়সা কিছু চাইবে? প্রাণের বিনিময়ে সব দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

কিন্তু কিছুই চাইল না।

শুধু প্রশ্ন করল, কবে যাবি এখান থেকে?

মুহূর্তে মনে হল, গলাটা যে ডাক্তারের। হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কী জবাব দেব বুঝতে পারিনি। শুধু উচ্চারণ করেছিলাম, রাঙাদি···

না, রাঙাদি-ফাঙাদি নয়, রাঙাদির নাম ভুলে যেতে হবে তোকে চিরকালের মতো। আর তা যদি না ভুলিস, দেখতে পাচ্ছিস হাতে আমার কি? দেব শেষ করে?—

মূর্তিটা আমাকে ঝাকুনি দিল।—শীগ্‌গির বল, কখন যাবি এখান থেকে?

প্রতিশ্রুত ছিলাম, ভোর বেলাতেই যাব। সেই-মতোই বেরিয়ে পড়ি। স্টেশনের হেড্ ট্রেন-একজামিনারের সাহায্যে লাহোরেও যেতে পেরে-ছিলাম। কিন্তু যতক্ষণ ট্রেনে ছিলাম, ভুলতে পারিনি রাঙাদির কথা। রাঙাদি সজল চোখে বিদায় দিয়ে-ছিলেন। বলেছিলেন, অতু, আমারই দোষ হয়েছে। উচিত হয়নি তোকে ডেকে এনে এভাবে অপমানিত করা। পারিস তো ক্ষমা করিস ভাই। কথা বলবার মতো আর মুখ নেই আমার—তোর কাছে। সবই অদৃষ্ট! এমন সময় আমার বিয়ে হয়, যখন বাবা দেনার দায়ে পাগল।·· সেসব অনেক কথা। ডাক্তার মানুষটা খুব খারাপ নয়। কিন্তু কেমন একটা বাতিক ওকে উন্মাদ করে রেখেছে। সবসময় ওর সন্দেহ—আমার ওপর, আমার গতিবিধির ওপর। আমি বুঝি লুকিয়ে-লুকিয়ে এমন কিছু করছি, যা কোনো বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে দোষণীয়। গঙ্গা নাইতে গেলে ও চুপি-চুপি আমাকে ফলো করে। ছাদে দাঁড়ালে ও মনে করে, আমি বুঝি কোনো পরপুরুষকে বাড়িতে আহ্বান করছি। তুই আমার ছোট ভাই—যেহেতু পুরুষ—সেটাও ওর চোখে আপত্তিকর!

ইচ্ছে হয়েছিল বলি, এমন লোককে তোমার মতো মেয়ে সহ্য করে কী করে?

সে কথা আর বলতে পারিনি। রাঙাদির দুরদৃষ্টের কথা ভেবে চোখে জল এসে গিয়েছিল। দ্রুত বেরিয়ে পড়েছিলাম ও বাড়ি থেকে।

তারপর দীর্ঘদিনের ব্যবধান।—

কুড়ি বছর পর।—

এক মামলার সাক্ষী হয়ে অফিস থেকে দিল্লী যেতে হয়েছিল।

কলকাতার পথে ফের আবার কাশী। সেই বোর্ডিং হাউস। বোর্ডিং হাউস থেকে রাঙাদির বাড়ি।

দীর্ঘদিন রাঙাদির কোনো খবরাখবর পাইনি। চিঠি দিলেও ওবাড়ি থেকে জবাব আসে না। সে অনেকেই জানে। আমিও জানতাম।

রাঙাদি ঘরে জল রেখে গেলেন।

বললেন, রাতে পিপাসা পেলে খাস।

কুড়ি বছরের মধ্যে কত পরিবর্তন। ভাবতেও পারা যায় না। সেই কুহু-কেকা আর ছোট নেই। ও বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে। কুহু এম. এস্‌সি. পাশ করে জার্মানিতে রয়েছে তার স্বামীর সঙ্গে। কেকা দেরাদুনে। ডাক্তার-স্বামীর সঙ্গে নিজেও সে ডাক্তারি করে। গত বছর এম. বি. বি. এস. পাশ করেছে। রাঙাদির সঙ্গে বর্তমানে শুধু তারু। ভালো নাম তারক। রাঙাদির ছেলে। বয়েস চোদ্দ। এবার স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছে। বলা বাহুল্য কুড়ি বছর আগে এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

আর রাঙাদির স্বামী? না, তিনিও নেই। আজ থেকে দু মাস আগে এক সন্ধ্যায় মণিকর্নিকার ঘাটে যে চিতা জ্বলে উঠেছিল, আর যে চিতায় শেষ জল ঢেলে দিয়ে পাড়ার লোকেরা বাড়ি ফিরেছিল, সেটা ছিল রাঙাদিরই স্বামীর। ডাক্তার সন্ন্যাস রোগে শেষ হয়েছেন।

সত্যই রাত হয়েছিল। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজে। কাশীর রমাপুরা অঞ্চলটা এখন নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। রিক্‌শ, গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও স্তিমিত।

শোবার আয়োজনে ব্যস্ত হতে হল।—

কত রাত্তির তখন জানি না। ঘুমটা পাকাপাকি বেশ জমে উঠেছে।...

সহসা—খুট করে একটা শব্দ! বুঝি কেউ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। কিন্তু দরজায় তো খিল দিয়ে শুয়েছিলাম। বেশ মনে আছে। অথচ উঠে দেখব—সে-সাধ্য তখন নেই। ঘর অন্ধকার। চোর নয় তো?

সহসা কদর্য মূর্তিতে এ কে দাঁড়িয়ে? ডাক্তার না—সেই রাঙাদির স্বামী? পাগলাটে ধরনের চেহারা। রোগা, কালো, লম্বা। পবনের প্যাণ্টের ক্রীজ বলে কোনো পদার্থ নেই। গলার টাইটা বিবর্ণ।

তবে কি ডাক্তার মরেননি? রাঙাদি শুধু-শুধুই বিধবা? তবে কি, যে মণিকর্নিকা-ঘাটের চিতায় পাড়ার লোকেরা শেষ জল ঢেলে দিয়ে চলে এসেছিল—সেটা মিথ্যা?

কী করব—ভেবে পেলাম না।

ডাক্তার কেমন হতাশভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

একটি কথাও বললেন না।

মুখে তাঁর ফুটে উঠল কেমন এক কাতর যন্ত্রণার চিহ্ন। তারপর আস্তে আস্তে···

আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। সহসা সাহসে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠলাম। আলো জ্বাললাম। দেখি দরজার খিল ঠিকই আছে। চোর নয়। যাঁকে দেখেছিলাম বিশ বছর আগে, তাঁকেই দেখেছি স্বমূর্তিতে।

খুব খানিকটা জল খেয়ে তবে যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম।

কিন্তু ঘুম আর এল না।

দরজা খুলে বাইরে এলাম।

কিন্তু বাইরে এসেও বিপদ! একি! রাঙাদির ঘর থেকে যেন একটা আওয়াজ আসছে না? কেমন একটা গোঙানির মতো! রাঙাদির ফিটের অসুখ আছে নাকি? আগে তো শুনিনি। অবশ্য এখন যদি হয়! সদ্যবিয়োগবিধুরার কাছে এ আর এমন কি আশ্চর্যকর?

দিনের বেলা রাঙাদিকে এ ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই আর বললাম না। হতে পারে এ আমার মনের ভুল। হতে পারে এ আমার কল্পনার প্রতিক্রিয়া।

অপেক্ষা করে রইলাম।

পুনরায় রাত এল। কিন্তু এ রাতেও দেখি সেই গতকালের পুনরাবৃত্তি। ছাড়ানছোড়ন নেই। ডাক্তার এসে ঘুম ভাঙিয়েছেন। মুখে তার ফুটে উঠেছে কেমন এক কাতর যন্ত্রণার চিহ্ন।

ডাক্তার কি বলতে চান? এবারও কি তিনি বলতে চাইছেন, না, রাঙাদি-ফাঙাদি নয়। রাঙাদির নাম ভুলে যেতে হবে তোকে চিরকালের মতো!···শীগ্‌গির বল, কখন যাবি এখান থেকে?

ডাক্তারের মনোবাসনা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিনি কী অনুতপ্ত? আমাকে একদিন অন্যায়ভাবে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছিলেন বলে ক্ষমাপ্রার্থী?

না, কিছুই বোঝা গেল না।

তবে কি ডাক্তার করুণভাবে আবেদন করতে এসেছেন: তুই তোর রাঙাদির খোঁজ-খবর নিবি। আমি তো চলে গেছি—কিন্তু মরেও যে আমার শান্তি নেই রে···তুই তোর রাঙাদিকে দেখিস ভাই···

না, সে-সব কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার যেন দাঁতে দাঁত ঘসার এক প্রকার শব্দ করলেন।

তারপরই ফট করে একটা আওয়াজ হল। আর তাঁকে দেখতে পেলাম না।

আগের রাতের মতোই আলো জ্বাললাম। দেখি দরজার খিল ঠিকই আছে।

বাইরে এসে অনুভব করলাম—রাঙাদির ঘর থেকে সেই আওয়াজ। কেমন একটা গোঙানির মতো।··· শুধু নূতন করে শুনলাম আজ তারুর কণ্ঠস্বর: মা মা, কতক্ষণ আর এরকম করবে?

কোনো এক ক্লক ঘড়িতে যেন বাজল দুটো।···

'প্রবর্ত্তক'-এর পঞ্চাশ বছর

অঃ অরাপ্যার সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

গত আষাঢ় সংখ্যা প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত দ্বিতীয় বর্ষের (১৯১৬) প্রবর্ত্তক হইতে উদ্ধৃত 'হোমরুল' শীর্ষক আলোচনার উপসংহারে আলোচক শ্রীমতিলাল একটা আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে অনতিদূর ভবিষ্যতে একজন সর্ব্বত্যাগী বলিষ্ঠ নেতার আবির্ভাব হইবে। ইহার তিন বৎসর পরেই এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া যাইতে দেখা গেল।

১৯১৯ সালে ভারতের জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী অধ্যায় রচিত হয়। যুদ্ধজয়-গর্ব্বিত ইংরেজ ভারতবর্ষকে তাহার স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিতে বদ্ধপরিকর। নেতৃবৃন্দ দিশাহারা। কোন পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। এমনি সময়ে মহাত্মা গান্ধী আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গান্ধীজির আগমনে চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের ন্যায় সমগ্র জাতি উদ্বেল হইয়া উঠে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই গান্ধীজির আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ভারতের চিরন্তন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের আদর্শকে স্বীকার করিয়া জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয় অধিকার করিলেন। আন্দোলনের গতি মুষ্টিমেয় আন্দোলকের সীমা ছাড়াইয়া গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল গান্ধীজির নেতৃত্বে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা এক যুগান্তকরী ঘটনা।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসের দলাদলিতে বাংলাদেশের নেতৃত্বও দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই কংগ্রেসের সভাপতি স্যার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতিরূপে বরণ করার ভার ছিল স্যার সুরেন্দ্রনাথের উপর। তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র লোকমান্য তিলক ইহাতে আপত্তি তুলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল লোকমান্য তিলকের জামা ধরিয়া বসাইয়া দেন। অপর পক্ষে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন পরিগ্রহে উদ্যত হইলে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত হয়। ফলে ভীষণ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে পুলিস আসিয়া শান্তিরক্ষা করে। তিলক, অরবিন্দ ঘাপার্দ্দে প্রমুখ গরমপন্থী জাতীয় নেতৃবৃন্দ সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই সুরাট দক্ষযজ্ঞের পর প্রায় দশ বৎসর ভাঙ্গা কংগ্রেস আর জোড়া লাগে নাই। ১৯১৬ সালে পাক্ষিক প্রবর্ত্তক পত্রিকায়

গতকালও হয়তো সময়টা একই ছিল। অত খেয়াল করিনি।

সকালে উঠে ঠিক করেই ফেলেছিলাম—আজ চলে যাব।

তবু চুপ করে থাকতে পারলাম না।

বললাম, রাঙাদি, তোমাকে একটা কথা বলব?

তুই কি বলবি আমি জানি।

রাঙাদি নিজে থেকেই বলে বসলেন।

কী বলবো বল দেখি?

আমার কুতূহলী প্রশ্ন।

ডাক্তারের কথা তো!—রাঙাদির কী হাসি! রাঙাদি হি হি করে হাসতে লাগলেন: লোকটা খুব ভালো রে! ও চলে গিয়েও আমাকে অস্বামিক করে যায়নি। যত সন্দেহ, তত ছিল ওর ভালোবাসা। ওরকম টান আজকালকার দিনে দেখতে পাওয়া যায় না। বাড়িতে কে আসছে, না আসছে—ও সব লক্ষ্য রাখে। প্রতি রাত্রে ও আমাকে পাহারা দেয়। তুই ওকে দেখতে পেয়েছিস বুঝি?

রাঙাদি কী ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন? না মানবীরূপে ঠাট্টা শুরু করেছেন?

কী জবাব দেব—ভেবে পেলাম না।

(২য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা) 'বাংলায় দলাদলি' শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রায় এক যুগের রাজনৈতিক চিত্রটি চমৎকার অঙ্কিত হইয়াছে। তখনকার প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় রাজনৈতিক আলোচনা ও মন্তব্য প্রাধান্য পাইতে দেখা যায়। আজকের দিনে প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত বিস্মৃতপ্রায় এই রাজনীতিক আলোচনা উপভোগ্য হইবে বলিয়া ইহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"ভারতের নূতন শক্তি বাংলায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পরস্পর বিপরীতগামী হইল। একটা কর্ম্মদোষে মরুকান্তার অভিমুখে লুপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে, আর একটা গণতন্ত্রবাদের গৌরব ঘোষণা করিতে করিতে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে মহোল্লাসে মহাশক্তি স্বরূপ অসীম বারিধির দিকে প্রবাহিত। বহুদিন পরে প্রবীণতার চাতুরীজাল ছিন্ন করিয়া দেশের ও দশের আশাকেন্দ্র হীরেন্দ্রনাথ, ব্যোমকেশ, চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল বাঙ্গালীর মরা প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিলেন।

"সুরাট দক্ষযজ্ঞে দেশনেতৃ বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণের মত তাদের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া জাতীয় জীবনকে বহুদিন শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে বেসান্তের আন্তরিকতায় যে শক্তি মিলিত হইয়া দেশের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণ কামনায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তির পথে সর্ব্বপ্রদেশেই তথাকথিত নেতৃগণ নানা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। কিন্তু বাংলার কয়েকজন লোকের পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথ এই নূতন শক্তির প্রকাশ পথে ভাগীরথী সম্মুখে মতঙ্গের মত বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া যেরূপ হাস্যাস্পদ হইলেন তাহা প্রকাশ করিতেও লজ্জা করে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত কেবল ব্যক্তিগত ভেদ ও স্বার্থ বজায় হইয়া আসিয়াছে, পরন্তু জনসাধারণের মত সেখানে চিরদিনই উপেক্ষিত —সাধারণের মত ব্যক্ত করিবার জন্য যখনই কেহ অসাধারণ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে উপক্রম করিয়াছেন তখনই পুরাতনের প্রভাব তাহাদিগকে নানা উপায়ে খর্ব্ব করিয়াছে।

"সুরাট মহাযজ্ঞে এই কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্যই মহামতি তিলক, শ্রীঅরবিন্দ এবং ভারতের অনেক মনীষি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধির বিপাকে তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে কিছুদিনের জন্য অপসৃত হইলেন—এই সকল মহাশক্তিশালী নেতৃগণের অভাব বশতঃই যে ভারতে মুষ্টিমেয় যুবকের দল বিপথগামী হইয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে?

"বাংলাদেশে যে স্পর্দ্ধা, যে সাহস, যে ধর্ম্মবলের অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে তাহাও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শিক্ষণীয়। দক্ষিণেশ্বরে ভাবী জগতের মঙ্গল উদ্দেশে যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহার আশীর্ব্বাদ-বাণী মাথায় লইয়া বাঙ্গালীর গৌরব স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র জগতে এই অদ্ভুত শক্তির খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারই মন্ত্রপ্রভাবে বাঙ্গালীর নবীন প্রাণে নূতন আশা ও দৈবশক্তির বিকাশ লক্ষিত হইতেছে।

"এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই, ভারতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে দশ বৎসর হইতে দুইটি দল ঘাতপ্রতিঘাতে আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। একটি নরম দল অপরটি জাতীয় দল। বাংলার অগ্নিময় কর্ম্মক্ষেত্রে দশ বৎসর ধরিয়া এই উভয় দলই বর্ত্তমান আছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরম দলের।"

১৯১৬ সালের কথা। বিগত দশ বৎসরের ক্রমাগত দলাদলির ফলে বাঙ্গালা নেতৃহীন হইয়া পড়িয়াছিল। উপযুক্ত নেতার অভাবে বাংলার তরুণদল ঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারিতেছিল না। সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ও পথের অভাবে বাঙ্গালার যুবকগণ দিশাহারা। এই সঙ্কটকালে শ্রীমতিলাল 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় (২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা) "পন্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই পন্থা বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছিলেন। লেখাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"বাঙ্গালী যুবকগণ যে উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা যদি সুনিয়ন্ত্রিত হইত তাহা হইলে বাঙ্গালায়ও আজ সোনা ফলিত—বাঙ্গালীর গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইত।

"দেশের নামে, জন্মভূমির উন্নতির কামনায় বাংলার যুবকমণ্ডলী যে ক্ষতিস্বীকার করিয়াছে, তথাকথিত বাঙ্গালার নেতৃমণ্ডলী তাহার শতাংশের একাংশও গ্রহণ করে নাই বরং রাজসম্মানে তাহারা সম্মানিতই হইয়াছেন—রাজার কঠোর শাসন যুবকগণের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে, ইহাতে ক্ষোভের কারণ নাই—তাঁহাদের আত্মোৎসর্গের উপরই ভবিষ্যৎ ভারত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

"কিন্তু বাঙ্গালার যুবকগণকে আজ ভগবন্নির্দ্দেশে পরিচালিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি—মানুষের অঙ্গুলীসঙ্কেতে ভক্তের মত, সেবকের মত এতদিন পরিচালিত হইয়া তাহারা যে শক্তি, যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে, আজ তাহার অনুশীলনের দিন আসিয়াছে—যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল রুদ্রশক্তি নিয়ত কঠোর কর্ম্মের আবর্ত্তনে স্থির ও শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, শুক্লকেশ স্থবিরের প্রজ্ঞা যুবক মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলার কর্ম্মরথে যুবক-সঙ্ঘই সারথ্যের কর্ম্ম গ্রহণ করিবে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে প্রবর্ত্তকের তথা প্রবর্ত্তকের প্রাণপুরুষ মতিলালের মানস-গঠনটি বেশ স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে। রাজনীতির আবর্ত্ত হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া ভগবান-কেন্দ্রিক একটা কিছু সংগঠনের জন্য তাঁর অন্তর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা বেশ বুঝা যায়। ভাবী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সৃষ্টির ইতিহাসের পথে ইহা নিদর্শন-চিহ্ন বলা যায়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৩০শে ডিসেম্বর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি প্রথম তাঁহাদের ফরাসী ভারতের অধিবাসীদের যুদ্ধাধিকার প্রদান করেন। এই অধিকারের বলে ১৯১৬ সালে ১৬ই এপ্রিল অপরাহ্নে ২৫ জন স্বেচ্ছাসৈনিক প্রথম দলভুক্ত হইয়া পণ্ডিচেরীতে প্রেরিত হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালীজাতি এই প্রথম যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ পাইল।

"সেইদিনটি বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সেই মাল্য-চন্দন-বিভূষিত, জনসাধারণের উল্লাস ও পুরমহিলাগণের শঙ্খধ্বনিমুখরিত, বিপুল জনসমুদ্রের পুরোভাগে বিংশতি সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকা হস্তে সুদূর ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যাত্রা সেইদিন যাহারা দেখিয়াছিল তাহারা কখনও ভুলিতে পারে না। সেই চন্দননগরে চাঞ্চল্য ও উল্লাস এবং সহস্র সহস্র নরনারী দ্বারা সৈন্যদের সংবর্দ্ধনা এবং অভূতপূর্ব্ব জন-সমাগম বর্ণনার অতীত।"

এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল তাঁর অনুপম গ্রন্থ 'জীবনসঙ্গিনী'তে উল্লেখ করিয়াছেন: "অন্তরের পরিবর্ত্তনের সহিত বাহিরের কর্ম্মজগতেরও পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কর্ম্মের রূপেও যেন সে পরিবর্ত্তনের চাপ পড়িল। বিপ্লবের ভাঙ্গন-ধর্ম্ম যেন ক্রমে ঘুরিয়া চলিতে চাহিল গঠনমুখে। বলিয়াছি—এই সময় ইউরোপের মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী পল্টন প্রেরণের ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছিল চন্দননগরে—বিশেষভাবে আমার কানেই। শ্রীমান হারাধন সেদিন আমারই অনুগত। তার ছাত্র-জীবনের আদর্শ আমি।.....সে আসিয়া জেদ ধরিল—ইউরোপের মহাযুদ্ধে বাঙ্গালীকে যোগদান করিতেই হইবে।...আমিও এই কর্ম্মে ঝাঁপ দিলাম।.....এই সেনা-বাহিনীর প্রথম প্রবর্ত্তকদের প্রতিদিন আমারই প্রাঙ্গণে সমবেত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাহাদের বুকে ভরসার আগুন জ্বালাইতে লাগিলাম। বীরত্বের ইতিকথা শুনাইয়া, রণরঙ্গের মহিমায় তাহাদের চিত্ত প্রবুদ্ধ করিলাম। অন্তঃপুরে মাতৃমূর্ত্তিও সেইদিন যেন রণরঙ্গিণী। উল্লাসে, উৎসাহে অন্নথালী হস্তে তিনি নব বীরজাতির মুখে শক্তিপ্রসাদ তুলিয়া দিলেন। তন্দ্রাতুর বাঙ্গালী ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত করিল। বিদায় দিনে এই রণযাত্রী বীরপুত্রগণের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিলেন।

"আমার দুয়ারে সেদিন বাঙ্গালীর জয়োৎসবের মেলা বসিয়া গেল। এই ভীড়ের মধ্যে একজনের পুণ্যস্মৃতি মুছিতে পারিব না। তিনি "অমৃতবাজার পত্রিকার" প্রাণস্বরূপ পরলোকগত পরম শ্রদ্ধেয় মতিলাল ঘোষ। তিনি বার্দ্ধক্যপীড়িত শীর্ণ কলেবর লইয়া বাঙ্গালীর এই

জয়যাত্রার উৎস-তীর্থ দেখিতে আসিয়া, আমায় ভুজপাশে বাঁধিয়া যে আশীষ ও স্পর্শ দিয়াছিলেন, তাহা ভুলিতে পারিব না।

"২৫ জন বাঙ্গালী সৈনিক ভার্দুন যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। * * এই স্বেচ্ছাবাহিনীর পুনরাগমন পর্য্যন্ত এই উভয়ভাবেই বুকে করিয়া আমায় রহিতে হইয়াছিল। ঘটনা ঈশ্বরের প্রেরণা। এই কর্ম্মের নিমিত্তমাত্র আমি হইয়াছিলাম। বাঙ্গালীর প্রাণ ইহাতে কিরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা লর্ড সিংহের কথা হইতে বুঝা যায়। তিনি এই স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনীর এই বিজয়োৎসব সেদিন স্বনামধন্য খলিসানির জমিদার ৺যোগেন্দ্রনাথ বসুর বাটী হইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি আমায় বিপ্লবযজ্ঞের একজন নামজাদা পাণ্ডা বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এই রণবাহিনী গঠনে আমায় উদ্যোক্তা জানিয়া সেদিন প্রশংসাপূর্ব্বক বাক্যে যোগেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন—"I wish to see the Lion of Bengal."

"আমি সার্থক হইলাম শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব্ব বাণী ফলবতী হইয়াছে বলিয়া। তিনি বাংলায় সেনাবাহিনী গঠনের আন্দোলন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—"সেবা শিক্ষার সুযোগ আমাদের যথেষ্ট আছে, বাঙ্গালীর অস্ত্রশিক্ষার সুযোগ চাই। সে সুযোগ যদি কখনও আসে, বিনা সর্ত্তে, বিনা দাবীতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।" * *

"বাঙ্গালীর দুর্নাম রটিয়াছিল—তাহারা ভেতো, স্ত্রী-পুত্র গৃহের আসক্তি ছাড়িয়া কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। এই ঘটনায় সেই কলঙ্ক ঘুচিয়াছিল। ২০শে জুন বাঙ্গালী সেনাবাহিনী পণ্ডিচেরী হইতে মার্সাই যাত্রা করে। পদাতিক সেনাদলের সেনাধ্যক্ষ মঁসিয়ে এ. জিলে তৎপূর্ব্বে আমাকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে থাকিবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"মহাশয়, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার নিকট আমি অপরিচিত, তথাপি অতি আনন্দের সহিত চন্দননগরের সৈনিকদিগের সংবাদ আপনাকে জানাইতেছি। তাহারা সকলেই শারীরিক কুশলে আছে এবং পণ্ডিচারীতে আসিয়া অবধি তাহারা যেরূপ যোগ্যতার সহিত কার্য্যাদি করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। এই অল্পবয়স্ক যুবকগণ সকলেই সৎ—তাহাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন দোষ দেখি নাই। ইহারা আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাদল। এই কথায় একটুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। * * *

(স্বাঃ) এ. জিলে
লেফটেন্যাণ্ট সেনাদল পণ্ডিচেরী"

চন্দননগরের ভলেন্টিয়ারগণের সাম্বাৎসরিক উপলক্ষে "বীরপূজা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রবর্ত্তকে (২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীজাতির রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে রচনাটি কাজে লাগিবে। এই রচনারও অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেইদিন, এই ভিক্টর হিউগো, কোমাঁ, নেপোলিয়ানের জাতির আহ্বানে এই চন্দননগরের বাঙ্গালী প্রবল ক্ষাত্রশক্তির উপাসনার অধিকার লাভ করিয়াছে। শতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে অসামান্য প্রতিভাশালী ডুপ্লে মহোদয় ভারতীয় সিপাহীকে সর্ব্বপ্রথম রণশিক্ষাকুশলী অদ্বিতীয় সেনাবাহিনীতে পরিণত করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—আবার এই নবীন যুগে ২৬ জন ভলান্টিয়ারকে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপের রণরঙ্গভূমে অগ্নিক্রীড়ায় অবসর দিয়া উদার হৃদয় ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তেমন হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক দূরীভূত হইবার প্রথম দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সমগ্র জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—বাঙ্গালীর ক্ষাত্রশক্তির নব উদ্বোধন ঘটাইয়া সমগ্র ভারতের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন। ইহার মূলে এই ক্ষুদ্র ফরাসী উপনিবেশের রণোদ্যম যে কতদূর শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত আশালতাকে জলসেকে কতদূর পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে, যাঁহারা সেই সময়ের "অমৃতবাজার পত্রিকা"র নিয়মিত পাঠক ছিলেন, তাঁহাদের তাহা অবিদিত নাই।

"সেই ২৬ জন বীর, সেই ২৬ জন অগ্রণী যুবক আজ এক বৎসর ধরিয়া কঠোর একনিষ্ঠ তপস্বীর মত রণকৌশল শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। * * * এই এক বৎসর তাঁহারা কিভাবে কাটাইয়াছেন—সেই বীর হারাধন বক্সীর স্বলিখিত কাহিনী একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাই : "অপর দিকের কথাও শুন। অনেকদিন ধরিয়া নিয়ম, রীতি, প্রণালীর পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে আমরা পদাতিকের শিক্ষার হর্দ্দমুর্দ্দ কবে ছেড়ে দিতে পেরেছি, সঙ্গে সঙ্গে চারি মাস ধরে সমর-বিদ্যালয়ে পড়িয়া যত উচ্চ কর্ত্তব্য সে সকলও আয়ত্ত করেছি। বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হতে পেবেছি। * * সেখানকার সামরিক শৃঙ্খলা, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ স্থান প্রভৃতিও দেখেছি, জেনেছি। * * * আমরা এখন কামান শিক্ষা করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যায় বন্দুক স্কন্ধে ইউরোপের রণরঙ্গপ্রান্তে বিচরণ করতেই—তখন মাইল মাইল দূব থেকে বিজ্ঞানসৃষ্ট এই রহস্যময় নালিকার মুখের সামনে মানুষগুলির মরণযজ্ঞ দেখে উপেক্ষার হাসি হাসা যেত * *।"

"ইঁহারা ত চলিয়াছেন—বাঙ্গালীর প্রথম রণযজ্ঞের পুরোহিত—বাঙ্গালীর ক্ষাত্রবীর্য্যের সাধনার অগ্রণী সাধক—আত্মাহুতিদানে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিতে, বিশ্ব-মানবের একত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া—ইঁহাবা ত চলিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ফুবায় নাই, আমরা সাম্বৎসরান্তে তাঁহাদের পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি।"

চন্দননগরের অন্যতম স্বেচ্ছাসৈনিক মনোরঞ্জন দাস ২৪শে এপ্রিল মিউনিক প্রদেশে বিজ্যার্ত নগরে পরলোক-গমন করেন। সংবাদটি প্রবর্ত্তকে (২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদটির আংশিক এখানে প্রকাশিত হইল।

"মনোরঞ্জন পুস্তক, বাটালী, হাতুড়ির পরিবর্ত্তে বন্দুক ধারণ করিতে সেই প্রথম বীরবাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া পণ্ডিচেরী যাত্রা করিলেন। সেইখানে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মনোরঞ্জন ৫০০ শত অফিসার ও সৈনিকের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর ইঁহারা পদাতিক ও কামান-পরিচালনা শিক্ষান্তে ফ্রান্সের রণপ্রান্তে গমনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এমন সময়ে জীবনের সায়াহ্নে ভীষণ টাইফয়েড রোগে মনোরঞ্জনকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল।"

বাঙালী সৈনিকের এই বীরত্বের কাহিনী এই সময়কার প্রবর্ত্তকে 'বাঙালী সৈনিক' শীর্ষকে কাব্যরূপও পাইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা শ্রীমতিলালেরই রচনা। কবিতাটি বৃহৎ। ইহার আংশিক এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

কেমনে রহিব গৃহকোণে—ওরা যে শুনেছে সব
শঙ্খের আবাব তব, এ বিশ্বের বিপুল উৎসব

* * *

শতাব্দীর শৃঙ্খলেরে ছিঁড়ি আজি বিশ্বের মেলা
বিশ্বের সবার সনে ওরা আজি মিলি পরে যায়।
ওই যে সমরক্ষেত্র—পলে পলে মরণের খেলা—
ওই আজি মিলনের স্থান, নাই যেথা অবহেলা।
নাহি ছল, নাহি ঘৃণা, কৃষ্ণ শ্বেত উচ্চ নীচ সব
মৃত্যুর পতাকাতলে হবে এক মরণোৎসব।
দেখিবে সবারে ভাঙ্গি মদমত্ত মোহময় কারা
কৃষ্ণ শ্বেত সবাকার বক্ষে একই রক্তধারা।
মৃত্যুর শাসন নিবে দূর করি যত অপরাধ
শতাব্দীব, যত মিথ্যা জীবনের যত বিসম্বাদ।
সঙ্কোচে হইবে নত, শুধু ববে মানুষের প্রাণ
উন্মুক্ত মিলন লাগি' বিধাতার শ্রেষ্ঠ অবদান।
ওই যে মরণক্ষেত্র ওই আজি মিলন মন্দির
সেথা ওরা ছুটিয়াছে দগ্ধ প্রাণ শত শতাব্দীর।

শ্রীমতিলাল তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'জীবনসঙ্গিনী'তে বাঙালা সেনাদল গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত যাহা দিয়াছেন তাহা এই—

"১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীরাম পাল প্রস্তাব উত্থাপন করেন—"ভারতবাসী স্বেচ্ছাসৈনিক যাহাতে হইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক।" মিঃ দাদাভাই নৌরোজী সেই কংগ্রেস সভাব সভাপতি ছিলেন। সেদিন ৪৪০ জ প্রতিনিধি লইয়া জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে প্রস্তাব

সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা জানি—উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।"

এইসব তথ্য হইতে বেশ বোঝা যায় যে, শ্রীমতিলালের আন্তরিক চেষ্টায় দেশীয় সেনাদল গঠন সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীমতিলাল তথা প্রবর্ত্তকের দান অবিস্মরণীয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই সম্পর্কে যাঁরা লিখিয়াছেন তাঁরা মতিলালের নামোল্লেখ না করিয়া সত্য ইতিহাসকে বিকৃতই করিয়াছেন।

১৩৩১ সালে ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় "চন্দননগরে বাঙ্গালী সৈনিক" শীর্ষক প্রবন্ধে তৎকালীন বাংলার বহু মনীষীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই যজ্ঞের অন্যতম প্রধান পুরোহিত শ্রীমতিলালের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ তিনি চন্দননগরেরই মানুষ। তাঁর ইহা না জানিবার কথা নহে। প্রবর্ত্তক পত্রিকাও নিশ্চয়ই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

আমার যতদূর মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে আরও দুইখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে রাজেন্দ্রলাল প্রণীত "বাঙ্গালীর বল" গ্রন্থ, অপর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। সুবেদার এম. বি. সিংহ প্রণীত 'সৈনিক বাঙ্গালী' ছিল এই গ্রন্থের নাম। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়েও শ্রীমতিলালের নাম উল্লেখ না থাকায় উহা অসম্পূর্ণ বলা চলে।

চন্দননগর গোন্দলপাড়া হইতে প্রকাশিত প্রাক্তণ বিপ্লবী শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়" গ্রন্থে শ্রীমতিলালের এই সেনাবাহিনী গঠনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।" সেই আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগ্রত সচেতন করার উদ্দেশ্যেই শ্রীমতিলাল গভীর বেদনাভরেই লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশের প্রেম কোথায়? ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এদেশে যত আছে, এমন আর কোন দেশে নাই!" তাই তিনি বাঙ্গালী সেনাদল গঠন সম্পর্কে "জীবন সঙ্গিনীতে" আরও বলিয়াছেন—"সে অপ্রকাশিত অধ্যায় আজ প্রকাশ না করিলে, বাংলার জাতীয় ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় অস্পষ্ট বা মিথ্যা রঙীন হইয়া থাকিবে।"

কথাটা মিথ্যা নহে। এই কার্পণ্য, কুণ্ঠা ও আত্ম-জাহিরের অশোভনীয় স্পৃহা এ জাতির সত্য ইতিহাস রচনার পথে কম বাধা সৃষ্টি করে নাই। (ক্রমশঃ)

একখানি চিঠি

[প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রবীণ অন্তরঙ্গ সভ্য ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত লেখা পত্র। পত্রখানি ব্যক্তিগত হইলেও তাৎপর্য্য বহন করে। 'প্রবর্ত্তক' প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের মুখপত্র। পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' সঙ্ঘের ভাবাদর্শের বাহক ও ব্যাখ্যাতা। পত্রখানি ইহারই সমর্থন ভরসা, প্রেরণা ও উৎসাহব্যঞ্জক।—প্রঃ সঃ]

ভাই রাধারমণ,

আষাঢ় সংখ্যায় প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয় উচ্চৈস্বরে একদমে পড়ে গেলাম। কয়েক সংখ্যায়ই চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। এবারকার সংখ্যা ভাল করেই সবটুকু পড়তে পেরেছি। সব সময় পড়বার মত মন ও মেজাজ থাকে না।

যে সময় থেকে গুরুর দিকে মুখ করে অর্থাৎ গুরুমুখী হয়ে গুরু বনাম সঙ্ঘের জন্ম, কর্ম্ম, দিব্য জাতি-গঠনের মর্মকথা লিখতে সুরু করেছ, লেখা যেন খুলছে। শ্রীগুরু ও সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার অনবদ্য চেষ্টা বহু সুকৃতি বশতঃ তোমার মধ্যে গঙ্গাপ্রবাহের স্বচ্ছ ধারার মত নেমেছে। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদই তোমাকে এক মহান্ ব্রতে যেন উদ্বুদ্ধ ও উদ্যত করেছে দেখছি। লেখনী তোমার সহজ ও সাবলীল ভাষায় সঙ্ঘের ভাবাদর্শে সমৃদ্ধ হয়ে জাতিকে শুদ্ধতত্ত্ব ও দর্শনের রূপ দিতে চাইছে। বিশুদ্ধ ভারতীয় জাতিগঠনের যে মর্ম্মচিত্র সঙ্ঘগুরুজী রেখে গেছেন, ভাগবত সমষ্টিজীবনের যে রেখাচিত্র আজ সঙ্ঘের মধ্যে রূপ নিচ্ছে দেখাতে চাইছ, তা অনুপম তথ্যবহুল হচ্ছে। লিখতে ইচ্ছা হয়, সঙ্ঘগুরুকে—তাঁর আবির্ভাবকে নতুন করে যেন দেখতে ও দেখাতে পারছ—তাই সার্থক হচ্ছে তোমার ভাব্য ও ভাবনা, সাধ্য ও সাধনা। তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের নবপ্রকাশ যেন মূর্ত্তিমান হয়ে সঙ্ঘকে তুলে ধরছে অপরূপ ভাবে ও ভাষায়। শ্রীভগবান তোমায় বলেছিলেন—অরুণের পাশে দাঁড়াও। তাঁর আদেশ ও ইচ্ছা আজ জয়যুক্ত হয়েছে দেখে অক্ষম অন্তরেও তৃপ্তি পাচ্ছি। অরুণকে (সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত) জিজ্ঞাসা করলুম সম্পাদকীয় কেমন হচ্ছে? অরুণের তৃপ্তিভরা বদন উদ্ভাসিত হয়ে জানাল যেন—অতি চমৎকার। প্রীতি নিও। ইতি কেষ্টদা।

পুনশ্চ—ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকারের লেখাও (প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর) তথ্যসমৃদ্ধ ও বহু জ্ঞাতব্যবহুল হচ্ছে।

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

বাহান্ন চাষ :

কৃষিতত্ত্ববিদ্ শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ সংগৃহীত এবং কলিকাতা, পোষ্ট বিডন স্কোয়ার, রয়েল গার্ডেনিং এসোসিয়েশন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০। কৃষিপ্রধান দেশে শিক্ষিত লোক কৃষি-বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন ইহা আশার কথা।

প্রতিভা :

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক পরিচালিত। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম. এ., বি. এল. সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। প্রতিভা কার্য্যালয়, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ।৵০।

প্রতিভা প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগেরই পাঠ্য, কেননা ইহাতে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কল্পে উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। যাঁহারা ভবিষ্যতে পূর্ব্ববঙ্গের সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবেন তাঁহারা প্রতিভা হইতে বিশেষ উপকৃত হইবেন এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতিভার বিশেষত্ব এই উহা আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য পরিষদের প্রদর্শিত পথে নিষ্ঠা সহকারে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। আমরা প্রতিভার বিস্তৃত প্রচার কামনা করি।

দ্বিতীয় সেনাদলের যাত্রা :

গত শুক্রবার ১৬ই জুন দ্বিতীয় বাঙ্গালী সেনাদল পণ্ডিচেরী রওনা হইয়াছেন। ইঁহারা তথা হইতে প্রথম সেনাদলের সহিত মার্সাই যাত্রা করিবেন। ইঁহাদের বিদায়-কালে চন্দননগর আবার উৎসাহে জাগিয়া উঠিয়াছিল, পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনিতে, কুমারীগণের মাঙ্গলিকে, যুবকদলের জয়শব্দে চন্দননগর সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদায় :

২০শে জুন পণ্ডীচারী হইতে বাঙ্গালী সৈন্যদল মার্সাই যাত্রা করিয়াছেন। ইউরোপের মহাযুদ্ধে বাঙ্গালীর যোগদান, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। আমরা শ্রীভগবানের নিকট নিয়ত তাহাদের কল্যাণ কামনা করিব।

বাঙ্গালীর অস্ত্রলাভ :

বিধাতার আহ্বানে বাঙ্গালীও রণক্ষেত্রে আগুয়ান হইল। আজ চিরদিনের ভীরু কাপুরুষ কলঙ্কলাঞ্ছিত ললাট সিন্দূরবরাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উপেক্ষিত অনশনক্লিষ্ট, দরিদ্র, জরাগ্রস্ত বাঙ্গালী জগতের মহাযজ্ঞে হোতার আসন লাভ করিল।

১৫ই মে বাঙ্গালীর জীবনে, বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। কেননা এইদিনই বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের সহিত মিলনের মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছে—এই দিনেই শত্রুবধকল্পে বাঙ্গালী অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। এই অস্ত্রই বাঙ্গালী সেনাদলের জীবনস্বরূপ হউক—এই অস্ত্রই এক্ষণে তাহাদের বন্ধু, সুহৃৎ, আত্মীয়। সেইজন্য ফরাসী সেনাপতি বাঙ্গালীর হস্তে অস্ত্র দান করিয়া বলিয়াছেন—"বন্ধুগণ, এই অস্ত্রই এক্ষণে তোমাদের প্রকৃত বন্ধু; স্বীয় শরীরের মত এই অস্ত্রের আদর-যত্ন করিবে। কে জানে একমাস পরে কে কোথায় থাকিব, কিন্তু এই অস্ত্রই আমাদের শেষ দিনের সাথী—এই অস্ত্রই শত্রুর আক্রমণ হইতে তোমাদের রক্ষা করিবে—যদি অস্ত্রের অনাদর কর, তুর্কী বা জার্ম্মাণীর আক্রমণে তোমরা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।" আরও বলিয়াছেন "যখন তোমরা সেনাদলে যোগদান করিয়াছ তখন আর তোমাদের কেহ নাই—বাপ, মা, স্ত্রী-পুত্র, ঘরবাড়ী সবই তোমাদের এই সেনা-নিবাস। এই সৈনিক বন্ধুগণ তোমাদের সর্ব্বস্ব—ইহাদের সহিত একত্র অবস্থান করাই তোমাদের স্বর্গবাস।"

বঙ্গবাসী এ শিক্ষা মাথায় করিয়া রাখিবে—বাঙ্গালী চিরদিন সঙ্কল্পপরায়ণ জাতি—আজ এই সেনাদলের উপর দিয়া বিধাতার যে কঠোর পরীক্ষা চলিয়াছে অন্যান্য পরীক্ষার মত এই পরীক্ষায়ও তাহারা কৃতকার্য্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইবে। বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালীর ভাষা—ভগবান পূর্ণ করুন।

—সঙ্কলক : শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত

ইংরেজ ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা

[বেঙ্গল কেমিক্যালের রাসায়নিক গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডঃ হরগোপাল বিশ্বাসের নিকট লিখিত একজন ইংরেজ ছাত্রের পত্র। নাম বিউট্রিক উইকিন্‌স্‌। বয়স ১৬ বৎসর। ইংলণ্ডের এর্ডিংটন বার্মিংহাম 'গ্রামার' স্কুলের ছাত্র। গত ১৯৬৩ সালে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের ছাত্রদের জন্য একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেকটি স্কুলকে নিজ নিজ প্রস্তুত দ্রব্য প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান করেন। পত্রলেখক ছাত্রটির স্কুল হইতে একদল ছাত্রী এই প্রদর্শনীতে রাসায়নিক রং ও এই রংজাত দ্রব্য উপস্থাপন করার মনস্থ করিয়া এই ধরণের প্রাথমিক পুস্তক বহু অনুসন্ধান করিয়াও ব্যর্থকাম হন এবং নৈরাশ্যে হাল ছাড়িয়া দেন। ছাত্রটির মা জার্মানীর ফ্রিবার্গে (Freiburg) তাঁর বন্ধু ডঃ লেভির বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া ঘটনাক্রমে ডঃ বিশ্বাসের "The Development of Coaltar dye Industry" বইখানির সন্ধান পান এবং সাময়িকভাবে তাঁর সন্তান উইকিন্‌স্‌কে উহা আনিয়া দেন। পুস্তকখানি পাইয়া ছাত্রীরা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ভারত হইতে প্রকাশককে লিখিয়া এই বই সংগ্রহ করিয়া ডঃ লেভির বই ফেরৎ পাঠাইল। বইখানি তাহাদের প্রভূত কাজে লাগিয়াছে এবং সাফল্যের হেতু হইয়াছে—তাহারই বিশদ বিবরণ এই কৃতজ্ঞতাসূচক পত্রে দেওয়া হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে পত্রখানির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল না—অতি সংক্ষেপে মর্ম্মমাত্র বিবৃত হইল। পত্রে দুইটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—বিলাতের ছাত্রদের অদম্য অনুসন্ধিৎসা আর এ দেশের ছাত্রদের ঔদাসীন্য। অবশ্য ছাত্রদের কি কথা, এ দেশের অনেক বিদ্বান্‌ প্রবীণেরাও ডঃ বিশ্বাসের এই বইয়ের নামও হয়তো শুনেন নাই। 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্‌ পায় না'। অন্যথায় একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের ইংরেজী বিশেষ বিজ্ঞানের বইয়ের বিদেশে এই কদর নিশ্চয়ই বাঙালীর গৌরবের।—প্রঃ সঃ]।

31, Greenside Road
Erdington Birmingham
England. 11. 11. 63.

Dr. H. G. Biswas,
47/2 Ramkrishna Ghosh Road,
Calcutta-50.

Dear Dr. Biswas,

I an writing to you on behalf of a group of students at our school. My mother knows Dr. Fritz Levi and his wife, and it is from them that I got your address.

I am writing to thank you for the help which we gained from your book—"The development of Coaltar dye Industry." Last year a group of girls at our school who are studying to do science at University took part in an exhibition organised by Birmingham University for grammar schools. Each grammar school was invited to prepare an exhibit and at our school we decided to do dyes. It was to be an exhibition of chemical dyes. I do not do science but I helped a little in the laboratories and also tried to find out information for them.

We started the project in September, 1962. It was decided that a few of the simple dyes should be made, and materials should be dyed, and to accompany these, short life-histories, pictures, and information should be shown about the most important people involved in the chemical dye industry development.

Of course when we started making the dyes we were not very successful. We started with alizarin and in fact we had to give that up eventually because we could not make it at all. Because of our lack of knowledge and because we had not much time to do our work, (we had to stay after school if we wanted to get anything done) we had produced only two or three dyes by April 1963. We began to despair of ever producing anything worth-while and our teacher wanted to give up because the exhibition was to be held in September, 1963. Besides being unsuccessful with our dyes, we

could not find any information or picture about any of the important people. Then during the Easter holidays I went to London and got a photograph of Sir William Perkin from the National Portrait Gallery. Proudly I took it back to school and this encouraged us a great deal. In fact it is surprising what that picture did. But we still needed a good book to tell us more about the general back ground and development of the dye industry.

Then my mother, in May, went to stay at Freiburg with Dr. and Mrs Levi whom she has known for a long time and is very great friend with. While she was staying there, Dr. Levi casually showed her a copy of your book which you had given him many years ago. My mother immediately saw that it was just what we needed, and she asked Mrs. Levi if we could borrow it.

I was absolutely thrilled with the book when she brought back from Germany and so were my friends when they saw it when I took it to school. It had everything we needed. I showed it to the teachers who immediately read it and used material from it. Besides having information about the dyes, it had pictures and information about the scientists as well. So far we had got was the one and only picture of Perkin and nothing about his work or life.

Besides using the book we were inspired by actually having some help in our task and immediately set to work again with renewed vigour. In fact the girls thought the book so good that they sent to India and asked the publishers if they had any spare copies of it. The publishers were very kind indeed and took a lot of trouble to find out. Eventually they replied and sent as a free copy of your book for advancement of science—they said. We used the pictures and materials in your book and returned Dr. Levi's copy with thanks.

The exhibition took place in September, 1963. We had prepared 12 different dyes with their crystals and had even made table mats and head-scarfs. If you are interested, among the dyes that we made were methylene blue, orange II, malachite green, betanphthol, fuchsine, crystal violet, aniline yellow, aniline black, primuline and Martius yellow. We tried indigo, but I think we did not complete it, but had to leave it at an intermediate stage.

May I thank again for the great help and inspiration which your book gave us and wish you further success with any future work you may do.

Dr. Levi and his wife send their kindest regards through this letter.

Yours faithfully,
Beatric Wickens (aged 16 years)

"Nothing can be farther from my thought than that we should become exclusive or errect barriers. But I do respectfully contend that an appreciation of other cultures can fitly follow ; never precede, an appreciation and assimilation of our own. It is my firm opinion that no culture has treasures as rich as ours has. We have not known it, we have to make even to deprecate its study and depreciate its value. We have almost ceased to live it. An academic grasp without practice behind it is like an embalmed corpse, perhaps lovely to look at but nothing to inspire or ennoble. My religion forbids me to belittle or disregard other cultures, as it insists under pain of civil suicide upon imbibing and living my own."

—*Mahatma Gandhi.*

আলোর সন্ধানে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আজকের ছাত্রসমাজই ভবিষ্যতে জাতির পরিচালক সমাজে পরিণত হবে, সেই ছাত্রসমাজ যদি ঠিকমত 'মানুষ' না হয়, তা হলে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ব্যাহত হবে। কেউ চায় না যে, তার স্বজাতি অবনমিত হোক। সেইজন্য ত্রুটি ও দুর্বলতা নির্ণয় করে তাকে অতিক্রম করার জন্য সবাই উৎসুক হন। এই ঔৎসুক্য কার্যকরী করতে পারেন দু' দলের মানুষ: চিন্তানায়ক ও কর্ম-নিয়ন্ত্রক। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ চিন্তানায়কদের মধ্যে বিশেষ মানুষ ছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন—'এদের শিক্ষা দাও, চোখ খুলে দাও, তারপর এরা নিজেরাই নিজেদের উন্নতি করতে পারবে।' কিন্তু কর্মনিয়ন্ত্রক হবার অবকাশ তিনি পাননি। সেই অবকাশ ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক ক্ষেত্রে তিনি সেই কর্মাদর্শের প্রয়োগ করে গেছেন, বাংলার ঘরে ঘরে তিনি গ্রাজুয়েট তৈরী করে দিতে চেয়েছিলেন বলেই, সে-যুগের বাঙালী সারা ভারতের অগ্রণী বলে গণ্য হয়েছিল। ভারতের প্রথম দু'জন রাষ্ট্রপতি ৺রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণণ সেই যুগের সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ প্রয়োগের ক্ষেত্র অতো ব্যাপক ছিল না সত্য, কিন্তু দরিদ্র দেশের বাহুল্যবর্জিত শিক্ষার কর্মকেন্দ্র তিনি জনসমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

কিন্তু এসব প্রাক্-স্বাধীনতা কালের কথা। দেশ স্বাধীন হবার পর এই শিক্ষার ব্যাপারটা সমস্যাবহুল হয়ে পড়েছে। কর্মকর্তাদের নানা অভিমত এই সমস্যার সুরাহা না করে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে। প্রথমেই উল্লেখ করা চলে, জানুয়ারী মাসের বদলে শিক্ষাবর্ষ হঠাৎ মার্চ মাস থেকে সুরু করা হলো, তারপর আবার সেই জানুয়ারীতেই ফিরে এলো। সব ইস্কুলে দশ বছরের বদলে এগারো বছরের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব হলো। কিন্তু অর্ধেক সংখ্যকের কাজ সম্পূর্ণ হতে না হতেই বিবৃতি প্রচার হলো যে, আর করা যাবে না, টাকা নেই: অনেক বড় বড় ইস্কুল-বাড়ী তৈরী হলো, কিন্তু বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞানের সরঞ্জাম সংগ্রহ করা গেল না। ইস্কুল ফাইন্যাল, আই-এ ও বি-এ তিনটি পরীক্ষা ছিল, সেস্থলে হলো চারটি, ইস্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, প্রি-ইউনিভার্সিটি ও বি-এ। অথচ উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা দু'টিতে নামিয়ে আনা—হায়ার সেকেণ্ডারী ও বি-এ, কিন্তু তা হলো না। এই সঙ্গে আবার আর-এক রকম বিদ্যালয় দেখা দিল—বহুমুখী বিদ্যালয়, সেখানে ছেলেমেয়েরা কিছুটা অর্থকরী বিদ্যা শিখবে। বেকার সংখ্যার ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কথা ভেবেই এই বিদ্যালয়গুলির সৃষ্টি। ইতিমধ্যে আবার আরেক বিপদ দেখা দিয়েছে, বিধি-নিয়ন্ত্রকদের কেউ ঘুরে আসছে আমেরিকা, কেউ অষ্ট্রেলিয়া, কেউবা জাপান। এসেই তাঁরা বলছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে, নয়তো জাপানী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে—আগাগোড়া ঢেলে সাজতে হবে। কিন্তু আমাদের যে পদ্ধতি এতদিন চলছে, তার ত্রুটিগুলি শুধ্‌রে নিয়ে কিছু যোগ-বিয়োগ করে শিক্ষাধারাকে যুগোপযোগী করে নেবার জন্য যে চেষ্টা হওয়া উচিত ছিল, সেদিকে তেমন উৎসাহ চোখে পড়ে না।

আরেক দিকে পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু যেমন বেড়েছে, ইস্কুল-কলেজের ছুটির দিনের সংখ্যা তেমনি বেড়েছে। নির্দিষ্ট ছুটির দিনের সঙ্গে ধর্মঘটের কয়েকটা দিন ও ইউনিয়নের নির্বাচনের কয়েকটা দিন যুক্ত হয়েছে। বৈদ্যুতিক পাখার যুগে দীর্ঘ গরমের ছুটি কেন, ৺পূজার ছুটিই বা দীর্ঘ কেন, বড়দিনেরই-বা একটানা ছুটি কেন? ইস্কুলের চেয়ে কলেজের ছুটি আরো বেশী। ইস্কুল কলেজের গ্রন্থাগারগুলি ছাত্রদের অনুপাতে প্রশস্ত হওয়া উচিত এবং ছুটির দিনে সেগুলি যথারীতি খোলা থাকা দরকার—অবশ্য যদি আমরা পড়াশুনা চাই।

কিন্তু পড়াশুনা আমরা চাই না। শিক্ষক মশাইরা আর্থিক অনটনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে

বীতস্পৃহ। আবার আরেক দল আছেন যাঁরা রাজনীতি করেন, এঁরা অধ্যাপনার চেয়ে রাজনীতিই করেন বেশী, তবু শিক্ষালয়ে এঁদের নাম থাকে, এবং নামের সঙ্গে অধ্যাপক শব্দটা যুক্ত থাকে।

এর উপর প্রাইভেট ইস্কুলগুলির সেক্রেটারী ও পরিচালকগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চ শিক্ষার ধার ধারেন না, শিক্ষালয়গুলি তাদেব রাজনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তি। বিদ্যালয় বাদ দিলে তাদের আর কোন ব্যক্তিপরিচয় থাকে না। এঁদের কবল থেকে বিদ্যালয়-গুলিকে মুক্ত করার কথা কেউ ভাবেন না। স্বাধীন দেশেব শিক্ষালয় কোন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে কেন, এ একটা প্রশ্ন।

এর উপব আরো দুটি উপসর্গ আছে। খেলার মাঠ ও সিনেমা। ষ্টেডিয়াম না থাকার জন্য ভাল খেলার টিকিটের যে লাইন দেওয়া হয় আগেব দিনের রাত্রি থেকে; যুব-মানসে তার একটা প্রতিক্রিয়া আছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। আর সিনেমায় যে পর্যায়ের হিন্দি বই প্রদর্শিত হয়, তাতে আমাদের যে সেন্সর বোর্ড আছে এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের কোন চেষ্টা আছে তা তো মনে হয় না। এর উপর উপরি পাওনা হলো বেডিও। সেখানে এমন গান খুব কমই শোনা যায় যা জাতীয় ভাবোদ্দীপক, চীনা আক্রমণের সময় কিছুদিন এই ধারা বদলেছিল; এখন আবার সেই পুরানো ধারাতেই ফিরে গেছে।

চারি পাশ থেকে তরুণ মনের উপর যে চাপ পড়ছে, তার প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম করার মত মানস তাদের নেই, সেই দিকের পরিচালন নেতৃত্বের প্রত্যাশা ছিল শিক্ষকদের কাছ থেকে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর মুনাফাবাজী অবস্থা শিক্ষকদেরও বিচলিত করেছে, বিভ্রান্ত করেছে।

আমাদের দেশের 'ট্রাডিশন' বুনো রামনাথের ধারা। গোপাল ভাঁড় খট্টাঙ্গ পুরাণের ভাঁড়ামি করে রাজসভায় প্রাচুর্যের সমাবোহ ভোগ করবে, আর বুনো রামনাথ তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে নবদ্বীপের শিক্ষার মর্যাদা বজায় রাখবেন—এ ব্যবস্থায় আর যাই থাক গৌরব করার কিছু নেই। কিন্তু সেই ধারা অদ্যাবধি বজায় আছে। প্রাইভেট ইস্কুলে ষাট টাকা মাহিনার ডবল এম-এ হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে আমরা পড়েছি, এখন হয়তো সে জায়গায় মাইনে হয়েছে আড়াইশো, কিন্তু তিন টাকা মণের চাল হয়েছে তেত্রিশ টাকা, দেড় টাকা জোড়া কাপড় হয়েছে বারো টাকা জোড়া, ঘরের ভাড়া পাঁচ টাকার স্থলে হয়েছে পঞ্চাশ টাকা! কাজেই শিক্ষকদের যে সমস্যা আগে ছিল, সেই অনটন ও অসঙ্গতি এখনও রয়েছে।

অর্থের জৌলুষ চিরকালই মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমানে সেই মর্যাদা আরো বেড়েছে, শিক্ষার ও মনস্বিতার কথা আর উঠছে না। সেই দিক থেকে ছাত্রসমাজের কাছে শিক্ষকদের সম্মান কমে গেছে। ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য দিয়ে তার কিছুটা পূরণ করা চলে, তারও অভাব ঘটেছে। মর্য্যাদা ও যোগ্যতার অভাব ছাত্রসমাজের উপর থেকে শিক্ষকদের প্রভাব কমিয়ে দিয়েছে। অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বেণীমাধব দাসের মত শিক্ষক আগের দিনে প্রত্যেক ইস্কুলেই দু'চারজন করে পাওয়া যেত, এখন দৈবাৎ মেলে। এই প্রসঙ্গে ছাত্রসংখ্যার আধিক্যের অসুবিধার কথা উঠতে পারে, কিন্তু আমরা সে কথা মেনে নিতে পারি না। আমাদের কালে বিদ্যাসাগর কলেজের হাজার দুয়েক ছাত্রের মধ্যে অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জী, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অচ্যুতকুমার দত্ত, মণি সেন প্রভৃতির প্রভাব তো ছাত্রসমাজে কম দেখিনি। স্বাদেশিকতার উত্তেজনায় মাঝে মাঝে ছাত্রসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেজন্য অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের হৃদ্য সম্পর্ক ছাত্র-সমাজের সঙ্গে কোনদিন রুদ্ধ হয়নি! তার মূলে ছিল শিক্ষকসমাজের মধ্যে সংবেদনশীল মনোভাব, যা বর্তমানে দুর্বলতা বলে গণ্য হয়েছে।

ছাত্রসমাজের মন থেকে শিক্ষকেরা দূরে সরে গেছেন আরও দুটি কারণে, একটি সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরটি কর্তৃত্বের হস্তান্তর। ছাত্রসংখ্যা আগের কালের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে বলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখার

সম্ভাবনা কমেছে। কথাটার মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু সংখ্যাধিক্য যতই হোক, কিছু কিছু ছাত্রের সঙ্গে যদি শিক্ষকের যোগাযোগ থাকে তাহলেই তার প্রভাব বাকি সবাইকার মধ্যে গিয়ে পড়বে। সেদিকে শিক্ষকদের বিশেষ করে কলেজের শিক্ষকদের চেষ্টা অতি কম।

স্বাধীনতা পাবার পরে আমাদের শিক্ষার ব্যাপারটা আর শিক্ষকদের হাতে নেই, রাজনীতিকদের হাতে গিয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্কুল-কলেজ—সবই এখন রাজনীতিক নেতা ও গোষ্ঠী পরিচালনা করেন, শিক্ষকরা শুধু বেতনভুক্ কর্মচারী মাত্র। ছাত্রেরাও এই গোষ্ঠীগত রাজনীতিক প্রভাবের মধ্যে গিয়ে পড়ে। তার ফলে শিক্ষার আদর্শের চেয়ে রাজনৈতিক আদর্শ তরুণচিত্তে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা-সমাধান সম্পর্কে শ্রীহুমায়ুন কবীরের সুচিন্তিত অভিমত বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

প্রভাতী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল,
জনতার বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল।
ট্রাম-ভাড়া ছুতো; ক্ষত আরো বহু গুণ,
সে সবেরি জ্বালা ট্রামে লাগায় আগুন।
কর্তারা লুটে-পুটে থাকে দুধে-ভাতে,
জনতার যন্ত্রণা বাড়ে দিনে-রাতে।
চাল-তেল-নুন-মাছ সবি পাওয়া দায়,
ক্ষুধার জ্বালায় তা'রা শুধু খাবি খায়।
চোরা-কারবারী, আর ঘুষ যারা নেয়
মোটরেতে জনতাকে চাপা তারা দেয়।

জোচ্চোরে সুখে থেকে নেতাগিরি করে;
বজ্জাতি উৎপাতে সজ্জনে মরে।
সরকারী বিবৃতি ঘায়ে দেয় নুন,
জাতির গালেতে পড়ে কালি আর চুণ।
এ রকম খেল আর ভেল্‌কির বলে
অবশেষে দেশ-জাতি যাবে রসাতলে।
এর থেকে বাঁচবার কী উপায় জানো?
কদাচারীদের পিঠে কষাঘাত হানো!
অন্যায়-বিরোধের বিপ্লব-রথ
মুখরিত ক'রে দিক এ দেশেরও পথ।

বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল
(সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়)
পুস্তকের বিষয়ঃ
- প্রথম জীবন
- দেশের তৎকালীন অবস্থা
- স্বদেশী আন্দোলন ও শ্রীমতিলাল
- শ্রীমতিলালের সাহিত্যকৃতি
- শ্রীমতিলালের সংগঠনী শক্তি

ইত্যাদি
দাম মাত্র এক টাকা।
'প্রবর্ত্তক'এর গ্রাহক ও সভ্যসভ্যাদের জন্য শতকরা ২৫৲. কমিশন।
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী
বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার
সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল
প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক
লক্ষ্মীনারায়ণ হোসিয়ারী
৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি, টি, রোড ঃ ঃ বড়বাজার

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে কয়েকটি ঃ

চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ঃ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ঃ দশন সংস্কার চূর্ণ ঃ
সারিবাদ্যারিষ্ট ঃ অশোকারিষ্ট ঃ ব্রাহ্মী ঘৃত (ছাত্র বন্ধু) ঃ মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

ঔষধের বিস্তৃত বিবরণী ও গুণাগুণের জন্য তালিকা দ্রষ্টব্য। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।

সাময়িকী

সীমান্ত গান্ধী সংবাদ :

সম্প্রতি (২৭-এ জুলাই) বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের ভারতীয় প্রতিনিধি দল কাবুলে সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফর খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পায়। জানা যায়, পাখতুনরা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া আজিকার পাক-সরকার তাহাদের হিন্দু বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে।

বিদায়কালীন করুণ দৃশ্যটি হৃদয়বিদারক। সীমান্ত গান্ধী সজল নয়নে প্রতিনিধিদের আলিঙ্গন করেন। বলেন, "নেকড়ে বাঘের মুখে আমাদিগকে ছুঁড়িয়া দিয়া তোমরা স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতেছ। আমাদের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছ।" এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে প্রকাশ পায় যে গফর খান ও গান্ধীজী পাকিস্তান সমর্থন করেন নাই। রাজাগোপালাচারী, ও সর্দার প্যাটেলের ইচ্ছার কাছে গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করিতে বাধ্য হন। আর একটু দৃঢ় হইলে হয়তো পাকিস্তান সৃষ্টি হইত না। লালকোর্ত্তা দলের নেতা এখনও কর্ম্মঠ আছেন এবং ভারতে আসিয়া বসবাস করার ইচ্ছাও নাকি প্রকাশ করেন।

আজকের রাজধানী দিল্লীতে এই সত্যনিষ্ঠ অহিংসার পূজারী সীমান্ত গান্ধীর অবস্থান ঘটিলে লোকে একটা মহৎ জীবন ও চরিত্রের আলো দেখার সুযোগ পাইবে, কিন্তু আঁধারের নেতৃবৃন্দ ইহা সহ্য করিতে পারিবেন কি?

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গভর্ণিং বডির অধিবেশন :

গত ২৫শে জুলাই, ১৯৬৫, রবিবার অপরাহ্নে চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমস্থ 'রবীন্দ্র হলে' প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গভর্ণিং বডির ১৩৭২ সালের প্রথম অধিবেশন হয়। নববর্ষের বাজেট আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হয়। গত বর্ষের আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হয়। সঙ্ঘের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কার্য্যধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া এক দীর্ঘ অভিব্যক্তি দেন। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য দান করিয়া নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেওয়ার পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

কান্তকবি স্মরণে :

গত ১০ই শ্রাবণ কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্মশতবর্ষ পূর্ত্তি দিবস উপলক্ষে প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তীর পৌরোহিত্যে মহাজাতি সদনে কবি-স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান শতকের রেনেসাঁ কবি ছিলেন রজনীকান্ত। প্রাণ-জাগানো গান তিনি গাহিয়া গিয়াছেন। কান্তকবির "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" গানটি স্বদেশীযুগে সভায়-সভায়, নগর-পল্লীর জনগণ-পথ মুখে মুখে গীত হইত। অগ্নিবিপ্লবের সূচনায়ই কান্তকবির 'বাণী' (১৯০২) ও 'কল্যাণী' (১৯০৫) গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। রজনীকান্ত মোট আটখানি গ্রন্থের রচয়িতা—তিনখানি মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পাঁচখানি মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। কান্তকবির হাসির গান বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় অবদান। হাসির গানের প্রেরণা তিনি পান কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিকট হইতে। বাক্‌শক্তিরহিত অবস্থায় রজনীকান্তের হাসপাতালে অবস্থানকালে একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কান্তকবি এক টুকরো কাগজে তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার কথা ব্যক্ত করেন। সেই দিনই রবীন্দ্রনাথ একটি গান লিখিয়া কান্ত-কবির নিকট পাঠান। রবীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ গানটি "আমায় হইতেছে সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব্ব করেছ চুর।" সর্ব্বদেশের কবির দুর্ভাগ্যের মত কান্তকবিও তাঁর জীবিতকালে দেশ ও জাতির নিকট যোগ্য মর্য্যাদা পান নাই। না পাইলেও উত্তরকালে রজনীকান্ত স্ব-মহিমায়ই অমর হইয়া আছেন ও থাকিবেন।

বোম্বে "বাহুখান" বিহারে বৌদ্ধ দীক্ষা-যজ্ঞ :

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ বোম্বের "বাহুখান বিহারে" বৌদ্ধদের এক ঐতিহাসিক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে ৩৫০ জন যুক্ত-প্রদেশ হইতে আগত ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অখিল ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি ও উত্তর ভারতীয় বুদ্ধসঙ্ঘের যুক্ত উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। ভিক্ষু এইচ ধম্মানন্দ বৌদ্ধ-বিধানানুসারে এই ধর্ম্মান্তরীকরণানুষ্ঠান "ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল" ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এই ধর্ম্মান্তরিতেরা সবাই হিন্দু বলিয়া অনুমিত হয়।

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত :

বহুবিশ্রুত বিপ্লবীবীর বটুকেশ্বর দত্ত গত ২০-এ জুলাই রাজধানী দিল্লীর এক যক্ষ্মা হাসপাতালে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান। শ্রীদত্তের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সরকারী, বে-সরকারী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীদত্তের অন্তিম ইচ্ছানুসারে ফিরোজপুরে বিপ্লবী নেতা ভগৎ সিংহের সমাধির পার্শ্বে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সর্দ্দার ভগৎ সিং-এর সহকর্ম্মী ছিলেন বটুকেশ্বর। ১৯২৯ সাল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। এই দুই বিপ্লবীর দুঃসাহসিক কার্য্য-কলাপে সারা দেশ আলোড়িত হইয়া উঠে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কক্ষে ভগৎ সিং একটি বোমা নিক্ষেপ করেন। ঘটনাস্থলেই ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্ম্মী বটুকেশ্বর গ্রেপ্তার হন। প্রায় সমসাময়িক কালে লাহোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন দাসও ধরা পড়েন। লাহোরে বিচার আরম্ভ হয় (১৯২৯, ১০ই জুলাই)। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামী সহ ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত একসঙ্গে অনশন আরম্ভ করেন। ৬৩ দিন অনশনের পর যতীন দাস দেহত্যাগ করেন। যতীন্দ্রের আত্মত্যাগের ফলে সরকার রাজবন্দীদের দাবী মানিতে বাধ্য হন। এই

সময়েই জেলে রাজবন্দীদের শ্রেণীবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়। বিচারে ভগৎ সিং-এর প্রাণদণ্ড ও বটুকেশ্বরের সারা জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে আন্দামানের রাজবন্দীদের দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৯৩৮ সালে বটুকেশ্বর দত্ত মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর তিনি বিহারের অধিবাসী হন। ১৯৪৭ সালে বিবাহ করেন। বটুকেশ্বরের পৈতৃক নিবাস বর্দ্ধমান জেলার ওয়ারি নামক ক্ষুদ্র গ্রামে। এই গণ্ডগ্রামটি দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। পিতা স্বর্গত গোষ্ঠবিহারী দত্ত। জীবনের প্রথমে তিনি কানপুরে ছিলেন। সেইখানেই ১৯০৯ সালে বটুকেশ্বরের জন্ম হয়।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সৎকার্য্য :

প্রকাশ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁর বিভিন্ন সাহায্য তহবিল হইতে প্রতিদিন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে প্রায় পাঁচশো টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন। জানা যায়, এই দানের মোটা অংশ গরীব ছাত্রগণ পাইয়া থাকেন। বিষয়টির প্রচার না থাকায় অনেক ছাত্রবাই সম্ভবতঃ ইহা জানে না।

মহিলার শিক্ষানুরাগ :

শ্রীমতী অরুণা চৌধুরী ১৯৬৫ সালে ৫০ বৎসর বয়সে এবারে বি. এ পাশ করিয়াছেন। স্বামী যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কলিকাতায় সামান্য আর্থিক সংস্থান করিয়া পুত্রকন্যা লইয়া অতি কষ্টে সংসার চালাইতেছিলেন। যতীন্দ্রনারায়ণও দৃষ্টিহীন হইয়া পড়েন। শ্রীমতী অরুণা ৭ম শ্রেণীর বিদ্যা লইয়া সংসারের সমস্ত কাজ করিয়া ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করেন। ১৯৫৮ সালে স্কুল ফাইনাল এবং ১৯৬৩ সালে আই. এ. পাশ করেন। দুঃখ তাঁকে দমাইতে পারে নাই। তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার এই অধ্যবসায় অনুকরণীয়।

ছন্দগীতিকা :

প্রখ্যাত সঙ্গীত ও নৃত্য-শিক্ষায়তন ছন্দগীতিকা হইতে ১৯৬৪ সালের "সঙ্গীতশ্রী" উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কুমারী শিখা রায়চৌধুরী দ্বিতীয় বিভাগে কুমারী শিবানী সরকার, লীনা গুহ, মীরা দত্ত, মঞ্জুশ্রী বসাক ও তৃতীয় বিভাগে কুঙ্কুম চক্রবর্ত্তী উত্তীর্ণা হইয়াছে। কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছে—অঞ্জলি বসাক, পলি ও রীণা দত্ত ও "রবিদীপ্তি" ডিপ্লোমা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে বিজয়া সেনগুপ্ত ও নির্মলা চক্রবর্ত্তী এবং জুনিয়ার 'রবিদীপ্তি" ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছে অঞ্জলি বাষ।

পাকিস্তানের ন্যায়বিচার :

পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের জমিজমা ও ঘরবাড়ী প্রকারান্তরে গ্রাস করার জন্য পাকিস্তান সরকার "সংখ্যালঘু সম্পত্তি অর্ডিন্যান্স" নামে যে ফরমান জারি করিয়াছিলেন গত ১লা জুলাই ঢাকা হাই কোর্ট "শাসনতন্ত্র ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিরোধী" বলিয়া উহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা
=শুভবিবাহের বিচিত্র বেনারসী শাড়ী=
॥ বিভাগীয় বিপণি ॥
[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : ফোন ৩৩-২৩০৩
বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি বিচিত্র রুচিসম্মত শাড়ীর বিপুল সম্ভার।
আধুনিক ডিজাইনের হরেক রকম দেশী তাঁতের শাড়ী।
গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার প্রচুর আয়োজন।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকপিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি, টি, রোড ঃ ঃ বড়বাজার

উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে কয়েকটি ঃ

চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ঃ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ঃ দশন সংস্কার চূর্ণ ঃ
সারিবাদ্যারিষ্ট ঃ অশোকারিষ্ট ঃ ব্রাহ্মী ঘৃত (ছাত্র বন্ধু) ঃ মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

ঔষধের বিস্তৃত বিবরণী ও গুণাগুণের জন্য তালিকা দ্রষ্টব্য। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD.

Gram : 'PRABARTAK' Mg. Agents—PRABARTAK TRUST Phone : 34-3088 & 89

IMPORT :
Machineries
Papers, Boards,
Synthetic Resin
Milk products
Casein and Chemicals
and Sundry Goods.

Expert Buying Service available at a very Moderate Charge.

EXPORT :
Jute Manufactures
Shellac, Kapok,
Myrobalan,
Cattle foods.
Spices, Rosin and
other India Products

61, Bepinbehari Ganguly Street : : Calcutta-12

Codes used : A. B. C. 5th. 6th. & 7th. Edition; Bentley's Complete Phrase, Western Union, Universal and 5-Letter, Acme and Com. Phrase with Supplement; Schofields 3-Letter.

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিস্রুত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
ভারতীয় শিরঃরোগে অদ্বিতীয়

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশাস কলি:-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলি:-৬

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ **শব্দ তত্ত্ব** ১৫-০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲

॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০

॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

POLYTHENE PIPES
• Light Flexible
• Non-Corrosive
• Acid Proof
P.V.C. PIPES.

"SANKHA" COMBS
• Durable
• Comfortable
• Economic
Purnima TOOTH BRUSH

JESSORE COMB INDUSTRY Co.
• ESTD.1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO.-10813

সূচীপত্র · প্রবর্ত্তক : ভাদ্র : ১৩৭২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	১৮৭
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	১৮৮
বেদ-মীমাংসা	উদ্ধৃতি	... ...	১৮৮
সম্পাদকীয়		... ...	১৮৯
হেলেন কেলার-এর বাণী	উদ্ধৃতি	... ...	১৯৪
সমুদ্রশাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	১৯৫
শ্রীঅরবিন্দ-সরণি	জীবন-স্মৃতি	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	২০০
বাঙালী ওঠো	প্রবন্ধ	শ্রীউমাপদ নাথ	২০২
নয়া ভারতের শিক্ষা	আলোচনা	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	২০৪
আব্দার	কবিতা	শ্রীশশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য	২০৫
চলচ্চিত্রের গতি ও প্রকৃতি	প্রবন্ধ	চিত্ত কর	২০৬
তুমি কি ?	কবিতা	দীপ্তোৎপল রায়	২০৭
গতিশীল কর্মের নিতি নব চেতনা	কবিতা	শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার	২০৭
শ্রীশ্রী৺অর্দ্ধনারীশ্বর	নিবন্ধ	শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী	২০৮
তুচ্ছতার মহিমা	গল্প	ডঃ মতিলাল দাশ	২০৯
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	পুরাতনী	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	২১১
মহাকাল	কবিতা	শ্রীসত্যেন জানা	২১৪
চিঠিপত্র	চিঠি	শ্রীসুবোধ চক্রবর্ত্তী	২১৫
পঞ্চাশ বছর আগে	সঙ্কলন	শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত	২১৭
স্বামী চিদানন্দজী স্মরণে	স্মৃতিকথা	শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত	২১৮
সমালোচনা	...	... ...	২১৯
সাময়িকী	...	... ...	২২০

"নিমন"

আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অম্লজনিত দন্তের ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সুরভিত হয়।

আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা-১৭

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥

স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২-৫০

জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪-০০

Living Knowledge 4.00

(যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি বিশ্লেষণ নৈপুণ্য। মুমুক্ষু নিশ্চয়ই সাধনার আলো ও পথ পাইবেন)

॥ শুভঙ্করেব ॥

মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪-০০

(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)

॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত ॥

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

অভিজাত কেশ-তৈল
নগেন্দ্রনাথের
হিমকল্যাণ
বড়·মাঝারী·ছোট
তিন সাইজে
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
প্রাঃ লিঃ • কলি-৪
UPCO

॥ সদ্গুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০ ; **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲ ; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ ; **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত : "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণাঙ্গ ; নির্ভরযোগ্য বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি, রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
১২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

উৎসব অনুষ্ঠানে -
ইন্দ্র সন্দেশ
অপরিহার্য্য!

৮৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিঃ ৯
ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলিঃ ১২
ফোন-৩৪-২৫৩৩

স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ্
করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের

বিদেশে মোহনবাগান—৪-০০

বিভিন্ন দেশে মোহনবাগান ক্লাবের রোমাঞ্চকর সফর কাহিনী। বহু চিত্র ও অজানা তথ্যসমৃদ্ধ। সহজ সাবলীল। রম্য-রচনার ভঙ্গী। ফুটবল খেলার এ-দেশ ও-দেশের তুলনামূলক সমালোচনা-বই এই প্রথম। সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিঃ-১২

৫০ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা | স্বুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৭২

জীবনের আলো

অরুণ আভাষের নবানুরাগ আধো লালিমায় উদ্ভাসিয়া আমার অন্তরে কি এ জাগিতেছে রে? কল্পনা? চিত্ত-চমৎকারী অফুরন্ত স্রোতঃরাশির ওই অগাধ সাগর সঙ্গম? কামনার সহিত কাম্যের ওই আলিঙ্গন? তোরা যা বলিবি বল—আমি আজ তারে লইয়া অন্তর্মগ্ন, বিভোর, নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইব। বাহিরের সকলখানি নিমগ্ন করিয়া দিব; তাহারই অতল তলে। সেই অগাধ জলে কুতূহলে আরাধনা করিব আমিহারা আমির।··· আমার কি যে ছিল, কি যে গেল, কি যে কি হইলাম—না, কিছুরই সুশৃঙ্খল স্মৃতি নাই। সব এলোমেলো, সব ঝাপসা। হে আমার অন্তর্য্যামি! এমন করিয়া আমার অস্তিত্ব লোপ করিতেছ কেন? কি সাজাইবে প্রভু? কি তোমার চাওয়া? ওগো কি তোমার লক্ষ্য? কেন এই আমার মধ্যে এমন একটা স্বতন্ত্র জগতের সৃষ্টি করা? জগতেরই তো ছিলাম গো? তাহাকে বঞ্চিত করিয়া, তাহারই মধ্যে আমি এ কাহার আমি? হৃদয়স্রোত যে বিশ্বস্রোতের প্রতিকূলে বহে। গতিভঙ্গে তরঙ্গ নাই, তবুও এত টান, এত খরবেগ? আর ওই? লক্ষ্য-মুখে ওই যে দিক্‌চক্রবালে ভাসা ভাসা অনন্তের আভাস! ওই কি আমার দেশ, আমার পথ?···ওই মহাশূন্যেই আমি বীজ বপন করিয়া চলিলাম। আমার সমস্তই বায়ুস্তরে মিশিয়া রহিল। অঙ্কুরোদ্‌গম বৃক্ষের মত আমার মানসী পৃথিবী আপনা হইতেই গজাইয়া উঠিবে—গড়িবে আবার কে? অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াই না তাহার মাটি প্রস্তুত করিলাম, সে তো কাহারও "আমি করিলাম" দাবীর গণ্ডীতে আসিবার নয়।···আজ বিজ্ঞানই ভাল। নয়নের অন্তরালই শ্রেয়ঃ। আমি সবার অলক্ষ্যে আমার মানসী প্রতিমা গড়িয়া চলিয়াছি। অসার্থক জগৎকে সার্থক করিতেই তো আমাব এই জগৎ-অতীত প্রয়াস। ওগো তোমরা কেউ আমায় ফিরাইতে চাহিও না। আমাকে খরবেগে বহিয়া যাইতে দাও। স্রোতোবেগ আমায় চূর্ণ করুক, হত্যা করুক। আমার হৃদয়-রক্তে সমস্ত বসুন্ধরা রাঙা হইয়া উঠুক—তবুও আমার চরণ টলিবে না—নিমেষ পড়িবে না। জগৎ আমায় আবৃত করিতে পারিবে না—আমিই দিনে দিনে জগৎকে আবৃত করিয়া ফেলিব; বিরামহীন গতি আমার। আমার এই লৌহকঠোর, এই গুমরিত হৃদয়—তোমার ঐ অনির্ব্বচনীয় অসাধারণের অবতরণবেগ বহিতে স্পন্দনে স্পন্দনে যেদিন ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইব—সেদিন যেন কোন অজানিত জগৎ হইতে দৈববাণী শুনিতে পাই—জগৎ তোমাকে পাইবে, পাইবে, পাইবে!! (৫ম বর্ষের প্রবর্ত্তক হইতে) **সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল**

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। অষ্টত্রিংশৎ সূক্তং।) নবমী ঋক্

(সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

। । । । ।
দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জ্জন্যেনোদবাহেন।

।
যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি ॥ ৯ ॥

অন্বয়—"চিৎ" (চিন্ময় অর্থাৎ প্রকাশশীল কারণ জগৎ) "তমঃ" (রাত্রি) "দিবা" (আলোকোজ্জ্বল অন্তরীক্ষ লোক বা সূক্ষ্ম জগৎ) "কৃণ্বন্তি" (সৃষ্টি করে) "উদবাহেন পর্জ্জন্যেন" (উদকবাহী মেঘসকলের দ্বারা) "যৎ" (যেখান হইতে) "পৃথিবীং" (ধরিত্রীকে) "ব্যুন্দন্তি" (অভিষিক্ত করে) ॥ ৯ ॥

সরলার্থ—কারণ জগৎ রাত্রিস্বরূপ। সূক্ষ্ম জগৎ বা অন্তরীক্ষ লোক উহা হইতেই সৃষ্ট হয়। উদকবাহী মেঘসকলকে যেখান হইতে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে।

বিশদার্থ—'চিৎ তমঃ, দিবা কৃণ্বন্তি'—এই সংক্ষিপ্ত মন্ত্রে ঋষি কারণ ও সূক্ষ্ম জগতের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

চিৎ শব্দে ঋষি বিশুদ্ধ চিন্মাত্র শক্তি-স্বরূপ কারণ জগৎকে বুঝাইয়াছেন। ইহা বিশুদ্ধতম আকাশ—যাহা শুধু ঘন অগ্নি-কণিকার দ্বারা পূর্ণ একটি অখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় সত্তা মাত্র। ইহাকে চৈতন্যের একটি জলন্ত মূর্ত্তিও বলা যায়। চেতনার জগতে ইহা ভাস্বর, জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু জড়দৃষ্টিতে ইহা অন্ধকারময়, তমোলোক। কেননা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি যতদূর চলে—এমন কি দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যেও যতদূর দেখা যায়—তাহা দিয়াও এই জগৎ দেখা যায় না—তাই ইহা তমোময় রাত্রিস্বরূপ। তারপর এই অন্ধকারময় বিশুদ্ধতম আকাশরূপী কারণ জগৎ হইতে 'দ্যৌঃ'—অর্থাৎ দিবা, অন্তরীক্ষ লোক বা সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি। মন্ত্রমুখে ইহা 'দিবা কৃণ্বন্তি'। এই জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই জগতেই সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র, গ্রহনক্ষত্র বিরাজিত। এই 'দিবা' অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক আলোকোজ্জ্বল। ইহাকে সৌরমণ্ডলও বলা হয়। এইখানেই উদকবাহী পর্জ্জন্যের উদ্ভব—যাহারই ধারা বর্ষণে পৃথিবী অভিষিক্ত।

"বৈদিক সাহিত্যে অধ্যাত্ম সাধনার যে রূপটি আমরা দেখতে পাই, তার মূলে রয়েছে দেববাদ। দেববাদের ভিত্তি হল 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধা মানব চিত্তের মৌলিক বৃত্তি, অতীন্দ্রিয় একটা কিছুকে পরাক দৃষ্টিতে অনুভব করা হল তার বিশিষ্ট রূপ। তার মূলে রয়েছে 'আবেশ'। এরই পাশাপাশি মানব চিত্তের আরেকটি বৃত্তি রয়েছে, যাকে অতি প্রাচীনকালে বলা হত 'ওহ' বা 'উহ', পরে বলা হয়েছে 'তর্ক'। তর্কের দৃষ্টি প্রত্যক্‌বৃত্ত। তার মূলে আছে 'জিজ্ঞাসা"। সাধনার দিক দিয়ে তার পরিণাম আত্মবাদে। দেবতাও অতীন্দ্রিয়, আত্মাও অতীন্দ্রিয়। সুতরাং দেবদর্শন ও আত্মদর্শন দুয়েরই পথ তুল্যভাবে অতিপ্রাকৃত। তবুও মানুষ দেববাদী বা আত্মবাদী হয়—স্বভাব অনুসারে। আত্মবাদী সংশয়কে নিমিত্তরূপে ব্যবহার ক'রে অধ্যাত্ম ভাবনার সমস্ত অস্পষ্টতাকে দূর করতে চান। তাঁর সংশয়ের আঘাতে ভাবনার পরাক্-বৃত্ত সব অবলম্বন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, থাকে শুধু আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়ের মূলে যদি আত্মপ্রসারণের প্রেরণা থাকে, তা হ'লে আত্মবীর্য্যের বলেই তিনি একদিন চেতনার চরম বিস্ফোরণে পৌঁছে বলতে পারেন 'এই সত্য'। দেববাদীও এই বৃহৎকেই পান—কিন্তু পান হৃদয়ের আবেগ দিয়ে, বোধিগ্রাহ্য বস্তুরূপে। আর আত্মবাদী পান বীর্য্য দিয়ে, নিজেরই আত্ম-রূপায়ণরূপে। বেদের ভাষায় একজন আবেগকম্পিত 'বিপ্র', আরেকজন পৌরুষদৃপ্ত 'নর'। একজনের প্রাপ্তির সাধন শ্রদ্ধা এবং বোধি, আর একজনের তর্ক এবং বুদ্ধি।"

বেদ-মীমাংসা : অনির্ব্বাণ

সম্পাদকীয়

ভারত কোন্ পথে ?

দুইটি মত। দুইটি পথ।

দুইটি জীবনাদর্শ। দুইটি জগৎ দর্শন।

একটি প্রজ্ঞানের—চেতনানুগত্যের। একটি অজ্ঞানের—জড়-দর্শনের।

একটি ধর্ম্মমানস ও অধ্যাত্ম-সচেতন শাশ্বত সনাতন ভারতবর্ষের। অপরটির জড়ীয় বিজ্ঞানমানস ও বিজ্ঞান-সচেতনতার চরম প্রতীক রাশিয়ার।

এই দুইটি মত ও পথের চিত্র :

কাম্যক বন। বনবাসী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আগন্তুক এক মহর্ষির সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, 'দেখুন ঋষি! আমার পত্নী দ্রৌপদীর পাতিব্রত্য কিরূপ অসাধারণ, আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বনে আসিয়া বনবাসের অকথ্য ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করিতেছেন।' ঋষি উত্তর করিলেন, 'রাজন্! দ্রৌপদীর চেয়েও অধিকতর পতিব্রতা নারী এই পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সতীকুল শিরোমণি লোপামুদ্রা, অহল্যা, সাবিত্রী, সীতা—ইঁহারা প্রত্যেকেই পতিব্রতা-ধর্ম্মে দ্রৌপদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

মহাভারতের বিরাট পর্ব্বের মহর্ষি-বর্ণিত এই সতী-চরিত্রের মহিমা-কাহিনী আজও ভারত-নারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রেরণার উৎসরূপে বিদ্যমান। আজও প্রাতঃস্মরণীয়া।

অপর চিত্রটি হইতেছে : "আমরা নতুন কলম্বাসের দল, নবভাবে অনুপ্রাণিত আমরা চারণদল, আমরা এক নতুন মানবজাতির বীজ। স্ফীত ফাঁপা বুর্জোয়া সমাজ তার সমস্ত কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলুক—এই আমাদের দাবী। অতঃপর পুণ্য বলতে আর কিছু থাকবে না। পরিবার, সম্পত্তি, সামাজিক বন্ধন, বিবাহ—এ সমস্তই লোপ করে দিতে হবে, এ হল আমাদের দাবী। নরনারী হবে মুক্ত, বন্ধনহীন, উলঙ্গ। যৌনসম্পর্ক ব্যক্তিগত না হয়ে হবে সামাজিক। যুবক-যুবতী, নর-নারী শ্বাসরোধকারী অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এস, মুক্ত হও, সুখী হও, সূর্য্যালোকে দাঁড়িয়ে বন্ধনহীন বন্য জন্তুর মত আনন্দে নৃত্য কর *।"

এই উলঙ্গ যুবক-যুবতীর বন্য জন্তুর মত আনন্দ-নৃত্য-প্রেরণার উৎস নিহিত ইহসর্ব্বস্ব রুশ-বিপ্লবের নাস্তিক্যবাদে। বিপ্লবনায়ক লেনিনের জীবন-দর্শন : "Our revolution will never succeed untill the myth of God is removed from the mind of man."

প্রশ্ন জাগে, বিশ্বমানব কল্যাণের শ্রেয়ঃ পন্থাটি কি—ইন্দ্রিয়সংযম-শাসন, না ইন্দ্রিয়ানুগতা, শাসনহীন বন্ধনহীন পাশবিক উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারিতা ? সংক্ষেপে—ভারতের শাস্ত্রানুশাসিত পথ—না বৈজ্ঞানিক প্রগতিবাদী পাশ্চাত্ত্যের পথ ?

সুখ শান্তি আনন্দ মানবমাত্রেরই কাম্য। সুখ-শান্তির স্বরূপটির বোধ প্রাচ্য-প্রতীচ্যে বিভিন্ন। জন্ম ও জীবনের প্রয়োজন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীও স্বতন্ত্র। দেহ-সর্ব্বস্বতা ও দেহাতীত সত্তার দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার এই পার্থক্য। একটি ইন্দ্রিয়জ, অন্যটি ইন্দ্রিয়াতীত। দেহসর্ব্বস্বতাকে ভারতবর্ষ পশু আখ্যা দিয়াছে। মানুষ জন্মগ্রহণ করে পশু হইয়া, দেহকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি লইয়া। সাধনা দ্বারা পশুর মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটে। দেহাত্ম বুদ্ধি যেখানে সেখানেই গতি, চাঞ্চল্য আর স্নায়বিক উত্তেজনাকে সুখ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। জন্ম ও জীবনের চরিতার্থতা আবর্ত্তিত হইয়া থাকে এই ইন্দ্রিয়জ ভোগ-সুখের মাঝে। এ ক্ষেত্রে পশুটা ফাঁপিয়া ফুলিয়া বৃহদাকার হইয়া থাকে। উত্তরণ-সাধনার প্রবণতা আসে জন্ম ও জীবনের মৌলিক প্রয়োজন জ্ঞানে। গীতা শাস্ত্রে এই জ্ঞানার্জ্জনের দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে—'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়।' শাস্ত্র-অনুশাসিত

* ১৯৪৩ সালের ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট গ্রন্থকার অ্যালেক্সি টলষ্টয়-এর 'অগ্নিপরীক্ষা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

শীলসম্মত পথে ও প্রাজ্ঞদর্শীর মতে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন নিরূপণের প্রথম ধাপ। তারপর হইতেছে ইন্দ্রিয়সংযম। ইহাই সনাতন ভারতবর্ষের—মানব-উজ্জীবনের রাজপথ।

●

ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ দ্বিতীয় পন্থার অনুগামী হইয়াছে। 'স্ব'-এর অধীনতার মধ্যেই স্বাধীনতার সত্যকার তাৎপর্য্য নিহিত। আত্মবিকাশের অবাধ সুযোগ আনিয়া দেয় পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্তি। স্বাধীনতা কথাটির ঠিক প্রতিবোধক শব্দ অ-ভারতীয় কোন পরিভাষায় মিলিবে না। Indepence হইতেছে পরনির্ভরতা হইতে মুক্তি। 'Liberty' (Latin Libertine) অর্থে উচ্ছৃঙ্খলতা। গ্রাসাচ্ছাদন, ইন্দ্রিয়জ ভোগবিলাস অনাত্মধর্ম্মী রাষ্ট্রের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত। এবং এই প্রয়োজনটি মিটাইবার সুযোগ-সুবিধা স্বাধীনতা আনিয়া দেয় বলিয়াই ও-দেশে স্বাধীনতার এত কদর। ভারতবর্ষের ভাবনায় স্বাধীনতা স্বকীয় জীবন বিকাশের লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র। স্বাধীনতাই (রাজনৈতিক মুক্তি অর্থে) স্বাধীনতার লক্ষ্য নহে। একটা জাতির মৌলিক সাংস্কৃতিক জীবন, তার 'Soul' বা 'Life idea'র বিকাশ বা স্ফূর্ত্তিকে নির্ব্বাধ করিয়া দেয় বলিয়াই স্বাধীনতা এত পরম আদরের। মৃত্যুপণেও ইহা রক্ষণীয়। ভারতবর্ষের এই অধ্যাত্ম ও ধার্ম্মিক সংস্কৃতির মূল সমাজজীবনের এত গভীরে অনুস্যূত যে, শত-শত বছরের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা, পীড়ন ও বারবার বিজাতীয় বহিরাক্রমণও ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে পারে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এই ধ্রুবা নীতির পথে চলার নজীর বিশ্বের আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সুগভীর সাংস্কৃতিক নোঙর-বিচ্ছিন্ন যে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাহা দীর্ঘ পরাধীনতা ও পরপীড়নে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না—যাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে।

স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ১৮ বৎসরে ভারত রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ, তার মতিগতি ও নীতি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা দ্রুত আত্মহত্যার পথেই ধাবমান হইয়াছে। আত্মবিলুপ্তি অর্থে ইহা নয় যে, ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও অধিবাসী, তার প্রাকৃতিক সম্পদ শূন্যে উবিয়া যাইবে। সবই থাকিবে, কিন্তু ইহার কালজয়ী সঞ্জীবনী প্রাণরসটির অভাব হইবে। ভারতভূমি থাকিবে কিন্তু ভারতত্ব মরিবে। এই অধ্যাত্ম-ভারত মরিলে বিশ্বমানুষের আদর্শ-গগন হইতে দিব্য জীবনের দিক্-দিশারী এক অদ্বিতীয় আলো নিভিবে। এ আলো জ্বালাবার মত ভারত ব্যতীত আর কোথাও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবচিত্ত অনুকূল নহে। ইহা ভারতের মানব-ভাগ্যবিধাতা নির্দ্দিষ্ট মিশন। শেক্সপীয়ারের কথা: Some are born great, some achieve greatness and some have greatness thurst upon them." ব্যক্তির পক্ষে যা সত্য একটা জাতির পক্ষেও তা সত্য হইবে না কেন? এ আমাদের শুধু বাগাড়ম্বর নহে, মোহমুক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টির বিচারে ইহা সুনিশ্চিত ধরা পড়িবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র মানবজাতির এক মহান ভবিষ্যৎ গঠনের সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যতের বনিয়াদ রচিত হইয়া থাকে বর্ত্তমানের চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতি ও কার্য্যপ্রণালীর উপরই। ইহা সুনিশ্চিত যে, আজকে ভারত রাষ্ট্রের বুদ্ধিভ্রষ্ট বিভ্রান্ত কর্ণধারেরা যে নীতি ও কার্য্যক্রম অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে ভারতের আত্মহত্যার পথই ত্বরান্বিত হইতেছে।

●

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের সর্ব্বাত্মক পরানুকরণতার মধ্যে মারাত্মক অনুকরণ হইতেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ। একটা দেশের সুখ-শান্তি-সম্পদ অবশ্যই নির্ভর করে সেই দেশের জনসংখ্যা ও উৎপাদন ক্ষমতার সামঞ্জস্যের উপর। ইহার ব্যতিক্রম হইলে জাতীয় উন্নতির সকল রকম প্রযত্নই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এইজন্যই ভারত গবর্ণমেণ্ট জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে সমস্ত সমস্যার মধ্যে প্রথম স্থান দিয়াছেন (Problem number one)। পরিবার-পরিকল্পনা সম্বন্ধে ডঃ সি. চন্দ্রশেখর একটু রসিকতার সঙ্গেই মন্তব্য করিয়াছেন: "India's bedrooms are the key to her biggest problems. What goes in the privacy of these

four walls results in 10 million additional mouths each year." জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত "key to her biggest problem", কিন্তু প্রশ্ন, কি ভাবে উহা করণীয়? আমাদের সরকার নির্বিচারে পাশ্চাত্যের পথটি ধরিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য, উহা ভারতীয় মৌলিক জীবনাদর্শ-সম্মত ভাবে করার সুযোগ স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিল। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারী পরিকল্পনা, রীতি-নীতি ও মনোভাবটি কি, তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপত্র 'কথাবার্তা' (৮।১।৬৪) হইতে নিম্নোদ্ধৃতিতে পরিষ্কার হইবে:

"ভারতে যথাশীঘ্র সম্ভব জন্মহার ৫০ শতাংশ হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে সকল রাজ্যসরকারকে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যসূচি দ্রুত রূপায়ণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯০ শতাংশকে পরিবার নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং ছোট পরিবারের উপকারিতা বোঝানো হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমগ্র দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম প্রতিটি দেশবাসীর কাছে সহজলভ্য করবার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

"পরিবার-পরিকল্পনা মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করেছেন যে, চতুর্থ এবং পরবর্তী কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণ কার্যসূচিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। তা ছাড়া, চতুর্থ পরিকল্পনায় যে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে তা ১৫ বৎসর মেয়াদী পরিকল্পনা হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বিচার ক'রে এই কার্যসূচী স্থির করতে হবে।

"আরও জানা গিয়াছে যে, আজকাল ৭০ ভাগ বিবাহিত ব্যক্তিই ছোট পরিবারের পক্ষপাতী। ৩৫ বৎসরের ঊর্ধ্বের যে-সকল মহিলার চারটি সন্তান আছে, তাঁরা পরিবার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শিক্ষা করতে ইচ্ছুক। পল্লী অঞ্চলের প্রায় ২০ শতাংশ বিবাহিত মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শিক্ষা করেছেন। ধর্ম কিংবা সামাজিক প্রথা এর বিরোধী নয়। দিল্লীতে কয়েকটি পরিবার-পরিকল্পনা ক্লিনিকের হিসাবে দেখা যায়, জন্মনিরোধক দ্রব্যাদি ব্যবহার ক'রে শতকরা ৮৫ জনের গর্ভনিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

"বর্তমানে এদেশে ৯,০৯০টি কেন্দ্রে পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ৭,০০০টি আছে পল্লী-অঞ্চলে। ১৯৬২ সালে ১,২৯,৫১৪টি ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার ক'রে প্রজনন ক্ষমতা রহিত করা হয়। প্রতি হাজারে ছ' জনের উপর এই অস্ত্রোপচার করবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তারদের দিনে এরূপ ১০টি অস্ত্রোপ্রচারের জন্য ১,০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। বহু হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি-সদনে বিনাব্যয়ে এই অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের এই অস্ত্রোপচারের জন্য ছ' দিন বিশেষ ছুটি, বিনা ব্যয়ে যাতায়াত এবং ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়।"

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের অগ্রগতির পরিচয়ও এখানে দেওয়া হইল:

কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পরিবার-পরিকল্পনার কাজ সুরু হয় ১৯৫৫ সালে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত সরকারী-বেসরকারী পরিবার পরিকল্পনার কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল মোট ২১৪টি—সহরে ৯৩টি এবং গ্রামাঞ্চলে ১২১টি। এই সময়ের মধ্যে মোট ১৭,৫৩৩ জনের (স্ত্রীলোক ৯,০৪২, পুরুষ ৮,৪৯১) শল্য চিকিৎসা দ্বারা সন্তান প্রজনন ক্ষমতা বন্ধ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপযোগী জিনিষগুলি পল্লী অঞ্চলে বিনামূল্যে বিতরিত হয় এবং সহর অঞ্চলে মাসিক আয়ের অনুপাতে বিনামূল্যে, অর্দ্ধমূল্যে বা পূর্ণমূল্যে দেওয়া হয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে: (ক) জনসাধারণের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার বিষয় ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, (খ) জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দেশের প্রতিটি লোকের সহজলভ্য করা; (গ) নিঃখরচায় সহজে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধ্যাকরণের সুযোগ দেওয়া; (ঘ) কর্ম্মিদের প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করা।

এই জন্মনিয়ন্ত্রণকে সহজ ও সফল করিয়া তুলিবার

জন্য পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি গবেষণা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। নূতন নূতন সহজ উপায় আবিষ্কার করাই ইহার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে ফ্রেঞ্চক্যাপ, বিচিত্র কণ্ট্রাসেপ্টিভ, ভাসেক্টমি, লাইগেশন, আই. ইউ. ডি (I. U. D.), অস্ত্রোপাচারে বন্ধ্যাকরণ প্রভৃতি জন্মনিরোধক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি উনোর (U. N.) প্রস্তাবিত 'লুপ'-এর কথায় মানুষ মুখর। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ইহার বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে। 'Loop' হইতেছে 'Intra uterine contraceptive device.' কথাটা বাংলায় লিখিলে সাহিত্যে হয়তো অশ্লীল বলিয়া অবজ্ঞেয় হইবে। তথাপি জোর প্রচারের দ্বারা আমাদেরই ঘরের বধূদের প্রকাশ্য ডাক্তারখানায় ডাক্তারের সাহায্যেই ইহা করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

●

জন্মনিয়ন্ত্রণের কুফল সম্বন্ধে এখানে একজন অভিজ্ঞের (ডাঃ প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়) অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত (মন্দির?) করিতেছি:

"আমাদের দেশে দিন দিন জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। বেকার সংখ্যা বাড়িতেছে। খাদ্য বাড়িতেছে না। খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হই নাই। খাদ্য আমরা আমদানী করিতেছি অন্য দেশ হইতে। এই জনসংখ্যা বাড়িবার কারণ কি? বেকার জীবন, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অতিরিক্ত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ, সুশিক্ষা ও সংযমের অভাব প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই যন্ত্রের যুগে, এই যন্ত্রসভ্যতার যুগে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, যন্ত্র-সভ্যতা মানব কল্যাণে না মানবের ধ্বংস সাধনে অগ্রসর হইতেছে। সাধারণ মানুষ মনের কি উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে? যন্ত্র মানবকে চালাইতেছে না মানব যন্ত্র চালাইতেছে? বর্ত্তমানে দেখিতেছি মানবও যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মানুষ যন্ত্রের সাহায্য লইতেছে। ভোগ-লিপ্সা যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত। ভোগ করিব, কিন্তু ফলের আশা করিব না। সুখের ভাগী হইব, দুখের ভাগী হইব না। পীরিতি করিব গায়েতে আঁচড় লাগাইব না। বুঝিলাম না এ অন্ধ।

"মানুষের জীবন গতিশীল ও সচল। তাহাকে কোন রূপেই বাধা দেওয়া উচিৎ নয়। কামরোধকে একেবারে বন্ধ করা উচিৎ নয়। বন্ধ করিলে নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। যৌনক্ষুধা মানুষকে উদ্দীপনা ও উৎসাহ দান করে। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণে মেয়েদের ক্ষেত্রে জরায়ুর দুই নল কাটিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাকে 'লাইগেশন' বলে। এই লাইগেশনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে উহার কি কুফল পাওয়া যাইবে তাহা বলিতেছি: (১) দেশের নৈতিক পতন; (২) বুদ্ধিমান শ্রেণীর ক্রমশঃ হ্রাস ও শ্রমিক শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাধিক্য; (৩) নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধির প্রাবল্য যাহার কোন চিকিৎসা নাই; (৪) ক্যানসার রোগের দ্রুত প্রাদুর্ভাব; (৫) আরও বহু রোগের উপসর্গ। এই সম্পর্কে আমি বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

"আমি প্রায় শত শত রোগী 'লাইগেশন'-এর পর দেখিয়াছি। সেই রোগীদের নিজস্ব মত বলিতেছি। কোন রোগী বলিয়াছে জীবনটা বৃথাই গেল, সুখ নাই শান্তি নাই, সহবাসের কোন স্পৃহা নাই। স্বামীর যেন যন্ত্র আমি। কোন রোগী বলিয়াছে তাহার যৌন প্রদেশ শুষ্ক। কেহ কেহ ঋতু হবার আগে ও পরে অসহ্য পেটের বেদনা অনুভব করে। কাহারও রক্তস্রাব কমে, আবার ঋতু আরম্ভ হয়। একটি ক্ষেত্রে দেখিয়াছি দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা 'লাইগেশন'-এর পর মারা যাইলে মাতা পাগল হইয়া গিয়াছে। যতদিন যাইবে উপসর্গ ততই বাড়িয়া চলিবে। কেহ কেহ বলিয়াছে ছেলেমেয়েদের উপর আর যেন আগেকার মায়া মমতা নাই। মনটা যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে।"

●

জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা জনসংখ্যা বৃদ্ধির রোধ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। কথা উপায় লইয়া। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাহার প্রকৃতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী যাহা করিয়াছে তাহা ভারতেরও করিতে হইবে, এমন বাধ্যবাধকতা নাই। রাজনীতির নেশা আমাদের শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। পশ্চিমী রাজনীতি ও অর্থনীতির ধারণা, সম্বেগ ও নির্ব্বিচার

অনুকরণ ভারতের সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল ধারা হইতে ভারতকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। পাশ্চাত্ত্যে জড়বাদী বৈজ্ঞানিক প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে জগৎ, জীবন, ইতিহাস, সমাজ সবকিছুকে যান্ত্রিক জড়-ভিত্তিক (mechanistic, materialistic) ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝানো হইয়াছে। সর্ব্বোপরি কার্ল মার্কসের দর্শন—অর্থনীতিই (দ্রব্যোৎপাদন ও বণ্টন) যুগে-যুগে সমাজ-পরিবর্ত্তনের একমাত্র সক্রিয় শক্তি—ওদেশের জনমানসকে ইন্দ্রিয়ানুগতায় অভিভূত করিয়াছে। সুতরাং উহারই অন্ধ অনুকরণ এদেশকেও ইন্দ্রিয়ভোগপরতন্ত্র করিয়া তুলিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

স্বাধীনতার পরে আত্মসংগঠনের অধিকার যখন আমরা পাইলাম, তখন আত্মবিকাশের স্বকীয় ধারাটির বিষয় আমাদের ভাবা উচিৎ ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র-কর্ণধারগণের সে প্রজ্ঞা ও সৎ সাহস ছিল না বলিয়াই তাহা বিবেচনার মধ্যে আসিতে পারে নাই। ইহা বিকৃত মানসেরই পরিচয়। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র সব মিলাইয়া মিশাইয়া আমরা একটা খিঁচুড়ী পাকাইয়াছি। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হইয়াও, আজ ব্যক্তির পছন্দ, রুচি, বিচার-বিবেক, পথ নিরূপণ, দ্রব্য, দ্রব্যমূল্য সবকিছুর মানদণ্ডের নিয়ামক রাষ্ট্র। সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিধি পারিবারিক জীবনের স্বাধীনতাই শুধু ক্ষুণ্ণ করে নাই, রান্নাঘর হইতে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত নিশীথের শয়নকক্ষ (ডঃ চন্দ্রশেখরের কথায়) পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

বিচিত্র জাতি-ধর্ম্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আশা করা গিয়াছিল যে, এখানকার বিধি-বিধান সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযুজ্য হইবে। কিন্তু হিন্দুকোড বিল প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। দুর্ব্বলতায় যে রাষ্ট্রের জন্ম তার কাছে এই সাম্যশক্তির আশা করা যায় না। তাই অনেক ভুক্তভোগীর আশঙ্কা যে, হিন্দুরা হুজুগে পড়িয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ করিবে আর মুসলমানেরা মনের আনন্দে বংশবৃদ্ধি করিয়া চলিবে। শুক্রবারে মস্‌জিদে মোল্লার ফরমান যদি জারী হয়, জন্মনিয়ন্ত্রণ গুণাহ্, তাহা হইলে সরকারী প্রচারে মুসলিম জনসাধারণ জন্মনিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। গুণগত বিচার যেখানে নাই সেখানে সংখ্যার জোরেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা সহজ হইবে। অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভারত রাষ্ট্রের দৌর্ম্বল্য, দ্বিধাগ্রস্ত দুর্ব্বল রীতিনীতির অভিজ্ঞান হইতে এই আশঙ্কাকে অমূলক বলিয়া সরাসরি উড়াইয়াও দেওয়া চলে না।

●

একটা দেশ বা জাতির স্বকীয় মিশন সম্বন্ধে সচেতনতা না থাকিলে অসংখ্য সমস্যার পঙ্কের মধ্যে পথের সন্ধান মিলে না। প্রাণেরও সঞ্চার হয় না। মানবসভ্যতার বিবর্ত্তনে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট এবং মহত্তম দান আছে। এই অবদান শাশ্বত, সর্ব্বগ্রাসী এবং সর্ব্বকালের মানব-সমুন্নয়নের উপযোগী। দীর্ঘ পরাধীনতা, কালের ঘাত-প্রতিঘাতে উহা আজ বিস্মৃতপ্রায় হইলেও, যে মুমূর্ষু কঙ্কালে ঐ শাশ্বত সনাতন সত্য অবধৃত তাহাকেই নবযুগের উপযোগী রূপান্তর সাধন না করিতে পারিলে ভারত-জাতীয়তার সত্যকার প্রাণের স্ফূর্ত্তি ও সংবেগ আসিতে পারে না। ইহারই আভাষ এই বিংশ শতাব্দীরই দুই জন স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রপুরোহিত দিয়া গিয়াছেন :

"The function of India is to supply the world with a perennial source of light and rennovation, whenever the first play of energy is excuated and earth grows old and weary, full of materialism, racked with problems he can not solve, the function of India is to restore the youth to mankind and assure it of immortality."

—Sri Aurobinda

"শুধু সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থসিদ্ধিই যদি হয় কোন জাতির অভিপ্রায় তাহলে সে জাতির বাঁচবার অধিকার নেই। একটি জাতি বড় হবার আকাঙ্ক্ষা করবে

মানবতাকে মহত্তর করে তুলবার জন্য—যেন এই পৃথিবী সুন্দর কল্যাণময় আবাসস্থলে রূপান্তরিত হতে পারে।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতবর্ষ তথা ভারত জাতীয়তার এই সুমহান উজ্জ্বল চিত্রটি অনুধ্যান করিলেও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আসে। কোন 'বাদ' অথবা কোন রাষ্ট্র বা অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রশ্ন নাই। প্রশ্ন—কি ধরণের মানুষ উহার পরিচালক? প্রয়োজন, সংযমপূত ত্যাগী ও প্রাজ্ঞ-শাসিত সমাজ এবং এইরূপ সমাজনিয়ন্ত্রিত অর্থ ও রাষ্ট্র। কি রকম মানুষ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠ? ভারতবর্ষ (গীতা) ইহার উত্তর দিয়াছে: 'বশে দি যস্যেন্দ্রিয়াণী তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'। ইন্দ্রিয়জয়ী যিনি তিনিই প্রজ্ঞাবান্। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ খানিকটা তপস্যা ও সঙ্কল্পশক্তিসাপেক্ষ। ভারত-রাষ্ট্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণকল্পে যে যান্ত্রিক জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের পথ অবাধ রাখিয়া মানুষকে পশুধর্ম্মে অবনত করার সুব্যবস্থাই করিতেছেন। সঙ্কল্পহীন, ইচ্ছাশক্তিবিহীন, বানরের মত চঞ্চল আর চড়াই পাখির মত কামুক দেহকেন্দ্রিক মানুষের সমাজ বা জাতির কি আত্মরক্ষা করিবার মত মেরুদণ্ড ও বীর্য্য থাকিবে? ফাঁসির মঞ্চে কি এই ভীরু আদর্শহীন স্বপ্নবিহীন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র তরুণের ওজন বেশী হইবে, এমন কল্পনা করা যায়? এই ভোগ-সর্ব্বস্ব মনোভাব সমাজে শ্বাসরোধকারী পাপচক্র আনিতে বাধ্য যা আজকের দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। ভাবী-কালের উত্তরাধিকারী ক্ষমতায় মোহমত্ত হইয়া যারা আজকে এমনভাবে 'বিষাইছে বায়ু আর নিভাইছে আলো' তাদের নিশ্চয়ই অভিশাপ দিবে।

ভাবিলে মন নৈরাশ্যে পীড়িত হয়, চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু ভরসার বাণী ভারতের অধিদেবতা বারবার শুনাইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তারকেশ্বর মঠের মোহন্ত জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রী১০০৮ দণ্ডিস্বামী জগন্নাথাশ্রম মহারাজ 'হিন্দুকোড' বিল সম্পর্কে যে মন্তব্য (হিন্দুধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সমাজ পুস্তিকা) করিয়াছিলেন সেই আশার বাণীই আমরা স্মরণ করিব: "কিন্তু সব সময় মনে রাখিতে হইবে এ ভারতবর্ষ। ধর্ম্মরক্ষার্থ শ্রীভগবান এই ভূমিতে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি করিবার আয়োজন 'হিন্দুকোড' বিলে কর্ত্তারা সম্পূর্ণ করিয়াছেন—এবার দেবতার পূজা নিষেধ এবং ভারতের কয়েক লক্ষ সাধুদিগের বিবাহের বিল আনিলেই ষোল-কলায় পূর্ণ হইবে। আশা করি শীঘ্র কর্ত্তাদের সেই সুমতির উদয় হইয়া শ্রীভগবানের আগমনপথ পরিষ্কার করিবেন। বক্তব্য এই যে, পিপীলিকা হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, তিনি নিদ্রিত নহেন, বেশী দিনের দেরী নাই। সম্মুখের দশ বৎসরের মধ্যেই পৃথিবী নূতনভাবে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে। অধর্ম্ম এবং অধার্ম্মিক দুইই সমূলে নাশ পাইবে, ইহাই আমার উপলব্ধ সত্য।"

ভাগবত বিশ্বাসী মানুষমাত্রেরই অন্তরের প্রার্থনা:

"অবনত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী মুরারী।"

যখন আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে জন্ম তখন আমরা অসহায়, পরনির্ভর, কিন্তু যখন আমাদের জন্ম অতীন্দ্রিয়ে তখনই আমরা ক্রিয়াশীল; এক অর্থে, তখনই আমরা স্রষ্টা। অস্তিত্বকে নির্ধারিত করতে আমাদের জন্মের কোন হাত নেই, কিছু করি আর না করি টিকে আমরা থাকবই। অপর পক্ষে, জীবনে যে জন্ম তা আমাদের ইচ্ছাধীন, তাতে আমাদেরই সক্রিয় সৃষ্টির হাত, কেননা কোনো অতীন্দ্রিয় জীবনই আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের উপর কেউ চাপাতে পারে না। ঈশ্বরের বাণীর তাই একমাত্র অর্থ তিনি নিরন্তর আমাদের আহ্বান করছেন সাদরে, যাতে তাঁর কাছে যাই এবং জীবন নির্বাচন করি আর সর্বক্ষণ সতর্ক থাকি কোনো অশুভ আমাদের নির্বাচিত জীবন থেকে না বিচ্যুত করে। মনন শক্তিতে জাগ্রত থেকে আর হৃদয়কে পবিত্র ও উত্তপ্ত রেখে চলাই আমাদের সত্যিকার বেঁচে থাকা। এই নবীন জন্মের আবির্ভাব বাহ্যিক পর্য্যবেক্ষণ থেকে নয়, আত্মার প্রশান্ত অতলে তলিয়ে গিয়ে। প্রভু বলছেন 'যেদিন ওর খুশি সেদিনই সমীরণ প্রবাহিত হবে, তুমিও শুনবে তার ধ্বনি, কিন্তু বলতে পারবে না কোত্থেকে তা আসে, কোথায় তা যায়—তেমনি তারাও প্রত্যেকে যাদের অতীন্দ্রিয়ে জন্ম।"*

* বিশ্বের বিস্ময় মূক-বধির হেলেন কেলার-এর বিখ্যাত বই 'The Open Door'-এর শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বঙ্গানুবাদ 'মুক্তদ্বার' হইতে উদ্ধৃত।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : শ্রাবণ, ১৩৭২ সংখ্যার পর]

এরপর যে সাংঘাতিক ঘটনা সংঘটিত হোলো তার জন্যই পরবর্তী ইতিহাস অপেক্ষা কোরছিল। এমনি কোরে অচিন্তনীয়ভাবেই অযাচিত কালে সময় সময় মানুষের জীবনে নূতন নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তার ফল হয় কোন সময়ে বিষময়, আবার কোন সময়ে অমৃতময়। এরই নাম বোধ হয় নিয়তি। এই নিয়তিরই অদৃশ্য সংকেতে সেই নির্জন আঁধার বনপথে অকস্মাৎ গগনবিদারী হুঙ্কারে বনভূমি প্রকম্পিত কোরে দুজনার ওপব এক বিরাট্ সিংহ লাফিয়ে প'ড়লো। সেই অতর্কিত আক্রমণে বত্নদত্তব হস্তধৃত তরবারি মাটিতে প'ড়ে গেল। রত্নদত্ত উগ্রতারাকে সবেগে ধাক্কা দিয়ে দূরে নিক্ষেপ কোরলো। ইতিমধ্যে সিংহ পুনরায় তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত বিশাল থাবা দিয়ে রত্নদত্তকে আক্রমণ কোরলো—সে বনভূমে পতিত তরবারি তুলে নেবার সময় পেলো না। নিরুপায় হোয়ে রত্নদত্ত তড়িৎগতিতে রিক্তহস্তে সিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়লো—তারপর সিংহ ও মানবে সুরু হোলো মল্লযুদ্ধ ; রত্নদত্তর অঙ্গবাস ছিন্নভিন্ন হোলো। মুহুর্মুহুঃ সিংহেব গর্জনে ও উগ্রতারার ভয়-বিহ্বল চীৎকারে বনভূমি শব্দায়মান হোতে থাকে। রক্ষীরা ছুটে এল, কিন্তু সিংহের করাল কবল থেকে রত্নদত্তকে উদ্ধার করবার কোন উপায়ই স্থির কোরতে পারলো না।—তখন সিংহ ও রত্নদত্ত মুহূর্তে মুহূর্তে নিজ নিজ স্থান পরিবর্তন কোরছিল।…অবশেষে সেই অসীম বীর রত্নদত্তেব উপর্যুপরি ভীম মুষ্ট্যাঘাতে পশুরাজ অনেকটা কাবু হোলো, তার মুখ দিয়ে রক্ত প'ড়তে লাগলো। রত্নদত্ত আর ক্ষণবিলম্ব না কোরে তার কটিবদ্ধ তীক্ষ্ণধার শাণিত ছুবিকা মুক্ত কোবে সিংহের বক্ষঃপঞ্জর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত কোরে তাকে ক্রমশঃ নিস্তব্ধ কোরে ফেললো—পশুরাজ রণে পরাজিত হোয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ভীষণ গর্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে মারা গেল। তখন রক্ষীদের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে কে!

উগ্রতারা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে এসে রুধিরসিক্ত রত্নদত্তকে আলিঙ্গনাবদ্ধ কোরে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলো তার সারা মুখমণ্ডল।

পরদিন প্রভাতে দেবী উগ্রতারার প্রাসাদে এসে রাজার রক্ষীরা রত্নদত্ত ও উগ্রতারাকে জানালো যে, রাজাদেশে তাদের আগমন রত্নদত্ত ও উগ্রতারাকে সসম্ভ্রমে রাজসভায় নিয়ে যেতে। রাজাদেশের মত কাজ হোলো—অবিলম্বে রক্ষীদের সঙ্গে উগ্রতারা শিবিকায় এবং রত্নদত্ত অশ্বপৃষ্ঠে প্রাসাদ-অভিমুখে যাত্রা কোরলো। ইতিমধ্যে রত্নদত্তর হাতে দুর্দান্ত সিংহের মৃত্যু-সংবাদ সারা রাজ্যে ছড়িয়ে প'ড়েছিল—তাই বীরের দর্শন আশায় উৎসুক ও উৎফুল্ল লোকসমাগমে জনপথ জনাকীর্ণ—পথের দুই পার্শ্বের গৃহশীর্ষ ও অলিন্দ পুরনারীর কলগুঞ্জনে আর বালকবালিকার উচ্চ হাস্যে মুখরিত, ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত।

সুরম্য সুসজ্জিত প্রাসাদের ইন্দ্রসভাতুল্য রাজসভায় রত্নদত্ত ও উগ্রতারা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ কোরে রাজাধিরাজ স্থাণুদত্তকে অভিবাদন কোরলো। তখন উচ্চ বেদীর ওপর রত্নময় সিংহাসনে উজ্জ্বল মণিময় মুকুটধারী রাজাধিরাজ উপবিষ্ট ছিলেন। ওদের অভিবাদনের উত্তরচ্ছলে ঈষৎ হাস্যরেখা তাঁর বিরাট্ গুম্ফের অন্তরাল হোতে নির্গত হোয়ে নিমেষে অন্তর্হিত হোলো।

জলদগম্ভীর স্বনে রাজাধিরাজ প্রশ্ন কোরলেন, যুবক, তোমার পরিচয় ?

অতি ধীর স্নিগ্ধ কণ্ঠে রত্নদত্ত উত্তর দিলো, ভিন্ন দেশের একজন নগণ্য অধিবাসী।

স্থাণুদত্ত একটি অঙ্গুরীয় রত্নদত্তর দিকে ছুড়ে দিতে, রত্নদত্ত সেটিকে তুলে নিয়ে নিজের অনামিকায় ধারণ করলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

স্থাণুদত্ত আবার প্রশ্ন কোরলেন, এই অঙ্গুরীয় তোমার ?

হাঁ, মহারাজ, এটা আমার।

কিসে বুঝলে ?

রত্নদত্ত নীরব। রাজার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বোললো, আমার মনে হয় কাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় আমার আঙুল থেকে খুলে গেছলো। হয়ত আপনার মন্দিরের দ্বারীরা ওটা পেয়ে থাকবে।

রাজাধিরাজ স্থাণুদত্ত সিংহাসন ত্যাগ কোরে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বোললেন, জানি না, তোমাকে কি বোলে সম্বোধন করা আমার উচিত—ভিন্নদেশীয় নগণ্য অধিবাসী, না—কম্বোজের যুবরাজ ছদ্মবেশী ইন্দ্রনীল ? তোমার ঐ অঙ্গুরীয়ের ভেতর পৃষ্ঠে ক্ষোদিত তোমার নাম ও পরিচয়ই তোমাকে কম্বোজের যুবরাজ বোলে সনাক্ত কোরেছে।

উগ্রতারা রত্নদত্তর দিকে সকলের অলক্ষ্যে কটাক্ষ-পাত করলো, তার পক্কবিম্বাধরোষ্ঠে ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষীণ হাসি খেলে গেল। মহারাজ বোলতে লাগলেন,—কম্বোজের দুরবস্থার সংবাদ আমি বহু পূর্বেই পেয়েছি ; আর এ সংবাদও আমার অজানা নয় যে, কম্বোজের যুবরাজ ইন্দ্রনীল ভারতবর্ষে এসেছেন ; কিন্তু তিনি যে আমারই রাজ্যে এতদিন অবস্থান কোরছেন, তা আমি কল্পনাও করিনি। উচ্চ বেদী থেকে নেমে এসে মহারাজ ইন্দ্রনীলের মস্তকের ঘ্রাণ নিয়ে তাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ কোরলেন। সমগ্র জনতা বিপুল জয়ধ্বনি কোরে উঠলো। রাজাধিরাজ স্থাণুদত্ত হর্ষোৎফুল্ল হোয়ে বোললেন, পরম স্নেহাস্পদ পুত্রপ্রতিম ইন্দ্রনীল, আজ থেকে তুমি মহাস্থানের প্রধান রাজ-অতিথির আসন গ্রহণ কোরে এর রাজা ও প্রজাকে ধন্য কর।

ইন্দ্রনীল করযোড়ে বিনীতভাবে বোললো, মহারাজ, আপনার নিকটে আমার কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় নিবেদন আছে।

তাও আমার অজ্ঞাত নয়—রাজা বোললেন, তবে সে-সব আলোচনার স্থান প্রকাশ্য রাজসভা নয়। এস আমার সঙ্গে। মন্ত্রিবর, আজ এইখানেই সভা শেষ হোলো।—রাজা ইন্দ্রনীলের হাত ধ'রে অগ্রসর হোলেন। যেতে যেতে উগ্রতারার প্রতি তাকিয়ে বোললেন, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নৃত্যপরা উগ্রতারা, এতদিন এই অজ্ঞাতবাসী যুবরাজ ইন্দ্রনীলকে তোমার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় দিয়ে তুমি আমার ও আমার প্রজাবর্গের মুখোজ্জ্বল কোরেছ, তুমি ধন্য। এই অজ্ঞাতকুলশীলের সস্নেহ আশ্রয় দানের পুরস্কার···তিনি নিজ কণ্ঠ হোতে বহুমূল্য মুক্তামালা খুলে নতজানু উগ্রতারার কম্পিত প্রসারিত অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রদান কোরে ইন্দ্রনীলসহ প্রস্থান কোরলেন।

উগ্রতারার করস্থিত মুক্তামালার ওপর মুক্তাধারার ন্যায় নেমে এল অশ্রুরাশি···

অতি প্রত্যূষে শর্মিষ্ঠার ঘুম ভেঙে গেল। স্খলিত বসন সংবরণ কোরতে কোরতে অলস চরণে কক্ষ হোতে নিষ্ক্রান্ত হোয়ে শর্মিষ্ঠা প্রাসাদের উন্মুক্ত ছাদে উপস্থিত হোলো। ছাদের এক পার্শ্বে রক্ষিত নানা জাতির ও নানা বর্ণের পোষা পাখীগুলো কলরব কোরে উঠলো। শর্মিষ্ঠা তাদের কাছে এগিয়ে গেল। পরিচারিকারা

পাখীদের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে এলে সে তাদের খাওয়াতে লাগলো। তারপর পায়রাদের ছোট ছোট খোপগুলো খুলে দিলে তারা উড়ে এসে শর্মিষ্ঠার শরীরের নানা স্থানে বোসে প্রীতি জানাতে লাগলো; তারা শর্মিষ্ঠার হাত হোতে খাবারগুলো ছোট ছোট চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খেতে সুরু কোরলো। শর্মিষ্ঠা সব পায়রাগুলোকে ভাল কোরে পরীক্ষা কোরতে লাগলো। কিন্তু হায়! ...এমনি কোরেই তো কতো দিন কেটে গেছে!

শর্মিষ্ঠা দূর গগনে তাকালো। অরণ্যময় পর্বতের ওপর নবীন সূর্য উদিত হোয়েছে। তমসা কেটে গিয়ে আলোকে উদ্ভাসিত—দিক্ হোতে দিগন্ত। কিন্তু তার জীবনের তমসা দূর হোতে আর কতো দেরি? কতদিন হোয়ে গেল প্রিয়ভ্রাতা ইন্দ্রনীলের কোন সংবাদ সে পায় নি, অথচ ইন্দ্রনীল নিরুদ্দেশ হবার আগে গোপনে সংবাদ পাঠিয়েছিল সে শর্মিষ্ঠাকে যতশীঘ্র সম্ভব সুসংবাদ পাঠাবে। তবে কি আজও পাঠাবার মতন কোন সুসংবাদ হয়নি ইন্দ্রনীলের? সুসংবাদ যদি নাও হয়, তবে শুধু ছোট একটু বার্তাও তো পাঠাতে পারতো—যে তারা ভাল আছে; ব্যথায় শর্মিষ্ঠার সারা অন্তর কেঁদে কেঁদে ওঠে। আর কতোদিনে এই দুরাত্মা দুঃশাসনের কবল হোতে সে মুক্তি পাবে—তার চোখের পাতা ভারি হোয়ে এল।

সহসা শর্মিষ্ঠার কাঁধের ওপর একটি পায়রা এসে বোসলো; সে ঘাড় ফিরিয়ে মুখ তুলে তার দিকে তাকাতেই দু' ফোঁটা টলটলে অশ্রু ঝ'রে প'ড়লো। হঠাৎ চম্‌কে উঠে চোখ দুটো তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে সে সেই পায়রাটিকে হাতে ধরে নিলো—হাঁ, এ সেই বহু আকাংক্ষিত পারাবতই বটে। এরি আশায় সে দীর্ঘ এতগুলি দিন অধীর আগ্রহে অতিবাহিত কোরেছে। সংবাদ! তা হোলে এতোদিন পরে সুসংবাদ এনেছে এই পারাবত। সে পায়রাটিকে আঁচল দিয়ে ঢেকে দ্রুতপদে কক্ষের দিকে ধাবিত হোলো।

নির্জন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ কোরে পায়রাটির ডানার মধ্যে গুপ্ত স্থান থেকে ক্ষুদ্র লিপিটুকু বার কোরে শর্মিষ্ঠা বার বার পাঠ কোরলো।

দেবী শর্মিষ্ঠা, গৌড়ের সন্নিকটস্থ স্থান হইতে এই সংবাদ প্রেরণ করিতেছি। যুবরাজ ইন্দ্রনীল সসম্মানে সুস্থ দেহে অবস্থান করিতেছেন। আমরা আশা করি, সুদিনের আর বিলম্ব নাই। তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনীয়।

তোমার কোদণ্ড।

শর্মিষ্ঠার সমস্ত প্রাণমন বর্ষা-সমাগমে ময়ূরীর ন্যায় নেচে উঠলো। মনোমুকুরে ফুটে উঠলো কোদণ্ডের দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, ঋজু দেহখানি। বিদায়-মুহূর্তের সেই শান্ত্বনাশীতল কথাগুলি সহসা ধনুকের টঙ্কারের মতন হৃদয়ে ধ্বনিত হোতে লাগলো—শর্মিষ্ঠা ধৈর্য হারিও না; যুবরাজকে নিয়ে আমি যাচ্ছি—হয়ত তুমি আমাকে ভীরু ভাববে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি কাপুরুষ নই—ম'রতে আমি ভয় পাই না, তবে আমার মৃত্যু দিয়ে যদি তোমাকে রক্ষা কোরতে পারতাম তো তা থেকে আমি পশ্চাদ্‌পদ হোতাম না। কিন্তু তা বর্তমানে সম্ভব নয়। তাই চোরের মতনই পালিয়ে যাচ্ছি। তবে আসবো—অতি শীঘ্রই ফিরে আসবো—বীরের মতই আসবো—তোমাকে উদ্ধার কোরবো, যুবরাজকে সিংহাসনে বসাবো।—এই আমার প্রতিজ্ঞা, এই আমার সংকল্প, এই আমার ব্রত। ভুল বুঝে তুমি যেন ভুল কোরো না। বিদায়!—শর্মিষ্ঠাকে কোন কথা বলার সময় না দিয়েই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেছলো সেদিন কোদণ্ড। তার ওপর নির্ভর কোরেই তো শর্মিষ্ঠা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছে। হাঁ, কোদণ্ডের কথায় সাহস পেয়েই তো পাপীষ্ঠ গ্রহবর্মার শয্যাশায়িনী হোয়েও আত্মঘাতী হয়নি সে—তীব্র জ্বালা নিয়ে অহরহঃ জ্বলেপুড়ে খাক হোচ্ছে। আজ সেই জ্বালায় বহুদিন পরে একটু শীতল প্রলেপ প'ড়লো। দ্বারে সজোরে করাঘাত হোলো। শর্মিষ্ঠা লিপিখানি লুকিয়ে রেখে দ্বার খুলে দিলো।

পরিচারিকা বোললো, মহারাণী, আমি বহুক্ষণ ধ'রে দ্বারে আঘাত কোরছিলাম?

শর্মিষ্ঠা ছোট মেয়ের মতন খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠে বললো, কেন, কিসের এতো প্রয়োজন?

কুমার বহুক্ষণ থেকে কাঁদছে। তাকে কি এইখানেই নিয়ে আসবো?

শর্মিষ্ঠার হাসি মুহূর্ত মধ্যে মিলিয়ে গেল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বোললো, এই প্রাসাদে শত শত দাসী আছে; তাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে, কুমারকে শান্ত কোরতে পারে? যাও, সেই ব্যবস্থা করোগে।

ভীতা পরিচারিকা দ্রুতপদে প্রস্থান কোরলো; শর্মিষ্ঠা অস্থির পদে ঘরের মধ্যে পদচারণ কোরতে লাগলো।—দস্যু গ্রহবর্মা তার সর্বস্ব লুণ্ঠন কোরেছে, কিন্তু তাতেও সে ক্ষান্ত হয়নি—বলপ্রয়োগ দ্বারা লুণ্ঠনের অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ……না-না……ও-সন্তান তার গর্ভে হোলেও পাপীর ঔরসজাত। ও-কে সে স্বীকার কোরবে না। কাঁদুক ঐ সন্তান…কেঁদে কেঁদে শেষ হোয়ে যাক।…ছিঃ! ছিঃ! সে একি ভাবছে? গ্রহবর্মা তার ওপর অন্যায় অত্যাচার কোরেছে বোলে সেকি ঐ অবোধ স্তন্যপায়ী শিশুর ওপর প্রতিশোধ নেবে? শিশু তো স্বেচ্ছায় আসেনি এ পৃথিবীতে।

স্তন্যপায়ী শাবকের প্রতি ব্যাকুল হরিণীর মতো ছুটে গেল শর্মিষ্ঠা ক্রন্দনকাতর কুমারের কাছে। গভীর মমতামিশ্রিত আবেগের সঙ্গে কুমারকে বুকে তুলে নিয়ে মাতা স্বীয় ক্ষীরধারা উন্মুক্ত কোরলো। কুমার শান্ত হোয়ে পরম নিশ্চিন্তে পান কোরতে থাকে সেই সুধাধারা। আচম্‌কা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গ্রহবর্মা ডাকে, মহারাণি!

শর্মিষ্ঠা চম্‌কে ওঠে—তার কোলে শিশুপুত্র চ'ম্‌কে উঠে কেঁদে ওঠে! শর্মিষ্ঠা মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে, মহারাজ গ্রহবর্মা ক্রুদ্ধ হিংস্র দৃষ্টিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান। চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ কোরে বিনা ঘোষণায় গ্রহবর্মার এই অকস্মাৎ আগমন সত্যই আশ্চর্যজনক। মহারাজ ইসারা কোরতেই পরিচারিকা কুমারকে কোলে নিয়ে কক্ষ হোতে নিষ্ক্রান্ত হোলো। শর্মিষ্ঠা উঠে দাঁড়ালো।

গ্রহবর্মা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বোললো, শর্মিষ্ঠা, তোমার এই গুপ্তচরবৃত্তি কতোদিন চ'লছে?

বুঝতে পারলাম না তোমার হেঁয়ালির অর্থ।

শর্মিষ্ঠা, কিছুক্ষণ পূর্বেই তোমার নিকটে পারাবত কি সংবাদ নিয়ে এসেছে?

গ্রহবর্মা, তুমি অত্যন্ত কাপুরুষ? তাই রজ্জুতে সর্প ভ্রম কোরছো।

জানি, তুমি সহজে স্বীকার কোরবে না, কিন্তু তোমাকে স্বীকার করাতেও আমি জানি।

তোমার রক্তচক্ষুকে শর্মিষ্ঠা যে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তা এতোদিনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো।

তুমি তা হোলে বোলবে না।

আমার মহলে—শর্মিষ্ঠা বলে, মহারাজের গুপ্তচর আছে, তা আমি জানি, কিন্তু…

কিন্তু?

তারা মহারাজের—শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বলে, অধিকতর প্রতিসম্পন্না প্রতিপন্ন হবার আশায় যে মহারাণীর আচরণের ওপর অহেতুক মিথ্যা অপবাদ মহারাজের গোচরে আনবে—তারা যে এতোটা নীচ তা আমি ভাবিনি।

শর্মিষ্ঠা, পারাবত দ্বারা তুমি যে প্রেম-পত্র বিনিময় কোরছো না তা আমি জানি। তুমি গোপনে আমার বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সংযোগ রাখছো—আমার ধ্বংসের চক্রান্ত কোরছো।

মহারাজ, আমার এখন স্নানের সময় হোয়েছে, বাজে কথা কাটাকাটি করবার সময় আমার নেই। শর্মিষ্ঠা দ্বারের দিকে অগ্রসর হোলেন। পেছন হোতে গ্রহবর্মা ডাকলো, শর্মিষ্ঠা!

বলো।

তুমি আমাকে অবজ্ঞা কোরছো!

একি আজ প্রথম, গ্রহবর্মা?

অসহ্য স্পর্ধা!

তা ঠিক কিন্তু সহ্য না কোরেওতো উপায় নেই।

আছে; গ্রহবর্মা কর্কশ কণ্ঠে বলে, এই মুহূর্তে আমি তোমার জীবনের ইতি কোরে দিতে পারি।

দাও। সেতো হবে আমার পুরস্কার—নিয়ত তোমার হাতে এইরূপ নির্যাতিত হওয়ার চাইতে সে আমার পরম শান্তি। তবে মহারাজ, আমার মৃত্যুর পর যেন কোন নীচ, কুটিল দাসীর স্তন্যে পালিত না হয় এই পার্শ্বের কক্ষে অবস্থিত ক্রন্দনরত শিশু।

কথাটা কি তুমি আমাকেই লক্ষ্য কোরে বোললে, রাণী?

হাঁ, রাজন্, তাই। কথাটা সত্য বটে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য।

শর্মিষ্ঠা!—গ্রহবর্মার স্বরে বজ্রনির্ঘোষ।

গ্রহবর্মা, এ শুধু আমার উক্তি নয়—এ রাজ্যের সকলেরই তাই দৃঢ় ধারণা।

রোষে ক্ষিপ্ত হোয়ে গ্রহবর্মা বোললো, এই কম্বোজ আমি ধ্বংস কোরবো—সাগর-গর্ভে তলিয়ে দেবো—ছারখার কোরবো, ভীতিভয়প্রদ মহাশ্মশানে পরিণত কোরবো।—ভারি পদধ্বনি কোরে গ্রহবর্মা দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হোলো। শর্মিষ্ঠা উচ্চস্বরে ডাকলো, পরিচারিকা! পরিচারিকা কুমারকে নিয়ে প্রবেশ কোরলে শর্মিষ্ঠা সন্তানকে স্নেহভরে বুকে তুলে নিলো।

সেইদিনই সায়াহ্নে শর্মিষ্ঠা প্রাসাদের ছাদে উঠে স্তম্ভিত হোয়ে গেল। পক্ষীদের আবাসস্থলগুলি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত,—বিরাট্ শূন্য ছাদ খাঁ খাঁ কোরছে। ঊর্ধ্ব আকাশে কতকগুলি পাখরা আশ্রয়-স্থানের অভাবে চক্রাকারে উড়ছে। ক্রোধে, বেদনায় শর্মিষ্ঠার সারা দেহ কম্পিত হোলো। তার হঠাৎ মনে হোলো, দূর দ্বারপ্রান্তে কে যেন অদৃশ্য হোয়ে গেল। তড়িৎগতিতে সে সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলো বৃদ্ধা দাসী সাংপোকে। তার নয়নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কোরে বোললো, দাসী সংপো!

হাঁ, মহারাণী, আজ্ঞা করুন···

আজ্ঞা! আর তোমাকে কোনদিন কারো আজ্ঞা বহন কোরতে হবে না। গুপ্তচরা! আজ তোমার শেষ দিন।

বৃদ্ধা দাসী কাঁপতে কাঁপতে বোললো, মহারাণী, আমি তো আপনার সেবার জন্যই···

স্তব্ধ হও। চম্পা থেকে গ্রহবর্মা তোমাকে এনেছে—তাই এই প্রাসাদের রীতিনীতি তুমি জানো না। প্রতিহারিণী!

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে একজন প্রতিহাবিণীব আবির্ভাব হোলো। শর্মিষ্ঠা অঙ্গুলি নির্দেশে আদেশ কোরলো, এই গুপ্তচরাকে বন্দী করো।

বৃদ্ধা শর্মিষ্ঠার পদতলে পতিত হোয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বোললো, আমি নিরপরাধ, মহারাণী।

না, তোমার অপরাধের শেষ নেই। তুমি নিয়ত ছায়ার মতন আমাকে যে অনুসরণ করো আমি তা এতো-দিন বুঝেও বুঝতে পারিনি, কিন্তু আর আমার মনে কোন সংশয় নেই। অবশ্য এব কারণ আমি জানি—গ্রহবর্মাকে জন্ম দিয়েই তার মা মারা যান, তোমারই স্তন্যে সে মানুষ—না, না মানুষ নয়—পশু হোয়ে বড় হয়। তার ওপর তোমার প্রচ্ছন্ন টান থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু···আমার নিজের দিক্‌টাও তো আমাকে দেখতে হবে। প্রতিহারিণী, নিয়ে যাও একে সেই গুপ্তস্থানে। শর্মিষ্ঠা নিজের কণ্ঠ থেকে রত্নহার খুলে প্রতিহারিণীকে দিল। বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে বোললো, মহারাণী, মহারাণী! ক্ষমা করুন। আমি আর···প্রতিহারিণী তার মুখ ও চোখ বস্ত্রদ্বারা আবৃত কোরে দিলো। শর্মিষ্ঠা আদেশের ভঙ্গিতে দৃঢ়কণ্ঠে বোললো, এই উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ যেন এ ব্যাপার জানতে না পারে! যাও, কার্য দ্রুত সম্পন্ন করো।

(ক্রমশঃ)

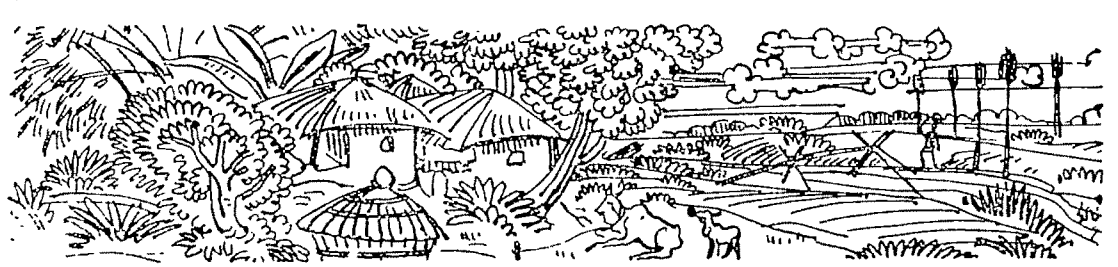

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণে

শ্রীধীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

॥ ৫ ॥

আমাদের প্রথম যৌবনকালে দেশে বিভিন্ন প্রকারের আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাত চলছিল। পরমহংসদেবের আবির্ভাবের পর কেশবচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ দেশে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তারপর স্বদেশী যুগেও একদেশমাতার বিভিন্ন সন্তান দেশাত্মবোধে জাগ্রত হয়ে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারগুলি অনেকটা ভুলে গিয়েছিল। স্বদেশী যুগে আমরা দেখেছি, দেশমাতার সেবায় গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমাজবিদ্রোহী নেতারা একই সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিলিত হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের অবসানে আমাদের কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে এরূপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল না। দেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিরোধ পুনরায় স্পষ্টভাবে জেগে উঠলো।

হিন্দু সমাজে একদিকে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা বিলাত-প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুদিগকে বাদ দিয়ে একটি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ গঠনে অগ্রসর হন; পক্ষান্তরে বিলাত-ফিরত হিন্দুগণও উদারনৈতিক আর একটি সমাজ গঠনে অগ্রসর হন। এই উভয় দলের মধ্যে নানা বাদানুবাদ সর্বদাই লেগে থাকতো। আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজ এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়; ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মগণের নানা বিষয়ে মত-বিরোধ লক্ষিত হয় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই বিরোধ সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়। প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মধ্যে স্বর্গীয় বিখ্যাত অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্র ও কৃষ্ণকুমার মৈত্র ব্রাহ্মসমাজের স্বাতন্ত্র্যের দিকে বিশেষভাবে অবহিত হন। পক্ষান্তরে বিলাত-ফিরত নবীন ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্ম-সমাজকে ভারতীয় বিশাল হিন্দুসমাজের প্রগতিশীল দলরূপে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ, অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবীন দল রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নেতৃত্বের প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে কোন দলেই থাকবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষালাভ করে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অনুসরণ বরাবরই করেছেন। তাঁর শান্তি-নিকেতনের উপদেশগুলি পাঠ করলে আমরা এ কথা সহজেই বুঝতে পারবো; কিন্তু তিনি প্রাচীন বা নবীন ব্রাহ্মসমাজের কোন দলেরই মুখপাত্ররূপে থাকতে চান্‌নি এবং নিজেকে তাঁর পিতার আদর্শ অনুযায়ী প্রগতিশীল হিন্দুরূপেই বিবেচনা ক'রতেন। তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বে নিরাকারবাদ প্রকাশ পেলেও তিনি রসের সাধনায় সাকারবাদী হিন্দুদিগের মন সম্পূর্ণরূপেই আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তিনি আমাদের ব'লেছেন যে, পৌরাণিক নানা ধারণা ও বিশ্বাস তাঁর না থাকতে পারে কিন্তু পৌরাণিক ভক্তি-সাধনার ভাব ও রস তিনি পূর্ণরূপেই গ্রহণ ক'রেছেন। এক হিসাবে পূর্ণ মাত্রায় সাকারবাদী ছিলেন; কেননা তাঁর ব্যক্তিগত সাধনায় নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান অপেক্ষা বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ভগবানকে অনুভব করার কথাই অধিকতর প্রয়োজনীয় স্থান নিয়েছে। ভগবানের কোন কল্পিত মূর্তি অপেক্ষা জগতের নানা সৌন্দর্য ও মানবীয় বিচিত্র সম্পদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রূপ আস্বাদনে তিনি সারা জীবনে ব্রতী ছিলেন।

কলেজে প্রবেশকালে রবীন্দ্রনাথের আদর্শেই আমি সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ ছিলাম। তাঁর শান্তিনিকেতনের উপদেশাবলী আমি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছি। ঐ সময় শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় আর একজন মহাপ্রতিভাধর ব্যক্তির লেখার সহিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য আমি আবিষ্কার ক'রে ফেললাম; কেননা শ্রীঅরবিন্দও ব্রহ্মসমাধি অপেক্ষা জগতের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা তাঁর যোগের উদ্দেশ্যরূপে বর্ণন ক'রেছিলেন। তাছাড়া মানবজাতির রূপান্তর অতিমানসতত্ত্ব এবং ঐহিক জীবনে দেবোপম অজর-অমর অবস্থার সম্ভাবনা আমার ঐশচিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে তোলে। আমার পড়ার ঘরে

রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের দুটি ছবি টাঙানো থাকতো। একদিন আমার ছোটদিদি (স্বর্গীয় বসন্তবালা দেবী) আমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, "খোকা, তুই দুটি বেলা ব্যক্তির ফটো পূজা করছিস কেন, অবতার ঋষিদের ছবি কোথায়?" আর একদিন আমার অভিভাবক ব'ললেন,—"রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ কবি হ'তে পারেন, কিন্তু অধ্যাত্ম-ঋষি হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই; আর অরবিন্দের চেহারা দেখলে মনে হয় ইনি একজন মুসলমান ফকির।" ছোটদিদি ছিলেন সাধুমায়ের অতি নিষ্ঠাবতী শিষ্যা এবং আমার অভিভাবক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজের এক অসাধারণ প্রতিভূ। তাঁদের চোখে রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক মহিমার যথাযথ নির্ধারণ সম্ভবপর ছিল না। বাবার সহিত রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য দেশখ্যাত নেতৃবৃন্দের যোগাযোগ চিরদিনই বিদ্যমান ছিল। বাবার নানামুখী কর্মক্ষেত্রে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক সকল প্রধান ব্যক্তিদিগের তাঁর হৃদ্য সম্পর্ক কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে যাঁদের সহিত বাবা একমত হ'তে পারেন নি, তাঁদের সঙ্গেও দেশের উন্নতিকর বহু কাজে ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁকে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত কাজ ক'রতে দেখা গেছে। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিলাত-ফিরত। বাংলার অর্থনৈতিক বিবিধ নূতন প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশে ক্রীড়াচর্চার প্রথম অভ্যুদয়ে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি নিজে একজন ক্রিকেটের ক্যাপটেন ছিলেন। সংগীত ও অভিনয়ের উন্নতির জন্য তিনি চিরদিনই ব্রতী ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও জমিদারগণের মধ্যে তিনি অগ্রণী স্থানীয় ছিলেন। এই সকল ক্ষেত্রেই তাঁর বহু অন্তরঙ্গ সুহৃদ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বহির্ভূত। তাঁর নিজ শিক্ষক ও পরে তাঁর জমিদারীর ম্যানেজার স্বর্গীয় মনমোহন ভট্টাচার্য বিক্রমপুরের এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তিনি হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রভৃতি বাবার বিশিষ্ট কর্ম-প্রতিষ্ঠানে বিলাত-ফিরৎ শিক্ষিত বাঙালীদিগকেই উচ্চতর পদে স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিদেশ থেকে ঘুরে না এলে মানুষ বর্তমান জগতে কাজের উপযোগী হয় না, এ কথা মনমোহনবাবুও ব'লতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গোঁড়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষণেই পক্ষপাতী ছিলেন। মনমোহনবাবুর শিক্ষার প্রভাব বাবার প্রাথমিক জীবনে যথেষ্ট লক্ষিত হয়। তার ফলে তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তিনি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের আদর্শ গ্রহণ ক'রলেও ব্যক্তিগত জীবনে ও কর্মজীবনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা রক্ষণে সক্ষম হন। মনমোহনবাবু শিক্ষক হ'লেও বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং তাঁর জমিদারী ও ব্যবসায় পরিচালনার ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন; কিন্তু বাবার অপর একজন শিক্ষক ছিলেন, যিনি চিরদিনই তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও অভিভাবকতুল্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত। তাঁব নাম এক প্রধান শিক্ষাব্রতীরূপে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য; তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাসে ইনি গণিত ও সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতিত্বের সহিত এম. এ. পাশ ক'রে প্রথমতঃ ডাফ কলেজের অধ্যাপক হন। বাংলার যুবকদিগের চরিত্র ও স্বাস্থ্য গঠনের জন্য ক্রীড়াচর্চার বিশেষ উপযোগিতা ইনিই প্রথম প্রচার করেন এবং নিজেও বাংলায় প্রথম ক্রিকেট বীররূপে খ্যাতি অর্জন করেন। শুধু লেখাপড়া নয়, খেলাধুলার ক্ষেত্রেও তিনি বাবার প্রথম মন্ত্রদাতা। আশ্চর্যের বিষয় কিশোরগঞ্জের বুনিয়াদী কায়স্থ সমাজের জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করে নিজ ব্যক্তিগত আচার, আহার ও ব্যবহারে ইনি যথেষ্ট রক্ষণশীল হিন্দুত্বের পরিচয় দিলেও এঁর নিকটতম আত্মীয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যখন যোগদান করলেন, তখন সারদারঞ্জন বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হন নাই। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম ও আচার রক্ষা ক'রেও অন্য মতাবলম্বী আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত তাঁর সহৃদয় সম্পর্ক জীবনান্তকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

(ক্রমশঃ

বাঙালী ওঠো

শ্রীউমাপদ নাথ

বাঙালী জাতির জীবনপ্রদীপ নিষ্প্রভ। বাঙালী বড় হতে সুরু করেছিল, বাঁচতে শিখছিল, কিন্তু মাঝপথেই তার মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। দেশ-বিভাগরূপ যূপে বাঙলার গর্দান দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু তার মনোরাজ্যে ক্ষয় প্রবেশ করেছিল তার অনেক আগে থেকেই। বাঙলার ফুসফুসে ক্ষয়রোগ ঢুকেছিল সিরাজের বিলাস-কক্ষ থেকে, তার স্নায়ু শিথিল হতে আরম্ভ করেছিল বল্লাল সেনের জাতিবিচার-সভার কাল থেকে। রাজনৈতিক বাঙলার সর্বনাশ সুরু হয়েছিল রঘুনন্দন দয়ারামের জন্মকাল থেকে। সেই বাঙলার মৃত্যু হলো র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের সঙ্গে। বর্তমান বাঙালী বাঙালী নয়—বাঙলার ভূত। বাঙলার অন্ধকার আবহাওয়ায় চলেছে সেই ভৌতিক বাঙালীর নৃত্যনাট্য।

অর্ধমৃত বঙ্গে জীবনদীপে তৈল সরবরাহ করতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, মতিলালের মতো মহামানবগণ। বিকারগ্রস্ত বাঙালী তাঁদের দান অবহেলাভরে ফিরিয়ে দিয়েছে—জীবনকে অস্বীকার করেছে—প্রাণের বহ্নিকে ভয় করেছে।

বাঙালীর নির্বীর্যতাই বাঙালীর আদিম পাপ।

শৌর্যের একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। বিক্রমের সঙ্গে চরিত্রের সংযোগ না হলে শৌর্য পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বর্তমান বাঙলায় না আছে বিক্রম, না আছে চরিত্র। বিক্রমের নামে মাঝে মাঝে যা দেখা যায় তা রসনাচর্চার বাহাদুরি। ফিটগ্রস্ত রোগীর ছটফটানি এখন শৌর্যের সম্মান লাভ করেছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দুষ্টামি পেয়েছে নেতৃত্বের গৌরব। নেতার কোনো জীবন্ত সদ্‌গুরু-আদর্শ নেই। কী আছে বাঙলার? আছে সেই সীতারাম-রামরূপ-শ্যামাকান্তের বাহুবল? না, আছে শীলভদ্র-রামনাথের জ্ঞানসাধনা? বাঙালীর তরুণরা কঙ্কালসার দেহকে টেরেলিনের আচ্ছাদনে ঢেকে চিত্রতারকাদের জীবনী আলোচনা করতে করতে রাস্তা চলে, তাদের দিকে তাকালে দুঃখ হয়, লজ্জায় মাথা নত হয়। এই বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-অরবিন্দের দেশ? এরাই ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীনের উত্তরপুরুষ?

এখন বাঙলার শিক্ষিত লোকেরা দিবালোকে চুরি করছে, বাঙালী প্রতিবেশীকে ঠকিয়ে নিজের ট্যাঁক ভারি করছে, বাঙালী ব্যবসায়ী ক্ষুধার্ত বাঙালী ভাইয়ের কাছে দেড় টাকা কিলো চাল বিক্রী করছে। বাঙালী সরকারী কর্মচারী ঘুষ না নিয়ে বাঙালী পড়শীর কাজ করে না। বাঙলার বাইরেও এ সব আছে, কিন্তু বাঙলাতেও আছে—যে বাঙলা নিজে ধুকধুক করছে সেই বাঙলাতেও আছে! বাঙালী ঘুষখোর আর চোরের লাইনে দাঁড়িয়েছে—সৌজন্যের মুখোসের নিচে ঈর্ষার কারখানা সৃষ্টি করেছে, মিষ্টি কথার মিষ্টিসিজম রচনা করে ছুরি চালাতে শিখেছে। বাঙালীর চরিত্র বিদায় নিয়েছে, বাঙালীর জাতীয়তাবোধ উদ্বন্ধনে ঝুলছে।

শিক্ষাপীঠ গুরুভূমি বঙ্গে আজ শিক্ষকরা কর্তব্যে ফাঁকি দিচ্ছে, অমানুষ ছাত্র প্রকাশ্যে শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে গৌরব বোধ করছে। আজকের শিক্ষালয় ছিঁচকে রাজনীতির আড্ডাগৃহ। আজ শিক্ষা মানে পরীক্ষা-পাশ এবং পরীক্ষা-পাশ মানে লটারি খেলা! শিক্ষালয়ের নামে বড় বড় প্রাসাদ উঠছে, চকচকে আসবাবপত্র বসছে—লক্ষ-লক্ষ টাকায় শিক্ষাখাতে খরচের অঙ্ক দেখানো হচ্ছে, কিন্তু সেই শিক্ষা-কারখানা থেকে যে মাল তৈরি হচ্ছে, তা? তার না আছে শীল-শালীনতার বোধ, না আছে ব্যবহার জ্ঞান, না আছে শ্রেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা। এ একটা প্যাণ্টপরা বুলিদার জীবমাত্র। এদের নিয়ে 'শো' করা চলে—স্ট্যাটিস্‌টিক্সে এরা কাজে লাগতে পারে, কিন্তু এদের নিয়ে জাতি বাঁচতে পারে না। জাতির জন্যে চাই মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ—দেশ-জাতি ও শ্রেষ্ঠের প্রতি ভক্তিমান মানুষ! যার হৃদয়ে ভক্তি নেই, সে গুরু মানবে কী করে? আর যে গুরুকে মানতে পারে না, তার চরিত্র কোথায়? চরিত্রের উৎস গুরুভক্তি। আর শক্তির উৎস

চরিত্র। বাঙালীর ভক্তি নেই, তাই চরিত্র নেই—তাই শক্তি নেই।

কিন্তু বাঙলা শ্রীভগবানের প্রিয়ভূমি। বাঙলা বার-বার তার সামনে ঈশ্বরপ্রতীক গুরুপুরুষগণকে পেয়েছে। মৃত বাঙালী তাই এখনো গতায়ু নয়। এর নাভিকেন্দ্রে এখনো প্রাণবায়ু অলক্ষ্যে বিদ্যমান রয়েছে। জীবনের অনাবৃত বীজমন্ত্র এখনো নিঃশব্দে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার শোণিতধারায়। বাঙলার অবসান ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়, বাঙালীর মৃত্যু ইতিহাসের অবাঞ্ছিত। কিন্তু মুখের কথায় জাতি জাগবে না, শুধু ভাবের চর্চায় বাস্তবের ভবী ভুলবে না। বাঙালীকে জাগতে হবে কর্মের মাধ্যমে, তাকে বেঁচে উঠতে হবে বহ্নিময়ী শক্তি সাধনার পথে। এখন আর বাঙালীর কানের কাছে আধুনিক প্রেমের গান শোনালে চলবে না, এখন তাকে শোনাতে হবে পাঞ্চজন্যের বজ্রনির্ঘোষ—আর তার জীবনমঞ্চে রম্য কথাকলি-নৃত্যের আসর বসালে চলবে না, বাঙালীকে নাচাতে হবে নটনাথের প্রলয় নৃত্যের তাথৈ-তালে। বাঙালী গল্প না করে, আড্ডা না মেরে কর্ম করুক। কর্মের ঝঞ্ঝাতরঙ্গে জীবনের যুগযুগব্যাপী মোহতন্দ্রার বাঁধ ভেঙে যাক, আবার বাঙালী নীড়চ্যুত হোক—সত্যকার প্রাণ-প্রকাশের উদগ্র আকুতিতে অস্থির হোক—সম্মুখ যুদ্ধের অকুতোভয় সৈনিকের মতো সাগ্রহে অগ্রধাবী হোক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সকল মহৎ কর্মের উৎস সংঘানুগতি। বিশুদ্ধ সংঘানুগতি থেকে আসে সৃজনক্ষমা সংঘসংহতি। সংঘসংহতিই শক্তি। সংঘ মানে আদর্শ জীবন সংগ্রামীর সংঘ—যার কেন্দ্রে রয়েছেন পরম শুভস্বরূপ সর্বদর্শী ঋষিপুরুষ। কর্ম ও শক্তির এ ছাড়া আর দ্বিতীয় ফরমুলা নেই। এই আদর্শ-কেন্দ্রিক কর্ম ও শক্তির সমবায়ে রচিত হবে জাতীয়তার শিলাস্তম্ভ।

বাঙালী যদি এইভাবে জাতীয়তার মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে পারে—এক কথায়, যদি বাঙালী মানুষ হয়, তবে বাঙলার মাটি থেকে তিন-তুড়িতে উড়ে যাবে দুর্নীতির এই কবন্ধলীলা। বাঙলার নেতারা যে স্বার্থবাদী, বাঙলার সরকারী কর্মচারীরা যে ঘুষখোর, বাঙলার ব্যবসাদাররা যে কালো-ব্যাপারী, বাঙালী পড়শী যে পরশ্রীকাতর অনিষ্টকারী, বাঙালী তরুণ যে উচ্ছৃঙ্খল, বাঙালী মেধা যে ক্ষীয়মাণ, তা এই পর্যুদস্ত বাঙলার সামগ্রিক পতনের পরিণতি। এর এক-একটা পৃথক সমাধান নেই, জাতির পূর্ণাঙ্গিক জীবনায়নের মধ্যে রয়েছে এর সমূহ সমাধান।

এই পূর্ণাঙ্গ জাগরণমন্ত্রের উদ্‌গানের জন্যে চাই শক্ত-মজবুত উৎসৃষ্ট প্রাণ বিপ্লবীর দল। এখন দেশে সাহেব শত্রু নেই। এখনকার শত্রু লুকিয়ে রয়েছে আমাদেরই রক্তের মধ্যে। নিজের সেই অপচয়মুখী ইষ্টবিমুখ মারণ-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে—সংগ্রাম করতে হবে ব্যক্তিগত জীবনে আত্মনির্মিতির সৎপ্রয়াসে, সংগ্রাম করতে হবে সকলে সমবেত হয়ে একাদর্শের ঐক্যমন্ত্রে। এই জাগৃতি-বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে নির্ভীক কর্মী চাই। এবার আর ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইতে হবে না, এবার রয়েছে তার চেয়েও মহত্তর কাজ—এবার নিজে বেঁচে অপরকে বাঁচাতে হবে, এবার সংঘবদ্ধ জীবন-যাজ্ঞিকগণের বজ্রহুংকার মৃত্যু-অপমৃত্যুর সম্ভাবনাকে অবলুপ্ত করতে হবে। এবার বেঁচে থেকে দেশের জন্যে, জাতির জন্যে—বাঙালীর জন্যে, ভারত-বাসীর জন্যে—মানবতার জন্যে প্রাণবলি দিতে হবে। হাজারে-হাজারে লক্ষে লক্ষে তরুণদের এগিয়ে এসে জীবন-যজ্ঞাগ্নিকে আপন জীবনাধারে করে দিকে-দিকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বাঙালী, তুমি জাগো! পূর্ণ জীবন পেতে তোমার এই মৃতপ্রায় জীবন-সায়রের পঙ্কাবশেষ উৎসর্গ করো! তুমি আবার এই নরকভূমিতে স্বর্গ স্থাপন করো।

আলোচনা

"নয়া ভারতের শিক্ষা"

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শ্রীহুমায়ুন কবীর দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আজকের শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলেছেন তাঁর "নয়া ভারতের শিক্ষা" পুস্তকে। শ্রীকবীর বলেছেন: প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির বিদ্যাচর্চার সেই ভাবাদর্শের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্য সেখান থেকে রাজনীতিক দলাদলি আর ছলচাতুরী সরিয়ে দেখতে হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্যান্য অফিসারকে নিয়োগ করতে হবে গুণের বিচারে, দলীয় নীতির বিচারে নয়।··· অন্য একটি উপায় হচ্ছে—শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের শিক্ষাদানের বিশেষ ক্ষমতা আছে তাঁদের স্বীকৃতি দেয়া।···শিক্ষকদের পারিশ্রমিকেব উন্নয়ন যে খুবই দরকার তাতে সন্দেহ নেই। ···এঁদের মাইনে তো প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।"

এই বেতন সম্পর্কে শ্রীকবীর দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। "জাপানে দেখেছি, মাধ্যমিক আর প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির হেডমাষ্টারদের বেতন প্রায় এক। তাঁদের বেতন সরকারী অফিসারদের বেতনের তুল্য। তুরস্কে দেখেছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন ২৫০৲ থেকে সুরু হয়ে ৫০০৲ পর্যন্ত বাড়ে, আর সেখানে সরকারের সেক্রেটারীরা পান ১১০০৲ থেকে ১৫০০৲ পর্যন্ত। তার মানে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের সঙ্গে উচ্চতম প্রশাসকের বেতনের অনুপাত হচ্ছে ১:৩। ভারতের এই অনুপাত হল ১:৮০।"

তুরস্কে ও জাপানে যা সম্ভব আমাদের দেশে তা অসম্ভব হবে কেন? তৎক্ষণাৎ জবাব পাব—'অতো টাকা আমাদের নেই।' কথাটা যথার্থ বলে মানতে আর ইচ্ছা হয় না। যত্রতত্র দেখি দু'হাজার তিন হাজার টাকা বেতনের ছড়াছড়ি, মোটর গাড়ীতে সহর ছেয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকা চোরা ব্যবসায়ীদের হাতে জমে আছে, তাহলে টাকার অভাবটা কোথায়? অভাবটা ইচ্ছার। আগের দিনে যেখানকার যা-কিছু ত্রুটি সব বিদেশী শাসকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া চলতো, এখন আর তার উপায় নেই। আমরা তো এখনি আইন বাঁধতে পারি যে, কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ব্যক্তি কোনভাবেই হাজার টাকার বেশি মাসিক গ্রহণ করতে পারবে না। সরকারী দপ্তরেও হাজার টাকার বেশি বেতন থাকবে না। এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে মুনাফার একটা অংশ শিক্ষাকর হিসাবে দিতে হবে। তাহলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে টাকা অনেক সুলভ হবে। তাছাড়া লুকানো কালো টাকা ধরা পড়লেই শতকরা পঞ্চাশ টাকা শিক্ষাখাতে বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে টাকা ধরার পন্থাও কঠিন নয়, এখনি যদি অর্ডিন্যান্স করে বর্তমানে সমস্ত ১০০৲ টাকার নোট অচল করে দিয়ে, ব্যাঙ্ক একাউন্ট মারফৎ নতুন নোট বদলে দেবার ব্যবস্থা হয়, তাহলে বহু কোটি টাকা ব্যাঙ্কের হিসাবের মধ্যে এসে পড়বে।

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ সত্য, কিন্তু যত দরিদ্র বলে প্রচার করা হয়, ততো গরীব আমরা নই। আমাদের সম্পদ মুনাফাবাজ কালোবাজারীদের গুপ্ত সিন্দুকে আমরা তুলে দিচ্ছি, এই দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলার সময় হয়ে গেছে, সমস্ত সম্পদ আহরণ করে জনকল্যাণে নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষাদাতারা অন্নচিন্তায় ক্লিষ্ট হবে, আর মোটরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সহরের রাজপথ 'জাম্' করে তুলবে এবং রাষ্ট্রচালকেরা বলবেন শিক্ষার উন্নতি বিধানের অর্থ নেই, ততদিন শিক্ষার মর্যাদা উন্নয়নের অন্তরায় থেকে যাবে। এবং শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রসমাজের উন্মার্গগামী মানসের গতিরোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। অথচ এই ছাত্রসমাজই আগামী যুগে আমাদের শাসন ও সংস্কৃতির ধারক বাহক চালক হবে। আগামী কালের জন্য আমরা কি কোন আদর্শ রেখে যাব না?

মানুষ গড়ার কাজে সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো দরদ, ছোটদের সেই দরদের দাবী শিক্ষক ও

অভিভাবকদের কাছে। কিন্তু বর্তমানের আর্থিক বৈষম্য মধ্যবিত্ত সমাজকে যেভাবে আড়ষ্ট করে তুলেছে, তাতে বিব্রত শিক্ষক ও উৎকণ্ঠিত অভিভাবক দরদী মনোভাব হারিয়ে ফেলেছেন, এই অবস্থার উন্নতি করতে পারতেন শাসক-কর্তৃপক্ষ। ইংরাজি শিক্ষাধারা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, ইংলণ্ডে ছোটদের উন্নীত করার জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, আমরা তো সেইগুলিই অবলম্বন করতে পারি, জাপান, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ায় আমাদের দরকার কি? গ্রেট বৃটেন তো সামান্য একটা দ্বীপ, সেখানে যদি অর্থাভাব না হয়ে থাকে তো আমাদের এতো বড় দেশে অর্থাভাব হবে কেন? চোরা ও মুনাফা-বাজদের সব টাকা সিন্দুকের অন্ধকার থেকে টেনে বের করতে হবে এবং তা শিক্ষার খাতে ব্যয় হবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উন্নত জাতিরা শিক্ষাকে রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য বলে মনে করে, আমরা কি এখনও সেইভাবে চিন্তা করতে পারছি? পারলে টাকার অভাব হত কি?

ছোটরা যখন পথেঘাটে নিষ্কর্মার মত আড্ডা দিয়ে অধঃপাতে যাচ্ছে বলে আমরা মনে করছি, তখন বিলাতের মত পার্কে কার্নেগী পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগার ও রিক্রিয়েশন বলে তাদের চিত্তবিনোদন ও অবসর যাপনের কোন ব্যবস্থা আমরা করেছি কি? আমাদের দেশে কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব গ্রন্থাগার ও তরুণ সংগঠন প্রতিষ্ঠান ক'টা আছে? মিউনিসিপ্যালিটির যেমন অবশ্য করণীয় পল্লীর স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করা, সে স্বাস্থ্য দৈহিক, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও কি তাদের কিছু করণীয় নেই? সুস্থ মনের অভাবে শুধু দৈহিক স্বাস্থ্য একদল অসুর তৈরী করবে, 'মানুষ' তৈরী হবে না।

শ্রীকবীর বলেছেন, "শিক্ষা তার স্ব-পরিবেশের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে তাকে মুক্ত করে সংকীর্ণতার বন্ধন থেকে। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব-বিষয়ে।···শিক্ষার কাজ হল মানুষের সহানুভূতিকে উদার ও প্রশস্ত করে তোলা আর কল্পনাকে বিচারের আলোকে দীপ্ত করা। এর উদ্দেশ্য হল চিরন্তন সত্যসমূহের নিত্যতা মেনে নিয়ে পরিবর্তনের অনিবার্যতা বিষয়ে অবহিত করা। এইসব সত্যের স্বীকৃতিই হল আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করা।"

—[নয়া ভারতের শিক্ষা]

এই যদি শিক্ষার মূল কথা হয় তা হলে আজকের তরুণ সমাজের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে আমাদের শিক্ষারীতিব ত্রুটি। এই ত্রুটি সংশোধন করে তরুণ মানসকে ঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব শিক্ষা-বিধায়কদের, কারণ রাজ্যের সম্পদ ও অধিকার তাঁদের হাতে। কিন্তু আঠারো বছরেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাটাই তাঁরা সর্বাত্মক করে তুলতে পারেন নি। ৩২,২২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে পশ্চিম বাংলায়, কিন্তু তাদের ব্যবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়, কারণ শ্রীকবীব যে শিক্ষার কথা বলছেন, তাতো শুধু অক্ষর পরিচয়, হিসাব লেখা আর চরকা কাটা, কি সামান্য হাতের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। 'মানুষ' তৈরীর শিক্ষা, সেই শিক্ষার ব্যবস্থা হবে কেমন করে? বিভ্রান্ত তরুণ সমাজকে সুষ্ঠু পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব কে নেবে? কে জাতীয় ভাবধারাকে অনিবার্য অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে?

আব্দার

শ্রীশশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য

অসংখ্য প্রদীপ জ্বলে না ঘোচে আঁধার
আলোর নাগাল হ'তে স'রে যায় দূরে,—
কিন্তু সেই দীপতলে বাসা তমিস্রার
আলোর প্রভাব সেথা শ্রান্ত ঘুরে ঘুরে।

আঁখি দেখে বিশ্বের যত সব কিছু
কিন্তু সে আপনায় না হেরে কদাপি—!
আলোর আড়ালে ছায়া চলে পিছু পিছু
যাহা যত পরিস্কার—"আব্দার" তথাপি।

চলচ্চিত্রের গতি ও প্রকৃতি

চিত্ত কর

১৯১৩ খৃঃ ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের এক স্মরণীয় বৎসর। D. G. Phalke বহু বাধা বিপত্তির মধ্য থেকে আমাদের মাঝে উপহার দিলেন "রাজা হরিশ্চন্দ্র"—এক পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপ। ভারতীয় জীবন-সাধনা ধর্মের মধ্য দিয়ে গতিশীল আর Phalke এক গোঁড়া মারাঠা হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান। তাই বুঝি চলচ্চিত্রের প্রথম গতির প্রয়াস পেল ধর্মমূলক ছায়াছবির মাধ্যমে। কিন্তু চলচ্চিত্রের সেই নির্বাক যুগে ফল্‌কে সাহেব সমাজ থেকে কোনও রকম সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক বরং তাঁকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে। এর নিদর্শন 'হরিশ্চন্দ্র'—ছবিতে তারামতির ভূমিকায় Salunke নামে এক পুরুষ অভিনেতার অভিনয়। এই সকল অসুবিধার মধ্য দিয়েও তিনি এগিয়ে চলেছিলেন তাঁর সিদ্ধিলাভের পথে—সম্ভব করেছিলেন চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক নবযুগের সৃষ্টিতে।

সিনেমা-শিল্প কালের পদক্ষেপে নির্বাক যুগে হাসিমুখে বরণ করে নিল সবাক্ যুগকে। সেই যুগান্তকারী বৎসর—১৯৩১ সন এগিয়ে এল আমাদের সামনে "আলম-আরা" উপহার নিয়ে। ইতিহাস সমৃদ্ধ হল ঐতিহাসিক প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে বাণীময় হ'য়ে। আমাদেরই হৃদয়ের যে আকুতি, যে প্রেম, যে ভালবাসা তারই প্রতিচ্ছবি পেলাম এই সবাক্ ছায়াছবির মাধ্যমে। মহাকালকে তাই আমরা বন্দনা করলাম এই মহান শিল্পকে আরও মহিমময় করে তুলতে। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশ মুখর হয়ে উঠল এই শিল্প-সাহিত্যকে আরাধনা করতে। ছবির বিষয়বস্তু শুধু ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আর বাঁধা রইল না—এ অনন্ত বিকাশের মধ্যে এগিয়ে চলল। ধর্মনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন সমস্যামূলক ছবি একের পর এক আত্মপ্রকাশ করল। যে আর্টের মধ্যে মানুষ দেখতে পেল তার জীবন-সত্তার প্রতিচ্ছবি—সেই চলচ্চিত্র শিল্পকে সে আরও আপন করে পাবার জন্য জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলল।

তারপর এল সেই রক্তক্ষয়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যা মানুষের প্রতিটি চেতনার মধ্যে এনে দিল পরিবর্তন। বিশ্ববাসী হাহাকার ক'রে উঠল—চাইল শান্তি—কিন্তু শান্তি চাইলেই ত পাওয়া যায় না—এর কাছে পৌঁছানোর পথ অতি দুর্গম—চারপাশে ঘিরে আছে বিভীষিকার অদৃশ্য প্রেতাত্মা—তারা শান্তির প্রয়াসী দূতকে করে দেয় দিশাহারা। অদম্য যুদ্ধাভিলাষী হিটলারের নাৎসীবাহিনী চরম নির্যাতন করল বিশ্বমানবতার—তাদের শিকার হ'ল পোলান্ড, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ। এই নিষ্ঠুরতার চরম প্রান্তে যখন তারা হাজির হ'ল তখন দেখল সামনে অবলুপ্তির বিরাট খাদ—পেছনে ফেরার আদেশ তারা পেল না, কারণ যে জাত শুধু এগিয়ে চলার নির্দেশ পেয়েছে তারা পিছনে ফেরে কি করে? তাই নিঃশেষ হয়ে গেল সেই অবলুপ্তির করাল গহ্বরে। যুদ্ধ গেল থেমে কিন্তু মানুষ কি শান্তির পথ খুঁজে পেল? তা যদি পায় আজও কেন আমরা হানাহানি করে মরছি? কেন এই দারিদ্র্য? কেন এই ব্যভিচার? পোলাণ্ড এখনও যুদ্ধের করুণ স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে নি। 'Kanal', 'Passenger' প্রভৃতি ছবিগুলোর মাধ্যমে তারা জগদ্বাসীর কাছে তাদের অত্যাচারিত জীবনের করুণ দিনগুলোর কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়াচ্ছে। এর স্মৃতিচিহ্ন তাদের শিল্পে, সাহিত্যে সর্বত্র প্রকাশমান। আমাদের দেশও কিন্তু এই সর্বনাশা যুদ্ধের বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে মুক্তি পায়নি—আমরাও ভুলিনি সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। একটা বড় রকম যুদ্ধে যা লোকক্ষয় হয় তার অনেক অনেক গুণ বেশী অসহায় মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে—এনে দিয়েছিল মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য।

যুদ্ধ শেষ হল—মানুষ চাইল তার বেদনার রূপ প্রকাশ করতে তার সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকর্মের মাধ্যমে। তাই অতীতের শিল্পকর্মের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করল নূতন চিন্তাধারা। ইতালীতে এল 'নিও-রিয়ালিজম্'-এ যুগ—ফরাসীতে 'নুভেল ভাগ'—চলচ্চিত্র শিল্পধারা ঝর্ণার স্বচ্ছ গতির মত এগিয়ে চলল। পৃথিবীর এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষের সাহচর্য

পেল 'ফিল্ম ফেষ্টিভালে'র মাধ্যমে। কৃষ্টির বিনিময় হল —মানুষ খুঁজে পেল সেই অজানার উৎস—যে অজানার মধ্যে লুকিয়ে আছে পরমানন্দের অস্তিত্ব।

আজ পঞ্চাশোর্ধ চলচ্চিত্রশিল্পে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে কত পরিবর্তন এসেছে। আমাদের দেশে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'পথের পাঁচালী' ছবি দিয়ে যুগান্তকারী ইতিহাস রচনা করলেন—তাঁর ছবিতে আমরা পেলাম প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশ, কাশবন, বাঁশবাগান, প্রাণবন্ত অভিনয় আর দেখতে পেলাম সেই বিরাট জিজ্ঞাসা—"মানুষের পৃথিবীতে এত দারিদ্র্য থাকা কি উচিত?" সারা পৃথিবী স্রষ্টার এই সৃষ্টিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করল। এই সৃষ্টির উৎসমুখ আরও প্রসারিত হল। এগিয়ে এলেন মৃণাল সেন, তপন সিংহ বাংলার প্রতিনিধি হয়ে। আসাম থেকে এলেন ডাঃ ভূপেন হাজারিকা, বম্বেতে বিমল রায়, কুন্দনকুমার প্রভৃতি—প্রতিভার মিলন হল আর তারই ফলশ্রুতি আজকের ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প।

কিন্তু আজ প্রশ্ন উঠেছে যে, আমাদের দেশে এই সমস্ত প্রেরণামূলক ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারছে না কেন? কেন এই সাফল্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে ভিন্ন দেশের অর্থের উপর? এ প্রশ্নের মীমাংসা বড়ই জটিল। তবে অনেকগুলি কারণের মধ্যে দুটি কারণ দেখতে পাই—একটা শিক্ষা ও অপরটা উপযুক্ত পরিবেশ রচনার অভাব। প্রতি বছর যতগুলি ছবি আমাদের দেশে মুক্তি পায় তার অধিকাংশই বোম্বাই প্রদেশে নির্মিত যৌন-আবেদনমূলক ভিত্তিহীন ছবি। এই সস্তা যৌন-আবেদন আমাদের প্রতিটি শিরায় বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে। এই প্রায়নিরক্ষর দেশে এই আবহাওয়া প্রতিটি মানুষের সুস্থ চিন্তাধারাকে আরও বিষাক্ত করে তুলছে। তাই এর মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে—আমাদের মিলিত শক্তি দিয়ে এর প্রসার রোধ করতে হবে—তবেই হয়ত একদিন আমাদের এই সুপ্ত-সত্তা জেগে উঠবে—নব চিন্তার ফল্গুধারা সিঞ্চিত হবে আমাদের চলচ্চিত্র মহীরুহে—যা একদিন বিরাটে রূপান্তরিত হয়ে মহাকালের কাছে বেঁচে থাকবে।*

* প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের অধিবেশনে পঠিত।

তুমি কি?

দীপ্তোৎপল রায়

তুমি কি আমার বন্ধু হবে?
এই অতল জলের আহ্বান আর মাদকতায়
যখন আমি নিঃসঙ্গ-বিচ্ছেদ ব্যথায়।
তখন?
তুমি কি আমার বন্ধু হবে?
এই ভগ্ন দেউল জীর্ণ বটের অন্তরালে,
যখন আমি সঙ্গহারা-সঙ্গী পাওয়ার কালে,
তখন?
তুমি কি আমার বন্ধু হবে?
ঐ শবর মনের দৃষ্টিতে আর একাগ্রতায়
যখন আমি মুখর হব নিবিড় নীরবতায়,
তখন?
তুমি কি আমার বন্ধু হবে?
আকাশ ছোঁয়া আশার দোলায় মনের ডালে,
যখন আমি জড়িয়ে আছি শতেক চিন্তাজালে,
তখন?

"গতিশীল কর্মের নিতি নব চেতনা"

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

কি এক অজানা হিল্লোল!
চঞ্চল মন যেন কিসের আনন্দে
মৃদু বায়ে, মৃদু সুগন্ধে—ছন্দে ছন্দে
শূন্য আকাশতলে কাঁপি' কাঁপি' করে কল্লোল।
সেকি স্বপ্নের অনাগত ভবিষ্যৎ?
সে বুঝি গ'ড়ে দেবে নূতন কিছু
পুরাতন ভেঙ্গেচুরে ফেলে দিয়ে পিছু—
সে আশেই মন বুঝি চুপি' চুপি' লেখে দাসখত?
নূতন নূতন করি' এ-পৃথিবী করে খেলা।
কিছুই তো কিছু নয়—শুধু সাময়িক,
সঞ্চালিত জীবনের স্পন্দন ক্ষণিক—
আয়ুটুকু করে ল'য়ে ফুস্‌ফুস্ পাখা দু'টি মেলা।
স্থির মন বোঝে, তবু কি ভুল বুঝে অস্থির?
না না, জীবনই তো কর্ম, আশাই যে প্রেরণা,
গতিশীল কর্মের নিতি নব চেতনা—
কর্মের আড়ালেই বহে চির আশা ঝির ঝির।

শ্রীশ্রী৺অর্ধনারীশ্বর

শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বি-মানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—(তৈত্তিরীয়োপনিষদ)।

আনন্দই সমস্ত জীবের জীবন। এই আনন্দই শিবের স্বরূপ। সগুণ ও নির্গুণভেদে এই শিবস্বরূপ পরব্রহ্মের দুইটী রূপ।

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥

মায়াযুক্ত হইলে সগুণ ব্রহ্মা বা ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন আর মায়োপাধি রহিত হইলে নির্গুণ হইয়া থাকেন। এই সচ্চিদানন্দ শিব প্রকৃতিকে গ্রহণ করিলে এক অপূর্ব অনির্বচনীয় মহাশক্তি তাঁহার মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই মহাশক্তিই সৃষ্টির মূল উপাদান। এই শক্তি সংযুক্ত শিব হইতেই মহৎ তত্ত্ব বা নাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে; শিবের কোন্ বদন হইতে নাদের উৎপত্তি তাহা পরে বলা হইতেছে। নাদ হইতে অহঙ্কার বা বা বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এই প্রকৃতি ও ব্রহ্ম (শক্তি ও শিব) অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া বারম্বার জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। ইহাতে চৈতন্য ও অহঙ্কার অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রকাশিত থাকে; এইজন্যই এই যুগল ভাবকে শাস্ত্র অর্ধনারীশ্বর নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর সম্মিলিত রূপই অর্ধনারীশ্বর; মহেশ্বরই মহাপ্রণব (জ্ঞানশক্তি গৌরী, ইচ্ছাশক্তি ব্রাহ্মী, ক্রিয়াশক্তি বৈষ্ণবী)। ত্রিগুণ ও গুণত্রয়ের অধীশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে উৎপন্ন যখন অভেদরূপে মিলিত হন তখনই মহেশ্বর হয়েন। প্রণবের যেমন অকার, উকার, মকার, নাদ, বিন্দু, কলা ও কলাতীত সাতটী অঙ্গ আছে তদ্রূপ শিবের ব্যক্ত পঞ্চমুখ ও অব্যক্ত দুটী মুখ আছে, এই সাতটী মুখ প্রণবের রূপ। শিবের প্রথম মুখ অকার—তৎপুরুষ দ্বিতীয় মুখ উকার—অঘোর; তৃতীয় মুখ মকার—সদ্যোজাত; চতুর্থ মুখ নাদ—বামদেব; পঞ্চম মুখ বিন্দু—ঈশ্বর; ষষ্ঠমুখ কলা—নীলকণ্ঠ; এবং সপ্তমুখ কলাতীত—চৈতন্য। এই সাতটী মুখই কলাতীত অব্যক্ত অনির্দেশ্যস্বরূপ।

আবার ব্রহ্মাই মহাপ্রণবের রূপে শিবের প্রথম মুখ; এই ব্রহ্মা হইতে সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব চতুর্বেদ প্রকাশিত। বিষ্ণু দ্বিতীয় মুখ, রুদ্র তৃতীয় মুখ, ঈশ্বর চতুর্থ মুখ, মহেশ্বর পঞ্চম মুখ, পরাশিব ষষ্ঠমুখ; আর সপ্তম মুখ শিবশক্তি সম্মিলিত মহেশ্বর অথবা কলাতীত মহেশ্বরী রূপ, তিনিই জগতের আদি, তিনিই অর্ধনারীশ্বর।

ইতঃপূর্বে পাঠক প্রবর্তক মাসিক পত্রিকায়, ১৩৭১ সালের (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫) মাঘ মাসের সংখ্যায়, শ্রীশ্রীঅর্ধনারীশ্বর শিবের বিগ্রহ মূর্তির বিষয় অবহিত হইয়াছেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত রিষড়া গ্রামে পূতসলিলা জাহ্নবী-বিধৌত, প্রেম-মন্দির আশ্রমে মনোহর, অপূর্ব মূর্তি শ্রীশ্রীঅর্ধনারীশ্বর শিব বিরাজিত। হিমালয়ান্তর্গত গড়বাল পর্বতে গুপ্তকাশী নামক স্থানেও শ্রীশ্রী৺অর্ধনারীশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন—উক্ত মূর্তি সন্দর্শনে স্বতঃই মনে জাগে, ইনি জগদ্‌গুরু সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য সংস্থাপিত; এবং ঔরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী ইলোরার পর্বতগুহামধ্যেও ৺অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ইনি পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত।

যে পুণ্যবান ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত গুরুদর্শিত মার্গে পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীশ্রী৺অর্ধনারীশ্বরের পূজা উপাসন করেন তিনি আনন্দময় হয়েন এবং দেহাবসানে অনাময় শিবলোকে গমনপূর্বক শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। তাঁহাকে আর ভবযন্ত্রণা ভোগের জন্য পুনরাগমন করিতে হয় না। ন স পুনরা-বর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি।

তুচ্ছতার মহিমা

ডক্টর মতিলাল দাশ

দেশ আজ গভীর সর্বনাশের সম্মুখে। স্বাধীনতা আমাদের দেয়নি সবলতা এবং সাহস—চরিত্রকে করেনি দৃঢ়, মনুষ্যত্বকে করেনি জীবন্ত, তাই নগেন কর্মকারের ছোট কাহিনীটি প্রকাশ করাকে আমি কর্তব্য মনে করি।

নগেন কর্মকারের বাড়ী পদ্মপুকুর—কোথায় সে গ্রাম জানি না—খুব সম্ভব দক্ষিণ অঞ্চলে। সে বর্ধিষ্ণু লোক ছিল, সোনার গহনা গড়িয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে তার দিন চলত। কিন্তু মোরারজী দেশাইয়ের কল্যাণে সে আজ তরিতরকারি বিক্রয় করছে।

স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের মর্ম আমি আদৌ বুঝি নি, কিন্তু এই উদ্ধত আইনের কল্যাণে বহু শিল্পীর যে অকারণ সর্বনাশ হয়েছে সে দিকটা আমরা সবাই স্বচক্ষে দেখতে পাই। সেই বহু সহস্র নির্যাতিতের অন্যতম নগেন কর্মকার।

কেমন করে নগেনের সাথে পরিচয় হল সেই কথাই বলি। বাসের অত্যধিক ভিড়ের জন্য বাসে চলতে পারি না—যতদিন প্রাইভেট বাস ছিল, বেশ নিয়মে এবং সুচারুভাবে বাস চলত। সরকারি বাস এল—আর এল বিশৃঙ্খলা, বাড়ল ভাড়া—আর সাধারণের টাকার লোকসান। যা পারবি না তাতে হাত দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু সবজান্তা কর্তাদের হামবড়াই ভাবের দুর্ভোগ আমাদের ভুগতেই হচ্ছে।

তাই মাসিক একটি টিকিট করে নিয়েছি। রেলে তবু বসে আসা চলে—আর রেলে আসি বলে নফর কোলের পাইকারি বাজার থেকে মাঝে মাঝে জিনিষপত্র কিনবার দুর্বাসনা জাগে। খুচরা কেনার থেকে লাভ হয় বটে, কিন্তু অনেক বেশী জিনিষ কিনতে হয়।

সেদিন হাতে ছিল ফোলিও ব্যাগ—কয়েকটী দুর্মূল্য ঔষধ কিনে তাতে ভরেছি—তার উপর নগদ টাকাও বেশ কিছু ছিল, সেই ব্যাগ এক হাতে, অন্য হাতে বাজারের থলে নিয়ে ভিড়ের চাপে সাঁওদা করে চলেছি। একটি কাগজি লেবুর দোকান থেকে পঞ্চাশটি কাগজি লেবু কিনেছি—তারপর ব্যাগটি নামিয়ে লেবু নেওয়ার জন্য থলের মুখ হাঁ করে ধরেছি। নগেন কর্মকার আমায় লেবু বেচেনি—তার পাশের লোক আমায় লেবু বেচেছিল—কিন্তু পাশাপাশি ওদের লেবুর ডালা—আমার ফোলিও ব্যাগ নগেনের ডালার পাশেই আমি রেখেছিলাম।

মানুষের মন বিচিত্র—লেবু কিনবার পর লেবুর থলে হাতে করেই আমি চলে গেলাম—মূল্যবান জিনিষপত্র ভরা ব্যাগ নিতে একদম ভুলে গেলাম। তারপর আমড়া কিনলাম আড়াই কিলো···তারপর চলে আসছি—তখনই স্মরণ হল আমার ব্যাগ।

হায়, হায়, হাতের ব্যাগ কোথায় গেল। মুখ শুকিয়ে গেল—এতগুলি দামী ঔষধ—তার উপর টাকা—তাছাড়া ত্রৈমাসিক টিকিট—সবশুদ্ধ একশ' দেড়শ' টাকা। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম।

ভাবতে ভাবতে চললাম—যেসব দোকানে জিনিষ কিনেছি তাদের কাছে সন্ধান করতে। আলু কিনেছি—প্রথমে চললাম আলুপট্টির দিকে। প্রথমে একজনের কাছে আলু কিনেছিলাম—তা সে যে দাম বলেছিল, দাম নেওয়ার সময় তার চেয়ে বেশী চাওয়ায় তার আলু ফেরত দিয়েছিলাম—আমার কেমন যেন মনে হল—সেইখানেই ব্যাগ ফেলেছি। যে আলু মাপছিল, সে তখন চলে গেছে—অন্য তিনটি ছোকরা তখন তার আলুর দোকানে। তারা বলল যে, তারা ব্যাগ দেখেনি—তাদের একজন বলল—ব্যাগ নিয়ে আমরা কি করব, পেলে আমরা দিয়ে দিতাম।

কিন্তু সন্দেহের বীজ অমূলক হলেও বেড়ে চলে। আমি তবু ভাবলাম যে, ওরাই ব্যাগ লুকিয়ে রেখেছে—ওদের আলু ফেরত দিয়েছিলাম, তারই জন্য ওরা মজা করছে। কিন্তু মজা করলেও না দিলে কি করব, খানিক তর্কবিতর্ক করে বিদায় নিলাম।

তারপর গেলাম নূতন আলুওয়ালার কাছে—তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তার কাছে যখন আলু কিনি, সে কি তখন আমার হাতে একটি চামড়ার বড় ব্যাগ দেখেছে। তারা তখন ব্যস্ত—ব্যস্ততার মধ্যে উত্তর দিল, না।

নফর কোলের বাজারে আসবার আগে গিয়েছিলাম আমার মেজ বোনের বাসায়—আমার এক ভাগ্নীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে। ভগ্নীপতি বেঁচে নেই—একটি মাত্র ভাগিনেয়—সে থাকে আমেরিকায়—আর প্রতি পত্রে লেখে "মামা, বোনেদের বিয়ে দিয়ে দিন।"

কিন্তু বিয়ে দেওয়া যে কি দুরূহ ব্যাপার, ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝবেন না। এখন সকল পাত্রই চায় ডানাকাটা পরী—কিন্তু ডানাকাটা পরীর দেখা যে মেলে না—এ কথা হয়রান না হলে কেউ ভাবে না—আর শুধু তাই নয়, অর্ধেক রাজত্বও চাই—কিন্তু আমরা যে রাজা নই—সে ভাবনাও তাদের থাকে না।

বাজারের থলে ছিল ফোলিও ব্যাগে—সে থলে খুলেছি নফর কোলের বাজারে—কাজেই বোনের বাসায় ব্যাগ ফেলে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু বিভ্রান্তির সময় মানুষের বুদ্ধি বিকল হয়। তাই মাইলখানেক দূরে বোনের বাসায় ছুটে চললাম। গলদ্‌ঘর্ম হওয়াই সার হল—সেখানে দরজা খুলেই ভাগ্নী বলল—"ব্যাগ ত আপনি নিয়ে গিয়েছেন।"

বাক্যান্তর না করে আবার ছুটলাম বাজারে। হন্তদন্ত হয়ে এলাম প্রথম আলুওয়ালার কাছে। যে মাপছিল সে তখন ফিরে এসেছে—অনেক কাকুতি করে তাকে বললাম, "দেখ ভাই—তোমার এখানেই ব্যাগ ফেলে গিয়েছি—ব্যাগটি নিশ্চয়ই তোমরা পেয়েছ।"

সে বলল, "না বাবু, আমাদের এখানে ফেলে গেলে নিশ্চয়ই পেতেন।"

নিরুপায় হয়ে দ্বিতীয় আলুওয়ালার দোকানে গেলাম। এবার সে বলল, "আমার এখানে যখন আলু কিনলেন, তখন আপনার হাতে একটা ব্যাগ ছিল।"

তাহলে ব্যাগ তারপরে কোথাও ফেলেছি। এমন সময় মনে হল যে ব্যাপারটি মার্কেট সুপারিন্টেডেন্টের গোচরে আনি। তিনি কোথায় বসেন—তখন তাঁরই সন্ধানে চললাম। একজনের কথামত এক স্থানে গিয়ে খোঁজ নিলাম। একজন বলল—"এখানে নয়, এগিয়ে যান—এগিয়ে গিয়ে দেখবেন দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি—সেইটি ধরে উঠলেই দেখবেন দারোয়ান বসে আছে—"

চলছি সেই সন্ধানে—হঠাৎ মনে হল সকলের খোঁজ নিয়েছি—লেবুওয়ালার খোঁজ নিই নি। লেবুওয়ালা যেখানে বসেছিল সেখানে এসে দেখি সে সেখানে নেই। আমিই তার শেষ খদ্দের—কাজেই তার বসে থাকার আশা করাই বৃথা। তবু সেখানে যারা বসেছিল তাদের কাছে সেই লোকের এবং ব্যাগের প্রশ্ন করলাম—সবাই বলল তারা কিছু জানে না।

ফিরতেই দেখি একটু দূরে এক কোণে ঝুড়ির মধ্যে আমারই হারাধন—আমারই জীর্ণশীর্ণ পরিচিত ব্যাগ। আনন্দে লাফিয়ে কাছে গিয়ে বললাম—"এইত আমার ব্যাগ।"

নগেন কর্মকার বলল, "আপনার জন্য এতক্ষণ বসে আছি বাবু—একটা গাড়ীও ছেড়ে দিয়েছি। উল্লসিত আবেগে বললাম—"তোমার নাম কি ভাই—তুমি আমার বড্ড উপকার করেছ ভাই—ব্যাগে আমার অনেক দামী জিনিষ ছিল। তুমি চা খেতে কিছু নাও ভাই।"

নগেন বলল, "না বাবু, চা খেতে কিছু নিতে পারব না—আজ লেবু বেচতে এসেছি—কিন্তু একদিন নগেন কর্মকারই গাঁয়ের সবার চেয়ে বড়লোক ছিল।"

তার হাস্য-সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে মানি ব্যাগের পয়সা মানি ব্যাগেই রেখে দিলাম—ফিরতে ফিরতে ভাবলাম—'আমাদের মত হতচ্ছাড়ারাই দেশের সব নয়, দেশে এখনও মানুষ আছে—এরাই দেশের সর্বনাশকে আটকাবে'।

'প্রবর্ত্তক'-এর পঞ্চাশ বছর

ডঃ অমলেন্দু সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

॥ ৫ ॥

বিগত শতকের শেষাশেষি ইংরেজি ভাব ও ভাষা বাঙালীর চিত্তে যে জাগরণের চাঞ্চল্য আনে তাহা ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় মুক্তি-আন্দোলন লক্ষ্যে একাগ্র ও তীব্র হইয়া উঠে। ইহারই ফলস্বরূপ কংগ্রেসের জন্ম হয়। বর্ত্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে কংগ্রেসের ঘন ঘটার মধ্যেই 'প্রবর্ত্তক'-এর আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের কালটিকে বুঝিতে হইলে কি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কংগ্রেস ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে তার একটুখানি পরিচয় থাকা আবশ্যক। প্রবর্ত্তক-এর সে সময়কার গতি-প্রকৃতি বুঝার পক্ষে ইহা সহায়ক হইবে। কারণ, প্রবর্ত্তকের কর্ণধার শ্রীমতিলাল অগ্নিবিপ্লব হইতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেও রাজনীতি হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন নাই। সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক আন্দোলন তাই প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনমোহন ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় মনীষির চেষ্টায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে এলবার্ট হলে এক জনসভার অধিবেশনে 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভা প্রতিষ্ঠার পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র উত্তর ভারতে এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে একটা সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিভ্রমণ করেন। তাহারই ফলস্বরূপ এবং ভারত সভার সদস্যগণের চেষ্টায় ১৮৮৩ সালে সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রিক সম্মেলনের (ন্যাশনাল কনভেনশন) অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে "ইলবার্ট বিল"-এর বিশেষ আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঠিক সেই সময়ে জাষ্টিস্ নরিসের অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ কারারুদ্ধ হন। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

ন্যাশনাল কনভেনশনের সাফল্য দেখিয়া ইংরেজ-কর্ত্তৃপক্ষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে এবং সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ মোহন বসু প্রমুখ রাজদ্রোহী বিপ্লবপন্থীদের প্রভাব খর্ব্ব করিতে না পারিলে যে সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দিবে, এ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব করার মানসে দেশের নরম-পন্থীদের, একটা রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপনের সহায়তা করার পরিকল্পনা বড়লাট লর্ড ডাফরিনের মনে জাগে। এবং ঐ রাজনৈতিক সংস্থা যাহাতে এ দেশের রাষ্ট্রিক চিন্তাধারাকে সংহত করিতে পারে তাহার জন্য একটা পরিকল্পনাও করেন। ঐ পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবন্ধু অ্যালেন অক্টাভিয়াস হিউমকে আহ্বান করিয়া এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহারই ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই সহরে। তখনকার দিনে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন চরমপন্থী। কাজেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উদ্যোক্তাগণ চরমপন্থী নেতাগণকে আমন্ত্রণ জানাইতে ভয় পান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি, কংগ্রেসের উদ্যোক্তা-গণের মধ্যে ভারতবন্ধু সিভিলিয়ান হিউমের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনের শাসননীতির ফলে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণ সরকারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। দেশের কোন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ, মহামারী ও সরকারী অনাচারের ফলে দেশময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই সময় হিউম সাহেব কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতীয়গণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন যাহার ফলে কংগ্রেস শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হইতে থাকে। কংগ্রেসের ৪র্থ অধিবেশন হয় এলাহাবাদে; এ যাবৎ প্রতি বৎসর রাজানুগত্য জানাইয়া কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও, রাজশক্তি কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের মধ্যে স্বীয় মৃত্যুর অঙ্কুর আবিষ্কার করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই চারি বৎসরের মধ্যে

কংগ্রেস যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া রাজপুরুষেরা শিহরিয়া উঠেন। কংগ্রেসের সহিত গণসংযোগের এই সম্ভাবনায় কর্ত্তৃপক্ষের টনক নড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজও নীতি পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য রাজশক্তি ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। ডাফরিনের শয়তানী ষড়যন্ত্রের ফলে দেখা দিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যা। ডাফ্‌রিন এই ভেদনীতির মাধ্যমে জাতির শিরায় শিরায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করাইবার কৌশল করিলেন। কংগ্রেস হতে মুসলমানদের সরাইয়া আনিবার জন্যই ডাফ্‌রিন প্রচার করিলেন হিন্দু মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি। কেবল ধর্ম্ম নহে, রাজনৈতিক স্বার্থও তাহাদের পৃথক। এইরূপে ভবিষ্যৎ মুস্‌লিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বের সেইদিন ডাফরিনই বীজ বপন করিয়াছিলেন। আজ তাহার বিষময় ফল জাতি ভোগ করিতেছে।

১৯১৬ সালে প্রবর্ত্তকে (২য় বর্ষ ২৩ সংখ্যায়) 'কংগ্রেস' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯০৬ হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের এক নিখুঁত চিত্র প্রদত্ত হয়। সমসাময়িক কালের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এবং কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রতি প্রবর্ত্তকের দৃষ্টিভঙ্গীটি বুঝা যাইবে বলিয়া প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত হইল।

"শিক্ষিত ভারতবাসী অতি দ্রুত জাগিয়া উঠিতেছে। এই জাগরণ সর্ব্বাঙ্গীন হইলেও, রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টাই ইহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে এবার যে দ্বাত্রিংশ জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইল, ইহাতে শিক্ষিত ভারত-বাসীর যে উৎসাহ, যে আকাঙ্ক্ষার আভাষ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে যে, "হোমরুল অথবা স্বায়ত্ত শাসন" না পাইলে জাতির কোন দিকেই উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র; অধিকন্তু ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেবের আশা-বাণীতে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র প্রতিনিধি এই কথারই পূর্ণ সমর্থন করিতে সমবেত হইয়াছিল।

"আজ আমাদের বাঙ্গালীর নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় মহাসমিতি লইয়া নানা রঙ্গের কথা মনে পড়ে। ১৯০৬ সালের কংগ্রেস-কাহিনী জাতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নরম গরম দলের অভ্যুদয়, পরস্পরের সহিত মতবিরোধ। ভারতের উন্নতির পথের পরিপন্থী সম্প্রদায়বিশেষের পরামর্শে, একদল অপর দলের উচ্ছেদসাধনে কিরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরাট মহাযজ্ঞে যে বিকট অভিনয় জাতির মজ্জায় মজ্জায় কলঙ্ক প্রলেপ লেপিয়া দিয়াছিল, ১৯০৬ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে সেই লীলাই সংঘটিত হইত—যদ্যপি মনীষী সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিশারদ দাদাভাই নৌরজিকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে না আহ্বান করিতেন। দেশপ্রেমিক নৌরজি ১৯০৬ সালের জাতীয় অধিবেশনে অত্যন্ত চতুরতার সহিত উভয় দলের মনস্তুষ্টি করিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিলেন। তিনি এক স্বরাজ কথা প্রচার করিয়া ভারতের জাতীয় জীবনে নূতন শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই নূতন শক্তিতরঙ্গ সকল বিভিন্ন দলকে ভাসাইয়া একই কেন্দ্রে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তথা-কথিত চরমপন্থীদের "বয়কট" "স্বদেশী" "জাতীয় শিক্ষা" প্রভৃতি মন্তব্যগুলি সেবারকার কংগ্রেসে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু দলাদলির যে বিদ্বেষ-হলাহল পরস্পরবিরোধী দলের মধ্যে সঞ্চিত ছিল, মহাসমিতির অবসানে তাহার বন্যা জাতির ভবিষ্যৎকে বিষময় করিয়া তুলিল। সুরাটের কংগ্রেস অভিনয়ের কলঙ্কের কথা শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রই অবগত আছেন। জাতির অস্থিমজ্জায় যে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিবার উপক্রম হইয়াছিল, গৃহবিবাদের ফলে তৎস্থলে জাতির জীবনে একটা অবসাদের চিহ্ন আসিয়া দেখা দিল। উন্নতিশীল দলের ভুলভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের উপযুক্ত ব্যবহার করিবার দিকে, তখনকার রাজনীতিবিদ্ স্বদেশপ্রেমিকদের কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় নাই, এবং নূতন দলের উচ্ছেদ যাহাতে

হয় তাহার কামনা অনেকেই মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন এবং এই গর্হিত মনোভাব কার্য্যে পরিণত করিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হন নাই। ইহার পর হইতে বাংলার অনেকেই কংগ্রেস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। জাতির মধ্যে অন্তর্বিরোধ হেতু, সনাতন চরিত্রে পাশ্চাত্ত্যের উৎকট বিষ প্রবেশ করিল, সুযোগ্য নেতার অভাবে কর্ম্মোৎসাহী বাংলার নন্দদুলালগণের কোমল অন্তঃকরণে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর হইতেই নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি বিকট কর্ম্মের অবতারণা হইতে আরম্ভ হইল। এই দশ বৎসর বাংলার কি দুর্দ্দিন যাইতেছে, তাহা আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। গত বৎসর লক্ষ্ণৌ জাতীয় মহাসমিতিতে বিদুষী বাসন্তীর প্রচেষ্টায় আবার দলাদলি মিটাইয়া একই মত ও পথে হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে চলিতে প্রতিশ্রুত হইল।

"এই দশ বৎসর ধরিয়া নানা আবর্ত্তনে ভারতবর্ষে যাহা হইয়াছে তাহারই প্রকাশ স্বরূপ এই কংগ্রেস। সুরাট কংগ্রেস হইতে যে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, কলিকাতাতে তাহারই পুনরভিনয় করিবার জন্য কয়েকজন তথাকথিত নেতা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দশ বৎসর ধরিয়া দেশ যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহাতে ১৯০৭ সালের মত ঘটনা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব, তাই আমরা এই মহামিলনের অভ্যর্থনা সভা হইতে কয়েকজনকে অপসৃত দেখিতে পাই, ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! যিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলার এই রাজনীতিক জটিল সম্প্রদায়বিশেষের নৈবেদ্যের চূড়াস্বরূপ অবস্থান করিয়াও দেশের জাতির গতি নির্ণয় করিয়া চলিয়াছেন।

"সুরাট দক্ষযজ্ঞে, লাঞ্ছিত অপমানিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যে নেতৃমণ্ডলী এতদিন নীরবে জাতির ভবিষ্যৎ গতি নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহারাই আজ আবার সদলবলে নবোদিত শক্তিসহযোগে জাতির কর্ণধার হইতে অগ্রসর হইয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যে সকল কর্ম্মবীর ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে আশা ও উৎসাহের কথা বটে। অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধাসম্পন্না, কার্য্যে তৎপরতা, দৈবশক্তিশালিনী বাসন্তী বিবির ভারতের জটিল রাজনীতিক মহাসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান—ইহা সুলক্ষণ ও সিদ্ধির পরিচায়ক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট সহস্র সহস্র ইংরেজী শিক্ষিত প্রতিনিধিবর্গের আশা ও আকাঙ্ক্ষা যাহাতে সফল হয় তাহার জন্য প্রার্থনা করি। ভগবান ইঁহাদের অন্তঃকরণে সাহস ও শক্তি প্রদান করুন—যেন তাঁহারা ভারতবর্ষের কল্যাণ ও উন্নতিবিধানকল্পে অবিচলিত চিত্তে বাধা ও বিঘ্নকে বিদলিত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।"

সুরাট দক্ষযজ্ঞের পর, নিখিল ভারত রাষ্ট্র মহাসভা ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার কংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত হইল। ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গতিও ভিন্নরূপ ধারণ করিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীমতিলাল "স্বদেশীযুগের স্মৃতি" গ্রন্থে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"সেই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ রাষ্ট্রবিৎ পণ্ডিতগণের সহিত আপোষে বঙ্গভঙ্গ রোধের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।...কিন্তু লর্ড মিণ্টোর অবসর গ্রহণের পরই, লর্ড হার্ডিঞ্জ এ দেশের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। তিনি ভারত-নেতৃগণের এক প্রকার অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, এইজন্য বাংলার এই সঙ্কটযুগে তাঁহার শাসনকার্য্য কি প্রকার হইবে, ইহা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাহার গুণগ্রাম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি চতুর রাষ্ট্রবিৎ হইলেও, তাঁহার সদ্ব্যবহারে ভারতের নেতৃবৃন্দ বিমোহিত হইলেন।

"১৯১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, বঙ্গভঙ্গজনিত ব্যথার কথা লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরকে বিদিত করার জন্য কলিকাতা টাউন হলে এক রাক্ষসী সভার আয়োজন হয়। এই সভার কথা শুনিবামাত্র বড়লাট সুরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠান। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রকাশ্য সভা অপেক্ষা বঙ্গভঙ্গ

রোধের উপায়স্বরূপ দেশের নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত এক মেমোরিয়াল প্রদানের সঙ্কেত প্রদান করিলেন।...তারপর গোপনে গোপনে বাংলার পঁচিশটি জিলার মধ্যে আঠারটী জিলার প্রতিনিধিবর্গের সই লইয়া তিনি এই মেমোরিয়াল লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট দাখিল করেন।.....এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ এমনই গোপন রাখিয়াছিলেন যে, কোন পক্ষই ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভের সুযোগ পান নাই।

"১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের মুখ দিয়া বঙ্গভঙ্গ রহিতের ঘোষণা হওয়া মাত্র দেশে উৎসাহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল।...বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণে স্বাধীনতার যে আগুন ধরিয়াছিল তাহা নিভিল না। বঙ্গভঙ্গ সেদিন উপলক্ষ্য হইয়া আসিয়াছিল, তাহা রোধ হইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রাণের আগুন নিভিবে কবে?

"অনেকে সুরেন্দ্রনাথকে ইহার জন্য দায়ী করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বৈধী আন্দোলনের সাহায্যে ভারতে শনৈঃ শনৈঃ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। তিনি যে রাজনীতিক জীবনের আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা হইতে কোনদিন বিচলিত হন নাই—সঙ্কল্পপূরণের জন্য তাঁর ছিল জলন্ত বিশ্বাস—দেশের দিক হইতে বিপ্লবের অশান্তি সৃষ্টিতে এবং রাজ্যশাসন নীতির কঠোর পীড়নেও তিনি বিচলিত হন নাই। বরিশালের পুলিসের লাঠিও তিনি যেমন অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, আবার দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অপদস্থ করার জন্য তাঁহার মাথা লইয়া গেণ্ডুয়া খেলার চিত্রও বাহির হইয়াছে—তিনি ছিলেন অটল নিথর হিমালয়, পরিশেষে তাঁরই চেষ্টায় দ্বিখণ্ড বাংলা অখণ্ড মূর্ত্তিতে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।"

মহাকাল

শ্রীসত্যেন জানা

সীমাহীন নীল আস্তরণ,—
বিস্তৃত, ধরণীর প্রান্তভাগে ঐ;
যেন মহাকাল,—সুষুপ্তির সুখ-শয্যা
লভিয়াছে হোথা নিস্তব্ধ, নিঝুম্।
কালের আবর্ত্ত যতো ঊর্ম্মি-ফণা ধরি'
ভাঙা-গড়া, ছেলেখেলা খেলিতেছে হেথা,—
সাগর বালুর চরে!
সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নায়,
রোমাঞ্চিত,—মাটির মানুষ
খেলিতেছে ধূলোখেলা সাগর-সঙ্গমে!
ঊর্ম্মি সাথে দোল খায়,—
ডুব দেয়,—সফেন ঊর্ম্মির বুকে
পুনঃ তোলে শির;
কালের আবর্ত্তে নাচে প্রাণের হিল্লোল,—
হাল্কা, লঘু, রঙীন পালক;
'হা-হা, হি-হি'—লঘু হাসি,
মুখরিত করে তোলে,—সাগর বালুর তট!
যতকিছু দম্ভ, আর শক্তির দাপট,—
সীমাবদ্ধ সকলি হায় ঐ বালুচরে,—
কালের আবর্ত্ত মাঝে,—ঢেউয়ের কল্লোলে!
ঊর্ম্মি সাথে জাগে তারা
ঊর্ম্মি সাথে ভাঙে,—
স্তব্ধ হয় প্রাণের হিল্লোল;
পুনরায় উঠে কলরোল,—
নতুন হাসির ঢেউ, নতুন পুলক,
জেগে-ওঠা সাগরের কূলে,—
নতুন ঢেউয়ের সম;
হাসি-কান্নার আবর্ত্ত, এইমত চলিয়াছে
চিরন্তনী পথরেখা বাহি'
কত কাল, কত যুগ,—কে বলিতে পারে!
ঊষার আলোকে জাগে—মিলায় সে রাত্রির আঁধারে!
মহাকাল,—স্তব্ধ নীল,—
অনন্ত শয়নে শায়ী,—নিস্তব্ধ নির্ব্বাক!
অনুভূতি নাই তার,—নাই তার চেতনার সাড়া
নাই কোনো হাসি, কান্না সুর!
বালুচরে বসি' তাই চাহি যতদূর,—
নীল, নীল, শুধু ঘন নীল,
অসীমের চক্রবাল সীমার রেখায়
লভিয়াছে মিল,—
নীলাম্বর নীলিমায়, আত্মভোলা রূপ,
অপূর্ব্ব, অদ্ভুত!
দীপ্ত গরিমাময় এই মহাকাল,
এই সেই ধ্যানমগ্ন, যোগী মহেশ্বর,—
শিলাময় নীলিমার
অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের বিকাশ,—
ভয়াবহ, স্তব্ধ ধীর,—নীলাম্বু জলধি!

চিঠি-পত্র

খড়দহ, ২৪ প:
১৩. ৮. ৬৫.

সম্পাদক সমীপেষু

'প্রবর্ত্তক'-এর আমি একজন শ্রদ্ধাশীল পাঠক। আষাঢ় সংখ্যাব সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (ইতিহাসের পথে ভারত-জাতীয়তা) ভারতবর্ষের জাতীয়তাকে একটি বিশিষ্ট ভাবধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশের অন্তর্নিহিত ভাব ও তার বাহ্যিক প্রকাশ একটি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করার এই আন্তরিক প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

প্রবর্ত্তক-এর সম্পাদকীয় বরাবরই নির্ভীক ও বলিষ্ঠ। ভাবের গভীরতা, ভাষার সৌন্দর্য ও বিশ্লেষণের আশ্চর্য নিপুণতা এই প্রবন্ধে প্রকাশিত। মানুষের জয়যাত্রার যে মূল ভাবধারাটি ভারতীয় ঋষিগণ উপলব্ধি করেছেন, সেই উপলব্ধ সত্যটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে বেদ থেকে সুরু করে 'রেনেসাঁ'র ভেতর দিয়ে গান্ধী-জহরলাল-নেতাজী পর্যন্ত টেনে সংঘশুরুতে শেষ করা হয়েছে।

তবু একথা স্বীকার্য যে, ইতিহাসের পথে ভারত-জাতীয়তাকে প্রবাহিত করা সহজ নয়। কারণ, অতীত ভারতের সংস্কৃতি একটি ভাব, একটি উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বেদের সূত্র বা উপনিষদের গভীর জ্ঞানের গভীরতা থেকে ভারতের একটা সমষ্টিগত মানব চেতনার সন্ধান মিললেও, সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া বেদ উপনিষদেরও পূর্বেও ভারত-সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ধারা ছিল। সেই ধারাটিকে বেদের বা পরবর্তী ধারার সংগে যুক্ত না করলে ভাবগত চেতনা ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। সিন্ধু উপত্যকা-সভ্যতা আজ অপ্রকাশিত নয়। এই সভ্যতার ভাবধারা থেকে বেদ-উপনিষদ কতটুকু নিয়েছে, কতটুকুই বা বর্জন করেছে তা যথার্থভাবে নির্ণয় করার দাবীটা স্বাভাবিক।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতাকে ভারত-জাতীয়তার ক্রম-প্রকাশের প্রথম ধাপ বলা যায় না কি? সে সভ্যতাটি স্থায়ী ছিল দীর্ঘকাল ধরে—খৃঃ পূর্ব ৩০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত। অথচ বেদের যুগ দেখা যাচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৮০০ পর্যন্ত। সিন্ধু-সভ্যতা এক হাজার পাঁচশ' বছর একটানা ভাবে চলে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এত বড় একটা সভ্যতা ধ্বংস হবার কারণ কি? আর্যরা জোর করে সে সভ্যতা ধ্বংস করেছিলো কি? বাংলা দেশেব যে বৈশিষ্ট্যের কথা সম্পাদকীয়ে উল্লিখিত হয়েছে তা কি সিন্ধু-সভ্যতার অবদান নয়? কারণ আর্যগণ তৎকালীন বাংলাদেশকে কখনও জয় করতে পারেন নি।

পরবর্তীকালে গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে যে ভাবধারা গড়ে ওঠে তাতেও এ দেশের বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের ভাবধারায় একটি সামগ্রিক রূপ ধরা পড়েছে। প্রাণ ও আত্মা আপন আপন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ খুঁজেছে। হয়তো দীর্ঘ যাত্রাপথের কোন এক ধাপে এদের সমন্বয়ও সাধিত হয়েছে। কিন্তু তা মনে হয় ক্ষণিকের জন্য। ইতিহাসের চলার-পথে কখন যে তা হারিয়ে গিয়েছে তা আজ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু আত্মিক চেতনায় তার স্বাক্ষর রয়েছে।

হাজার হাজার বছরকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতের চিন্তায় সমষ্টিগত চেতনার অন্তর্নিহিত ভাবটি ধরা দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাণ-ধর্মের সহজ বিকাশের অন্তরায় থেকেই গেছে। উপলব্ধ সত্য, আত্মিক সত্যকে সামাজিক স্তরে টেনে এনে একটা বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা যায় নি। তার ফলেই জাতীয়তা বা ধর্মকে একান্তভাবে গ্রহণ না করে ব্যক্তিগত মুক্তি কামনায় শক্তিমান ও যোগ্য মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। কাজেই সমাজ হয়েছে দুর্বল—রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রীতিনীতি, অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙ্গে গেছে—বার বার করে পরাধীন হয়েছে এই ভারতবর্ষ। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার যুগে ভারতের আত্মিক ও প্রাণিক স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে কি?

যে সভ্যতার চিন্তার বনিয়াদ এত দৃঢ় সে সভ্যতা বার বার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারিয়েছে কেন? কেনই বা হাজার বছর ধরে বীর্যহীনতার পরিচয় দিয়েছে?

ভারতীয় চিন্তায় আত্মার আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ। আবার এই আত্মিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ভারতের বাহ্যিক পূর্ণতার অন্তরায়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "But this high and noble ideal brought some evils in its train. The best minds turned away from the world and their service was lost to the society."

সত্যিই ভারতীয় চিন্তায় ও কর্মে দুর্বলতা এখানেই। ব্যক্তিগত মুক্তির ঐতিহ্যের পথেই বার বার মার খাচ্ছে আমাদের ধর্ম। এই মার খাওয়াকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডঃ মজুমদার আবার বলেছেন, "There was a spirit of escapism, in the garb of spirituality."

রেনেসাঁর যুগে একটা নূতন চেতনার উদ্বোধন হয়েছিল। তখন ধর্ম ও জাতীয়তার একটি অভিন্ন আদর্শ গড়ে উঠেছিল। একটা বীর্যের সাধনায় জাতীয়তার রূপ ধরা দিয়েছিল। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তা মিলে গিয়েছিল একটি ভারতীয় বোধে। এই বোধটিকেই ভারতীয় চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ বলা চলতে পারে। এই বিকাশের একটি পরিপূর্ণ চিত্র দেখা গিয়েছিল তৎকালীন বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও আত্ম-উপলব্ধির ভেতর দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেরই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মুক্তির প্রেরণা এসে গিয়েছিল। তাই সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঠিকই বলা হয়েছে, "এই জাতীয়তা-ভিত্তিক হিন্দু রেনেসাঁর ফলেই বাংলায় বিপ্লব-উত্তরকালে বিপ্লবীদের দ্বারাই সংগঠিত আধুনিক যুগসম্মত বহু ধর্ম প্রতিষ্ঠানে (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে) গুরুপরম্পরা সাধনধারাটি বাষ্টি স্বরূপ সিদ্ধি লক্ষ্যে শিষ্যপরম্পরা ধৃত হইলেও, সামগ্রিক ও জাতীয়তার সাধনা ও সিদ্ধি হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।"

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংকীর্ণতা থেকেই যায়। এই সংকীর্ণতাই ধীরে ধীরে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেখানেও জাতীয়তার ব্যাপক বোধের কোন স্থান নেই। তাই যেন মনে হয় রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতীয়তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। তাই শ্রীঅরবিন্দ যথার্থ-ভাবে বলেছেন, 'Governance by the Dharma of India's social, economic and even her political rule of life, system, turn of existance.'

কিন্তু এই ধর্মকে কি করে কোন্ পথে পূর্ণতা দেওয়া যাবে? রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে ধর্ম-সাধনা সে সাধনা আর যাই হোক ইহা যে জাতীয়তার সাধনা নয় তা নিশ্চয় করে বলা চলে। অথচ ধর্মের নামে রাজনীতিকে বর্জন করার প্রবণতাই প্রবল।

জীবনই ধর্ম, জীবন বোধের প্রতি স্তরের সাধনাই ধর্মের সাধনা। এই সাধনার পথেই জাতীয়তার মুক্তি।

কাজেই সে-পথে পথ চলার ধারাটি পরিষ্কার করে বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কোথাও কোন ধোঁয়া থাকলে চলবে না। উপলব্ধি স্তর থেকে সুরু করে একেবারে বাস্তব স্তরের নিখুঁত চিত্রটি চাই।

ভারতীয় ধর্ম কি? এ ধর্ম কি কেবলই হিন্দুধর্ম? ভারত-জাতীয়তার যে সমষ্টিগত আত্মা তা তো শুধু হিন্দু নয়। ভারত হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান সবারই। কাজেই কেবল হিন্দু রেনেসাঁর উল্লেখে জাতীয়তার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব কি?

বেদ-উপনিষদের জ্ঞান বিশ্বমানবের জন্য। আর জাতীয়তার ক্রমবিকাশও মানব চেতনার। এই মানব-বোধই জাতীয়তার মূল কথা। কাজেই হিন্দু ধম নয়, ভারতীয় ধর্মই আমাদের কাম্য।

ভবিষ্যতে প্রবর্ত্তক-সম্পাদকীয়ে এই সব চিন্তা ও প্রশ্নের উপর আলোকপাত আশা করিয়া থাকিব।

শ্রীসুবোধ চক্রবর্ত্তী

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

রুচি :

বিখ্যাত "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকায় "সাহিত্যে রুচি ও নীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন, "দেশমাতৃকার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াও কবি (রবীন্দ্রনাথ) নিজের বিকৃত রুচি ঢাকিতে পারেন নাই। বলিতেছেন—"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী"।

"জননীর রূপের কথা কি এমন করিয়া বলিতে আছে?" হরি! হরি! যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। রবীন্দ্রনাথের বিকৃত রুচির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া সমালোচক মহাশয়ের হৃদয় যে নিতান্তই শুষ্ক এবং অগভীর তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মা যে আমার সত্যই ভুবনমোহিনী! একথা যে তন্ত্রে লেখা আছে। একি রবীন্দ্রনাথের কথা? উপরন্তু মাতৃমন্ত্রে সিদ্ধ রামপ্রসাদ কি বলিয়াছেন শোন—

কে রে ঐ মনোমোহিনী।
যার ঢল ঢল তড়িৎপুঞ্জ মণি মরকত কান্তি ছটা,
এ কি চিত্ত ছলনা দৈত্যদলনা-ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী।
আবার অধর বিগলিত, বিম্ব বিনিন্দিত কুন্দ বিকশিত
সুদর্শনে।

আবার—"সমর করে কে ঐ রমণী কুলবালা
ত্রিভুবন মোহিনী॥" প্রভৃতি।

যদি মা বলিলেই সন্তানের হৃদয় ভক্তি ও প্রেম ভরিয়া যায় তখনই ত মায়ের রূপ ধরা পড়ে, তখনই বুঝি মায়ের রূপের সীমা নাই, সেই রূপ প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই না। জানি না, অমরেন্দ্রবাবু ঐ ভুবন-মনোমোহিনীর মধ্যে কি দুর্নীতির সন্ধান পাইলেন—অবশ্যই মহাকৌল মাতৃসাধক রামপ্রসাদের অপেক্ষা সমালোচক মহাশয় মাতৃমহিমা কমই বুঝেন।

সমালোচনা খুব ভাল জিনিষ—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখি একদেশদর্শিতার ফলে সমালোচক-গণ প্রতিভার আদর করিতেও কুণ্ঠিত হন। প্রতিভা যে জাতির প্রাণ, একথা স্মরণ রাখিয়া বাণীর সাধনা করিলে দেশের মঙ্গল হয়।

ভলান্টিয়ার প্রসঙ্গ :

বাঙ্গালীর চির দুর্নাম যে, তাহারা "ভেতো" তাহারা কাপুরুষ, তাহারা স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। পাখীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া তার উড়িবার শক্তি নাই বলা এবং উক্তরূপ কলঙ্ক আরোপ করা উভয়ই তুল্য করা। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর দুর্নাম ঘুচাইবার পথ অবরুদ্ধ ছিল। সম্প্রতি প্রজাতন্ত্র ফরাসীরাজ এই মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী সেনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই অল্পদিনের মধ্যে তাহা যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর জানিয়া রাখা উচিৎ। এইজন্য আমরা ফরাসী উপনিবেশের পদাতি সেনাধ্যক্ষ মঁসিয়ে এ. জিলে ৭ই জুন শ্রীমতিলাল রায়কে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার বাংলা অনুবাদ দিলাম। :

"মহাশয়, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার নিকট আমি অপরিচিত, তত্রাপি অতি আনন্দের সহিত চন্দননগর সৈনিকদিগের সংবাদ আপনাকে জানাইতেছি—তাহারা সকলেই শারীরিক কুশলে আছে এবং পণ্ডিচেরিতে আসিয়া অবধি তাহারা যেরূপ যোগ্যতার সহিত কার্য্যাদি করিতেছে তাহাতে তাহাদিগকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। এই অল্পবয়স্ক যুবকগণ সকলেই সৎ—তাহাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনও দোষই দেখি নাই। ইহারাই আমার সকল সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল (Champions), এই কথায় একটু মাত্রও অত্যুক্তি নাই।

এইমাত্র সংবাদ পাইলাম আমাদিগকে জিপুতির পরিবর্ত্তে ফ্রান্স দেশের মার্সাই (Marsailles) নগরে গমন করিতে হইবে। আমি আপনাকে ইহাই জানাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি যে, সেখানে আমি ইহাদের অভিভাবকস্বরূপ থাকিব—আমার ইউরোপীয় সেনা-দিগের প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার করি, ইহারা বাঙ্গালী হইলেও ইহাদের প্রতি আমি তদ্রূপ আচরণই করিব এবং ইহাদিগকে পিতার ন্যায় স্নেহ করিব। ইহারা সকলেই ফ্রান্সে দাঁড়াইয়া মাতৃভূমির সেবার জন্য লালায়িত এবং ইহাতেই ইহারা সুখী। আপনি সেনাগণের পরিবারবর্গকে জানাইবেন যে, পুত্রের মত আমি ইহাদের সতত দেখিব এবং রক্ষা করিব। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবেন।

(সহি) এ. জিলে
লেফ্‌টনেন্ট পদাতিদল, পণ্ডিচারী।

পুনশ্চ : এই মাসের শেষাশেষি আমাদের যাত্রা করিতে হইবে।"

শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত

স্বামী চিদানন্দজী-স্মরণে

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

ভোর রাত্রে নলিনদাকে স্বপ্নলোকে দেখ্‌লাম—শিশুর মত স্মিত সারল্যময় মূর্ত্তি—কিন্তু স্বামী চিদানন্দজীকে ত দেখ্‌লাম না! অথচ আজ ২৭শে আগষ্ট—তাঁরই স্মরণ-দিবস। ইন্দু-ভায়ের স্মারক-লিপিও পরশু রাত্রে পেয়েছি। রাত্রে শয়ন-পূর্ব্বে সে কথা মনেও জাগরূক হয়েছে কয়েকবার—আজ ভোরে উপাসনান্তে তাঁর স্মরণে কিছু লেখা দিতে হবে বল্লে। স্বামী চিদানন্দজী কি সূক্ষ্মলোকে এখন আর নেই? হিন্দু-শাস্ত্রের মর্ম্মালোকে এ কথা ভাবা কি ঠিক হবে যে, স্বামীজি স্থূল জগতে আবার দেহ গ্রহণ করেছেন—তাঁরই গুরুদত্ত পূর্ব্ব মিশন-প্রেরণা নব রূপে, নব দেহে সিদ্ধ করার জন্য?

স্বামী চিদানন্দজীর স্বপ্নমূর্ত্তি কয়েকবার ইতঃপূর্ব্বে দেখেছি। আমার মানসলোকে তাঁর যে ধ্যান-রূপ, তার শব্দচিত্র এই ছন্দোবদ্ধ অর্ঘ্যতর্পণে আঁকারই প্রয়াস আছে—

"সঙ্ঘত্রিভুজের মেরু চিদানন্দ সঙ্ঘপ্রাণ—
নির্ম্মল চন্দ্রেরি সম স্বচ্ছ পুণ্যে দীপ্তিমান্।
সিদ্ধবিশ্বাসের জ্যোতিঃ
চরণে বিদ্যুদ্-গতি
প্রত্যয়ের অগ্নিমন্ত্রে তপঃ-জ্যোতিঃ মূর্ত্তিমান্।
স্বামী চিদানন্দ যোগী, সঙ্ঘাগ্রজ, মাতৃপ্রাণ।
অমর সে প্রাণবলি
সঙ্ঘে দিল জয়ডালি
মৃত্যুঞ্জয়ী বীরবেশে আজো পাই দরশন—
দণ্ডধারী সঙ্ঘনেতা করে সঙ্ঘ-সংরক্ষণ।
অশ্রু নাহি, বাষ্পঘন
সঙ্কল্পের মূর্ত্তি যেন
ভুবনে সঙ্ঘের সিদ্ধি তাঁর ব্রত চিরন্তন॥

'ভুবনে সঙ্ঘের সিদ্ধি—তাঁর ব্রত চিরন্তন।'—ইহা প্রত্যয় করি, তাই তাঁর 'দণ্ডধারী বীর রূপ' আজ কয়েক বৎসর যাবৎ স্বপ্নজগতে না দেখ্‌তে পেলেও, সঙ্ঘকে লক্ষ্যপথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে অমর প্রেরণা তাঁর মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলন্ত হয়ে উঠেছিল, উহা যে বিদেহে বা দেহে অনির্ব্বাণ হয়েই রয়েছে—ইহা না ভেবে পারি না।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এমনই এক থম্‌থমে মেঘমেদুর ২৭শে আগষ্ট তারিখে চিদানন্দজীর মহাপ্রয়াণ—সঙ্ঘগুরু স্বয়ং নির্ম্মম নিষ্করুণ চেতনায় যেন ত্বরান্বিত করে' তাঁর রুদ্ধ রোগজীর্ণ দেহবন্ধন থেকে তাঁকে মুক্ত করলেন—তাঁর কর্ম্মভার তুলে' দিলেন তরুণ গুরুনিষ্ঠ কর্ম্মী সঙ্ঘপ্রাণ কৃষ্ণধন ভায়ের উপর—সঙ্ঘের এক যুগান্তর হ'ল সেদিন। চিদানন্দজীর সন্ন্যাস-বীর্য্য সঙ্ঘজীবনে ও অর্থ-ক্ষেত্রে যে আদর্শোজ্জ্বল প্রেরণা রেখে গেছে—সঙ্ঘের মূল কেন্দ্রে একটা শিলাস্তূপ মাত্র ছাড়া তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন আর কিছু আমরা এখনও রাখতে পারি নি—সঙ্ঘের এই অর্থপ্রতিষ্ঠানের সোপানপথে রক্ষিত তাঁর এই প্রতিকৃতি—প্রতিদিনের যাতায়াত পথেই কর্ম্মীদের স্মরণ করায় কি না জানি না—আমি এখানে এলেই একবার চিদানন্দ স্বামীজির তপোমূর্ত্তির পানে চেয়ে অন্তরে প্রণতি জানাই—উৎকীর্ণ শ্লোকটীও সময় পেলেই একবার অনুচ্চ উচ্চারণে বা নীরব নেত্রে পাঠ করি—

"বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষা লভি তব শক্তির স্ফুরণ,
চিদানন্দ নাম তাই করেছিল তোমারে বরণ।
ত্যজি অপবর্গ লোভ সাধি মহামানব মঙ্গল,
সঙ্ঘ-ধর্ম্মে সঁপি প্রাণ জন্ম তব করিলে সফল।"

—এই বাণী ও রূপ প্রবর্ত্তক ট্রাষ্টের সকল সাধক ও কর্ম্মিবৃন্দকে অহরহঃ প্রেরণা দিক—সঙ্ঘের অর্থসাধনাকে নিত্য সঞ্জীবিত রাখুক সঙ্ঘত্বেরই আদর্শে ও উৎসর্গ-চেতনায়।

প্রণাম জানাচ্ছি—শ্রদ্ধায়, প্রেম ও প্রীতিভরে, সঙ্ঘ-চেতনারই অভিন্ন প্রত্যয়-নম্রতায়—সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্ঘাত্মাকে:

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, হরিঃ ওঁ

সমালোচনা

শ্রীশ্রীদেবী শক্তিমাতা :

শ্রীশ্রীদেবী শক্তিমাতার শততম জন্মতিথি (১০ই ভাদ্র '৭২) উপলক্ষে মাতৃকাশ্রম-প্রণব সঙ্ঘ, ১৫ বি, ঈশ্বর গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬ হইতে আলোচ্য পুস্তিকাখানি প্রকাশিত। পুস্তকে শক্তিমাতা ও দেবী-মাতার যুগল চিত্র ও মাতৃকাশ্রম-প্রণব সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভে এই অসাধারণ মহামহিমসী মাতৃযুগলের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম্মের রেখাচিত্র এবং ইঁহাদের কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানমূলক সহজ উপদেশ পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। "মানুষের শুভমতি আর প্রাণঢালা ভালবাসা দূরের কাছের জনকে আপন করে"—শ্রীদেবী শক্তিমাতার উপদেশের সারমর্ম্ম। উপদেশগুলি সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন—সকলেই পাঠে উপকৃত হইবেন। ইংরাজী ও বাংলায় পুস্তকখানি লিখিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

কল্যাণ কল্পতরু : বিশেষ সংখ্যা।

গোরক্ষপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত কল্যাণ পত্রিকার ধর্ম্ম ও শাস্ত্র প্রচার বিষয়ে অতুলনীয় অবদান সর্ব্বজনবিদিত। আলোচ্য কল্যাণ কল্পতরু বাল্মীকি রামায়ণের আরণ্য কাণ্ডের বিশেষ সংখ্যা। দেবনাগরী হরপে মূল শ্লোক এবং ইংরাজীতে উহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। আটখানি ত্রিবর্ণ চিত্রে সুশোভিত। ইংরেজি শিক্ষিতদের পক্ষে বাল্মিকী রামায়ণ জানার সুবিধা হইবে। এই সংখ্যার প্রথমেই পরিবেশিত গীতা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও কল্যাণ পত্রিকার প্রাণপুরুষ শ্রীজয়দয়াল গোয়েন্দাজীর মহাপ্রয়াণ সংবাদে সকলেই ব্যথিত হইবেন। অত্যন্ত মহাপ্রাণ, সৎ ও সাধুপুরুষ ছিলেন তিনি। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার ঊর্দ্ধগতি কামনা করি।

আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি—

'নিউ ডিল এবং তারপর', 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি' 'কৃষি উন্নয়ন', 'ব্যবসায়ের বিবর্ত্তন', 'শিল্পবোজনার সামাজিক দায়িত্ব' 'স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনকল্যাণ', 'অববাহিকা উন্নয়ন', 'শ্রমজীবী উন্নয়ন' এবং 'নাগরিক অধিকার উন্নয়ন'—এই ন'টি বিষয়ে বিগত ত্রিশ বৎসর যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহারই দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন প্রত্যেকটি বিষয়ের দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ। আলোচ্য পুস্তকে সংক্ষেপে বিশ্বের বিস্ময় আমেরিকার বৈষয়িক অগ্রগতি এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনের মান ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিখুঁত সচিত্র হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বইখানি প্রত্যেকটি লেখকের পরিচিতি ও চিত্র সম্বলিত।

Aggression from the North :

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রীয় বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। উত্তর ভিয়েৎনাম কর্ত্তৃক দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বিজয় অভিযানের আগা-গোড়া সচিত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণী। মানচিত্র ও প্রামাণ্য তথ্যসমূহও বিবৃত। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে দীর্ঘ জটিল সংঘর্ষের একটা মোটামুটি ধারণা পাঠকসাধারণ এই আলোচ্য পুস্তক হইতে পাইবেন।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

The Cultnral Heritage of Bengal : Sri Kali Kinkar Sengupta M. A. ; B. SC., M. B..

সুকবি ও চিন্তাশীল লেখক ডাঃ সেনগুপ্ত গোটা ভারতবর্ষকে এক ক্ষুদ্র পুস্তকে সীমিত করে এনেছেন। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সুরক্ষিত হয়েছে এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে। অদ্ভুত এবং অপূর্ব্ব নৈপুণ্য লেখকের। এ যেন কয়েকটা রেখা টেনে লেখক একটা চিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এ চিত্রও আবার যে সে চিত্র নয় ভারত-সত্তার বিরাট্ ভূচিত্র। সংক্ষেপে ভারতবর্ষকে জানতে হলে এই বইখানিই যথেষ্ট।

শ্রীইন্দুগুপ্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা—উইলিয়াম এল, মিচেল। মুদ্রক ও প্রকাশক : ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা।

বর্ত্তমানে প্রায় প্রতিটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রচলিত। এককালে ছিল সমাজের জন্য ব্যক্তি। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যায় সমাজ প্রত্যেকের জন্য। ব্যষ্টিবোধ বিলুপ্ত হয়ে এসেছে সমষ্টিবোধে। মানুষের জীবনে নিরাপত্তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সমাজ যেখানে ব্যক্তির নিরাপত্তার ভার নেয়, নিরাপত্তার সেখানে বিশেষ মূল্য আছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকামনায় এই আইনের সৃষ্টি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট বিশেষ বাণী প্রেরণ করেন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করার পর সামাজিক নিরাপত্তা বিধি আইনে পরিণত হয়। এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় বৃদ্ধ বয়সে সাহায্য, বেকার বীমা, বয়স্ক দুঃস্থ, অন্ধ রোজগারীর উপর নির্ভরশীল শিশুদের এবং মাতৃমঙ্গল, শিশুস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণকর কর্মের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। পুস্তকটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা আইনের ইতিহাস, বিভিন্ন দিক ও অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিসংখ্যান সহ তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় তথ্যানুসন্ধীর পক্ষে পুস্তকটি সুবিধা হইবে।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সাময়িকী

স্বামী চিদানন্দজী স্মরণে :

গত ২৭-এ আগষ্ট (১০ই ভাদ্র '৭২) বেলা এগার ঘটিকায় কলিকাতা প্রবর্ত্তক ভবনের সোপান-পথে প্রলম্বিত পুষ্পমাল্য শোভিত স্বামী চিদানন্দজীর তৈলচিত্রের সামনে ধূপধুনা-সুরভিত আবহাওয়ার মধ্যে প্রবর্ত্তক ট্রাষ্টের কর্ম্মিবৃন্দ সনিষ্ঠায় স্বামিজীর ত্রিংশ বার্ষিক তিরোভাব তিথি স্মরণ করেন। প্রবর্ত্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী কর্ম্মিগণের পক্ষে স্বামিজীর জীবন ও মিশন বিষয়ে উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের প্রেরিত বাণী (স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল) পাঠ করেন। অতঃপর সমবেত সংক্ষিপ্ত সঙ্ঘোপাসনার পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বিজ্ঞান-চর্চ্চায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাধান্য :

ভারতে বৈজ্ঞানিক সমিতির উদ্ভব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা-পরিষদ যে সমীক্ষা-কার্য্য চালাইয়াছিল তাহাতে প্রকাশ পায় যে, সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞান-সচেতন রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গে—প্রধানতঃ কলিকাতায় সবচেয়ে বেশী সর্বভারতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমিতি আছে। ইহাদের সংখ্যা ৪১টি। বিজ্ঞানচর্চ্চায় উৎসাহদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গেই প্রথমে (১৭৮৮) খৃষ্টাব্দে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক সমিতি দি ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স (ভারত) কলিকাতাতেই অবস্থিত। এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪২,৮৮৭।

পশ্চিমবঙ্গের পরেই মহারাষ্ট্র এবং তাহার ঠিক পরেই দিল্লীর স্থান। মহারাষ্ট্রে ৩১টি এবং দিল্লীতে ২৯টি বৈজ্ঞানিক সমিতি আছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। সমিতিগুলির অধিকাংশই কলিকাতা বোম্বাই, দিল্লী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি সহরে অবস্থিত। মোট ১৫০টি বৈজ্ঞানিক সমিতির মধ্যে ১১৮টি সমিতিই এই সমস্ত সহরে অবস্থিত।

লেডী অবলা বসু :

১৮৬৫ সালের ৮ই আগষ্ট অবলা বসু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় (পরে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় এবং আরও পরে বেথুন বিদ্যালয়ে নামান্তরিত) হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। ১৮৮৬ সালে বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশ বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লেডী বসু স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সাহচর্য্যে কণ্টকময় রাজনীতিতে তাঁহার অপ্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিয়াছিল। স্বামীর মতই লেডী বসুর দেশাত্মবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। সত্যের পূজারী লেডী বসু বহুবার স্বামীর সহিত ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা অতিক্রম করিয়া লেডী বসু নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করেন। বিবাহিতা নারীর অবগুণ্ঠন-প্রথা উন্মোচন আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া তিনি দাঁড়ান। ১৯১০ সালে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকারূপে নির্ব্বাচিতা হন। ১৯১৯ সালে নারী শিক্ষা সমিতি গঠন করেন। ঐ সমিতির চেষ্টায় বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় (পরে মুরলীধর গার্লস স্কুল ও কলেজ) এবং শ্যামবাজার বিদ্যালয় ও নারিকেলডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে বেলতলা বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত হুগলী-হাওড়ায় ৮টী এবং ঢাকা ফরিদপুরে ১৪টী বালিকা বিদ্যালয়ও এই সমিতির প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। এই সমিতির অন্যতম স্মরণীয় কাজ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শিল্প ভবনের প্রতিষ্ঠা। ১৯৫১ সালে ২৬শে এপ্রিল এই মহীয়সী মহিলা দেহত্যাগ করেন। বর্ত্তমান ৮ই আগষ্ট হইতে বৎসরকাল লেডী বসুর জন্মশতবার্ষিকী স্মৃতি উদ্‌যাপনের আয়োজনে বাঙালীর আন্তরিক সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

রুশভাষার অধ্যাপিকা শ্রীমতী নিলা :

শ্রীমতী নিলা বাংলাভাষা শিক্ষার জন্য সম্প্রতি এ দেশে আসিয়াছেন। তিনি বলেন 'বাংলা ভাষা শেখার ভারী সখ আমার।' যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের যে সকল ছাত্র রুশ ভাষা শিখিতেছে তাহারা সকলেই শ্রীমতী নিলার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমতী নিলা রুশ ভাষা শিক্ষার এইরূপ আগ্রহে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। তিনি এদেশে রুশ ভাষায় উচ্চতর শিক্ষার কোর্স প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।

দীর্ঘজীবীদের দেশ :

রাশিয়ার জর্জ্জিয়া দেশের ৩২০০০ মানুষের মধ্যে ৮০ বৎসরের এমন কি ১০০ বৎসর বয়স্ক নরনারীর সংখ্যা অনেক। ইহারা কেহ থুরথুরে বা অথর্ব নহেন। স্বাস্থ্য ভালো, স্মৃতিশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ। স্বাভাবিক মানুষের মতই চলাফেরা ও কাজকর্ম্ম করেন এমন কি ৯০।১০০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধেরাও নাচগানের দল গঠন করিয়াছেন। ইঁহাদের অধিকাংশই ধূমপান করেন না।

পণ্ডিচারী অরবিন্দ আশ্রম :

বিগত ভাষা আন্দোলনে পণ্ডিচারী আশ্রমে যে গোলযোগ হয় সেই সম্বন্ধে সরকারী কমিশনের অনুসন্ধান রিপোর্টে জানা গিয়াছে, ইহা নিছক বিদ্বেষমূলক। আশ্রমের হিসাবমত ১৫০০০০৲ এবং সরকারী হিসাবে ৫০০০০৲ টাকা ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ, পণ্ডীচারীর বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই আশ্রম-এর সঙ্গে সহযোগিতায় নারাজ। ইহার একটি প্রধান কারণ আশ্রম-সংস্থা সাধারণভাবে নাগরিক-গণের মেলামেশা করিতে ও তাহাদের সহিত অবাধ আলাপ-আলোচনায় অনিচ্ছুক। আশ্রমে বহুবিধ অর্থকরী প্রতিষ্ঠান, ভারত গভর্ণমেণ্টের উদার অর্থ সাহায্য এবং সমুদ্র-সৈকতের বহু সৌধ প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যও এই জাতক্রোধের অন্যতম কারণ। ভাষা আন্দোলন ব্যাপারে এই আশ্রমের কোন সংস্পর্শ না থাকিলেও, এই সুযোগে বিরুদ্ধ পক্ষ কিছুটা আক্রোশ উদ্ধার করিয়াছেন—গুণ্ডা বদমায়েস নিয়োগ করিয়া।

দুই মহাকবি-সাক্ষাতের স্মরণোৎসব :

সত্তর বৎসর পূর্বে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র কবি রবীন্দ্রনাথ রানাঘাটে মহকুমা-শাসকের বাসগৃহে আর এক মহান বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় তেত্রিশ বৎসর। তারপর হইতে প্রতি বৎসর রানাঘাটের জনগণ ঐ দিনটিকে স্মরণ করিবার জন্য সেখানে মহকুমা-শাসকের গৃহে স্মরণোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই বৎসরেও রানাঘাট রবীন্দ্র-ভবনের উদ্যোগে মহকুমা-শাসকের বাসগৃহে অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়।

যুগগুরু আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ :

বিগত ঝুলন-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুজীর আবির্ভাব উপলক্ষে সদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘের উদ্যোগে ২৬-এ শ্রাবণ হইতে ৩০-এ শ্রাবণ অনঙ্গমোহন হরিসভায় ভাগবতীর অনুষ্ঠানাদি সনিষ্ঠাব প্রতিপালিত হয়। ঝুলন-পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ ভবনে হোম, পাঠ, গোঁসাইজীর পূজা, ভজন-কীর্ত্তন-নাম-গানের মধ্য দিয়া উৎসবের সূচনা হয়। অতঃপর দিবস-চতুষ্টয় অনঙ্গমোহন হরিসভায় "যুগ-প্রয়োজনে প্রভু বিজয়কৃষ্ণ", "মহাবদান্য প্রভু বিজয়কৃষ্ণ", "জীব-কল্যাণে প্রভু বিজয়কৃষ্ণ", "নামকীর্ত্তনে প্রভু বিজয়কৃষ্ণ বিষয়ক" আলোচনায় বিশিষ্ট বক্তাগণ অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিদিনই বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার শ্রবণ-মঙ্গল কীর্ত্তন-ভজন সভায় অমৃত বর্ষণ করে।

বানরের ভাষার অভিধান :

সম্প্রতি বৃটিশ রয়েল সোসাইটির বাৎসরিক রিপোর্টে অধ্যাপক রবার্ট হাইণ্ডের বানর লইয়া গবেষণার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গত চারি বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক হাইণ্ড কেম্ব্রিজশায়ারে ২৫টি বানরকে দিনের পর দিন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বানরের ভাষার এক অভিধান রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, বানরদের বহু ইঙ্গিত ও শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থ বহন করে। তিনি প্রায় ৬০টি শব্দ, দেহভঙ্গিমা ও হস্তসঞ্চালনের ইঙ্গিতের অর্থ এই অভিধানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্রোধ, হর্ষ, ভয় প্রভৃতি আবেগ প্রকাশের মাধ্যম এই সকল শব্দ ও ভঙ্গিমা।

ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা :

প্রকাশ, ডাক ও তার দপ্তর সেভিংস ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের সুদ বাবদ ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকারও বেশী দিয়াছেন। সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানতকারীর সংখ্যা বর্তমানে এক কোটিরও বেশী। স্বাধীনতার পূর্বে এই সংখ্যা ৩১ লক্ষের কাছাকাছি ছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে সুদ বাবদ ৯ কোটী ৪২ লক্ষ এবং ১৯৬১-৬২ সালে ৮ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। বর্তমানে দেশের ৫২,৫০০টী ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুবিধা চালু আছে। এগুলির মধ্যে ৩৪ হাজার ডাকঘর গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ইদানীং এইসব ডাকঘরে জমার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি

বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

(সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়)

পুস্তকের বিষয় :

- প্রথম জীবন
- দেশের তৎকালীন অবস্থা
- স্বদেশী আন্দোলন ও শ্রীমতিলাল
- শ্রীমতিলালের সাহিত্যকৃতি
- শ্রীমতিলালের সংগঠনী শক্তি

ইত্যাদি

দাম মাত্র এক টাকা।

'প্রবর্ত্তক'এর গ্রাহক ও সভ্যসভ্যাদের জন্য শতকরা ২৫'/. কমিশন।

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

পাইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে ৮৭·৯৬ কোটী টাকা জমা পড়িয়াছিল। গত বৎসর জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৪·৯৬ কোটী টাকায় দাঁড়ায়।

নকল বিড়াল :

কিছুদিন আগে টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইঁদুর তাড়াইবার জন্য বৈদ্যুতিক বিড়াল তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই নকল বিড়ালের পেটের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি কোটর বসান থাকে যাহা প্রতি ৬ সেকেণ্ড অন্তর আসল বিড়ালের মতই মিউ মিউ শব্দ করে এবং সারা ঘরে ঘুর ঘুর করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা প্লাসটিকে প্রস্তুত ঠিক বিড়ালের মতই—চোখ দুইটি অন্ধকারেও জ্বল্ জ্বল্ করে। বিড়াল পোষার ঝামেলা নাই, অথচ ইঁদুর তাড়ানোর কাজ চলে।

সাধনসমর আশ্রম :

সম্প্রতি বরাহনগর (কলিকাতা) সাধনসমর আশ্রমে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মর্ষি সত্যদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজা সনিষ্ঠায় সম্পন্ন হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা আর্য্য ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী নরনারীগণ শ্রেণী ও বর্ণনির্ব্বিশেষে এই তিথি-পূজায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

দুগ্ধ-সমস্যা সমাধানের নূতন উপায় :

কেন্দ্রীয় খাদ্যমান-নির্ণয় কমিটি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ২৮শে জুলাই-এর অধিবেশনে "দুগ্ধ" ব্যবস্থার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, উট-দুগ্ধ এবং গর্দ্দভ-দুগ্ধ মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী। গো-দুগ্ধ ও উষ্ট্র-দুগ্ধ প্রায় সমগুণ-সম্পন্ন। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলণ্ডে গর্দ্দভ দুগ্ধের অবাধ ব্যবহার আছে। এইবার ভারতবাসী গর্দ্দভ-দুগ্ধ পান করিয়া দুগ্ধের অভাব মিটাইতে পারিবে। গোমাতার সঙ্গে গর্দ্দভমাতা যুক্ত হইল।

যুক্তরাষ্ট্রে সিগারেট প্যাকেটে স্বাস্থ্যের হুঁসিয়ারী :

প্রেসিডেন্ট জনসন ২৭শে জুলাই একটি বিলে সহি দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী জানুয়ারী মাস হইতে যত সিগারেট বাজারে বাহির হইবে তাহার প্রত্যেক প্যাকেটের উপর লেখা থাকিবে "সিগারেট সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক"। সিগারেটের বিজ্ঞাপনেও উক্ত সতর্ক-বাণী লিখিতে হইবে। ভারত সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ শ্রীগুরুমন্দির :

গত ২৫শে জুলাই রবিবার প্রবর্ত্তক আশ্রমস্থ সঙ্ঘগুরু ভবনে গুরু-মন্দির নির্ম্মাণ কমিটির কার্য্যকরী সমিতির ২১তম অধিবেশন হয়। সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মন্দির নির্ম্মাণকল্পে সঙ্ঘের ও জনসাধারণের দানের যে হিসাব দান করেন তাহাতে দেখা যায়, এ যাবৎ প্রায় ৬০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য মোট ব্যয় নূন্যাধিক এক লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সম্পাদক অর্থ-সংগ্রহ ব্যাপারে কমিটির সভ্য-সভ্যাগণকে আরও উদ্যত হইবার জন্য আহ্বান করেন।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা
=শারদীয়ার বিচিত্র আয়োজন ঃ বেনারসী শাড়ী=
॥ বিভাগীয় বিপণি ॥
[কটন : সিল্ক ঃ উলের জিনিষ ঃ বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার ঃ ফোন ৩৩-২৩০৩
বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি বিচিত্র রুচিসম্মত শাড়ীর বিপুল সম্ভার।
আধুনিক ডিজাইনের হরেক রকম দেশী তাঁতের শাড়ী।
গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার প্রচুর আয়োজন।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড্, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিক্রয়-বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে হোর্ডিং

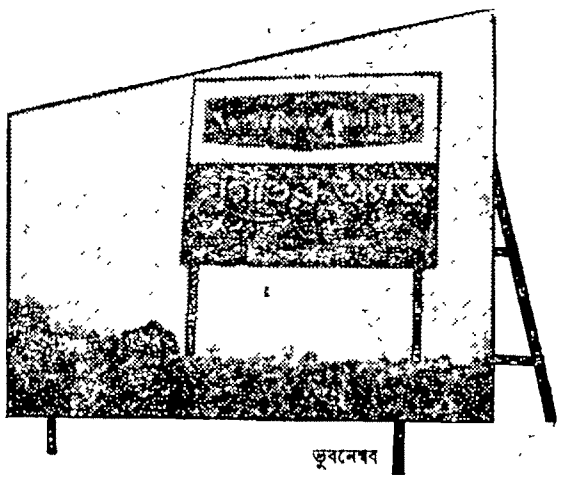

ভুবনেশ্বর

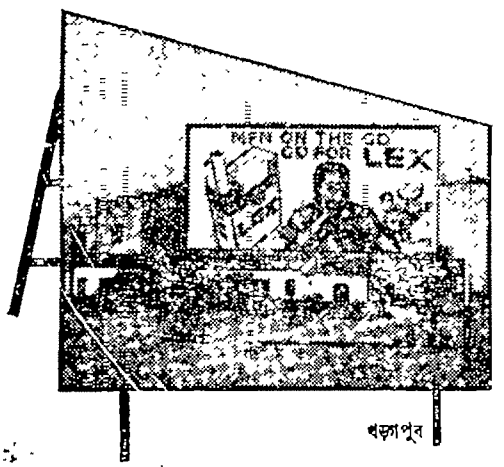

খড়্গপুর

আপনার পণ্যের বিক্রয়-বৃদ্ধি বা আপনার কাজের প্রসারে আপনি নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত, আর ঠিক এই ব্যাপারেই আমরা আপনার প্রযোজনে আসতে পারি· ·আপনার খরিদ্দারের কাছে কম খরচে আপনার পণ্যের খবর পৌছে দেবার জন্য স্টেশন ভবনে বা তার চারদিকে হোর্ডিং-এর জায়গাগুলির আপনি সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য লিখুন :
কমার্শিয়াল পাবলিসিটি অফিসার,
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে,
গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-৪৩
(ফোন : ৪৫-২২৩২)

বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেল-এর কর্তৃপক্ষ ন্যায্য হারে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের যে কোন স্থানে হোর্ডিং-এর কাঠামো তৈরী, তার স্থাপনা এবং অঙ্কন ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। পৌর-কর দিতে হয় না।

জায়গা :

(পশ্চিমবঙ্গ)
গার্ডেনরীচ (কলিকাতা), শালিমার (হাওড়া), খড়্গপুর, বার্নপুর, আদ্রা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, গিড্‌নী।

(বিহার)
চক্রধরপুর, রাঁচি, টাটানগর, চাইবাসা।

(উড়িষ্যা)
ভদ্রক, বালাসোর, জাজপুর—কানজোর রোড, কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর, রৌরকেল্লা, সম্বলপুর, বহরমপুর, ঝাড়সুগুদা।

(মধ্যপ্রদেশ)
বিলাসপুর, রায়পুর, দুর্গ।

(মহারাষ্ট্র)
গোণ্ডিয়া, ইটওয়ারি।

(অন্ধ্র প্রদেশ)
ওয়ালটেয়ার, ভিজিয়ানাগ্রাম, ভিজাগাপট্টম, পার্বতীপুরম, শ্রীকাকুলম, বব্বিলি, ইত্যাদি।

বি, এন, আর সেতু আসানসোল জি, টি, বোড

== মহাপূজায় আমাদের প্রেম-প্রীতি শুভেচ্ছা ==

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন: ৫৫-৩৭১১

॥ বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ॥

❁ পেটেণ্ট ঔষধ

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য

❁ সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধ

সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে

॥ সকল সময়ে প্রেসক্রিপ্‌শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে ॥

আজকের উৎসব আনন্দের দিনে
আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন রইলো
প্রত্যেকটি দেশবাসীর প্রতি।

মিলবোর্ণ এণ্ড কোং

একমাত্র পরিবেশক: "রয়েল" ক্রুড অয়েল ইঞ্জিন
বিশেষ নির্ভরযোগ্য: সর্ব্বাপেক্ষা কম পাকবিশিষ্ট

২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৪৭২৫

প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য জাতির সেবায়—

সম্পদ সংরক্ষণ করুন। অপরিহার্য হ'লেই শুধু ভ্রমণ করবেন। সহজ নির্দেশগুলি পালন করে শ্রমশক্তি বাঁচান।

ট্রেনের গতিরোধে প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অপরিহার্য না হলে ট্রেনের শিকল টানবেন না।

আগাম টিকিট কিনলে শেষ মুহূর্ত্তের উদ্বেগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

অল্প মাল মানেই বেশী জায়গা।

লাইন দিলে টিকিট জল্দি বা প্রবেশদ্বারে টিকিট প্রদর্শনে অনেক সুবিধা হয়।

স্টেশন ভবন পরিচ্ছন্ন রাখুন। জাতির স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনেক।

জাতির দুর্বার অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে···

পূর্ব রেলওয়ে

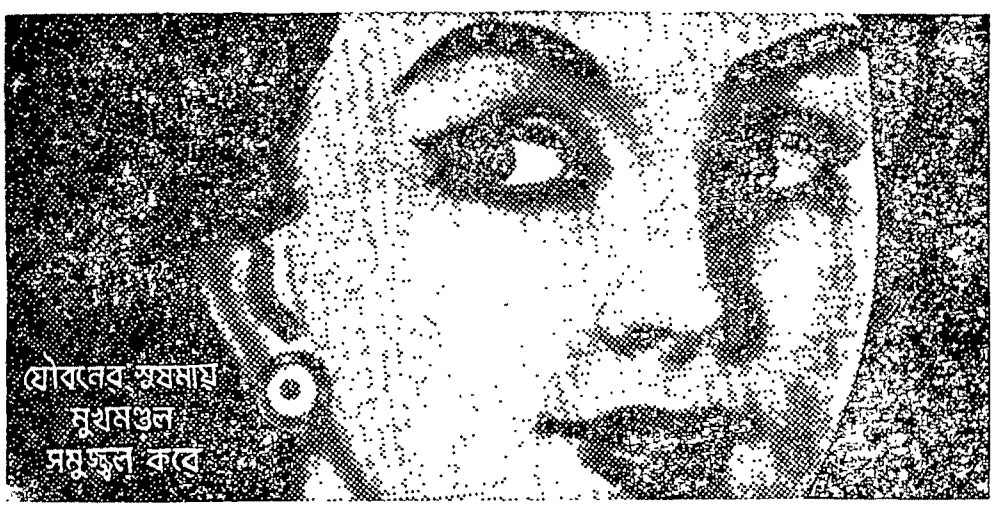

লাবণি
ভ্যানিশিং ও কোল্ড ক্রীম

দিনে লাবণি ভ্যানিশিং ক্রীমের ব্যবহারে ত্বকের লোম-কপগুলি পরিষ্কার হয়ে ত্বককে সজীব ও সুন্দর করে তোলে। তাছাড়া মুখে পাউডার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

রাত্রে লাবণি কোল্ড ক্রীমের ব্যবহারে মুখমণ্ডলে মসৃণ সুষমা এনে দেয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

—শারদীয়া শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সকল রকম কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি, সর্বপ্রকার
আনুষাঙ্গিক মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

রঘুনাথ বিল্ডিংস : ৩২বি, ব্রেবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১
পোষ্ট বক্স নং ৭৬২ : টেলিগ্রাম 'নোটপেপার'
কলিকাতা : ফোন ২২-৪৯৯১/৯২

শাখা অফিস : চক বারাণসী ॥ ১৩নং, গোপীনাথ বারদৌলি রোড, গৌহাটি ॥
কঙ্ক বাজার, কলিকাতা-২ ॥ নয়াতলা, পাটনা ৪ ॥

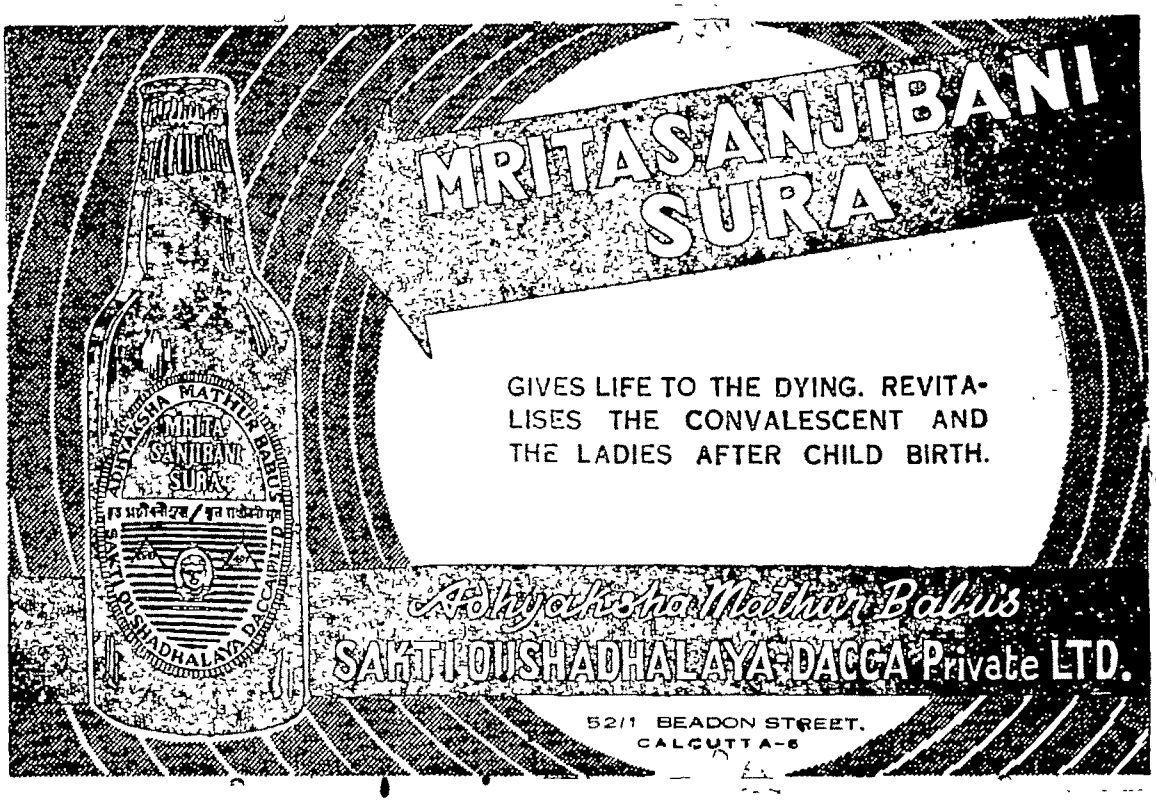

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

১নং মিল ঃ
কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

২নং মিল ঃ
বেলঘরিয়া (ভারত রাষ্ট্র)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

এই মিলের ধুতি সাড়ী প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে
ধনীর প্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের কুটীর পর্য্যন্ত
সর্ব্বত্রই সমভাবে সমাদৃত—

FURNITURE
FOR
HOUSEHOLD • OFFICE
COLLEGE • SCHOOL.
ALSO
DUNLOPILLO Stockist.

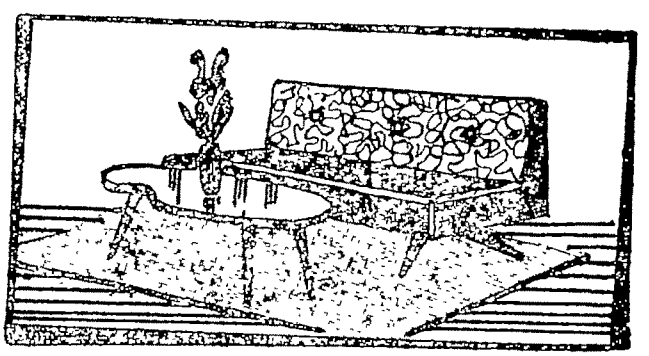

FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT a real Home

PRABARTAK FURNISHERS LTD.
61, BIPIN BEHARI GANGULY ST. CAL-12 (JUNC. OF CENTRAL AVE)
PHONE: 34-3088 (SHOWROOM) & 24-1536 (WORKSHOP)

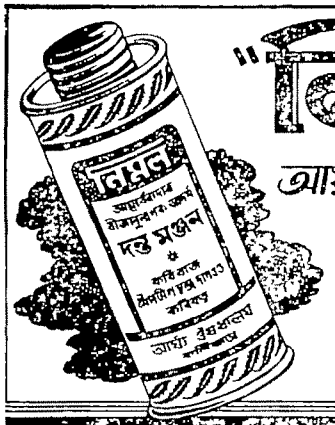

"লিওরা"

আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অম্লজনিত দন্তের ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সুরভিত হয়।

আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা-৯

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥

স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২ ৫০

জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪-০০

Living Knowledge 4.00

(যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি বিশ্লেষণ নৈপুণ্য। মুমুক্ষু নিশ্চয়ই সাধনার আলো ও পথ পাইবেন)

॥ শুভঙ্করের ॥

মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪-০০

(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)

॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত ॥

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব রাজজ্যোতিষী এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীর বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে আলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর আলৌকিক শক্তিতে যাঁহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ হাইনেস মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে টি, সম্বোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি কে রায়, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্যার ফজল আলী কে-টি, মাননীয় বিচারপতি মিঃ জে. পি, মিত্র, এম-এ (অক্সন) বার-এট-ল, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র. এম-এ (ক্যান্টাব) বার-এট-ল, কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয় কুমার ব্যানার্জি, এম-এ, বি-এল, আমেরিকার মিঃ এডি টেম্পি, আফ্রিকার ঈশাক মামি এরিয়া, ইংলণ্ডের এন, টেইলর প্রভৃতি।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে স্বল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—৭।৶০ শক্তিশালী বৃহৎ—২৯।৶০ শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—২২।৶০, (সর্ব্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য)। **সরস্বতী কবচ**—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল—৯।৶০, বৃহৎ—৩৮।৶০। **মোহিনী (বশীকরণ) কবচ**—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১।০, বৃহৎ—৩৪৶০, মহাশক্তিশালী ৩৪৭৸৶০। **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলষিত কার্য্যোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯৶০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৶০ মহাশক্তিশালী—১৮৪।০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)।

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) **অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী** (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস—৫০—২ (প্র), ধর্মতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৬৫ সময়—বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, 'বসন্ত নিবাস', কলিকাতা—৫ ফোন ৫৫—৩৬৮৫। সময়—প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা।

With Puja Greetings of

Bholanath Paper House Private Ltd.

Head Office : **32A, Brabourne Road, Calcutta-1**

Phone : 22-1532 (3 lines) Gram : BIDYASEVA

P.O. BOX No. 995

Largest Stockists of

PAPER, BOARD, PRINTING INK ETC.

Selling Agents : **UNITED PAPER STATIONARIES PRIVATE LTD.**

Secretaries & Treasurers : **EASTEND PAPER INDUSTRIES LTD.**

॥ কয়েকখানি সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থ

॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু ॥

কর্ম্মবীর রাসবিহারী বসু—৫·০০

নির্ভরযোগ্য জীবনকথা। বহুল চিত্রসম্বলিত।

॥ বিপ্লবী নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ॥

বিপ্লবীবীর রাসবিহারী—৫ ০০

॥ শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ॥

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—৫·০০

॥ ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ॥

এম. এ. পি-এইচ-ডি. ॥

অমৃতের সন্ধান (উপনিষদের সারমর্ম) ৬॥০

॥ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক ॥

মহাভারত কথামৃত—১০·০০

শঙ্করাচার্য্য ৫·০০ **সাঁওতালী কথা** ২·০০

Upanishad Vol. I Rs. 3/- Vol. II 6/-

॥ মনীষী পণ্ডিত গুণদাচরণ সেন ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত (২য় সং) ৫·০০

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—১·৫০

॥ ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥

তন্ত্রের আলো ৪·০০

প্রজ্ঞার আলো—১·২৫

॥ শ্রীমৎ স্বামী উপানন্দ মহারাজ ॥

আত্মার আলো ১·২৫

॥ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী ॥

গীতার আলো ১·৫০ **মহামায়া** ১·৫০

প্রবর্ত্তক পাবলিসার্স : কলিকাতা-১২,

পূজার উৎসব-আনন্দে—

বাজারের সেরা

কিরণ

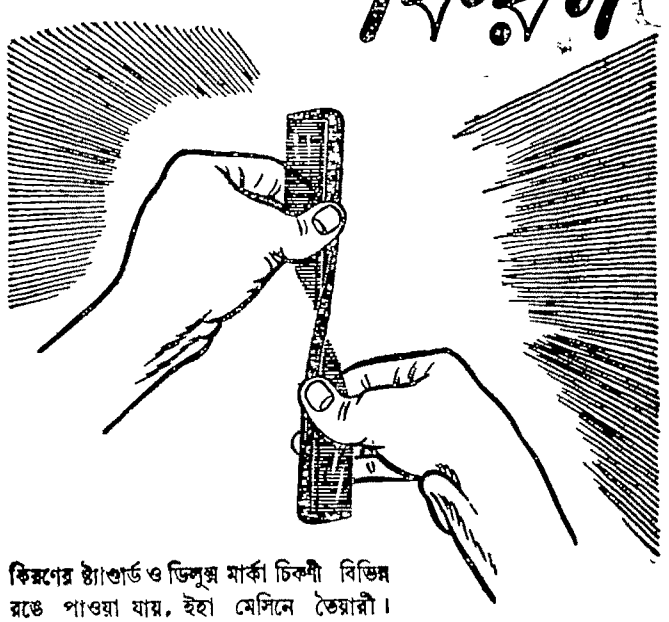

কিরণের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও ডিলুক্স মার্কা চিরুণী বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায়, ইহা মেসিনে তৈয়ারী। প্রতিটি চিরুণীর দাঁত গোলাকার ও মাথা মসৃণ। চুল ছিঁড়ে আসে না বা মাথায় লাগে না আর এমন টেকসই যে স্বচ্ছন্দে অনেক দিন চলে।

কিরণ এর চিরুণী আপনার চিরুণীর সমস্যা মেটাবে

কিরণ প্রোডাক্টস্ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—৯

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব খাতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন)সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় ○ ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান রোড, কলিকাতা-৩

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

পশ্চিম বাংলার তাঁতের কাপড়

কিনুন

সুলভ ঃ টেকসই ঃ চিত্তাকর্ষক

●

পাড়ের বাহারে, জমিনের উৎকর্ষে ও রঙের ঔজ্জ্বল্যে বাংলার তাঁতের কাপড়ের বিকল্প নেই। সুদর্শন নক্সাগুলি নিখুঁত কারিগরীর প্রত্যক্ষ নিদর্শন যা পশ্চিমবঙ্গ তাঁত শিল্পের অবদান। সারা ভারত জুড়ে তাই এর খ্যাতি।

●

বাংলার সকল অঞ্চলের বাছাই করা শাড়ী, চাদর, ব্লাউজ পীস্ প্রভৃতি।

বিভিন্ন সরকারী বিপণন কেন্দ্রে পাওয়া যায়।

আনন্দময়ীর আগমনে

বিশেষ আকর্ষণ

ইন্দ্র'র

- *দধি*
- *ক্ষীরের খাবার*
- *স্পঞ্জ রসগোল্লা, চমচম্*

সকল সময় মজুত থাকে।
সকল অনুষ্ঠানেই সযত্নে
অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

৮৬ আমহার্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৫-১৩৮৩

৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-২৫৩৩

সূচীপত্র · প্রবর্তক : আশ্বিন, ১৩৭২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
আবাহন	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	২২৩
শ্রীদুর্গা প্রশস্তি:	প্রশস্তি	শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী	২২৪
প্রসীদ দেবী	কবিতা	ঠাকুর ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী	২২৪
দেবী বরণ	কবিতা	শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী	২২৫
আগমনী	গান	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	২২৫
মাতৃ-মনন	প্রবন্ধ	অধ্যাপক শ্রীউমাপদ নাথ	২২৬
পূজনীয়	কবিতা	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২২৮
বন্যার্তের প্রার্থনা	কবিতা	নরেন্দ্র দেব	২২৮
সম্পাদকীয়	...	... ...	২২৯
শ্রীশ্রীচণ্ডী ও সত্য প্রতিষ্ঠা	প্রবন্ধ	মহর্ষি প্রেমানন্দ	২৩৫
বাঙালীর দুর্গোৎসব	প্রবন্ধ	শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৭
বোধন	কবিতা	শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ	২৪২
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	২৪৩
মাতৃ-স্নেহ	কবিতা	শ্রীসুধীর গুপ্ত	২৪৬
মূর্তি	অলৌকিক ঘটনা	মহীতোষ বিশ্বাস	২৪৭
সেক্সপীয়ার সনেট : ৪৩	কবিতা	সুষমা মৈত্র	২৫২
একটি মুখের রেখায়	কবিতা	দীপ্তোৎপল রায়	২৫২
ইতিহাস ও বাঙলা উপন্যাস	প্রবন্ধ	শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫৩

THE CENTRAL BANK OF INDIA LTD.

Head Office : **Mahatma Gandhi Road,**
BOMBAY. 1.

Figures that tell.

Authorised Capital	...	Rs. 10,00,00,000/-
Paid-up Capital	...	Rs. 4,71,61,325/-
Reserve Funds	...	Rs. 6,34,55,589/-
Deposits as at 30-6-1965	...	Rs. 2,98,36,59,799/-

Sir Homi Mody, K. B. E.,
Chairman.

F. C. Cooper
General Manager.

B. C. Sarbadhikari
Chief Agent, Calcutta.

সূচীপত্র ঃ আশ্বিন, ১৩৭২

ক্ষমা নেই	গল্প	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	২৫৫
ফসল-হারা ক্ষেত	কবিতা	শ্রীকালিদাস রায়	২৬০
স্বাগত বিশ্বসমাজ	কবিতা	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	২৬০
অমর বাংলা	কবিতা	প্রবীর বিশ্বাস	২৬১
যুগধর্ম্ম	প্রবন্ধ	শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য	২৬২
বন-মহোৎসব	গীতালেখ্য	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	২৬৫
বাংলার লোককলা-শিল্প	প্রবন্ধ	দীপেন রাহা	২৬৯
পাক-ভারত সমর সম্ভার	প্রবন্ধ	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	২৭১
সোনার কাঠির শিল্পী	গল্প	মাণিক সরকার	২৭৩
ভজন	কবিতা	শ্রীঅমল চৌধুরী	২৭৬
সনাতন গোস্বামী	কবিতা	অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	২৭৬
রণযাত্রা	কবিতা	শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার	২৭৬
সাময়িকী	...	... ...	২৭৭

চিত্র সূচী

মহিষমর্দ্দিনী	পূর্ণ পৃষ্ঠা স্বতন্ত্র প্লেট	বাহাদুর একবার আমার মুখের দিকে চাইলো	২৪৮
দেবী দুর্গা	২২৭	বাহাদুর আমার পাশে পাশে চলেছে	২৪৯
মূর্ত্তি	২৪৭	আমার দিকে স্থির দৃষ্টি	২৫১
পথটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে দূরে ঐ বাড়ীটার দিকে	২৪৭	বিশেষ ধরণের আলপনা	২৬৯

EASTERN CREDIT CORPORATION PRIVATE LTD.

Registered Office :
2B, DOVER ROAD,
CALCUTTA-19
Telephone : 47-3966

Telegraphic Address : EASTCREDIT

Principal Business Office :
24B, PARK STREET,
CALCUTTA-16
Telephone : 44-1681

PROVIDE EXPERT SERVICE ON FINANCIAL, CREDIT AND MANAGERIAL PROBLEMS. CONSULTANTS ON FOLLOWING SUBJECTS

- INVESTMENTS
- ADVANTAGEOUS PLACEMENT OF SAVING AND SURPLUS FUNDS FOR SHORT OR LONG PERIODS
- CREDIT AND CAPITAL REQUIREMENTS INCLUDING FOREIGN PARTICIPATION
- HIRE PURCHASE FINANCE AND SERVICE
- BETTER WORKING RESULTS AND PROFITS
- AVOIDANCE OF WASTAGE-COST ANALYSIS
- CREDIT INVESTIGATION
- INCOME TAX ADVICE—COMPANY FLOATATIONS AND COMPANY LAW REQUIREMENTS—ADMINISTRATIVE EFFICIENCY

B. T. THAKUR
Chairman of Board of Directors

A. B. THAKUR
Manager and Director

বাংলার
লক্ষ্মীশ্রী
ফিরে আসুক

লক্ষ্মী শ্রী

উৎসব অনুষ্ঠানে
বাংলার ঘরে ঘরে
আনন্দের বার্ত্তা
বয়ে আনে।

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবী বিশ্বার্ত্তিহারিণী।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

[দুশো বছরের প্রাচীন মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি : অম্বিকা কালনা]

CENTRAL LIBRARY

৫ম বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ ॥ আশ্বিন ঃ ১৩৭২

প্রবর্ত্তক

কাশী যেমন শিবের রাজ্য—বাংলা তেমনি মায়ের সিদ্ধপীঠ। কোটী কোটী জন্মের কঠোর তপস্যায় মানুষ বাঙ্গালী হয়। পদ্মা-ভাগীরথী-অধ্যুষিত সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা পুণ্যময়ী ধাত্রী আমার, জননী আমার মায়ের কোলে বসিয়া যে কেহ মাকে ডাকিয়াছে, সেই তো জগজ্জননীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। কেন পাইবে না? মা তো শুধু তোমার আমার মা নন, মা যে জগতের মা। তাই তো বাংলার দুর্গাপূজা শুধু বাঙ্গালীর পূজা নয়, জগতের পূজা, জগদ্ধাত্রীর পূজা। এই পূজামণ্ডপে শুধু যে হিন্দুরই অধিকার আছে আর কারুর নাই, তাহা নহে। জীব মাত্রেরই আজ মাতৃ-উপাসনার দিন। শরতের আকাশ স্বচ্ছ, নীল,—সরোবরে কুমুদ-কহ্লার বিকশিত। আঙ্গিনায় দোপাটী স্থলপদ্মের রঙিন হাসি, প্রাবৃটের জলধারাস্নাত বিটপী-বল্লরী শুচিবেশে শ্যাম-বসনে দেবীর আহ্বানে উদ্‌গ্রীব। সূর্য্যকিরণে গলান সোনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর আগল ঠেলিয়া পুলকের স্পন্দন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শরীরে শিহরণ তুলিয়াছে। হরিৎ, নীল কৃষিক্ষেত্রে কাশ-কুসুমের ঢেউ, দোয়েল, বুলবুলের শিষ, মরি মরি, অলক্ষ্য পদসঞ্চারে বাংলার পূজামণ্ডপে এ কার নূপুর গুঞ্জন রে। ...এই জগৎপালিনী মহাশক্তির আরাধনা-মণ্ডপে কে জাতি বিচার করিবে? কাহাকে অনধিকারী বলিয়া দূরে রাখিবে? আমার ধর্ম্মক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্ররূপে সর্ব্বজাতি, সর্ব্বসম্প্রদায়ের তীর্থ; আমার পূজামণ্ডপ ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মবিশ্বাসীর উপাসনা ক্ষেত্র। আমি বিশ্বের পদরেণু মাথায় বহিয়া শুচি হইব। জগতের চরণে লুটাইয়া মায়ের দয়া লাভ করিব। মা যে আমার জগদ্ধাত্রী! মায়েরই করুণায় সাগর রসশূন্য নয়, সমীরণে অমৃত, শস্যে বীর্য্য। মা আমার সর্ব্বভূতে চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, শক্তি, তৃষ্ণা, কান্তি। মা আমার লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া। মা আমার নিশ্বাস, প্রশ্বাস, হৃদয়ের স্পন্দন। মা আমার দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ। ধমনীর স্রোতে মায়ের অনুভূতি, চরণের প্রতি পদক্ষেপে মায়ের দয়া মূর্ত্তিমতী—এ মা কি শুধু আমার মা? তোমরা কি আমার এই চিন্ময়ী মাকে মৃণ্ময়ী বলিবে? এস! আমরা এই সর্ব্বভূতস্থিত মাকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পূজার মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়া বলি—জাগ মা জননী —সন্তানপালিনী মা!

(১৩৩২-এর পুরোণো প্রবর্ত্তক হইতে)

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

শ্রীদুর্গাপ্রশস্তিঃ

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীবশুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥—শ্রীশ্রীচণ্ডী

স্মারং স্মারং বিজহৃতি ভয়ং প্রাণিনো নাম দুর্গে
সিংহস্থাং ত্বাং মতিরতিশুভা ধ্যায়তাং স্যাচ্চ মাতঃ।
দৌঃস্থ্যে দুঃখে ন উপকৃতয়ে চেন্ন কার্পণ্যমম্ব
ত্রৈলোক্যস্যার্ত্তিশমনপরং পূজনং নঃ কুতো ন ॥

দেবগণস্তবে তব বাণী—
আর্ত্তি ল'য়ে তব নাম, দুর্গে, করিলে স্মরণ,
যত ভয় সব কেটে যায়।
মৃগেন্দ্রবিন্যস্তচরণা,
স্বস্থমনে সে পদ ধেয়ানে, অতীবশুভা যেই মতি,
সেই মতি সদ্য উপজয় ॥

দৌঃস্থ্যে দুঃখে ওগো মাতঃ,
তব সদাদয়ার্দ্রহৃদয়ে, কৃপণতা কুণ্ঠালেশ,
যদি নাহি রয় সর্ব্ব উপকারে
তবে বল, তোমার পূজন,
কি কারণে হইবে না আজ, ত্রৈলোক্যের যত আর্ত্তি,
যত ভয়, সব শমনের তরে ॥

প্রসীদ দেবী

ঠাকুর ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

একা তুমি আছ জগত মাঝারে
দ্বিতীয়া কোথা নাই।
বিভূতি তোমার দিকে দিকে রাজে,
সব মাঝে তোমা পাই।
জগতরূপিণী বিরাজ বিশ্বে,
গুরুর হৃদয়ে, সাধকে, শিষ্যে—
তুমি মাতা, তুমি কন্যা, প্রতিমা,
জায়ারূপা, তোমা চাই।

ধন দাও, দাও দাস পরিজন,
রূপ, যশঃ দাও, শত্রু-নিধন,
স্নেহ মায়া-দয়া বরদা জননী
জগতে তুলনা নাই।
জড়ে, শবে, দিলে দীপ্ত জীবন,
চরাচরে দিলে তড়িৎ-কিরণ—
আমার ভিতরে দেবতা জাগালে—
অসুর পলাল তাই।

তোমারি বিশ্বে, তব লীলাখেলা!
তব গুণগান গাই।

দেবী-বরণ

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী

শ্রাবণের বর্ষণমুখর বিরহীর বেদনাজড়িত
সুনিবিড় কালো মেঘ দূরে যায় স'রে
খণ্ড শুভ্র ক্ষুদ্র যাযাবর হাসে নীল নভোতলে
মন্ত্রমুগ্ধ শারদ-চন্দ্রিমায়;
তরী সম ছায়া ভাসে ধরণীর বুকে
মায়ার অমবা।
প্রেরণা ও আবেগের নব-অভ্যুদয়ে
মর্ম্মে যেন আনন্দের হয় উদ্বোধন।
নদী-নালা জলে ভরা বক্ষে শতদল,
শিউলী ঝরানো প্রাতে নূতন ধানের শিষ দোলে
পুলকের ঢেউ উঠে শিহরণ জাগায় বাতাসে।
রাতের কুয়াশা যেন মুক্তাবিন্দু শোভে রমণীয়;
চৈতন্যচঞ্চল প্রাণ সমারূঢ় ধরণী অঙ্গনে,
বিল্ববৃক্ষতলে।
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম সমন্বয়ে শক্তির প্রার্থনা করি
মৃন্ময়ী মুরতি যেন চিন্ময়ী হয় এ বোধনে।
পুষ্প বিল্ব পদ্ম দূর্ব্বা ধূপ দীপ তুলসী চন্দন
পূর্ণ ঘট নৈবেদ্য আরতি দেবীময় সবি চিন্ময়।
প্রতিমায় প্রতিবিম্ব অনন্তের আনন্দ উদার
সীমার এ একতারায় অসীমের আগমনী গান
শারদীয়া দেবীপক্ষে শক্তিময়ী জননী-আহ্বান
যেমন মধুর তেমন আশ্চর্য্য সুন্দর;
মহামায়া ত্রিনয়নী ভূমা ভূমি করে একাকার
বিচিত্র সম্ভার।

আগমনী

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আজ শরতের শ্যামলিমায়
মা এসেছে ফিরে,
ফুলের মেলা মিলেছে তাই
কুঞ্জবীথি ঘিরে।
স্নিগ্ধ শ্যামল ধানের ক্ষেতে
বেড়ায় পবন গন্ধে মেতে,
শুভ্র কাশের চামর দোলে
নদীর তীরে তীরে।

আনন্দে আজ মায়ের লাগি'
শিউলী সুবাস ঝরে
অপরাজিতার কুঁড়িগুলি
ফুটলো থরে থরে।
এসো মা আজ হৃদয় মাঝে
তোমার বোধন শঙ্খ বাজে,
তোমার পূজায় জ্বালবো এবার
হৃদয়-প্রদীপটিরে।

মাতৃ-মনন

অধ্যাপক শ্রীউমাপদ নাথ, এম. এ.

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। এই দুর্গতির আবির্ভাব যেমন বাহিরে তেমনি অন্তর্লোকে। বাইরের দুর্গতি সংঘটিত হয় অসতের অভ্যুত্থানে, অন্তরের দুর্গতি আসে ক্লৈব্যের অধিষ্ঠানে। তাই দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আবির্ভাব অসন্নিবোধ এবং শক্তিসঞ্চারের উদ্দেশ্যে। দুর্গার সার্থক সম্পূজনে অন্তঃস্থিত শক্তিহীনতা এবং বহিঃস্থিত দস্যু-শক্তির অপনোদন। চৈত্ত্য ক্লৈব্য এবং দৈত্যদর্প খণ্ডনার্থেই শ্রীদুর্গার আত্মপ্রকাশ। আবার আন্তর নির্বীর্যতার সঙ্গে অন্তরাঙ্গিক অন্যায়-ভাবনা ও বহিরাঙ্গিক অন্যায়-অনুষ্ঠানেরও অঙ্গাঙ্গী যোগ বিদ্যমান। কাজেই বহির্গত দণ্ড্য আসুরীশক্তি ছাড়াও একটি আত্মগত শোধ্য পরিমণ্ডলের স্থিতিও এই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। সত্য-সুন্দর-প্রীতিঘাতী বহিঃস্থ দানববলকে দমিত কবার সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় পাপানুস্যুতি এবং পাপানুকৃতিকে ক্ষালন করে আত্মশুদ্ধির হোমানল প্রজ্জ্বালিত করবার সুসমঞ্জস অমোঘ ইঙ্গিত রয়েছে শক্তিময়ীর অর্চনার মধ্যে। অন্তরের পাশব-বৃত্তির নিবৃত্তির প্রতীক বলি। বলি অর্থে আন্তর ক্লৈব্যের বিনিঃশেষ অপসারণ এবং পাপপ্রবৃত্তির সংশোধন।

দশপ্রহরণধারিণী মহিষাসুরমর্দিনী দশহস্তা দুর্গা সন্নিষ্ঠাময়ী সমরশক্তির শ্রীবিগ্রহ। ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারায় স্রষ্টা ও স্রষ্ট্রী-সমন্বিত মিথুন-শক্তির রূপ-প্রকল্প ঋগ্‌বেদীয় কাল থেকে বিদ্যমান। শিব এবং দুর্গা সেই মিথুন-শক্তির প্রাচীনতম আর্য-নিদর্শন যা আজ-পর্যন্ত জনমানসে আদর্শরূপে পূজিত। শিবের বুকে শ্যামাঙ্গিনী কালীর অবস্থান দ্বারা তমসাচ্ছন্ন চিৎপয়োধির বুকে প্রথম সৃষ্টির অভিব্যঞ্জনার মুহূর্তটি প্রতীকায়িত হয়েছে। শিব হলেন সমিত নিদ্রিত ব্যঞ্জনা-বিক্ষোভ-রহিত নিরঙ্গ নির্ব্যক্তিক চিদস্তিত্ব। শিব সমুদ্র, দুর্গা তরঙ্গ। শিব মর্ম, দুর্গা কর্ম। শিব পুরুষ, দুর্গা প্রকৃতি।

শিব আমাদের জনক, দুর্গা আমাদের জননী।

প্রকৃতির নিয়ম বিবর্তন—ক্রমাভিব্যক্তি। নিত্য-জীবনের ক্রমোচ্চ-বিকাশ এবং তদ্বিরোধী বিপর্যয়ী শক্তির বিনাশ—এই হলো প্রকৃতির নিয়ম। শ্রীদুর্গার প্রকৃতি-সত্তার মধ্যেও আমরা এই উজ্জীবন-প্রকরণ এবং নিরোধ-নিরাকরণেব পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ করি। তিনি দশভুজে দশাস্ত্র ধারণ করে সাধু অর্থাৎ সত্তাপ্রেমী সন্তান-গণের রক্ষা করছেন এবং পদচাপে বিশ্বের দানবশক্তির প্রতীক মহিষাসুরকে নিধন করছেন। মায়ের দশ হাত দশদিকের প্রতীক। মা দশ হাতে প্রহরণ নিয়ে দশদিক রক্ষণপবা, যাতে কোনো দিকেব রন্ধ্রপথ দিয়েই অমঙ্গল বা বিপদ এসে সন্তানকে বিনষ্ট বা আদর্শচ্যুত করতে না পারে। এইভাবে একরূপে তিনি রক্ষাময়ী এবং রণময়ী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনায় দেবী লম্ফপ্রদান করে মহাসুরের স্কন্ধে আরোহণ করলেন এবং দৃঢ়-পদপেষণে আক্রমণ করে তাকে শূলাঘাতে ব্যথিত করতে লাগলেন। এইভাবে দেবীপদপেষণে আক্রান্ত হয়ে অসুররাজ স্বমুখাৎ অর্ধনিষ্ক্রান্ত হলো এবং তদবস্থায় দেবীশক্তির দ্বাবা সংবৃত হলো। অর্ধনিষ্ক্রান্ত অসুর যুদ্ধ করতে থাকলে দেবী তাঁর মহাখড়্গদ্বারা শিরশ্ছেদ করে তাকে নিপাত করলেন।

দেবীর এই চরণমর্দন-ব্যাপারটি তাৎপর্যপূর্ণ। চরণ এখানে চলনার্থক। চরণের সাহায্যে চলনকর্ম সম্পাদিত হওয়ায় চরণকে চলনের অভিন্ন্যার্থক প্রতীকালংকাররূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং দেবীর চরণ মানে দেবীর চলন। যে দেবী মহাদেবের ঘরণী, যিনি সর্বকল্যাণ, সর্বশ্রী এবং সর্বদ্যুতিময়ী—যিনি জগৎপালনপরা জগন্মাতা, যিনি পরম-বরাভয় এবং রক্ষা ও আশীর্বাদ-রূপিণী তিনি তো সর্বতোভদ্রা, তাঁর চলন অর্থাৎ জীবন-ব্যবহার এমনই শুভবহ যে তাঁব পথে কোনো জীবনধ্বংসী মৃত্যুচ্ছায়ার আত্মপ্রকাশই সম্ভব নয়। তাই মহিষাসুরমর্দন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ প্রয়োজনে সংঘটিত হওয়ার চিত্রাশ্রয়ী হলেও আসলে জগজ্জীবনশক্তির প্রতিমুহূর্তের চলন-প্রয়াসেই অজস্র অমঙ্গল-ফণা বিমর্দিত হচ্ছে। জননীর সদাশুভময় জীবনপ্রবর্তনায় যারা তন্মুখী, তারাই তাঁর সন্তান—তারাই তাঁর সঙ্গে একসুরে বাঁধা এবং যারা তাঁর জীবন-প্রবাহের বিরোধী তারাই অসুর—তারা স্বভাবতঃই বিমর্দ্য। প্রকৃতিরূপিণী জগজ্জননীর চরণচাপে অর্থাৎ বিবর্তনের গতিধর্মে তাদের বিনষ্টি সুনিশ্চিতই।

জগন্মাতা দুর্গার শক্তি আহ্বান করে জাতীয় সংকট-কালে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অর্চনা করেছিলেন। বস্তুতঃ দানবদলন এই চণ্ডিকাশক্তির ধ্যানন-মননে এবং তত্ত্বতঃ এই মহাচিচ্ছক্তির সম্যক্ উপলব্ধিতে মানুষের আত্মিক বল, মানসিক শৌর্য, আন্তর অভীপ্সার সঙ্গে কর্মপ্রবাহী স্নায়ুমণ্ডলের সহযোগ, একোদ্দেশ্যে চিন্তার ঐক্য এবং সর্বোপরি অপরিমেয় আত্মপ্রত্যয় ও সাহসোজ্জ্বল নির্ভীকতা বিকশিত হয়ে ওঠে। ত্রেতাযুগে শক্তিপূজা করে শ্রীরামচন্দ্র যেমন দেশবাসীর সম্মুখে স্বদেশ, ন্যায় ও ধর্মের

জন্য নিশ্ছিদ্র ঐক্য, সাধনার তীব্রতা, অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের উদ্দীপনা এবং সর্বাবস্থায় অকুতোভয়তার মহা-উদ্বোধন করেছিলেন, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে লোকনায়ক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আপন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে মহাবাহু অর্জুনের মধ্যে সেই একই বোধ, শক্তি, প্রেরণা, প্রস্তুতি এবং ইষ্টনিষ্ঠ প্রত্যয় সঞ্চারিত করেছিলেন। বস্তুতঃ উভয় পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত শক্তিসংগ্রহ, প্রত্যয়-অর্জন ও একার্থে ঐক্যবন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া দুইটি একই তাৎপর্যবাহী। মহাশক্তি সর্বত্রই অভিন্ন, তাঁর আহ্বানে এবং তাঁর যথার্থ অনুধ্যানে যেমন ব্যষ্টি-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শুদ্ধি, সামর্থ্য এবং কর্মযোগের একাগ্রতা আসে, তেমনি সমষ্টিক্ষেত্রে জাতিগত ঐক্য, স্নায়ু-মনের শক্তি, অসীম সাহসিকতা, সিদ্ধ্যর্থে একপ্রাণতা এবং পারস্পরিক প্রীতিময়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই জননীরূপিণী দুর্গা জাতির ঐক্য ও শক্তির উৎস।

আজ জাতির মানসিক ক্লৈব্য ও স্নায়ুদৌর্বল্যের দিনে চণ্ডীশক্তির সম্যক্ আহ্বানের প্রয়োজন আছে। পরমাশক্তির মনন-পূজন করে যদি আমাদের আত্মিক শৌর্য এবং জাতীয় সচ্চৈতন্য, বিভেদবিহীন একমুখীনতা এবং ইষ্টাদর্শোচ্ছল শক্তি-প্রদীপ্ত সংহতি ও আসিদ্ধি প্রতিজ্ঞার জাগরণ সূচিত হয়, তবেই জননী-প্রীতা হবেন—তবেই তাঁর বরাভয়দৃঢ় দশভুজে আমাদের আত্মজীবনের ও জনজীবনের কবচস্বরূপ হয়ে রইবেন।

দেবী দুর্গা

তাই লক্ষ্য রাখতে হবে, চিন্ময়ী মা যেন মৃন্ময় পুতুলে পর্যবসিত না হন, তাঁর পূজার নামে যেন অনর্থক চিত্তচাঞ্চল্য, বিলাস প্রতিযোগিতা এবং সাধনসংযম নাশক বহিরাড়ম্বরের প্লাবন সৃষ্টি করা না হয়। যে মা জীবনরূপে, প্রাণরূপে, শক্তিরূপে, সিদ্ধিরূপে, স্বদেশরূপে সংস্থিতা, সেই মায়ের প্রকৃত পূজায় আমরা যেন তাঁর নিত্যবর্ষী আশীর্বাদে জেগে উঠি, বেঁচে থাকি, ঋদ্ধিবৃদ্ধিময় হই, তপস্যাস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হই—সর্বসিদ্ধির বলিষ্ঠ গৌরবে জয়শ্রীমণ্ডিত হই। মনে রাখতে হবে, আদর্শই জীবন—আদর্শবিচ্যুত জীবন মৃত্যুরই সমান। আর্য-জাতিকে বাঁচতে হলে আবার শিবাদর্শপ্রাণা উমার মতো তাকে আদর্শকেন্দ্রিক বীর্যময় সংহত জীবনের জন্য তপস্যা করতে হবে। এ ছাড়া বাঁচবার দ্বিতীয় পথ নেই।

পূজনীয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জীবন ধবে করছে পূজা—তারাই পূজনীয়,
সবার আগে তাদের প্রণাম দিয়ো।
করে তারা অখণ্ড এক পূজা,
কারণ কি তা যায় না ভাল বুঝা
ভব-জীব-বন্ধু তারা ভগবানের প্রিয়।

বিশ্ববাসীব লাগি নাকি তাদেব তপস্যা?
কাটে কত পূর্ণিমা ও ঘোর অমাবস্যা।
একই লয়ে করছে তারা ঘর,
কিন্তু কেহই নহে তাদের পর
নাই তাহাদের সমাধান ও নাইকো সমস্যা।

ত্যাগের মানুষ, ভাবের মানুষ শক্তি তাদেব কত,
নূতন করে গড়াতে চায় ধবায় মনের মত।
ময়লা ধূলার এই পৃথিবীটাকে
তারাই বাসের যোগ্য করে রাখে
মর্ত্তকে যে করতে চাহে স্বর্গে পরিণত।

তাদেব ডাকে মহাপুরুষ আসেন প্রবর্ত্তক,
সে আগমন শুভাগমন নয়কো অনর্থক।
কোথায় সরে হিংসা ও বিদ্বেষ,
উর্দ্ধে উঠায় জাতি এবং দেশ,
নরের মাঝে নারায়ণে দেখতে তাদের সখ।

বন্যার্তের প্রার্থনা

নরেন্দ্র দেব

সুপ্রসন্ন হও তুমি, অপ্রসন্ন হে দেব বরুণ!
দেবযোগ্য নহে ইহা, কেন হ'লে হেন অকরুণ?
আমি ক্ষুদ্র অভাজন, অসহায় নির্বিরোধী প্রাণী
ফিরে দাও ফিরে দাও আমার গ্রামের ঘরখানি।
নিরাশ্রয় আমি আজ, বন্যার দুর্যোগে দেশ ভাসে,
শতছিন্ন পরিধেয় ওড়ে সিক্ত সজল বাতাসে।
শান্ত হও, ক্ষান্ত হও, হে বিক্ষুব্ধ দেবতা বরুণ!
মেঘাচ্ছন্ন পূবাকাশে দেখা দিক আবার অরুণ।

ফিরে চাও একবার দুর্গত এ দুর্ভাগার পানে,
ঘিরে তার চারিধার জলোচ্ছ্বাস মৃত্যু মুখে টানে।
ছিন্নমূল এ জীবন অসহায়, অতি নিরুপায়,
এ দুর্যোগ দুর্দিনে যে এক গ্রাস অন্ন মেলা দায়!
কী করেছি অপরাধ? কেন দিলে হেন শাস্তি তুমি?
জল! জল! শুধু জল! জেগে নেই এতটুকু ভূমি।
শান্ত হও, ক্ষান্ত হও, হে বিক্ষুব্ধ দেবতা বরুণ!
মেঘাচ্ছন্ন পূবাকাশে দেখা দিক আবার অরুণ।

এ বিপুল প্লাবনের জলতলে রহি দীর্ঘকাল,
মরুভূমি হয়ে গেল শস্যক্ষেত্র কত সুবিশাল;
তুমি জানো জলাধীশ আমরা হেথায় কতো অসহায়,
আমাদের ঘিরি এই ঘোর নিষ্ঠুরতা একি সহা যায়?
স্পর্ধা যদি করে থাকি শুব্ধ তব করিবারে গতি
সে শুধু বাঁচাতে আর বাঁচাইতে সন্তান সন্ততি।
শান্ত হও, ক্ষান্ত হও, হে বিক্ষুব্ধ দেবতা বরুণ!
মেঘাচ্ছন্ন পূবাকাশে দেখা দিক আবার অরুণ।

বাঁধ নহে অপরাধ, এ বন্ধনে ক্রোধ নাহি সাজে,
আসন্ন দুর্ভিক্ষ ছাড়া বন্যা তব লাগিবে কী কাজে?
আমরা যে মৃতপ্রায়, নহি কেহ জলচর প্রাণী
সাজে কিহে আমাদের করা, এতো ক্ষয় ক্ষতি হানি?
যদিবা নির্বুদ্ধি বশে ক'রে থাকি তব অপমান,
কেমনে দেবতা হ'য়ে দিলে তুমি হেন শাস্তি দান?
শান্ত হও, ক্ষান্ত হও, হে বিক্ষুব্ধ দেবতা বরুণ!
মেঘাছন্ন পূবাকাশে দেখা দিক আবার অরুণ।

সম্পাদকীয়

ত্রিনয়নী—তৃতীয় পন্থা :

ত্রিনয়না দুর্গা—দুর্গতিনাশিনী অসুরদলনী—সামগ্রিক-ভাবে সমস্ত দৈবীশক্তির ঘনীভূত প্রতীক।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের বীজ দুর্গা। দেবতা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী মহালক্ষ্মী। প্রাণ চৈতন্যের আধার বিষ্ণু এই মধ্যম চরিত্রের ঋষি—পুষ্টি ও সৃষ্টির পালক ও রক্ষক। শক্তি শাকম্ভরী—ভাব ও রসসঞ্চারী সত্ত্বগুণময়ী পালনকারিণী। সাধনার প্রাণময় ও জ্ঞানময় দ্বিতীয় স্তরের তত্ত্ব বায়ু—যার অবধারণে চঞ্চল মন স্থির হয়। এই মধ্যমের ছন্দঃ উষ্ণিক (ঋগ্বেদ)—যে মন্ত্রচ্ছন্দে আয়ু বৃদ্ধি ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। চৈতন্যের হয় উদয়।

ত্রিনয়নের তৃতীয় দৃষ্টি—দু'নয়নের দৃষ্ট দেশকাল পাত্রের অতীত দর্শন। ইহাই তৃতীয় পন্থা।

প্রবৃত্তিও নহে, নিবৃত্তিও নহে। একান্ত ইহসর্ব্বস্বতা নহে, আবার জগৎ ও জীবনাতীত তুরীয়ও নহে।

ইহাই ভারত তথা সমগ্র মানব-সাধনা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যম স্তর—মধ্যম চরিত্র। পূর্ণাঙ্গ জীবনের তৃতীয় পথ। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, হিংসা-অহিংসা, ভোগ-ত্যাগের ঊর্দ্ধে নিত্য যোগযুক্ত জীবনের পন্থা।

●

ভারত-শাস্ত্রসমূহের সার গীতা ও চণ্ডী। গীতা মন্ত্রময়। চণ্ডী প্রায়োগিক বিজ্ঞান,—তিনটি চরিত্র বা স্তরে এই বিজ্ঞান বিন্যস্ত। প্রথম স্তরটি উদয়ের—সৃষ্টির। তৃতীয় বিলয়ের—নির্ব্বাণের নির্ব্বিকল্পের। মন সৃষ্টির মাধ্যম। মনোময় ব্রহ্মা তাই প্রথম চরিত্রের ঋষি। সৃষ্টির অনুলোম গতির শক্তিপ্রতীক তমোগুণসম্পন্না মহাকালী এই স্তরের দেবতা।

উত্তর চরিত্রের ঋষি জ্ঞানময় রুদ্র, আর দেবতা মহাসরস্বতী—সৃষ্টির বিলোম ক্রমের সূচক।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্যোতনা বহন করে যথাক্রমে চণ্ডীর প্রথম ও উত্তর চরিত্র—শক্তির অনুলোম-বিলোম গতির দুই পথ। মধ্যম স্তরটি স্থিতির—জীবন ও জগতের।

মার্কসীয় জড়বাদ ও বিজ্ঞান বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাৎপটে কোন প্রাণচৈতন্যশক্তির অবস্থিতি স্বীকার করে না। জড়পদার্থ হইতে এই জীবন ও জগৎ উদ্ভূত। এই জড় নিষ্ক্রিয় নহে, অন্ধ গতিশীল। গতির পথে হঠাৎই এক সময়ে প্রাণের আবির্ভাব। প্রাণহীন জড়ের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতিক্রমে ক্রমশঃ মনের প্রকট। আজকের বৈজ্ঞানিক জড়বাদী সভ্যতার গতি ও প্রকৃতি এই জগৎ ও জীবনদর্শনের মধ্যেই আবর্ত্তিত। ভারত ও বহির্ভারতের জীবন ও জগৎবোধের বৈপরীত্য এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সুস্পষ্ট।

ভারতবর্ষের জগৎ ও জীবন দর্শন কম বেশী প্রথম ও তৃতীয়, প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি এই দুইটি প্রান্ত সীমায় বরাবর লাট খাইয়াছে। জীবন ও জগতকে একান্ত-ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়া ভোগসর্ব্বস্বতার মাঝে এই জীবন ও জগৎ দুইকেই হারাইয়াছে ; নয়তো, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হইয়া জীবন ও জগৎ হইতে পলায়ন করিতে গিয়া আত্মহারা হইয়াছে। জগৎ-বিষয় লোপের সঙ্গে অনুভবী মনের অভাবে আত্মাও শূন্যবৎই হইয়া পড়ে। শ্রুতি এই অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন "তমোভূতং অলক্ষণং অপ্রাজ্ঞতম্"।

বাঙালী মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তার জীবন-সাধনার ঐতিহ্য বহু বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সর্ব্বাবস্থায় চিরবিরাজমানা যে চৈতন্যময়ী আদ্যাশক্তি তাহাকেই আবিষ্কার ও আশ্রয় করিয়াছে মূর্ত্তি দিয়াছে। এই আদ্যাশক্তিই সেই পরম একের একরসমগ্র প্রশান্ত হৃদয়কে বিরংসার মধুসিক্ত করিয়া বহুরূপী হইয়া বিচিত্র রসাস্বাদনে আগ্রহী করিয়া তুলেন—অখণ্ড মনকে, ব্রহ্মাকে করেন সিসৃক্ষু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন 'তমোভূতং অলক্ষণ অপ্রজ্ঞাতম্' (রুদ্রের বিলোম গতির ফলে) তখন এই চৈতন্যময়ী দেবীই 'হরিনেত্রকৃতালয়া' হইয়া জাগিয়া থাকেন। এই আদ্যাশক্তি এক, আবার বহুও বটে—একেরই বহুত্ব। জীব, জগৎ, জীবন যা-কিছু পরিদৃশ্যমান

সবই সত্য, সবই নিত্য—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্"। "সচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্‌বস্তু সদসদ্ বা অখিলাত্মিকে"—জড়-চেতন সবই তিনি। নিত্য জাগ্রত প্রাণময়ী ইনি—কাম ও প্রাণ এই মধ্যম চরিত্রের আদ্যা-শক্তি দেবী দুর্গার স্বরূপগত ধর্ম্ম। জীবনের পূজারী বাঙালী তার সকল ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, ঋদ্ধি-সিদ্ধি ও সৌভাগ্যের কল্পমূর্ত্তি দিয়াছে এই সগুণ দুর্গা প্রতিমার রূপায়ণে। জগৎ ও জীবনবোধের এই সম্পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক ভাবনা বাঙালীকে শুধু নিখিল ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বজগৎ হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে।

বাঙালীর এই আত্মিক ঐতিহ্যের যুগ-পূজারী ছিলেন সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। তিনি বাঙালীর অভিনব এই দিব্য জাতি-সাধনায় ছিলেন সমগ্র জীবন স্বপ্নবিভোর। মুরারীর তৃতীয় পন্থা বলিয়া তিনি এই পথকে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁরই ইঙ্গিত: "এই অপূর্ব্ব জাতি-জীবনের গতির পরিচয় এখনও অজ্ঞাত স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। একান্ত বাংলায় ঈশ্বরচেতনার উপর এমনি একটা জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

এই তৃতীয় পথে জাতি সংগঠনের সাধনার সঙ্কেতও সঙ্ঘগুরুজী দিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় চিরাচরিত সাধনধারায় জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির পথ প্রসিদ্ধ। সঙ্ঘগুরুজী এই ত্রিমার্গেরও অতিরিক্ত আত্মসমর্পণ যোগের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই আত্মসমর্পণ যোগ নিজেকে নিঃশেষে ভগবানে উৎসর্গ করিয়া এই মর্ত্ত্য জীবনেরই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ছন্দে ভগবানকেই জীবনে প্রকাশ করা। ইহা এই ত্রি-মার্গের সমন্বয় নহে—জ্ঞান-কর্ম্মের ভক্তিতে অন্বিত হওয়াও নহে—ভক্তিকে অতিক্রম করিয়াই এই উৎসর্গের স্থিতি। ইহা ত্রিমার্গ-যোগের সম্যক্ লয়-সাধনে সম্পূর্ণ এক নূতন সাধন বিজ্ঞান। সঙ্ঘগুরুরই দিগ্‌দর্শন: "ভারতের সকল প্রাচীন সাধনার লয় সাধন করিয়াই এই আত্মসমর্পণ যোগের সৃষ্টি। আত্মসমর্পণের সাধক এই বৈদিক ধর্ম্মের সাধন যেমন আশ্রয় করে না, জ্ঞান-শক্তি-ভক্তির সাধনায়ও তেমনি প্রবৃত্ত হয় না। তাহার সাধন নাই। আগম নিগম দর্শনাদি সবই আপনাকে ভগবানে তুলিয়া দিতে দিতেই প্রকাশ পাইতে থাকে।"

সঙ্ঘগুরুজী সনাতন ভারতের মেরুদণ্ড বেদকে নাকচ করেন নাই। তিনি বেদবাদকে আমল না দিয়া বেদ-প্রতিপাদ্য জীবনবাদেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান ও কর্ম্মের যে বিকৃত ধারণা ভারতের জাতিগঠনের প্রতিকূল হইয়াছে তাহারই নিরসন করিয়া বেদের মৌলিক অভিসন্ধি জীবনবাদেরই যুগ-প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। বেদের বিকৃত ব্যাখ্যায় জ্ঞানের লক্ষ্য হইয়াছে মোক্ষ—জীবন ও জগৎ হইতে পলায়ন; আর কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হইয়া নৈষ্কর্ম্ম প্রশ্রয় পাওয়ায় ভারতে সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূত্র রচিত হইলেও, অখণ্ড জাতিব অভ্যুত্থান সম্ভবপর হয় নাই। জ্ঞান ও কর্ম্মের কোন ভেদ ধারণা, মূলগত কোন পার্থক্য সঙ্ঘগুরুজী স্বীকার করেন নাই। তাঁর জীবনসাধনায় তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, জ্ঞান মায়াবাদ নহে, পরন্তু জাগ্রত জীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। সঙ্ঘগুরুরই কথা: "বেদবিধি পিতামাতার ন্যায় মানবজাতিকে সমাজবদ্ধ করিয়াছে, ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছে। এই বেদ-ধর্ম্মের উপর আরও এক উত্তম চেতনার স্তর আছে। ইহাই বেদাতীত ধর্ম্ম—সেখানে জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের অহংপ্রসূত নহে, স্বয়ং ভগবানের আত্মপ্রকাশ। মানব-যন্ত্র স্বর্গাদি ফলকামনা এবং মোক্ষরূপ অপবর্গের আসক্তি পরিত্যাগ করিলে, স্বয়ং ঈশ্বর যন্ত্রী হইয়া জীবাধারে আবির্ভূত হন। তখন নয়নের দৃষ্টি দিয়া জীবের ব্রহ্মদর্শন হয় না, ব্রহ্ম স্বয়ং নেত্রযোগে আত্মসৃষ্টি সন্দর্শন করেন। বুদ্ধি জ্ঞান-চর্চ্চা করে না, ভগবান অনুভব করেন বুদ্ধি দিয়া আত্মার মহিমা। হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির গঙ্গোত্রী উৎসৃতা হয়-মা, অমিশ্র ভাগবত প্রেমই সহস্র ধারায় জগৎ অভিষিক্ত করে, প্রাণের আর স্বতন্ত্র চেষ্টা থাকে না, সর্ব্বনিয়ন্তাই প্রাণের আশ্রয়ে আপনাকে সৃষ্টিলোকে মূর্ত্ত করেন নব নব রূপে, রসে, ভোগে। মানববিগ্রহে শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশে এই নরজীবনই দিব্য অমৃতময় হইয়া উঠে।"

সঙ্ঘগুরুজী এই ঈশ্বরযুক্ত জীবনকে নিত্য জীবন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সমষ্টির মধ্যে এই যোগ-

যুক্তি সিদ্ধ হইলে ভাগবত জাতির অভ্যুত্থান ঘটিবে। আত্মার অভ্যুত্থান ভগবানে, নিঃশ্রেয়সের পরিচয় ভাগবত জীবনে। এই পূর্ণাঙ্গ জীবনের সৌরভ বুকে লইয়া পুষ্পের বিকাশের ন্যায় জাতিবীর্য্য তখন জীবন প্রকাশের মাধ্যম শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ প্রভৃতি বিকাশ করিয়া চলিবে। ইহাই হইতেছে সঙ্ঘগুরুজীর দিব্য জাতি-তত্ত্বের মর্ম্ম আর তৃতীয় পন্থা।

অতি সংক্ষেপে সঙ্ঘগুরুর জাতি-দর্শনের একটা আভাস মাত্র এখানে টানিলাম। ইহা বাঙালীর কল্পস্বপ্ন যে সর্ব্বগ্রাসী জাতীয়তা—যে জাতীয় দুর্গোৎসব—তাহার মর্ম্মতাৎপর্য্য ও তাত্ত্বিক-ভিত্তি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে। সঙ্ঘগুরুর এই জাতি-দর্শন আকস্মিক বা উদ্ভট কিছু নহে। বাংলার প্রাজ্ঞদর্শী পূর্ব্বসূরিগণের পরম্পরাগত এই জীবন ও জাতি-ভাবনা যুগমানব সঙ্ঘগুরুতে উত্তরাধিকাক্রমে বর্ত্তাইয়াছে মাত্র।

চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' হইতে বৈষ্ণব সাধকের

"ভকত ভজন করে নিজ অঙ্গ দিয়া।
বেদধর্ম্ম ভক্তিযোগ সর্ব্বত্যাগী হইয়া॥"

প্রভৃতিতে ঐ একই ভাগবত জীবনবাদের সুর ধ্বনিত। ঐ একই ক্রমে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :

"হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কি অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি॥" ইত্যাদি।

বাংলার ভাব-সাধনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গভীরে ফল্গুধারার মতই এই জীবন ও জাতিসাধনার স্রোতটি প্রবহমান। এই জাতি-ভাবনা সগণ ত্রিনয়নী দুর্গাদেবী ও দুর্গোৎসবে মহামহিমান্বিত রূপ পাইয়াছে। ইহারই উৎকর্ষতা আগামী কালে মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার তৃতীয় পন্থা বলিয়া সুনিশ্চিত অভিনন্দিত হইবে।

●

বাঙালীর সাধনা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ জীবন ও জাতি-ধারণার বাস্তব রূপায়ণ সগণ দুর্গা প্রতিমায় প্রতিফলিত। মানব সভ্যতার বিবর্ত্তন ধারায় আর কোথাও এমন পূর্ণাঙ্গ জীবন ও জাতি কল্পনার নজীর নাই। ইহারই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা এখানে করা হইল।

আর্য্য তথা বিশ্বমানবেরই আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদের রাত্রি-সূক্ত-পরিশিষ্টের দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথম 'দুর্গা' নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয় :

দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুরতসি তরসে নমঃ সুরতসি তরসে নমঃ॥

এই দুর্গাকে "অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং" বলা হইয়াছে। আরণ্যক যুগে উপনিষদসমূহে দুর্গা তথা শক্তির মহিমা নানাভাবে কীর্ত্তিত। তৈত্তিরীয়-র 'দুর্গা-গায়ত্রী'তে আছে 'কাত্যয়নাং বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ'। 'কেন'-উপনিষদের 'হৈমবতী উমা', 'মহানারায়ণ' উপনিষদের 'দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে' প্রভৃতিতে এই 'দুর্গার' ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

বিশাল 'মহাভারত' মহাগ্রন্থের মাত্র দুইটি স্থানে (বিরাট্ ও ভীষ্মপর্ব্বে) দুর্গাস্তব দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায় 'দুর্গাদেবী' তখনও জনপ্রিয় হইয়া উঠেন নাই। মহাভারতের পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের পুরাণসমূহে (মৎস্য, কালিকা, দেবী, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বৃহন্নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি) শুধু দুর্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই, দুর্গাপূজার পদ্ধতিও বর্ণিত হইতে দেখা যায়।

বস্তুতঃ বাংলাদেশে একাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এই দুর্গাদেবী ও দুর্গোৎসব ক্রমশঃ জীবন ও জাতীয়তার সহিত ওতঃপ্রোত ব্যাপকতা লাভ করে। তাই প্রচলিত প্রবাদ—'গৌড়ে প্রকাশিত বিদ্যা'। প্রতিমায় দুর্গাপূজা বাংলা দেশেরই বিশিষ্ট অবদান। ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রধান চারিটি তন্ত্র-সম্প্রদায়ের (গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মীরী ও বিলাসী) মধ্যে শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতিভা এক অভিনব সৃষ্টি, এক নূতন পথের দিগ্দর্শন দিয়াছে। বাঙালীর সগণ দুর্গা-দেবীর কল্পনায় শক্তি এবং জননী-জন্মভূমি একাকারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞান, শক্তি, প্রেমের সাধনা এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ভূমিতে সমুন্নত হইয়াছে। আজিকার

নব্য বাংলায় রাজা রামমোহন হইয়া বেদান্তের অদ্বৈত জ্ঞানের ধারা নান্নুর-নবদ্বীপ, হালিসহর-দক্ষিণেশ্বরের যথাক্রমে প্রেম ও শক্তি-সাধনার স্রোতে মিলিয়া-মিশিয়া যে ত্রিবেণীসঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে অবগাহিত হইয়াই বাঙালী বিশ্ব-মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনের আলোক-দিশার উত্তরাধিকারীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাঙালীর 'নব্যন্যায়', বাংলার 'কীর্ত্তনগান', বাঙালীর 'বন্দেমাতরম্'-এর মতই দুর্গোৎসবও বাঙালীর একান্ত নিজস্ব প্রতিভার অনুপম সৃষ্টি। বাঙালীর মনের মনন দিয়াছে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র, তার হৃদয়ের পেলব-মাধুর্য্য মন্থনের সুরধুনি হইতেছে 'কীর্ত্তনগান', মেধার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে 'নব্যন্যায়', আর দুর্জ্জয় প্রাণের ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-মাধুর্য্য রূপ পাইয়াছে শ্রীদুর্গাবিগ্রহ ও দুর্গোৎসবে। এই অনুপম উত্তরাধিকার-সচেতন হইয়াই আজিকার বাংলা ও বাঙালীর নিবিড় অন্ধকার ও অশেষ নৈরাশ্যের দুরবস্থার মধ্যেও সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভরসার বাণী শুনাইতে পারিয়াছিলেন: "এই দেশ আমার স্থান, বর্ত্তমান যুগ আমার কাল। আজিকার দুর্দ্দিন আমার অবস্থা। তবুও আমি এই দেশের বুকে নবীন যুগের জ্যোতির্ম্ময় আলোকোদয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি।"

●

দুর্গোৎসবকে কলির অশ্বমেধ বলিয়া স্মার্ত্তকারগণ অভিধা দিয়াছেন। বিনা বিতর্কে বলা চলে, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসবই শুধু নয়, সৃজন-বিজ্ঞান, জগৎ-দর্শন ও জীবনবোধের এমন সামগ্রিক ধারণায়ও এই উৎসব অদ্বিতীয়; ইহার দ্বিতীয় তুলনা আর কোথাও নাই। কার্ত্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী ও তাঁহাদের বাহন ও যাবতীয় দেবদেবী-অবতারের চালচিত্র সমন্বিত দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা দুর্গাপ্রতিমার ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-মাধুর্য্যের তুলনা বাংলা ভিন্ন ভারত তথা বিশ্বের আর কোথাও মিলিবে না। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের ধর্ম্ম-অর্থ, কাম-মোক্ষ, শিক্ষা-দীক্ষা, শৌর্য্য-বীর্য্য, সমাজ ও জাতি-বিকাশের এমন সামগ্রিক অভিব্যক্তির রূপায়ণপ্রতীক সত্যই অনুপম অতুলনীয়। যে গোষ্ঠী-মনীষার ধ্যান-ধারণায় ইহা উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহার সাধনা, ঐতিহ্য ও উন্নতির মান ইহাতেই বুঝা যায়। সেই গোষ্ঠী—পূর্ণাঙ্গ জীবন-সাধনার তৃতীয় পন্থার আবিষ্কারক এই বাংলার বাঙালী।

বাঙালীত্ব একটি পরম ভাব—দেশ-কাল-সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে ইহার বিদ্যমানতা। বাঙালী বলিতে বিশেষ ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত একটা জনসংঘট্য বুঝিলে ভুল হইবে। মানবতার পরম বিকাশের বিশুদ্ধ আধার সিদ্ধির জন্য বাঙালীর দেশ-ধর্ম্ম, জাতি-সমাজ-শিক্ষা, রাষ্ট্র-অর্থ সব কিছু নিয়ন্ত্রিত, লক্ষিত।

বাংলার প্রাজ্ঞ পূর্ব্বসূরীগণ বাংলা বলিতে একটি বিশেষ ধারণা পোষণ করিতেন। শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশকে ভারতের মর্ম্ম বলিতেন। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালও বাংলা বলিতে ক্ষুদ্র একটা ভৌগোলিক সীমা বুঝেন নাই। বাঙালীত্বকেও তিনি একটা জাতি-প্রতীক হিসাবে দেখিতেন। বাংলাদেশ বলিতে অরণ্য-পর্ব্বত-নদী আর শ্যামলিমা-শোভিত ভূ-ভাগমাত্রই তিনি বুঝিতেন না। পরন্তু মানবাত্মার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ, অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-পরম্পরায় আগত এবং সমাজ-নীতি, চিন্তা-চর্চ্চা, ভাব ও ভাবনার মধ্যে বিকশিত, সঞ্জীবিত ও সংগ্রথিত এবং বহু মহামানবের অবদানপুষ্ট একটা আত্মিক অভিব্যক্তির পরম আশ্রয় ছিল সঙ্ঘগুরুজীর স্বপ্নের বাংলা। তাঁরই কথা: "দিব্য জীবনবিকাশের কেন্দ্রতীর্থ ভারতবর্ষ। বাংলা এই মহাভারতের হৃৎপিণ্ড। বাঙালী এই হৃদয়-শতদলের অপার্থিব মকরন্দ।"

●

বাংলা ও বাঙালীর সাধনা পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে দুর্গাপ্রতিমা ও দুর্গোৎসবে। বাংলাদেশ, বাঙালীত্ব, বাঙালীব জাতি-সাধনা ও দুর্গোৎসব অভিন্ন-অবিচ্ছেদ্য। একটাকে বুঝিলেই অন্যটি বুঝা যাইবে। বাঙালীর আদর্শ, তার সর্ব্বাভীষ্ট, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা এই দেবী দুর্গাপ্রতিমায় বিগ্রহান্বিত। সমষ্টির জাগ্রত আত্ম-চৈতন্যবোধের উপরই জাতীয়তার ভিত্তি-পত্তন। এই সামগ্রিক জাতীয়তার বিগ্রহ-প্রতীকই দেবী দুর্গা।

গর্ব্ব চাই—গর্ব্ব এই বৃহতের—বিশ্বমানবের সর্ব্বোদয়মূলক ভৌম আদর্শের—যাহারই বীজ নিহিত এই দুর্গাপ্রতীকে—বাঙালীর জাতিসাধনায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট আদর্শহীন মানুষের বীর্য্যই বা কিসের—গৌরব করিবারই বা উদ্বুদ্ধতা কোথায়? দুর্গোৎসব এই আত্মচৈতন্যেরই উদ্বোধন। দেবী দুর্গা ও দুর্গোৎসব যেমন তুলনাহীন, তেমনি অতুলনীয় এই দুর্গা ও দুর্গোৎসবের পৃষ্ঠভূমির নিগূঢ় জীবন ও জাতি-দর্শন। বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি তাকে আজ শ্মশানের চিতাশয্যায় শায়িত করিয়াছে। ক্ষুদ্র তুচ্ছতার আবর্ত্তে পড়িয়া বাঙালীর আজ নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। জাতীয়তার মৌলিক চেতনা, তথা বাঙালীত্ব বা দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে বাঙালীর দৃষ্টি ও ধারণা কুয়াশাচ্ছন্ন। কিন্তু সঙ্ঘগুরুজীর কথায় "এই জাতি চৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অমৃতই জাতিকে পুষ্টি দেয়, প্রবুদ্ধ করে।" এই দিব্য দেশাত্মবোধের জাগরণই আজিকার দিনের বাঙালীর সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান মাতৃমুখীন হওয়া—মায়েরই শরণ লওয়া। মা-ই দেশজননী। মা-ই বাঙালীর দেশাত্মবোধ—তার বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি আর প্রাণে বল। তাই এবারকার এই ঘন ঘোর দুর্দ্দিনের মহাপূজায় পূজনীয় সঙ্ঘগুরুজীর কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি :

"দশপ্রহরণধারিণী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী দুর্গাপ্রতিমার দিকে প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া আর একবার বল বাঙালী—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা'। আত্ম-সমৃদ্ধির জন্য বাঙালীর সাধনা নয়—জাতি গড়াই তার লক্ষ্য। বাঙালীর মা অসুর দলনের জন্য সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া। দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব। হে বাংলার মাতৃব্রতী সন্তানগণ, মাকে আহ্বান করিয়া ঘরে আনিয়াছ। পূজান্তে বিজয়ার বাদ্য বাজাইয়া বিজয়-তিলক ললাটে ধারণ কর। মাতৃ-আশীর্ব্বাদপূত হইয়া দশদিকে অভিযানে বাহির হও। জয় তোমার সুনিশ্চিত। আবার সমবেত কণ্ঠে গগন বিদীর্ণ করিয়া বল 'বন্দেমাতরম্'।"

মানবেতিহাসের নূতন দিগন্ত :

বক্ষ্যমান 'সম্পাদকীয়'-র প্রুফ দেখিবার সময় পাক-ভারত সংঘর্ষের ঘনঘটা শুধু ঘনাইয়াই আসে নাই, চূড়ান্ত মীমাংসার পথে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। পাক-ভারত সম্পর্কের আদ্যন্ত ইতিহাস এবং দৈনন্দিন ঘটনার এখানে বর্ণনা করিব না। ইহার আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা ও তাৎপর্য্যের কথাও উঠাইব না। ভারত তথা বিশ্বমানুষের ভবিষ্য-ইতিহাসের কি ইঙ্গিত এই ঘটনার অন্তরালে অবস্থিত তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, ত্রিনয়নীর তৃতীয় আঁখি-পল্লব কিভাবে উন্মোচিত হইয়া চলিয়াছে। মানবসভ্যতা বহু বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তার গতির বাঁক পরিবর্ত্তন করিয়া তৃতীয় পথে আসিয়া উপনীত হইতেছে। এবং এই পথটি ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতারই বিশিষ্ট অবদান। দশ দিকে প্রসারিত দশভুজা দুর্গাপ্রতিমা ইহারই প্রতীক। কার্ত্তিক (বীর্য্য), হস্তীমুণ্ড গণেশ (গণপ্রতিভূ), লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য), সরস্বতী (জ্ঞান), অসুর, দেবতা এবং তাহাদের বাহন একটা সম্পূর্ণাঙ্গ সমষ্টি-জীবনেরই দ্যোতক। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-শ্রেণী-বিশ্লিষ্টে সার্ব্বজনীন-ভাবে বিশ্বমানুষের সর্ব্বোদয়ের কল্পরূপ ইহা।

বিশ্ব আজ দুইটি জোটে বিভক্ত। দুইটি জীবনবোধ ও জীবনবিকাশের আদর্শ প্রতীক। গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র। একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন, অপর দিকে রুশ-চীন। এই দুই দলের কূট-কৌশলের ফলেই জার্ম্মানী, কোরিয়া, ইন্দোচীন, ভারত এমনকি চীনও বিভক্ত। সদ্য স্বাধীন অনুন্নত জাতিসমূহও এই দুই পক্ষের কোন এক পক্ষকে অনুসরণ করিয়া উন্নত হইতে চাহিতেছে।

খণ্ডিত ভারত পশ্চিমী সমাজতন্ত্রের ধাঁচে গণতন্ত্রের পথ ধরিয়াছে। অখণ্ড না হওয়া পর্য্যন্ত তার মৌলিক ভাবাদর্শ এবং স্বকীয় প্রতিভা ও বীর্য্য প্রকাশের দ্বার রুদ্ধ। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ভারতাক্রমণ আশীর্ব্বাদের মতই কাজ করিয়াছে। ভারতবর্ষের মৌলিক ইতিহাসের অভিব্যক্তির রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। চীনা আক্রমণ তার মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া-ছিল। পাক-অভিযান ভারতের জাগরণ আনিয়াছে। বিচিত্রকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক করা নহে, শ্রেণীকে শ্রেণী-হীন করিয়া নহে, বিচিত্রকে যথাস্থানে রাখিয়া, তার গুণ-ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া, একই সূত্রে বিচিত্রের মালা গাঁথাই ভারত সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইতিহাসের নিগূঢ় অভিসন্ধি। 'মহাভারতের সাগর তীরে' মহামানবের মিলন ঘটাইবারই ইহা জীবন ও জাতি-দর্শন। বিচিত্র, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণের মনুষ্যগোষ্ঠী লইয়া মহাজাতি নির্ম্মাণের

কাজই সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারত-ইতিহাসের অঘটনঘটন-পটিয়সী শক্তি নীরবে করিয়া চলিয়াছেন ঋজু অথবা তীর্য্যক পথে।

ভারতবর্ষে এই সর্ব্বজাতি-ধর্ম্মের সম্মিলিত মহাজাতি গঠনের সম্ভাবনা ও সিদ্ধির আভাস যুগদিশারী সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সঙ্ঘগুরুজীরই কথা: "ভূমার অনুভূতি যুগেই বিশ্ব এসে উপস্থিত হল ভারতে। সে কোথাও আত্মরক্ষায় আর মাথা তুলতে পারল না। ভারত বরণ করে নিল বিশ্বকে আপনার মত করে। ভারতে ছিল না এত জাতি, এত ধর্ম্ম। আজ ভারত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সবারই। ভারত ভূমার ধর্ম্ম পেয়ে সকল ধর্ম্মকে নিজের ক্ষেত্রে ডেকে এনেছে।"

সঙ্ঘগুরুর এই দূরগামিনী ঋষি-দৃষ্টি প্রমাণিত হইতেছে বর্ত্তমান পাক-ভারত সঙ্ঘর্ষে। খণ্ডিত ভারতের ঐক্যসাধন, দ্বিজাতি-তত্ত্বের উৎসাদন ও মহাভারত-জাতি-সংগঠনের ভৌম চেতনা না থাকিলে মুসলিম-গরিষ্ঠ কাশ্মীর আর পশ্চিম পাঞ্জাবে রক্তদানের কোন সার্থকতাই থাকিবে না। শেষ পর্য্যন্ত ইহা সুফলপ্রসূও হইতে পারে না। কিন্তু অনিবার্য্য ভারত-ইতিহাসের এই সার্ব্বভৌম চেতনার অভিব্যক্তি এখনও সুস্পষ্ট না হইয়া উঠিলেও, ইহার ক্ষীণ পদধ্বনি এই পাক-ভারত রণ-হুঙ্কারের মধ্যে শ্রুত হইতেছে।

বর্ত্তমান পাক-ভারত সংগ্রামের অন্যতম নিগূঢ় সঙ্কেত এই যে, বিগত প্রায় এক হাজার বছর পশ্চাদপসরণের পর এই প্রথম উত্তর-পশ্চিম তথা গান্ধার অভিমুখীন ভারতের অভিযাত্রার পদক্ষেপ সুরু হইল।

বর্ত্তমান পাক-ভারত সংঘর্ষের ফলাফল যাহাই হোক, মহামানবের তীর্থ ভারতবর্ষের ইতিহাসের অভিব্যক্তির পথ রুদ্ধ হইবার নহে।

মহাভারতের এই ভৌম আদর্শের বাণীই ভারতের প্রাজ্ঞদর্শী দার্শনিক রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সাম্প্রতিক (১২।৯।৬৫) বেতার ভাষণে ঘোষিত হইয়াছে। এমন সর্ব্বমানব-প্রেমমূলক শান্ত সমাহিত বাণী এক ভারতাত্মার প্রতিভূর পক্ষেই সম্ভব। তিনি বলিয়াছেন, ভারত যুদ্ধ করিতেছে একটুকরো জমি লাভের জন্য নয়, পরন্তু কতকগুলি মৌলিক মানবিক নীতির (fundamental principles) প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ভারতের পরাজয়ে 'the lamp of freedom will go out in Asia"—এশিয়া হইতে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আলো নিভিয়া যাইবে—সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলিত একটি আধুনিক ধর্ম্মনিরপেক্ষ কল্যাণ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণেরই কথা "we are resisting a military dictatorship, a controlled press and theocratic state." পাশ্চাত্যের অন্ততঃ একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক মিঃ জন গ্রিগও সম্প্রতি 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

তবুও একটা প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। ইংরেজ শাসনের অগণিত অভিশাপের মধ্যে একটি আশীর্ব্বাদ ছিল ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতা—যাহা সাংস্কৃতিক ঐক্য সত্ত্বেও, ভারতের ইতিহাসে স্থায়ী ও স্বচ্ছ রূপ পায়নি স্মরণীয় কালের মধ্যে। বর্ত্তমান পাক-ভারত সংঘর্ষের শান্তি স্থাপিত হইলে, এমনকি পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাইলেও কি সব সমস্যার সমাধান হইবে? রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রূপ দিলেও কি সর্ব্ব জাতি-ধর্ম্ম সম্মিলিত গণতন্ত্র তথা ভারতের অখণ্ডত্ব সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত হইবে? সামাজিক সমানাধিকার, ইহসর্ব্বস্ব অর্থ-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদের পথেও ইহার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ভারতীয় গণতন্ত্রে দ্রাবিড় সভ্যতার ও কাজাখামের কেন স্বাতন্ত্র্য দাবীর কণ্ঠ শোনা যায়? সন্ত ফতে সিং পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে আত্মাহুতি দিতেইবা কেন যাইতেছেন?

আসলে মানবচেতনার উদ্বর্ত্তন না হইলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। ভারতের হিন্দু তথা আর্য্য-নীতি ও সভ্যতার মধ্যে ইহার বীজ নিহিত আছে। আমাদের কালেই একজন মহামানব সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল বিশ্বমানব-মিলন-সঙ্কেত আভাসে-ইঙ্গিতে দিয়া গিয়াছেন। তাঁরই কথা—"যে সত্ত্বা ভূমার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত সেই হিন্দুসত্ত্বায় ধর্ম্মবস্তুই বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ভারত যেদিন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে সেইদিনই বিশ্বে এক নূতন আন্দোলন আসবে। ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করার পর ধর্ম্মের কোন আকার থাকবে না—অধর্ম্মেরও নয়। তখন একটা জীবন থাকবে—সে জীবন ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বর্জ্জিত—একবারে অভিনব। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার উপরই বিশ্বজগতের কল্যাণ—সর্ব্বমানব মিলনের বনিয়াদ রচিত হইবে।"

দূর আগামীকালের স্বপ্ন ইহা। ভারত সভ্যতা বিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে এই লক্ষ্যেই। বর্ত্তমান ইহারই একটি পর্য্যায়। আজিকার বিশ্বে সর্ব্বজাতি-ধর্ম্ম-বর্ণের মহামিলনের পরীক্ষাগার এই পুণ্য ভারতভূমি। ভারতের সহস্র সহস্র বছরের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ও সত্যপ্রতিষ্ঠা ঃ রক্তবীজ বধ

মহর্ষি প্রেমানন্দ

আন্তর কলন শক্তির কৃপায় চণ্ডমুণ্ড বধ হলেই সাধকের সাধনা এগিয়ে যায় আরও এক স্তর। সেখানে যেয়েই সাধক সন্ধান পায় রক্তবীজের। "রন্‌জ" ধাতু রঞ্জিত করা অর্থেই রক্ত। সেটিই সৃষ্টির রূপায়ণের উৎসমুখ। সৃষ্টিকে রঞ্জিত বা রূপায়িত করবার বীজরূপ বলেই নাম তাঁর রক্তবীজ। কারণ (causal) স্তর বা পরমাণবিক স্তর। এই কারণের সমষ্টিই (aggregate causal bodies) লিঙ্গদেহ (subtle body) ধারণ করে ক্রমে স্থূল রূপে নেয় প্রকাশ। এই স্তরে যখন উঠে আসে সাধক তখন বাসনার বিলাসে উপ্ত স্থূল সৃষ্টির কারণকেও হজম করে নেয়। অর্থাৎ নিরন্তর বাসনার সৃষ্টিতে কোন কারণ বা পরমাণুকেই স্থূল রূপ নিতে দেয় না। অধ্যাত্ম লোকের ক্রম উত্তরণের ফলে মতো ক্রমশঃই হয়ে আসে নিশ্চল। অপরদিকে আত্মাও তা'র প্রতিস্পর্দ্ধী সকল অ-সুরকে ক্রমশঃ নিহত করে কুমারী, বারাহী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী ও কালী শক্তির প্রভাবে। মানসভূমি পায় ক্রম-পরিচ্ছন্নতা।

আত্মা তা'র মূল ব্রহ্মাণীশক্তি (main attribute) হ'তে উদ্গত মুখ্য পঞ্চশক্তির পঞ্চ প্র-হরণে (প্রকৃষ্টরূপে) হরণ করে অ-সুর সত্তার বলবীর্য্য। নিঃশেষ করে নিঃশঙ্ক করে সাধককে।

আত্মা ও তন্নিহিত (মুখ্য) পঞ্চশক্তি ঃ আত্মা—মূলধর্ম্ম (main attribute) ব্রহ্মাণীশক্তি।

ব্রহ্মাণীশক্তি—(মুখ্যতঃ পাঁচটি ধর্ম্মে (5 attributes) বিভূষিতা)

	নাম	তাৎপর্য্য	প্র-হরণ
১।	কুমারী	ক্রীড়াশীলা	**"শক্তি"** (energy)।
২।	বারাহী	অন্যায়ের কারণ ও তদ্‌নিগ্রহকারিণী শক্তি	**"অসি"** ('অস্' ধাতু নিক্ষেপ করা অর্থে। সর্ব্বত্র তিনি নিজেকে নিক্ষিপ্ত বা ব্যাপ্ত করেই ক্রিয়াশীলা)।
৩।	মাহেশ্বরী	মহান্ ঈশ্বরী বা সর্ব্বত্র প্রভুত্ব-কারিণী শক্তি	**"ত্রিশূল"** (ত্রিচিহ্ন) (অ, উ, ম এই ত্রিচিহ্নেই মহানাদ ওম্‌কারের প্রকাশ। সর্ব্বত্র প্রভুত্বকারিণী শক্তির প্রকাশ রয়েছে মহানাদ ওম্‌কারে)।
৪।	বৈষ্ণবী	সর্ব্বব্যাপিণী শক্তি	**"চক্র"** (প্রাণচক্র। "প্রাণোহি বিষ্ণুঃ"—এই অর্থে বৈষ্ণবীশক্তি সর্ব্ব প্রাণসত্তায় স্পন্দিতা শক্তি ছন্দ)।
৫।	কালী	কলন শক্তি	**"ভীষণ নিনাদ"** (এখানেই নিহিত বা শায়িত থাকে শক্তির সর্ব্বপ্রসবিনী শুভদা ইচ্ছা। তাই এই কলনশক্তি "অত্যুগ্রা" ও "শিবাশত নিনাদিনী"। "শিবা"=শুভদা এবং "শী" (শয়ন করা) অর্থেও শিবা)।

এই আত্মিক সংগ্রামে নিহত হয় অ-সুরকুল—

	নাম	তাৎপর্য্য
১।	কম্বুকুল জাত	সাধকের অন্তর নিহিত কামনাকুলজাত আত্মার সকল প্রতিস্পর্দ্ধী শক্তি।
২।	ধূম্রবংশ	জীবনের সকল অনিশ্চয়াত্মক বা সন্দেহাত্মক ভূমিতে জাত প্রবৃত্তিনিচয়।
৩।	কালক	জীবনের অজ্ঞানকালের বিযুক্তিতে জাত প্রবৃত্তি।
৪।	দুর্দ্ধর্ত	দুষ্ট চিত্তোদ্ভূত প্রবৃত্তি।
৫।	মৌর্য্য	মোহ বেষ্টিত মানস উপ্ত প্রবৃত্তি।
৬।	কালকেয় বংশ	জীবনের তামস ভাবায়তনে জাত প্রবৃত্তিসমূহ।

স্বরূপতঃ চরিত্রে বিশেষ বিভেদ এদের মধ্যে কিছুই নেই। সবাই জাত হচ্ছে আত্মজ্ঞানহীনতার বা স্বরূপ বিস্মৃতির একই মূল বেদীতে। ধর্ম্মের (virtue) দিক থেকে সবাই আত্ম-অহিতকারী—বুদ্ধি বিধ্বংসী। আত্ম-জ্ঞান বিকাশের প্রতিবোধী শক্তি।

অধ্যাত্ম সংগ্রামে রক্তবীজ বধের স্তরে একদিকে আত্মা যেমন বিকশিত হচ্ছে তার সর্ব্বশক্তির প্রকাশ দিয়ে, অপর দিকে তেমনি আত্মিক ধর্ম্মের প্রতিস্পর্দ্ধী অসুরকুলও প্রকাশ নিচ্ছে তাদের সকল প্রতিরোধী শক্তি নিয়ে। জৈবীধর্ম্মে মোহাসক্তির এইত খেলা। তা'রি প্রভাবে মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকে তার আত্মিক জ্ঞানে। কোটী কোটী মানুষের মধ্যে কচিৎ দু' একজন যত্নশীল হন স্বরূপের সন্ধানে। অনেক সাধক অধ্যাত্ম-সংগ্রামের স্তর ভাঙ্গার পর্য্যায়ে পরাজিত হয়ে আবার এসে ঘুরতে থাকে মোহাসক্তির আবর্ত্তে। মোহাসক্তির ভূমি আত্মবিস্মৃতির ভূমি। ভূমার সাথে নেই কোন সম্বন্ধ।

চণ্ডমুণ্ড বধের পরেই সাধক পায় ব্যোম সন্ধান, পায় শিবসত্তার অনুভূতি। শ্রীচণ্ডীতে দেখতে পাই এখানেই শিব শুম্ভ, নিশুম্ভ ও দেবীর মধ্যে দৈত্য কার্য্যে নিযুক্ত। তিনি যেয়ে অসুরকুল ও শুম্ভ, নিশুম্ভকে বলছেন—

"যুয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছত ॥"

(রক্তবীজ বধ—২৬)

সকল প্রবৃত্তির পূর্ণ নিবৃত্তি হলেই সাধক অবস্থান করে—"সংযম্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি মনঃ হৃদি নিরুদ্ধঃ"। তখনই তিনি আত্মারাম বা শিবসত্তায় প্রতিষ্ঠিত। শিবসত্তার অনুভূতিতে সেই শৈবজ্ঞানই আত্মিক শক্তির নিকট জানায়—"হনন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডীকাম্ ॥

(রক্তবীজ বধ—২২)

"সাধকের শক্তির স্ফুরণ হয় চারিটি ধারায়—রসবতী, স্পর্শবতী, গন্ধবতী ও জ্যোতিষ্মতী। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াতে প্রকাশ হয়—রসবতী ধারা। উক্ত ক্রিয়াতে দেহস্থ দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফ) নিরাময় হয়ে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, মগজ ও শুক্রের সুস্থতায় তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণে প্রকাশিত হয় স্পর্শবতী ও জ্যোতিষ্মতী ধারা।" (মৎপ্রণীত—"সাধনায় শরীর তত্ত্ব" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

সুষ্ঠু প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াতে সাধক এই স্তরে থাকে নাদ সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত। নাদ সাধনার বলিষ্ঠ ধারা থেকেই ক্রমে সাধকে প্রকাশ নেয় স্পর্শবতী, জ্যোতিষ্মতী, রসবতী ও গন্ধবতী ধারা। (মৎপ্রণীত—"যুগের যোগী" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

নাদ ধারায় জাগ্রতা শক্তিই ব্রহ্মাণী বা ব্রহ্মশক্তি। উহা ক্রিয়াশীলা থাকে দেহাকাশস্থিত প্রাণাদি (বায়ু) নিহিত শব্দকে আশ্রয় করেই। তাই রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরকুল ধ্বংস করে আত্মারাম হয়ে উঠতে এই স্তরে প্রথমেই বলিষ্ঠতম রূপে ক্রিয়াশীলা হয় ব্রহ্মাণী বা ব্রহ্ম-শক্তি। তাই শ্রীচণ্ডী বলেছেন—

"হংসযুক্ত বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥"

(রক্তবীজ বধ—১৫)

[হং=অহঙ্কার, স=বায়ু (শ্বাস, প্রশ্বাস), বি=আকাশ, মান=শব্দ, অক্ষসূত্র=জপসূত্র, ক (জল) মণ্ডু (ভূষণ)=কমণ্ডলু।]

বৃন্হ—দীপ্তি পাওয়া ইত্যাদি অর্থেই ব্রহ্ম। এই দীপ্তিদা ব্রহ্মশক্তির অনুসহায়ই প্রকাশিত হয় আত্মার মুখ্য পঞ্চশক্তি।

এই স্তরটিই সাধনার **জনলোক**। স্থূল সৃষ্টির মূল উপাদান কারণ এখান থেকে জন্ম নেয় বলেই এর নাম জনলোক। এখানে এসেই সাধকের প্রচেষ্টা বাসনাকে করে দিত স্তব্ধ, জননকে করতে রুদ্ধ। তাইত শ্রীচণ্ডীতে দেখতে পাই কালী রক্তবীজের সকল রুধির পান করে তা'কে হতবল ও হতবীর্য্য করে নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। সাধকের আন্তর কলনশক্তি স্তব্ধ হলেই জননধারা রুদ্ধ হয়ে যায়।

এ স্তরটিও অতিক্রম করে যেতে হয় সাধকের।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে শারদীয়া দুর্গাপূজা সর্ব্ব-প্রধান জাতীয় মহোৎসব। বাঙ্গালীর মনীষা ও বাঙ্গালীর হৃদয় ভারতের সনাতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ভারতের জাতীয় সাধনা ও সভ্যতা, যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, যে ভাবে তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, যে ভাবে তাহা জীবনের বিভিন্ন বিভাগে প্রতিফলিত করিতে প্রযত্নশীল হইয়াছে, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা তাহারই সমুজ্জ্বল প্রতীক, দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহা সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হইয়াছে। বাঙ্গালী কর্ম্মব্যপদেশে ভারতের যে প্রদেশেই গমন করিয়াছে, সেখানেই তাহার দুর্গোৎসব সঙ্গে লইয়াছে, দুর্গাপূজার আদর্শ প্রচার করিয়াছে, সকল প্রদেশের ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে এই জাতীয় মহোৎসবের ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছে। এই সময়ে নবরাত্র-উৎসব সমগ্র হিন্দু-ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী-প্রতিভা সেই নবরাত্র-উৎসবকে দিবসত্রয়ব্যাপী দুর্গোৎসবের রূপ প্রদান করিয়াছে। বাঙ্গালী-প্রাণের বিশেষ বিকাশ দুর্গোৎসবের মধ্যে। মূর্ত্তির পরিকল্পনা, বোধনের অনুষ্ঠান, পূজার পদ্ধতি, বিসর্জ্জনের বিধান, বিজয়ার সম্মেলন,—এ সকলের মধ্যেই ভারতের সমাতন সংস্কৃতির সহিত, বাঙালী-প্রাণ, বাঙালী-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সুন্দর ও সমুজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে।

একটি দার্শনিক রহস্যপূর্ণ পৌরাণিক আখ্যান মূর্ত্তি-পরিকল্পনার ভিত্তি। অদ্ভুত তপঃপরায়ণ একজন মুনির অমোঘ বীর্য্যে ও এক মহিষীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম। সে শক্তি লাভ করিয়াছে পিতা হইতে, ও প্রকৃতি লাভ করিয়াছে মাতা হইতে। তাহার প্রাণশক্তি মুনির তপস্যায় অজেয়, কিন্তু সেই তপঃশক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে পাশব-জীবনাদর্শের চরিতার্থতায়। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি আসুরিক ভাবসমূহ তাহার মধ্যে মূর্ত্তিমান। সুখ, সম্পদ ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা তাহার স্বভাবে অপরিমেয়। মর্ত্ত্য ও স্বর্গের—মানবজগতের ও দেবজগতের—সমস্ত সুখ ও সম্পদ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্ব ও অক্ষয় আধিপত্য লাভ করিলেও, তাহার বাসনার সম্যক্ পরিতৃপ্তি নাই। এই নিয়ত পরিণামশীল সর্ব্বতো-মৃত্যুব্যাপ্ত অনিত্য সংসারে থাকিয়াই সে চায় জরা-ব্যাধি মৃত্যুহীন অমিত শক্তিসম্পন্ন দেহ, অব্যয় অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার, ত্রিলোকের আধিপত্য, দেবতা মানব দৈত্যদানব পশুপক্ষী সকলের উপর চিরস্থায়ী প্রভুত্ব। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যত প্রকার শক্তি আছে, সব হবে তাহার পরিচর্য্যায় নিরত, যত প্রকার ভোগ্যসামগ্রী আছে, সব হবে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োজিত। পিতার তপস্যা ও নিজের তপস্যা মিলিত হইয়া তাহার শক্তিকে অপরাজেয় করিয়া তুলিল। কিন্তু এই শক্তি হইল, তাহার মাতৃপ্রদত্ত প্রকৃতির সেবায়, তাহার ভোগ-বাসনার পরিচর্য্যায়, তাহার রাজৈশ্বর্য্য সুখসম্পদ লাভের সাধনায়। পৃথিবীরাজ্যে তাহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সকল দৈবীশক্তি তাহার ক্ষমতার নিকট পরাভব মানিল, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তাহার গতিবিধি অপ্রতিহত হইল; বসুন্ধরার বক্ষো বিদীর্ণ করিয়া, রত্নাকরের গর্ভে প্রবেশ করিয়া, পবনের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, বিদ্যুৎকে কুক্ষিগত করিয়া, নানাপ্রকার মহাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার অনুচরবৃন্দ বিচিত্র ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিল। বিশাল জগতে তাহার বিরাট সাম্রাজ্য সংগঠিত হইল। সে মনে করিল যে, বিশ্বভুবনে তাহারই ঈশ্বরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে-ই সকল দেবতার অধীশ্বর, দেবাদিদেব মহেশ্বর, তাহার আর মরণ নাই, তাহার ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় নাই, তাহার সাম্রাজ্যের বিনাশ নাই, তাহার উপরে আর কোন নিয়ন্ত্রীশক্তি নাই।

কিন্তু ভোগ কখনো চিরস্থায়ী হয় না। বিশ্বের নিয়ামক ঐশ্বরিক বিধানে ভোগার্থ প্রযুক্ত তপঃশক্তি, ভোগ ভোগ দ্বারাই কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কি ব্যষ্টি জীবনে, কি সমষ্টি জীবনে,—সর্ব্বত্রই আত্মম্ভরিত্ব বস্তুতঃ বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ। বিশ্ববিধান, এই বিদ্রোহকে কিছুকাল বর্দ্ধিত হইবার ও বিজয়াভিমানে স্ফীত হইবার সুযোগ প্রদান করে, এবং যথাসময়ে

তাহাকে প্রশমিত করিয়া জগতে সাম্য, মৈত্রী ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে। শক্তি যখন আত্মম্ভরিত্ব দ্বারা চালিত না হইয়া বিশ্বম্ভরিত্বের আদর্শ দ্বারা চালিত হয়, ভোগার্থে নিয়োজিত না হইয়া যজ্ঞার্থে নিয়োজিত হয়, সুখৈশ্বর্য্য সাম্রাজ্যের সেবায় প্রযুক্ত না হইয়া সত্য শিব সুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তখনই সেই শক্তি যথার্থতঃ সাফল্যমণ্ডিত হয়, তখনই সে অমরত্বের হেতু হয়, অনন্ত সুখ, অনন্ত তৃপ্তি, অভাব-অভিযোগ-বিহীন নিরাবিল আনন্দের হেতু হয়। অপরের সুখ হরণ করিয়া নিজের সুখের আহরণ, অপরকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিজের স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব অর্জ্জন, অপরকে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন, অপরকে ভোগবঞ্চিত করিয়া নিজের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা—এতদর্থে নিয়োজিত অপ্রমেয় পুরুষকারের মধ্যেও তাহার ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে। এই সাধনা যতই আপাততঃ সাফল্যমণ্ডিত হয়, ততই সে সাধককে ধ্বংসের করাল কবলের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়।

অসুরের ভোগকাল শেষ হইয়া আসিল। তাহার তপঃশক্তি ভোগ সাধনার ভিতর দিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখনই বিশ্বের সব দৈবশক্তি পুনরায় উদ্বোধিত হইয়া বিশ্ববিধান-বিদ্রোহী অসুরের ধ্বংস সাধনে উদ্যোগী হইল। দেবতাগণ মিলিতভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক পরামর্শ-সভা করিলেন। ব্রহ্মা জানাইলেন যে, তিনি সৃষ্টির বহিরঙ্গ-নিয়ম প্রণালী দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। বিশ্ববিধানের প্রাণস্বরূপ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বিশ্বের কল্যাণস্বরূপ শিবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিষ্ণুর সহিত যুক্ত হইতে হইবে; অসুর যদি বিশ্বের কল্যাণকে আহত বা অবমানিত করিয়া থাকে, শিবের সঙ্গে অসুরের যদি বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে, তবেই বিশ্বপ্রাণ বিষ্ণু তাহার ধ্বংসের বিধান করিবেন, এবং জগতে পুনরায় কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিবেন। ব্রহ্মা দেবতাগণসহ শিবসমীপে উপনীত হইলেন। শিব বলিলেন, সত্যই অসুর ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত হইয়া বিশ্বের কল্যাণশক্তিকে অবমানিত করিয়াছে; প্রভুত্বগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া নিজেকেই সে বিশ্ববিধানের কর্ত্তা ভোক্তা ও প্রশাসিতারূপে খ্যাপন করিয়াছে; সে ভোগকে ত্যাগের উপরে, বাহ্য সম্পদকে আন্তর সম্পদের উপরে, সংগ্রাম-শক্তিকে প্রেমশক্তির উপরে, কূটনীতিকে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বীয় সামর্থ্য ও সৌভাগ্যের অপব্যবহার করিয়াছে; সুতরাং অসুরের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বের প্রাণপুরুষ বিষ্ণু নিশ্চয়ই আত্ম-শক্তির বিশেষ প্রয়োগ দ্বারা এই অকল্যাণের ধ্বংস-সাধন ও কল্যাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

শিব ও ব্রহ্মা দেবতাবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাদের নিকট স্ব স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং সহাস্যবদনে বলিলেন,—তোমাদের উদ্দেশ্য আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির সময়ও এখন উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তোমাদের সমুচিত কর্ত্তব্য তোমাদিগকে করিতে হইবে।

বিশ্বের উপরিভাগে যে আসুরিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আসুরিক আধিপত্যের সাময়িক প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আসুরিক আদর্শের প্রচার হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত দৈবশক্তির সম্যক্ সংহতি আবশ্যক, দেবতাবৃন্দের সকল বিশেষ বিশেষ শক্তির সম্মেলনে এক পরম কল্যাণময়ী মহাশক্তির আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক; দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি ও তজ্জনিত অভিমান তিরোহিত হওয়া আবশ্যক, এবং তাহাদের মধ্যে একাত্মবুদ্ধি সম্যক্‌রূপে জাগ্রত ও জীবন্ত হওয়া আবশ্যক। প্রাণপুরুষ বিষ্ণুর অনুপ্রাণনাময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অঙ্গীভূত দেবতাবৃন্দ আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের অবিদ্যাজনিত ভেদবুদ্ধি ও অভিমানই যে তাঁহাদের ও বিশ্বের দুর্দ্দশার কারণ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন; নাম ও রূপের পার্থক্য এবং বাহ্যিক শক্তিবিকাশ ও ব্যবহারিক ক্রিয়াবিধির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁহাদের অন্তর দেবতা যে এক, তাঁহারা সকলেই যে এক পরম দেবতারই বিশেষ বিশেষ বিগ্রহ, তাঁহাদের ভিতরে এক নিত্য-সত্য-কল্যাণময়ী মহাশক্তিই যে বিচিত্র প্রকারে বিশেষ বিশেষ উপাধিযোগে প্রকটিত, ইহা তাঁহারা নূতন ভাবে উপলব্ধি করিলেন।

দেবতাগণ সকলে সজ্ঞানে সপ্রেমে বিষ্ণুর সহিত

যোগযুক্ত হইয়া আপনাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করিলেন। বিষ্ণুর প্রসাদে সকল দৈবশক্তি সম্মিলিত হইয়া একটি বিরাট জ্যোতির্ম্মণ্ডলরূপে আত্মপ্রকাশ করিল; এবং সেই সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া একটি পরমাসুন্দরী নারীমূর্ত্তিতে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। পরমপুরুষ বিষ্ণু দেবতাবৃন্দের সমীপে এই পরমা নারীর তাত্ত্বিক পরিচয় প্রদান করিলেন। যে মহাশক্তি হইতে এই অশেষ বৈচিত্র্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, যে মহাশক্তির দ্বারা বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই জড় চেতনাত্মক জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ববিধ ব্যাপার সম্যক্ শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে, মহাপ্রলয়ে যে মহাশক্তির গর্ভে এই বিশাল জগৎ বীজাকারে একীভূত হইয়া বিরাজিত থাকে, দেবতা অসুর মনুষ্য পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল চেতনের অন্তরে চিৎশক্তিরূপে যিনি বিদ্যমান এবং সৃষ্টিকালে এই সব বিচিত্র নামে, বিচিত্র দেহে, পরস্পর শত্রুমিত্রভাবাপন্ন বিচিত্র শক্তির আকারে যে মহাশক্তির বিচিত্র রসময়ী লীলা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই মহাশক্তিই এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী। এই সুপ্রশান্ত সুকমনীয় সর্ব্বরসঘন লীলায়িত গতি নারীমূর্ত্তিই বস্তুতঃ বিশ্বজননী বিশ্ববিধাত্রী অদ্বিতীয়া মহাশক্তির যথার্থ পরিচয় প্রদান করে। অনন্ত বীর্য্য, অমিত ঐশ্বর্য্য, অপ্রমেয় বিক্রম, অসীম তেজ তাঁহার মধ্যে নিত্য নির্দ্বন্দ্ব নির্ভীক ও সহজভাবে বিরাজিত বলিয়াই তাহা সৌন্দর্য্যে পর্য্যবসিত, মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত।

অপূর্ণ বীর্য্যৈশ্বর্য্য প্রতিদ্বন্দ্বী বীর্য্যৈশ্বর্য্যের সহিত সংঘর্ষেই চঞ্চল হয়, প্রখর হয়, কদর্য্য হয়, রুক্ষ হয়, জ্বালাময় পুরুষকার রূপে অভিব্যক্ত হয়। বীর্য্যৈশ্বর্য্য তখন সহজ অবস্থা হইতে বিচ্যুত হয়, খণ্ডীভূত হইয়া ঘাতপ্রতিঘাতের প্রচেষ্টার আকারে প্রকাশ পায়। মহাশক্তির ভিতরে কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, শাসনশক্তি ও প্রেমশক্তি, সবই নিত্য পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তাঁহার জ্ঞানের কোন আবরণ নাই, সংকল্পসিদ্ধির কোন অন্তরায় নাই, হিংসার কোন পাত্র নাই, আত্মপর ভেদ নাই। সুতরাং তাঁহার প্রশ্বত ও প্রশাসিত এই বিশ্বজগতের অনন্ত প্রকার বৈষম্যের মধ্যেও তাঁহার স্বরূপে নিত্য শান্তি ও আনন্দ, নিত্য প্রেম ও কোমলতা, নিত্য সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, নিত্য ধীরতা ও স্থিরতা বিরাজমান। সেই হেতুই তাঁহার মূর্ত্তি রমণীমূর্ত্তি।

বিশ্বজননী, বিশ্বান্তর্য্যামিনী, সচ্চিৎ প্রেমানন্দময়ী এই মহারমণী সকলের অন্তরের অন্তস্তলে নিত্য বিরাজমানা, সকলের সত্তার মূলে, সকলের সকল কর্ম্ম, সকল জ্ঞান, সকল ভোগ, সকল শক্তি-সামর্থ্যের মূলে এই মহা-রমণী আত্মগোপন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। নিজের ভিতরে, নিজের দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সকল শক্তি ও সকল ব্যাপারের ভিতরে, এবং এই বৈচিত্র্যময় জগতের সর্ব্বপ্রকার শক্তি ও ক্রিয়ার ভিতরে এই পরম কল্যাণময়ী সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময়ী বিচিত্র রসবিলাসময়ী নিত্যা রমণীকে উপলব্ধি ও আস্বাদন করিতে পারিলেই, জীব-জীবনের সার্থকতা, সর্ব্ববিধ দুঃখ দৈন্য বিঘ্ন বিপত্তি ভয় ভাবনা হইতে মুক্তি, পরিপূর্ণ বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সম্ভোগ, বাধাহীন সঙ্কোচহীন দ্বন্দ্বহীন স্বাধীনতা ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা।

এই মহাশক্তিকে নিজের সাধনার ভিতরে জাগ্রত করিতে পারিলে, অন্তরে মহাশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে, আর অসুরের ভয় থাকে না। জাতির ভিতরে এই মহাশক্তির চেতনা উদ্বুদ্ধ হইলে, আসুরিক শক্তি ও আসুরিক ভাব সেখানে আর রাজত্ব করিতে পারে না। এই মহাশক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, কোন প্রকার দুর্ব্বলতা, কোন প্রকার ভীতি, কোন প্রকার নৈরাশ্য অন্তরে স্থান পায় না; এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত সাধক কাহারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না, কাহারো দাসত্বও অঙ্গীকার করে না, কাহাকেও দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না, তাহার স্বাধীনতার উপর কাহারো পদক্ষেপও সহ্য করে না। সকলের প্রতি তাহার হৃদয় প্রেম ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়, সকলকে সে একই জননীর সন্তান জানিয়া সৌভাত্র্যভাবে আলিঙ্গন করে, সকলের সহিত সমবেত হইয়া সে ব্যক্তিগত জীবনে ও সমষ্টিগত জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় পুরুষকার প্রয়োগ করে।

বিষ্ণু প্রসাদে আপনাদের সম্মিলিত সাধনায়

আবির্ভূত নিত্য সত্য কল্যাণানন্দময়ী মহাশক্তিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যপ্রতিমা দিব্যা নারী মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া দেবগণ তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বজননী দেবতাদিগকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক দৈবীশক্তি ও দৈব আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে অসুররাজের রাজ্যমধ্যে আত্মপ্রকট করিলেন। আসুরিক দৃষ্টিতে নারী পুরুষের সম্ভোগ্যা, বিলাসের সামগ্রী। অসুর-রাজের দূতগণ তাঁহাকে এই দিব্যাঙ্গনার সংবাদ দিলেন এবং তিনিও এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণীকে অন্তঃপুরে গ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রী ও সেনাপতি পাঠাইলেন। নারী বলিলেন, আমাকে যে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া বীর্য্যবলে বশীভূত করিতে পারে, আমি তাহারই সম্ভোগ্যা হইয়া থাকি; এই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে কত বীর্য্য লুক্কায়িত, এই মাধুর্য্যের ভিতরে কত ঐশ্বর্য্য স্বভাবসিদ্ধ, অসুরের অবিদ্যাগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাহা প্রতিভাত হইল না। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নারী সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে বহুভুজা হইয়া হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া দুলিয়া, যুদ্ধের অভিনয় করিলেন। অসুরগণ দেখিতে পাইল,—দশদিকেই এই অদ্ভুত নারীর হস্ত প্রসারিত, সকল প্রকার দৈবপ্রহরণ তাঁহার হস্তে সুশোভিত। বিশ্বের সকল পাশবশক্তির প্রতীকস্বরূপ পশুরাজ সিংহকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তিনি সহাস্যবদনে যুদ্ধ করিতেছেন; সকল দিক হইতেই তাহাদের উপর অস্ত্র বর্ষিত হইতেছে; তাঁহার কোন ক্লান্তি নাই, কোন শ্রমের লক্ষণ নাই। অসুররাজের সমস্ত সেনা ও সেনাপতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তাহাদের সমস্ত কূটজাল ব্যর্থ হইল, সমস্ত অস্ত্রকৌশল নিরর্থক হইল। যে নারীকে সম্ভোগের উপকরণ মাত্র মনে করিয়া অমিতপরাক্রমশালী অসুর তাহার হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা মাত্রও কল্পনা করিতে পারে নাই, যে নারী সর্ব্বত্র স্নেহ মমতা কোমলতা, দুর্ব্বলতা ও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের প্রতিমা বলিয়া পরিজ্ঞাত, সেই নারীই অসুরের মৃত্যুস্বরূপ হইল।

বিশ্বজননী মহানারী অসুররাজকে পদানত করিয়া তাহার মস্তকোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক চরণ বিশ্বের সব পাশবশক্তির মস্তকে স্থাপন করিয়া বিশ্বান্তর্য্যামিনী সচ্চিৎ প্রেমানন্দময়ী মহাশক্তি বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সচ্চিৎ প্রেমানন্দের রাজত্ব সংস্থাপন করিলেন। অসুরদমনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীর কোলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশ আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বত্র ধন সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি, বীর্য্য-বিক্রম এবং শান্তি-সন্তোষ বিধান করিলেন। ব্রাহ্মণ্যশক্তি (সরস্বতী), ক্ষাত্রশক্তি (কার্ত্তিক), বৈশ্য-শক্তি (লক্ষ্মী) ও শূদ্রশক্তি (গণেশ) স্ব স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বলরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইল। যাবতীয় দৈবশক্তি মহাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া, মহাশক্তির অনুবর্ত্তন করিয়া মহাশক্তির স্বভাব নিহিত পরম কল্যাণময় বীর্য্যৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যময় সুমহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, একযোগে বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত হইল। আসুরিক অভিমানের জগৎ ভাগবতী ভক্তির জগতে পরিণত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইল। বিশ্বপ্রকৃতির সকল বিভাগে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। বাহ্যপ্রকৃতি হাস্যময়ী হইল, আন্তর-প্রকৃতি মাধুর্য্যমণ্ডিত হইল। বসুন্ধরার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নবজীবন ও নব-যৌবনের বিকাশ হইল। নিদাঘ-সন্তপ্তা অসুর-বিধ্বস্তা রোরুদ্য-মানা তপস্বিনী পৃথ্বিদেবী অসুরের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুস্নাত ও সুপবিত্র দেহে নূতন বেশভূষায় সুসজ্জিত হইলেন এবং মুক্তির আনন্দোজ্জ্বল হাস্যে দিগ্‌দেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া সত্য শিব সুন্দর প্রাণদেবতার সোপচার অর্চ্চনার নিমিত্ত আপনার অন্তর্নিহিত সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল মাধুর্য্য, সকল প্রেম-ভক্তির বিকাশ সাধন করিলেন।

ভারতীয় ঋষি বিশ্ব, বিশ্বজননী ও বিশ্বপ্রাণের এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চিরতরে তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইলেন, এবং মানবসমাজে ইহার পূজা প্রচার করিলেন। বিশ্ব-বিধানে অন্তর্নিহিত সত্য ও সৌন্দর্য্য মহাশক্তির এই সিংহবাহিনী অসুরমর্দ্দিনী বীর্য্যৈশ্বর্য্য-বিদ্যাসিদ্ধিজননী দেবমানবাভয় প্রদায়িনী সর্ব্বকল্যাণ-শোভিনী চিরহাস্যময়ী দিব্য মূর্ত্তির মধ্যে প্রকটিত। বিশ্ব সংসারে আপাত দৃষ্টিতে আসুরিক শক্তির তাণ্ডব-নৃত্য যতই বীভৎস আকারে প্রতীয়মান হউক না কেন,

বিশ্বের সনাতন অধ্যাত্মবিধানে তাহার মস্তকটী চিরকাল সচ্চিৎ প্রেমানন্দময়ী বিশ্বজননীর চরণতলে। তাঁহার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া দীর্ঘকাল আত্মম্ভরিত্ব-সাধনের শক্তি অসুরের নাই। বিশ্ব-জগতের সব পাশবশক্তি, সব আসুরশক্তি, সব দৈবশক্তি, সব মানবশক্তি, নিত্য-লীলাময়ী নিত্যসত্যকল্যাণস্বরূপা বিশ্ব-মাতারই সর্ব্ব-নিয়ন্ত্রী শক্তির নিয়মাধীন থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। তাঁহারই লীলাবিধানে জগতে কখন কখন আসুরী-শক্তির অভ্যুত্থান ও দৈবীশক্তির গ্লানি সমুপস্থিত হয়,—বিপ্লবী-শক্তির প্রাদুর্ভাব ও সংগঠনী শক্তির নিস্তেজভাব প্রকটিত হয়—আবার তিনিই আপনার মহাদেবী শক্তির বিশেষ প্রকাশ দ্বারা আসুরী-শক্তিকে পদানত করিয়া, বিপ্লব-শক্তিকে পরাভূত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া, সাম্যমৈত্রীশান্তি শৃঙ্খলাময়ী দৈবীশক্তির প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বে কল্যাণাকুল দৈব-শক্তিসমূহ যখন নিজেদের প্রাণস্বরূপা এবং অদ্বিতীয়া সর্ব্বকল্যাণময়ী মহাশক্তিকে বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হয়, নিজ নিজ আদর্শেরই শ্রেষ্ঠ খ্যাপন করে, তখনই সেই সুযোগে বা দুর্য্যোগে আসুরীশক্তি প্রতাপান্বিত হয়, তাহারা আসুরীশক্তির কবলে নিপতিত হয়। ঐক্যের ভিতরেই মহাশক্তির প্রকাশ, বিচ্ছেদের ভিতরেই অন্তর্দ্ধান। দৈবশক্তিসমূহ সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ থাকিলেই, মহাশক্তি তাহার বিভূতিস্বরূপ বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও সিদ্ধিকে কোলে লইয়া বিশ্বজগতে আত্মবিকাশ করেন এবং সকল আসুরীশক্তি ও পাশবীশক্তিকে পায়ের নীচে রাখিয়া দৈবীশক্তির নিয়মানুসারে সু-পরিচালিত করেন। এই অশেষ-বৈচিত্র্য সমাকীর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একই সচ্চিদানন্দ-ময়ী মহাশক্তি বহুরূপে লীলাবিলাস করিতেছেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাহারই লীলাবিলাস। বিশ্ববৈচিত্র্যের সর্ব্বত্রই তিনি অনুপ্রবিষ্ট, সকল শক্তির মধ্যে তাঁহারই শক্তির খণ্ড প্রকাশ, তিনিই সকল জ্ঞানের উৎস, সকল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, সকল শান্তি ও সিদ্ধির জননী। বিচিত্র রূপে বিচিত্র নামে বিচিত্র ভাবে আত্ম-প্রকট করিয়া তিনিই একাকী বিরাজমানা। সকল জননীর মধ্যে তাঁহারই জননীত্বের খণ্ড প্রকাশ, সকল প্রেমিকের মধ্যে তাঁহারই প্রেমের অভিব্যক্তি। সূর্য্যের কিরণে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, ফুলের গন্ধে, বীর্য্যবানের বীর্য্যে, দয়াবানের দয়ায়, ঐশ্বর্য্যশালীর ঐশ্বর্য্যে, পুণ্যশীলের পুণ্যে—তাহারই প্রকাশ। "দ্বিতীয়া কা মমাপরা"।

এই মহাশক্তিই বাঙ্গালী জাতির প্রাণদেবতা। বাঙ্গালী হিন্দুর ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি জীবনের আদর্শ। এই মহাশক্তিকে বাঙ্গালী হিন্দু সাধক একদিকে স্নেহময়ী বিশ্বজননীরূপে, অপরদিকে ঘরের আদরণীয়া কন্যারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রখর রৌদ্রতাপ, ঝড়ঝঞ্ঝার উৎপীড়ন, মেঘের প্রলয় গর্জ্জন, বর্ষার প্লাবন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শরৎ সমাগমে বাঙ্গালী হৃদয় তাহার প্রাণদেবতাকে নানা রসে ও নানা ভাবে আস্বাদন করে; ঘরের মেয়ে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া অনুভব করে; কার্ত্তিক ও গণেশকে—ক্ষাত্রবীর্য্য ও জনগণ সন্তোষকে—দুই পাশে লইয়া, এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে—ধনসম্পৎ ও জ্ঞানসম্পৎ—দুই হাতে ধরিয়া, পাশবশক্তি ও আসুর-শক্তিকে পদতলে রাখিয়া, স্নেহপীযূষভরা বক্ষে হাসিতে হাসিতে মা আমাদের বহির্জ্জীবন ও অন্তর্জ্জীবন আলোকিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া অনুভব করে। জীবনের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে, ব্যক্তি-গত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মহামহিমময়ী মহা-তেজোময়ী, মহালাবণ্যময়ী, মহাদেবীর আগমনী আস্বাদন করিবার জন্য বাংলার উচ্চনীচ, ধনীনির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল নরনারী মহামহোৎসবের আয়োজন করে। তাহাদের সকল অন্তর আগমনীর গানে পুলকিত হইয়া উঠে। মহাশক্তিকে তাহারা উপলব্ধি করে পরমানন্দময়ীরূপে; সকল তেজের আধারকে তাহারা আস্বাদন করে সকল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আধাররূপে; পশুরাজবাহিনী অসুররাজ-মর্দ্দিনী, বিচিত্র প্রহরণধারিণীকে তাহারা অনুভব করে বিশ্ববিপদ্‌নাশিনী সর্ব্বকল্যাণবিধায়িনী বরাভয়-প্রদায়িনী স্নেহপীযূষপ্রস্রবিনী জননীরূপে। দশদিকেই

তাহারা দর্শন করে মায়ের মঙ্গলহস্ত, আকাশে বাতাসে জলে স্থলে তাহারা অনুভব করে মায়ের আশীর্ব্বাদ। তাহাদের সারা প্রাণ ভরিয়া উঠে আশার উৎসাহে বীর্য্যে প্রেমে আনন্দে। মা'কে বেষ্টন করিয়া মা'কে জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলিত হয়—নির্ভীক নির্ম্মৎসর নিরাবিল প্রেমে।

যাহার যেরূপ শক্তিসামর্থ্য, যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, যেরূপ অর্থসম্পৎ, সে তাহাই মাতৃপূজার উপচাররূপে লইয়া উপস্থিত হয়। কাহারো প্রতি কাহারো হিংসা বিদ্বেষ নাই। মায়ের কাছে বড়-ছোটর ভেদ নাই। উপকরণের পার্থক্যে মাতৃপূজায় অধিকারের পার্থক্য হয় না। কেহ প্রতিমা গড়ে, কেহ তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, কেহ মন্ত্রোচ্চারণ করে, কেহ ফুল সংগ্রহ করে, কেহ নৈবেদ্য সাজায়, কেহ বাজনা বাজায়,—পূজায় সকলেরই সমান অধিকার, কেহই এই মাতৃপূজায় যোগদানে বঞ্চিত হয় না। স্নেহময়ী জননী কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখেন না, কাহাকেও উৎসবানন্দে বঞ্চিত করেন না, দুর্ব্বল বা দরিদ্র বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

মাতৃকেন্দ্রিক জীবনের উদ্বোধনে পূজার আরম্ভ, মহাশক্তিময়ী সচ্চিৎ প্রেমানন্দস্বরূপিনী মাকে সর্ব্বত্র অনুভবগোচর করিবার অনুশীলনই পূজার প্রক্রিয়া, এই আদর্শকে জীবনের সকল অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া প্রতিমার বিসর্জ্জনেই আনুষ্ঠানিক পূজার শেষ। এই সুমহান্ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত দেহ মনে সকলের সহিত সকলে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সংসারপথে অগ্রসর হওয়াই বাঙ্গালী জীবনের অভীষ্ট। মা আমাদের সকলের, আমরা সকলে মায়ের, মা আমাদের দৈত্য-দানবদলনী অনন্ত মঙ্গল-প্রসবিনী; আমরা এই মহাশক্তির সন্তান, আমাদের মধ্যে এই কল্যাণময়ী মহাশক্তিই বিশেষ বিশেষ রূপে রূপায়িত; সুতরাং আমরা ভয় করিব কাকে? হিংসাই বা করিব কাকে? ঘৃণাই বা করিব কাকে? মা'কে অনুভূতির মধ্যে চিরজাগ্রত করিয়া চল আমরা সকল সন্তান এই বৈচিত্র্যসঙ্কুল সংসারে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের পথে ভয়ভাবনারহিত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের সহিত সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হই। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব বিশ্বের সকল মানবকে এই আহ্বান জানাইতেছে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"।

বোধন

শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ

এবার আনন্দময়ী রূপে নয় দেবী
মুক্ত কৃপাণ করে,—
এসো বংগের সমরাংগনে
দানব দলন তরে।
গর্বিত যারা,—তাদের গর্ব,
রণ হুংকারে করিতে খর্ব,
অত্যাচারীর উন্নত শির
নোয়াতে শ্রীপদভরে।
এসো বংগের সমরাংগনে
মুক্ত কৃপাণ করে।

এই বংগের যতো সম্পদ ভার
সবি মাতঃ তোমারি তো
তবে কেন বলো, তব সন্তান
তাহা হ'তে বঞ্চিত?
কাঁদিবে নীরবে কেন চিরদিন,
ক্ষুধায় খিন্ন ব্যথায় বিলীন
সয়েছে অনেক, আর নয় দেবী
তাদের রক্ষা তরে
এসো বংগের সমরাংগনে
মুক্ত কৃপাণ করে।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : ভাদ্র, ১৩৭২ সংখ্যার পর]

মহাস্থানের বৃহৎ প্রাসাদের একটি সুরম্য মহলে যুবরাজ ইন্দ্রনীল চিন্তান্বিতভাবে পদচারণ কোরছিল। সময় হু হু কোরে কেটে যাচ্ছে। এখানে আসার পর কয়েকটি পক্ষ অতিবাহিত হোয়ে গেছে। কোদণ্ড ফিরে এসে এই প্রাসাদেরই অপর একটি অংশে আছে—মহারাজ স্থাণুদত্ত তাকেও সসম্মানে গ্রহণ কোরেচেন। কিন্তু আসল কাজের কিছুই হোচ্ছে না। রাজোচিত বিলাসের মধ্যেই ইন্দ্রনীলের দিন কাটছে। ইন্দ্রনীলের আমন্ত্রণ সংবাদ পেয়ে বারকয়েক উগ্রতারা প্রাসাদে এসেছিল। কিন্তু উগ্রতারার ব্যবহারে এখন আর ইন্দ্রনীল পূর্বের ন্যায় তৃপ্ত হয় না। উভয়ের অজ্ঞাতসারে যেন একটা সূক্ষ্ম আবরণ তাদের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে। হয়ত এটাই স্বাভাবিক, কেননা সার্থবাহ রত্নদত্ত ও যুবরাজ ইন্দ্রনীলের মধ্যে অনেক প্রভেদ। অন্ধকার আলোককে আহ্বান করে, কিন্তু সে জানে না যে, আলোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই হয় তার মৃত্যু!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ইকা প্রজ্জ্বলিত দীপ হস্তে প্রবেশ কোরে কক্ষের দীপগুলি জেলে দিলো। ইন্দ্রনীল পদচারণ বন্ধ কোরে ইকার প্রতি তাকালে আদেশের প্রত্যাশায় ইকা উৎসুক নেত্রে ইন্দ্রনীলের কাছে এগিয়ে এল। অদ্ভুত দাসী! না, দাসী নয়—ক্রীতদাসী এই ইকা। মহারাজ স্থাণুদত্ত ইন্দ্রনীলের ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও সেবার জন্য এই ক্রীতদাসীকে নিযুক্ত কোরেছেন। ইকা এই দেশীয় তো নয়ই—এমনকি ভারতীয়ও নয়—তার জন্মস্থান ইরান! হুন দস্যু কর্তৃক অপহৃত হোয়ে সে আনীত হয় হিন্দুস্থানে, তারপর হাত বদল হোতে হোতে বর্তমানে সে মহারাজ স্থাণুদত্তর অধীন। ইকার দেহ শ্বেত-মর্মরে নির্মিত নিপুণ ভাস্করের রচিত শ্রীসৌষ্ঠবসম্পন্ন এক অপূর্ব মূর্তি। কিন্তু সে মূর্তি মর্মরের ন্যায় কঠিন নয়—কার্পাস সদৃশ কোমল, নমনীয়। ইকার দেহবল্লরীর মধ্যদেশ হ'তে ক্ষীণ কটি হোতে করভোরু পর্যন্ত রেশমী বস্ত্রে আবৃত; কারু চুচুকৃতি ক্ষৌম বস্ত্রে আচ্ছাদিত; খগনাসা, চকিত হরিণনয়না; বেণীসম্বদ্ধ স্বর্ণাভ কেশরাশি ইকার শুচিশুভ্র পৃষ্ঠদেশে দোলায়মান!

ইন্দ্রনীল বোললো, ইকা, আমি লক্ষ্য কোরেছি তুমি আমাকে যেন ভয়-ভয় করো, কিন্তু আমি তো তোমাদের সঙ্গে সব সময়েই মিষ্ট ব্যবহার করি।

ইকা মুখখানি নামিয়ে ধীরে ধীরে বলে, আপনি অত্যন্ত দয়ালু, কিন্তু আপনি প্রভু—আমি ক্রীতদাসী—সে তো প্রভুকে ভয় কোরবেই।

এস আমার কাছে।

ইকা আরও এগিয়ে এলে ইন্দ্রনীল তার চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরলো—ইকার চক্ষুঃপল্লব যুক্ত হোলো—দুই বিন্দু অশ্রু চোখের কোণে দেখা দিলো!

ইন্দ্রনীল ঈষৎ কম্পিত স্বরে বোললো, আশ্চর্য সুন্দরী, কিন্তু কি অদ্ভুত জীবন তোমার! কোন দূরদূরান্তর হোতে এসেছ—কি ভয়ানক রোমাঞ্চকর তোমার জীবন—বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বহু জ্ঞান তুমি অর্জন কোরেছ, কিন্তু তা সবই বৃথা হোয়েছে। তুমি যে ক্রীতদাসী—অপরের আজ্ঞায় তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে বিক্রীত। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি এতে তোমার ক্লান্তি বা দ্বেষ আসে না? অন্তরে অন্তরে আমার ওপর কি তুমি বিরক্ত নও?

না, প্রভু, বিরক্ত কেন হবো। এবার ইকা ঝর্‌ঝর কোরে কেঁদে ফেললো।

একটু পরে ডান হাতখানি ইকার মাথার ওপর রেখে সস্নেহে ইন্দ্রনীল বলে, তা কি সম্ভব! নারী বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি—কোমলে মধুরে স্নেহে সোহাগে, সেবা যত্নে—তোমরাই তোমাদের একমাত্র তুলনা। তুমিও সেই নারী—পাষাণী নও। মানুষ যখন যা কিছু করে, তার মধ্যে প্রতিদানের অঙ্কুর কিছু-না-কিছু থাকেই। কিন্তু বোলতে পারো, তুমি কী প্রতিদানের আশায় আমার সেবিকার সেবিকা হোয়েছো? আমার মানস ইচ্ছাও আমার অজ্ঞাতসারে অকুণ্ঠভাবে পূরণ কোরছো—দিবারাত্র? যত তুচ্ছ পুরস্কারই আমি তোমাকে যাবার সময় দিই না কেন সে তো তুমি দাবী কোরতে পার না—তুমি সেবাদাসী হোলেও, তুমি যে ক্রীতদাসী।

ইকা আস্তে আস্তে বোললো, আপনি আমার জন্য এতো চিন্তা কোরেছেন? আশ্চর্য!

শুধু তোমার জন্য নয়, ইকা—জগতে সমস্ত ক্রীতদাসীর তরেই আমি চিন্তিত—দুঃখিত; তবে এ কথা ঠিক তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার মনে এই ভাবান্তর ঘটেছে। কিন্তু…

ইন্দ্রনীলের কথা শেষ কোরতে না দিয়েই ইকা স্তিমিত—জড়িত কণ্ঠে বোললো, যুবরাজ! আমার এই ঘৃণ্য জীবনে আপনার এই মহতী চিন্তা—কৃপাপরায়ণ মনোবৃত্তিই আমার শ্রেষ্ঠ উপহার। আপনার ন্যায় রাজপুরুষের মনে যখন আমাদের চির বেদনার কথা উদয় হোয়েছে, তখন এটা দুরাশা নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হবে।

আমি যখন কম্বোজে ফিরে যাবো তখন তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

যুবরাজকে স্মরণ করিয়ে দিই—আমি ক্রীতদাসী।

বাইরে থেকে ঘোষক অনুচ্চকণ্ঠে বোললো, কোদণ্ডদেব যুবরাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

ইন্দ্রনীল বোললো, যাও ইকা, কোদণ্ডকে নিয়ে এস।

কিছু পরেই ইকার সঙ্গে কোদণ্ড গৃহে প্রবেশ কোরলো, ইন্দ্রনীল 'এস বন্ধু' বোলে তাকে আহ্বান কোরলো। কোদণ্ড ইকার প্রতি তাকাতেই ইন্দ্রনীল ইসারায় ইকাকে বাইরে যেতে বোললো, সে চ'লে গেল।

ইন্দ্রনীল বোললো, তারপর?

তারপর আর কিছু নেই, কোদণ্ড বলে, শুধু দুটি কাজ,—ভোজন আর নিদ্রা।

মহারাজ বাণগড় থেকে না ফেরা পর্যন্ত আমাদের আর কিছু করবার নেই।

আছে।

আছে?

হাঁ, আছে, কোদণ্ড বলে, মহারাজ বাণগড়ে কেন গেছেন তা তুমি জানো। উত্তর সীমান্তের ভুটিয়াদের বার বার হামলা প্রতিরোধের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করাই হোচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য। বাণগড়ই বর্তমানে মহারাজের সেনাবাহিনীর প্রধান কেন্দ্রস্থল।

ইন্দ্রনীল প্রশ্ন করে, এ ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়?

মহারাজের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

কথাটা তুমি ঠিকই বোলেছো, কোদণ্ড। আমরা যদি মহারাজের কার্যে সহায়তা করি, তাহোলে আমাদের কার্যেও মহারাজের সহায়তা অবধারিত। কোদণ্ড, বাণ্‌গড়ে আমাদের অতি শীঘ্রই যাওয়া প্রয়োজন—তুমি সেই ব্যবস্থাই করো।

ইন্দ্রনীলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রফুল্লমনে কোদণ্ড নিজের কক্ষে ফিরে গেল। কক্ষের অপর দ্বার

দিয়ে কে যেন দ্রুতবেগে বার হোয়ে গেল। কোদণ্ডের ভ্রূ কুঞ্চিত হোলো। কঠোর কণ্ঠে ডাকলো, রক্ষী! রক্ষী প্রবেশ কোরে অভিবাদন কোরলো।

এইমাত্র এ কক্ষ হোতে কে বার হোয়ে গেল?—কোদণ্ড প্রশ্ন করে।

ক্রীতদাসী উল্কা।

যাও সনাতনকে পাঠিয়ে দাও।

রক্ষী চ'লে গেল, অল্প পরে প্রৌঢ় ভৃত্য সনাতন প্রবেশ কোরলো।

কোথায় ছিলে?

আজ্ঞে……

এই রাজপ্রাসাদে তুমি কতোদিন আছ?

তা হুজুর, ছেলেবেলা থেকেই আছি।

তাহোলে প্রাসাদের রীতিনীতি, আদব কায়দা তোমার জানা উচিত।

হুজুর! আমি উল্কাকে অনেক নিষেধ কোরেছি, কিন্তু……

অত্যন্ত অবাধ্য এই দাসী। মহারাজ আমার সুবিধার জন্য এই ক্রীতদাসীকে নিযুক্ত কোরেছেন, কিন্তু সনাতন, কোন নারীর পরিচর্যার প্রয়োজন আমার নেই; মহারাজ ক্ষুণ্ণ হবেন বোলে ওকে আমি ফেরৎ পাঠাইনি; কিন্তু তোমাকে আমি অনেকবার বোলেছি উল্কা যেন আমার কক্ষে কখনো না প্রবেশ করে, তবু…।

হুজুর আমি উল্কাকে ডেকে দিচ্ছি, যদি দয়া কোরে আপনি নিজে একবার…

সনাতন, তুমি যাও; আমার অনেক কাজ আছে। —কাল প্রত্যূষে আমি বাণগড় যাবো।

এর পরের ঘটনাগুলো যেমন দ্রুত ও আকস্মিক, তেমনি গৌরবময়। মহারাজ স্থাণুদত্ত ইন্দ্রনীল ও কোদণ্ডের সাহচর্যে দুর্ধর্ষ পাহাড়ী ভুটিয়াদের পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত কোরে তাদের সন্ধি কোরতে বাধ্য কোরলেন এবং সন্ধির একটি সর্ত হিসাবে স্থির হোলেও ভুটিয়ারাজ নিজ পুত্রকে উপস্থিত পাঁচ বৎসরের জন্য রাজধানী মহাপ্রস্থানে তার প্রতিভূস্বরূপ রেখে দিলো। সীমান্ত প্রদেশ নিরাপদ হোলো।

পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে ইন্দ্রনীল ও কোদণ্ডর খ্যাতি-প্রতিপত্তি, মান-যশ বহু গুণ বর্ধিত হোলো। সকলেই তাদের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা কোরতে লাগলো, কিন্তু প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তাই ওদের এতো খ্যাতি-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও, অন্তরের অন্তঃস্থলে রুদ্ধ বেদনা গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে। নিশীথে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ইন্দ্রনীল অলিন্দে পদচারণ করে। রাজকীয় পরিবেশে এই রাজকীয় ভোগসম্ভার তার তিক্ততম মনে হয়। মন তার দ্রুতগতিতে চ'লে যায় বহু দূরে তার সেই প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি—যেখানে সে জন্মগ্রহণ কোরেছে, যেখানে সে তার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম…

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হোয়ে গেল—প্রাসাদের দক্ষিণ প্রান্তের ত্রিতলের একটি কক্ষের আলোকধারার প্রতি ইন্দ্রনীলের দৃষ্টি আবদ্ধ হোলো। ইন্দ্রনীল জানে, ঐ কক্ষটি রাজকুমারী চার্বী দেবীর।

রাজকুমারী চার্বী। অদ্ভুত, অপূর্ব, অনুপম বিদূষী এই কন্যা—রূপের সঙ্গে গুণ ও বিদ্যার এমন অভূতপূর্ব যুগপৎ মিলন খুবই বিরল। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে রাজকন্যার কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ ও পরিচয়ও হোয়েছে, কিন্তু সে পরিচয় শ্লীলতা ও সংযমের দ্বারা সীমাবদ্ধ। রাজকন্যা অত্যন্ত স্বল্পভাষী, অধিকাংশ সময় শাস্ত্র ও সৎগ্রন্থ-সমুদ্রে নিমগ্ন থাকে, ইন্দ্রনীল শুনেছে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত অধ্যয়ন করে—রাজকুমারীর কক্ষের আলোকই সেই বার্তা ঘোষণা কোরছে।

ইন্দ্রনীল একাগ্র দৃষ্টিতে সেই আলোকোজ্জ্বল বাতায়ন প্রতি তাকিয়ে রইলো·· সহসা বাতায়ন-পথে একটি ছায়ামূর্তি দেখা গেল, ইন্দ্রনীল বুঝতে পারলো রাজ-কুমারী চার্বীর উদয় হোয়েছে ঐ বাতায়ন-সমীপে। ইন্দ্রনীল দেখে, রাজকুমারী তার সুদৃশ্য কবরীবন্ধন খুলে কেশরাজি আলুলায়িত কোরতে লাগলো। এই দৃশ্যে ইন্দ্রনীল অভিভূত হোলো—মন তার এক মনোরম পুলকে ভ'রে উঠলো। যে অস্থিরতা ক্ষণকাল পূর্বে তাকে চিন্তাক্লিষ্ট কোরেছিল, শরতের মেঘের ন্যায় তা অপসৃত হোলো। উন্মুক্ত কেশরাশিতে চার্বীর উভয়

পার্শ্ব ভরে গেল, লঘু হাওয়ায় সেই দীর্ঘ কেশপাশ মৃদু-মধুর আন্দোলিত হোতে লাগলো। ইন্দ্রনীল বিস্ময়বিমুগ্ধ। কিন্তু এ অপূর্ব মোহকর দৃশ্য অল্পক্ষণ স্থায়ী—দেখতে দেখতে চার্বী গবাক্ষ হোতে দূরে সোরে গেল—পর মুহূর্তেই সমস্ত আলো নির্বাপিত হোলো—আঁধারের মধ্যে চার্বীর কক্ষ হারিয়ে গেল—ইন্দ্রনীলের চক্ষের ওপর যবনিকাপাত হোলো। কিন্তু ইন্দ্রনীলের মানস-প.ট চার্বীর সৌন্দর্য-সুষমা বিকশিত রইলো। পরিতৃপ্ত মনে সে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ কোরে শয্যায় আশ্রয় নিলো।

তন্দ্রা নেমে এল তার চোখে, আর তারই সাথে মিছিল কোরে এল নারীর পর নারী। সেই শোভা-যাত্রার সব শেষে যে মুখচন্দ্রমাখানি ভেসে উঠলো তা আর সব জ্যোতি ম্লান কোরে দিলো—জ্যোতির প্রচণ্ডতায় নয়—স্নিগ্ধতায়। এ এক অনির্বচনীয় স্নিগ্ধতা, যা মনকে উত্তপ্ত করে না—প্রসন্ন করে; সকল কামনা, বাসনা, আকাঙ্খা এক স্বর্গীয় শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হোয়ে ভোগের পরিবর্তে নিজেকে ধূপের ন্যায় অনন্তে বিলীন হোয়ে যেতে ক্ষিপ্ত হোয়ে ওঠে। ইন্দ্রনীল সুখস্বপ্নময় নিদ্রায় মগ্ন হোলো।

(ক্রমশঃ)

মাতৃ-স্নেহ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

সব তো তোমার পূর্ণ করার
সাধ্য আমার নাই;
হাজার হাজার বাছা আমার,
সে-ও তো ভাবা চাই।
রাজার হালে রাখি তোমায়,
তবুও অসন্তোষ!
আমার বাছা হ'লেও তোমার
এই তো মহাদোষ;
কেবল রোষের ছল্ খোঁজো গো—
কেবল অভিমান,
অজস্র মোর স্নেহের দানেও
ভরতে না চায় প্রাণ।
খুঁত খোঁজো আর বিবাদ করো,
আশার যে শেষ নাই;
বিশ্ব-মায়ের কোলেই আছো
এ-ও যে বোঝা চাই।
খেলা-ঘরের মোহ-ও যাবে
মুহূর্ত্তে যে খসি',
খুসী র'বে তখন কেবল
কোলের কাছে বসি'।

২

এতো আলোর আশিস্ দিলাম—
সোনার সূর্য্য-কর,
এতো নদীর ধারা দিলাম—
কোমল কল-স্বর,
এতো পাখীর কাকলি-রব,
এতো ফুলের বাস,
এতো রকম মাধুর্য্য সব
তবুও অবিশ্বাস!
লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার,
উচিত হওয়া খুসী;
বসুন্ধরার মাধুর্য্যে যে
নিত্য তোমায় তুষি।
মায়ের স্নেহের গভীরতার
স্বাদটি যেদিন পাবে,
আমায় ছাড়া বাছা, তখন
আর কিছু না চা'বে।

মূর্তি

(অলৌকিক ঘটনা)

মহীতোষ বিশ্বাস

বাস থেকে নেমে পড়লাম। কণ্ডাক্টর বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "ঐ যে দেখছেন দূরে বড় বাড়ী, ঐটাই বাবুদের বাড়ী।"

একবার সেইদিকে তাকালাম, হ্যাঁ একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে বটে। পথটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে দূরে ঐ বাড়ীটার দিকে। চলতে লাগলাম। সঙ্গে এমন কিছু নেই, কেবল একটা সুটকেশ, দু'একটা জামা কাপড় আর এটা-সেটা।

অপরিচিত জায়গা, আগে এখানে কোনদিন আসিনি। চারদিকের দৃশ্য বেশ একটা নতুনের ছাপ রাখছিল মনে। এ জায়গা অনেকটা পাহাড়ী অঞ্চলের মত। উঁচু নীচু পথ, ফাঁকা-দিগন্ত বিস্তৃত রুক্ষ জায়গা ছড়িয়ে আছে। ঝোপ-জঙ্গল তেমন নেই বললেই হয়। চারদিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় যেন বাঙ্গলার বাইরে পশ্চিমে কোথাও এসেছি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিমে রক্তরাঙা রবি বিদায় নিচ্ছেন, সারা আকাশ লালে লাল। পথ চলেছি। জমিদার বাবুদের বাড়ী পৌঁছতেই সূর্য অস্ত গেল। আকাশের কোলে রাঙা রঙের বদলে কেমন কালো বেগুনে রংয়ের আভা দেখা দিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল মাটির বুকে।

পথটা এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে দূরে ঐ বাড়ীটার দিকে

শরীর খুবই ক্লান্ত। প্রায় একশো মাইল পথ বাসে এসেছি। বাসের ঝাঁকানিতে সারা দেহ যেন ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। তাছাড়া স্নান আহারও হয়নি। পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো যেন পাক দিচ্ছে। কেমন একটা অস্বস্তি।

ধনী-জমিদার বাড়ী। ফটকে দারোয়ান আছে। বাগান আছে। লাল সুরকির সুন্দর রাস্তা। চমৎকার সাজান বাড়ী। ফটকে ঢুকতেই দরোয়ান উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলাম জমিদারবাবু বাড়ীতে আছেন কি না। দারোয়ান জিজ্ঞাসা করলে কোন জমিদারবাবু অর্থাৎ বড়বাবু, মেজবাবু, কি ছোটবাবু। কারণ এঁদের তিনজনের বাড়ী আলাদা আলাদা। নাম বললাম। দারোয়ান বললে, "হ্যাঁ, ভিতরে চলিয়ে যান। বাবু আছেন।"

বাহাদুর একবার আমার মুখের দিকে ভাল করে চাইলো

ভিতরে গিয়ে বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়ালাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। চারদিকে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোতে এই বিরাট বাড়ী যেন মাঠের মধ্যে এক দৈত্যপুরীর মত মনে হচ্ছিল।

একজন চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলে আমি কোথা থেকে আসছি এবং কাকে চাই। কিন্তু তার প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লোনা, তার আগেই এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন, বললেন, "আপনার কি কাল আসবার কথা ছিল?" বিনীতভাবে বললাম, "আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু কাল একটুর জন্যে সকালের বাসটা ফেল করলাম।" ভদ্রলোক বললেন, "আমারই নাম হরিশঙ্কর সিংহ। আমিই আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধুর কাছে আপনার কথা শুনেছি, আমার কয়েকখানা ছবির দরকার।"

নমস্কার করে বিনীতভাবে বললাম, "আজ্ঞে হাঁ চিঠিতেও সেই কথা লেখা ছিল।"

হরিশঙ্করবাবু বিনয় করে বললেন, "কিন্তু আপনার তো মনে হয় খাওয়া দাওয়া হয়নি। এখানে একটু চা-টা খেয়ে আপনি আমাদের গেষ্ট হাউসে চলে যান। কাল সকালে কথাবার্ত্তা হবে।"

ভদ্রলোক ডাকলেন, "বাহাদুর।"

বাড়ীর ভিতর থেকে বাহাদুর এল। নেপালি চাকর বাহাদুর, পরে জানলাম খুব বিশ্বাসী এবং বাবুদের প্রিয় চাকর।

হরিশঙ্করবাবু বাহাদুরকে আমার খাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিতে বলে অন্দরে চলে গেলেন।

একটু পরে চা, কিছু বিস্কুট এল। খেয়ে নিয়ে বাহাদুরকে বললাম, "চল গেষ্ট হাউসে যাই।"

বাহাদুর একবার আমার মুখের দিকে ভাল করে চাইল। মনে হ'লো কি যেন সে বলতে চাইছে। কিন্তু বলতে পারলো না। হঠাৎ বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

একটু পরেই হরিশঙ্করবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এল। তিনিই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গেষ্ট হাউসে অন্য কোন লোক এখন নেই। আপনার কোন অসুবিধা হবে নাতো?" শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু শুতে পারলে বাঁচি। কাজেই কোন দ্বিধা না করে বললাম, "না অসুবিধা কি হবে?"

হরিশঙ্করবাবু বাহাদুরকে বললেন, "যা বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে আয়। যাবার সময় বাবুর খাবার বাড়ী থেকে নিয়ে যাবি।"

বাহাদুর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

হরিশঙ্করবাবু বললেন, "কাল এ জায়গাটা আপনাকে

ঘুরিয়ে দেখাব। আপনি আর্টিষ্ট মানুষ—আপনার ভালই লাগবে।"

কথার জবাব কিছু দিতে হয়, যদিও এ ধরণের আলাপ তখন আর ভাল লাগছে না। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বললাম, "হাঁ আসতে আসতে পথের দু'ধারের দৃশ্য বেশ ভাল লাগছিল।"

হরিশঙ্করবাবু বেশ খুসি হয়েই বললেন, "নিতান্ত সখ্ করেই এখানে এই বাড়ী করেছি। আমাদের সাবেক বাড়ী এখান থেকে কিছুদূরে। গেষ্ট হাউসের কাছাকাছি দেখতে পাবেন।" একটু থেমে বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার ঠাকুর্দা ছিলেন রাজা যদুপতি সিংহ, তাঁর আমলেই বাড়বাড়ন্ত, জমিদারির আয় ছিল অনেক, কলিয়ারী ছিল অনেকগুলো।"

হরিশঙ্করবাবু আরও অনেক কথা হয়তো বলতেন, কিন্তু বাহাদুর এসে দাঁড়াল। তার এক হাতে ঢাকা দেওয়া খাবারের থালা, অন্য হাতে এক বালতি জল।

হরিশঙ্করবাবু বললেন, "আচ্ছা আপনি তা হলে এর সঙ্গে যান। কাল আবার দেখা হবে।"

নমস্কার করে বাহাদুরের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম।

শীতের রাত্রি। ফাঁকা জায়গা। নিকটে আর কোন ঘরবাড়ী নজরে পড়লো না। সব নিঝুম নিস্তব্ধ। বাহাদুরের সঙ্গে পথ চলতে বুঝলাম গেষ্ট হাউস বেশ খানিকটা দূরে। কাছাকাছি এসে দেখলাম দু' ঘর সাঁওতালের বাস আছে। পুরানো জমিদার বাড়ী নাকি খুব কাছেই। বাহাদুর বললে সেখানে ছোটবাবু থাকেন, তাঁদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। হরিশঙ্করবাবুর জমিদারী ছাড়াও ব্যবসা আছে। যুদ্ধের দৌলতে বেশ দু' পয়সা হয়েছে।

গেষ্ট হাউসের সামনে আসতেই বুঝলাম বাড়ীটা সাবেকী ধরণের বেশ পুরান বাড়ী। আগেকার ধরণের কারুকার্য, মোটা মোটা থাম, দরজা জানালা সবই সেকেলে। কিছুদিন আগে জায়গায় জায়গায় মেরামত হয়েছে বোঝা গেল। বেশ বড় বাড়ী।

পূর্বপুরুষদের আমলে আরও যে জমিদারীর আয় ছিল ও জাঁকজমক ছিল তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু আজ তার কিছুটা ভাঁটা পড়লেও হরিশঙ্করবাবুর দৌলতে কিছুটা ঠাট বজায় আছে। তিনিই নতুন করে বাড়ীঘর মেরামত করেছেন।

বাড়ীটার সামনে এসে একবার থম্‌কে দাঁড়ালাম। অল্প চাঁদের আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে সমস্ত বাড়ীটা। টর্চ সঙ্গে ছিল, ভাল করে সেই আলোয় এদিক-

বাহাদুর আমার পাশে-পাশে চলেছে।

ওদিক দেখে নিলাম। বাহাদুর আমার পাশে পাশে চলেছে। এবার টর্চের আলো দেখিয়ে তাকে আগে আগে যেতে বললাম।

বাড়ীর সদর দরজায় চাবি দেওয়া ছিল, বাহাদুর জলের বালতিটা নামিয়ে রেখে চাবি খুললো। ভিতরে প্রবেশ করলাম। একটা চত্বর পার হয়ে সামনের একটা ঘরে ঢুকলাম। দরজাটায় চাবি দেওয়া ছিল না, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। চত্বর বা প্রাঙ্গণের চারদিকেই

ঘর। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে, অল্প অল্প আশেপাশে ঝোপ-গাছপালা হয়েছে। সব ঘরের দরজাই বন্ধ, জানালাও বন্ধ। বুঝলাম সম্প্রতি কোন অতিথি ওখানে আসেনি।

বাহাদুর ঘরে ঢুকে টর্চের আলোয় খাবার থালা আর জলের বালতি রেখে দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক আলোর সুইচ্‌ টিপে আলো জ্বাললো। এখানেও ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে। বাহাদুর একে একে সব জানালাগুলো খুলে দিল, ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঘরের গুমোট ভাবটা, ভ্যাপ্‌সা গন্ধ অনেকটা কেটে গেল। ঘরের সামনেই বারান্দা, বারান্দার আলোটাও জ্বেলে রাখলাম। ঘরের একদিকে খাট পাতা আছে, বিছানাও পাতা আছে। বাহাদুর ভাল করে ঝেড়ে দিল। বালিশটা সরিয়ে ঠিক করে দিল, পাশবালিশ দুটো আছে—সে দুটোও ঠিক জায়গায় সরিয়ে দিয়ে আমাকে যা বললে তাতে বুঝলাম, সে এবার চলে যাবে। সবকিছু দেখেশুনে বুঝে নিতে বললে অর্থাৎ কোথায় দরজার খিল, কোথায় লাইটের সুইচ, কোথায় জল থাকলো, কোথায় বাথরুম, পায়খানা ইত্যাদি। সবকিছু দেখে নিলাম, বাথরুম অন্যদিকে—ঘরের বাইরে চত্বর পার হয়ে যেতে হয়।

বাহাদুর আর থাকতে চাইছে না। তাকে আবার ফিরে গিয়ে অন্য কাজ সারতে হবে। তা ছাড়া সে বেশ তাড়াহুড়ো করছে এসে পর্যন্ত। জলের বাল্‌তি থেকে জল নিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে বাহাদুরকে যেতে বললাম। জ্যোৎস্নার আলো এখন আরও একটু পরিষ্কার হয়েছে। দেখলাম সে চত্বর পার হয়ে সদর দরজার দিকে চলে গেল। একটু পরে গিয়ে সদর দরজায় খিল দিয়ে এলাম। বারান্দার দরজা বন্ধ করে ঘরের দরজাটা খোলা রেখে দিলাম। জানালা একটা খোলা রেখে সব বন্ধ করে দিলাম। একটা কুঁজো ছিল, বাহাদুর তাতে খানিকটা জল ঢেলে রেখেছে। কুঁজোটা কাছে নিয়ে এলাম। থালার ঢাকা খুলে দেখলাম, অনেক রকমের খাবার। লুচি, তরকারী, চাট্‌নি, মিষ্টি, এর মধ্যে আবার চারটি পোলাও আছে। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থাকলে খাওয়ার ব্যাপারে এরকম ব্যবস্থা হয়, এখানেও তাই। যা পারলাম খেয়ে নিলাম। বাল্‌তির জলে হাত ধুয়ে খাটের উপর উঠে বসলাম। বারান্দার আলো জ্বেলে রেখেছি। ঘরের আলো তো জ্বলছেই।

বেশ কনকনে শীত মনে হচ্ছে। লেপটাকে টেনে গায়ে দিলাম। একটু বসে আছি, শরীরটা এখন একটু সুস্থ মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দূরে ঘড়ি বাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় পুরান জমিদার বাড়ী থেকে ঘড়ি বাজানর ব্যবস্থা আছে। শুনলাম দশটা বাজলো।

শুয়ে পড়লাম। আলো দুটো যেমন জ্বলছিল জ্বলতে থাকলো। কোথাও কোন জনমানুষের সাড়াশব্দ নেই। নির্জন এই বিরাট বাড়ীটায় কেমন যেন অসহায় মনে হচ্ছিল। লেপটা মুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। নতুন জায়গা তার উপর এই বিরাট বাড়ীতে একা, কেমন যেন মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব। ভাবলাম, আলো দুটো নিভিয়ে দিই। কিন্তু সাহস হলো না। কি জানি অপরিচিত জায়গা। কোথায় কি আছে, এসব জায়গায় সাপ থাকা আশ্চর্য নয়। অবশ্য শীতকাল, কিন্তু বিশ্বাস কি। পুরানো কতকালের বাড়ী। ঢং ঢং করে এগারটা, তারপর বারটায় ঘা দিল। শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম। কেমন যেন বমি বমি ভাব, পেটটা মোচড় দিয়ে উঠছে। না, ঘুম আসবে না বুঝলাম। উঠে বসলাম। আবার শুয়ে পড়লাম। পরে এবার ঢং করে একটা বাজলো। আবার মুখের উপর লেপটা চাপা দিয়ে চোখ বুঁজলাম, দেখি ঘুম আসে কিনা।

গভীর রাত। থম্‌ থম্‌ করছে রাত, মাঝে মাঝে খুট্‌খাট্‌ শব্দ, কিসের শব্দ কে জানে। অনেক ভাবনা মনের মধ্যে জড়ো হতে লাগলো।

লেপটা মুখ থেকে সরিয়ে ফেললাম। পাশ ফিরে দরজার দিকে তাকাতে দেখলাম দরজাটা ঠিক খোলাই আছে। বারান্দার দরজাটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু একি! দরজার কাছে স্ত্রীলোকটি কে? স্পষ্ট দেখছি স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে স্থির দৃষ্টি। চেয়ে দেখলাম সুন্দরী মেয়ে; খুবই সুন্দরী মনে হ'লো।

এলো চুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কপালে একটা কাটা দাগ।

ভয়ের পরিবর্তে বিস্ময় বোধ হ'লো। মনে হ'লো কোন্ দুষ্ট স্ত্রীলোক হ'তে পারে। জমিদার বাড়ী, কত রকমের মানুষ আছে। ভাবলাম কিছু বলি? কিন্তু আবার ভাবলাম, চুলোয় যাক, দাঁড়িয়ে আছে থাক দাঁড়িয়ে।

লেপ মুড়ি দিয়ে আবার পাশ ফিরলাম। ঘড়িতে এবার দুটোয় ঘা দিল। শরীর গরম হয়ে উঠেছে, লেপ যেন আর গায়ে রাখতে পারছি না। মুখ থেকে আবার লেপটা সরিয়ে ফেললাম। কৌতূহল হলো। দরজার দিকে আবার চাইলাম। একি! এখনও স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে আছে। এবার আরও যেন স্পষ্ট। কপালের দাগটা বেশ দেখতে পেলাম। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম কি বলতে চায়।

এবার উঠে বসলাম। খাটের কাছ থেকে দরজা একটু দূরে। ভাবলাম কাছে গিয়েই জিজ্ঞাসা করি। কি চায়, এত রাত্রে এভাবে কেন এসেছে। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল এই বাড়ীতেই মেয়েটি থাকে।

জামার বোতামগুলো দিলাম। পায়ের জুতোটা পরতে নীচের দিকে চাইলাম। কিন্তু একি! স্ত্রীলোকটিকে আর তো দেখা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি পায়ের জুতো খুলে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লাম। লেপটা আবার সারা দেহে চাপা দিয়ে দিলাম। একবার ভাবলাম ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু সাহস হলো না। চুপচাপ কোন রকমে খাটেই শুয়ে রইলাম।

ভোরের দিকে কেমন একটু তন্দ্রা এসে গেল। কিন্তু সেই তন্দ্রা ভাঙতেই উঠে পড়লাম। ঢং ঢং করে ঘড়িতে চারটের ঘা দিল। নিঃশব্দে সুটকেশটা নিয়ে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। তখনও শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন চারদিক। কাক-জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রয়েছে মাটির গায়ে। সোজা হরিশঙ্করবাবুর বৈঠকখানার বারান্দায় এসে উঠলাম। দারোয়ান সেই সকালেই উঠেছে, গেট খোলা পেলাম।

একটু বেলা হতেই বাহাদুর এসে হাজির। "বাবুজি এসে গিয়েছেন?"

প্রশ্নের উত্তরে শুধু বললাম, "হ্যাঁ।"

বাহাদুর বললে, "বাবু একটু বেলাতে ওঠেন, উঠলে খবর দেবো।" বাহাদুর মুখ-হাত ধোবার জল এনে দিল। এটু পরে চা বিস্কুট এনে দিল। চা খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেলা আটটা নাগাদ হরিশঙ্করবাবু এলেন। "আরে এত সকালে এসে পড়েছেন?" হরিশঙ্করবাবু হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে বেশ খোসমেজাজে কথা বললেন।

আমার দিকে স্থির দৃষ্টি

বললাম "আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব সকালেই চলে এসেছি।"

হরিশঙ্করবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘুমটুম হয়েছিল তো? কোন অসুবিধে—"

কথার ছেদ না টানতেই জবাব দিলাম, "আজ্ঞে না—কোন অসুবিধা হয় নি।"

হরিশঙ্করবাবু এবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন। হাতে একখানা বাঁধানো ফটো। একটু কেমন গম্ভীরভাবে বললেন, "এই ছবিখানা থেকে একটা অয়েল পেন্টিং করতে হবে। আমার স্ত্রীর ছবি।"

ছবিখানা হাতে নিয়ে এক দৃষ্টে দেখতে লাগলাম। বিস্ময়ে কেমন যেন হতবাক হয়ে গিয়েছি। কথা বলতে পারছি না। গত রাত্রের দেখা সেই স্ত্রীলোকটির এই ছবি এমন কি সেই কপালের দাগটি পর্যন্ত রয়েছে। সেই সুন্দর সুডোল মুখ, একরাশ মাথার চুল। চুলগুলি কাঁধের উপর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই স্থির দৃষ্টি।

ছবিখানা হরিশঙ্করবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, "পেন্টিং করে দেব। ভালই হবে এ ফটো থেকে। কিন্তু কপালের ঐ দাগটা কি উঠিয়ে দেব, না থাকবে?"

কথাটা শুনে হরিশঙ্করবাবু একটু চুপ করে রইলেন, ফটোখানা ভাল করে দেখে একটু অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ, দাগটা তুলে দেবেন। ওটা না থাকাই ভাল। পড়ে গিয়ে এই দাগটা হয়েছিল।"

বললাম, "আচ্ছা।"

ফটোখানা আমার হাতে দিয়ে এবার হরিশঙ্করবাবু বললেন, "চলুন, আপনাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

আপত্তি করলাম। বললাম, "দেখুন আমার শরীরটা বেশ ভাল নেই। আমি এখনই ফিরতে চাই।"

হরিশঙ্করবাবু একটু যেন আশ্চর্য হলেন। বললেন, "সেকি! এখনই যাবেন?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে এখনই যেতে হবে।"

হরিশঙ্করবাবু হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, "তবে তো দেরী করলে চলবে না, একটু পরেই একটা বাস আছে। ঐ বাসে না গেলে আবার সেই দুপুরে।"

বেরিয়ে পড়ছি, দেখি বাহাদুর এসে আমার সুট-কেশটা কাঁধে তুললো। বুঝলাম আমাকে বাস ষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত সে পৌঁছে দেবে।

বাহাদুর পথে চলতে চলতে কয়েকটা কথা বললো। তার মধ্যে তার একটা অনুরোধ এবার এলো—যেন আমি আর ঐ গেষ্ট হউসে না থাকি। বাবুকে বলে সে নতুন বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে।

কথাটার জবাব দিলাম না। শুধু বাহাদুরের দিকে একবার চাইলাম।

সেক্সপীয়র-সনেট ঃ ৩৩

সুষমা মৈত্র

বারে বারে দেখিয়াছি পরিপূর্ণ উজ্জ্বল উষায়
রাজকীয় অনুগ্রহ বশংবদ পর্বত চূড়ায়,
সুবর্ণ-চুম্বনে তার শ্যামল বনানী শিহরিত,
প্রাণহীন স্রোতস্বিনী রসায়নে সুবর্ণ-মণ্ডিত।

আর বার অচিরাৎ আলোহীন মেঘগুলি ধায়,
স্বর্গীয় আননখানি ঢেকে দিতে ঘন কালিমায়।
পশ্চাতে পৃথিবী রেখে গভীর আসন্ন অপমানে,
চৌর্যবৎ চুপিসারে চলমান প্রতীচীর পানে।

এমনি ত ভাগ্যসূর্য মোর একদিন উষাকালে,
সর্বজয়ী চিহ্ন এক এঁকেছিল অভাগার ভালে।
কিন্তু হায় সে শুধুই ক্ষণিকের ছিল আপনার,
এখন রয়েছে মেঘ ব্যবধান তোমার আমার।

তবুও আমার প্রেম করেনাক অবহেলা তা'রে
যদিও স্বর্গের সূর্য কলঙ্কিত এ মর্ত্য-সংসারে।

একটি মুখের রেখায়

দীপ্তোৎপল রায়

একটা আকাশকে সামনে ধরে রাখ—
ছোট্ট আয়না ঘিরে মিষ্টি মনের মুখ,
কল্পনায় মধুর করতে করতে দেখ
ছোট্ট মনের কান্না ঘিরে যতেক সুখ—
সবটাই তোমার জন্যে রাখা।

একটা কান্নাকে গভীর করে ফুটতে দাও—
মনের গভীর তলখানিতে সুখের জাল,
শান্ত মনের উত্তরীয় ছড়িয়ে দাও
ছোট্ট শিশুর মুক্ত আকাশ ঐ কপাল—
দেখতে পাবে তোমার স্বপ্নমাখা।

নতুন শিশু কাঁদছে তাকে কাঁদতে দাও—
তোমার জন্যে নতুন আকাশ, আমন্ত্রণ,
অনেক সুখের স্বপ্ন মেশা আকাশটাও
কেমন তোমার অনেক কাছের, কত আপন—
কান্না হতে উল্লাসের এক সান্ত্বনা।

ইতিহাস ও বাঙ্‌লা উপন্যাস

শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্‌লা সাহিত্যের পূজার আঙিনায় সাহিত্য-ভারতী আজ রাজরাজেশ্বরী। কাব্যে-গানে, নাটক-প্রহসনে, উপন্যাসে-ছোটগল্পে, প্রবন্ধে-রম্যরচনায় পরিপূর্ণ নৈবেদ্যের স্বর্ণথালি বহন ক'রে বঙ্গভারতীর ভক্তবৃন্দ মাতৃপূজায় সমবেত হয়েছেন, বর্তমানে হচ্ছেন ও ভাবীকালেও হবেন। মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত দেবীপূজার প্রসাদ বিতরণ ক'রে তাঁরাও যেমন ধন্য, আমরাও তেমন তৃপ্ত! 'চির-মধু-নিস্যন্দী' বাঙ্‌লা-সাহিত্যের মধুচক্রে আজ শুধু গৌড়জনই নয়, বিশ্বজনও 'আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি'। নানা দিক দিয়ে দুর্ভাগ্য-তাড়িত সহস্র-ক্ষত-লাঞ্ছিত বাঙালী জাতির এদিক দিয়ে সৌভাগ্যের তুলনা মেলে না।

বাঙালীর এই সৌভাগ্যের স্রষ্টা যাঁরা, তাঁদের কত-জনের কত কথা! কত বিচিত্র তাঁদের সাধনা! কত বাধা-বিঘ্নের উচ্চাবচ পথ অতিক্রম ক'রে কত দিগন্ত-প্রসারী পথে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন! তাঁদের কতজনের খবরই বা আমরা রাখি? এই সাহিত্যের শ্যাম-সমারোহের সামনে দাঁড়িয়ে কাকে রেখে কার আলোচনাই বা আমরা স্বল্পায়ু আলোচনায় করতে পারি, আর সে শক্তিই বা আমাদের কয়জনের আছে? তবু এর মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছি এর একটি অতি ক্ষুদ্র প্রত্যন্তদেশ। কিন্তু তারই ইয়ত্তা করা দুরূহ। সেটি হোল বাঙ্‌লা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যেদিন ইংরেজী সভ্যতার ও সাহিত্যের আস্বাদ বাঙালী পেল, সেইদিন সুরু হোল বাঙ্‌লার তথা ভারতের নবজাগরণের সূচনা। আর সেই জাতীয় নবজাগরণের পুরোধা ছিলেন যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই সেদিন জাগাতে চেয়েছিলেন তাদের চোখের সামনে তুলে ধ'রে এই ভারতের অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে মহাবীর ভারতীয় তথা বাঙালীদের জীবনালেখ্য। তাই ইতিহাস তার স্বাভাবিক স্থান খুঁজে পেল সেই জাতীয় নবজাগরণের যুগের সাহিত্য-কৃতিতে। সেই যুগেই সত্যকার বাঙ্‌লার উপন্যাসের জন্ম। আর তার জন্মলগ্নেই আবির্ভূত হোল সত্যকার বাঙ্‌লা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

হিন্দুকলেজের একজন সেরা ছাত্র প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ অব্দে ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে রচনা করলেন বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম সত্যকার উপন্যাস এবং সেটির নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। শুধু নামেই নয় কাজেও সত্যকার ঐতিহাসিক উপন্যাস। এক বিখ্যাত সমালোচকের মতে—"ভূদেব কেবল যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক রচনাকার তাই নন, তিনি বাঙ্‌লা উপন্যাসের পথিকৃৎ।" কণ্টার-রচিত 'Romance of History' থেকে ভূদেবের ঐ গ্রন্থের প্রথম উপন্যাস 'সফল-স্বপ্ন' ও দ্বিতীয় উপন্যাস 'অঙ্গুরী-বিনিময়'-এর বিষয়বস্তু গৃহীত। 'সফল স্বপ্ন' ধর্ম ও নীতিকথায় কণ্টকিত হ'লেও 'অঙ্গুরী-বিনিময়ে' ভূদেব ছত্রপতি শিবাজী ও মোগল-বাদশাজাদী রোসেনারার ব্যর্থ প্রেমকে উপজীব্য ক'রে আধুনিক ভারতে শিবাজীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও স্বাধীনতাকামী বাঙালী তথা ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হ'য়েছেন। আকারে ক্ষুদ্র এই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসখানি প্রভাবিত করেছে তাঁর উত্তরসাধক বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রকে।

বাঙ্‌লা উপন্যাসের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমের চৌদ্দখানি উপন্যাসের মধ্যে ন'খানিই ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-ভিত্তিক। 'বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস নাই'—এই ব'লে আক্ষেপ করেছিলেন বঙ্কিম। তাই তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস রচনায়—যে ইতিহাস ভাবী বাঙ্‌লা ও ভারতকে অতীত গৌরবের মন্দাকিনীধারায় স্নান করিয়ে নব ভারত গঠনে সমর্থ করবে। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'চন্দ্রশেখরে' মুখ্যতঃ রোমান্স-রচনার উপাদান হয়েছে ইতিহাস কিন্তু দেশে দেশাত্মবোধের জাগরণে ইতিহাস

মশলা যুগিয়েছে বঙ্কিমকে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'। আর 'রাজসিংহে' ইতিহাস ও উপন্যাস হ'য়ে উঠেছে পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী। সেখানে ইতিহাসের পেয়ালায় সাহিত্যের সুধা, না সাহিত্যের পেয়ালায় ইতিহাসের সুরা,—কোন্‌টি বিতরিত হয়েছে, যেন নির্ণয় করা কঠিন হ'য়ে পড়ে—এই হোল যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস!

এর পর বঙ্কিমের রচনারীতির অনুসরণে সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা রমেশচন্দ্র দত্তের নাম এসে পড়ে। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস-নিষ্ঠা ও কল্পনার যথার্থ মিলন ঘটেছে। দেশপ্রীতির রসে রসায়িত তিনি। তাঁর 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' দেশপ্রীতিতে দীক্ষিত বাঙালীর সাধনপথের একান্ত সহায় হয়েছিল ও তৃপ্ত করেছিল তার রোমান্স-প্রীতি।

রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও বাঙালীর ইতিহাসকে উপজীব্য ক'রে উপন্যাস লিখলেন ভারতী-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি রমেশচন্দ্রের সমকালেই রচনা করলেন পৃথ্বীরাজকে নিয়ে 'দীপনির্বাণ', গোহকে নিয়ে 'মিবার-রাজ', মহসীনের জীবনী নিয়ে 'হুগলীর ইমামবাড়ী', নাগাদিত্যকে নিয়ে 'বিদ্রোহ' এবং রাজা গণেশের জীবনকে নিয়ে 'ফুলের মালা'। বাঙ্‌লার নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপ্ত করেছে সেদিন এ সকল সৃষ্টি। চণ্ডীচরণ সেন ১৮৮৫ অব্দে প্রকাশ করলেন 'মহারাজ নন্দকুমার' ও তার পরে 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝান্‌সীর রাণী' ও সর্বশেষে 'এই কি রামের অযোধ্যা' উপন্যাস। ইংরাজ আমলের কুশাসনের ও অবিচারের চিত্র প্রথম তিনখানিতে প্রকাশিত। 'ঝান্সীর রাণী'তে তিনি লক্ষ্মীবাঈয়ের চরিত্রকে পরাধীন ভারতে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারই চণ্ডীচরণের উপন্যাস-গুলিতে মুখ্যতঃ প্রকাশিত। এঁদের পর রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস নিয়ে। প্রথমটি খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রবীন্দ্রপ্রতিভার অযোগ্য না হ'লেও রাজর্ষি তাঁর সার্থক সৃষ্টি। এ ছাড়া বঙ্কিমের সমসাময়িক ও পরবর্তী বহু সাহিত্যিক ঐ যুগে ইতিহাস থেকে নেওয়া নানা বিষয়বস্তু ও পাত্র-পাত্রী নিয়ে নানা উপন্যাসে ঐ ধারাকে পুষ্ট করেছেন। এঁদের সকলের উল্লেখ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। তবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'কাঞ্চনমালা' ও 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'করুণা', 'ময়ূখ', 'অসীম' এবং নিখিলনাথের 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুরু করেছিলাম উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে—এসে পৌঁছেছি বিশ শতকের প্রথম পাদের শেষে এবং দেখেছি যে প্রায় শতবর্ষকালে বাঙালীর উপন্যাসকৃতির উৎস মুখ্যতঃ যে ধারা বেয়ে ফুল ফুটিয়েছে তা ইতিহাসের ধারা। যুগের প্রয়োজনে পরাধীন জাতির গঠনে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে কল্পনার রঙে রঙিন ক'রে, বাঙালী ঔপন্যাসিক জাতির জাগরণে আপনার প্রতিভা যেমন নিয়োজিত করেছেন, তেমনই বঙ্গ-ভারতীর বর অঙ্গ নানা অলঙ্কারে করেছেন শোভিত।

এর ঠিক পরে আমরা বাঙালী ঔপন্যাসিক বলতে যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আপনাদের সামনে আনতে পারি তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং তাঁদের প্রভাবিত শিল্পীদের সম্প্রদায়। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসে অতীত ইতিহাস রসদ যোগাতে পারেনি। তাঁদের অনুবর্তীরাও কিছুদিন যেন পুরাতন ইতিহাসের প্রেরণা পাননি, এ কথা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আর ইতিহাসের পুরাতন সংজ্ঞাও আজ বদলেছে। পূর্বের ব্যক্তি-প্রধান ও যুদ্ধবিগ্রহ-প্রধান ইতিহাসের স্থলে আজ সমাজ ও সংস্কৃতিই প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে ইতিহাসের। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সেই নূতন ইতিহাসের বাণীরূপ আপনাপন উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। সেই নূতন ইতিহাস আজকের ঔপন্যাসিককেও করছে অনু-অনুপ্রাণিত!

আমরা তাই পেয়েছি মনোজ বসুর 'ভুলি নাই', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', গোপাল হালদারের 'একদা', তারাশংকরের 'ধাত্রীদেবতা', প্রমথ বিশীর

ক্ষমা নেই

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ভূপালা-তাল-এর ঘাটে সে বসে আছে। ভূপাল নবাব-বাড়ীর পাশ দিয়ে প্রশস্ত পাষাণ-বাঁধানো ঘাট, তারপর ঘাস জমি, বড় বড় অশথ্ ও বট গাছের সারি, দু'-একটা অন্য গাছও আছে। ওদিকে একটি ছোট পাহাড, সামনে জলের শান্ত বিস্তার। গাছের নীচে সবুজ ঘাসের উপর বসে থাকতে ভাল লাগে।

মধ্য প্রদেশের রাজধানী ভূপাল। পাশ দিয়ে বহে গেছে বেত্রবতী নদী। নদীর জল সঞ্চিত রয়েছে বিশাল এই হ্রদের এপার থেকে ওপার অবধি। নীল জল টল টল করছে, নীল জল সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো হয়ে উঠছে, আকাশের লাল রং ক্রমে ফিকে কালো হয়ে উঠছে। ওপারের পাহাড় মেঘের মত ম্লান হয়ে উঠেছে। শীতের ঘনায়মান সন্ধ্যায় গাছের মাথায় পাখীর কাকলি ছাড়া আর কোথাও কোন সাড়া নেই।

কাশীরাম বসে আছে। একটি গাছের গায় হেলান দিয়ে সে বসে আছে, এমনভাবে বসে আছে যে, ঘাটের দিক থেকে যদি কেউ এদিকে তাকায় তাহলে সহসা তাকে নজরেই পড়বে না। ঘাটের ওদিকে নবাবের একখানি লাল রঙের পানসী ভাসছে, পানসীতে কোন মাঝিমাল্লা নেই। খেয়ালমত নবাব এই পানসী চড়ে হ্রদে বিহার করেন। এই পানসী চড়েই তিনি যান ওপারে পাহাড়ের মাথায় আমেদাবাদ প্রাসাদে। কালো পাহাড়ের উপর আব্ছা আকাশের গায় শাদা প্রাসাদ এখন ঝাপ্সা হয়ে আসছে, এবার ওই প্রাসাদে আলো জলবে। এদিকের প্রাসাদের দোতলার দর-দালানে ঝাড়-লণ্ঠন জলেছে। আকাশে দু'চারটে তারাও দেখা দিয়েছে। জলের ছোঁয়া লেগে শীতের হাওয়ায় এবার একটু যেন ঠাণ্ডার আমেজ দেখা দিল। কাশীরাম কালো চাদরখানা গলার দিকটা ভালো করে জড়িয়ে দিল।

ভূপালা-তাল-এর এই পাষাণ ঘাট অন্য সময় লোকের ভীড় থাকে, এই কদিন কিন্তু এদিকে আর মানুষের চলাফেরা নেই। সন্ধ্যার সময় জলের কলসী কাঁখে যে সারি সারি রঙীন শাড়ী ঘাটের পথে দেখা যেত, সেই রঙের চলমান লাবণ্য কদিন ধরে অদৃশ্য হয়েছে, আর, তারই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে ঘাটের আশে-পাশে যে মানুষের বসতি ছিল, সেই-সব মানুষ। প্রাণের ভয়ে এরা পালিয়েছে।

ভয় পাবার কারণও আছে। লখ্নৌতে যে হাঙ্গামা হয়ে গেল, সেই হাঙ্গামার পর একদল সিপাহী এসে এদিকে কিছুদিন হৈ চৈ করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কোন ভয় ছিল না তাদেরকে। তাদের সব হৈ হুল্লোড়ের হেতু ছিল ক্ষুধা, দু'খানা চাপাটি আর এক লোটা পানি পেলেই তাদের মেজাজ নরম হয়ে যেতো, কিন্তু তারা চলে যাবার পর এখন যারা এসেছে, তাদের কাছে সে চাল চলে না। লুণ্ঠন ও হত্যা ছাড়া এরা কিছু বোঝে না। লখ্নৌ ও বারাণসীতে এরা যাকে পেয়েছে তাকেই গাছের ডালে লট্কে দিয়েছে। এখানে অবশ্য তেমন কিছু হয়নি, কিন্তু দু'চারটে খুন হয় প্রায় প্রতিদিনই। এমনি এক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী এই কাশীরাম, অকারণে কাশীরামের দুই ছেলে খুন হয়েছে। সেই খুনের জন্যই এই ভূপালা-তাল-এর সীমানা আজ জনশূন্য ও কাশীরাম এসে বসেছে এই গাছতলায়।

'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', রমাপতি চৌধুরীর 'লালবাঈ', মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'নটী', বিমল মিত্রের 'বেগম মেরী বিশ্বাস' আরও অনেক আধুনিক ঔপন্যাসিকের নানা নব-ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যাযাবর, কণিষ্ক, পারাবার প্রভৃতি বর্তমান লেখকরাও অপস্থত, অপস্থয়মান ও চলমান ইতিহাসের পটভূমিকায় পাত্র-পাত্রীকে স্থাপন করে নানা উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে চলেছেন।

তাই আমরা এই আলোচনায় দেখতে পেলুম যে, ইতিহাস, যার জন্ম-লগ্নে বাঁকা হাসি হেসেছিল, সেই বাঙ্লা উপন্যাস আজ পূর্ণ যৌবনে পদক্ষেপ ক'রেও তারই ইশারা বহন ক'রে চলেছে।

হ্রদের পশ্চিম কোণের শেষ গৃহটি কাশীরামের। সারি সারি কুমোরদের বাড়ী। সেই কুমোরপাড়ার শেষ প্রান্তে বামুন কাশীরাম এসে ঘর বেঁধেছিল কুমোর-পাড়ার মধ্যে। বামুনপণ্ডিত কাশীরামের সপরিবারে বাস করতে আসার একটি কারণ ছিল। একবার সে সস্ত্রীক গিয়েছিল কাশীধামে বিশ্বনাথ দর্শন করতে, সেখানে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পায়, সন্ন্যাসী তাকে বলেন—'তুই বামুন পণ্ডিতের ছেলে, নিজেও তো অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েছিস, বিদ্যেটা কাজে লাগা, যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের কিছু কিছু শেখা, নীচর মানুষগুলোকে উপরে তোল্ তবে তো বিদ্যে সার্থক হবে, নারায়ণ প্রসন্ন হবেন'। কথাটা কাশীরামের মনে লাগে, কাশীধাম থেকে ফিরে এসে কাশীরাম এই কুমোরপাড়ায় ঘর বাঁধে, আর একটি চতুষ্পাঠী খুলে বসে।

কুড়িটি বছর এই হ্রদের তীরে কেটে যায়। চতুষ্পাঠীতে যারা এসে প্রথমে হাতেখড়ি দিয়েছিল, তারা অনেকে আজ বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। তাদের দেওয়া শ্রদ্ধা ও 'সিধে'তে কাশী পণ্ডিতের গৃহ আজ পূর্ণ। পল্লীর এমন কোন ছেলে নেই যে, আজ তার চতুষ্পাঠীতে আসে না। একা পণ্ডিত আজ পেরে ওঠে না, বড় ছেলেটিকেও খানিকটা অধ্যাপনার দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

দিন কাটছিল শান্তিতে। কিন্তু বিপদ ঘটলো এই সিপাহীদের হাংগামা নিয়ে। ফিরিঙ্গীরা যেসব রাজা-মহারাজার সঙ্গে মিতালি করতো তাদের দরবারের খবরদারি করার জন্য এক একজন সাহেবকে পাঠিয়ে দিত। ভূপালের নবাবের দরবারে যে সাহেব ছিল তার নাম হেনরি মেরিয়ন ডুরাণ্ড। ডুরাণ্ডের কাজ ছিল নবাবকে কখনও ভয় দেখিয়ে, কখনওবা মদ খাইয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ পুষ্ট করে চলা, এবং নবাবের সৈন্যদের লোভ দেখিয়ে আর সেনানায়কদের ঘুষ খাইয়ে নিজেদের দিকে রাখা। সেদিক থেকে ডুরাণ্ড সাহেবের যোগ্যতা কম ছিল না। নবাবকে নিয়ে মাঝে মাঝে এই হ্রদে তিনি জলবিহার করতেন, ফিরিঙ্গী বাইজির আমদানী হতো পানসীতে, বিলিতী সেরী ও শ্যাম্পেনে তরুণ নবাবের মাথা ঘুরতো। আর ডুরাণ্ড সাহেব নবাবের এই মাথা ঘোরানোটাই বেশি পছন্দ করতেন।

চতুষ্পাঠীর পাশেই হ্রদেই কিনারায় মস্ত আমগাছ, প্রতি বছরই কাঁচামিঠে আমে গাছটা ভর্তি হয়ে যায়। এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়ছিল, কোন-কোন ঢিল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গিয়ে পড়ছিল হ্রদের জলে। একটি ছোট ঢিল বোধহয় একটু বেশী জোরেই ছোড়া হয়েছিল, ঢিলটি গিয়ে পড়লো একেবারে নবাবের পানসিতে। ছাদের উপর ডুরাণ্ড সাহেব সবে সেরির বোতল খুলেছে, ঢিল এসে লাগলো ডুরাণ্ড সাহেবের গায়। ডুরাণ্ড চমকে উঠলো, বললো—কে? কে ইঁট ছুড়লে?

পানসীতে বরকন্দাজ ছিল, তখনই তারা পানসী ফেরালো তীরে। কয়েকটা ছেলেকে এসে ধরলো। নিয়ে গেল পান্‌সীতে। বললো—হুজুর, এরা ইঁট ছুঁড়েছে।

সাহেব হুকুম দিলেন—আচ্ছা করে চাব্‌কে দাও।

বরকন্দাজরা তিনচারটি ছেলেকে রীতিমত প্রহার দিয়ে আধমরা করে ঘাটে ফেলে দিয়ে চলে গেল। তাদের মধ্যে কাশীরামের ছোট ছেলেও ছিল।

ছেলেদের প্রহার-জর্জর অবস্থা দেখে কুমোরপল্লীতে সাড়া পড়ে গেল। বাপ-মায়েরা হাউচাউ করে উঠলো। কোন ছেলেরই অবস্থা সুস্থ নয়। সবাই অবসন্ন, আচ্ছন্ন। কাশীরামের ছেলে নিত্যানন্দ মার খেয়েছে সব চেয়ে বেশি, সে চোখ চাইতে পারছে না, ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। কাশীরাম বললে—এতো অত্যাচার।

মাতব্বররা বললো—দুটো আম পেড়ে যদি ছেলেরা খায় তো এমন কি অপরাধ যে এমনভাবে মারবে?

কিন্তু এই প্রহারের কি প্রতিকার হয়, তা কেউ জানে না।

কথায় কথায় নদীর তীরে রীতিমত ভীড় জমে ওঠে।

পানসীর বুকে সাহেবের সেরীর নেশা তখন জমেছে। কোন এক সময় তার নজরে পড়লো, নদীর কিনারায় এই জনসমাগমের উপর। বললো ওখানে—এতো ভীড় কিসের?

একজন বরকন্দাজ বললো—ছেলেরা মার খেয়েছে সেইজন্য বোধ হয়।

—ওরা মারপিট করার জন্য জমায়েত হয়েছে, সব বদ্‌মাস আছে।

বরকন্দাজ চুপ করে থাকে।

সাহেবের মাথায় তখন সিপাহীদের কথাই ঘুরছে। বললো—ওরা সব খুনী, বদমাস্—দেশী সিপাহী আছে।

বরকন্দাজ বললো—না, হুজুর, ওরা সব কুমোর।

সাহেব সে কথা কানে তুললো না, বললো—সব বদমাস্, আমি ওদের চিনি, আমি ওদের শায়েস্তা করতেও জানি। দেখি আমার রাইফেল।

রাইফেল সাহেবের হাতের কাছেই ছিল। রাইফেলটা তুলে নিয়ে মাতাল ডুরাণ্ড নৌকা থেকে তাগ্ করলো, তারপর দম্ দম্ করে দুটো গুলী ছুঁড়ে দিল সেই ভীড়ের পানে। কিন্তু জানবাব বোঝবার আগেই নদীর কিনারায় দুটি লোক শুয়ে পড়লো। তার একজন কাশীরামের বড় ছেলে। গুলী তার বুক ভেদ করে চলে গিয়েছিল, একটা কথাও তার মুখ থেকে বেরুলো না।

পানসীর ছাদে সাহেবের হাতে বন্দুক দেখে, ক'জন সাড়া তুললো—পালাও পালাও, সাহেব গুলী চালাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সবাই নদীর কিনারা থেকে সরে গেল গাছের আড়ালে। দু'মিনিটের মধ্যে নদীতীর লোকশূন্য হলো, শুধু গুলী খাওয়া মানুষ দুটি পড়ে রইল, আর তাদের কাছে দাঁড়িয়ে রইল একাকী কাশীরাম।

পানসীর ছাদে বসে ডুরাণ্ড এবার রাইফেলটা নামিয়ে রাখলো। তরল কণ্ঠে বললো—যেমন দুষমন তেমনি দাওয়াই! শালালোগ্ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সাহেব সেরীর গেলাসটা তুলে নিয়ে নবাবের মুখের পানে তাকালো। নবাব তখন তাকিয়ায় এলিয়ে পড়েছেন, এসব ব্যাপারের কোন কিছু তিনি খেয়াল করেছেন বলে মনে হলো না। কাশীরাম জ্যেষ্ঠ পুত্রের রক্তাক্ত দেহের পানে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

সেই রাত্রির কথা কাশীরাম আর স্পষ্ট করে ভাবতে পারে না। কনিষ্ঠ পুত্রটিও মারা গেল শেষ রাত্রে। জ্যেষ্ঠপুত্রের অগ্নিকার্যের জন্য গাছ কাটা হয়েছিল, তাতেই দুই ছেলের দাহকার্য একত্রেই শেষ হলো। পুত্রশোকে ব্রাহ্মণী উন্মাদের মত হয়ে পড়লেন এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভূপালা-তালাও-এ। মুহ্যমান কাশীরামের কোন দিকে খেয়াল ছিল না। সকালে তালাও-এর জলে শাড়ীর আঁচল ভাসতে দেখে পল্লীর লোকেরা ব্রাহ্মণীর মৃতদেহ জল থেকে তুললো। কোন্ সময় যে তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তা কেউ জানে না। এক সন্ধ্যা থেকে আরেক সকাল পর্যন্ত কাশীরামের শান্তিপূর্ণ গৃহ, জনহীন নির্বান্ধব শ্মশান হয়ে গেল। ব্রাহ্মণীর সৎকার করে কাশীরাম আর ঘরে ফিরলো না, সামনের বড় অশ্বত্থ গাছটার নীচে বসে রইল অনেকক্ষণ, তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে আনমনে পথ চলতে সুরু করলো।

কুমোর পল্লীর কোন মানুষ কাশীরাম পণ্ডিতের আর কোন সন্ধান পেল না।

তারপর এই অঞ্চলে অনেক গোলযোগ ঘটে গেল। ঝাঁসী থেকে বিদ্রোহী সিপাহীরা এই পথ দিয়ে ইন্দোর গেল, নবাব প্রাসাদ ছেড়ে হ্রদের ওপারে পাহাড়ের উপর আমেদাবাদ-প্রাসাদে চলে গেলেন, ডুরাণ্ড সাহেব চলে গেল ইন্দোর। কত রকমের কত গুজব ভেসে এলো। ঝাঁসী থেকে গোয়ালিয়রের দিকে নানাসাহেব দলবল নিয়ে চলে গেল, সেখানে লড়াইয়ে হেরে সিপাহীরা নানা দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গেল। ডুরাণ্ড আবার ফিরে এলো ভূপালে। তবে আগের ডুরাণ্ড আর এখনকার ডুরাণ্ড-এ অনেক বদল হয়ে গেছে। আগের ডুরাণ্ড মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকতো, এখনকার ডুরাণ্ড মদ খেয়ে চারিপাশে বিভীষিকা দেখে, কাউকে ফাঁসীতে লটকায়, কারও ঘরে আগুন দেয়।

ডুরাণ্ড সাহেব এখানে আসার কদিন পরেই এই ভূপাল-হ্রদের তীরে ঘাটের পাশের গাছতলায় সন্ধ্যাবেলা একাকী কাশীরামকে দেখা গেল। এই ক'মাসে কাশীরাম পণ্ডিতও বদলেছে। সোনার মত রং ঝল্‌সে গেছে, মুখের সে লাবণ্য নেই, সর্বাঙ্গে একটা শুষ্ক ভাব, মাথার চুল আর মুখের দাড়ী দেখে সে মানুষ বলে আর চেনা যায় না। সেই চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা শুধু আছে,

চোখ দুটোর পানে তাকালে মনে হয় যে চোখ যেন চেনা, কিন্তু কাশীরামকে চেনার মানুষ তখন সেই হ্রদের চারিপাশে কেউ ছিল না। কয়েকদিন আগে ফিরিঙ্গী সিপাইরা কুমোরপাড়ায় আগুন জ্বালিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে। হ্রদের চারিপাশ এখন পরিত্যক্ত।

শীতের আমেজ নেমেছে, হ্রদের জলে জলো বাতাসে হিমের ভাবটা যেন আরো কিছু বেশি। সূর্যাস্তের পর থেকেই এই অঞ্চলে বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পায়। কাশীরাম এই আবহাওয়ায় বিশ বছর কাটিয়ে গেছে, তার অভ্যাস আছে। কালো চাদরখানা গলার কাছে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে দিয়ে কাশীরাম গাছে হেলান দিয়ে বসে, তাকিয়ে থাকে সামনে নবাব-বাড়ীর দোতলার দরদালানের পানে। ঝাড় লণ্ঠনের ওই আলো, উপরটা দেখা যায় নীচেটা আড়াল পড়ে লোহার রেলিংএ, ওই রেলিংয়ের আড়ালে চোপদার এসে জাজিম পেতে দিয়ে গেল, মখমলের তাকিয়া ও রূপার ধূপদানী সাজানো হলো, তালিম্‌চি এক কোণে গড়গড়া বসিয়ে দিল, এবার ডুরাণ্ডকে নিয়ে নবাব আসবেন, পিছনে পিছনে বাঈজিও আসবে সরাপদানী নিয়ে।

আসবে আসবে ভাবতে ভাবতে সময় কেটে যায়, নবাব আসেন অনেক পরে। হ্রদের উপর তখন তৃতীয়ার একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে।

নবাবের সঙ্গে ডুরাণ্ড সাহেব। দুজনে পাশাপাশি বসে। বাঈজি সরাপদানী এগিয়ে দেয় সামনে। বিলাতের এক অর্ধশিক্ষিত গরীব ঘরের ছেলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চালিয়াতির ব্যবসায় ভারতে এসে নবাবের পাশে বসে নবাবী সুরু করে। নবাব মদ ঢালে, নিজে নেয়, এক পাত্র এগিয়ে দেয় সাহেবের হাতে। তারপর বাঈজি গান ধরে।

এবার কাশীরাম যেন একটু সজাগ হয়।

বাঈজি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতমুখ দুলিয়ে গান গায়, আগে বাঈজির গানের সঙ্গে সারেঙ্গী ও তব্‌লচি সঙ্গত করতো, সাহেবের নাকি ওসব ভালো লাগে না, তাই তাদের আসা বন্ধ হয়েছে, একা বাঈজি এসে গান শোনায়। এই বাঈজিটি সম্পর্কে সাহেবের কিছুটা দুর্বলতা আছে, এ নতুন এসেছে আমেদাবাদ থেকে। বয়স কম, গলা ভালো। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এই মেয়েটিকে ডুরাণ্ড সাহেবের নজরে ধরেছে, প্রথম দিন সাহেব বলেছে—মুখখানা ইংলিশ-কাট্, একেবারে দেশের মেয়ে, চোখ দুটো দেখেছ, মেমের চোখ—ইংলিশ আইজ্।

এই চোখ দুটোর জন্যই আমেদাবাদে বাঈজির নাম ছিল বিল্লী বাঈজি। সেই চোখ দুটোই আজ ডুরাণ্ড সাহেবের মন হরণ করলো। আর ডুরাণ্ড সাহেবের ভাল লাগা মানে নবাবের ভাল লাগা। প্রতিদিন সন্ধ্যার মজলিসে বিল্লী বিবির হাজিরা চাই। সাহেব তো একদিন নেশার ঝোঁকে বিবির হাত ধরে বললো—বিবি, তোমায় আমি আমার দেশে নিয়ে যাবো, তোমায় আমি নাচতে শেখাবো—বল-ড্যান্‌স্, তোমাকে আমি শেখাবো ইংলিশ টিউন্।

বিবির বয়স কম হলেও অনেক বড মানুষের অনেক মন ভোলানো কথা সে শুনেছে, সে জানে—নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক, দূরের বাজনা লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক। হিন্দুস্থান থেকে ফিরিঙ্গী দেশে যেতে হলে তিনটে সাগর পেরিয়ে যেতে হয়। বিবি হেসে বলে—সাহেব, তুমি তো এই লড়াইয়ে অনেক পয়সা লুটেছ, আমাকে এক-ছড়া মুক্তার মালা দিও, আমার গলায় পড়তে বড় সখ।

—পার্ল নেক্‌লেস্! ইয়েস্ ইয়েস্, আমার দেশের মেয়েরা খুব পরে, তোমাকে আমি আলবৎ দোব।

তারপর সাহেব জড়িয়ে ধরেছিল বিবিকে, বিবি হেসে সাহেবের কাঁধের উপর হেলিয়ে দিয়েছিল তার মাথা। নবাব সাহেব দেখে খুশি হয়েছিলেন।

সেতো মাত্র দুদিন আগের কথা।

নবাব সাহেব মারাঠাদের করদ রাজ্য, তার উপর ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঘাড়েব উপর চেপে বসেছে। এই সিপাহী যুদ্ধেব হাঙ্গামা-হুজ্জুতের মধ্যে ডুরাণ্ডকে খুসি করে যদি কোনমতে মারাঠাদের কর দেওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, নবাব সাহেবের দিক থেকে সেটা খুব বড় লাভের কথা হবে, নবাব তাই

বিল্লী বিবিকে সেইদিনই বলেছেন—সাহেব যা বলেন শুনবে, সাহেবকে খুসি রাখতে পারলে তোমাকে আমি ইনাম দোব।

সাহেবকে খুসি রাখতে গিয়ে বিল্লী বিবির তাই চেষ্টার ত্রুটি নেই। পর পর দুটো রাত সে সাহেবের ঘরেই কাটিয়েছে।

গান চলছে। সেরীর গ্লাস খালি হচ্ছে। গাছতলায় বসে কাশীরাম দেখছে। মনে হয় সে যেন গানের সুরটুকু উপভোগ করার জন্যই এখানে বসে আছে।

সহসা কাশীরাম চাদরখানি গলা থেকে খুলে রাখলো। একখানি ছোট গেরুয়া রঙের ধুতি ছাড়া পরণে আর কিছু নেই। কাশীরাম ধীরে ধীরে গাছে উঠতে সুরু করলো। দেখতে দেখতে গাছের মাথায় পাতার আড়ালে তাকে আর দেখা গেল না। একটা মোটা ডাল এগিয়ে গেছে নবাব-বাড়ীর বারান্দার দিকে, কাশীরাম বরাবর সেই ডালটার শেষ মুখে গিয়ে বসলো। এবার সে কাছার কাছ থেকে টেনে বের করলো একটি রিভলভার। এই রিভলভারটি সে অনেক কষ্টে জোগাড় করেছে, গোয়ালিয়রের এক সিপাহীর কাছ থেকে। রিভলভারটায় দুটি গুলী ভরা ছিল, কাশীরাম ভাল করে একবার দেখে নিলে, তারপর বাগিয়ে ধরলো সামনের বারান্দার দিকে।

বারান্দার দূরত্ব সেই গাছের ডাল থেকে বিশ-পঁচিশ হাতের বেশী হবে না। ডুরাণ্ড তাকিয়া কোলে নিয়ে সেরীর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর গানের তালে মাথা দোলাচ্ছে। কাশীরাম ভাল করে তার পানে তাগ করলো। তারপরে রিভলভারের গুলী চালালো পর পর দুটো।

দুম্ দুম্ শব্দে গান থেমে গেল, ডুরাণ্ড আর্তনাদ করে উঠলো। দুটি গুলীই পর পর ডুরাণ্ডকে লেগেছিল। কাশীরামের লক্ষ্য অব্যর্থ।

নবাব লাফিয়ে উঠলেন।

কাশীরাম তর তর করে গাছের ডাল থেকে আরেক ডালে এসে ঝুপ করে হ্রদের জলে লাফিয়ে পড়লো। ঠাণ্ডা পাথুরে জল সর্বাঙ্গে শির্ শির্ করে উঠলো, তা হোক, কাশীরাম আজ আর এসব গ্রাহ্য করে না, সে আজ হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। তার পত্নী ও পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু ঘটানো সে ক্ষমা করেনি। রক্তের দাগ সে রক্ত দিয়েই মুছলো।

হ্রদের জলে সে সোজা সাঁতরে চললো ওপারের পাহাড়ী জঙ্গলের দিকে।

দেখতে দেখতে হ্রদের কিনারায় সোরগোল পড়ে গেল। অনেক লোক, অনেক মশাল। কিন্তু কাশীরাম তখন যেখান দিয়ে চলেছে, মশালের আলো ততদূর পৌঁছায় না।

ওপারে পৌঁছে কাশীরাম জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এপারে কিন্তু ডুরাণ্ড সাহেব মরেনি, দুটি গুলীই তার বাম বাহুতে লেগেছিল। শেষ অবধি বাঁ হাতখানি কেটে ফেলতে হলো। হাতকাটা মেজর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিলাত চলে গেল। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা তাঁর অনেক প্রশংসা করে লিখলেন, সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে ডুরাণ্ড হাতখানি খুইয়েছেন। লিখিত মিথ্যা অনেক দিনের পুরানো হলে সত্য বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কাশীরামের কিংবদন্তী আজও বৃদ্ধ ভূপালীদের মুখে শোনা যায়, তারা বলে—বামুনের তেজ ছিল ওই একজনেরই।

ফসল-হারা ক্ষেত

শ্রীকালিদাস রায়

পউষ কাবার, হয়েছে সাবাড় ধান-কাটা মাঘ মাসে,
মাঠপানে আর কোনো চাষী নাহি আসে ;
ধূ ধূ-করা সারা মাঠে কোনো জীব নাহি হাঁটে,
শুধু আকন্দ ক্ষেতের আলিতে সান্ত্বনা দেয় হেসে ;
মাঠের জীবন সূচনা করিছে মুথা আর 'গলঘেসে'।
দো-ফসলী ক্ষেত গাঁয়ের অঙ্গ, গাঁ বলেই হয় ধরা,
তখনো গাঁয়ের চারিধারে ক্ষেত চৈতী ফসলে ভরা।
তাও উঠে গেলে ফাগুন চৈতে সারা মাঠ করে ধূধূ,
নাড়া-ভরা ক্ষেতে আগাছারা থাকে শুধু,
তৃণ নেই মোটে, চরে নাকো গোঠে ধেনু,
বাজে না সেখানে কোনো রাখালের বেণু ॥

এই মাঠ পানে চাই—
আমার জীবনে মাঠের জীবনে ভেদ খুঁজে নাহি পাই।
যৌবন গেছে, গেছে তার সাথে জীবনে শ্যামল ভাতি,
আশ্বাস আশা আনে নাকো উষা, শান্তি আনে না রাতি।
উঠে গেছে মোর ফসল-ফলানো পাট,
বাকীটা জীবন মনে হয় মোর যেন বৈশাখী মাঠ।
ছায়াহারা বুক পোড়ায় প্রখর ধূপ,
আষাঢ় আসিলে ফিরিবে মাঠের রূপ।
পুনঃ সে শ্যামল হবে এ-দশা তার না র'বে।
আমার জীবন-মরুর আকাশে মেঘ জাগিবে না আর ;
এই দেহ তাই ধরিছে উষ্ট্রাকার।

নাই এ-জীবনে মরূদ্যানেরও দাবি,
মাঠ পানে চেয়ে সেই কথা শুধু ভাবি।

●

স্বাগত বিশ্বসমাজ !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

একটা বিরাট্ বিশ্বসমাজে আমরা এখন বাস করি !
এসো এসো সবে ক্ষুদ্র বৃহৎ জাত্যাভিমান নাশ করি' !
দেশ-মহাদেশে মিলিয়া মিশিয়া রবো আনন্দে একসাথে ;
বিশ্ব চালাবো বিশ্বসঙ্ঘে প্রতিনিধি দিয়ে সব জাতে !

খাদ্য খাওয়ায় নাহি কোনো মানা,
যার যাহা রুচি তাই খাবে ;
নীতি-শৃঙ্খলা মানিবে সবাই,
কেহ আর কারো নাই তাঁবে।
ধর্ম্ম-মতের স্বাধীনতা মেনে মনে মনে সবে সব মানে ;
মানবধর্ম্ম সবার উপরে, তারি জয় ঘোষে সম্মানে।

পাত্র পাত্রী করে নিরূপণ পাত্র পাত্রী দুই জনে ;
তৃতীয় জনের ঘটকালি করা দূর হয়ে গ্যাছে সুক্ষণে।
রূপের গুণের সমান আদর, কভু রূপে কভু গুণ দিয়ে ;
সকল দেশের পুরুষের সাথে সকল নারীর হয় বিয়ে।

নাবালক ছেলে মেয়েদের সমভাবে লয় বাপ মায়ে ;
জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে রাষ্ট্র সকল বোন ভায়ে।
সকলের আগে মাতৃভাষারে নহে মেনে নিতে গর্‌রাজি ;
বিশ্ববাসীর ভাববিনিময়ে চালু আছে শুধু ইংরাজী।

জায়া-পতিদের বিচ্ছেদে বহে বিশ্বরাষ্ট্র সব বোঝা ;
অল্প আয়াসে শেষ হয়ে যায় আবার কন্যা বর খোঁজা।
অতি আনন্দে নূতন করিয়া আবার উভয়ে ঘর বাঁধে ;
স্বাধীন জীবন করিতে যাপন নাহি পড়ে ভবে কেউ ফাঁদে।

ভেজালদাতাদের গুলী মেরে বধে বিশ্বরাষ্ট্র-সংসদে ;
জঘন্য সব মুনাফালোভীরে ফাঁসি দিয়ে সদা প্রাণ বধে।
প্রচুর খাদ্যে, অটুট স্বাস্থ্যে ভুলিয়া মৃত্যুশঙ্কারে,
দেড়-শো বছর পরমায়ুঃ পেয়ে সুখে রয় সবে সংসারে।

●

আমারে দেখাও ভয় ?
জানো না আমার পাঁজরে পাঁজরে
বজ্র তৈরী হয় !
শিরে শঙ্কর রয়েছে প্রহরী
জাগ্রত বরাভয় ।
আমার মৃত্যু ভয় ?!
বাংলার ছেলে আমি,
সংবর্তের সঙ্গে লড়াই
করছি দিবস-যামী ।
আমার কি আছে ক্ষয় ?
শোকে-সন্তাপে, ঝড়ে-দুর্যোগে
চির অমৃতময় ।
আমারে দেখাও ভয় ?
জানো না আমার পাঁজরে পাঁজরে
বজ্র তৈরী হয় !
মৃত্যুতে আজ এসেছে অরুচি
মরছি না, শোন,—আর—
কান্নার স্রোতে গড়ব না ভিত
জীবনের নীড় আর ।
এবার শক্ত গদ্যের পথে,
জীবনের সংগ্রাম,
সকল কর্মে জন্মভূমির
শপথ নিলাম ।
তুচ্ছ-ক্ষুদ্র-ভয় হ'তে
জেগেছি নির্ভয় ;
নিঃশঙ্ক দুর্জয় !
আমার মৃত্যুভয় ?
জানো না আমার পাঁজরে পাঁজরে
বজ্র তৈরী হয় ?!
দুর্ভিক্ষ-মড়ক, আসুক
দুর্বিপাক—দুর্জয় প্লাবন
আমরা মরব না আর— !
আমরা হবো না ভোজ্য
শকুনির ঘৃণ্য লালসার ;
দিকে দিকে শোন সেই—
শোন তারি দৃপ্ত অঙ্গীকার !!
নগরে-শহরে-গ্রামে—
যেথা যত অপচিত প্রাণ,
শোননি উঠেছে সেথা ;
উজ্জীবিত জীবনের গান ।
নিজেকে ধিক্কার দিয়ে
অন্ধকারে নিঃশব্দ প্রথায়
একেবারে গিয়েছে হারিয়ে,
কিম্বা, যারা হারাতে বসেছে
বিগলিত অশ্রুতে-দীর্ঘশ্বাসে
তাদের কামনা স্পর্শে
নিয়েছি শপথ :
: রেখে যাবো গান-গল্প
কলহাস্য মুখর জীবন
উদ্দীপ্ত যৌবন !
প্রয়োজনে বিপ্লবের
হবো মুখোমুখি ।
শোষণের ঘৃণ্য চক্র
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিতে আজ
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ
অঙ্গে তুলি সংগ্রামের সাজ !
বিপন্ন জন্মভূমি
বিপন্ন যে মনুষ্যত্ব
এখন ক্লীবত্ব নয়,
নয় মৃত্যুর সমতুল কিছু,
সম্মুখে যে কর্মের শপথ
দৃপ্ত ভবিষ্যত !
আমাদের ঘরে যারা এসে গেছে,
কিম্বা যারা আসেনি এখনো
তাদের জীবন পথ
নিষ্কণ্টক ক'রে যেতে হবে
তাদের জীবনে এনে দিতে হবে
অগ্নিপূত নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ।
বিশ্বাসের গান
এখানে গাইবো আমরা
আকাশে-বাতাসে তারি
প্রতিধ্বনি ওঠে বারম্বার ।
আমরা মরব না আর
রক্তের অক্ষরে লেখা
দিকে দিকে সেই অঙ্গীকার ।

যুগধর্ম

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

প্রত্যেক যুগ নিয়ে মানুষের মনে একটা ভ্রম থাকে। অনেকে মনে করেন—বর্তমান যুগই শ্রেষ্ঠ, আবার অনেকে বলে থাকেন এই যুগই সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অতি দূরে যেমন দেখা যায় না, অতি নিকটেও তেমনি। এই জন্য স্বর্ণযুগ ছিল অতীতে বা আসবে ভবিষ্যতে—এ নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। প্রাচীনকালে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এই রকম করে সাজিয়ে মনে করা হত যে, উপস্থিত বা কলিযুগই সবচেয়ে খারাপ। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়, সেদিন হতে পৃথিবীতে সত্যযুগ সুরু হয়েছে। আবার আধুনিক কালের মনীষীরা ভবিষ্যতে মানুষের উত্তরোত্তর উন্নতি চরমে পৌঁছবে এ রকম কল্পনা করে থাকেন। এই ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগ নিয়ে ইউরোপে বিরাট কল্পলোকীয় বা utopian সাহিত্য জমে উঠেছে। তাতে নানারকম যন্ত্রের আবিষ্কার ও সমাজব্যবস্থা-পরিবর্তনের দ্বারা দেখান হয়েছে কি করে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন কথা আছে—ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ—দুনিয়া কখনও আজকের থেকে নিতান্ত আলাদা ছিল না, অর্থাৎ সবদিক্ বিবেচনা করলে প্রায় তুল্যমূল্য অবস্থাতে মানুষ বরাবর আছে।

কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার পরে ভারত স্বাধীন হয়েছে। জাগতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এই বাহ্য উন্নতি ও সমারোহেই কি তার চরম সার্থকতা? এইখানেই কি অধীনতা হতে মুক্তি পাওয়ার পূর্ণ সাফল্য? স্বাধীনতা লাভের ফলে প্রত্যেক জাতি নিজ শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ও অবকাশ পেয়ে থাকে। এই হিসাবে স্বাধীন ভারতের সার্থকতার কি মূল্য, কি লক্ষ্য—তাই আজ বিবেচনার বিষয়। এমন একদিন ছিল, যখন মহর্ষি মনু বলেছিলেন—এদেশে প্রসূত ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীর সকল মানব নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করবে। আজ কি ভারতের এই গৌরব দেখা যায়? পশ্চিমের সভ্যতার মুখপাত্রগণ বলে থাকেন—জীবনের কাম্য, পুরুষার্থ বা মূল্য বিষয়ে এবং জীবনধারণের প্রণালী বা কৌশল বিষয়ে আজ পশ্চিম যে পথ দেখায়, সারা পৃথিবী তার অনুসরণ করে। কারণ এই নবীন সভ্যতা অপূর্ব। অতীত কোন সভ্যতার এর সাথে তুলনা হতে পারে না। এই অভিনব সভ্যতার মূলে আছে দুটি তত্ত্ব—একটি গণিতের সূত্র ও পরিমাপ—আর অন্যটি অচেতন শক্তির প্রয়োগ। অজীব পদার্থ-শক্তির বলে এখন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। এবং বর্তমানে সকল প্রকার চেষ্টা ও চিন্তা সম্পূর্ণভাবে হিসাব নিকাশের উপর দাঁড়াচ্ছে—সকলই মাপাজোকা, বাঁধাবাঁধির মধ্যে আসছে এবং প্রত্যেকটি অনুমান বাস্তবের নিকষে পরীক্ষিত হয়ে গ্রাহ্য হচ্ছে। ফলে সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ অসীম বিস্তার লাভ করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষ আজ ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ না হয়ে মহাশূন্যে অভিযান, গ্রহনক্ষত্রে বাসের কল্পনা করছে এবং অদ্ভুত কৃতিত্বও দেখাচ্ছে। দেহ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাতে অন্য সব যন্ত্রের মত শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ ও অংশ বদল করা ও মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে। গতিবেগে মানুষ সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাকৃতিক শক্তিকে অতিক্রম করছে। শব্দের গতি সে পিছনে ফেলতে পেরেছে, হয়ত এককালে আলোকের গতিরও সে নাগাল পাবে। প্রকৃতির রহস্য-উদ্ভেদেও বর্হিজগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে মানুষ যে নিজের বিভূতি প্রকাশ করছে তা বিস্ময়কর। যে সকল যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে তা বিচিত্র ও বিস্ময়াতীত। যেমন ইলেক্ট্রনিক হিসাব ফল এবং এক সাথে নানা ভাষায় স্বয়ংক্রিয় অনুবাদের যন্ত্র। এ সকল দেখলে মনে হয় কালে স্রষ্টারও সমকক্ষ হওয়া তার লক্ষ্য। কিন্তু গতির বেগে ও যন্ত্রের কৌশলে মানুষ যতই দক্ষতা দেখাক না কেন, সকল জীবন সমস্যার সমাধান তার আয়ত্তের মধ্যে নয়। যেমন দেখা যাচ্ছে—বিজ্ঞানের বলে শস্যের উৎপাদন যতই সে বাড়াক না কেন, মানবপরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সে সঙ্কটাপন্ন হতে থাকবেই। খাদ্যসমস্যার সমাধান

যেন মানুষের হাতের বাইরে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিতে সংক্রামক রোগ, মহামারী ও অপঘাতের সে আশ্চর্য্যকর প্রতিকার করতে পারছে, গড়পড়তা আয়ু বেড়ে যাচ্ছে সত্য, কিন্তু মৃত্যুকে দূরে রাখবার চেষ্টায় সে যত কৃতী হচ্ছে, তার সাথে এই বিপুল সংখ্যক দীর্ঘজীবী লোকদের নিয়ে আরও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছে —তাদের জীবিকা ও অবসর যাপনের উপায় দুর্ভাবনার বিষয় হচ্ছে। শ্রমের লাঘবের জন্য যন্ত্রগুলিকে ক্রমশঃ স্বয়ংক্রিয় করা হচ্ছে—উদ্দেশ্য মানুষের অবসর যাতে বাড়ে এবং কৃষ্টির প্রসার হয়। কিন্তু এরূপ যন্ত্রের বাহুল্যে বেকারের সংখ্যাও আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেক উপায়ের উদ্ভাবনের পাশে তার ছায়ার মত দেখা দেয় অপার চিন্তা। মোটের উপর আধুনিক মানুষ বিজ্ঞানের বলে যেমন বিপুল শক্তিমান হচ্ছে, তেমনি নব নব সমস্যায় আরও জড়িত হয়ে পড়ছে। এ সকল সমস্যার মূলের কথা সমাজে সকলের সুখে, শান্তিতে, স্বাচ্ছন্দ্যে সমানভাবে জীবন ধারণ।

আণবিক শক্তিতে মানুষ বিপুলকায় দানব হয়ে উঠছে—সত্য। কিন্তু নৈতিক হিসাবে সে এখনও শিশুত্ব অতিক্রম করতে পারছে না। ইতিহাসের আরম্ভ থেকে গত দশ এগার হাজার বছরে মানুষ যে সকল বৃত্তি ও সহজাত সংস্কার নিয়ে কাজ করেছে, আজও সে সকলের সে মুঠার মধ্যে। বর্ত্তমান যুগকে আণবিক যুগ বলা হয়। কারণ এমন সব মারণাস্ত্র পর পর শত্রু বিনাশের জন্য আবিষ্কৃত ও প্রস্তুত হচ্ছে যাতে শত্রুর সাথে স্বজন, স্বদেশের সাথে সারা ভূমণ্ডল বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু শুধু এ কারণেই নয়, অন্য কারণেও এ যুগ আণবিক। কেননা বিস্ফোরণের মত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় এবং পৃথিবীর সম্বল ও সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় জগন্ময় অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশঃ কঠিন ও কঠোর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে প্রত্যেক মানুষকে আরও উগ্রভাবে আত্মরক্ষার জন্য, আত্মহিতের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করতে হচ্ছে। তাই দেখা যায় যে, আজ পৃথিবীর অগণিত মনুষ্যসন্তান স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাদের অবস্থা যেন সমুদ্রতীরের বালুকণার মত প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। এইদিক থেকেও এ যুগ আণবিক। মনুষ্যপরিবারের সংহতি যেন পরমাণুর মত পৃথক্ হয়ে পড়ছে। অন্য যুক্তিতেও এ যুগের আণবিক নাম সঙ্গত। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে চৈতন্য দ্বিবিধ। এক বিভু চৈতন্য—ব্যাপক। বিশ্ব চেতনা—যা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রত্যেক জীব আবার অণুচৈতন্য—কারণ তার মধ্যে এই বিশ্বব্যাপী বিরাট চৈতন্যের একটা ক্ষুদ্র কণা, একটা স্ফুলিঙ্গ নিহিত। এই অণুচৈতন্য আজ বর্ত্তমান সময়ে মানব-সমাজের প্রত্যেক স্তরে, সকল শ্রেণীতে, সকল কার্য্যক্ষেত্রে আর যেন বশ মানতে চাইছে না। সর্বত্র এই অণুচেতনার বিস্ফোরণ দেখা যাচ্ছে। সেই বিস্ফোরণের প্রকাশ—গীতার ভাষায়—আসুরী সম্পদের আকার নিচ্ছে। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান বা মোহ দানববৃত্তির বিকাশ। এই বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করা শুধু এ যুগের নয়—চিরকালের সমস্যা। বর্ত্তমানকালে লোকতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র শাসন বহু দেশে প্রসারলাভ করেছে। লোকতন্ত্রের মূলের কথা—প্রত্যেকে যেন নিজেকে অন্য কাহারো হতে বড় বলে জ্ঞান না করে। প্রত্যেকে যেন আপনাকে একাধিক নয়, একক বলে গণ্য করে। এর অর্থ অন্য সকল মানুষকে সে যেন ছায়ার মত অকিঞ্চিত মনে না করে—নিজের মতন সত্য ও বাস্তব বলে ধরে নেয়। অন্য আত্মাকে সমবুদ্ধিতে এইরূপ গ্রহণ করার প্রয়োজন পূর্ব হতে বর্ত্তমানে আরও বেড়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে একই সময়ে মানবসমাজে দুটি বিভিন্ন এবং বিরোধী প্রবৃত্তির স্রোত বইছে। এ যুগে ঐক্যের, সহযোগিতার, শান্তিতে সহাবস্থানের আবশ্যকতা যেমন বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে অবস্থার চাপে, প্রয়োজনের তাগিদে মনুষ্যসমাজ অহমিকার বিস্ফোরণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মানব-সমস্যার সমাধানে পূর্ব ও পশ্চিমের শুভবুদ্ধি মিলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভারতীয় প্রজ্ঞা কতকগুলি শিক্ষাকে চিরদিন সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এসেছে। যেমন সর্বজীবে শিব জ্ঞান

অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের সমান মর্য্যাদাবোধ। এই সমদৃষ্টি এদেশে সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। বলা হয়ে থাকে সকল প্রাণীর যিনি স্রষ্টা, যিনি ঈশ্বর তারই অধিষ্ঠান মনে করবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—যে আমাকে সর্বভূতে দেখে এবং আমার মধ্যে সর্বভূত অধিষ্ঠিত দেখে, তার সর্বদা ভগবদ্দর্শন হয়ে থাকে। অতি প্রাচীনকাল থেকে এ দেশের প্রার্থনা—মিত্রের চক্ষে সকলে যেন আমাকে দেখে, আমি যেন সকলকে মিত্রের চক্ষে দেখি। বলা হয়েছে সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ-যাতে নানা পক্ষীর আবাস একটিমাত্র নীড় বা কুলায়ে পরিণত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই সহযোগিতা ও সহানুভূতির সর্বাধিক প্রয়োজন—ইহাই এ যুগের চরিত-নীতি। অন্যদিকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি পরিবর্ত্তন আপনি এসে পড়েছে—সেটা earthliness বা পার্থিবতা। সম্প্রতি রাশিয়া হতে মহাশূন্যে যে অসম সাহসিকা নারী যাত্রা করেছিলেন তিনি অনন্ত আকাশে অসীম বেগে যখন উঠছিলেন—পিছনে তাকিয়ে তখন তাঁর মনে হয়েছিল অন্য কদাপি এই ধরণী তাঁর চক্ষে এত সুন্দর বা মনোরম দেখায় নি। বর্ত্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যোম-বিহারে, পরমাণুর রহস্য-উদ্ভেদে মানুষ যতই অগ্রসর হোক না কেন, তার মধ্যে এই উদ্বোধই ক্রমশঃ প্রখর হতে প্রখরতর হয়ে উঠছে—সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এবং সে মানুষ মাটির মানুষ, পৃথিবীর সাথে শৃঙ্খলিত—ভূতলেই তার শিকড় দৃঢ়বদ্ধ। তার কল্পনা মানুষের কল্পনা। তার যুক্তি ও জ্ঞান মনুষ্য বুদ্ধির বিকাশ। এমন কি ঈশ্বরের ধ্যানসমাধিতে সে যে আনন্দ পায় যা ব্রহ্মানন্দ মানুষের হৃদয়েরই, মানুষের অনুভূতিরই অন্তর্গত, বাইরের জিনিষ নয়। এইভাবে মানুষের সুখ-দুঃখ ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে, ধরণীকে নিজের নিকেতন এবং গৃহস্থালি মনে করে, নিজ বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য ও দায়িত্ব জ্ঞানকে একমাত্র অবলম্বন করে নিজের নিয়তি গড়ে তোলা সেইটিই হল মানবিকতা। এই নূতন ধরণের ঐহিকতা এবং নূতন ধরণের মানবীয়তা—এ দুটিই জাতির মনকে বর্ত্তমান সময়ে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে ফেলছে।

এ যুগের এই সংক্রামক মনোভাব মানুষকে তার উচ্চতম আদর্শ হতে বিচ্যুত করছে বা সেদিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? আজ প্রশ্ন ইহাই। তিনটি দৃষ্টান্ত এই যুগের সামনে রয়েছে—তিনজন মহাপুরুষ আধুনিক মানুষকে যেন তার দিঙ্‌নির্দ্দেশ করছেন। ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক Jeanthul Sartre, নেদারল্যাণ্ডের মনীষী ও মানবপ্রেমিক Albert Schweitzer এবং মার্কিনে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে শান্তি পথিক যোদ্ধা Martin Luther King। তিনজনেই আধুনিক কালের উচ্চতম সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো জাতির সম্পর্কে যে মজ্জাগত হীনতাজ্ঞান ও বিদ্বেষবুদ্ধি শতাব্দীর পর শতাব্দী পুষ্ট হয়েছে—Dr. King মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি অনুসরণে তা উচ্ছেদ করবার জন্য স্থির সঙ্কল্প। বৈরের দ্বারা বৈর উপশান্ত হয় না, অবৈরের দ্বারা বৈর জয় করা যায়, এই চিরন্তন ধ্রুব নীতি তিনি মূলমন্ত্র করেছেন সর্বত্রপণে। দার্শনিক Sartre মানুষকে নূতন আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্য্যাদা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাণী শুনিয়েছেন। স্বর্গের বা ঈশ্বরের দিকে অসহায়ভাবে না তাকিয়ে, নিজের ভিতর প্রকৃতিদত্ত যে শক্তি ও সম্ভাব্যতা আছে, তারই প্রয়াসে আত্মলাভ করতে হবে এবং সংসারের সকল জটিলতা নির্ম্মলতার মধ্যে আপন পথ করে নিতে হবে এবং পূর্ণতা লাভ করতে হবে—এই নূতন অস্তিত্ববাদ বা Existintialism চিন্তাজগতে তাঁর অবদান। গীতাতেও বলা রয়েছে—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু। আপনাকে কখনো অবসন্ন করবে না, নিজের দ্বারা নিজ উদ্ধারসাধন করবে। নিজ মতবাদে ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্য Dr. Sartre সুদুর্লভ ও মহামূল্য নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি দেখান যে, যারা এই সম্মানের প্রদাতা তাঁরা যে মতবাদের পরিপোষক তা ঐ পুরস্কার স্বীকারের দ্বারা তিনি সমর্থন করবেন না।

বন-মহোৎসব

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

(গীতালেখ্য)

ঋত্বিক :

[সমবেত কণ্ঠে] ওঁ দৌঃ শান্তিঃ অন্তরীক্ষং শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ
বনস্পতয় শান্তিঃ।

তন্ত্রধার : আরণ্যক সভ্যতার ঋষি আর্যদের কণ্ঠে উচ্চারিত হ'লো সর্বাত্মক শান্তির মন্ত্র। উদ্গীত হ'লো স্থল জল অন্তরীক্ষ ও বনস্পতির মাঙ্গলিক স্তোত্র। শস্য-প্রসবিনী এই সসাগরা পৃথিবী প্রথম কথা কইল অরণ্য মর্মরে। পঞ্চ ভূতের কাণে—স্থষ্টির আদিম গানে—এসে পৌঁছিল নবজাত শিশু-তরুর অসহায় কান্না। মাটির মা তা'র স্নেহের দুলালী অরণ্যাণীকে বুকে তুলে নিয়ে আশীর্বাদ করে বরাভয় দিয়ে বল্লে : ভয় কি মা, আমি আছি। মাতৃ-স্বরূপিনী ক্ষিতি এসে দাঁড়ালো অগণিত শিশু-তরুর শিয়রে : [শ্যাম-বসনা ক্ষিতি এসে 'বনস্পতয় শান্তিঃ বলে এই আশীর্বাদ করবে] :

ক্ষিতি : বনস্পতয় শান্তিঃ

[আবৃত্তি]

জলের থেকে গড়িয়ে যেদিন নামলে এসে পঙ্কে,—
সেদিন তোমায় ঠাঁই দিয়েছি আমার কোমল অঙ্কে।
কাঁপলো যখন ছোট্ট তোমার পাতার অধর দু'টি,—
উঠলো সেদিন বক্ষে তোমার শ্যাম গরিমা ফুটি।
সেই থেকে তো আমাব বিশাল উষর-হৃদয় ভরি',—
আছো তৃণে পুষ্পে পাতায় গন্ধে আকুল করি।
এমনি থাকো শীতল রাখো দীর্ঘজীবি হ'য়ে—
যাক্‌না প্রাণের স্নিগ্ধ ছায়ে স্থষ্টি ধারা বয়ে।

তারপর শিশু-তরুর শিয়রে এসে দাঁড়াল মেঘমালা :

অপ : [কৃষ্ণবসনা অপঃ-এব প্রবেশ] অন্তরীক্ষং শান্তিঃ

[আবৃত্তি]

আমি এলেম দিগন্তরে উড়িয়ে মেঘের ঝড়,
বৃষ্টি-ধারার নূপুর পায়ে পল্লবে মর্মর।
পিয়ে আমার অমৃতময় স্থষ্টিময়ী সুধা,—
মিটাও তরু ফুল ও ফলে বিশ্বজনের ক্ষুধা।
বাদলা দিনের হাওয়ার দোলায় একটু এসো খেলি,—
মুচ্‌কে হেসে দাও ছড়িয়ে সবুজ রঙের চেলি।
বইয়ে দেবো তোমার বুকে উদ্দীপনার ঝড়,—
বৃষ্টি ধারার নূপুর পায়ে পল্লবে মর্মর॥

তারপর এলো সূর্য্যালোক :

তেজঃ [হলুদ বসনা তেজ-এর প্রবেশ]

[আবৃত্তি] "পৃথিবী শান্তি :"

Dr. Schweizer মেধা ও হৃদয়ের সম্পদে অতুলনীয় বা একাধারে সঙ্গীত, চিকিৎসা বিদ্যা ও দর্শনানুশীলনে তিনি অসাধারণ পারদর্শী। তাঁর অন্তরের বিভূতির উপযুক্ত প্রকাশক্ষেত্র ইউরোপ। কিন্তু মনুষ্যসমাজে যে অন্যায় ও দুঃখের প্রাচুর্য্য রয়েছে, তার কিছু প্রতিকারের জন্য তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে আফ্রিকার জঙ্গলে, অসভ্য আদিম অধিবাসীদের মধ্যে পিয়ানো যন্ত্রটিকে মাত্র সঙ্গী করে সত্য ও প্রেমের জয়পতাকা নিয়ে প্রবাস বরণ করেছেন এবং সেখানেই আনন্দময় জীবনযাপন করেছেন। ঐ দৃষ্টান্ত তিনটিতে প্রমাণ হয় যে, জড়বাদ, আত্ম-পরায়ণতা যতই প্রবল হোক না কেন, বর্ত্তমান যুগেও মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করছে আত্মবিক্রমেব দ্বারা—দেখাচ্ছে যে তার শক্তি সীমিত নয়, তার অবধি নেই, আদর্শের আহ্বানে, অন্তরেব প্রেরণায় সে ক্রমাগত আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আপন হারিয়ে আপনাকে পাচ্ছে। মানবতার এই অতি সত্য তত্ত্ব তার জীবনে ও আচরণে আজও জগৎ প্রত্যক্ষ করছে। এই যে Trans-humanism বা অতিমানবতা বর্ত্তমান যুগের আণবিক বিস্ফোরণের বিষাক্ত আবহাওয়ার মাঝে মনুষ্যজাতির আশা ও আশ্বাসের বস্তু। ইহাই যুগধর্ম্ম।

আমি এলাম আপন তেজে রঙিন বাঁধা হাতে,—
আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলতে তোমার সাথে।
দিনের শেষে রাত্রে এসে ঢালব চাঁদের সুধা,—
আমি তোমায় মিটিয়ে দেবো সবুজ প্রাণের ক্ষুধা।

হাওয়ায় উড়না উড়িয়ে এলো মারুত :

মারুত : [শ্বেত-বসন পরিহিত পুরুষবেশী]

[আবৃত্তি]

আমি এলাম চতুর্দিকে উড়িয়ে হাওয়ার পাখা,—
দোদুল দোলায় দুলিয়ে দিতে নিবিড় বনের শাখা।
পাতার বাঁশী তালে তালে বাজবে হাওয়ার নাচে,—
উড়িয়ে দেবো ওড়না আমার গন্ধ-বিভোল গাছে।

শেষ দিগন্তে আনত হলো আকাশ :

ব্যোম : [ব্যোম নীল বস্ত্রে শোভিত হ'য়ে আসবে]

[আবৃত্তি] "বনস্পতয় শান্তিঃ"

আমি এসে ছড়িয়ে দেবো স্বপ্ন-মধুর মায়া,
ফেলবো দূরের নিবিড় বনে নীলাঞ্জনের ছায়া।
তখন তুমি মর্ত্য সীমা আনন্দেতে ভুলি',—
বাড়িয়ে দিও দিগন্তরে পত্র মুকুলগুলি।

তন্ত্রধার : এসো এইবার আমরা নিখিলের সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলি, এসো হে উৎসুকচিত্ত, এসো হে আনন্দিত প্রাণ। দিনরাত্রের জন্য এখানে তোমাদের হৃদয় আসন বিছিয়ে দাও, তোমাদের স্নেহ-ছায়া-তলে নব জীবন উদ্ভিন্ন হোক। আকাশে আকাশে বনে বনে সকলের মনে মনে তোমাদের গানের আসর বিছিয়ে দাও। সুন্দরের পাদ-পীঠ-তলে যেখানে কল্যাণ দীপ জ্বলে, সেখানে তোমাদের চিরন্তন কালের আসন বিরচিত হোক—

গান [সমবেত কণ্ঠে]

এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ॥
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা রাতি
করুক নব জীবন দান ॥
আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণ দীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান ॥

তন্ত্রধার : ওগো শিশু-তরুর দল! তোমরা এসো আমাদের অঙ্গনে। আমাদের স্নেহ-সঙ্গ-ছায়ে তোমরা দলে দলে আমাদের ঘরে ঘরে এসো নিঃশব্দ চরণে। এসো শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে চঞ্চল কল-সঙ্গীতে। তোমাদের শাখায় শাখায় বনে বনে আনো আনন্দ-কোলাহল। তোমাদের নবীন পল্লবে নেচে উঠুক সবিতার স্বর্ণালো। আজিকার শ্রাবণ বর্ষণে তোমাদের পাতায় পাতায় অমরাবতীর ধারাজল আশীর্বাদের মত বর্ষিত হোক :

(গান)

আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে, চল্-আমাদের ঘরে চল্ ॥
শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে চঞ্চল কল সঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায় প্রাণআনন্দ
কোলাহল ॥
তোমাদের নবীন পল্লবে নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বন বল্লভে মর্মর গীত-উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে আশীর্বাদের স্পর্শনে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায় অমরাবতীর ধারাজল ॥

তন্ত্রধার : মাটির অনুর্ব্বরতায় বিবর্ণ হ'য়ে আসছে ধরণী। দিকে দিকে ঊষর রুক্ষতায় ধূলির গেরুয়া উত্তরীয় উড়ছে। ছায়াহীন রৌদ্রদগ্ধ মাঠ খাঁ খাঁ করছে। শ্যাম শষ্পদলের অভাবে নিরাভরণা পৃথিবী বার বার তোমার ছায়া-স্নিগ্ধ শ্যামলিমার স্পর্শ কামনা করছে। এই মরুভূমির সাদৃশ্য মৃত্তিকা হে পথিক বন্ধু! তোমার মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও, পল্লবে-ফলেফুলে পর্যাপ্ত ছায়া দানে স্নিগ্ধ, সমৃদ্ধ করো :

(গান)

মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ ॥
মৌন মাটির মর্মর গানে কবে উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহন প্রাণ ॥
পথিক বন্ধু, ছায়ার আসন পাতি এসো শ্যাম সুন্দর।
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথি! মাতাও নীলাম্বর।
ঊষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরাম গভীরভাব,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা হে উদার প্রাণ ॥

তন্ত্রধার : ওগো তরু শিশু ! তুমি কেবল এ যুগের নবীন অতিথি নও, তুমি চিরন্তনকালের সঙ্গী। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিবর্তন ধারার সঙ্গে তুমি অভিন্ন হয়ে আছ। যুগে যুগে তোমার সঙ্গে কতনা পরিচয় ঘটেছে। আরণ্যক সভ্যতার যুগে তুমি ছিলে মানুষের শান্তি নিকেতন, তপস্যার তপোবন। আজও সেই সম্পর্কের যোগসূত্র ধরে আমার ভাবলোকে সঞ্চারিত হ'চ্ছে বিবর্তনের আবণ্যক স্মৃতি। মনে পড়ছে হে নবীন অতিথি!—তোমাদের নেপথ্য ইতিহাসের কথা :

(গান)

ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সংগোপন ॥
যতনে কত কী আনি বেঁধেছিল গৃহখানি
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয় তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে কত হাসি অশ্রুজলে।
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারাণী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে পদার্পণ।

তন্ত্রধার : হে বৃক্ষ! তুমি আমাদের আজন্মের নিত্য সহচর। তোমাকে নানারূপে, নানাভাবে বরণ করেছি; সযত্নে ভবন দ্বারে স্থাপন করেছি—মাঙ্গলিকরূপে।

তোমার কাছ থেকে জীবন-বেদের মন্ত্র নিতে হ'বে আমাদের। তুমি গৃহ-দেবতারূপে, জননী বেশে, যে মহান চরিত্রের আদর্শ তুলে ধরেছ, একে একে সেগুলি আয়ত্ত করবার সেই অটল সঙ্কল্প দাও, তোমার জীবন্ত উপমা আমাদের সেই অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করুক :

(গান)

এসো হে গৃহদেবতা।
এ ভবন পুণ্য প্রভাবে করো পবিত্র ॥
বিরাজো জননী, সবার জীবন ভরি,
দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র ॥
শিখাও করিতে ক্ষমা, করোহে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা,
দেহো ধৈর্য হৃদয়ে—
সুখেদুখে সংকটে অচল চিত্ত ॥
দেখাও রজনী-দিবা, বিমল বিভা,…
বিতরো পুবজনে শুভ্র-প্রতিভা
নব শোভা কিরণে
করো গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র ॥
সবে করো প্রেম দান পুরিয়া প্রাণ—
ভুলায়ে রাখো সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈর হ'বে দূর—
তোমারে বরণ করি জীবন মিত্র ॥

তন্ত্রধার : জগতের জীবকুলের জীবনমিত্র হে বনস্পতি! তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। সৃষ্টির আদি-কাল থেকে মানুষের সঙ্গে এই বৃক্ষ-বনস্পতির কি নিগূঢ় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আদিম মানুষের তুমি ছিলে পরম আত্মীয়। বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন পাহাড়ের গুহায় তারা বাস করত। কতদিন তারা অতিবাহিত করেছে তরুর কোটরে, অথবা ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন বৃক্ষের শাখায়। এই তরুলতার ফলমূল ছিল মানুষের আহার্য। বৃক্ষের শাখা কাণ্ড ছিল মানুষের আগুন জ্বালাবার ইন্ধন। পত্র বল্কলে সেদিনের মানুষ নিবারণ করত তাদের লজ্জা। ভূর্জ্জর আর তালপত্রে লেখা হয়েছে সে যুগের বেদমন্ত্র, পুষ্পপল্লবে হয়েছে দেবার্চনা। প্রাচীন ভারতের পঞ্চবটী, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য আজিকার মানুষের কাছেও বহন করে আনে এক স্বপ্নময় শান্ত সৌম্য জগতের চিত্র।

তাই হে বৃক্ষ! হে অরণ্যাণী! তোমার স্নিগ্ধ সুশোভন লোচন-লোভন শ্যাম সভাতলে বর্ষায়, শরতে, শীতে, বসন্তে শুনি বিশ্ববীণার ঝঙ্কার। তোমার অবিরল রসধারায়, তোমার কলসঙ্গীতে আজও ধ্বনিত হয় সেই বিগত দিনের কত বিচিত্র গাথা, উদ্গীত হয় দিকে দিকে তোমার বাণী :

(গান)

বিশ্ব রাজালয়ে বিশ্ব বীণা বাজিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরি গুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরম সংগীত মধুরিমা, নিত্য নৃত্য রসভঙ্গিমা।
নব বসন্তে, নব আনন্দ—উৎসব নব—
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে;

শুনিরে শুনি মর্ম্মর পল্লব পুঞ্জে ;
পিক কূজনে পুষ্প বনে বিজনে।
তব স্নিগ্ধ সুশোভন লোচন-শ্যাম সভাতল মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে।
তোমার নিশ্বাস-সুখ-পরশে উচ্ছ্বাস হরষে,
পল্লবিত, মুখরিত, গুঞ্জরিত, উল্লসিত সুন্দর ধরা।
দিকে দিকে তব বাণী—নব নব তব গাথা—অবিরল
রসধারা।

তন্ত্রধার : আজ এসো এই মাটির মাকে প্রণাম করি। যে মা তার অরণ্য-স্নেহের আঁচল পেতে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। যার বুক ফেটে উদ্ভিন্ন হ'য়েছে এই সহস্র বাহু অগণিত তরুরাজি ; যার হাসিতে এই প্রফুল্ল ধরণী ফুলে ফলে ভরে উঠেছে ; যার সঙ্গে আমাদের জন্মমৃত্যুও একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে, সেই মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহাঞ্চলে মাটির টানে ফিরে চল্ :

(গান)

ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল
ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে ॥
দিক্ হ'তে ওই দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা,
জন্ম-মরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা সাগর পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥

তন্ত্রধার : আবার অরণ্য সম্পদে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ধরণী পূর্ণ হোক। মানুষের চিরপুরাতন ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য-ভূমি আবার সেই পরম শান্তির নীড়ে পরিণত হোক। হে অরণ্যভূমি তোমার সেই স্নেহাঞ্চল বিছিয়ে দাও, আবার ফুলে ফলে অন্নবস্ত্রে প্রাচুর্যে পৃথিবী ভরে উঠুক। তোমার মর্ম্মরধ্বনির অস্ফুট মন্ত্রে, তোমার বিচিত্র হিন্দোল সঙ্গীতে, উন্মুক্ত দিগন্তের আনন্দে, বচনাতীত সারল্যের ঔদার্যের ঐশ্বর্যে সেই সনাতন বাণী প্রচার কর—

[আবৃত্তি]

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জ্জীব নহ সৌধের মতন—
তোমার শ্রীমুখখানি নিত্যই নূতন,
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল ;
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা ;
নিশিদিন মর্ম্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষায় মন্ত্রে ; বিচিত্র সংগীতে
গাও জাগরণ গাথা ; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মত,
জননীর বক্ষে ; বিচিত্র হিল্লোলে যত,
খেলা কর শিশু সনে ; বৃদ্ধের সহিত—
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।

তন্ত্রধার :

আজ এক দিকে যতই মারমুখী সভ্যতা সম্প্রসারিত হ'চ্ছে, অন্য দিকে ততই সঙ্কুচিত হ'চ্ছে আরণ্যক পরিবেশ। দিকে দিকে ক্রমশঃই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে ভয়াবহ ভূমিক্ষয়। রুক্ষ অনুর্বর ধরণী ততই যেন শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। লৌহ লোষ্ট্র-প্রস্তরে গগন-চুম্বি প্রাসাদে মিনারে নগর সভ্যতা কী নির্মমভাবে আমাদের শ্বাসরোধ করছে! এই নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী সভ্যতা কেবলই যেন নানা কৃত্রিমতায় প্রাণধারণের দিন যাপনের গ্লানিতে আমাদের স্বাভাবিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। তাই রবীন্দ্রনাথ এ হেন নব সভ্যতার পরিবর্তে চেয়েছেন, সেই আরণ্যক সভ্যতার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে, সেই নয়নাভিরাম অবাধ উন্মুক্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে। তিনি তাই বলেছেন যে, হে আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতা! তুমি অতীতের সেই আরণ্যক সভ্যতার সুস্থ সরল স্বাভাবিক দিন-গুলোকে আবার ফিরিয়ে দাও। এই বস্তু সর্বস্বতার মোহ গ্রাস থেকে আমাদের মুক্ত কর :

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যছায়া রাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যা স্নান,
সেই গোচারণ সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল-বসন,
মগ্ন হয়ে আত্ম-মাঝে নিত্য আলোচনে,
মহাতত্ত্বগুলি।

বাংলার লোককলা-শিল্প

দীপেন রাহা

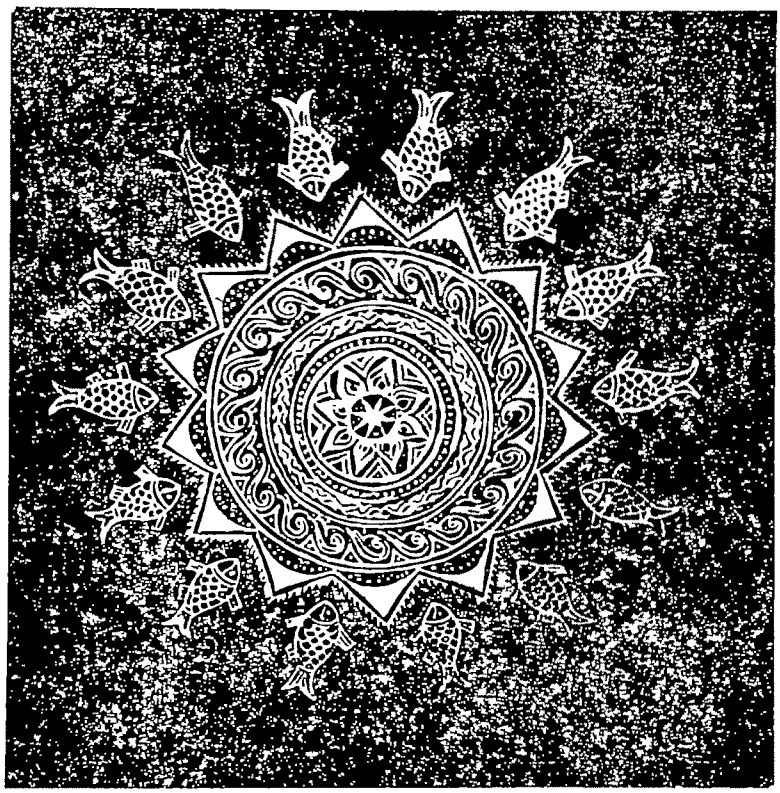

বাংলার অতি প্রাচীন লোককলা-শিল্প হচ্ছে আলপনা-শিল্প। কবে কোন তারিখে এর প্রথম উদ্ভব হয়েছে বলা কঠিন। তবে উৎস হচ্ছে বাংলার হিন্দুদের লোকাচার ও ধর্মাচার। আলপনা-শিল্পের প্রচলন চলে আসছে আবহমানকাল থেকে। বংশপরম্পরায়। এই লোককলার যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সাংস্কৃতিক মূল্য আছে, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। এই লোককলা বিদ্যা শেখবার জন্যে নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশী করতে হয় না। ঘরে বসে মা দিদিমার কাছে অতি স্বল্প প্রয়াসে ও ব্যয়ে অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা করা যায়। এই শিল্প দর্শন মাত্রই মনটা খুশী হয়ে ওঠে; অতীত ঐতিহ্যের কথা মনে পড়ে। চোখেরও তৃপ্তি হয়। কিন্তু খানিকক্ষণ পর মনে হয়, "হায় লাঠি তোর দিন গিয়াছে।"

অর্থকরী বিদ্যার পেছনে ছুটছে বর্তমান সমাজের লোক। কৃষ্টি তাদের মাথায় উঠেছে। যে সৃষ্টি বা কৃষ্টি পেট ভরে খেতে দেয় না, তার প্রতি আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। এরকম যুক্তি প্রায়ই শুনতে পাই। কিন্তু অতীত সমাজের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও আদর্শের কথা আমরা ভেবে দেখি না। অর্থের জন্যে, ভাত-কাপড়ের জন্যে বা যশের আকাঙ্ক্ষায় গৃহস্থবধূ বা মেয়েরা আলপনা-শিল্পকে তখন অনুসরণ করে নি। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশই তার নিজস্ব অতীতের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি রক্ষায় যত্নবান।

সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের আলপনা-শিল্প প্রচলিত আছে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্কৃতি সংস্থাগুলো যদি মিলে মিশে মাঝে মাঝে আলপনা-শিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করে, তাহলে এখনও মৃতপ্রায় লোককলাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা!

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটি খুঁড়ে যখন অতীতের কলা-শিল্পের নিদর্শন বার করার জন্য প্রাণপাত করছেন আমরা তখন সহজলভ্য লোককলা-শিল্পকে কবর দিতে উদ্যত। এ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। এইভাবে আমাদের পুরাকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা অনেক জিনিষই খুইয়েছি। নতুনেরও কৃত্রিম আস্বাদনে

বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। নতুনকে সাদরে গ্রহণ করবো, কিন্তু পুরাতনের ভালো জিনিষগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করা উচিত।

কেউ কেউ বলেন, এসব শিল্প নিয়ে থাকতে গেলে ভাতের বদলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়, পেটে গামোছা বেঁধে থাকতে হয়। তার চাইতে অর্থকরী শিল্পের পেছনে ছোটা অনেক ভাল। বাস্তব দৃষ্টিতে অনেক সময় তাই মনে হয়। কিন্তু একটা জিনিষ বিবেচ্য। কৃষ্টিকে ধরে রেখে, মর্য্যাদা দিয়ে, রক্ষা করে উপোস থেকে মরার কথা আসে না। আজ পর্য্যন্ত কেউ মরেও নি কোন দেশে। তাই যদি হতো তা' হলে বাংলা তথা ভারতের বহু কৃষ্টির লোপের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও কমতো। আমরা আন্তরিক-ভাবে কলা-শিল্পকে ধরে রাখিনি বা রাখবার চেষ্টা করিনি। তাই সে অনাদরে শুকিয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। এ অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। শিক্ষিত, সামাজিক প্রাণী হিসাবে কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সর্বরকম ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা, প্রসার করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে লোককলা-শিল্প অর্থাৎ আলপনা-শিল্প শত শত বছর ধরে বাংলার গৌরবের বস্তু হয়ে আছে তা' এমনি-ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ভাবলেও মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে। বেশীর ভাগের লোক পল্লীগ্রামেই বাস করে। একথা সত্যি যে, পল্লীগ্রামগুলো শহরে উঠে আসেনি। শহরের প্রভাবে ও ফ্যাশানের অনুকরণ করতে গিয়ে অনেক গ্রাম তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছে, মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের উন্নতি মানে গ্রামের অতীত ঐতিহ্যকে, কৃষ্টিকে ভুলে যাওয়া নয়, বরঞ্চ আঁকড়ে ধরা, বাঁচিয়ে রাখা, স্থায়ী ভাবে রূপ দেওয়া।

এসব নির্ভর করে প্রচারের উপর। বছরের এক-বারের মত সাংস্কৃতিক সম্মিলনের দোহাই দিয়ে আলপনা-প্রদর্শনী করলে হবে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে, বছরে কয়েকবার নির্দিষ্ট আলপনা-শিল্পের প্রদর্শনী করা উচিত। পুরস্কার দেবার পরিকল্পনাও থাকা উচিত। তাহ'লে উৎসাহীরা, শিল্পীরা এগিয়ে আসবে। উত্তর-স্থরীগণও সোৎসাহে এ শিল্পটাকে অনুসরণ, অনুকরণ করবার মত মনোবল পাবে।

বেশ কিছুদিন পূর্বে একবার কাঁথা-কম্বলের উপর সূচী-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দেখেছিলাম। বিদেশীরা এসব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুদূর আমেরিকায় ও ভারতীয় প্রদর্শনীতে নাকি স্থান পেয়েছে। এসব কাঁথা কম্বলে যে সব ছবি, লতা পাতা আঁকা হতো তার বেশীর ভাগের সঙ্গে আলপনা-শিল্পের মিল আছে। একই সৃষ্টির যেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপ দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে যেসব হাণ্ডলুম জিনিষের বিদেশে চাহিদা বেড়েছে তার উপরও বিভিন্ন রকমের কারুকার্য্য হয়। এই সব কারুকার্য্যের রকমফের কিছুটা কালের গতির সঙ্গে বদলাচ্ছে। তবে একেবারে আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। ঘটতে পারে না। কারণ একটি শিল্পের প্রভাব সমশ্রেণীর অন্য শিল্পের উপর পড়া বা থাকা স্বাভাবিক।

আলিম্পন শিল্পের সঙ্গে এদের যেন রক্তের যোগ রয়েছে। তা'ছাড়া এত কম খরচে, স্বল্প প্রয়াসে ক্ষুদ্র কুটীরকে সুদৃশ্য করে তোলায়, পবিত্র ভাব জাগিয়ে তোলার আর অন্য কোন রকম উপকরণ বোধ হয় তাদের কাছে নেই। এ কথা হয়ত অনেকেরই মনে হতে পারে। কিন্তু কারণটা যাই হোক, শিল্পটাকে নিয়মিত রূপ দেওয়া, বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করার একটা সার্থকতা আছে।

শহরে এ দৈন্য অনেকখানি চোখে পড়ে। আলপনা দেওয়ার মত সুদক্ষ মহিলা বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বা পত্র-পত্রিকায় যাঁরা আলপনার ছবি আঁকেন ও ছাপান তাঁদের সংখ্যা আঙ্গুলের কবে গুণে শেষ করা যায়। এমন একদিন ছিল যখন আলপনা দেওয়ার জন্যে সোৎসাহে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা ছুটে আসতেন। আর আজ কোন পল্লীতে প্রয়োজন হলে দু'একজনের বেশী পাওয়া যায় না। শান্তিনিকেতনের যে সব মেয়েরা আলপনা-শিল্পে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ এখনও তুলি ধরছেন। মা, দিদিমারা যাঁরা এ বিদ্যেটা কাউকে শিখিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন তেমন উৎসাহী

পাক-ভারত সমরসম্ভার

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

বিলাতের ইকনমিষ্ট পত্রিকার সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় মন্তব্য করা হইয়াছে যে, বিগত ১৮ বৎসর ধরিয়া পাকিস্থান অনেক চেষ্টাই করিয়াছে, কিন্তু কাশ্মীর প্রশ্ন নিজের মত করিয়া সমাধান করিতে পারে নাই। এইবার সে বলপ্রয়োগের দ্বারা বাজিমাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এ সম্পর্কে পত্রিকার অভিমত এই যে, "ভারতের এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা, বিভক্ত দেশ, দুর্ব্বল সশস্ত্রবাহিনী এবং দুর্ব্বলতর অর্থনীতি লইয়া ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা বাতুলতা।"

ইকনমিষ্ট পত্রিকা এই প্রসঙ্গে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে প্রধান তিনটি বিষয়ের তুলনামূলক একটি চিত্র দিয়াছেন: (১) পাকিস্থানের ভূ-ভাগ ভারতের ভূ-ভাগের এক-তৃতীয়াংশেরও কম। (২) পাকিস্থানের জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশেরও কম। (৩) পাকিস্থান দুইটি পরিকল্পনায় ব্যয় করিয়াছে ২৩০০ কোটী টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ভারত দুইটী পরিকল্পনায় ব্যয় করিয়াছে ১০,১১০ কোটী টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হইলে মোট ব্যয় দাঁড়াইবে ১৮,০০০ কোটী টাকারও বেশী।

এখানে পাক-ভারতের জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ-বাহিনীর একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল:

স্থলবাহিনী

পাকিস্থানের স্থলবাহিনীতে মোট সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার। ভারতবর্ষের ১৯৬৪ সালের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যে পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইয়াছিল স্থলবাহিনীতে সওয়া আট লক্ষ লোক নিযুক্ত করা হইবে। গত এপ্রিল মাসের সংবাদ—কয়েকটি টেকনিক্যাল শাখা বাদ দিলে—ভারত প্রায় এই লক্ষ্য পূরণ করিয়াছে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের যুদ্ধের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত দশটী ডিভিশনের মধ্যে অন্ততঃ ছয়টি ডিভিশন ইতিমধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত পাকিস্থানের মিলিশিয়া বাহিনীতে মোটামুটি সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত (এক ধরণের রিজার্ভ বাহিনী) আছে ৩ লক্ষ লোক। সে স্থলে ভারতের আঞ্চলিক বাহিনীতে আছে ৬ লক্ষাধিক সহায়ক সৈন্য। জম্মু-কাশ্মীর মিলিশিয়া যাহারা চীনা আক্রমনের সময় ভাল কাজ করিয়াছিল সেইটি বর্ত্তমানে স্থলবাহিনী হিসাবে গঠন করা হইয়াছে।

বিমান বল

পাকিস্থানের বিমানবাহিনীতে আছে—২ স্কোয়াড্রন (১ স্কোয়াড্রনে ৯টি বিমান থাকে) বোমারু বিমান। এই

কোন মেয়ে তাঁরা হাতের কাছে পান না। কোন কোন মেয়ে যদি জানতে পারে যে, কোন শিল্পীর বই আছে তখন সেটা উলটে পালটে দেখার ইচ্ছা হয়ত তাঁদের হয়। কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে বসে আলপনা কী করে দেওয়া হয় তা দেখবার ফুরসৎ নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এখনও এই মৃতপ্রায় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কেউ কেউ চেষ্টা করছেন। বই পুস্তক পুস্তিকার মাধ্যমে বা সক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠানাদিতে আলপনা দিয়ে, নির্দেশ দিয়ে বা যোগান দিয়ে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাইতে বাঙ্গালী সমাজে মেলা-মেশার উদ্দেশ্যে, তাদের সমাজজীবন ও কৃষ্টিমূলক কার্য্যাদি জানবার জন্যে গিয়েছিলাম। দেখলাম, বাংলার কৃষ্টি, শিল্পের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট।

আরও দেখে খুশী হলাম, বোম্বাই শহরে এক প্রান্তে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সমাজের মধ্যে 'আলপনা'র গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীযুক্তা প্রতিভাবালা বর্ধন এখনও পূজাপার্বণে, উৎসবে নিয়মিতভাবে আলপনা দিয়ে যাচ্ছেন। এত বয়সেও তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বহু অবাঙ্গালী মহিলা তাঁর কাছে বাংলার আলপনা সাগ্রহে শিখছেন। শ্রীযুক্তা বর্ধনের অঙ্কিত বিশেষ ধরণের দুইটি আলপনার নমুনা এখানে দেওয়া হল—একটি বক্ষ্যমান রচনার প্রারম্ভেই এবং অপরটি এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে।

বিমানগুলি ক্যানবেরা শ্রেণীর। আর আছে ৬ স্কোয়াড্রন বিমান। এই বিমানগুলি আমেরিকার নিকট হইতে পাওয়া দ্রুতগতিসম্পন্ন এফ-১০৪ ষ্টার ফাইটার এবং এফ-৮৬ স্যাবার জেট বিমান।

ভারতবর্ষের আছে—বোমারু বিমান ৮ স্কোয়াড্রন। ক্যানবেরা জঙ্গী বিমান ১৪ স্কোয়াড্রন—হাণ্টার মার্ক-৫৬, স্যাট, তুফানী ভ্যাম্পায়ার। ভ্যাম্পায়ার বিমানকে বোমারু হিসাবে ব্যবহার করাও চলে। তাহা ছাড়া রাশিয়ার নিকট হইতে সংগ্রহ করা মিগ্ বিমান ৩টী স্কোয়াড্রন তৈয়ার করা হইতেছে এবং মরুৎ নাম দিয়া এইচ এফ-২৪ শ্রেণীর শব্দের দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন বিমান ভারতে তৈয়ার হইতেছে।

নৌবল

ভারতবর্ষের একটি বিমানবাহী জাহাজ আছে। পাকিস্থানের নাই। ভারতবর্ষের দুইটি ক্রুজার (মহীশূর ও দিল্লী), পাকিস্থানের একটি হাল্কা ক্রুজার আছে। ভারতবর্ষের ৬টী ডেষ্ট্রয়ার আছে (রাজপুত, রাণা, রঞ্জিত, গোদাবরী, গোমীত ও গঙ্গা)। পাকিস্থানের ৫টী আছে। ভারতবর্ষের ১১টী ফ্রিগেট আছে (তাহার মধ্যে সাবমেরিন ও বিমানের সঙ্গে লড়িবার উপযুক্ত জাহাজও আছে)। পাকিস্থানের মাত্র দুটি ফ্রিগেট আছে।

আমেরিকার বহুল প্রচারিত ২০এ সেপ্টেম্বরের 'নিউজ উইক' (News week) পত্রিকায় এ সম্পর্কে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইল :

Arms : who supplied what

	India	Pakisthan
United states→		
F. 86 Sabre jets	0	100
F-104 Starfighters	0	50
B-57 attack bombers	0	30
C-130 transports	0	4
C-119 transport	25	0
Patton Tanks	0	200
Sherman tanks	30	0
Great Britain→		
Hunter jet fighters	150	0
Vampire bombers	100	0
Gnat jet fighters	100	0
Canberra bombers	80	50
Canberra photo planes	8	0
Viscounts tranports	5	0
Centurian tanks	210	0
Stuart tanks	80	0
Soviet Union→		
Mig-21 jet fighters	6	0
Ilyushin transports	2	0
Antonov transports	24	0
France→		
Mystere iv jet fighters	100	0
AMX-13 tanks	40	0

গত কয়েক বৎসর পাকিস্থান আমেরিকার নিকট হইতে সিয়াটো ও সেনটোর সদস্য হিসাবে যেসব অপেক্ষাকৃত আধুনিক অস্ত্র লাভ করিয়াছিল তাহার মূল্য ৪০০ কোটী ডলার অর্থাৎ দুই হাজার কোটী টাকা। ইহার মধ্যে আছে ১৭০ খানা প্যাটন ট্যাঙ্ক। এফ্ জেট বিমান রাডারের সরঞ্জাম প্রভৃতি। রাজনৈতিক অর্থাৎ সীমান্ত বিষয়টি পাকিস্থানের অনুকূলে। যেখানে ভারতবর্ষকে ৯,৪২৫ মাইল দীর্ঘ স্থল সীমানা সামলাইতে হইতেছে, সেইখানে পাকিস্থানের স্থল সীমানার দৈর্ঘ্য তার অর্দ্ধেকেরও কম। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের ৪৬১৫ মাইল দীর্ঘ যে সীমানা, সেইটিই পাকিস্থানেব একমাত্র স্থল সীমানা। অধিকৃত কাশ্মীরকে বাদ দিলে চীনের সঙ্গে পাকিস্থানের কোন সাধারণ সীমান্ত নাই। অপর পক্ষে চীন ভারত সীমান্ত ভারতের পক্ষে উদ্বেগের কারণ।

দুইটি কারণে পাকিস্থানের রণনীতির সুবিধা নস্যাৎ হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ পাকিস্থানের দুই অংশ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতায় সামবিক দিক হইতে পূর্ব্ব পাকিস্থানকে দুর্ব্বল কবিয়া রাখিয়াছে। আকাশপথে বা স্থলপথে পাকিস্থানের স্বল্পতম দূরত্ব হইল ৭২৫ মাইল। তাহাও ভারতবর্ষের উপর দিয়া। জলপথে করাচী হইতে চট্টগ্রাম আসিতে লাগে ১১ দিন। করাচী-চট্টগ্রাম সমুদ্র-পথেরও অধিকাংশ ভারত মহাসাগরে ভারতীয় জল সীমানার মধ্যে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, মোটেই শান্ত বা নিরাপদ নহে। ওই সীমান্তের আব্দালী, আফ্রিদি, খাটাক, ওয়াজির, মাসুদ ও বেলুচ পাঠানকুলের প্রীতি পাকিস্থান অর্জ্জন করিতে পারে নাই। অনবরত সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। পাখতুনীস্থানের স্বাতন্ত্র্য দাবী ঐ সীমান্তকে অশান্ত করিয়াই রাখিয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পাক-ভারতের সঠিক সমর-সম্ভারের সংবাদটি দেওয়া সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট হইতে সঠিক নির্ভুল তথ্যটি বাহির করা শক্ত। *

* প্রধানতঃ ইকনমিষ্ট পত্রিকা, ষ্টেটস্‌ম্যানস্ ইয়ার বুক (১৯৬৪-৬৫), ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট, নিউজ উইক, যুগান্তর প্রভৃতি হইতে তথ্যগুলি গৃহীত।

ঠাকুর গড়া শেষ হয়েছে। সারি সারি কুড়ি পঁচিশ-খানা প্রতিমা রূপে, রঙে, আভরণে ঝলমল করছে যেন। তিন চার মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের সফলতা। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দু'চোখ ভরে দেখছিল নন্দ। কারবাইডের আলোতে তার সুগৌর মুখখানা এক সফল নিপুণ শিল্পীর মত লাগছিল।

কিছুদূরে একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ অন্ধ সনাতন বসেছিল। নন্দর বাপ সনাতন। কাশ-ফুলেব মত শাদা একমাথা কোঁকড়ান চুল। রেখাঙ্কিত কুঞ্চিত মুখে এখনো যেন কোথায় বিগত যৌবনের শ্রীর অবশিষ্টটুকু মিশে আছে। নির্ব্বাপিত প্রদীপের পোড়া সল্‌তের মত চোখ দুটো বুজে চুপসে গেছে।

অথচ একদিন ঐ চোখের আলোয় মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ে উঠতেন, রূপ-লাবণ্যের স্বর্গীয় দীপ্তি জড়িয়ে থাকত তার সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে। কিন্তু কী বিড়ম্বিত ভাগ্য! সারা জীবন মায়েব চোখ এঁকে নিজেই শেষে অন্ধ হয়ে গেল সনাতন।

বাবার দিকে লক্ষ্য পড়তে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায় নন্দ। আজ এই আনন্দের দিনেও এক অজানা আশঙ্কায় বুক তার দুব দুর করে ওঠে। অতীত গৌরবের অহমিকা আর আত্মপ্রত্যয় এতকাল মাথা উঁচু করে ছিল ; আজ বুঝি কালের আবর্ত্তনে তাও বিলুপ্ত হতে চলল।

কলকাতায় এসে এই সে প্রথম বায়না নিয়ে ঠাকুর গড়েছে। যদিও বাপের খ্যাতির জন্যই সম্ভব হয়েছে এত তাড়াতাড়ি। একটা দুটো তো মানুষ বাড়ি ঘর ছেড়ে আসেনি। তাই পূজো আসতেই সনাতনের খোঁজ।

কুমারটুলিতে আগতরা এসে পেল মানুষটিকে। কিন্তু এসে দেখল, প্রতিভার প্রদীপে আর সেই আলোর স্পর্শ নেই, নেই ক্ষীণ উত্তাপটুকুও। শুধু পড়ে আছে এককালের গৌরবের সাক্ষী হয়ে পোড়া সল্‌তেটুকু।

সোনার আলোয় নন্দ সোনা হতে পারে নি। কিন্তু উজ্জ্বলতার আভাষটুকু তো পেয়েছে। তাই নন্দ এগিয়ে এল সনাতনের হয়ে। সোনাব কাঠির প্রসিদ্ধ প্রতিমা-শিল্পী সনাতন। পিতৃ-পরিচয়ের গৌরবে নন্দ গৌরবান্বিত। এবারের প্রতিমার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কলকাতার বাজারে নাম হলে আর প্রসারের অভাব হবে না। পঁচিশ বছরের নন্দ এর মধ্যেই কলকাতাব হালচাল রুচি বুঝে নিয়েছে।

ঠাকুরের সাবেকী ঢং এখন অচল। একটু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না করলে লোকের চোখে লাগবে

না। নাম করা যাবে না তাড়াতাড়ি। নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নন্দ এবারে আশৈশবের একই অভ্যাসে অভ্যস্ত হাতকে একটু বদলাতে চেষ্টা করেছে। রঙে রেখায় গড়নে দিতে চেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

* * *

এর জন্যই বুঝি এত ভিড় নন্দর প্রতিমার আড়তে। সবাইর চোখেই সপ্রশংস মুগ্ধ দৃষ্টি। গতানুগতিকতায় ক্লান্ত মানুষ এবার বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছে।

সনাতন এই নিস্তব্ধতায়ও বিড়ির গন্ধে ছেলের উপস্থিতি বুঝতে পারছিল। সারাদিন খেটেখুটে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ছেলেটা!

ও নন্দা, ঘুমাইয়া পড়লি নাকি?—সস্নেহে জিজ্ঞেস করে সনাতন। অন্যমনস্ক নন্দ বাবার ডাকে চমকে ওঠে, তারপর নিজেকে সামলে বলে, না। এমনি বইয়া আছি। কাজকর্ম্ম সব শ্যাষ অইল। ভুলটুল তো হয় নাই কিছু? ধর না আমারে দেখি ক্যামন করছিস—অধীর আগ্রহে বলে সনাতন।

এবারেও অসম্পূর্ণতার অজুহাত দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখে নন্দ। বুঝতে পারে চোখ হারালেও মন তো হারায়নি মানুষটা। হারায় নি চেতনা আর উপলব্ধি। হাতের প্রথম ছোঁয়াতেই যে কেমন ঠেকচে সব। যে মূর্ত্তির এতটুকু ভুলত্রুটিতে অকল্যাণ অমঙ্গলের সর্ব্বনাশ নেমে আসে। বইতে হয় অন্ধত্বের অভিশাপ। যুগযুগান্তের সংস্কার অন্ধ বৃদ্ধ নিজের পরিণতির কথা ভেবেই যে হায় হায় করে উঠবে। এতদিন তবু এখানে ওখানে পাঠিয়ে কোন রকমে সরিয়ে রেখেছিল নন্দ। আজ আর তার কোন উপায় নেই। উল্টোডিঙ্গির সেই মেয়ের বাসা থেকে ভর দুপুরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে মানুষটা। এসে চৌকাঠে পা রেখেই জিজ্ঞাসা করেছিল, ক্যামন অইলরে নন্দা। তোর বাপ ঠাকুর্দ্দার নাম রাখতে পারবি তো?

বাবার উপর অপরিসীম শ্রদ্ধা নন্দর। ছোটবেলা থেকে কোনদিন এতটুকু অবাধ্য হয়নি। যেমন শিখিয়েছে তেমন শিখেছে।

গ্রামের সেই সীমিত সীমানায় থাকলে হয়ত প্রাচীন কৃষ্টির গৌরবটুকুই জিইয়ে রাখত নন্দ। বাপ ঠাকুর্দ্দার খ্যাতির আসন আরো সুদৃঢ় করত। আজ বৃহত্তর জগতে পা দিয়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। আশৈশবের ধারণা, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি সবকিছু। প্রগতির এত আলোর সমারোহ যদি তার আম, জাম, নারকেল, সুপারির ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট গ্রামখানিতে এতটুকুও প্রতিভাত হোত, তাহলে বাবা হয়ত প্রাচীন সংস্কারের জরাজীর্ণ প্রাচীর নিজের হাতেই ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেন।

কিন্তু তা হোল কৈ?

বাপ-ঠাকুর্দ্দার প্রচলিত ধারাই সারা জীবন ধরে বইল মানুষটা। সেই বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি। হাত ছিল নিপুণ আর ছিল শুদ্ধা ভক্তি, অটল বিশ্বাস। এই সব মিলে ঠাকুর হোত অনন্যসুন্দর।

সোনার কাঠির প্রতিমা দেখতে আট দশখানা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ত। সহর থেকেও লোক আসত কত। সারা জীবন মেডেল আর বিভিন্ন পুরস্কার সনাতন যা পেয়েছিল তা বুঝি গুণে শেষ করা যায় না। ঐ এক-খানাই ঠাকুর গড়তেন বাবা। জমিদারের কুলকুমার যখন, বাইরে যাওয়াও নিষেধ। রাজশিল্পী বাজারে শিল্পী হতে যাবে কেন!

খ্যাতির অহঙ্কার আর নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এই দু'টোকে সযত্নে আগলে রাখতে রাখতেই সময় ফুরিয়ে গেল মানুষটার। শেষ পর্য্যন্ত খ্যাতির প্রলোভনে মহাকালের অমোঘ বিধানকেও অস্বীকার করে চলেছে সনাতন।

বছর তিনেক আগে থেকেই বড়কর্ত্তা সনাতনকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। বার্দ্ধক্যের শৈথিল্য তাঁর বিচক্ষণ চোখে এড়ায়নি।

কিন্তু শুনলে তো মানুষটা! জীবনের প্রাণ-সলতে যতক্ষণ উস্‌কে উস্‌কে জ্বেলে রাখা যায় ততক্ষণই তো প্রতিভা। ততক্ষণই তো নাম আর খ্যাতি। সরিয়ে নিলেই সমাপ্তি—হারিয়ে-যাওয়া বিস্মৃতির অতলতায়।

এই হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়ই কাঁপা-কাঁপা হাতেও চল্লিশ বছরের খ্যাতির আসন আঁকড়ে রইল সনাতন।

কাজের মধ্যে বেঁচে থাকার এই উদগ্র বাসনাই সর্ব্বনাশ আনল। মহাকাল তাকে ক্ষমা করলো না।

সেদিনের কথা মনে পড়লে আজো ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেবার মায়ের শুধু দৃষ্টিদান বাকি। প্রতি বছরের মত আয়োজন আড়ম্বরে গম গম করছে চারিদিক। পুরুত ঠাকুরের মন্ত্রপাঠ, মেয়েদের উলুধ্বনি আর ঢাক ঢোল শানাইয়ের সমবেত বাজনার মধ্যে নতুন কাপড় আর নতুন ফতুয়া পরে সনাতন উঠলো প্রতিমার দৃষ্টিদান করতে। বাবুদের বাড়ির সবাই এসে ভিড় করেছে মণ্ডপ ঘিরে। এতক্ষণের মৃন্ময়ী মা ঐ যাদুময় তুলির স্পর্শে চিন্ময়ী হয়ে উঠবেন। স্বর্গীয় দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠচে তার সমস্ত অঙ্গ।

ক্রোধ, ক্ষমা, করুণার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফুটে উঠবে দেবীর আয়ত চোখে। সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে অপেক্ষমান। রক্ত মাংসের ঐ চেহারার মানুষটি যেন এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

সনাতন নামলো কাজ শেষ করে।

আর একবার উলুধ্বনি, মন্ত্রপাঠ, বাদ্যি বাজনায় মুখর হোল পুজামণ্ডপ।

নন্দ কিন্তু প্রতিমা আর তার বাবার মুখ দেখে আঁতকে উঠলো। দেবীর দৃষ্টিতে সেই অভিব্যক্তি নেই। নেই সেই স্বর্গীয় আলো। নিছক সাধারণ চোখ। মাটির প্রতিমা মাটিরই রয়ে গেছেন। নন্দ লক্ষ্য করেছিল, বাবাও যেন কেমন বিষণ্ণ। নিষ্প্রভ চোখ তার চুপসানো। মুখে অপরাধের ভীতি।

সহকারী বলরামের চোখও এড়ায়নি এই ত্রুটি। তাকে চুপ থাকার নিষেধ জানানোর আগেই বলে বসল সে, এবার যেন মায়ের চাওন ভালো লাগতেছে না বুড়া কর্ত্তা।

আজন্মের শান্ত নিরীহ সনাতন হঠাৎ ক্ষিপ্ত চীৎকারে বলে উঠলো, চুপ হইয়া থাক হারামজাদা, আমার উপর কথা—বলেই অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেল সনাতন।

সনাতনের মর্ম্মভেদী চীৎকারটা যেন এক সর্ব্বস্বান্ত সম্রাটের হাহাকার হয়ে পূজামণ্ডপের চিলছত্রের থামে খিলানে কার্নিশে, কড়িকাঠে ইঁটের পাঁজরে পাঁজরে মিশে গেল।

সনাতন অন্ধকার থেকে আর আলোয় ফিরে এল না। বাড়ি ফিরেই বিছানা নিলো। শুরু হোল প্রচণ্ড জ্বর আর বিকার। সেই বিকারে শুধু অনুতাপ আর অন্তর্জ্বালা। কেবলই প্রলাপ—আমি পাপ করছি, আমি অন্ধ হইয়া যামু। মায় আমারে অভিশাপ দিছে।

এই বিকারই শেষে সত্য হোল। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে বেঁচে উঠলো সনাতন। কিন্তু চোখের আলো চিরদিনের মত নিভে গেল সনাতনের।

* * *

আজও সনাতনের সেই ভাবনা: অতীত গৌরবের ধ্বংসস্তূপটি যে বিশ্বাস আর অহমিকায় এতকাল মাথা উঁচু করে ছিল আজ বুঝি কালের আবর্ত্তনে বিলুপ্ত হতে চলল।

সনাতন গোস্বামী

(অপ্রকাশিত রচনা)

৺অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তোমার বিরহ রাতি নেমে আসে হৃদি-বৃন্দাবনে,
তোমারে স্মরণ করি অশ্রুজলে পুণ্য তিথি ক্ষণে।
শ্রাবণ-সজল ছায়া রাধা কুঞ্জে পড়েছে এ রাতে,
হে মোর গোস্বামী প্রভু! কৃষ্ণ কথা কই কার সাথে!
চৈতন্য চরিত সুধা বিলায়েছ প্রেমপাত্র ভরি,
তুমি কি দিবে না সাড়া নামে নামে সঙ্কীর্ত্তন করি।
অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যজি কন্থা আর করঙ্কেরে লয়ে,
ওগো দৈবী মায়াধর মহাভাবে রাত্রি দিন রয়ে
নিভৃতে নির্জ্জনে, কয়ে গেছ জীবে প্রেম রুচি নামে
এই শুধু নিয়ে যায় মানুষেরে চির সত্যধামে।
শ্রীজীব বিরলে কাঁদে, তুমি কেন অন্তরালে রহি
জন্মমৃত্যু আলোছায়া মাঝখানে লীলাস্রোত বহি'
আনন্দে রয়েছ প্রভু। দর্শনের নব দ্বৈপায়ন
অকিঞ্চনে কৃপা করো দিকে দিকে ধ্বনিছে ক্রন্দন
প্রাণের প্রণাম লহ, প্রেমভক্তি চিত্তে যেন জাগে
সন্ধ্যা হয়ে এলো মোর, দূর হোতে নিশীথিনী ডাকে।

ভজন

শ্রীঅমল চৌধুরী

কৃষ্ণ মুরারী মেরে গিরিধারী
প্রভু, নাম ভজন শিখাও,
জিন্দিগীমে তুম্‌হি হামারী
তুঁহু যুগল রূপ দেখাও।
সংসারো কে সবই ঝুঠা হায়—
ঝুঠা জীবন রোতি হায়।
হায়, মেরা গোপাল! মৈ দুখহারী
তুম্‌হারী প্রেম্‌কি নাম পিলাও॥

পূজা নেহি, হায় মেরা আঁসুক্
দিল্‌কি পুকার ইয়ে কহতি হায়,
জীবন্‌কি বহলানা তুম্‌হারী লিয়ে
কিস্‌মৎ কি খেলোনাকে ভুল্‌তি হায়।
দুনিয়াকো আঁধেরা মে সবই আঁধেরা
বহতি হায় বার বার দিল্‌কি পুকারা,
কেইসে খেল্‌তি হায় মায়া তুম্‌হারী
তুম্‌হারী চরণ মুঝে দিলাও॥

রণযাত্রা

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

বীর সাজে সাজি যায় রণে আজি পুত্রসব ওই তোমারি ;
এস পুরবাসী দেখ শোভারাশি দুনয়ন ভরি'।
তারা দানব দর্প করিতে খর্ব্ব, দীপ্ত করিতে ভারত গর্ব্ব ;
যেতেছে বক্ষঃ উন্নত করি বিদূরিতে ঐ অরি।
আজি বল সবে জয় ভারতের জয় ;
তথা দানবের ধ্রুব পরাজয়,
বরিষ লাজ পুষ্পাঞ্জলী বীরগণ শিরোপরি।
আর গাও সবে মিলি বীরের ধর্ম্ম,
বুঝ প্রাণে প্রাণে শক্তি মর্ম ;
ধর ধর অসি সবল হস্তে সকল নরনারী।
যদি আসি হেথা পুনঃ সাধিতে ধ্বংস,
আর গ্রাসিতে এ পূত ভারত অংশ ;
যাবে যাবে তারা রঞ্জিত করি আমাদের তরবারি।
ঐ আসিছে ভারত মহিম অঙ্ক,
উড়াও নিশান বাজাও শঙ্খ ;
জননী চরণে জবা বিল্বদল দাও প্রাণ মন ভরি'।
কোথায় কে আছ এখনও সুপ্ত, করগো জীবনে ধন্য তৃপ্ত ;
এ মাহেন্দ্র যোগ গেলে চলি আর আসিবে না ফিরি।

সাময়িকী

বুড়ীবালাম-যুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী :

বুড়ীবালাম-যুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বুড়ীবালামের তীরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক-দিকে বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ৪ জন বিপ্লবী ও অপরদিকে বিরাট্ সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকিয়া আগ্নেয় অস্ত্র লইয়া 'নেটিভের' সংগ্রাম পরিচালনা এই প্রথম। মাত্র ৫ জন বাঙালী যুবকের রণকৌশল ও অসীম বীরত্ব পুলিশদলের অধিনায়ক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলব ও ডেপুটি কমিশনার কুখ্যাত টেগার্টেরও বিস্ময় ও সপ্রশংস শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বালেশ্বর জেলার (উড়িষ্যা) এই বুড়ীবালাম তীরের সশস্ত্র সংগ্রামের অমর কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রতি বৎসরের মত এবারও ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে বহু তীর্থযাত্রী এই স্বাধীনতা-তীর্থে সমবেত হইয়া স্মরণোৎসব পালন করিয়াছেন। উড়িষ্যা সরকারের সাহায্য ও সহ-যোগিতায় এই তীর্থে যতীন্দ্রনাথের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব হইয়াছে।

বাংলার বরণীয় সন্তান অভিজিৎ :

সম্প্রতি কাশ্মীরে হানাদার-বিতাড়ন-সংগ্রামে ভারতীয় বাহিনীর ২৩ বৎসর বয়স্ক অফিসার (সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট) অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়া প্রাণ দান করিয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
জগতে তাদের কেহ করেনি সম্মান।"

—জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীমান অভিজিৎ। বর্ত্তমান কাশ্মীর রণাঙ্গনে দেশাত্ম-বোধের এমনি আরও নজীর স্বাধীনতা-উত্তর নিস্তেজ প্রাণহীন দূষিত আবহাওয়ায় সুনিশ্চিত প্রাণ ও প্রেরণাপ্রদ। কৃষ্ণনগরের (নদীয়া) প্রবীণ নেতা আজীবন দেশসেবী ও সংসদ সদস্য শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সন্তান ছিলেন অভিজিৎ। পিতা যেমন হাসিমুখে উপযুক্ত পুত্রকে দেশের কাজে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তেমনি হাসিমুখেই পুত্রের মৃত্যু-বারতা বরণ করিয়া লইয়াছেন। অভিজিতের জীবনোৎসর্গের কাহিনী উদীয়মান তরুণের সামনে চির প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে।

প্রাক্তন বিচারপতি গ্রেপ্তার :

মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ বশীর আহম্মদকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। প্রাক্তন বিচারপতির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অভিযোগ প্রমাণ হইলে সত্যই অনুতাপের বিষয়।

চন্দননগর পুস্তকাগার :

চন্দননগর পুস্তকাগারের বিগত তিন বৎসরের (১৯৬১-৬৪) কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ, মোট সভ্য সংখ্যা ৫৫০ জন, তন্মধ্যে ৭৩ জন আজীবন সভ্য। আলোচ্য সময়ে নূতন ১১৪৯ খানি পুস্তক সংযোজনার পর মোট পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩২,১৩১। ইহার মধ্যে ছাত্রের সভ্য সংখ্যা ১৮ জন। এই সময়ে মোট আয় ১৪,৫৮৫-৭৩ ও ব্যয় ১৪,৭৩১-২১; তন্মধ্যে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর দরুণ যথাক্রমে ২,৪০৩·০০ ও ২,২০০·০০। বিবরণীতে প্রকাশ আলোচ্য তিন বৎসরে মাত্র ৬ জন সভ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকাগারটি বাংলাদেশে সুপরিচিত এবং ৯২ বৎসরের পুরানো। সভ্য সংখ্যা ও নূতন সভ্য সংযোজনের স্বল্পতা নৈরাশ্যজনক।

কলিকাতার স্কুলে পাকিস্তানী বই :

আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ই ভাদ্র) প্রকাশ, খাস কলিকাতার বুকেই সরকার অনুমোদিত ৬৮নং ডাফমওহারবার রোডস্থ সেণ্ট পলস্ বোর্ডিং অ্যাণ্ড ডে স্কুলের কে জি. ওয়ান শ্রেণীর জন্য পাকিস্তানী বই চালু রহিয়াছে। ফলে ছেলেমেয়েরা পাকিস্তানী মুদ্রা আর ডাক-টিকিটকে জাতীয় মুদ্রা ও ডাক টিকিট বলিয়া শিখিতেছে। লেখিকা পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামের এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা। বইটি ছাপা হইয়াছে করাচী সিভিল এণ্ড মিলিটারী প্রেসে। বইটির ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় চাঁদ-তারা মার্কা পাকিস্তানী মুদ্রার ছবি আর ৫০ পৃষ্ঠায় পাকিস্তানী ডাকটিকিটের ছবি দিয়া অঙ্ক শিখান হইয়াছে। ইহা সরকারী শিক্ষা বিভাগের সতর্কতার চমৎকার নমুনা!

এ-যুগের প্রতিচ্ছবি 'ফুলিয়া' :

কবি কৃত্তিবাসের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত ফুলিয়া (নদীয়া) গ্রামের বহুমুখী শিল্প-শিক্ষায়তনের সাম্প্রতিক এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য 'যুগধর্ম্ম' শীর্ষকে একটি চিন্তাগর্ভ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হইল। শ্রীভট্টাচার্য্য ফুলিয়া গ্রাম ও কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বলেন : পাঁচশ বছর আগে এই গ্রামে বাংলা সাহিত্যের এক প্রতিভাধর স্রষ্টা জন্মেছিলেন। তাঁর ভিটা বুকে ধরে চিরস্মরণীয় হবে রয়েছে ফুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামে বর্ত্তমানে একটি লক্ষ্যণীয় প্রতিষ্ঠান—সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্র—এই Polytechnic Institute—বহুমুখী শিল্প-শিক্ষায়তন। বর্ত্তমান কালের উপযোগী নানা ধরণের কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এই একদিকে আর অন্যদিকে অতীতের স্মৃতির গৌরব ও সংস্কৃতির সম্পদ—দুইয়ের এই স্থানে সমাবেশ। ইহা এক হিসাবে এ যুগের প্রতিচ্ছবি বলা যাইতে পারে।

ঐস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধর্ম্মের ভান :

বর্ত্তমান কাশ্মীর যুদ্ধে জম্মুর ৪০ মাইল দূরে চাম্ব অঞ্চলের জোরিয়ান গ্রামে পাকিস্তানী সেনার জেট বিমান নমাজের সময় একটি মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে পঞ্চাশজন উপাসনারত মুসলমান নাগরিক প্রাণ হারায়। সংবাদে প্রকাশ, উক্ত গ্রামের

অধিবাসিগণ পাকিস্তানী হানাদারদের সহযোগিতা করিতে রাজী না হওয়াই এই প্রতিহিংসার কারণ। কিছুদিন আগে এই হজরত ইকবাল মসজিদে রক্ষিত মহম্মদের কেশ চুরির অজুহাতে পূর্ব্ববঙ্গে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আশ্চর্য্য প্রকৃতির পরিহাস।

প্রবর্ত্তক সাহিত্যচক্র :

গত ১৫ই শ্রাবণ কলিকাতা প্রবর্ত্তক ভবনে প্রবর্ত্তক সাহিত্য চক্রের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীজলধর দিশ্বাস মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। কুমারী শিখারাণী বড়ুয়ার উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সম্পাদক শ্রীইন্দু গুপ্ত কান্তকবি রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। সম্পাদকীয় বিবৃতির পরিবর্ত্তে এবারে প্রবর্ত্তক আষাঢ় ১৩৭২ সংখ্যার সম্পাদকীয় পাঠ করেন শ্রীআরাধনা গুপ্ত। সমাজ সংস্কারে ভারতীয়তা নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন চক্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সঙ্গীত প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ইন্দু গুপ্ত, শ্যামাদাস দে, সুষমা মৈত্র, নির্মলকুমার সরকার, জগন্নাথ সাহা, সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শশাঙ্ক রায়, শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ, শক্তিকুমার মল্লিক প্রভৃতি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রনাথ নায়েক প্রভৃতি সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের প্রেরণার উৎসস্বরূপ সম্পূর্ণ যুগোপযোগী প্রবর্ত্তকের আষাঢ় সংখ্যার এই সম্পাদকীয়টি সকলেই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। সভাপতি শ্রীবিশ্বাস সভায় পঠিত রচনাদির অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করেন। প্রবর্ত্তক সম্পাদক ও চক্রের সভাপতি শ্রীরাধারমণ চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ দান করেন।

আমেরিকার শিল্পপতিদের 'পৌষ মাস' :

ভিয়েৎনাম বর্ত্তমান যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের জন্য সরবরাহকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে অর্ডার পাইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

১। সৈন্যদের সুতী কাপড়—৭০ লক্ষ টাকা; ২। সৈন্যদের শূকরের মাংস (টিনভরা)—৫০ লক্ষ টাকা; ৩। সৈন্যদের লৌহ-শিরস্ত্রাণ—১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা; ৪। বিভিন্ন রকমের হেলিকপ্টার—প্রায় ৭৫ কোটি টাকা; ৫। বিভিন্ন শক্তির বোমা—প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা, ৬। বিভিন্ন ধাতব গদী (Land mats)—৫০ লক্ষ টাকা; ৭। সৈন্যদের বুট জুতা—১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা; ৮। ভিয়েৎনামে সাময়িক বিমান ঘাঁটি তৈয়ারী—৮৫ কোটি টাকা, ৯। ভিয়েৎনামে নদীনালায় চলার জন্য ভারি নৌকা—১০০০ কোটি টাকা; ১০। জেট বিমান—সাড়ে সাত কোটি টাকা।

গত এক বৎসরে এই যুদ্ধে আমেরিকা খরচ করিয়াছে ৬৫০ কোটী টাকা। আরও ৫০০ কোটী টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। শিল্পপতিদের এই যুদ্ধ পৌষ মাস হইলেও ভিয়েৎনামের সর্ব্বনাশ।

জগদীশ্বরী দেবী রচনা প্রতিযোগিতা :

এই প্রতিযোগিতার সংবাদটি গত বৈশাখ সংখ্যা প্রবর্ত্তকের সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার তারিখ বৃদ্ধি করিয়া ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ করা হইয়াছে। প্রতিযোগিতার বিষয় (১) বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসে বাঙ্গালী মহিলার অংশ গ্রহণ, (২) স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙ্গালী মেয়েরা কিভাবে স্বদেশপ্রীতি ও দেশকল্যাণের সহায়ক হইতে পারে। যে কোন বাঙ্গালী মেয়ে যোগ দিতে পারিবেন। পঞ্চাশ টাকা বা ঐ মূল্যের পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে। চন্দননগর পুস্তকাগারের সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

ত্রুটি স্বীকার :

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবর্ত্তকের 'সাময়িকী' বিভাগে 'কান্তকবি স্মরণে' শীর্ষক অনুচ্ছেদে অসতর্কতাবশতঃ কান্তকবি স্থলে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ স্থলে কান্তকবি ছাপা হইয়াছে। 'আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ, গর্ব্ব করেছ চুর' কবিতাটি হাসপাতালে অবস্থানকালে কান্তকবি লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠান। এ ত্রুটির সম্পর্কে আমরা কয়েকখানি পত্রও পাইয়াছি। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

বিগত ভাদ্র সংখ্যা প্রবর্ত্তকে 'আন্দার' শীর্ষক কবিতার (পৃষ্ঠা ২০৫) কবির নাম শ্রীশশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য স্থলে শ্রীশশাঙ্কশেখর ঘটক হইবে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

॥ প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন ॥

বর্বর নৃশংশ শত্রুবেষ্টিত শান্তিকামী স্বাধীন ভারত। 'জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষোজহি'—ভারতের এই সনাতন জীবনাদর্শের সম্যক পরিচয় আমাদের জোয়ানেরা সাম্প্রতিক পাকিস্তানের আক্রমণে দিয়াছেন। জোয়ানদের শৌর্য্য-বীর্য্য-দেশাত্মবোধে ভারতবাসী গর্বিত। প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করিয়া স্বাধীনতার পতাকা গর্বোন্নত রাখার সহায়তা প্রতিটি স্বাধীন নাগরিকদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আনন্দময়ীর আগমনে—

শারদীয়া আনন্দোৎসবের দিনে লোক-লৌকিকতা, আত্মীয়তা ও মিত্রতা স্মরণীয় করবার জন্য চাই উপহার দেবার মত সর্বরকম রুচির আধুনিক ডিজাইনের ধুতি ও শাড়ী।

আপনাদের এই বিবিধ ও অফুরন্ত চাহিদা মেটাতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বেনারসী শাড়ী, কেরালা, বাঙ্গালোর, কোয়েম্ব্যাটোর, কাঞ্জিভরম, টীসু ইত্যাদি নানাবিধ সিল্কের শাড়ী এবং বাংলার রকমারী আধুনিক ডিজাইনের তাঁতের ধুতি-শাড়ীর বিপুল সম্ভারের জন্য

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

সর্বজন প্রশংসিত সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : ফোন ৩৩-২৩০৩

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]

বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি বিচিত্র রুচিসম্মত শাড়ীর বিপুল সম্ভার।

আধুনিক ডিজাইনের হরেক রকম দেশী তাঁতের শাড়ী। গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার প্রচুর আয়োজন।

An Important Announcement

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR
★ DOUBLE ENDED-GRINDER
★ POLISHING & BUFFING
★ FLEXIBLE SHAFT GRINDER

etc. etc.

MANUFACTURED BY :

KSHAMA ELECTRO WORKS

146, SHYMNAGAR ROAD, DUM DUM, CALCUTTA-28. Phone : 57-2799

বৈদিক ঔষধালয়-ঢাকা

চন্দননগর

জি, টি, রোড ঃ ঃ বড়বাজার

উচ্চস্থান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরিচালক—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শৃক্তি ঔষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ।

নিজ তত্ত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে কয়েকটি ঃ

চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ঃ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ঃ দশন সংস্কার চুর্ণ ঃ
সারিবাদ্যারিষ্ট ঃ অশোকারিষ্ট ঃ ব্রাহ্মী ঘৃত (ছাত্র বন্ধু) ঃ মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।

ঔষধের বিস্তৃত বিবরণী ও গুণাগুণের জন্য তালিকা দ্রষ্টব্য। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD.

Gram : 'PRABARTAK' Mg. Agents—PRABARTAK TRUST Phone : 34-3088 & 89

IMPORT :
Machineries
Papers, Boards,
Synthetic Resin
Milk products
Casein and Chemicals
and Sundry Goods.

Expert Buying Service available at a very Moderate Charge.

EXPORT :
Jute Manufactures
Shellac, Kapok,
Myrobalan,
Cattle foods.
Spices, Rosin and
other India Products

61, Bepinbehari Ganguly Street : : Calcutta-12

Codes used : A B. C. 5th. 6th. & 7th. Edition ; Bentley's Complete, Phrase, Western Union, Universal and 5-Letter, Acme and Com. Phrase with Supplement ; Schofields 3-Letter

আর মিত্রের
মুক্তাকার্কা
তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিস্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃরোগে অব্যর্থ

আর মিত্রের সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স কলিঃ-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিঃ-৬

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস.
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ **শব্দ তত্ত্ব** ১৫-০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲
পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
পরার্থকথা ২-২৫
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

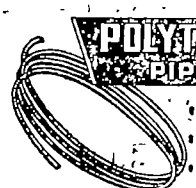

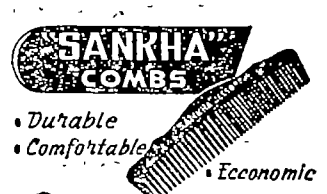

JESSORE COMB INDUSTRY Co.
ESTD. 1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX No.-10813

অভিজাত কেশ-তৈল

নগেন্দ্রনাথের

হিমকল্যাণ

বড়-মাঝারী-ছোট

তিন সাইজে

সর্বত্র পাওয়া যায়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ ● কলিঃ-৪

॥ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০ ; **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲ ; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ ; **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত : "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণাঙ্গ ; নির্ভরযোগ্য বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

৮২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬

ফোন: ৩৪-৩৭১১

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

শ্যামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ্

করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের

বিদেশে মোহনবাগান—৪-০০

বিভিন্ন দেশে মোহনবাগান ক্লাবের রোমাঞ্চকর সফর কাহিনী। বহু চিত্র ও অজানা তথ্যসমৃদ্ধ। সহজ সাবলীল। রম্য-রচনার ভঙ্গী। ফুটবল খেলার এ-দেশ ও-দেশের তুলনামূলক সমালোচনা-বই এই প্রথম। সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত।

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিঃ-১২

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় ○ ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান পাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এস,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

মিষ্টান্ন জগতে বিশেষ আকর্ষণ

ইন্দ্র'র

- উৎকৃষ্ট দধি
- ক্ষীরের খাবার
- স্পঞ্জ রসগোল্লা ও চমচম্

বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে।
সকল অনুষ্ঠানেই সযত্নে অর্ডার সরবরাহকরা হয়।

৮৬ আমহার্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৫-১৩৮৩

৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-২৫৩৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিলতৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিস্রুত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃরোগ অব্যর্থ

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশাস কলিঃ-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিঃ-৬

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক; সম্পূর্ণাঙ্গ; নির্ভরযোগ্য বুক বাইণ্ডিং কারখানা।
পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪ - ৩৭১১

সূচীপত্র : প্রবর্তক : কার্ত্তিক, ১৩৭২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
বহ্নিদীক্ষা	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	২৭৯
এহি	নিবন্ধ	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	২৮০
গান্ধী বাণী	সঙ্কলন	মহাত্মা গান্ধী	২৮১
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	২৮২
সম্পাদকীয়	...	...	২৮৩
সত্যমেব জয়তে	কবিতা	শ্রীতারাশঙ্কর	২৮৮
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	২৮৯
মানুষ কি চায়	প্রবন্ধ	শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	২৯৩
ছায়াজাল	গল্প	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২৯৫
শ্রীঅরবিন্দ-সরণি	স্মৃতিকথা	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৩০০
চির-তৃষা	কবিতা	শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত	৩০২
একটি স্মরণীয় ঘটনা	কথিকা	শ্রীকুন্তল মজুমদার	৩০৩
বৃত্তপথ	কবিতা	নরেন বিশ্বাস	৩০৪
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	ইতিবৃত্ত	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৩০৫
ভুল	গল্প	শ্রীঅজিত দাস	৩০৮
পূজায় বলিদান	আলোচনা	শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	৩১১
বৈদিক যুগের সঙ্গীত	নিবন্ধ	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য	৩১৪
পঞ্চাশ বছর আগে	সংকলন	...	৩১৬
ভূস্বর্গ চঞ্চল	ইতিবৃত্ত	শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার	৩১৭
সমালোচনা	...	...	৩১৯
সাময়িকী	...	...	৩২০

"নিমল"

আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অম্লজনিত দন্তের ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সুরভিত হয়।

আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা-১৭

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥

স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২·৫০

জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪·০০

Living Knowledge 4.00

(যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি বিশ্লেষণ নৈপুণ্য। মুমুক্ষু নিশ্চয়ই সাধনার আলো ও পথ পাইবেন)

॥ শুভঙ্করের ॥

মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪·০০

(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)

॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত ॥

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩·০০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

অভিজাত কেশ-তৈল

নগেন্দ্রনাথের

হিমকল্যাণ

বড়·মাঝারী·ছোট

তিন সাইজে

সর্বত্র পাওয়া যায়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ প্রাঃ লিঃ • কলি-৪

UPCO

॥ সদ্‌গুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০; **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ; **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত: "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাবলিশার্স: কলিকাতা-১২

সূতিকায়

দুর্ব্বলতায়

জ্বরে

বাতে

মৃত সঞ্জীবনী সুধা

মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে

শতবর্ষ পরে প্রথম প্রস্তুতকারক

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

কলিকাতা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

৫০ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা | সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৭২

ঘোর অন্ধকার চিরে' বুঝি এক ঝিলিক আলোর রশ্মি দেখা গেল। এ আলো উষার অরুণরাগচ্ছটা কিনা—হয়ত এখনও ঠিক বলা যাবে না। আমরা নব-নব অরুণোদয়েরই প্রতীক্ষায় আছি। যে উজ্জ্বল আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে এ জাতি দিশেহারা হয়েছিল, স্বাধীন হয়েও পদে-পদে চলার বাধা, ঘরে-বাহিরে আতঙ্ক-বিভীষিকা—বিশ্বের দুয়ারে করপুটে ভিক্ষাযাত্রা—অন্নভিক্ষা, বিদ্যাভিক্ষা, অস্ত্রভিক্ষা—দুর্ব্বল মনে নীতির অস্পষ্টতা, আদর্শের ফাঁকা বুলি ছড়িয়ে জান ও মান বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা—এই বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতার কুয়াশা ভেদ করে' এক বিন্দু আশার আলো, শক্তির বিদ্যুল্লেখা ঝলসিত হল সহসা ভারতের ভাগ্যাকাশে—ভারতীয় যৌবনের বীর্য্যশুল্কে অর্জ্জিত এই নূতন তেজঃ, নূতন উদ্দীপনা—ইহা আত্মশক্তির উপলব্ধি, ইহা নবজীবনেরই অগ্নি-দীক্ষা। যুগপ্রেরণার স্পর্শ যদি জাতির প্রাণ পেয়ে থাকে, সে উন্মাদ প্রাণ ঝড়ের দোলায় চড়ে' এগিয়ে যাবে—নিভ্‌বে না আর এ বহ্নিশিখা—নূতন জোয়ার আনবে সে দেশের জীবনে। আর অবিশ্বাস নয়—মরণের স্রোতে ভেসে চলা—ততোধিক অগৌরবকর পরাভবের লাঞ্ছনা লেপে বুকে হেঁটে মাটি খাওয়ার অপেক্ষাও নয়—প্রতিদিনের চলা-ফেরা, খাওয়া-পরা, ভোগ-বিলাস, উৎসব, আনন্দের মধ্য দিয়ে ছুটতে চাই বিশ্বাসের বীর্য্য, জীবনজয়ের অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়েই। এবার জাতির নেতাদের আর আমরা ঘুমাতে দিব না—বিধাতার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলার যে দুর্ম্মদ সংবেগ, উহা এবার কোন কারণে কোন ঘটনায় স্তব্ধ নিথর হওয়া আর চলবে না। জাগা জাতির জীবনে এবার আর শ্রান্তির, অবসাদের, নিদ্রার ঘনিমা নামতে দেওয়া হবে না। ওগো কাণ্ডারী, তুমিই ত বারে-বারে কতরূপে এসে পথ দেখালে, অন্ধের কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, তোমার দেওয়া স্বচ্ছ-আলোর-রেখা জীবনের সম্বল করে' চলার সঙ্কল্প ত আমরা নিইনি, আলোর দান অপচয়ই করেছি—আজ তুমি এস আলো-রূপে নয়, পথ-প্রদর্শকরূপেও নয়—শুধু নির্ম্মল সুমতিরূপেই আমাদের অন্তরে ফুটে' ওঠ—সুমতির অভাবেই কত পাওয়া আমরা খুইয়েছি, বর পেয়েও দুর্ম্মতিবশে তাকে অভিশাপে পরিণত করেছি! বিশ্বাসের বেদী আমাদের চূর্ণ হয়ে গেছে। দুর্নীতি দমন, পরিবার-সংক্ষেপ কল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—অজীর্ণ রোগীর অসুস্থ ভুক্তোদ্গারের মত আবর্জ্জনার অপসৃষ্টিই করেছে, জাতির হৃদয়ে প্রত্যয় জাগায়নি। মহাজনদের শান্তির আদর্শ, বিশ্বমৈত্রীর সুখস্বপ্ন ধূলায় লুটাচ্ছে। কত কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্য, কত

এহি

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ভারতের ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। অযোধ্যার, হস্তিনাপুরের, মথুরার, দ্বারাবতীর গৌরবধ্বজা ধূলি-ধূসরিত হইয়াছিল। মগধ, কলিঙ্গ, মথুরা জাতির গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। কাশী, কাঞ্চী, মিথিলার ইতিহাস ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আমরা পরবর্ত্তীযুগে দেখি ভারতের বক্ষ-পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া শাক্যসিংহের অভ্যুত্থান। ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভারতের পথে পথে তাঁর অভিযান। আমরা দেখি নিঃসহায় বিধবার অঙ্ক শূন্য করিয়া ভারতকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিতে বিজ্ঞানাচার্য্য শঙ্করের ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা। গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া রামানুজের সন্ন্যাস—কবীর, নানক, চৈতন্যের সর্ব্বহারা কাঙ্গাল মূর্ত্তি। ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই ইঁহাদের কটিতটে ছিন্ন বস্ত্র, হস্তে ত্যাগবৈরাগ্যের বিজয় ধ্বজা। এই জন্যই বিহারে বিহারে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুককে আমরা ব্যূহ রচনা করিতে দেখি। ভারতের চতুষ্কোণে ধর্ম্মদুর্গ রচনা করিয়া শঙ্কর-শিষ্যগণের সংহতিবদ্ধ প্রাণও এই পরিচয়ই দিয়াছিল। আজও ৩০ লক্ষ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ভারতের এই গৌরবই রক্ষা করে। ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জয়টীকাই তাঁহাদের ললাটে। নবদ্বীপের ধূলি অঙ্গে মাখিয়া অসংখ্য নারী-পুরুষ ভিক্ষাপাত্র হস্তে পথে পথে যে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেও এই ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়েই। কিন্তু তথাপি আজ আমরা কি দেখি? দেখি, নামী আছে, নাম নাই; দেহী আছে, দেহ নাই। যাহা না থাকিলে অন্য থাকে না, অন্যের জন্য তাহারই রচনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হয়। ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মূর্ত্তি লইবে

রামমোহন-রামকৃষ্ণ, কত বিবেকানন্দ-অরবিন্দ, গান্ধী-নেহেরু জ্যোতির দেশ থেকে এলেন, মেঘমন্দ্রে বাণী-মন্ত্র শোনালেন—জাতি কাণ পেতে শুন্‌ল, মনে হ'ল বুঝি জাগল, আবার পরক্ষণেই হাই তুলে' পাশ-মোড়া দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল! তাঁদের জলন্ত বিশ্বাস আমাদের মরা বুকে আগুন জ্বাল্‌ল না—জ্বাল্‌লেও অনির্ব্বাণ ঘৃত-প্রদীপের মত জীবনে তা' জ্বেলে রাখতে পারলুম না! দোষ জাতির বটে—তারা এমনি ক'রেই বিশ্বাসের দানগুলি মাথা পেতে নিয়েছে, আবার যুগান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—বড় জোর সাজিয়ে তুলে রেখেছে পূজ্য প্রত্নসামগ্রীর মত—মনের আলমারীতে। মৃতসঞ্জীবনী সুধারূপে উহা আমাদের অমৃতত্বের সঞ্চয় হয়নি। বিশ্বাসের বালাই নিয়ে মরি—কারও কথায় আজ তাই আর জীবন-জাগা প্রত্যয় সহজে জন্মায় না।

কিন্তু বিশ্বাসই ত বীর্য্য! বিশ্বাসের মহাশক্তিই মানুষকে অমর করে, জাতিকে করে মহৎ ও শক্তিমান্।

এই বিশ্বাসের বহ্নিদীক্ষা নিয়েই এবার আমরা নূতন তপঃশক্তি লাভ করব। আপনাকে গড়ে' তুল্‌ব সেই তপস্যায়। এই আত্মতপস্যায় গড়বে অখণ্ড ভারতজাতি—অখণ্ড মাতৃভূমি যাদের মা, তারাই এই নবীন, স্বাধীন, পূর্ণ ভারতজাতি। বেদ-বাইবেল-পুরাণ-কোরাণ-আবেস্তা-গ্রন্থসাহেব—সর্ব্বধর্ম্মবিশ্বাসের জলন্ত মর্ম্মসার—এই জাতির জীবন-স্বভাবে স্বতঃ-প্রকাশ অন্তরপ্রত্যয় হয়ে ফুটে উঠবে। আর্য্যানার্য্য, হিন্দু-বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, পার্সী-শিখ—আসামী, বাঙালী, রাজপুত, মারাঠী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, বিহারী, আউধী, নেপালী, ভুটানী, গুর্খা, জাঠ, কাশ্মীরী ও পাঠান—অভিজিৎ, তপন, ভাস্কর ও মজুমদারের সঙ্গেই গৌতম, পিঙ্গলে, মঙ্গত, সাঙ্কু, কীলর, ভরতসিং, আশারাম, ওসমান, হামিদ, শেখ,—একই লোহিত রক্তটীকার দীক্ষা নেবে এই তরুণ জাতি। পথের দিশারী—জাতির সত্তা। যোগ-মন্ত্র—পূর্ণ আত্মসমর্পণ। বিশ্বাসের আগুনে সিদ্ধ হোক তাদের মর্ম্মগত—প্রেম ও ঐক্য। জীবন-মরণের অর্ঘ্যদানে তারা পূর্ণ করুক—মর্ত্ত্যের দিব্যসৃষ্টি—ঊর্দ্ধজীবন।

(সঙ্ঘগুরুজীর রচনার ভিত্তিতে অনুলিখিত : পূজা সংখ্যা নবসঙ্ঘ হইতে)

যে ধর্ম্মে, যে রাষ্ট্রে ও সমাজে, তাহা কোথায়? ভারতের সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইযাছেন। কিন্তু জ্ঞানাধার রচনার জন্য কিছু করেন নাই। ভারতের ব্রাহ্মণ তাহা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কালে তাঁহারা দুই কূলই হারাইয়া ফেলিলেন। ভারতের সন্ন্যাসী এক কূল রাখারই চেষ্টা করিয়াছেন। আজ প্রয়োজন দুই কূল রক্ষার—ইহার জন্য আগাইয়া আসিবে কে? সেই নব তান্ত্রিকদেরই আজ আহ্বান জানাই। যাহাদের মস্তিষ্কে ব্রহ্মণ্য প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিবে। প্রাণে ত্যাগবৈরাগ্যের অনির্ব্বাণ হোমানল প্রজ্জ্বলিত থাকিবে। ইহার জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতে হইবে না—চাই আত্মার উৎসর্গ। আত্মোৎসর্গেই ইহা সিদ্ধ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের যে বজ্র সঙ্কল্প ধ্বনিয়া উঠে—তাহা নর-নারায়ণের মিলনেই সংসাধিত হইবে। জীবনের সিদ্ধ বেদী এইখানেই সর্ব্বাগ্রে পরিলক্ষিত হয়। যেখানে যোগেশ্বর নারায়ণ, যেখানে পার্থরূপী নরবিগ্রহ—এই দুইয়ের মধ্যে যুক্তি যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই ভারতের বিশুদ্ধ ধর্ম্মবীর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। নব-তান্ত্রিকদের সাধনা এই ধর্ম্মবীর্য্যকে ধারণ করা। ভারতের সন্ন্যাসীর কাজও ছিল সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট। যেদিন ভারত শুধু ধর্ম্মহীন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছিল, সেদিন সন্ন্যাসীর কাজ ছিল জাতিকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করার জন্য ধর্ম্মের জয়ছত্র উড়ান। ভারতের ব্রহ্মণ্য-শক্তি এই সন্ন্যাস ধর্ম্মের মহিমস্তুতি করিতে করিতেই অন্তর্হিত।

সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবার দিন আজ শেষ হইয়াছে। নানা সমস্যায় দেশ আজ সমাচ্ছন্ন। সমস্যা নিরাকরণের জন্য—নব-সন্ন্যাসীদেরই আজ উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। কেবল তীর্থ রক্ষা নহে, সেবা নহে, শাস্ত্র প্রচার নহে, আজ রাষ্ট্রে চাই নব-তান্ত্রিকের দল। সমাজ-সংস্কারে চাই নব তান্ত্রিক, দেশে শতকরা ৯০ জন অজ্ঞান মূর্খ মানুষের চক্ষে জ্ঞানের কাজল পরাইয়া দিতে চাই নবীন তান্ত্রিক। ভারতের ভাগ্য হলচালনায় যদি ফিরে, শত শত নব তান্ত্রিককেই আজ কৃষিক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভারতের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কেবল অধ্যাত্মসম্পদে পূর্ণ করিলেই চলিবে না, ধন-ধান্যেও উহাকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। গৃহীর মেরুদণ্ডে আজ এই শক্তি নাই। ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা তাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের দায়ে রক্ষা করিতে অসমর্থ। সেই জন্য এই নব তান্ত্রিকদেরই আজ আগাইয়া আসিতে হইবে। কোথায় আছ এই নব-তান্ত্রিকের দল—উদাত্ত কণ্ঠে তোমাদের আহ্বান দিয়া বলি—এহি।*

* পুরাতন নবসঙ্ঘ হইতে রেণুকণা ঘোষ কর্তৃক সঙ্কলিত।

● স্বাধীনতার অর্থ এই যে, সাধারণ গ্রামবাসীও মনে করিবে যে, সে-ই তাহার ভাগ্যবিধাতা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফতে সে-ই আইন-প্রণেতা। দরিদ্র জনগণের স্বরাজই আমার স্বপ্নের স্বরাজ। রাজন্যবর্গ ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য ভোগ করেন, সকলেই স্বচ্ছন্দে সেই সকল দ্রব্য ভোগ করিতে পারিবে, ইহাই হইল আমার নীতি।

● শোষণের পিছনে রহিয়াছে হিংসা। ভবিষ্যৎ অহিংসসমাজে সর্ববিধ শোষণ কলুষ নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া যাইবে—ইহাই আমার কাম্য। ভারতের পল্লীসমাজের জন্য সত্যকার স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত আমরা বিশ্রামের কল্পনাও করিতে পারি না। যে ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায়ের লোক পূর্ণ মিলনে আবদ্ধ হইয়া বাস করিবে, সেই ভারতের জন্যই আমি কাজ করিয়া যাইতেছি।

● যে দেশপ্রেম অন্য জাতির দুর্দশা ও শোষণের উপর নির্ভর করিতে চায়, সে দেশপ্রেম আমার জন্য নয়। কুশাসনকে অগ্রাহ্য করিবার অধিকার প্রজাসাধারণের নিশ্চয়ই আছে। ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বিদ্বেষপ্রচারে মানুষের কোন কল্যাণ হইতে পারে না। পৃথিবীকে নূতন শিক্ষা দিবার জন্য এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করিবার গৌরব ভারতবর্ষই লাভ করিবে।

● আমি মহাত্মা নই, আমি দীনাতিদীন, কেবল 'মহাত্মা' নামের দুঃখ-ভোগের বোঝা মাথায় লইয়া বেড়াইতেছি। আমি ঋষি নই, মুনি নই, অবতার নই, নই সন্ন্যাসী। আমি গৃহী, আমি দেশের সেবক, আমি শুধু সত্য-সন্ধানী। আমি সাধু নই, রাজনীতিকও নই। সত্য যে অখিল জ্ঞানের উৎস, ইহাই মাঝে মাঝে গভীরভাবে উপলব্ধি করি মাত্র।

মহাত্মা গান্ধী

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। অষ্টত্রিংশৎ সূক্তং।) দশমী-দ্বাদশী ঋক্

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবং।

অরেজন্ত প্র মানুষাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—"মরুতাং" (মরুদ্গণ সম্বন্ধি) "স্বনাদ" (ধ্বনি, গর্জ্জন), "অধ" (অনন্তর) "পার্থিবং" (পৃথিবী সম্বন্ধি) "বিশ্বং" (সকল) "সদ্ম" (গৃহ) "আ" (সমস্ত, পর্য্যন্ত) মানুষাঃ" (মনুষ্যগণও) "প্র" (প্রকৃষ্টরূপে) "অরেজন্ত (কম্পিত হয়) ॥ ১০ ॥

সরলার্থ—মরুদ্গণ যখন গর্জ্জন করেন, তখন পৃথিবীস্থ গৃহসকল এমন কি গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যগণ পর্য্যন্তও কম্পিত হইতে থাকে ॥ ১০ ॥

মরুতো বীলু পাণিভিশ্চিত্রা রোধস্বতীরনু।

যাতেম ধিভ্রয়ামভি ॥ ১১ ॥

অন্বয়—"মরুত" (হে মরুদ্দেবগণ) "রোধস্বতী" (বাধাপ্রদানকারী) "চিত্রাঃ" (বিচিত্র মেঘমালাকে) "অনু" (লক্ষ্য করিয়া) "বীলুপাণিভিঃ" (দৃঢ় হস্তে) "অধিভ্রয়ামভিঃ" (অবিচ্ছিন্ন গতিতে) "যাতেম্" (গমন করুন) ॥ ১১ ॥

সরলার্থ—হে মরুদ্দেবগণ! বৃষ্টিরোধকারী বিচিত্র মেঘমালাকে দৃঢ় হস্তে নিরোধ করিয়া অবিচ্ছিন্ন গতিতে আপনারা আগমন করুন ॥ ১১ ॥

স্থিরা বঃ সন্তু নেময়ো রথা এষাং।

সুসংস্কৃতাং অভীশবঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—হে মরুত! "বঃ" (আপনাদের) "নেময়ঃ" (রথচক্র সকল) "স্থিরাসন্তু" (স্থির ভাব ধারণ করুক) "এষাং" (ইহাদের) "রথাঃ" (রথগুলি) "অশ্বাসঃ" (অশ্বসকলও) [স্থিরাসন্তু—স্থির হউক] "সুসংস্কৃতাং" (সুন্দরভাবে) "অভীশবঃ' (কর্ম্ম সম্পন্ন হউক) ॥ ১২ ॥

সরলার্থ—হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের রথচক্র সকল স্থির হউক। স্থির হউক চক্রযুক্ত রথ সকল। সুষ্ঠুভাবে বারিপাতরূপ কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হউক ॥ ১২ ॥

বিশদার্থ—পূর্ব্ব ঋকে উদকবাহী পর্জ্জন্যদেবের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। এই তিন ঋকে সেই পর্জ্জন্য-দেবের স্বভাব ও স্বরূপ কি প্রকার, তাহাই বর্ণনা করা হইতেছে।

পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ অনেক রকমের আছে। সব মেঘেই যে বৃষ্টি হয় না—এই জানা কথাটিও ঋক্‌মন্ত্রে ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত করা হইয়াছে। 'যে মেঘ যত গর্জ্জায়, সে মেঘ তত বর্ষায় না'—ইহাও এক প্রচলিত প্রবাদ

সম্পাদকীয়

দ্রষ্টার দৃষ্টিতে :

অত্যন্ত সশঙ্ক ঘন ঘটার মধ্যে এবারকার পূজা সমাপ্ত হইল। বস্তুতঃ দুর্গতিনাশিনী দুর্গা পূজার ইহা ছিল এক মহেন্দ্রক্ষণ। আজকের মত এমনি দুর্য্যোগের দিনে স্বভাবতই জীব-চেতনার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া দুর্গতিনাশিনী শক্তির আশ্রয়ে অভয় খোঁজে।

শক্তি সর্ব্বভূতস্থিতা। তিনিই সবকিছু ধারণ করিয়া আছেন, আবার পোষণও করিয়া থাকেন। তিনি জগন্মূর্ত্তি—উপাদান-কারণ; আবার নিমিত্ত-কারণও—"তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" নিমিত্ত-কারণ বলিয়াই তো তিনি সদসদ্, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ভাল-মন্দ, ভুল-ভ্রান্তি সবকিছুর গোড়াতেই ক্রিয়াশীলা। তাই দেবী-প্রণামের মন্ত্র :

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ধর্ম্মায় নমঃ অধর্ম্মায় নমঃ। শক্তি ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা। শক্তির এমন সামগ্রিক ধারণা ভারত ভিন্ন বিশ্বের আর কোথাও মিলিবে না।

এই শক্তি-অভিমুখীন দৃষ্টিতে দূষণীয় কিছু নাই, দোষ দিবারও কেহ নাই। শক্তি-আরাধনার সাধ্য ও সিদ্ধি এই সর্ব্বব্যাপিণী শক্তির সহিত সমাত্মতায়। এখানে অন্তর ও বাহিরের দ্বেষ জয়ের মধ্যেই বিজয় নিহিত। মহাপূজান্তের বিজয়োৎসবে আমরা তাই আমাদের শুধু অনুরাগী সুহৃদ পৃষ্ঠপোষকই নয়, শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে সবাইকে সর্ব্বোদয়মূলক সপ্রেম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। পশ্চিম বাংলার বাঙালী আমরা পূর্ব্ব বাংলার আয়ুবশাহীর লৌহ কারান্তরালের জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করিয়া এই শুভ বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ প্রেরণ করিতেছি। আমরা আশা করিব, এই অঘটন ঘটন-পটিয়সী শক্তির অন্তর্গূঢ় লীলা উভয় বাংলার মিলনের দিনটিকে আসন্ন করিয়াই তুলিতেছে। ক্ষমতা-মদমত্ত বিভ্রান্ত আয়ুব-ভুট্টোর দলও এই বিশ্বশক্তির হাতের ক্রীড়নক বৈ নয়। "সচচ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্ বা অখিলাত্মিকে" যিনি—সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার বাহিরে বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্রও বৃন্তচ্যুত হইতে পারে না। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে অপ্রেমের কিছু নাই। বিগত সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া অখণ্ড ভারতে মহামানবের সাগরসঙ্গমে বিশ্বমানব সভ্যতা সমুন্নয়নের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বাক্য। দশম ঋকে ঋষিও সেই কথাই মন্ত্রমুখে উচ্চারণ করিয়াছেন—'আকাশে এমন মেঘও সৃষ্টি হয়, যাহাদের পরস্পর মিলনে শুধু গর্জ্জনই সার হয়, বর্ষণ হয় না। আর সেই গর্জ্জনে পৃথিবীস্থ গৃহ সকলই যে শুধু কাঁপিয়া উঠে তাহাই নহে; গৃহ মধ্যস্থ মানুষগুলিও কাঁপিয়া উঠে।' এই মেঘ কিন্তু পৃথিবীর কল্যাণকামী নহে। ইহারা ধারা বর্ষণে পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে না। এই অনিষ্টকারী মেঘগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্যই ঋষি একাদশ ও দ্বাদশ ঋকে মরুদ্দেবগণের অধিদেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন—'বৃষ্টিরোধকারী বিচিত্র বাধাসমূহকে, হে মরুদ্দেবগণ, দৃঢ় হস্তে নিরোধ করিয়া অবিচ্ছিন্ন গতিতে আগমন করুন। এমনভাবে বারিপাত করুন, যাহাতে নদীসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতে পৃথিবী যেন ক্ষতিগ্রস্তা না হন। স্থির, নিশ্চল, অবিরাম বারিপাতে পৃথিবীর শুষ্ক মরুকান্তার সরস হউক—নদনদী ভরিয়া উঠুক, পৃথিবী শস্যপূর্ণা হউক। মরুদ্দেবগণের কর্ম্ম পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি দান করা—সেই কর্ম্ম যেন সুষ্ঠু ও শোভনরূপে সম্পন্ন হয়—ইহাই প্রার্থনা। শান্ত, সংযত, নিরুদ্বিগ্ন-চিত্ত ঋষিমনের প্রার্থনাভঙ্গীও অনুরূপ॥

চলিয়াছে তারই ক্রমাভিব্যক্তির বর্ত্তমান পর্য্যায়ে আসুরশাহী শাসক-সম্প্রদায় অসুর-ভূমিকায় নিমিত্ত মাত্র। এই দ্বান্দ্বিক জগতের রীতিই ইহা। সত্যের জয়যাত্রা আবর্ত্ত উদ্ভিন্ন করিয়াই—কুটিল বর্ত্তে আঁকা-বাঁকা গতিতে। সুতরাং আজকের এই বিশ্বব্যাপ্ত শক্তি-সচেতন দ্বেষ-জয়ের উৎসবে কল্পধৃত অখণ্ড ভারতের শত্রুর ভূমিকায় দেশ-বিদেশে যারা অবতীর্ণ তাদের প্রতিও আমাদের শুদ্ধ চিত্তের স্বতোৎসারিত অভিনন্দন রহিল।

●

গত আশ্বিন সংখ্যা প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেবী দুর্গোৎসব যে বাঙালীর সর্ব্বগ্রাসী জাতীয় মহোৎসব তাহাই প্রতিপাদন করার প্রযত্ন করা হইয়াছে। এবার জাতীয় সঙ্কটের মুখোমুখী হইয়া দেবীপূজা অনাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইলেও, পূজার মধ্যে খানিকটা আন্তরিকতা ছিল—ছিল দুর্গতিনাশিনী দুর্গার নিকট দুর্গতি নাশের একটা প্রার্থনার আকুতি। বর্ষে-বর্ষে মহাপূজা গতানুগতিকতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় ইহার সুফল ঠিক আমরা লাভ করিতে পারি নাই। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল এই সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন: "পূজা হইয়াছে হিন্দু বাঙালীর দৃঢ় সংস্কার। পূজাও ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস সৃষ্টি করে এক প্রকারের প্রকৃতি। যেমন প্রকৃতি বলপূর্ব্বক মানুষের হৃদয় মন নিয়োজিত করে বিষয় বিশেষে, তেমনি এই প্রকৃতিও পূজা করে, দেবীর বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজায়। অভ্যাসবশতঃ প্রকৃতি এইরূপ করায়। প্রতিমা সাজায়। মহাড়ম্বরে তিনদিন অতিবাহিত হয়। ঘর ছাড়িয়া দেবীকে পথে বাহির করি, প্রদর্শনীর দ্বার খুলি। তারপর বিসর্জ্জনেব বাদ্য বাজে। সব শেষ হইয়া যায়।"

সঙ্ঘগুরুজীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, অনবহিত এই পূজার ফলে আমরা চেতনার ক্ষেত্রে পূজারম্ভে ও পূজান্তে একই স্থানে স্থাণু হইয়া থাকি—কোন উত্তরণ ঘটে না। মহাপূজার চরিতার্থতা আমরা লাভ করিতে পারি না। পূজারী প্রায়শঃ আত্মসমীক্ষার মধ্যে যাহা সঙ্কল্প করিয়া সমাধা করিল তাহার ফলাফল সম্বন্ধে একটিবার ভাবিয়াও দেখে না। ইহা উপরিচর মানসেরই লক্ষণ। বলা বাহুল্য, এইরূপ মানস কোন মহৎ কর্ম্ম সিদ্ধ করার অনুকূল নহে।

বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সার্ব্বজনীনতা, তার সর্ব্বগ্রামী ভাব-সম্পদ, তার সার্ব্বভৌম মানবিকতা-বোধটি এমনি যে, ইহা বিশ্বমানব-সভ্যতার, আলোকদিশারী হইবার যোগ্যতা রাখে। ভৌগোলিক ভাবেও যেমন সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ এই ভারতবর্ষ, তেমনি ইতিহাসের পথেই বিশ্বমানবের প্রেমৈক্য সাধনার পরীক্ষাগারে পরিণত হইয়াছে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ! ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের এই বাংলার গগন হইতেই বিশ্বমানব সভ্যতার নবীন অরুণোদয় হইবে। বিশ্বমানবের নবজন্মের সম্ভাবনাকে সফল করিয়া তুলিবার মত জীবনাদর্শ বাঙালী উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দীর্ঘ দুর্গাস্তোত্রের এক জায়গায় ইহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন: "মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা সর্ব্ব সৌন্দর্য্য অলঙ্কৃতা জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি, এতদিন শক্তি সংহরণে আত্মগোপন করিয়াছিল। আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে, এস মাতঃ প্রকাশ হও।"

এই 'দুর্গাস্তোত্রে' শ্রীঅরবিন্দ শক্তিকে পূজান্তে বিসর্জ্জন না দিয়া জীবনগত করিবার কথাও বলিয়াছেন: "মাতঃ. দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জ্জন করিব না। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও। বীরমার্গ প্রদর্শনি, এস, আর বিসর্জ্জন করিব না, আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবায় ব্রতী হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ এই বঙ্গদেশে প্রকাশ হও।"

সঙ্ঘগুরুজীও শক্তিময়ী দেবী দুর্গার আবাহন, বিসর্জ্জন ও জীবনে বিকাশের মর্ম্ম-তাৎপর্য্যটি চমৎকার বিস্তার করিয়া ধরিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন: "দেবীর আগমন হয় আবার তিনি প্রস্থান করেন, এ কিরূপ কথা? ভগবতী বিশ্বশক্তির প্রতীক। শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় কি প্রকারে? শক্তি ছিল না

তাই তার আবির্ভাব, শক্তি চলিয়া যায় বলিয়া তিরোভাব যদি হয়, তবে আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বা বাঁচিয়া ছিলাম কি লইয়া আর তিরোভাবের পরেই বা বাঁচিব কেমন করিয়া ?"

সদ্গুরুজীই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। উত্তরটি অনুধাবন করিলে শক্তিপূজার মর্ম্মই শুধু পরিষ্কার হইবে না, শক্তি-সাধনার ইঙ্গিতও মিলিবে আর জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিও পরিস্ফুট হইবে। তাঁরই কথা : "দেবী আসেন আবার চলিয়া যান, এইরূপ হইলে শক্তির অভাবে দেবীর আগমনের পূর্ব্বে বিশ্বপ্রাণ প্রকাশ হইত না। বিসর্জ্জনের পর বিশ্ব আবার ঘুমাইয়া পড়িত। মানবাত্মা যেমন ঘনীভূত হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করেন, তেমনই যে বিশ্বশক্তি চরাচরে পরিব্যাপ্ত তাহাকেই আমরা গুরু-মন্ত্র-প্রতিমায় ঘনীভূত হইতে দেখি। সেই ছড়ান শক্তি গুটাইয়া প্রতিমায় ধরা দেন বলিয়াই পূজায় এই মহাধূম। আত্মার অনন্তত্ব থাকিলেও তাহার লক্ষণ প্রকাশ হয় না, কিন্তু এই মানবতনু আশ্রয় করিয়াই স্বয়ং ঈশ্বর প্রকাশিত হন। গীতার কথা—'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষিং তনুমাশ্রিতম্'।"

ভারতের অধ্যাত্ম জাতীয়তার—যেখানে বিশ্বের সর্ব্ব বর্ণ-ধর্ম্ম-সংস্কৃতির মানুষের সম্মেলন সম্ভবপর হইতে পারে —মর্ম্ম ইহারই মধ্যে মিলিবে। আজিকার আত্মবিস্মৃত বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মানস যে অচেতনতার স্তরে নামিয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা আমাদের সুদীর্ঘ সাধনা ও মিশনের মর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছি। শ্রীঅরবিন্দের কথায় আজকের বাঙালী সম্বন্ধে বলা যায়, "The life you lead conceals the light you are." বাঙালীর এই উদার ভাবনার কথা স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিতে ভরসা করিয়াছেন, "নিখিল জগৎ আসে তোমারই পশ্চাতে।"

পাকিস্তানেব অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ভারতে এই অধ্যাত্ম জাগরণের মাহেন্দ্র ক্ষণ সমুপস্থিত। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত:—বাঙালী, উঠ, জাগো, তোমার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মিশন সুসিদ্ধ কর। প্রবর্ত্তকের প্রাণপুরুষ, বাংলার যুগ-দিশারী শ্রীমতিলালের দীপ্ত বাণীরই পুনরুক্তি করিয়া বলি, "হে বাংলার মাতৃব্রতী সন্তানগণ, মাকে আহ্বান করিয়া ঘরে আনিয়াছ। পূজান্তে বিজয়ার বাদ্য বাজাইয়া বিজয় তিলক ললাটে ধারণ কর। মাতৃ-আশীর্ব্বাদপূত হইয়া দশদিকে অভিযানে বাহির হও। জয় তোমার সুনিশ্চিত। অবার সমবেত কণ্ঠে গগন বিদীর্ণ করিয়া বল বন্দেমাতরম্।"

এবারকার বিজয়া বাস্তব তাৎপর্য্যপূর্ণ। সীমান্তে-সীমান্তে আক্রমণোদ্যত অসুরের অট্ট কলরব। দনুজ-দলিনী মায়ের বীরপুত্র! ওঠ, জাগো, অগ্রসর হও। অসুরের রক্তে মায়ের ও মাতৃভূমির পূজা সার্থক করিয়া বিজয়োসব কর। চরিতার্থ হও। 'হতো বা প্রাপ্সসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'।

●

ভারত-ইতিহাসের মোড়-পরিবর্ত্তনের এক অভূত-পূর্ব্ব যুগসন্ধিক্ষণ উপনীত। অলক্ষ্যে মহাকাল লোকক্ষয়ী বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া এই গতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য জঙ্গীশাহী পাকিস্তান নিজের কবর নিজেই রচনা করিতেছে। অসুর আপনার হিংসার ভারে আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। জঙ্গীবাদী আয়ুবশাহীও পড়িবে। অখণ্ড ভারত, অখণ্ড ভারত-জাতীয়তার নবজন্মের মাহেন্দ্র ক্ষণ সমুপস্থিত। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দর্শন: "A free and united India will be there, and the mother will gather around her sons and weld them into a single national strength in the life of a great and united people."

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ভারত-আক্রমণ এই দিক দিয়া আশীর্ব্বাদের মত কাজ করিয়াছে যে, বহু ভাষাভাষী, বিচিত্র ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও মতবাদী মানুষের মধ্যে ঐক্য ও অখণ্ডতার অনুভূতি, এক সার্ব্বজনীন সত্তার বোধটি উদ্বুদ্ধ হইবার আনুকূল্য করিয়াছে। শান্তির সময়ে যাহা মূর্চ্ছিত ছিল, সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া তাহাই জাগ্রত হইয়াছে। বেদনাই চেতনা জাগায়। দেশের মুক্তিলক্ষ্যে ধর্ম্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রাণ সমস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে। কাশ্মীর

হইতে কন্যাকুমারী, গুর্জ্জর হইতে বাংলার ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম, ভাষা এই ভাবগত ঐক্যের পথে বাধা হয় নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী, ইহুদী রণাঙ্গণে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সানন্দে প্রাণ বলি দিয়াছে। ইস্‌লামিক রাজ্য পাকিস্তান বা ভারতের বাহিরে অন্য কোন রাষ্ট্রে ইহার নজীর মিলিবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, ধর্ম্মের গোঁড়ামী, ভাষার অহমিকার উর্দ্ধে এই সামগ্রিক জাতি-সত্তার স্থিতি যাহা একটা অখণ্ড অস্তিত্বে গুণান্বিত। পশ্চিমী 'নেশন' (এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক দেশ প্রভৃতি) ধারণার বহির্ভূত ভারতের এই জাতি-তত্ত্ব—যাহারই পরীক্ষাগার এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। বিচিত্রকে একই সূত্রে গাঁথার—সমাহার করার রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এই উপ-মহাদেশের পরীক্ষাগারে চলিয়াছে (শ্রীঅরবিন্দের কথায় welding them into a single national strength)। এই অভূতপূর্ব্ব জাতীয়তা এখনও স্থায়ী বাস্তব স্বাভাবিক রূপ পায় নাই। সঙ্কটের মধ্যে ইহার গড়ন মাত্র চলিয়াছে। পাক-ভারত সংঘর্ষ-সঙ্কট ইহারই একটা চকিত আভাস, একটা ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি দিয়া গেল মাত্র। তবে অখণ্ড ভারতে এই সার্ব্বভৌম জাতীয়তার তথা বিশ্ব মানবমিলনের পদধ্বনি ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পাকিস্তানের অতর্কিত আক্রমণ ও ভারতের সামরিক জয় রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছে। সাধারণ মানুষের লুপ্তপ্রায় মনোবল ও বর্ত্তমান সরকারের উপর আস্থাও অনেকখানি ফিরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত দল ও মতবাদগত বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে আপদকালীন এই ঐক্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মহিমা। এই সামরিক জয় এবং জাতিগত ঐক্যের জন্য বিশ্বের দরবারেও ভারতের মর্য্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। এক অখণ্ড ভারত, এক জাতি, একপ্রাণতার মৌলিক ভিত্তি বর্ত্তমান ভারতের অর্থ ও রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শের মধ্যে কি মিলিবে এবং সাময়িকভাবে মিলিলেও উহা কি স্থায়ী হইবে? বিশ্বমানব মিলনের বনিয়াদ কি ইহাতে রচিত হইতে পারিবে? পশ্চিমী গণতান্ত্রিক পুঁজীবাদ এবং অর্থনীতিক সমাজতন্ত্রবাদ কি ভাষা-ধর্ম্ম-শ্রেণী-সম্প্রদায়—নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের সর্ব্বোদয়ের সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছে? এই পশ্চিমী জাতীয় জীবন বিকাশের (way of life) অনুকরণ ভারতে কি করিয়া ইহার ফলাফলের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে?

ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শ যে কি তাহা ভারতের প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রপতি ডা: রাধাকৃষ্ণাণ পাক ভারত সংঘর্ষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন: "We are fighting to day not for a piece of territory but for fundamental principles." এই মৌলিক নীতি যে কি, সে সম্বন্ধেও ড: রাধাকৃষ্ণাণ বিস্তার করিয়াছেন: (1) India has a freely-elected Government, a free press, reliance on law and a non-Communal State which respects all religions. (2) We believe in freedom even for those who think differently from us. (3) The interest of democracy demands our victory, otherwise the lamp of freedom will go out in Asia.

বিলাতের একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক জন গ্রীগও গার্ডিয়ান পত্রিকায় ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কথারই সমর্থন করিয়াছেন। পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রীগ্রীগ বলিয়াছেন: "We cannot afford to treat a secular state, with a freely elected Government and a free press on a par with a theocratic state, ruled by a military dictator and with a controlled press."

জন গ্রীগের মতেও "This struggle will decide the fate of free institutions in Asia."

ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আত্ম-স্বার্থ চরিতার্থতার অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি-বিকাশের রাজনৈতিক অধিকার গণতন্ত্রের গোড়ার কথা। গণতন্ত্রের দুর্গ ইংলণ্ড ও আমেরিকার চেহারা পাক-ভারত সংঘর্ষে নগ্ন হইয়া ধরা পড়িয়াছে। পুঁজীবাদ, কায়েমী স্বার্থ, বণিকবৃত্তি যে একটা জাতিকে কতদূর

মিথ্যাচারী, কত ভণ্ড করিয়া তুলিতে পারে তাহা ভারত তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছে। গত আঠার বছরে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে যে ধন-বৈষম্য, জীবন-মানের যে আকাশ পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। প্রায় ৪৫ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর নির্ব্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কোটি কোটি টাকার ব্যয়ের প্রয়োজন সেখানেই দল ও ভোটপ্রার্থীর টিকি বিত্তবানের হাতে বাঁধা পড়িতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

গণতন্ত্র তথা পুঁজীবাদের প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে গিয়া ইতিহাসের পথেই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব। ধনসাম্য, জীবনমানের সমতা, ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন-বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে গিয়া সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রে শুধু রক্তেরই প্লাবন বহে নাই, ব্যক্তি মানুষ যন্ত্র এবং দাসে পরিণত হইয়াছে—ইঙ্গ-মার্কিন গণতান্ত্রিকদের—তথা-কথিত 'free world'-এর ভাষায় ইহা slave world. অবশ্য আত্মবিকাশের পথে মানবসভ্যতা ভাঙ্গা-গড়ার মাধ্যমে আগাইয়া চলিয়াছে এবং চলিবেও। আজকের রাশিয়ার ক্রমবিবর্ত্তন এখানে উল্লেখ্য।

এই দুইটি জীবনধারা, অর্থ ও রাষ্ট্রাদর্শে জোট বিভক্ত আজকের পৃথিবী। ছোট বড় সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি কম বেশী এই দুই জোটের দ্বারাই প্রভাবিত। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ জীবনবিকাশের রীতি এবং আদর্শবাদের ক্ষেত্রেও এই দুইটি মত ও পথের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। এখানেই ভারতবর্ষে ভাবী সংঘর্ষের বীজ নিহিত। জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেই মত-নিরপেক্ষতা আসে না। ইহা হইতে হইলে একটি তৃতীয় মত ও পথের আদর্শানুগ হইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আমরা প্রত্যয় করি, জ্ঞানে-অজ্ঞানে বর্ত্তমান পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ তার স্বতন্ত্র স্বকীয় ঐতিহ্য ও প্রতিভার দিকেই ক্রমাভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে। সাম্প্রতিক পাক-ভারত সংঘর্ষে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক ইঙ্গ-মার্কিন বণিকের নির্লজ্জ শঠতায় লাঞ্ছিত হইয়া সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও রুশীয় আদর্শ-প্রভাবিত পূর্ব্ব ইউরোপের রাজ্যগুলির (যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, পূর্ব্ব জার্ম্মানী) সহিত ঘনিষ্ঠতর হইতে বাধ্য হইলেও, আশা করা যায় নিজের স্বাধীন সত্তা কখনও হারাইয়া ফেলিবে না। কারণ, মানব-সভ্যতার একটা মহৎ সম্ভাবনাকে সম্ভবপর করিয়া তুলিবার জন্যই বিশ্বপ্রকৃতি ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

যুদ্ধ বা যে কোন সংঘর্ষের প্রথম বলি হয় মানবিকতা—ইংরাজীতে যাকে বলা হয় human values—দয়া-দাক্ষিণ্য-করুণা-প্রীতি প্রভৃতি স্বাভাবিক মানবোচিত গুণ-গুলি লোপ পাইয়া পশুসুলভ দ্বেষ হিংসা বিদ্বেষ নৃশংসতা চিত্ত অধিকার করে। মানুষের হত্যায় মানুষের উল্লাস মনস্তত্ত্বের যে অবর পর্য্যায়ে উদ্দীপিত হয় তাহা কেবল অনুত্তেজিত ভাবনার মধ্যেই মাত্র ধরা পড়িতে পারে। বিশ্বজীবনে যুদ্ধ অপরিহার্য্য। নরহত্যাও অনিবার্য্য। কৃতকর্ম্মের গুণাগুণ নির্ভর করে দৃষ্টিকোণের উপর। খানিকটা অনাসক্ত অসঙ্গ ভূমি হইতে দেখিতে না পারিলে দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা আসে না। রাজনীতিজ্ঞতারও পরিচ্ছন্নতা আসে এই সুসমঞ্জস মানসের উপর। গত পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজীর এই মানসিক স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য লক্ষ্য করিয়া আমরা আশান্বিত। অহিংসার প্রবক্তা আচার্য্য বিনোবাজী মন্তব্য করিয়াছেন, "I have tried to be very impartial about the Indo-Pak fight over Kashmir. It is however difficult to ignore that the present trouble was started by Pakishtan. India should fight Pakisthan without any malice or rancour. গত পাক-ভারত সংঘর্ষে বুদ্ধিভ্রংশ আয়ুব-শাহীর উন্মত্ত উন্মাদনার সম্মুখে ভারতের প্রশাসক ও সামরিক বাহিনী যে স্থিরলক্ষ্য, ধীর বুদ্ধি ও শান্ত-সংযমের পরিচয় দিয়াছে তাহাই তাহার জয়ের হেতু হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে।

হিংসা বিদ্বেষ (malice or rancour) না থাকাই শেষ কথা নহে। দ্বেষ-বিদ্বেষ, হিংসা-অহিংসা, ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরেও মানবচেতনার এমন একটা স্তর আছে যেখান হইতে 'হত্বাঽপি স ইমান্ লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে'—হত্যা করিয়াও করা হয় না, নিজেও হত হয় না। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব? গীতাশাস্ত্র

ইঙ্গিতে দিয়াছেন, 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্'। কারণ, 'নিহতাং পূর্ব্বমেব'। মহাকালের গতিপথে ঘটনা ঘটিয়াই আছে, শুধু নিমিত্তমাত্র হওয়া। ইহাই অধ্যাত্ম দৃষ্টি—যোগযুক্ত জীবন—ভারতের কল্পস্বপ্ন অধ্যাত্ম-জাতীয়তার ভিত্তি। গণতন্ত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা সমাজ-তন্ত্রের ব্যক্তিবিলোপ নহে—পরন্তু ব্যক্তি-অহং-এর পরিপূর্ণ উৎসর্গে নবজন্ম। বহু ভাষাভাষী, বিচিত্র ধর্ম্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। ভৌম চেতনার অবতরণ এখানেই হইয়াছে। মানব সভ্যতার সেই আদি আবণ্যক যুগে ঋষিকণ্ঠে প্রথম ধ্বনি উঠিয়াছিল 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। 'খল্বিদং ব্রহ্ম,' 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্'—এই ভারতেরই অনুভূতি। জীবন-দর্শনের এমন সার্ব্বভৌম সামগ্রীকতার নজীর ভারত ভিন্ন আর কুত্রাপি মিলিবে না। এক অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তি এই উদার মানবিক দৃষ্টি। ভারতে প্রধানতঃ হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র তথা রাজনীতিক বা অর্থনীতিক ভিত্তিতে হইবে না—হইবারও নহে। ইহা সম্ভবপর হইবে অধ্যাত্ম ভিত্তিতে—এক বিশ্বপ্লাবী অধ্যাত্ম জাগরণে। অনতিদূর আগামী কালে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' প্রতিশ্রুতি পূরণ করিতে আবির্ভাব হইবে এক অধ্যাত্ম পুরুষোত্তমের—ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিগত আধারে—যে আবির্ভাব এই সার্ব্বজনীন জাগরণ আনয়ন করিবে। এই দিব্য প্রকাশের আধার হইবে বাংলা দেশ যার ইঙ্গিত দিয়াছেন যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দুর্গাস্তোত্রে। বহু দুর্য্যোগ, ভীষণ হানাহানি, অজস্র রক্তস্নানের মধ্যেই আগামী এই আলোর অরুণোদয়। ভারতের প্রতি প্রত্যন্ত দিব্যোন্মাদনায় শিহরিয়া উঠিবে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর দিশাহারা মানুষ নতজানু হইয়া করজোড়ে পথের আলো ভিক্ষা করিবে এই দিব্য ভারতীর দুয়ারে। অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে এই আলোকদিশারী ভারতবর্ষের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন :

Believe, believe, The decree has gone forth, the fiat of the Lord has gone forth. A wonderful, glorious India will come—I am sure it is coming—a greater India than ever was."

সত্যমেব জয়তে !

শ্রীতারাশঙ্কর

অসৎ প্রতিবেশী যখন বাধিয়ে দিলো যুদ্ধ,
আক্রান্ত কি তারপরেতেও দুয়ার ক'রে রুদ্ধ
হবিষ্যান্ন খেয়ে শুধুই নামের মালা জপ্‌বে ?
কাশ্মীর আর কচ্ছ-সীমা শত্রুপদে সঁপবে ?

এমনতরো রসিকতা হয় না কভু সত্য,—
জাত-বেনিয়া 'সামু চাচা' মানবে না এ তথ্য।
কারচুপিতে করিৎকর্ম্মা, নেইকো চক্ষুলজ্জা ;
হাড়েতে তা'র ভেল্কি খেলে ; বাইরে ভদ্র সজ্জা।

ও-দিকেতে 'ষণ্ড জন্'-ও শয়তানীতে সিদ্ধ।
ভগ্ন শৃঙ্গ যদিওবা, জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ ;—
তথাপি তা'র স্বভাবই যে গুঁতিয়ে দেওয়া অন্যে,
আক্রান্তকে হান্‌তে আঘাত তাই সে হ'লো হন্যে।

এদেরি কলকাঠি নাড়ায় 'উনো'-র খেলা চল্‌ছে ;
ভেস্টি-লোকিউশ্যনেতে 'উথাণ্ট' কথা বল্‌ছে।
বল্‌ছে ডিলীরিয়াস্ হ'য়ে : হিন্দুস্থানই দুষ্য।
বল্‌বেই তো। পাকিস্থান যে ওদের প্রিয় পোষ্য।

এদের খুঁটোর জোরেই আয়ুব মেড়ার লড়াই লড়ছে ;
রাষ্ট্রসঙ্ঘের রঙ্গমঞ্চে 'ভুট্টো' নৃত্য করছে।
বোম্বেটে চীন দোস্ত এদের, ইয়াঙ্কি উত্তমর্ণ
দুধার থেকে দুই শরীকে নাচায় ধ'রে কর্ণ।

নাচুক ওরা ; বাদ্যি বাজাক ওদের যতো ভক্ত।
ভারত কিন্তু এর পরেতে বজ্রসম শক্ত ;—
ভয় করে না প্যাটন্, সেব্যর, চীনের চরম পত্র।
চায় না পি. এল্. খাদ্যশস্য, চায় না এটম্-ছত্র।

একলা চলার মন্ত্রে তাদের আজকে নব দীক্ষা।
বৃটেন, আমেরিকার কাছে চায় না কোনো ভিক্ষা।
চল্‌বে ভারত সত্য পথে ; লড়বে ন্যায়ের যুদ্ধ ;—
যাক্ না দেখা কে করে তা'র জয়ের দুয়ার রুদ্ধ ?

বাস্তবে কে পান করেছে কতো মাতৃ-স্তন্য ;
আচরণে সভ্য কে, আর কেই বা পশু বন্য ;—
ইতিহাসই রাখবে লিখে নির্ভুল সে তথ্য।
মিথ্যা যাবে কবরখানায়, জয়ী হবে সত্য।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : আশ্বিন, ১৩৭২ সংখ্যার পর]

মহাশিল্পী পৃথুল অসহায় চিন্তাক্লিষ্ট মুখে এক অসমাপ্ত মূর্তির প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, তখন হাতে তার সেই ক্ষুদ্র লৌহমুদ্গর ও ছেদনী ছিল না। আজ কয়েক-দিনই তার কাজ বন্ধ। ধ্যানের মধ্যে মূর্তির যে রূপ সে কল্পনা কোরতে চেষ্টা কোরছে তাকে সে ধরতে পারছে না। ধ্যানেই যা আসছে না তা বাস্তবে রূপ দেবে কেমন কোরে? তাই তার হাত নিশ্চল। একটা আদর্শ চাই, কিন্তু তা সে পাচ্ছে না। উগ্রতারার মধ্যে যে রূপের দ্যুতি আছে, সে দ্যুতি এ মূর্তিতে অচল। তাই উগ্রতারাকে পৃথুল বিদায় দিয়েছে; কিন্তু উগ্রতারা বিদায় নেয়নি। শিল্পীর শিল্পের সম্পূর্ণতার জন্য সে বহু সুন্দরীকে এনে পৃথুলের সামনে দাঁড় করিয়েছিল—পৃথুলের তাতে মন ভরেনি—তার আকাংক্ষিত নারীমুখ সে পায়নি। ভগ্নহৃদয়ে গভীর বেদনায় শিল্পী মুহ্যমান। স্নানাহারের স্পৃহা তার তিরোহিত, মুখমণ্ডল শুষ্ক ও শীর্ণ। পাষাণের গায়ে ছায়া পড়লো; পৃথুল মুখ তুলে দেখলো, উগ্রতারা একটি প্রস্তর পাত্রে কিছু আহার্য নিয়ে এসেছে। পৃথুল বোললো, আবার এসেছো, নারী!

নতমুখে উগ্রতারা বলে, দেব, এমনভাবে নিজেকে নষ্ট কোরবেন না। জানিনা কিসের অন্বেষণে আপনি সতত চিন্তিত। কিন্তু তাই বোলে কি আহার-নিদ্রা ত্যাগ কোরবেন?

যাও উগ্রতারা, আমাকে একটু একাকী থাকতে দাও। শিল্পের মধ্যে শিল্পী বেঁচে থাকে, উগ্রতারা! কিন্তু আমার শিল্প শেষ হোলো না—অপূর্ণই থেকে গেল। অপূর্ণ শিল্প নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয় নয়? তুমি কি জানবে আমার হৃদয়ের যাতনা!

উগ্রতারা ধীরে ধীরে বলে, শিল্পী, আমাকে নিয়ে তুমি তো অনেক মূর্তিই সৃষ্টি কোরেছ, তবে এই শেষ মূর্তিটিও কি আমাকে অবলম্বন কোরে হয় না?

না, উগ্রতারা না, তা হয় না।

না কেন?

শিল্পী বলে, উগ্রতারা, তোমার রূপ, তোমার মাধুর্য, তোমার সৌন্দর্য—সত্যই দুর্লভ। কিন্তু তোমার রূপের মধ্যে আছে কামনা, বাসনা, অভিলাষের ভাবাধিক্য। আমার ঈপ্সিত মূর্তিতে তা একেবারেই অচল। জানো, এই মূর্তিতে আমি জগন্মাতার প্রস্তর প্রতিমা রচনা কোরতে চাই। প্রতিমার প্রীতি প্রফুল্ল অধরে থাকবে স্নেহ, করুণা, মমতা—বরাভয়তা। তোমার তো তা নেই, উগ্রতারা। যাও, নিজের কাজে যাও।

আজ আমায় প্রয়োজন নেই বোলেই কি এমনি রূঢ়ভাবে আমাকে অবহেলা কোরছেন?

তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা—নারী অনন্তরূপিণী, কিন্তু তোমার মধ্যে মাতৃকামূর্তি কৈ?

আমি যাচ্ছি; কিন্তু আপনি কিঞ্চিৎ আহার্য গ্রহণ করুন।

পৃথুল উগ্রতারাকে কোন উত্তর না দিয়ে, ক্ষণকাল নীরব থেকে তন্ময় হোয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হোলো। উগ্রতারা জলভরা চোখে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল, পশ্চাতের পদশব্দে পেছনে দেখতেই প্রচণ্ড বিস্ময়ে তার মুখ থেকে শুধু বার হোলো, মহারাজ!

মহারাজ স্থাণুদত্ত প্রশ্ন করেন, শিল্পী কোথায়, উগ্রতারা?

এইমাত্র মন্দিরের অন্ধকারময় অভ্যন্তরে গেলেন।

মহারাজ পুনরায় প্রশ্ন করেন, তিনি কি কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন?

ঠিক জানি না, তবে···

তবে?—মহারাজের পাশ থেকে রাজকুমারী চার্বী হেসে ওঠে।

উগ্রতারা অতি ধীরে বলে, শিল্পীকে অসুস্থ ও অস্থির-চিত্ত মনে হোলো। আজ ক'দিন কিছুই মুখে দেননি।

সে কি! চার্বীর মুখে ব্যগ্রতা প্রকাশ পায়।

উগ্রতারা স্নিগ্ধ নিম্নকণ্ঠে একটি একটি কোরে সব কথা রাজার নিকট নিবেদন কোরলো। রাজা চিন্তিত হোলেন—মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য নয়—শিল্পীর মহৎ জীবনের ক্ষতির আশংকায়। রাজকুমারী শিল্পীর সৃষ্ট মূর্তিগুলি একটির পর একটি কোরে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। মহারাজ স্থাণুদত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোললেন, চলো চার্বী, স্কন্দদেবের ইচ্ছা নয় আমার এই মন্দির শেষ হওয়া। অনেক আশা নিয়ে···

বাবা, যাবার আগে একবার শিল্পীর সঙ্গে দেখা কোরে যাবে না?

তুমি তো মা, বুদ্ধিমতী। আমার হুকুম সকলের ওপর চলে, কিন্তু এই শিল্পীর ওপর চলে না। তাঁরা বাস্তবের বাইরে।

একটা বিরাট্ প্রাণ এ ভাবে বিনষ্ট হোয়ে যাবে, বাবা! আর আমরা নীরবে—নিশ্চেষ্টভাবে তাই দেখবো। আমি একবার শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো, বাবা।

বেশ, করো।

রাজকুমারী উগ্রতারার হাত হোতে খাদ্য ও পানীয় লয়ে তারই প্রদর্শিত পথে ধীরপদে অগ্রসর হোলো। একটা বাঁক ঘুরতেই চার্বী দেখতে পেলো, ভূমির ওপর অতি সামান্য শয্যায় শিল্পী শায়িত। মাথার কাছে একটি প্রদীপ টিম্‌টিম্ কোরে জ্বলছে। শিল্পীর নয়ন মুদ্রিত। রাজকুমারী অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলো, শিল্পী!

শিল্পী তাকালো, বিস্মিত হোলো—বিস্ময়ের সঙ্গে তার নেত্র আকর্ণ বিস্তৃত হোলো। রাজকুমারী মধুরস্বরে বোললো, ওঠো, শিল্পী, আহার গ্রহণ করো।

শিল্পী মন্ত্রমুগ্ধের মতন উঠে বোসলো—বিস্ময়বিমুগ্ধ আবেগভরে বোললো, কে তুমি মমতাময়ী, বরাভয়দাত্রী? এমন সুষমাভরা করুণাঘন মুখশশী নিয়ে আমার অন্ধকার কক্ষে আলোকস্বরূপ উদিত হোলে? আমার ধ্যানের মধ্য দিয়ে এতদিন যে তোমারই অন্বেষণ কোরছিলাম দেবী! দাও, দাও, আমাকে খেতে দাও, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। না,—একি আমি স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য স্বপ্ন দেখছি?

রাজকুমারী বলে, স্বপ্ন নয়। আগে এই পানীয় গ্রহণ করো।

পৃথুল এক নিশ্বাসে সেই পানীয় পান কোরলো। পরে বোললো, এতোই যদি তুমি করুণাময়ী, তবে আমার একটি ক্ষুদ্র অনুরোধ রাখতে হবে।

চার্বীর অধরপ্রান্তে ক্ষণপ্রভার ন্যায় ঈষৎ হাসি দেখা দিলো, সে বোললো, রাখবো, নিশ্চয় রাখবো—সেইজন্য তো আমার আসা।

স্কন্দদেব! তোমার অপার অনুগ্রহ! শিল্পী যুক্ত করে দেবতার উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে যেন মনে খানিকটা শান্তি পেলো। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত আহার্য ভক্ষণ কোরলো।

রাজকুমারী বোললো, আজ আমাকে বিদায় দাও। শিল্পী—আবার কাল আমি আসবো। তুমি ক্লান্ত, শ্রান্ত—আজ বিশ্রাম করো।

না, দেবী, এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ; নব উদ্যমে, নবীন উৎসাহে এখুনি আমি আমার কার্য আবার

আরম্ভ কোরবো। কথা দাও, সত্যই তুমি কাল আবার আসবে।

আসবো।

তোমার পরিচয় ?

থাক না অজ্ঞাত। তাতে কি কোন ক্ষতি আছে ?

না—তোমার আসল পরিচয় আঁকা রইলো আমার মানসপটে—ধ্যানে মগ্ন হোলেই যা উদ্ভাসিত হবে মুহূর্ত মধ্যে।

পৃথুল প্রদীপ তুলে ধরে তন্ময়ভাবে রাজকুমারীর মুখশ্রী দেখতে থাকে—হৃদয়ে তার লক্ষ সুরের ঝংকার ওঠে।···

রাজকুমারী ব'লে গেল, কিন্তু পৃথুলের মনোজগতে তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আভা ব্যাপ্ত হোলো। আবেশভরে পৃথুল সেই অসমাপ্ত মূর্তির কাছে এল।

ক'দিন বিরতির পর। পরদিন প্রত্যূষে টুংটাং শব্দে মন্দিরের নিস্তব্ধতা আবার ভঙ্গ হোতে থাকে।···

তারপর মহাশিল্পী পৃথুলের মহাসাধনা একদিন সিদ্ধ হোলো—স্কন্দদেবের মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হোলো।

এরপর এক শুভদিনে স্কন্দদেবের প্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরের দ্বার-উদ্ঘাটন উপলক্ষে এক বিরাট্ পূজার্চনা ও উৎসবের আয়োজন হোলো। দেশ-বিদেশ থেকে বহু শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের এবং বহু জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী ও গণ্যমান্য বরেণ্যবর্গের আগমন হোলো। মন্দিরের সম্মুখস্থ অরণ্যানী ছেদিত হোয়ে প্রান্তরের আয়তন সুবিশাল করা হোলো। শত শত জনসমাগমে উৎসব-মুখর প্রান্তর নানা বেশভূষায় বিচিত্রবর্ণ ধারণ কোরলো। সুবৃহৎ সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নিম্নে বেদীর ওপর সুখাসীন মহারাজ স্থাণুদত্ত মল্লবীরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন কোরছিলেন—একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল ইন্দ্রনীল ও কোদণ্ড, অন্য পার্শ্বে সমাসীন মহারাণী ও রাজকুমারী।

মুহুর্মুহুঃ হর্ষোৎফুল্ল ধ্বনিতে সকলে আত্মহারা।··· সহসা কোদণ্ড মহারাজ স্থাণুদত্তকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিতেই মহারাজ সে বেগ সহ্য কোরতে না পেরে ধরাশায়ী হোলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি ভীম বর্শা শূন্য আসনের ওপর সবেগে পতিত হোলো। উত্থিত হোলো চারিদিকে প্রবল কোলাহল! তৎক্ষণাৎ কোদণ্ড সেই উচ্চ বেদী হোতে নিম্নের জনতার মধ্যে তড়িৎগতিতে লাফিয়ে প'ড়লো। সৈনিকেরা এসে জনতা সরিয়ে দিলে দেখা গেল, কোদণ্ড ও একজন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভুটিয়ার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ হোচ্ছে। সৈনিকেরা ভুটিয়াকে নিরস্ত করার জন্য অগ্রসর হোতেই ইন্দ্রনীল উচ্চস্বরে সৈনিকদের স'রে যেতে আদেশ কোরলো—জানালো ঐ শয়তানকে কাবু করার পক্ষে কোদণ্ড একাই যথেষ্ট। সৈনিকেরা সরে দাঁড়ালো—মহারাজ দাঁড়িয়ে উঠে যুদ্ধ দেখতে লাগলেন—তখন মুখে তাঁর ক্রোধ, বিস্ময় ও আনন্দ একত্র বিরাজ কোরছিল। কিছু পরেই কোদণ্ড আততায়ীকে কাবু কোরে তার বিপুল বপু চক্ষের নিমেষে দু'হাতে ধ'রে মাথার ওপর তুলে, শূন্যে কয়েকবার ঘুরিয়ে দূরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো; আততায়ী কিন্তু মাটিতে পড়েই ক্ষিপ্রহস্তে শাণিত ভোজালি কোষমুক্ত কোরে কোদণ্ডের প্রতি ছুটে এল—কোদণ্ড তখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র! সৈনিকেরা সাহায্যের জন্য ছুটে এলে কোদণ্ড হাত তুলে আবার তাদের নিবৃত্ত কোরলো; তখন সে একাই ভুটিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো, সূর্যের আলোকে ভুটিয়ার হাতের ভোজালি ঝকমক কোরে উঠলো। সমবেত সমগ্র জনমণ্ডলী নির্বাক নিস্পন্দ! তারপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়ের প্রতি রোষকষায়িত হিংস্রভাবে তাকিয়ে পরস্পর ঘৃণিত লোচনে পরস্পরকে পরাজয় করবার সুযোগ অন্বেষণ কোরতে প্রবৃত্ত হোলো। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস হোতে থাকে, অধীর উত্তেজনায় জনতা কিন্তু নিস্পন্দ নিষ্কম্প রইলো—সদাই সবার মনে কি হয় কি হয় রণে!

এক সময়ে ভুটিয়া ভোজালি দিয়ে কোদণ্ডকে আঘাত করবার চেষ্টা কোরতেই কোদণ্ড সাঁ কোরে সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করলো, তবে তার গাত্রবস্ত্রের অনেকখানি খণ্ড খণ্ড হোয়ে গেল। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই—চোখ ঘুরছে ভুটিয়াকে বাগে আনবার জন্য। দ্বিতীয়-বার ভুটিয়া ভোজালি তুলতে-না-তুলতেই কোদণ্ড

বিদ্যুৎবেগে তার কব্জী বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে সজোরে এক ঝট্‌কা মারলো—ভুটিয়ার হাত থেকে ভোজালি খ'সে প'ড়লো। ভুটিয়া আর দাঁড়িয়ে ওঠবার সময় পেলো না—কোদণ্ড তাকে ঝড়ের বেগে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত কোরে ফেললো—তার চোখ, মুখ, নাক, কাণ ধেঁতলে গিয়ে রক্তধারায় মুখমণ্ডল প্লাবিত হোয়ে বীভৎস মূর্তি ধারণ কোরলো—অসহ্য যন্ত্রণায় সে এক বিকট চীৎকার কোরে নীরব হোলো—তার সারা দেহ নিথর, নিস্পন্দ।

দেখা গেল, সেই উন্মত্ত জনতাকে ঠেলতে ঠেলতে, এক হাতে ভৃঙ্গার ও অন্য হাতে পানপাত্র নিয়ে একটি যুবতী ঝড়ের মত ছুটে এসে কোদণ্ডের সম্মুখবর্তী হোয়ে শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বোলছে, প্রভু, আপনি তৃষ্ণার্ত, একটু ঠাণ্ডা জল খান। বোলে ভৃঙ্গার হোতে পাত্রে জল ঢেলে কোদণ্ডকে দিলো। হতবাক্ কোদণ্ড সেই শীতল স্নিগ্ধ জল আকণ্ঠ পান কোরে বোললো, উল্কা!···

আদেশ করুন, প্রভু! আপনার আদেশ মাথায় নিয়ে সেদিন থেকে উল্কা আর প্রভুর কক্ষে প্রবেশ করে না। বোলতে বোলতে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে উল্কার প্রস্থান।

স্থাণুদত্ত বেদীপৃষ্ঠ হোতে নেমে কোদণ্ডের নিকটবর্তী হোয়ে নিজ কণ্ঠের মুক্তিকগ্রথিত রত্নহার খুলে কোদণ্ডকে উপহার দিতে উদ্যত হোয়েই সংযত কণ্ঠে বোললেন, না, যুবক, এ সামান্য মাল্য আমি তোমাকে উপহার দেবো না। বলো, যুবক, তুমি কি উপহার চাও। জেনো, তুমি আজ আমার প্রাণরক্ষা করেছ—তুমি আমার জীবনদাতা। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

মহারাজ! কোদণ্ড বলে, অন্নদাতার প্রাণরক্ষা করাই মহৎ ধর্ম।

তবু আমি তোমাকে পুরস্কৃত কোরতে চাই। বলো, কিসে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

আমার ও আমার বন্ধু কুমারের চির পোষিত বাসনা তো মহারাজের অজ্ঞাত নয়।

কোদণ্ড, তুমি শুধু বীর নও—বুদ্ধিমানও বটে। কিন্তু কোদণ্ড, তোমার যুবরাজের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির সাহায্য কোরতে আমি প্রতিশ্রুত। তবে এই মুহূর্তেই কি তা সম্ভব? আমার পার্শ্ববর্তী মহাক্ষমতাশালী গৌড় র'য়েছে। তাকে অগ্রাহ্য কোরে সুদূর কম্বোজে আমার বাহিনী পাঠানো কি বর্তমানে যুক্তিযুক্ত হবে?

না, মহারাজ!—কোদণ্ড বলে, তবে মহারাজ যদি অনুমতি দেন তো আমি ও যুবরাজ ইন্দ্রনীল গৌড় অধিকার করে আপনার চিন্তা দূর কোরতে পারি।

এতক্ষণ পরে ইন্দ্রনীল বোললো, মহারাজ! গৌড় জয়ের ভার আপনি আমাদের দিন।

মহারাজ বলেন, অবশ্য তোমাদের দু'জনের ওপরই আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তবে···

মহারাজ! সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রধান সেনাপতি বলে, গৌড় জয় করা অতো সহজ নয়।

তা ঠিক সেনাপতি। তবে এঁদের ন্যায় বীরের সহায়তায় গৌড় জয় খুবই কি দুরূহ ব্যাপার?

মহারাজ! উত্তর সীমান্তের অশিক্ষিত ভুটিয়াদের দমন করা আর গৌড় জয় করা এক কথা নয়। তাছাড়া এঁরা এতোই যদি বীর তো নিজেদের দেশ হোতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

সেনাপতি!—কোদণ্ড গর্জন কোরে উঠলো।

কোদণ্ড!—ইন্দ্রনীল স্থিরভাবে বোললো, উত্তেজিত হোয়ো না। প্রধান সেনাপতি যা বোলছেন তা অপ্রিয় হোলেও সত্য। তবে মহারাজ, একটা কথা আমি বোলবো—আপনার ন্যায় নির্ভীক রণদক্ষ নরপতির প্রধান সেনাপতি হবার কোন যোগ্যতা এই কাপুরুষের নেই।

ইন্দ্রনীল!—প্রধান সেনাপতি তার তরবারি কোষমুক্ত কোরলো। স্থাণুদত্ত রোষরক্তিম নয়নে বজ্রনির্ঘোষে বোললেন, সেনাপতি! তুমি ভুলে যাচ্ছো কার পাশে তুমি দাঁড়িয়ে রোয়েছ!

কিন্তু মহারাজ!—সেনাপতি বলে, আপনার সমক্ষে এ অপমান অসহ্য। আমি ইন্দ্রনীলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কোরছি।

কোদণ্ড অধীরভাবে বোললো, তুমি ইন্দ্রনীলের কাছে শিশুর চেয়েও দুর্বল! তারপর সেনাপতির কাছে অগ্রসর হোয়ে, তার তরবারি স্পর্শ কোরে, ঈষৎ ব্যঙ্গ

মানুষ কি চায়

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

অনেকদিন আগে দু'খানা বই হাতে পড়েছিল। জার্মান দার্শনিক নীট্‌শের মতবাদ নিয়ে লেখা। একখানা বইয়ের নাম "গস্‌পেল অব সুপারম্যান", অন্যটির নাম "ফিলসফি অব নীট্‌শে"। নীট্‌শের নানা মতবাদ থেকে নানা উক্তি তুলে দিয়ে সে আলোচনা।

এতদিন পরে সে লেখকদের নাম আর মনে নেই। এবং বইও কাছে নেই। মেয়েদের নানা অবস্থান্তরের সঙ্গে বইগুলিও স্থানান্তরিত হয়ে গেছে।

"গসপেল অব সুপারম্যান"-এর লেখক ঐ বিরাট দার্শনিক সংসার-বিরক্ত-তিক্ত 'বিরক্ত' সিনিক মানুষটির বিশেষ বিশেষ মতবাদের নানাদিক ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। যার একটী প্রতিপাদ্য বিষয় হল "এ যুগে আর 'ঈশ্বর মানার দরকার নেই'। অথবা 'ঈশ্বরই নেই'! মানুষই সুপারম্যান হয়ে মহামানব হয়ে বলিষ্ঠ মানবসত্তা রূপে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের অভাব মিটিয়ে দেবে!" ঐ মতবাদের কার্যকারণও খুঁজে নির্ণয় করার দিকনির্ণয়ও করেছিলেন। তাতে ছিল নীট্‌শের বিশেষ দর্শনের ও বিশেষ বিশেষ বইয়ের আলোচনা যেমন "বিওণ্ড গুড্ এন্‌ড্ ইভ্‌ল", "জরথুষ্ট্রের বাণী" ইত্যাদির মতবাদ দর্শন।

আর ছিল ঈশ্বর খোঁজার একটী রূপক কাহিনী "এক দার্শনিকের দিনের আলোয় প্রদীপ নিয়ে ঈশ্বর অন্বেষণ"···।

'গসপেল অব সুপারম্যান্'-এর লেখক বলেন—নীট্‌শের একটী মতবাদ হ'ল এক সগুণ মানুষ ঈশ্বর। 'সুপারম্যান' অথবা মহামানব। যাতে হিন্দু-দর্শনেরও একটা বিশেষ মত পাওয়া যেতে পারে—'সোহম্' মতবাদের। কিম্বা হিন্দুর ঈশ্বরাবতার বাদ।

কিন্তু দু' মতে প্রভেদ এই, হিন্দু-দর্শনে যখন মানুষ 'সোহম্' হয়ে ওঠেন, 'তিনিই আমি' 'আমিই তিনি' হন, তখন ঈশ্বরের মতই নির্লিপ্ততাও পান। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভাবে ভাবিত হয়ে যান। অবতারেরও একটী লোকোত্তর গুণময় দেবসত্তা থাকে।

নীট্‌শের দর্শনে কিন্তু 'সুপারম্যান' (রূপী ঈশ্বর) এক উগ্র রুদ্র বলিষ্ঠ মতবাদী মানব ঈশ্বর। 'সুপার ম্যান' যেন রুদ্রের প্রকাশ।

'গস্‌পেল অব সুপারম্যান'-এর লেখক নীট্‌শের এই ধরণের নানা মতবাদকে এক জায়গায় সাজিয়েছেন। অবশ্য আমার যতদূর মনে আছে। তাতে নানা উক্তি তুলে দেওয়া আছে নীট্‌শের। দুর্বলের বিরুদ্ধে, ক্ষুদ্র

কোরে বোললো, এই অস্ত্র নিয়ে তুমি ইন্দ্রনীলের সঙ্গে যুদ্ধ কোরবে?

নিশ্চয়ই!

কোদণ্ড তরবারিখানি ইন্দ্রনীলের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, দেখ, বন্ধু, এই অস্ত্র তোমার দেহে আঘাত করবার উপযুক্ত কিনা।

ইন্দ্রনীলও হাসিমুখে তরবারিটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে, হাসিতে উৎফুল্ল হোয়ে, অস্ত্রের মাঝখানটা নিজের বাঁ জানু মুড়ে তার ওপর রাখলো আর সঙ্গে সঙ্গে অসির দুই প্রান্তে দুই হাত দিয়ে চাপ দিতেই সেটি দুই খণ্ড হোয়ে ভূমিসাৎ হোলো! জনমণ্ডলী আত্মবিস্মৃত হোয়ে তুমুল জয়ধ্বনি কোরে উঠলো! সেনাপতি লজ্জায় নতমুখ, রাজা হর্ষোৎফুল্ল! ইন্দ্রনীল নিজের ভার সুবৃহৎ তরবারিখানি অতঃপর কোষমুক্ত কোরে সেনাপতির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বোললো, পারো ত ভগ্ন করো আমার এই অসি।

সেনাপতি ইন্দ্রনীলের তরবারিখানি তুলে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে বোললো, আমায় ক্ষমা করো, যুবরাজ! গৌড়বিজয় একমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। আর সেই অভিযানে এই হতভাগ্যকে যদি সঙ্গে নাও তো সে নিজেকে ধন্য মনে কোরবে।

ইন্দ্রনীল সেনাপতিকে জড়িয়ে ধ'রলো, মহারাজ স্থাণুদত্ত প্রশান্ত মনে উচ্চহাস্য কোরে উঠলেন।

(ক্রমশঃ)

ভাবের বিরুদ্ধে, মেয়েদের বিরুদ্ধে, যে কোনো দুর্বলতার বিরুদ্ধে, দাস মনোভাবের বিরুদ্ধে। এবং সেগুলি ঈশ্বর উক্তির মত নির্গুণাত্মক তাও নয়; মহামানব-উচিত অবতারোচিত কোমল করুণাময় সকরুণ সদয় সহৃদয়ও নয়। যা' আমরা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধাদি চৈতন্য, রামকৃষ্ণাদিতে পাই।

বেশ দৃঢ় আপাত সত্য অসত্য নিয়ে তিক্ত বা কটু উক্তির সমাবেশ।

এ মতবাদের কথা ঐ পণ্ডিতরা ভেবেছেন ও ভাববেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

"ফিলসফি অব নীট্‌শে" বইখানি অত বড় নয়। এ বইখানি হ'ল নীট্‌শের প্রবল সমস্ত মতবাদের একটী মতের সার সংকলন। এবং একটী মাত্র উক্তিতে তাকে রূপ দেওয়া।

সেটা হচ্ছে এই যে, 'মানুষ কি চায়'? জীবনে সংসারে সমাজে তার সবচেয়ে বড় চাওয়া কি? কিসে তার মোহ? কবির ভাষায় মানুষের সেই চাওয়াকে সাজিয়ে বলার চেষ্টা করি।

কবি বলেছেন:

বহু দিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;
ধন নয় মান নয় একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
... ...
অন্তরের ধ্যানখানি, লভিবে সম্পূর্ণ বাণী,
ধন নয় মান নয় আপনার ভাষা
করেছিনু আশা!
... ...
বহুদিন মনে ছিল আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তায় শেষ সুধা
ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।
... ...
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা
কাছে এলে দুই চোখে কথা ভরা আভা
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

হ্যাঁ। এইসব কথা। আমরাও পড়ে মুগ্ধ হয়ে ভাবি আমাদেরও সব চাওয়া এই! সব এই! কিন্তু সত্যই তাই?

কবি কি শুধু এইটুকুই চেয়েছিলেন? মানুষও কি শুধু এইগুলিই চায়?

না। মানুষ শুধু এইটুকুই চায় না। এবং কবিরও ওই চাওয়াটা কোনো সময়ের নির্বেদ বেদনাময় অন্তরের একটা বিশেষ মুহূর্তের একটী চাওয়াকে রূপ দিয়ে প্রকাশ করা। শুধু এইটুকুই পৃথিবীতে তাঁর চাইবার ধন ছিল না। ওই চাওয়া হ'ল মহাকবির হৃদয়ের ভাষায় রস-সাহিত্যের একটী আশ্চর্য মুহূর্তের ভাবের ভাষাময় রূপ। কিন্তু এ হ'ল কবি আর রস-সাহিত্যের কথা মাত্র। সাধারণ আমাদের কথা হ'ল মানুষ যে কি চায় তা সব সময়ে নিজেই জানে না। নিজেই বোঝে না।

কি যে সে চায় যুগযুগান্ত ধরে তার স্বরূপ সে খুঁজে বেড়িয়েছে। প্রশ্ন করেছে নিজেকে;—প্রতিষ্ঠা? যশ? ধর্ম? কর্ম? জ্ঞান? ধন? ভক্তি? প্রেম? মুক্তি? সে কি জিনিষ? এবং সে কি একটী জিনিষ?

না। সে তার একটিকে পেলে সে অন্যটির দিকে হাত বাড়ায়। সেটার সাধ মিটলে বা সঞ্চয় করা হলে আবার একদিকে হাত বাড়ায়। হয়ত একসঙ্গেই এলোমেলোভাবে সব চায়। হয়ত চতুর 'ঈশ্বরী পাটনী'র মত 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এমন চাওয়াও চায়।

এই মানুষের চাওয়ার স্বরূপ। যার শেষ নেই। সীমা নেই।

... ...

হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রবেত্তারা এই চাওয়ার সব

রূপকে সমগ্রভাবে কখনো কখনো খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখেছেন, তার আর মানুষের স্বরূপকে দেখেছেন।

তাই হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনমতে যখনি তাঁরা মহামানব হয়েছেন, অবতার হয়েছেন, তখনি ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠাকে 'অস্পৃশ্য' 'অবেধ্য' মনে করেছেন। ধনজন যৌবনকেও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মনে করেন নি। সাধারণ ধর্মকর্মকেও অনুষ্ঠানভাবে দেখেছেন। জ্ঞানও তাঁদের বাহিরের পাওয়া সম্পদ নয়;—নিজেকে মানা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই তাঁদের জ্ঞান। আর সব জ্ঞান অবিদ্যা অজ্ঞান। বাকি থাকে ভক্তি মুক্তি। সে ভক্তি ঈশ্বরভক্তি। সর্বভূতে যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বর দর্শন।

কিন্তু নীট্‌শের মহামানব বা সুপারম্যান-এর দর্শন এ দর্শন নয়।

তাই তাঁর মহামানবের ঈশ্বর রূপ হ'ল ওল্ড টেস্‌টামেণ্টের সর্বশক্তিমান শক্তিময় ঈশ্বরের এক রূপ। আর নিজের মনগড়া এক সুপারম্যান রূপ। যদিও সুপারম্যানের সত্য স্বরূপ ও ঈশ্বর রূপ তাঁর স্পষ্ট করে বলা হয় নি। (সেই সুপারম্যান?) এবং সেই মানুষের চাওয়ায় স্বরূপ তত্ত্ব তাঁর কাছে দেখা দিল will to power রূপে। ক্ষমতাপ্রয়োগবাদ ও ক্ষমতা অধিকারের রূপে। প্রবল প্রতাপের আকাঙ্ক্ষা রূপে।

ফিলসফি অব্ নীটশের লেখকের মতে নীট্‌শের মানব স্বরূপের মূল চাওয়া হচ্ছে-ধন নয়, বিলাস ঐশ্বর্য নয়, মান-খ্যাতি-যশ নয়, প্রেম নয়, দয়া মায়া করুণা নয়;—এইসব সাধারণ জাগতিক সুখ এবং গুণ নয়—তাঁর মতে মানুষ চায় ক্ষমতা। আধিপত্য 'উইল টু পাওয়ার'। তিনি বলেছেন মানুষের চরিত্রে এই চাওয়া, এই আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতার এই মোহ—এর চেয়ে বড় মোহ আর নেই।

সাধারণ জগতে এ যে কত বড় সত্য তা' আর জগতে যুগে যুগে জানতে কারুর বাকি নেই। স্বেচ্ছাচারী বাজারা ছিলেন যাঁরা চিরকালই নানারূপে আছেন বিশেষ করে এ যুগে একনায়কতন্ত্রের প্রবলতার যুগেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নীট্‌শের সুপারম্যানও কি তাই হতে চাইবেন? এই মানুষের প্রশ্ন। তাহলে তাঁর এ যুগে যে ঈশ্বর সুপারম্যান হয়েই আসবেন, সে ঈশ্বর কেমন? এবং এই মতে সুপারম্যান বা মহামানবই ঈশ্বর,—সে ঈশ্বরবাদই বা কেমনভাবে লোকে নেবেন?

সে সব যাই হোক 'সুপারম্যানরূপী ঈশ্বরতত্ত্ব' নীট্‌শের দর্শনের থেকে—তাঁর স্বরূপ নির্ণয় নীট্‌শে তত্ত্বজ্ঞরাই করবেন।

কিন্তু তাঁর মতে মানুষ কি চায়, কিসে তার সবচেয়ে বেশী মোহ, ধন-জন-মানের যশের প্রতিষ্ঠার মোহ ত্যাগ করলেও সব জিনিষ সব বস্তু পাওয়ার পরেও অন্তরের অতলে যা' থেকে যায় তা হচ্ছে ঐ ক্ষমতার মোহ। আর তা হল ক্ষমতার অহংকারের যে স্বরূপ যা' সাধারণ মানুষ লুকোয় না, দম্ভভরে প্রচার ও প্রকাশ করে। কিন্তু যাঁরা ধার্মিক জ্ঞানী ত্যাগী পুরুষ তাঁদের অন্তরেও সেটা, দেখা যায়, গোপন অবচেতন মনে থেকে যায় সময়ে সময়ে। নীট্‌শের দর্শনের মতে সেইটাই হল মানুষের স্বভাব বা চরিত্র। যেটা সর্বত্যাগের পরও থেকে যায় দেখা যায়। থেকে যেতে পারে। সর্ব ভোগের পারেও অতিক্রম করেও যার একটা স্বরূপ আছে। যার ফলে দেখা যায় মুনি বিশ্বামিত্রের জগত সৃষ্টি; দুর্বাসার অম্বরীষকে অভিশাপ দেওয়া,—আরো কত ছোট বড় মানুষে এই ক্ষমতার প্রয়োগ-লীলা পাওয়া যাবে সর্বত্রই। সর্বত্যাগী চরিত্রেও কত সময়ে এই ক্ষমতার মোহ সবাই দেখেছেন।

এই শতকেই এ যুগে ঐ ক্ষমতা দর্পের প্রচণ্ড প্রকাশ আমরা দুই মহাযুদ্ধের দুই মহানায়ককে দেখেছি—কাইজার (দ্বিতীয়) আর হিট্‌লার চরিত্রে। তার আগের শতকে নেপোলিয়নে। আর সাধারণ অসাধারণ প্রায় সর্বত্রই দেখা যাবে মানুষ চায় সব চেয়ে বেশী ক্ষমতা। এবং নীটশের মত সত্য। এবং হিন্দু দর্শনের মত হ'ল সবচেয়ে বড ত্যাগ, প্রতিষ্ঠাব মোহ ত্যাগ। কিন্তু সে মোহ সব ত্যাগের পরও গোপন মনে অশথ গাছেব মত গোপন শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে থাকতে পারে। হয়ত ক্ষুদ্র অঙ্কুররূপেই বেঁচে থাকে মানুষের নিজের অজ্ঞাতে। সর্বত্যাগীর যশের প্রতিষ্ঠার মোহকে মহাপ্রভু "শূকরী বিষ্ঠা" বলেছেন।

কিন্তু সর্বত্যাগের পর যে ক্ষমতা লাভ ও লোভের মোহ থেকে যায় সেই মোহের পার হবার কি উপায়?

ছায়াজাল

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিচেরী স্টেশন। রাত আটটা।

আমাদের বগী রয়েছে সাইডিং-এ। কিছুক্ষণ হল আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। যে ট্রেনের সঙ্গে আমাদের স্পেশ্যালের বগী যুক্ত হয়েছিল ভেলুপুরম স্টেশনে, সেখানা যথাসময়েই বেরিয়ে গেছে। কেটে রেখে গেছে আমাদের।

নীচে নেমে দেখি লাইনের পাশে একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে খান দুই বেঞ্চ পাতা হয়েছে। একটা পেট্রোম্যাক্সও জ্বলছে। আমাদেরই সহযাত্রীদলের কয়েকজন বসে আলোচনায় মগ্ন।

আমাদের সঙ্গে একজন ডাক্তার ছিলেন। চন্দননগর থেকে সপরিবারে এসেছেন। তিনি যে ডাক্তার—জানা ছিল না। তাঁর নিজের মুখের স্বীকারোক্তি শুনে বুঝলাম, হ্যাঁ তিনি ডাক্তারই। তবে ডিগ্রীর পিছনে ছোট করে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা (এইচ)। সেটা তাঁর নেমপ্লেটে শোভা পায় নিশ্চয় বাড়ির দরজায়!

তিনিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন: ওই যে মেয়েটিকে দেখছেন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে……

একটি মেয়েকে দেখলাম বটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে। বয়েস আঠারো-উনিশ হবে। আমাদেরই দলের সঙ্গে এসেছে। তবে এত সাধারণ তাকে দেখতে যে, কোনোদিন দেখেও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। হয়তো পাশের কামরায় থাকে।

বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি বটে…

ওই মেয়েটির হঠাৎ পায়ে চোট লাগে মাদ্রাজ-এগমোর স্টেশনে।—ডাক্তার বললেন: ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে ডান পা-টা মচকে যায়। এত যন্ত্রণা যে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমাকে দেখায়। আমি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার! হাড়ের কী বুঝি? তবুও আর্নিকা দিই হাইয়ার ডাইলুশনের। ব্যথা মরে যায় শুনেছি। কিন্তু সন্দেহ হয়, ভিতরে কিছু গোলমাল হয়েছে। হয়তো হাড় সরে গেছে। সে কথা সাহস করে বলিনি। বেচারী মাসির সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। এখনই যদি সে কথা জানাই, কর্তৃপক্ষ হয়তো ওদের এয়ারে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। তাতে মাসিরও আর তীর্থভ্রমণ হবে না। কারণ ওই মেয়েটি মাসির গলার হার। মাসির পয়সাও আছে শুনেছি। তবে শেষদিকে একদিন বলব, কলকাতায় ফিরে গিয়ে যেন ও পায়ের একটা এক্স-রে নেয়। দেখুন দেখি, কী গ্রহ!

গ্রহ বলে গ্রহ! দত্তমশায় বলে এক ভদ্রলোক আমাদের দলে ছিলেন। তিনি বললেন, আরে মশাই, আমারই তো পিসিমা! ইয়া শক্ত-সমর্থ চেহারা। একা রান্না করে পাঁচশো লোককে খাওয়াতে পারেন। আর-বছর বাথরুম থেকে বেরুলেন। ঠিক সন্ধ্যের মুখটা। কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ একটা হোঁচট খেলেন। আর পায়ের মালাইচাকিটা এক হাত বেরিয়ে পড়ল। সে কি বিপদ রে বাবা। ডাক্তার-কবিরাজ—কেউ আর বাদ রইল না। ঠিক একটি বছর ভুগলেন। এক্স-রে হল। তাতেও সুবিধে হল না।…এই কদিন হল, একটু উঠতে-হাঁটতে পারেন। কী গ্রহ না কী গ্রহ! হোঁচট খাবার দু'মিনিট আগেই কি তিনি জানতেন, এই অবস্থা আসবে? নিয়তি…

তবে শুনুন স্যার!—বিশ্বাস-মশায় নামক এক

পথ কি? সেই চাওয়ার পারে উত্তীর্ণ হবার পথ অবশ্য হিন্দু-দর্শনে আছে নানাভাবে—নানা উপদেশে। কিন্তু নীট্‌শে তো ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ বলিষ্ঠতাকে সমর্থনই করেছেন। যে চাওয়া এক মহাসমুদ্র। নীট্‌শের মতে সেইটাই মানুষের প্রবলতম চাওয়া (মোহ অহঙ্কারের, মনের?)। এবং প্রশ্ন জাগে তবে কী একালেই আমরা ঘরে-বাইরে রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মে সাহিত্যক্ষেত্রে ঐ চাওয়া ঐ ক্ষমতার মোহের পিছনে নরনারী জ্ঞানী-ধনী-ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে চলেছি? না, সব কালেরই মনুষ্যচরিত্র এমনি?

ভদ্রলোক গলা এগিয়ে দিলেন : যদি নিয়তিই বললেন, তবে আরেকটু শুনুন। নোতুন বিয়ে করে বর চলেছে নিজের বাড়িতে। সঙ্গে কনেবউ। অপূর্ব সুন্দরী যাকে বলে। আর সঙ্গে পুরোহিত, নাপিত, বরের বাবা, বরের ছোটভাই। একই ট্রেনে আমরা চলেছি। হালিশহর থেকে ট্রেনখানা আসছে কলকাতার দিকে। বর অনেকক্ষণ ধরে উস্‌খুস্ করছে। জাতে ধূর্ত নাপিত। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, বর কি চায়। চুপি চুপি জিগ্যেস করল তাকে, সিগারেট খাবে তো? লজ্জা কি? দরজার দিকে দাঁড়িয়ে খেয়ে এসো না। বাবার সামনে খেতে সঙ্কোচ হচ্ছে—এই তো? যাও খেয়ে এসো···

ট্রেনটা সিগন্যাল না পেয়ে পথের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মুখে সিগারেট রেখে বর দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। দু'হাত দিয়ে দেশলাই জ্বালতে গেছে। ঠিক এমনি সময় ট্রেনটা অতর্কিতে দিল ছেড়ে হেঁচকা টানে। আর পড় তো পড়, বর একেবারে বাইরে পড়ল ছিটকে উল্কার গতিতে। ট্রেন থামিয়ে যখন তাকে উদ্ধার করা হল, তখন দেহটাই শুধু আছে। সে-দেহে প্রাণ নেই। দেহটা থেঁতলে গেছে একটা লাইট পোস্টের ধাক্কা খেয়ে। ভলকে ভলকে রক্ত উথলে পড়েছে মুখ দিয়ে। ভাবুন দেখি, কী মর্মান্তিক দৃশ্য! বরের বাবার সব চেয়ে বড় অহঙ্কার ছিল, সুন্দরী বউ আনছেন ঘরে। সে বউয়ের ভাগ্যে এই লেখা ছিল? বরই কি জেনেছিল এক মিনিট আগে—এই তার হাল হবে? আমাদের চোখের সামনে এই ব্যাপার ঘটেছে। আমরা তো তাদের কেউ নই। তবু দু'চোখের জল রুখতে পারলাম না। এখনো সে কথা মনে এলে—কেমন যেন হয়ে যাই। নিয়তি ছাড়া আর কি বলা যায়? ভগবান কার প্রতি যে কী বিধান দিয়েছেন, তিনিই জানেন। মানুষের বোঝবার ক্ষমতা নেই।

হালদারমশায় নামক আরেক ভদ্রলোক শুরু করলেন।—তাহলে আমার ব্যাপারটাও বলি। সেবার আসছিলাম নৈহাটি থেকে শিয়ালদার দিকে। বেলা তখন দুটো। ইছাপুরে ট্রেন থেমেছে। এক বুড়ী উঠল গাড়িতে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে। সঙ্গে বুড়ীর চারটে নাতনী। ষোল বছর থেকে শুরু করে তিন বছর পর্যন্ত। বুড়ীর বউ-এর গালও ভেসে যাচ্ছে দুটী চক্ষের জলে। সঙ্গে তাদের এক বেটাছেলে। সে নাকি খোলা চায়ের ব্যাপারী। দোকান আছে তার ইছাপুরে। লোকটি বসবার জায়গা না পেয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। বুড়ী, তার বউ ও নাতনীরা কাঁদছে দেখে আমরা কোনোক্রমে তাদের বসবার জায়গা করে দিলাম। দুএকজনকে উঠেও দাঁড়াতে হল। পরে যা শুনলাম, এই—বুড়ীর ছেলে আজ নাকি বেলা দশটার সময় মালগাড়ির ধাক্কা খেয়েছে। বুড়ীর ছেলে বদ্ধ কালা। বয়েস পঞ্চাশের উপর। ওই লোকটির দোকান থেকে চা নিয়ে বাইরে বেচতে যেত। আজও যাচ্ছিল। এক হাতে ছাতি, অপর হাতে ব্যাগ। লাইন পার হচ্ছে, এদিকে মালগাড়ির পিছন দিকটা যে তার সামনে এগিয়ে আসছে—বুড়ীর ছেলের সেদিকে হুঁশ ছিল না। কে একজন সতর্ক করবার জন্য ডেকেও ছিল নাকি তাকে। কিন্তু শুনতেই যদি সে পাবে, তাহলে আর দুর্ঘটনা ঘটবে কেন? নিয়তি বলা যাবে কাকে? মাথায় ছাতি। বুড়ীর ছেলের চোখ বন্ধ। দুটি পা এক করে সে হুড়মুড় করে পড়ে যায়। এই সংবাদ পাওয়ামাত্রই সোদপুর থেকে বুড়ী, তার বউ আর নাতনীরা অভুক্ত অবস্থায় ছুটে আসে ট্রেনে করে। স্টেশন থেকে দেহটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে। চা-ব্যাপারী লোকটি তাদের সঙ্গ দিয়ে নিয়ে গিয়ে উঠেছিল স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানে গিয়ে শোনে, রোগীকে নাকি ঘণ্টা দুই রেখে কলকাতাতে বদলী করা হয়েছে। তারা তাই শুনে ফের ট্রেনে উঠেছে। কলকাতার হাসপাতালে যাবে। দেখবে—কেমন আছে।

আমরা শুনে সান্ত্বনা দিলাম, তবে আর ভয় কি? দেখবেন ঠিক বেঁচে যাবে। না হয় পা দুটো জখম হবে। প্রাণে মরবে না।

বুড়ী চোখের জল মুছে বললে, তাই যেন হয় বাবা। তোমাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ছেলে বেঁচে থাকলেও মুরাহাতি লাখ টাকা!

কী করে মরাহাতি লাখ টাকা হবে বুঝতে পারলাম না। এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে চা বেচে কতই বা হয়? খেতেই কুলোয় না, তার ওপর চার চারটে মেয়ে বুকের ওপর। এদের শিক্ষা আছে, গ্রাসাচ্ছাদন আছে, ভবিষ্যতে বিয়ের ভাবনা আছে। এসব ভাবতে বসলে যে সুস্থ মানুষও পাগল হয়ে যায়!

তিন বছরের মেয়েটি মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর দিকে চেয়ে চোখের পলক পড়ল না। যেন একটি সুন্দর ফুল! ওকি জেনেছে কিছু? অন্যান্য মেয়েগুলির চোখে জল। বড়টি উদাস হয়ে চেয়ে আছে। মনটা বলতে লাগল, যদি ওদের বাবা সত্যিই চলে গিয়ে থাকে? তখন? তখন কী হবে? ভিক্ষে করবে ওরা? ভিক্ষেই বা কে দেবে? বাস্তহারা হবে? তাতেই বা সান্ত্বনা কই? সরকারী টাকায় চালাবে? হায় রে···

চা-ব্যাপারী লোকটি—যে ওদের সঙ্গ দিয়েছে, উঠে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করলাম। লোকটি যা বললে—শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এমনটা ভাবতে পারিনি। স্থানীয় হাসপাতালে বুড়ীর ছেলেকে নাকি দুঘণ্টা এমনি-এমনি ফেলে রাখা হয়। সেখানেই সে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তারপর তাকে পাঠানো হয়েছে কলকাতার বড হাসপাতালে। বুড়ীর ছেলে যে মারা গেছে—এ কথা এখনো ওদের জানানো হয়নি। শুধু সময়ক্ষেপ করবার জন্যই ওদের নিয়ে যেতে হচ্ছে। মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। উপায় কি?

যে বউটির হাতে এখনো শাঁখা, মাথায় সিঁদুর, কয়েক ঘণ্টা পরেই যে তার কী হাল হবে—কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। আজ সকালেও কী কেউ জেনেছিল—জেনেছিল বুড়ীর বউ, যে তার বৈধব্যযোগ একেবারে হাতের নাগালে? বুড়ীর নাতনীরা কি ঘুম থেকে উঠে একবারও কল্পনা করতে পেরেছিল—আর তারা তাদের বাবাকে জীবনে কাছে পাবে না? নিয়তি ছাড়া আর কী বলব?

যতীন মৈত্র ছিলেন সামনে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

বললেন, বল খেলতে গিয়ে কেউ বিপাকে পড়ে শুনেছেন?

কী রকম? একজনের প্রশ্ন।

তাহলে শুনুন ব্যাপারটা।—যতীনবাবু শুরু করলেন: আমার এক বন্ধু ছিল। নাম তার ধীরেন। উত্তরপাড়ায় থাকত। সে প্রায় ২৪।২৫ বছর আগের কথা। ধীরেনের মতো পাকা ফুটবল প্লেয়ার আমাদের ব্যাচে আর কেউ ছিল না। যেখান থেকে যত ম্যাচের নিমন্ত্রণ আসত, আমরা গ্রহণ করতে সাহস না করলে কি হবে, ধীরেন ঠিক অ্যাক্সেপ্ট করে বসে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতাম, ধীরেনের জন্যে আমরা জিতে গেছি। সেই ধীরেন বিয়ে করল। ছেলে হল। ছেলে যখন দু'বছরের, একটা ম্যাচের নিমন্ত্রণ পেলাম। খেলার দু'দিন আগে ধীরেনের বাড়ি গেছি, ও বললে, বড় খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি ভাই।

কী স্বপ্ন?

যেন খেলার মাঠ থেকে আমাকে ধরাধরি করে নিয়ে লোকে কি-একটা গাড়িতে ঢোকাচ্ছে। গাড়িটাকে দেখতে অ্যামবুলেন্সের মতো।

সেকি?—বললাম, তাহলে তুই খেলতে যাসনি।

দূর বোকা!—ধীরেন বললে, একটা তুচ্ছ স্বপ্ন আমাকে খেলা থেকে নিবৃত্ত করবে?

জিগ্যেস করলাম, স্বপ্ন তুই মানিস কিনা?

মানি আর না-মানি—সেকথা আলাদা। আমি খেলতে যাবই।

খেলা যেদিন শুরু হবে—তার দু'ঘণ্টা আগে আমরা সদলবলে গেলাম ধীরেনের বাড়ি। ধীরেনকে ডাকতে। সেখানে গিয়ে দেখি, ভয়ানক অবস্থা। ধীরেনের দু'বছরের ছেলে উঁচু রক থেকে মাটিতে পড়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক হল, তার জ্ঞান ফিরে আসেনি। ধীরেন ডাক্তারবাড়ি গিয়েছিল। ফিরে এসে ছেলেকে নিয়ে ফের হাসপাতালে যাচ্ছে। এই অবস্থায় কী করেই বা তাকে বলি, চল খেলতে?

আমরা মনমরা হয়ে পড়লাম। খেলাটা কাঁচিয়ে দিতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু তখনো দেখলাম ধীরেনের উৎসাহে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। ও বললে, তোরা এগিয়ে যা, আমি ঠিক সময়েই যাব। খেলা বন্ধ করা চলবে না।

এই অবস্থায় না গেলেই নয়? আমরা ধীরেনকে প্রতিনিবৃত্ত কববার চেষ্টা করলাম। ধীরেন সঙ্কল্পে অটল। বললে, না, তা হয় না। ছেলে বাঁচুক আর মরুক—খেলবই।

খেলতে গিয়ে দেখলাম, যথাসময়েই ধীরেন এসে হাজির। ছেলের অবস্থা একটু ভালো। হাসপাতালে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

দুর্দান্তভাবে ধীরেন খেলতে লাগল। কোন্ দিনই বা সে এমন খেলেনি? কিন্তু মনে হল, আজ যেন তার উৎসাহের পলতেতে কে সযত্নে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। প্রতিপক্ষ টিম বিশেষ নামকরা। তাদের হারানো খুবই শক্ত। কিন্তু ধীরেনের দিকে চেয়ে আমাদের আজ মনেই হল না, আমরা হারব। যদি কেউ হারে—তবে ওই প্রতিপক্ষ টিম! তাই যেন করে ভগবান। প্রতিপক্ষ টিম থোঁতামুখ ভোঁতা করে বাড়ি যায়।

আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম বিপক্ষদলকে হারাবার।

এমন সময় কী যে হল—কিছুই বুঝতে পারলাম না।

পেটে হাত দিয়ে ধীরেন বসে পড়ল। সমস্ত মুখ ছেয়ে তার কাতর যন্ত্রণার স্বাক্ষর।

কী হল? কী হল?—আমরা হইচই করে উঠলাম।

আমাদেরই দলের মানিক বললে, ধীরেনের পেটে বল লেগেছে।

খেলতে গেলে বল তো এরকম কতই লাগে। এর আগে কি লাগেনি?

কে দেবে উত্তর? ধীরেন সেই যে বসে পড়ল, আর দাঁড়াতে পারল না। শুয়ে পড়ল।

তারপরের ঘটনা ধীরেনেরই স্বপ্নের অনুরূপ।

এল অ্যামবুলেন্স। ধীরেনকে ধরাধরি করে তার মধ্যে পোরা হল।···

তারপর মাসখানেক কেটে গেল।—

ধীরেনের বউকে আমরা বউদি বলতাম। যদিও ধীরেন আমাদের বয়সে ছোট।

একদিন দেখতে গেছি বউদিকে, দেখি সে তার ওই অতটুকু ছেলেকে বল খেলা শেখাচ্ছে। পরনে তার থান। হাতে দু'গাছা মাত্র চুড়ি। কিন্তু বিধবা হওয়াতে ভেঙে পড়ার লক্ষণ তার শরীরে কোথাও নেই। ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেই যেন সে প্রস্তুত। যে নিয়তি তার স্বামীকে সরিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে—বিশ্বসংসার থেকে, তাকে যেন সে অগ্রাহ্য করতেই চায়। ভাগ্যের পায়ে দুর্বল দিতে নতিস্বীকার করতে যেন সে জন্ম নেয়নি।

আমাদের চোখ ফেটে জল আসে দেখে একদিন সে হেসে বলেছিল, দেখো ঠাকুরপো, যে চলে গেছে, তার কথা ভেবে অনর্থক অশ্রুপাত করে তো কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে তার আদর্শটাকে তুলে ধরাই তো তার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের একমাত্র পথ! তোমরা পুরুষ হয়েও যদি এ কথাটা মেয়েদের না বোঝাতে পারো, আমি মেয়ে হয়ে সেটা পুরুষদের স্মরণ করিয়ে দেব কোন্ সান্ত্বনায়?

তারপর থেকে আমাদের চোখে আর জল আসেনি।

সেই দু'বছরের শিশুকে তার মা বল খেলতে দিয়েছে। যে বল লেগে তার বাবার মৃত্যু ঘটেছে।

পাঁচ বছর বয়েস যখন ছেলের—মা জানিয়েছে তাকে, তোমাকে বড় খেলোয়াড় হতে হবে। তোমার বাবা এই খেলতে গিয়েই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ভয় পেলে চলবে না। তোমাকে দেখাতে হবে, তুমি বাবার চেয়েও বড় খেলোয়াড। তবে তো তুমি তার প্রকৃত শ্রাদ্ধের অধিকারী। শ্রাদ্ধ আর কিছু নয়—যাঁর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান, তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। এমন খেলা খেলতে হবে, উপর থেকে দেখে যাতে তিনি তৃপ্ত হন। তুমি তোমার বাবার শূন্য আসন পূর্ণ করো।

মায়ের উপযুক্ত শিক্ষা পেলে কোন্ ছেলে না বড় হয়? মানুষ হয়?

শ্রী অরবিন্দ-স্মরণ

শ্রীধীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

॥ ৬ ॥

কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব'লেছিলেন : মন অতীব চঞ্চল, তাকে নিগ্রহ করা বাতাসকে নিরোধ করার মতই দুঃসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ তখন যোগের বিভিন্ন প্রণালীর দ্বারা মন শান্ত করার উপায় অর্জ্জুনকে শেখালেন। তিনি এমন পথও দেখালেন, যে শুধু জপ-তপ বা সাত্ত্বিক আচরণের মধ্যে নয়, যুদ্ধ প্রভৃতি উগ্র রাজসিক ক্রিয়ার মধ্যেও মনকে শান্ত রাখা যায়। ইন্দ্রিয় বা মন নিগ্রহ ছাড়াও ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব এবং সর্ব্ব অবস্থাতেই মনের প্রশান্তি আনয়নের উপায় আছে। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে এই সকল উপায়ে শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদিগকে যথাযথভাবে দেহ-প্রাণ, মনের সহিত আত্মগঠনের অবকাশ দেওয়া হ'তো। এই সকল ছাত্র এইভাবে দ্বিজত্ব বা আত্মিক দ্বিতীয় জীবন লাভ করে যখন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ ক'রতো, তখন সংসারের কোনও ঝড়-ঝাপ্‌টাই তাদের বিচলিত ক'রতে পারতো না। ভারতে এই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই চ'লে এসেছে। আমাদের ছাত্রজীবনে দেশে অনেক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ছিল ; রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তা ছাড়া ঘরে ঘরে পিতামাতা ও গুরুগণ পুত্র-কন্যাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। সকল গৃহে ও সকল পরিবেশেই এটা সম্ভবপর ছিল। আমার ক্ষেত্রে,—মা আমাকে ধর্ম্ম বিষয়ে বাল্যকাল থেকেই বহু শিক্ষা ও জ্ঞান দিয়েছেন ; কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি কারণেই তিনি যখন সাধুমাতার আশ্রয়ে তীর্থবাসিনী হলেন, তখন বৎসরে দুই-চারিবার তাঁর সান্নিধ্যলাভ ব্যতীত সর্ব্বদা তাঁর আবহাওয়ায় জীবন যাপন অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া তাঁর প্রকৃতি ও আচার ছিল একান্ত সাত্ত্বিক। যা বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মবহুল জগতে প্রতিষ্ঠিত কোনও জমিদার-শ্রেণীর লোকের ঠিক উপযোগী নয়। বাবা আমার জীবনগঠনের ভার নিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন ; পাছে হিতে বিপরীত হয়। এজন্য আমাকে তাঁর নিজ

উত্তরকালে কী দেখা গেল? ছেলে বি. এ. পাশ করেছে। কিন্তু বি. এ. পাশটা কিছু নয়। খেলোয়াড় হিসেবে ছেলের নাম আন্তর্জাতিক কোটায় উত্তীর্ণ। সেই ছেলে গেলবছর অলিম্পিক থেকে ফিরে এসেছে। আবার নিমন্ত্রণ পেয়েছে—'প্লে গ্রাউণ্ড অব্ ইওরোপ' সুইটজারল্যাণ্ড থেকে।

তার বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তার মাকে বলতে শুনেছি, ওগো দেখেছ? তোমার শূন্য আসন তোমার ছেলে আজ পূর্ণ করেছে।

কথায় কথায় রাত্রি হয়ে গিয়েছিল।

খাবার দেবার বন্দোবস্ত শুরু হতেই দেখলাম সেই মেয়েটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে চন্দননগরের ডাক্তারের কাছে।

আমার যেন চোখের পলক পড়ল না।

আমার এক ভগিনী টিবি রোগগ্রস্ত। জন্মে অবধি বেচারী কোনো সুখই পায়নি। অথচ মুখে রা নেই। কলকাতার এক স্যাঁৎসেতে অন্ধকার ঘরে চারটে দুরন্ত কচি ভাই-বোন নিয়ে অহরহ বিপন্ন, ব্যতিব্যস্ত। শোবার-বসবারও তার উপায় নেই। বাপের পোষ্ট অফিসের চাকরি। আয় অল্প। অনেক রাতে তার বাড়ি-ফেরা। তখন সেই বাপকে সেবা করার পালা। মা পাগল। ছাতের চিলে-কোঠায় বসে কখনো সে হাসে, কখনো কাঁদে।

সেই অসুস্থ ভাগনীকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা সুস্থ মানুষ দেশভ্রমণে বেরিয়েছি! ভাগনীর মুখের সঙ্গে এ মেয়েটির মুখের একটা আশ্চর্য মিল আবিষ্কার করলাম।

মনোনীত পথে নিয়ে চ'লতে দ্বিধা বোধ ক'রতেন। আমার অভিভাবকগণ পাণ্ডিত্যে বাংলার রত্নস্বরূপ এবং সংস্কৃত শিক্ষায় দেশে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। কিন্তু ভারতের মধ্যযুগীয় মনোভাব তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল; ফলে শুধু সংস্কৃত শিক্ষার দিকেই তাঁরা আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রতেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাঁদের একটা ভীতি ছিল। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা আমার জন্য নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল। আমার অভিভাবকগণ বাবার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমার জীবন ও মন গঠনের জন্য তাঁদের উপর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করাই তাঁর বিবেকের কাছে শ্রেয়স্কর পদরূপে বিবেচিত হ'লো। আমার অভিভাবকগণ সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থিত আমাদের সরকারী বাড়ী থেকে কালু ঘোষের লেনে একটি বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গেলেন; ঐ বাড়ীতে আমি তিন-চার বৎসর ছিলাম। বাবা থাকতেন সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে; তাঁর সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে দু-একদিন আমার সাক্ষাৎ হ'তো। বাবার তখন বহুমুখী কর্ম্মপ্রবৃত্তি নানা ক্ষেত্রে সার্থক হ'তে চ'লেছিল; একই সঙ্গে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য, ব্রাহ্মণ সভার সভাপতি, সংগীত রসিক, কলকাতার নাট্যসমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং স্বয়ং অভিনেতা, জাতীয় প্রধান প্রধান অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়স্থল এবং বাংলায় ক্রীড়াবিদ্যা প্রচারে উৎসাহী। তাঁর ভবনে সর্ব্বদাই বিভিন্ন সংস্কৃতি ও রুচির পরিচায়ক ব্যক্তিগণের সমাগম হ'তো। এই সকল লোকের সংস্রব থেকে আমাকে দূরে রাখা আমার অভিভাবকগণের দৃষ্টিতে বিশেষ আবশ্যক বলে অনুমিত হ'তো; ফলে তাঁদের সঙ্গ ও তাঁদের নির্দ্দিষ্ট কতিপয় লোকের সহিত কথাবার্ত্তা ছাড়া বহির্জ্জগতের সহিত কোন সংস্রব রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। অভিভাবকগণ ছিলেন অতীব রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ। শুধু আহারে-আচারে নয়, মনের চিন্তাতেও যাতে আমার মধ্যে রক্ষণশীলতার বিঘ্নকর কিছু না ঘটে,—সেইজন্যে সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই সুতীক্ষ্ণ ছিল। আমার পাঠ্যজীবনে আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনার চর্চ্চা, খেলাধুলার হুজুগ প্রভৃতি তাঁরা সুচক্ষে দেখতেন না। তাই একটা সূক্ষ্ম শাসনের চাপ আমি সর্ব্বদাই অনুভব ক'রতাম; কেননা আমি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁদের অনুশাসন মেনেই চল্‌তাম। শাস্ত্রীয় সদাচার ছাড়াও কায়মনোবাক্যে নৈতিক কঠোরতার অনুসরণ সম্বন্ধে তাঁরা সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন। কিন্তু অন্তরে শান্তির সন্ধান ব্যতীত শুষ্ক কর্ত্তব্য বা নৈতিক কঠোরতা আত্মনিগ্রহেরই নামান্তর। আমাদের ঋষিশাসিত সমাজে নিগ্রহবাদের স্থান ছিল না। উন্নত বিষয়ের অনুভূতি জাগিয়ে মানুষের মন স্বাভাবিকভাবে শান্ত করাই তাঁদের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। ঋষিদের আদর্শে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সকল দেশ-বরেণ্য পুত্রদিগের জীবন গঠিত করেছিলেন; তিনি কখনও ছেলেদের ব'লতেন না, এটা কোরো না, ওখানে যেও না, ওদের সঙ্গে মিশো না ইত্যাদি। স্বাভাবিক-ভাবে জীবনকে বিকশিত করাই ঋষিদের আশ্রমের আদর্শ ছিল। কিন্তু যুগসন্ধিস্থলে নিপতিত কলিযুগের প্রবল ভয়ে ভীত অতি-রক্ষণশীল কতিপয় পণ্ডিত ও নেতাগণ বর্ত্তমানের সবকিছুকেই ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কোনও দেশ-নেতা বা ধর্ম্মসংস্কারকের প্রতি তাঁদের আস্থা ছিল না।

এই সকল প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের প্রভাব আমার কৈশোর বয়সে আমার পরিবেশে বিশেষভাবেই সক্রিয় ছিল। বাবার স্বদেশীযুগের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের প্রতিক্রিয়ার যুগে এই সকল প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, কোনও জমিদারবংশে দত্তক পুত্র গৃহীত হ'লে সেই পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য,—জমিদারী রক্ষা ক'রে চলা। দেশের জন্যই হোক বা ব্যক্তিগত কোনও আদর্শ বা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যই হোক, যাতে জমিদারী বিপন্ন হয়, এমন কোন কাজ দত্তক পুত্রের পক্ষে গর্হিত। নিজে জমিদারী, কুলধর্ম্ম রক্ষায় নিয়োজিত থাকাই যথেষ্ট নয়, পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষাও এরূপ দেওয়া কর্ত্তব্য, যাতে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরূপে পুত্রও নিজ জমিদারী, ভদ্রাসন ও কুলধর্ম্ম রক্ষণে ব্রতী হয়। বলা বাহুল্য, বাবা রাজ-নৈতিক জীবনে যে উচ্চতম আসন পাবার অধিকারী

ছিলেন এবং দেশের যে স্বাভাবিক নেতৃত্ব তাঁর করায়ত্ত ছিল, তা এই সকল প্রবীণ ব্যক্তিদিগের উপদেশ ও প্রভাবের ফলেই সফল হয় নি। আমার প্রথম জীবনে এঁদের প্রভাবের ফলে কিছু স্নায়বিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্রের পক্ষে যে ধরণের শিক্ষা-দীক্ষা উপযোগী, তা কলিকাতার কোনও ভাড়া বাড়ীতে সম্ভবপর নয়; তার জন্য প্রয়োজন শহরের কোলাহলের বাইরের কোনও গ্রাম বা তীর্থে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাশ্রম। তা-ছাড়া জমিদারের পুত্রের পক্ষে এরূপ শিক্ষা দরকার, যাতে যৌবনে সংসারে প্রবেশের সময় সবল-সুস্থ দেহে নানামুখী বিষয়ে ও অভিজ্ঞতায় সুদক্ষভাবে জীবনপথে সে অগ্রসর হ'তে পারে। এরূপ সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অভাব আমার যথেষ্ট ছিল। প্রথমতঃ দেহগঠনে যথাযথ মনোনিবেশ করা হয় নি; বাবা বাল্যকাল থেকেই ব্যায়াম ও খেলাধুলায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাঁর দেহ আমার ন্যায় থলথলে ছিল না। খেলোয়াড় হিসাবে যেমন তাঁর নাম ছিল, তাঁর মাংসপেশীগুলিও ব্যায়ামবীরদিগের তুল্য সুদৃঢ় ছিল। স্নায়বিকতা কাকে বলে, তিনি তা সারা জীবনেও বুঝতে পারেন নি। বাল্যকাল থেকে দেহ গঠনের ফলেই তিনি শক্ত দেহ ও শক্ত মন লাভ করেছিলেন। আমার পাঠ্যজীবনে নানা প্রকার রোগভয়, মৃত্যুভয় ও উৎকণ্ঠা প্রভৃতি প্রকাশ পাওয়ায় বাবা বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সহিত পরামর্শক্রমে তাঁর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রথম যুগের ছাত্র গণিত ও বিজ্ঞানে কৃতী এবং তখন ব্যায়ামবীররূপে পরিচিত স্বর্গীয় হর্ষনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমার দেহচর্চ্চার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ক'রলেন। ইনি হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে ইতিপূর্ব্বে বাবার কর্ম্মচারীরূপে কাজ ক'রেছেন। উত্তরজীবনে দক্ষিণ কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণের ব্যবসায়ে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছেন। বাঙ্গুর কলোনী এঁর নাম চিরস্থায়ী ক'রে রাখবে। ইনি আধুনিক সুগায়িকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা ছিলেন। স্বদেশী যুগের প্রথম তরুণ দেশসেবকরূপে ইনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম অধ্যক্ষ পদে অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দ এঁকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। কেননা হর্ষনাথের ন্যায় বিনয়ী অথচ তেজস্বী এবং ব্যায়ামে কৃতিত্বসম্পন্ন তাঁর অপর কোনও ছাত্র ছিল না। (ক্রমশঃ)

চির-তৃষা

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

ভক্তি মোর মুক্তি নাহি পায়
নাহি জানি কোন্ অপরাধে
মাটির প্রদীপ আজো মিনতি জানায়
চির-মুক্ত আকাশের চাঁদে।
চাওয়া মোর আচ্ছন্ন মায়ায়
কেড়ে লয় অনন্ত-কায়ায়
ব্যক্ত করিবার লাগি' নিজেরে বিলাই
মুক্তি নাহি পাই।
ধীরে ধীরে ফিরে আসি
আপন আলয়ে—
ম্লান মুখ ঢাকি' দুই করে
যেথা আছে আপনার ঠাঁই
বিরহের মধুময়
একান্ত গোপন।
আজো বিলাপের নাহি অবকাশ
দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছি ভিক্ষা-পাত্র ল'য়ে
মিটাইতে বাসনার ক্ষুদ্র অভিলাষ—
নদী চিরদিন জানি হার মেনে যায়
তবু মহাসাগরের ডাক থামে না যে হায়
যুগে যুগে বারে বারে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ব'য়ে যাওয়া
অনন্ত ভাষায়।

একটি স্মরণীয় মামলার বিচার

শ্রীকুন্তল মজুমদার

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। একদিকে বেয়াল্লিশের আন্দোলন আপাত-দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও স্বাধীনতার আগুন জ্বলছে সকলেরই মনে মনে; অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজয়ী ইংরেজ আরো ভাল করে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে এদেশে।

এমনি সময়ে একটি মামলার বিচারকে কেন্দ্র করে নতুন উৎসাহে, দুর্জয় সঙ্কল্পে জেগে উঠলো গোটা ভারতবর্ষটাই।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীর লালকেল্লার সামরিক আদালতে অভিযুক্ত হলেন যুদ্ধকালীন দূর প্রাচ্যের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার তথা ফৌজের তিনজন সেনানায়ক, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খাঁ, ক্যাপ্টেন পি, কে, সেগল ও লেফটানেন্ট জি, এস, ধীলন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল ব্রিটিশ ভারতের সামরিক বাহিনীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করেছেন, দল ত্যাগ করে শত্রু-পক্ষীয় আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজে যোগদান করেছেন এবং ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন ও নরহত্যায় অংশ নিয়েছেন।

"আসামী"দের গ্রেপ্তার ও চার্জ-শীট দেওয়ার সময় থেকে এই অসাধারণ মামলার অনেক কিছু বিবরণ সংবাদপত্র মারফৎ ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে, বেয়াল্লিশের ছাই-চাপা আগুন জ্বলে উঠলো নতুন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, নিজস্ব সামরিক বাহিনী ও অস্থায়ী স্বাধীন ভারত (আজাদ হিন্দ) সরকার গঠন, ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ ঘোষণা এবং দূর প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে ভারতের মাটিতে তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের রোমাঞ্চকর ও গৌরবময় ইতিহাসের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো তাদের আশ্চর্য দেশপ্রেম এবং ভারতের পরাধীনতা মোচনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, অসহ্য কষ্টস্বীকার এবং জীবন-পণ সংগ্রাম।

মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার, লেঃ কর্ণেল ও মেজর পদাধিকারী সাতজন ইংরাজ ও ভারতীয় সামরিক অফিসার আসামীদের বিচারে বসলেন। সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনার ভার ছিল এডভোকেট জেনারেল, শ্রীএন, পি, ইঞ্জিনিয়ারের ওপর। লালকেল্লার বাইরে তখন অপেক্ষমান হাজার হাজার মানুষের ভীড়ে পুরা-কালের দুর্গ অবরোধের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

"আসামী"পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবহারজীবী শ্রীভুলাভাই দেশাই, এবং তাঁর সহায়তা করতে দাঁড়ালেন সর্বশ্রী কৈলাসনাথ কাটজু, আসফ আলি, তেজবাহাদুর সপ্রু, বক্সী টেকচাঁদ, পি, কে, সেন, দলীপ সিং, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ সতেরোজন দেশজানিত ব্যারিষ্টার, এডভোকেট ও হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। "আসামী"পক্ষের মামলা পরিচালনার দায়দায়িত্ব নিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

প্রায় ১৫০ পাতার একজিবিট ও ২৫০ পাতার লিখিত সাক্ষ্য জড়ো হল আদালতে এবং জাপান ও আজাদ হিন্দ সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার আদালতে এসে সাক্ষ্য দান করে গেলেন অভিযুক্তদের পক্ষে।

অভিযোগ স্বীকার করে "আসামী"পক্ষের শ্রীশাহ নওয়াজ আদালতে বললেন, "সেই চরম মুহূর্তে আমাদের বেছে নিতে হল দেশমাতৃকা আর বিদেশী শাসকের মধ্যে—শুধু অস্ত্রের সাহায্যে যে আমাদের দেশ দখল করেছে ও পদানত রেখেছে এবং দেশের প্রতি আনুগত্যই আমরা বেছে নিলাম।

এই মামলায় কোন রকম লিখিত নোটের বিনা সাহায্যে শ্রীভুলাভাই দেশাইয়ের দশ ঘণ্টাব্যাপী সওয়াল আইনের ইতিহাসে এক নব অধ্যায় সংযোজন করেছে।

যুদ্ধকালীন দূর প্রাচ্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলন করে তিনি দেখালেন, জাপানের কাছে ইংরাজের দ্রুত ও ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিওর বিশ লক্ষ ভারতীয়ের মান, প্রাণ ও সম্পত্তি অসহায় ও অরক্ষিত হয়ে উঠলো

একদিকে। অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারতীয় বাহিনীর এক বড় অংশ বিনা সর্তে জাপানীদের হাতে তুলে দিলেন ইংরাজপক্ষের কর্ণেল হাণ্ট। এই বিশ লক্ষ বেসামরিক ভারতীয় এবং কর্ণেল হাণ্টের পরিত্যক্ত ভারতীয় সেনানীদের মিলনেই সম্ভবপর হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার—যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে নিয়েছে একটি নাম, "নেতাজী"। বস্তুতঃ দেশগৌরব শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর নেতাজীতে উত্তরণই এক হিসাবে আজাদ হিন্দ সরকার তথা ফৌজের প্রকৃত ইতিহাস বলা যায়।

দূরপ্রাচ্যের ভারতীয়দের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একতাবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সঙ্গত ও আইনানুগ এবং প্রজার রক্ষণাবেক্ষণে রাজা অনিচ্ছুক অথবা অপারগ হলে রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্যের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রীদেশাই প্রমাণ করতে চাইলেন যে, স্বতঃপ্রণোদিত, স্বাধীন, যথাযথভাবে গঠিত ও স্বীকৃত আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল মাতৃ-ভূমির বন্ধন মোচন ও যুদ্ধের জরুরী পরিস্থিতিতে প্রবাসী ভারতীয়দের রক্ষণাবেক্ষণ। যুদ্ধকালীন কার্যকলাপ যুদ্ধেরই প্রয়োজনে বৈধ এবং তা সম্পাদনে ব্যক্তিগত কিছু দায়িত্ব থাকতে পারে না কোন সেনানী অথবা সেনানায়কের। ইংরাজেরই প্রণীত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন, ইওরোপ ও আমেরিকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনমান্য আন্তর্জাতিক আইন, প্রিভি কাউন্সিল ও ফেডারেল কোর্টের মামলার নজীর, বরেণ্য বিচার-পতিদের রায়, রাষ্ট্রনায়কদের বাণী, ম্যাগনা কার্টা ও আতলান্তিক সনদের ঘোষণা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি ও উদাহরণ সহযোগে শ্রীদেশাই আদালতে এই সত্যটাই তুলে ধরলেন যে, পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রামের ও স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অধিকার আইনসম্মত।

কিন্তু দেশকে ভীতিপ্রদর্শন এবং হেয় ও দোষী প্রমাণ করতে যে বিচারব্যবস্থা, অনিবার্যভাবেই সেখানে নেমে এল "আসামীদে"র ওপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ।

তবে এই রায় প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী এমন এক প্রচণ্ড আলোড়ন ও আন্দোলন শুরু হল যাতে ভীত ও বিভ্রান্ত ইংরাজ সরকার অবিলম্বে ও বিনা সর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়কদের।

এই মামলার অনুষ্ঠানকে ইংরাজ কূটনীতিজ্ঞরা বলেছেন "ভারতবর্ষে আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল।" অর্থাৎ লোকচক্ষুর আড়ালে যাকে নীরবেই সমাধি দেওয়া যেত কলঙ্কের পশরা মাথায় তুলে দিয়ে, জনসমক্ষে তাকে টেনে এনে ভারতে নিজেদেরই সমাধি রচনার কাজ ত্বরান্বিত হল বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানেই শাসকগোষ্ঠীর এমন বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে শতাব্দীর অবিচার অত্যাচার আর অনাচার অবসানের জন্য।

বৃত্তপথ

নরেন বিশ্বাস

জীবনের কী যে মানে—সত্য কথা ভুলে গেছি তা'ও
গোলকের শেষ খুঁজে পাই নি কোথাও ;
কথায় কাব্যে শুধু বিশ্লেষণ বেড়েছে অনেক,
বর্ষায় প্লাবনে কত উদ্বাস্তু শতাব্দীর ভেক।
হায় রে জীবন, হায়!
পান-পাত্রে সে-মদিরার আস্বাদ কোথায়?

অনেক কয়েছি কথা : প্রেম-প্রীতি বহু উপদেশ,
অনেক কাহিনী রচি : মধুময় অনেক নিমেষ ;
জীবনের সত্য বিন্দু খুঁজি তাতে জহুরীর মত
উলঙ্গ সত্যেরে ঘিরে যে-জীবন রয়েছে সংহত।
হায় রে জীবন, হায়!
স্থবির পথিকে তুমি কেবল ছুটিয়ে চল নিপুণ মায়ায়।

জীবনের কী যে মানে—স্থির সত্যের পাইনি সন্ধান।
যেহেতু, আমরা ছুটে চলেছি সমান
সত্যের উত্তরীয় খসাবই ব'লে।
বৃত্তপথে পদযাত্রা : সবেগে—সকলে!

'প্রবর্ত্তক'-এর পঞ্চাশ বছর

অঃ অরবিন্দ সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

॥ ৬ ॥

১৯১৬ (বাংলা ১৩২৩) সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রিকার ২য় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীমতিলাল সর্ব্বপ্রথমেই নববর্ষকে আবাহন জানাইয়াছেন: "ওগো নূতন বর্ষ, ওগো অনাগত, তোমায় অভিবাদন করি।" এই 'আহ্বানে তিনি যোগযুক্ত জীবনের আলোর সন্ধান করিয়াছেন। লিখিয়াছেন: "যোগসাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছে, তার কাছে তুমি নূতন নও, সে তার ভবিষ্যদৃষ্টি দিয়ে তোমার সবখানি দেখ্‌তে পাচ্ছে—সমুদ্রের তরঙ্গ কাটিয়ে নাবিকেরা তাদের ক্ষুদ্র তরীখানি যেমন করে সাগরবক্ষে নিয়ে যায় যোগ-দৃষ্টিশালী ভারতের মহাত্মাগণ তেমনি করে অবহেলে তোমাকে অতিক্রম করে চলেছে। অনন্ত মহাকালের বুকে এক স্থানে ভারতের স্বর্ণযুগটির কথা লেখা আছে, সেই দিনটি লক্ষ্য করে তুমি এসেছ দূরাগতকে কাছে এনে দেবার জন্য। তোমায় অভিবাদন করি। সমুদয় জগতের ভাগ্যাকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন, বরষের শেষে বিদ্যুৎ বিকাশের মত শান্তির আভাষ মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে মুহূর্ত্তেই বুঝি মিলিয়ে যায়, অহঙ্কার জাগ্রত মূর্ত্তি ধূলিশায়ী না হলে স্থায়ী শান্তি অসম্ভব—তাই সমগ্র মিত্রশক্তি প্রবল হুহুঙ্কারে মেদিনী কম্পিত করে তুলেছে। হে নববর্ষ, মনুষ্যজাতির হৃদয় হতে হিংসা-বৃত্তি মুছে দিয়ে চির শান্তি ফিরে দেবে—তাই তোমায় অভিবাদন করি।"

তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। ভারতবর্ষেও রাজশক্তি দ্বারা প্রজাশক্তির উপর নিপীড়ন চলিতেছে। সারা পৃথিবী অশান্তিময়। শান্তি কোথায়? শ্রীমতিলালের মনে উদয় হইয়াছে শান্তির পথ। দুনিয়া হইতে হিংসা দূর না করিতে পারিলে শান্তি আসিতে পারে না। যোগসাধনার দ্বারাই শান্তি পাওয়া যায় বলিয়া সেই সময়েই তাঁর ধারণা হইয়াছিল। তাই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে লিখিয়াছেন (১৯১৫)—"আমি যে একেবারে তন্ত্রসাধনা ছাড়িয়া এখন "বেদান্তে" প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি।" শ্রীঅরবিন্দও উত্তর দিয়াছিলেন—"বেদান্ত যোগে আপনাকে নিবদ্ধ করিয়া ভালই করিয়াছ।"

শ্রীমতিলাল ব্যক্তিগত জীবনে বাংলার বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও পথ এবং সাধন-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নিজের পথ খুঁজিতে গিয়া হঠাৎ জীবনের এক অনাহত মুহূর্ত্তে শ্রীঅরবিন্দের সংকেতে আত্মসমর্পণসাধ্য পূর্ণযোগমূলক জীবনসাধনার সঙ্কেতের সন্ধান পান। সেই সময়কার মনের অবস্থা তিনি জীবনসঙ্গিনী মহাগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন: "যোগ! যোগ!! যোগ!!! অন্য কথা নাই, আসন নাই, প্রাণায়াম নাই, ধারণা নাই, একেবারে গতানুগতিক জীবনের কোনই অনুষ্ঠান নাই। যোগ শব্দ দিনে হাজার বার উচ্চারণ করিতে বাধ্য হই, আর কি একটা ভাবের ঘোরে জীবনের দিন অতিবাহিত হয়। খাইতে হয় খাই, কথা কহিলে—ঐ শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ আর 'যৌগিক সাধনা'র দুই পরিচ্ছেদের—তত্ত্বকথা। ভারতের শাস্ত্র পুরাণ অনাদরে ঘরের মেঝেয় ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া একাকার হইল, হাওয়ায় কত পাতা উড়িয়া গেল, কাজেরও অন্ত নাই, অন্যদিকে অন্তর্যোগে ও বিচিত্রানুভূতি আমায় তখন উন্মাদ করিয়াছে।"

এই ভাবের ঘোরে শ্রীমতিলাল 'প্রবর্ত্তক'-এর ২য় বর্ষে প্রথম হইতে পর পর দশটি সংখ্যায় "পূর্ণ যোগ" শীর্ষকে যোগের স্বরূপ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ ও তান্ত্রিক যোগ, পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

'যোগ' বলিতে তিনি বুঝিয়াছেন: "মানুষে ভগবানের স্পর্শ। এখানে ভগবান অর্থে আমরা যাহাই বুঝিনা কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। মানুষ হইতে উচ্চতর বৃহত্তর বিশ্বজনীন অথবা তুরীয় একটা কিছু জাগ্রত সত্তা এইটুকু স্বীকার করিয়া

আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট। ভক্তের সহিত ভগবানের, অহং-এর সহিত ঈশ্বরের, জীবের সহিত শিবের, আত্মার সহিত পরমাত্মার—এমন কি বৌদ্ধ মত অনুসরণ করিয়া সংস্কারের সহিত শূন্যের—আমরা সেই একই সংযোগের কথা বলিতে পারি। মূল কথা এই সংযোগ। এই সম্বন্ধ স্থাপন, উহা হইতে যোগ সাধনা আরম্ভ হয়, কিন্তু এই সাধনার প্রণালী, গতি, পরিণতি সবই নির্ভর করে মানুষ আপনার কোন্ ভাগে কোন্ ক্ষেত্রে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে, তাহার কোন্ অংশে ভগবানের স্পর্শ পড়িয়াছে।"

প্রবর্ত্তকে ১ম বর্ষের ন্যায় ২য় বর্ষেও ধর্ম্মবিষয়ক বহু প্রবন্ধ ছিল। ধর্ম্ম, ধর্ম্ম প্রচারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পাট, তপস্যা, তিনটি কথা, নরনারায়ণ, অগ্নি-স্তোত্র, বৈদিক অঞ্জলী, বৈদিক চিন্তাপ্রসূন, ব্রহ্মতেজ, সন্ন্যাসীর প্রভাব, সন্ন্যাসীর কথা, চির নবীন, মহা প্রলয়, উৎসর্গ, সততা, অধ্যাত্ম-বিপ্লব, কালী প্রভৃতি রচনা ২য় বর্ষে প্রকাশিত হয়। রচনায় রচয়িতার নাম নাই। সম্ভবতঃ উহা একক শ্রীমতিলালেরই লেখা।

'ধর্ম্ম'-সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—"নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিতে যে বিধিনিষেধাদি লিপিবদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদনুসরণ করাই ধর্ম্ম। * * এই ধর্ম্ম কেহ সৃজন করিতে পারে না। যে নিগূঢ় প্রেরণায় এক বহুরূপে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, যাহার শাসনে নিখিল সৃষ্টি চলিতেছে, যাহা শাশ্বত সনাতন তাহাই ধর্ম্ম। ইহার প্রতিষ্ঠা তুরীয় লোকে, ভগবানের বিজ্ঞানলোকে, বিরাট চৈতন্য মধ্যে। ইহার নাম সত্যলোক—সেখানে সত্য সত্তা, সত্য কর্ম্ম সকল বস্তুই অন্তরাত্মার প্রকৃতি। * * মন বুদ্ধি আবেগ বাসনা যে ধর্ম্ম রচনা করে সে ধর্ম্ম খণ্ডিত ধর্ম্ম যেন গোধূলির অস্পষ্ট ছায়াপাত।"

যোগসাধনা বিষয়ক 'লীলা' প্রবন্ধটী যথাক্রমে ৮টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জাতীয় চরিত্রগঠন ও উপদেশসম্বলিত প্রবন্ধসমূহ, যথা—স্পষ্ট কথা, আমাদের আশা কি, শিক্ষা, মহাজন বাক্য সংগ্রহ, গতিনির্দ্দেশ, জাগরণ, ত্যাগের কথা, নারী পূজা, মহাজন পন্থা, বীরবাণী, চিন্তাগুচ্ছ, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, দেবজ্যোতি, পন্থা, চিন্তাচুম্বক, অহঙ্কার, চিন্তা-বীথি, কলির সত্য, নূতন মানুষ, প্রাণের দায়, নিশীথ চিন্তা, নিত্যের খেলা, দরকার, অন্তঃপ্রেরণা, ভাব-কুসুম, জানা ও অজানা, জাতীয় শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ও নেশান ইত্যাদি।

"স্পষ্ট কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমতিলাল বলিয়াছেন—"ভারতে সন্ন্যাসীর প্রভাব একদিন ছিল—আজও যে তাহা নাই এ কথা বলি না। তবে যাঁহারা কেবল পারমার্থিক চিন্তায় ভরপূ, যাঁহারা জগতের কোন সংবাদই রাখেন না—তাঁহারা যে আজ বাঙ্গালীজাতির কর্ণধার হইতে পারেন এ কথায় আমাদের আর বিশ্বাস নাই। মহামতি তিলকের ভাষায় আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে—'I say the days of wonders are gone, you cannot now feed hundreds of people on a few crumbs of bread as Jesus did. The attainment of this object cannot be achieved by a wonder from heaven, you have to do it. These are day of work.'

"ইহা কঠোর কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগের মধ্যেই শ্রীভগবান এবার পূর্ণ প্রকট। এই কর্ম্মযোগ সাধন করিতে পারিলেই অভাবনীয় বিভূতি লাভ করিবে।"

"আমাদের আশা কি" শীর্ষক প্রবন্ধে এই জীবন ও কর্ম্মের কথাই উক্ত হইয়াছে: "বৈদিক যুগে ভারতবর্ষ ইহা সার্থক করিয়াছিল। ইহাই স্বর্ণ-যুগ; ইহাই স্বর্গ-রাজ্য—লীলাচক্রে বার বার এই স্বর্ণযুগই ভাঙ্গিয়াছে, আবার নবীন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতির গুপ্ত প্রেরণায় নূতন যুগে নবীনতর আকারে সেই আশাই সফল করিয়া তুলিবে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যাহারা কান পাতিয়া আপনার জীবনদেবতার বাণী শুনিয়াছে, চোখ মুদিয়া আপনার অন্তরস্থিত চিন্ময়ী দেবীর ইঙ্গিত বুঝিয়াছে, তাহারা আমাদের এই আশায় অংশীদার হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।"

'রামকৃষ্ণের পাট' প্রবন্ধে শ্রীমতিলাল স্বামীজির জাগরণ-বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি জাতিকে আহ্বান

দিয়াছেন : "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ। উঠ জাগ শ্রেষ্ঠ বর লাভ কর। কে বলে তোমরা পরাজিত পদানত হীনবীর্য্য—জাগাও কুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে, ভৈরব গর্জ্জনে জগতের লোককে এই অমৃতের সন্ধান প্রদান কর। ইউরোপের অধঃপতন আসিল বলিয়া —এত ভোগের মধ্যে মহাশক্তি তিষ্ঠিতে পারে না।"

'শিক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি বঙ্গনারী-জাগরণের আহ্বান দিয়াছেন :

"জাগাও বঙ্গজননী অন্তঃপুরচারিণী মহালক্ষ্মীদের—বীরপ্রসবিনী জগদ্ধাত্রী, কার ভয়ে ভীতা সঙ্কুচিতা? কোন্ কাপুরুষের কটাক্ষে মহামায়া চঞ্চলা, সন্তপ্তা? সর্ব্বক্ষেত্রে অক্ষর পরিচয়ের আবশ্যক নাই, রাশী রাশি পুস্তকের পাতা উল্টাইলেই শিক্ষা হয় না। হিন্দু শক্তির মর্য্যাদা ভুলিয়াছে। বর্ণদ্বয় মন্ত্রসাধনে রত্নাকর মহাকবি হইয়াছেন—গার্গী, মৈত্রেয়ী মন্ত্রসাধনে সিদ্ধা ছিলেন। আত্মজয়ী অভী হইয়া কার্য্য আরম্ভ কর—জগতে জানাও তোমার দ্বারা অমঙ্গল অশুভ সম্ভব হইবে না—তারপর তোমার পথের পরিপন্থী যে হইবে শ্রীকৃষ্ণ তার বিচারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।"

২য় বর্ষে প্রকাশিত চণ্ডীদাস, জাগরণ, জীবনের খেলা, ত্যাগের কথা, প্রেম, রাজসিক উত্তেজনা, সন্ন্যাসীর কথা ও সন্ন্যাসীর প্রভাব, হিরণ্যের চিঠি প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

এই সকল প্রবন্ধ শ্রীমতিলালের একক লেখনী-প্রসূত। ইহাতে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নব জাতিগঠনে ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সব্যসাচী ছিলেন। তখনকার দিনের কথা শ্রীমতিলাল জীবন সঙ্গিনীতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"প্রবর্ত্তক চলিতেছে নিজেরই আনন্দ ও উৎসাহের দাপটে। আর রাজনীতিক ক্ষেত্রে বাংলার যত সংশয়-ভাজন তরুণ ছিল, তাহাদের জন্য নগরের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র গোপন অতিথিশালা খুলিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছি। আর প্রতি রাত্রে আমার গৃহপ্রাঙ্গণে তাহাদের সভা বসিতেছে। সে কত প্রকারের আলাপ-পরিচয়, হাসি-কৌতুক, আর কত বৈপ্লবিক আন্দোলনের আলোচনা, পরিকল্পনা! এত বড় বিপজ্জালে জড়াইয়া পড়িতেছি, বিন্দুমাত্রও তাহার জন্য চিন্তা ছিল না।* * অন্তরে অন্তরে অভিনব শক্তির ফল্গুপ্রবাহ বহিতেছিল। তাই সেদিন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলাম —জড়শক্তির আশ্বাস পরিহার করিব, ভগবচ্ছক্তির আশ্রয় লইব; কালের আবর্ত্তন হইতে প্রেমমন্দাকিনীতে অবগাহন করিব। জ্ঞান শক্তি প্রেমের বন্যায় দেশ আমার স্বর্গ হইবে। সোনার দেশে সোনার গৌরাঙ্গ নাচিবে। আগুনের মত মর্ম্মভেদী আমার বাণীমন্ত্রের প্রচার দেশব্যাপী হইবে। জাতি পরিগ্রহ করিবে নূতন জন্ম। মুক্তিসাধনায় এই নূতন ব্রত জাতিকে দীক্ষা দিবে।"

শ্রীমতিলালের সত্য সত্যই আগুনের মত মর্ম্মভেদী বাণীমন্ত্র তখনকার প্রবর্ত্তকের ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ হইয়া তরুণ প্রাণে বহ্নিদীক্ষা দিয়াছে। এই হিসাবে প্রবর্ত্তক ঠিক সাধারণ পত্রিকা ছিল না—ছিল অসাধারণ—নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। (ক্রমশ)

ভুল

শ্রীঅজিত দাশ

তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মরশুম।

আমেরিকান সৈন্যরা ঘাঁটি গড়ে আছে ভারতবর্ষের নানা স্থানে। বাঙলাদেশের এ অঞ্চলেও তারা ছিল। এই শহরের পাশেই। শহর সীমার মাইল চার দূরে।

একদিন সকালে তাদের সেই ছাউনীর কাছাকাছি পথে শহরের এক বৃদ্ধ অন্ধ ভদ্রলোককে যেতে দেখা গেল। তাঁর হাতে লাঠি। সেই লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি সৈন্য ছাউনীর দিকে এগিয়ে চলছেন।

পথচলতি স্থানীয় লোকজন কিছুটা অবাক হোল তাঁকে দেখে।

প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন গো?

ওই সৈন্যদের ছাউনীতে। ওটা কতদূর?

ওইতো সামনে।

এই পথ তো?

হ্যাঁ।

এর বেশি তারা আর কিছু বলল না। যদিও মনে কিছু প্রশ্ন থেকেই গেল। তারা সাধারণ লোক। সাধারণ লোক যেমন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং মনের প্রশ্নকে মনে রেখেই দিন কাটায়। তারা যে যার কাজে চলে যেতে লাগল।

তারপরেও অনেকখানি হাঁটতে হোল বৃদ্ধকে।

অনেক সময় লাগল। লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটা। শেষে সৈন্য ছাউনীর সামনে আসতেই প্রহরী আটক করল তাঁকে।

এখানে কি?

এটা কি সৈন্যছাউনী?

হ্যাঁ।

আমি ভিতরে যেতে চাই।

কে আপনি?

আমি এদেশীয় একজন সাধারণ মানুষ।

ইংরাজীতেই বললেন আগন্তুক।

প্রহরী আবার প্রশ্ন করল, এখানে কি দরকার?

আমি আপনাদের ক্যাপটেনের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

প্রহরী সন্দিগ্ধ হোল।

কি দরকার ক্যাপটেনের সঙ্গে?

একটু পরিচয় করব?

কে তুমি?

বললাম তো সাধারণ এক বৃদ্ধ।

কিন্তু ক্যাপটেনের সঙ্গে পরিচয় করে কি হবে?

এমনিই। একটু আলাপ করব।

আপনার উদ্দেশ্য কি?

অন্য কিছু না ভাই। দেখছেন না আমি বৃদ্ধ, তার ওপর অন্ধ। আমার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

এখন দেখা হবে না।

কখন দেখা হবে?

দেখা হবে না।

কেন?

নিয়ম নেই।

কিন্তু ভাই, আমি যে এসেছি শহর থেকে, অনেক কষ্ট করে। আপনি একটু খবর দিন না দয়া করে। বলুন, এক বৃদ্ধ, অন্ধ শুধু একবার তাঁর সামনে দাঁড়াতে চায়। আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

প্রহরীর পাশে আরও দু'চারজন সৈন্য দাঁড়িয়ে গেছে তখন। তারা কৌতূহলী। এমন একজন বৃদ্ধ, নেটিভ পুরোদস্তুর পোষাক পরিচ্ছদে অথচ চোস্ত ইংরাজীতে কথাবার্তা বলে চলেছেন।

কে? কেনই বা এসেছে এমন করে, কেনই বা ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করতে চায়?

অতএব ক্যাপটেনের কাছে খবর গেল।

ক্যাপটেনও কৌতূহলী।

কে বৃদ্ধ? কি চায়? হুকুম দিলেন ডেকে আন।

বৃদ্ধকে নিয়ে যাওয়া হোল ক্যাপটেনের কাছে।

ক্যাপটেন ডাকলেন, আসুন!

তারপর তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, বসুন।

বৃদ্ধ বসলেন চেয়ারে।

ক্যাপটেন বললেন, বলুন কি প্রয়োজন ?

বৃদ্ধ বললেন, আপনি ক্যাপটেন ?

হ্যাঁ।

আপনি ?

আমি সামনের শহরে থাকি। এককালে অধ্যাপক ছিলাম। এখন অবসরভোগী, মৃত্যুর অপেক্ষায় বলা যায়।

ক্যাপটেন-এর সুর এবার অনেক সহৃদয়।

আপনি অধ্যাপক ছিলেন ?

হ্যাঁ। আমিও শুনলাম, আপনিও অধ্যাপক ছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, আপনার অনেক খ্যাতি, অনেক মূল্যবান গবেষণা আছে।

ক্যাপটেন এবার বিগলিত।

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু গবেষণা আছে আমার।

বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি। এবং তারপর শুনলাম, আপনি এখানে ক্যাপটেন হয়ে এসেছেন। তারপর আপনার কথা ভাবতে ভাবতে মনে একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছে। তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারলাম না, তাই শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

ক্যাপটেন বললেন, আপনি কি সিগ্রেট খান ?

আজ্ঞে না।

চা খাবেন একটু, অনুগ্রহ করে ?

আজ্ঞে না, ধন্যবাদ।

বেশ বলুন আপনার কি প্রশ্ন।

বৃদ্ধ বললেন, আমি অন্ধ, আপনার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, সেইজন্যই প্রশ্নের এই আগ্রহ। আচ্ছা, আপনি একজন অধ্যাপক, জীব-বিজ্ঞানী, গবেষক, জীব-জগতের ক্রমবিকাশ-এর ধারা, প্রাণ-প্রাণের মাহাত্ম্য নিয়ে জীবন কাটাতে কাটাতে এই প্রাণীহত্যার এই নিধন যজ্ঞের নায়ক হয়ে এলেন কি করে ? কি করে আপনার মনকে মানিয়ে নিতে পারলেন ? এটা কী বৈপরীত্য নয় ? এতোখানি বৈপরীত্য কিভাবে সম্ভব হোল আপনার মধ্যে ? এই আমার প্রশ্ন। নিজের মন থেকে কিছুতেই এর সমাধান করতে পারিনি। তাই শেষ পর্যন্ত এখানে ছুটে এসেছি আপনার কাছেই।

ক্যাপটেনের কাছে এ প্রশ্ন অভাবনীয়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এতোবড় মারাত্মক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে কোনদিন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি।

অধ্যাপক থেকে সৈনিক। জীবন-রহস্য ভেদের গবেষণা থেকে জীবধ্বংসী প্রাণধ্বংসী বৃত্তি গ্রহণ। কেন ? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়াও সম্ভব নয়। যদিও বৃদ্ধ প্রশ্ন-কর্তা অন্ধ, তবুও তাঁর অস্তিত্বের সামনে বসেই ক্যাপটেন যেন স্তব্ধ, অসহায়, পঙ্গু।

অনেকক্ষণ ধরেই সমস্ত ঘরখানা থমথমে হয়ে রইল। অন্ধের চোখের পাতা দুটি পড়ছে থেকে থেকে। তাঁর ঘোলাটে চোখ দুটো নড়াচড়া করছে। যেন তার ভিতর দিয়েই তিনি দেখতে চেষ্টা করছেন ক্যাপটেনকে। যেন তাঁর জিজ্ঞাসা ওই চোখ দিয়েই বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে ক্যাপটেনের মুখের ওপর।

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ বললেন, কি হোল ? জবাব নেই ? আপনি কিভাবে এলেন তবে ?

ক্যাপটেন এবার বললেন, দেখুন, আমিতো একটি রাষ্ট্রের প্রজা। সে রাষ্ট্রের সেবা করাই আমার কাজ হওয়া উচিত। কাজেই আমার বিপন্ন রাষ্ট্র আমাকে ডাক দিল, নির্দেশ দিল যে কাজ করতে আমি তাই করতে এসেছি।

বৃদ্ধ হেসে উঠলেন। সতী তীব্র কর্কশ সে হাসি। বলে উঠলেন, কী অধ্যাপক, আপনি বোধহয় প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইছেন। জাতির সেবার কি একটাই পথ ? একজন অধ্যাপকের পক্ষে এই স্থূল কষাইবৃত্তি গ্রহণ কি জাতীয় গৌরব ? জাতি যত বিপন্ন হয়েছিল আপনি অধ্যাপক থেকে ক্যাপটেন হয়ে কি তার চেয়ে বেশি বিপন্ন করেননি আপনার জাতিকে ? ক্যাপটেন অনেক মিলত হয়ত। কিন্তু আপনার মতো একজন জীব-বিজ্ঞানী

যদি জীবের জন্মরহস্য, প্রাণ রহস্যের কোন অজানা তথ্য আবিষ্কার করে ফেলতেন এই মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগিয়ে এবং তার দ্বারা যদি সমগ্র মনুষ্য সমাজ উপকৃত হোত, সভ্যতার নতুন পর্যায়ে পৌঁছাত, নতুন করে বাঁচবার উপযোগী কোন পথ পেত যদি এই বিপন্ন মনুষ্য সমাজ কিম্বা আপনার ছাত্ররা যদি উদ্বুদ্ধ হোত আপনার প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যাবার জন্যে তবে কি আপনার জাতি দেশ বেশি উপকৃত হোত না আপনার দ্বারা? বৃদ্ধ থামলেন।

ক্যাপটেন নিরুত্তর।

বৃদ্ধ টেনে টেনে ব্যথিত স্বরে বলে গেলেন, কে জানে, কেন যে আপনার পদস্খলন ঘটল, কেন যে অতো দূরে পৌঁছে অমন করে ওপথ থেকে সরে দাঁড়ালেন—কিছুতেই বুঝতে পারলাম না—হয়তো নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে—

যাই হোক, মনে কিছু করবেন না। বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা করবেন। বুড়ো হয়ে গেছি তাই নিজেকে সংযত করতে পারি না অনেক সময়। এ ক্ষেত্রেও তাই। প্রশ্নটা খুবই পীড়িত করছিল। আচ্ছা—চলি, নমস্কার।

বৃদ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

যাবার জন্য উদ্যত হতেই ক্যাপটেন বললেন, দাঁড়ান। আপনার ঠিকানা—

বৃদ্ধ ঠিকানা বললেন।

ক্যাপটেন ঠিকানা লিখে নিয়ে বললেন, আপনার প্রশ্ন রইল আমার কাছে। ঠিকানাও রইল। ভাবতে সময় দিন কিছু।

এরপর ক্যাপটেন প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধকে, কিভাবে শহরে যাবেন?

যেভাবে এসেছি। খানিক হেঁটে গিয়ে তারপর ট্রেনে—তারপর—

না, না। সে অনেক কষ্ট হবে। দাঁড়ান।

এরপর ক্যাপটেন নিজেই একখানি সামরিক জীপ গাড়িতে বৃদ্ধকে চড়িয়ে, চালিয়ে নিয়ে শহরে এলেন। বৃদ্ধকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ বার বার আমন্ত্রণ জানালেন ক্যাপটেনকে তাঁর বাড়িতে আরেক দিন আসবার জন্য।

এরপর ঘটনা খুবই সামান্য।

দিনচারেক পরেই একখানি চিঠি পেলেন বৃদ্ধ।

চিঠিখানি তাঁর কলেজে-পড়া নাতনি পড়ে শোনাল: শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়,

আপনার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মনুষ্যসমাজে আমি একজন পদস্খলিত নরাধম। মহাপাপী। আমার পাপের কোন ক্ষমা নেই বুঝি।

বৃদ্ধ বিচলিত হয়ে পড়লেন চিঠির বক্তব্য শুনে। আত্মহারা। তাঁর প্রশ্নটি তাহলে যথার্থই হয়েছিল এবং মানুষের মনে যথার্থ আবেদনই এনেছে! হে ঈশ্বর, ওর শুভ হোক,—ওর বিবেক জাগ্রত হোক।

তখন বেলা নটা বাজে।

বৃদ্ধের পাশে তখনও তাঁর নাতনি দাঁড়িয়ে।

সেই সময় ঘরে ঢুকল প্রৌঢ় সুবোধ মুখার্জী। মস্ত গায়ক, পণ্ডিত শহরের। সেই সূত্রেই ক্যাপটেন তাঁর কাছেই পরিচিত হতে এসেছিলেন একদিন।

সেই সুবোধ মুখার্জী এসে বললেন, দাদা কি করছেন?

সুবোধ? এসো ভাই—এসো—

বৃদ্ধ খুবই পুলকিত। এই দেখ ক্যাপটেন কি চিঠি লিখেছে—কই রে—

নাতনি বলল, কি?

চিঠিখানা দেত ভাই সুবোধকে?

সুবোধ মুখার্জী পড়লেন চিঠিখানা। তারপর বললেন, এতো পুরনো খবর দাদা। আমি যে জন্যে এসেছি। এই মাত্র খবর পেলাম, ক্যাপটেন কাল রাতে আত্মহত্যা করেছে।

এ্যাঁ—বৃদ্ধ চমকে উঠলেন ভীষণ ভাবে।

যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁর কেঁপে উঠল। দু'হাত দিয়ে মুখখানা চেপে ধরে তিনি বলে উঠলেন, আবার—আবার—ভুল!

তারপর তাঁর হাত দু'খানা চোখের জলে ভিজে উঠল।

আলোচনা

৺পূজায় বলিদান

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ, এম্. এ., পি. আর. এস্.

বিগত ৮ই আগষ্ট (১৯৬৫ ইং) তারিখে কলিকাতাস্থিত "কচ্ছী জৈন ভবন"-এ স্থানীয় "পশুবলি-নিষেধক-সমিতি"র উদ্যোগে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র আমার নামে আসিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম—কলিকাতার কজেয়জন গণ্যমান্য হিন্দু উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া পূজায় বলিদানেব নিন্দা করিবেন। জৈনসম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সভার উদ্যোগী ছিলেন বটে; কিন্তু আমার বিশেষ পরিচিত জনৈক হিন্দুর নামও আহ্বানকারীদের নামের সহিত মুদ্রিত দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম।

বুঝিলাম—এই সভায় গিয়া ৺পূজায় পশুবলির সমর্থনে কিছু বলা চলিবে না; সুতরাং সভায় না যাওয়াই উচিত বিবেচনা করিলাম। পরে শুনিয়াছি—যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। উপস্থিত হিন্দুরা (মাত্র ১ জন ব্যতীত) সকলেই ৺পূজায় বলিদানের নিন্দা করিয়াছেন। একজন মাত্র বিশিষ্ট হিন্দু "পূজায় বলিদানে শাস্ত্রের সমর্থন আছে"—এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে চারিদিক হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল—"ইঁহাকে কে আনিয়াছে? ইঁহাকে কে আনিয়াছে?" এই হিন্দু ভদ্রলোকটি হইতেছেন কলিকাতার স্বনামধন্য শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের শাসকগণ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন—ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতীয় সংবিধানেও কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর আঘাত দেওয়া অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়েরাই বিভিন্ন সময়ে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর আঘাত দিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ ইহারই ফলে উৎসাহিত হইয়া কলিকাতাস্থিত জৈনসম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে সাহস করিতেছেন। দুঃখের বিষয়—অনায়াসে খ্যাতিলাভ করিতে ইচ্ছুক কিছুসংখ্যক হিন্দুসন্তানও স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উল্লিখিত নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল—"জগজ্জননী মহামায়ার পূজাতে তাঁহারই এক সন্তানস্বরূপ নির্দ্দোষ পশুকে বলিদান করিয়া হত্যা কেবল একটি নৃশংস প্রথা নহে; কিন্তু ধর্ম্মের ঘোর বিকৃতি।" স্মরণাতীত কাল হইতে যে প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে এমন কি খোদ বেদে পর্য্যন্ত যাহার বিধান রহিয়াছে, সম্প্রতি কয়েকজন জৈন আবিষ্কার করিলেন—ইহা ধর্ম্মের ঘোর বিকৃতি। হিন্দুধর্ম্মে কোন বিকৃতি আছে কিনা, তাহা বিচার করিবার অধিকার ও যোগ্যতা একমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুনেতাদেরই রহিয়াছে, জৈন বা অন্য কোন বিধর্ম্মীর অথবা এচোড়ে পাকা হিন্দুসন্তানদের এইরূপ অধিকার বা যোগ্যতা নাই—ইহাই আমার ধারণা।

অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় আমাদের পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের মতবাদ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। এখানে সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, অন্যান্য ৺পূজার ন্যায় শারদীয়া ৺দুর্গাপূজাও তিন প্রকারে করা যায়; যথা—(১) সাত্ত্বিক, (২) রাজসিক এবং (৩) তামসিক। এই সম্বন্ধে "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-ধৃত নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচনটি উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি; যথা—

"শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা স্মৃতা॥"

সাত্ত্বিক পূজায় কেবলমাত্র বিষয়বাসনাহীন মুক্তিকামী ব্যক্তিদেরই অধিকার আছে। এই পূজায় পশু বলিদানের প্রয়োজন হয় না। জপ, যজ্ঞ এবং ফল, মূল প্রভৃতি নিরামিষ উপকরণই এই পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ। শাস্ত্র বলেন—

"সাত্ত্বিকী জপ-যজ্ঞাদ্ বৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।"

সাত্ত্বিক পূজায় ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি সাত্ত্বিক খাদ্য দেবীর নিকট নিবেদন করা প্রশস্ত। বিষয়বাসনাহীন সাধু-

সন্ন্যাসীরা মাছ মাংস খান না, এবং শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই দেবতার 'আত্মবৎ সেবা'র বিধান রহিয়াছে—এই কারণেই সম্ভবতঃ সাত্ত্বিক পূজায় পশুবলির বিধান দেওয়া হয় নাই।

যে সকল সংসারী লোক বিষয়সম্পত্তি কামনা করেন; বিশেষতঃ রাজ্য বা সম্পত্তিরক্ষার জন্য যাঁহাদিগকে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধেও নামিতে হয়, এবং যাঁহারা নিজে মাছ মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে রাজসিক পূজাই প্রশস্ত। রাজসিক বা রাজসী পূজায় বলিদান এবং দেবীর নিকট বিহিত-মাংস নিবেদন পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই সম্বন্ধে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী-ধৃত পুরাণ বচন, যথা—

"রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈরামিষৈস্তথা।"

উল্লিখিত দ্বিবিধ পূজার বিধানই শাস্ত্রকারেরা দিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তৃতীয় আর এক শ্রেণীর পূজাও মনুষ্য সমাজে প্রচলিত আছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর পূজায় ভক্তির চেয়ে ভোগস্পৃহাই বড়। দেবতার তুষ্টিবিধানের চেয়ে নিজেদের রসনার তুষ্টিবিধানের দিকেই এই শ্রেণীর পূজকদের মনোযোগ অধিক দেখা যায়। বস্তুতঃ তাহারা স্ফূর্ত্তির জন্যই এইরূপ পূজার অভিনয় করিয়া থাকে। ইহাকে পূজা না বলিয়া পূজার অভিনয় বলিলাম এই কারণে যে, ভক্তি ব্যতিরেকে যথার্থ পূজা হয় না, এবং উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর পূজায় ভক্তির কোন বালাই নাই। এই শ্রেণীর পূজার অভিনয়কে শাস্ত্রে 'তামসী পূজা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বে কিরাত প্রভৃতি অনার্য্যদের মধ্যেই এই শ্রেণীর পূজার প্রচলন ছিল। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন যথা—

"সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা।"

অর্থাৎ উল্লিখিত তামসী পূজায় সুরা, মাংস প্রভৃতি উপচারের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং ইহাতে জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্রোচ্চারণের প্রতি নজর দেওয়া হয় না। কিরাত প্রভৃতি লোকেরাই এইরূপ পূজার সমাদর করে।

হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুটাও জ্ঞান আছে, তাঁহারা জানেন—বেদে বিভিন্ন যজ্ঞে পশুবলির বিধান দেওয়া হইয়াছে। আইনের ক্ষেত্রে যেমন সংবিধানই সর্ব্বোচ্চ প্রমাণ, ধর্ম্মীয় ব্যাপারেও হিন্দুদের কাছে বেদবাক্য তেমনি বা ততোঽধিক বড় প্রমাণ। বস্তুতঃ সংবিধানের চেয়েও বেদের প্রামাণ্য অধিক, কারণ সংবিধান মানুষের রচিত এবং পরিবর্ত্তনযোগ্য; আর বেদ অপৌরুষেয় এবং অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব বেদবিরুদ্ধ কথা বলিয়া যাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে চান, বর্ত্তমান ভারতীয় সংবিধানের বিধানেও তাঁহারা অপরাধী। এইরূপ সংবিধান-বিরোধী আচরণ করিয়াও যে এক শ্রেণীর লোক কোন প্রকার শাস্তি পান না, তাহার কারণ—ইঁহারা অত্যধিক বলবান্। আমরা দেখিয়াছি, স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু পাকিস্তানকে বেরুবাড়ীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যে সংবিধানবিরোধী আচরণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি কোন শাস্তি পান নাই; বরং সংবিধানের একটি ধারাকে পরিবর্ত্তন করিয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সংবিধানকেই শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। বেদের কোন বিধানকে এইভাবে পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার কাহারও নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক যজ্ঞে বলিদানের বিপক্ষে এক আপাত-মনোরম যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মাধ্বাচার্য্যকৃত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে চার্ব্বাকের উল্লিখিত যুক্তিটি নিম্নলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে—

"পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং যাতি জ্যোতিষ্টোমে মখে।
স্বপিতা যজমানেন কথন্তত্র ন হিংস্যতে?"

[জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশুবলি দিলে সেই পশু যদি স্বর্গে যায়, তবে যজ্ঞকারী ব্যক্তি নিজের পিতাকেই যজ্ঞে বলি দেন না কেন?]

ইহার উত্তরে আমি পাঠকমহোদয়গণকে জানাইতে চাই যে, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে যে কোন পশুবলি দেওয়ার বিধান নাই। বিশেষ লক্ষণযুক্ত ছাগপশু (পাঠা) বলিদানেরই বিধান রহিয়াছে; এবং এইরূপ পশুবলি দিলে তবেই বলিদাতা ফলভাগী হন এবং পশুটিও স্বর্গ-লাভ করে বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং আমি বলিব—চার্ব্বাক যদি পাঠার (ছাগপশুর) ঔরসে জন্ম-লাভ করিয়া থাকেন, তবেই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে তাঁহার

পিতাকে বলিদান করা চলিবে; নতুবা নহে। কোন হিন্দু পাঠার ঔরসে জন্মেন নাই; অতএব যজ্ঞে হিন্দুদের পিতৃবলিদানের কোন প্রশ্নই উঠে না।

হিন্দুসমাজে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছেন বটে কিন্তু ইঁহারা কেহই বেদের সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করেন না। বেদবিরোধী আচরণ হিন্দুদের কাছে ধর্ম্মদ্রোহ। শ্রীমদ্ভাগবতকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পঞ্চম বেদের মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। এই ভাগবতে ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বেদোক্ত বলিদানকে অহিংসার মধ্যেই গণনা করা হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে নরহত্যাও করা চলে; তাতে অপরাধ হয় না—এই নীতি শুধু শাস্ত্রগ্রন্থেই নহে, আধুনিক আইনেও স্বীকৃত হইয়াছে। ভাগবত তো স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"অহিংসৈবাসাধুহিংসা পশুবৎ শ্রুতিবোদনাৎ।"

অর্থাৎ, বেদে পশুবলির বিধান থাকায় যেমন যজ্ঞে পশুবলি দিলে তাহা হিংসার পর্য্যায়ে পড়ে না, তেমনি দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে আঘাত দান বা হত্যা করিলেও তাহা অহিংসার পর্য্যায়েই পড়ে।

পাঠকমহোদয়গণ ভাবিয়া দেখুন—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের ফলে যখন ভারতবাসীরা পশুবধে বিরত হইয়াছিল, তখনই রণক্ষেত্রে শত্রুবিনাসের সামর্থ্যও তাহাদের কমিয়া গিয়াছিল। যে ব্যক্তি রক্ত দেখিলে মূর্চ্ছিত হয়, সে কেমন করিয়া যুদ্ধ করিবে? বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রবলতাই ভারতীয় আর্য্যসন্তানদের মধ্যে ক্লীবত্ব আনিয়াছিল। এই দুই ধর্ম্মের প্রাবল্যের ফলেই হিন্দুরা ভুলিয়া গিয়াছিল—গীতায় শ্রীভগবানের সেই অমৃতোপম উপদেশ—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

[হয় যুদ্ধে মৃত্যুলাভ করিয়া স্বর্গে গমন কর; না হয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া পৃথিবী ভোগ কর।]

ভারতসন্তানেরা যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ ভুলিয়া না যাইত, তাহা হইলে বৈদেশিক শত্রুরা পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইত না। সম্রাট অশোকের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি—যে সময়ে তাঁহার (অশোকের) রন্ধনালয়ে প্রত্যহ তিনটি পশু বধ করা হইত, সেই সময়েও তাঁহার রাজ্যে কোন হিন্দুসন্তান পূজায় বা যজ্ঞে একটিমাত্র পশু বা পক্ষী বলি দিলেও দণ্ডলাভ করিত। অশোকের এই অদ্ভুত বিচারবুদ্ধিকে আমরা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সম্রাট্ অশোক তাই আমাদের দৃষ্টিতে হিন্দুদ্বেষী। বর্ত্তমানযুগে যাঁহারা পূজায় বা যজ্ঞে পশুবলি নিবারণ করিতে প্রয়াসী তাঁহাদিগকেও 'হিন্দুদ্রোহী' ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

আশ্চর্য্যের বিষয়—দুর্গাপূজায় পশুবলি নিষেধ করিবার জন্য যাঁহাদের এত আগ্রহ, কলিকাতার বিভিন্ন কশাইখানায় প্রত্যহ যে শত শত গোবধ হইতেছে, তাহা নিষেধ করিবার জন্য ইঁহাদের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। ইঁহারা পূজায় বলিদান করিতে হিন্দুদিগকে নিষেধ করেন, কিন্তু কোরবানি করিতে মুসলমানদিগকে নিষেধ করেন না। সম্ভবতঃ এই কারণেই সমিতির নাম 'পশুবধ-নিষেধক সমিতি' না রাখিয়া 'পশুবলি-নিষেধক সমিতি' রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ ইঁহারা বলিতে চান—পশুবধে এমন কি গোবধেও আপত্তি নাই; আপত্তি শুধু হিন্দুদের দেবতার নিকট পশুবলি দানে। ইঁহারা বুদ্ধিমানই বটে; কারণ সম্পূর্ণরূপে পশুবধ নিষিদ্ধ হইলে ইঁহারা কশাইখানা হইতে মাংস কিনিয়া খাইবেন কেমন করিয়া?

পশুবলি-নিষেধক সমিতির মুদ্রিত পত্র হইতে উপরে যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছি; তাহার সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। মহামায়া জগজ্জননী; অতএব পশুরাও তাঁহার সন্তান—এ কথা খুবই সত্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি শুধু মা-ই নহেন; এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়েরও তিনিই একমাত্র অধীশ্বরী। মধুকৈটভের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকেও এই মহামায়ারই উপাসনা করিতে হয়। স্থিতি বা পালনের অধিকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণুকেও ইনিই যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। প্রাণহীন দেহ যেমন কোন কার্য্য করিতে পারে না, তেমনি এই আদ্য-শক্তি সঙ্গে না থাকিলে প্রলয়াধিকর্ত্তা মহেশ্বরও প্রলয়কার্য্য সাধনে

বৈদিক যুগের সঙ্গীত

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় সভ্যতার ন্যায়ই ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসও প্রাচীনত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত। বিশ্ব-সঙ্গীত ভাণ্ডারে ভারতীয় সঙ্গীত অমূল্য বস্তুরূপে বিরাজিত।

স্যার জন মার্শালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে এ কথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সিন্ধু উপত্যকার জনপদগুলিতে সুউন্নত প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত সাধনার ধারা প্রবহমান ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ মার্শাল সাহেবের মতে সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনত্ব খৃঃ পূঃ ৫০০০ থেকে ৬০০০ হাজার বৎসরের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনত্বও তদ্রূপ বলা যেতে পারে। শ্রীদয়ারাম শাহনীর আবিষ্কৃত ব্রোঞ্জ নির্মিত নৃত্যরতা নগ্ন নারীমূর্তিগুলিও বৈদিক যুগের সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য কলাবিদ্যার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। নানা উপজাতির সাঙ্গীতিক উপকরণ ভারতীয় সঙ্গীতে সংগৃহীত হয়েছে এবং বিভিন্ন সঙ্গীতশৈলীর বিচিত্র স্বরসম্পদ আত্মসাৎ করে ভারতীয় সঙ্গীত-সঞ্জীবন শক্তি লাভ করেছে। বৈদিক সাহিত্য, বেদের শ্লোক বা সূক্ত, মহাকাব্য, দর্শন শাস্ত্র, পুরাণ ও কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রভৃতিতে সাঙ্গীতিক তথ্যাদি বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। এই সমুদয় তথ্য বা উপাদানাদি থেকে আমরা তদানীন্তন সঙ্গীতধারা সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে পারি। স্বরগ্রাম লিখনপ্রণালী না থাকায় বৈদিক যুগের ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতধারা ঠিক কেমন ছিল তা আজকের দিনে বোঝা সম্ভব নয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদান থেকেই আমরা যা কিছু জানতে পারি।

বৈদিক যুগে সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গীত-শিল্পের গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। সঙ্গীত সাধনা

সমর্থ হন না। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখিতে পাই—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই মহামায়ার স্তবে প্রবৃত্ত হইয়া যথার্থই বলিয়াছেন—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈব সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি! ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥"

[হে দেবি! তুমিই সব কিছুকে ধারণ করিয়া আছ। এই জগৎ তোমাকর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমিই এই জগৎকে পালন করিয়া থাক, এবং প্রলয়কালে তুমিই সব কিছু ভক্ষণ কর (অৎসি)।]

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন—জগজ্জননী মহামায়াকে সব কিছুর ভক্ষণকারিণীরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। যিনি রণক্ষেত্রে রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরের রুধির পান করিয়াছিলেন, তিনি কি পশুর রুধির পান করিতে পারেন না? যিনি সব কিছু ভক্ষণ করেন, তিনি কি বলির পশুকে ভক্ষণ করিতে অসমর্থ? বাঘিনী যেমন তাহার কোন সন্তানকে রক্ষণ এবং কোন সন্তানকে ভক্ষণ করে, এই আদ্যাশক্তিও কি তেমনি তাঁহার কোন সন্তানকে রক্ষণ ও কোনটিকে ভক্ষণ করিতে পারেন না? উল্লিখিত পশুপ্রেমীদের (?) যুক্তি মানিয়া লইলে যে দেবীর সর্ব্বশক্তিমত্তাই অস্বীকার করিতে হয়। বলিহারী হিন্দুদ্বেষীদের বিচারবুদ্ধি!

চণ্ডীতে দেখিতে পাই—সাম্রাজ্যকামী রাজা সুরথ নিজদেহের রক্ত নির্গত করিয়া (নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্) দেবীর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন; এবং সুরথের এই পূজায় তুষ্ট হইয়াই দেবী তাঁহাকে হৃতরাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির বর দেন। অতএব স্বীকার করা উচিত যে, অধিকারীবিশেষে সাত্ত্বিক ও রাজসিক—উভয়বিধ পূজারই প্রয়োজন আছে।

বর্ত্তমানে যখন চীন ও পাকিস্তানের সাম্রাজ্যলিপ্সু শাসকেরা ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছে, তখন বরং রাজসিক পূজারই ব্যাপক প্রচলন হওয়া আবশ্যক। যে সময়ে জাতিকে সংগ্রামশীল করিয়া তোলা প্রয়োজন, সেই সময়ে 'অহিংসা অহিংসা' বলিয়া চেঁচানো কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

আত্মিক উন্নতির সোপানরূপে পরিগণিত হত। অধ্যাত্ম-বাদের সঙ্গে সঙ্গীতকলার অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সঙ্গীত সাধনায় সবাই আত্মনিয়োগের সুযোগ ও অধিকার লাভ করেছিল। বৈদিক যুগের সঙ্গীত-সাধনা শুধু মাত্র বিলাসের বস্তুরূপে গণ্য হত না—মানবাত্মার কল্যাণকল্পে ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপই সঙ্গীতবিদ্যা নিয়োজিত হত।

আভ্যুদায়িক ও অভিচারিকএর অনুবর্তী বৈদিক রচনাবলী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, আরণ্যক, কল্পসূত্র, শিক্ষা, প্রতিসাখ্য প্রভৃতি স্বরসম্বলিত হয়ে নৃত্য ও বাদ্যাশ্রিত হয়ে গীত হত। সম্মেলক গানও মাঝে মাঝে করা হত; তবে একক গান যেমন—উদ্‌গান, উদ্‌গীতি, স্তোত্র ও গন্ধর্ব প্রভৃতি রীতির গীতই বেশী প্রচলিত ছিল। চারি বেদের মন্ত্র বা সূত্রগুলি সুর সহযোগে আবৃত্তি করা হত। সামবেদের স্বরাশ্রিত মন্ত্রগুলি উদাত্ত ভঙ্গিতে গীত হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল—এইজন্য সামবেদকে সঙ্গীতের আদিপুরুষ রূপে মান্য করা হয়।

বৈদিক যুগের সঙ্গীত নিবাভরণা সুন্দরী নারীর মত ছিল। সঙ্গীত যখন সাবালকত্ব লাভ করল তখন সঙ্গীতে পাঁচ স্বরের আবির্ভাব দেখা দিল—যাকে বলা হয় Pentatonic scale অর্থাৎ পঞ্চস্বরী ঠাট। কিন্তু রাগরাগিণীর মূর্তি তখনও পুরোপুরিভাবে গড়ে ওঠেনি—তবে জাতি, গ্রাম, গ্রামরাগ ইত্যাদিকে পরবর্তীকালে রাগ-রাগিণীর পূর্বপুরুষ বা জনকরূপী উপাদান বলা যেতে পারে। বৈদিক যুগে উপাসনা ও আরাধনারূপেই সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন ছিল বলেই হয়ত রাগরূপের প্রয়োজন তখনও বোধ হয়নি। সহজ সরল স্বরমন্ত্রগুলিই সঙ্গীতের মুখ্য বাহনরূপে কাজ করত। আচার্য কর্কের মতে ঋক্‌মন্ত্র যখন সুর করে গাওয়া হত, তখন তাকে সাম নামে অভিহিত করা হত। সাম গায়কবৃন্দ উদ্গাত বা উদ্গাতা নামে পরিচিত। গ্রামগ্য গান থেকে লৌকিক গান্ধর্ব সঙ্গীত উদ্ভূত বলে জানা যায়; এবং লৌকিক গন্ধর্ব থেকে মার্গসঙ্গীত সঞ্জাত বলে প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্‌গণ বর্ণনা করেছেন। যে গীত-বাদ্য-নৃত্য পদ্ধতি দেশ কাল ও লোককুচির প্রয়োজনে জনসাধারণের মনোরঞ্জন করে তাকে দেশী সঙ্গীতরূপে আখ্যাত করা হয়। এর থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে সঙ্গীতের দুটি মুখ্য বিভাগ ছিল। একটি মার্গ বা উৎকর্ষ সঙ্গীত ও অপরটি দেশী সঙ্গীত।

বীণাবাদ্যকে সে যুগে সমধিক মর্যাদা দেওয়া হত—অবশ্য বীণা বলতে তখন সকল তারযন্ত্রকেই বোঝাত। সে যুগে নানা প্রকারের বীণা প্রচলিত ছিল। যথা: একতন্ত্রী, নকুল, ত্রিতন্ত্রিকা, চিত্রা, বীণা, বিপঞ্চি, মত্ত, কোকিলা, কিন্নরী, নিঃশঙ্ক, পিনাকী প্রভৃতি।

বৈদিক যুগে রাজা মহারাজা ব্যতীত সমাজের অন্যান্য অংশের লোকেরাও সঙ্গীতের রস উপভোগ করতেন। সঙ্গীতে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করতেন তাঁদের মুনি বা ঋষি বলা হত—কখন কখনও তাঁদের নায়ক উপাধিতে ভূষিত করা হত। গোষ্ঠীর অধিপতি ও সদস্যরাও সঙ্গীতাভ্যাস করতেন। বৈদিক যুগে নাদ-তত্ত্বের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। নাদবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রাবলীও তৎকালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। বৈদিক যুগের শেষের দিকে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বরের প্রয়োগ হয়েছিল। সপ্তস্বরের আবিষ্কার ভারতীয় তথা বৈদিক সভ্যতার এক গৌরবমণ্ডিত অবদান। বৈদিক যুগের সঙ্গীতশাস্ত্রে তিনটি 'গ্রামের' উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলির নাম ষড়জ গ্রাম, গান্ধার গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম। এইগুলি এক ধরণের সপ্তস্বরী সমাবেশ। এদের শ্রুতি-বিন্যাস এক থেকে অপরকে পৃথকতা দান করেছে। বর্তমানে শুধু ষড়্‌জ গ্রামই প্রচলিত। প্রাচীনতম সঙ্গীত-শাস্ত্রী ভরতও মাত্র দুটি গ্রামেরই উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

আমাদের লক্ষ্য :

মনুষ্যজাতির উন্নতি যদি তোমার ঈপ্সিত হয়, পূর্ব্ব-কল্পিত সকল সংস্কার বর্জ্জন কর। নব উদ্ভাবিত চিন্তাই নূতন সৃজনে সমর্থ।

মানবাত্মা নিজের কেন্দ্রটুকুর চতুর্দ্দিকেই ঘুরিতেছে না। চিরদীপ্ত অক্ষয় জ্ঞানসূর্য্যকে বেড়িয়াই ইহার মহত্তর পরিক্রমণ।

প্রথমে আত্মস্থ পুরুষের সাক্ষাৎলাভ কর। তারপর চিন্তা ও কর্ম্ম কর। প্রতি তেজোগর্ভ চিন্তা মাত্রই এক একটি নূতন জগতের উদ্বোধন। প্রতি কর্ম্মই চিন্তার স্থূল বিকাশ মাত্র। স্রষ্টার অন্তর্নিহিত আত্মচৈতন্যে কোনদিন এ বিশ্বের কল্পনা জাগিয়াছিল বলিয়াই এই স্থূল জগতের অস্তিত্ব।

মানুষ যাহা চিরকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছে তাহারই পুনরাবৃত্তি আমাদের কার্য্য নহে। নূতন নূতন তথ্যের বার্ত্তা বহিয়া আন, অকল্পিত বিষয়ে বিজয় লাভ কর। কাল ও জগৎ আমাদের ক্ষেত্র, দিব্যদৃষ্টি সৃজনকারী কল্পনা ও অপরিসীম আশা আমাদের পরিচালক, শক্তি, চিন্তা ও শ্রম আমাদের অব্যর্থ আয়ুধ।

নূতন করিয়া কি কিছু আমাদের সাধন করিবার নাই? প্রেম বলিয়া আমরা ত শুধু ঈর্ষা, ঘৃণা ও অহং তুষ্টিকে আলিঙ্গন দিয়াছি, জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভ্রান্তিকেই পোষণ করিয়াছি, আনন্দের পরিবর্ত্তে সুখ দুঃখ ও উদাসীনতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছি; শক্তির নামে দুর্ব্বলতা, প্রয়াস, ব্যর্থ বিজয় গৌরবই অর্জ্জন করিয়াছি, জীবনের পরিবর্ত্তে জন্ম, বর্দ্ধন ও মরণের পথেই চলিয়াছি, ঐক্য ছাড়িয়া সংগ্রাম ও সঙ্গ লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি।

প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি, জীবন, আনন্দ—এক কথায় দেবত্ব—সকলই জগতে নূতন। মানুষ এই সকলেরই সাধন কর। মানুষ তুমি দেবতা হও। ধরণী ত্রিদিবে পরিণত হউক।

নূতনের প্রতি :

বাংলাদেশ আজ প্রকৃতই শ্মশানক্ষেত্র। কোটি কোটি অন্নাভাবক্লিষ্ট নরনারীর তুলনায় দুইচারিজন ভাগ্যবান ধনবান ব্যক্তি গণনার মধ্যেই নহে। যাঁহারা ভোগসুখে আকণ্ঠ নিমগ্ন করিয়া দেশের সর্ব্ববিধ আন্দোলনে শুধুই বক্তৃতা দিয়া বেড়ান, যাঁহাদের নাম দেশের সংবাদপত্রে প্রতিনিয়তই দৃষ্টিগোচর হয়, যাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া শাসিত ও শাসক উভয়েরই সুপরিচিত ও আদৃত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অভাবের মুখ দেখেন নাই, সুতরাং যে বিস্তৃত জনসংঘের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা সংবাদপত্রে বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন অথবা সভামণ্ডপে উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতা করেন—তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের উপদেশ, সেই জনসাধারণের কর্ণে অর্থশূন্য প্রলাপের মত শুনায়, কাজেই দেশহিতৈষীগণের উদ্যম আশানুযায়ী ফলপ্রসূ হইতেছে না।

দুরদৃষ্টক্রমে অন্নচিন্তার দারুণ বিভীষিকা মানুষকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, সংসারের যাবতীয় লোকই উদাসীন, দিনগত পাপক্ষয় করিবার জন্য যাহা নহিলে নয় এইভাবে জীবনযাপন করিতেছে। অভাবের তাড়নায় উচ্চচিন্তা করিবার যন্ত্রগুলি হয় বিকৃত, না হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কোনমতে দেঁত হাসি হাসিয়া দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন সংস্থান করিতে পারিলে ইহারা পরিতৃপ্ত। ঘরে চাউল থাকিলেই ইহারা তাস পিটে, পাশা খেলে, থিয়েটার করে, বড় জোর কোন নূতন সত্যপূর্ণ হিতকর কর্ম্মে কাহাকেও প্রবৃত্ত দেখিলে ইহারা উপহাস করে এবং গোপনে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

দেশ বিকৃত বলিয়াই, এই অশুদ্ধতা দূর করিবার জন্যই আমরা চরিত্রবান, শিক্ষিত, সঙ্কল্পপরায়ণ ধর্ম্মপ্রাণ যুবসঙ্ঘকেই জাগাইয়া তুলিতে চাই। আকাশের বজ্র মাথা পাতিয়া লইয়া, বিকারগ্রস্ত দেশবাসীর উপহাস, উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ক্ষুরধার পথে, ন্যায়পরায়ণতার দৃঢ় যষ্টি হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে মন্থরে, দেশমাতৃকার প্রতি অগাধ অনুরাগে কর্ত্তব্যের সরল পথে তাহারা নিঃসঙ্কোচে আগাইয়া চলিবে।

এই সকল অবনতির কারণ চরিত্রের অভাব। অতএব নিজের চরিত্রকে গঠন করিয়া সমাজের চরিত্র পরিবর্ত্তনই নূতন দলের প্রথম কাজ। অভাবের তাড়না সহ্য করিয়াই নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাহারা অন্তরে সন্ন্যাসী হইবে। তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, গৌরব কিছুই থাকিবে না, থাকিবে শুধু দীনা হীনা কণ্ঠাগতপ্রাণা দেশমাতৃকা—"সুজলা, সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মা" আজ যাহা হইয়াছেন।

স্বার্থসেবার লেশমাত্র যেন তোমাদিগকে কলঙ্কিত না করে। অনাঘ্রাত কুসুমের মত তোমরা বাংলার সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠ—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত

ভূস্বর্গ চঞ্চল

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

মহারাজ হরি সিং তখন কাশ্মীর সিংহাসনে আসীন।

এশিয়ার বুকে সদ্য দুটি স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়েছে—ভারতবর্ষ আর পাকিস্তান। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে সবটা জুড়ে এক ছিল—ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন। কিন্তু মুসলীম লীগ দাবি তুলেছিল মুসলমানদের জন্য চাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসম্মত একটি অঞ্চল। সেটা হবে একটা স্বতন্ত্র রাজ্য। বৃটিশের আদুরে দুলাল মুসলীম লীগ—জিন্নাকে তোষণ করার জন্য এবং চিরকাল ধরে হিন্দু-মুসলমান জনতার মধ্যে একটা বিবাদ জিইয়ে রাখার জন্য গোটা দেশটা তিনটে টুকরো করে দিল বৃটিশ রাজশক্তি। দু'টো টুকরো নিয়ে হ'ল মুসলীম রাজ্য—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। বাকীটুকু নিয়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় গঠিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

কাশ্মীর কিন্তু তখনও স্বতন্ত্র রাজ্য। পাকিস্তান আর ভারত দু'টী সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র তার লাগোয়া দেশ—কিন্তু তবু মহারাজ হরি সিং কারো দিকে ঢলে পড়েন নি। ইংরাজ বন্ধুদের মন্ত্রণায় তিনি ভেবেছিলেন নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখবেন। তিনি ছিলেন করদ রাজ্যের রাজা। এবার হ'বেন স্বাধীন কাশ্মীর রাজ্যের স্বাধীন রাজা।

কিন্তু তা' কি সম্ভব?

কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু—ডোগরা রাজপুত। কিন্তু চল্লিশ লক্ষ কাশ্মীরীর মধ্যে মাত্র ন'লক্ষ্য হিন্দু—বাকী সব মুসলমান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত-আদিবাসী লক্ষ লক্ষ ধনী-দরিদ্র মুসলমান।

সাম্প্রদায়িকতা-বাদী পাকিস্তানী মুসলমান-শাসকরা এমন সুযোগে হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না। দু'মাস পার হতে না হতেই ১৯৪৭ সালের বাইশে অক্টোবর সকাল বেলায় একদল পাকিস্তানী হানাদার কাশ্মীরের সীমান্ত পার হল। কায়েদে আজম জিন্না তখন পাকিস্তানের গভর্ণর। তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে আর বৃটিশের দেওয়া পাকিস্তানী রাইফেল-ষ্টেনগান-হালকা মেশিনগান-হাতবোমা আর মর্টার দ্বারা সজ্জিত হয়ে হাজার হাজার হানাদার কাশ্মীরে ঢুকে পড়ল। একদল জম্মুর কাছে আর একদল পুঞ্চের কাছে সীমান্ত পার হয়ে এগিয়ে চলল রাজধানী শ্রীনগরের দিকে!

হানাদারী আক্রমণ রুখতে গিয়ে প্রাণ দিলেন কাশ্মীরের সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংজী। বৃটিশের ছত্রছায়ায় শাসন আর শোষণ চালিয়ে বেশ নিরুপদ্রব জীবন কাটাচ্ছিলেন মহারাজ হরি সিং। সৈন্য-সামন্ত আর সেনাপতি না থাকলে আবার কিসের মহারাজ! তাই রাজত্বের ঠাঁট-টুকু বজায় রাখার জন্যেই ছিলেন রাজেন্দ্র সিংজী আর শ পাঁচেক সৈন্য! সবচে ধরা আদ্যিকালের রাইফেল নিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হানাদারদের তাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হল না কাশ্মীর-বাহিনীর পক্ষে।

বারমুলারর পতন ঘটল।

হানাদারদের হাতে এবারে প্রাণ দিলেন কাশ্মীরের মুসলীম নেতা মকবল শেরওয়ানী। কাশ্মীর কাশ্মীরীদের—হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান প্রত্যেক অধিবাসীর। মুখে আল্লার নাম নিয়ে মুসলমান-হানাদাররা অত্যাচার চালিয়েছে কাশ্মীরীদের উপর। শেরওয়ানী হানাদারদের এই সব কার্য্যকলাপ সমর্থন করতে রাজী হলেন না—দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন। কাজেই হানাদারদের গুলিতে প্রাণ দিতে হল শেরওয়ানীকে!

মহারাজ হরি সিংএর স্বপ্ন গেল টুটে।

হানাদারদের রুখবার জন্য ভারতের কাছে সাহায্য চাইলেন মহারাজা পঁচিশে অক্টোবর। মহারাজের কাছ থেকে বিশেষ দূত এসে পৌছাল দিল্লীতে। মাউন্টব্যাটেন তখন ভারতের গভর্ণর আর প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল। আশ্চর্য্য! এক বছর আগে ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের নিমন্ত্রণে, কাশ্মীরী জনতার আন্দোলনে মদ্দ দেওয়ার জন্য শ্রীনগরে গিয়েছিলেন জওহরলাল। কিন্তু তাঁকে বন্দী করেছিলেন মহারাজ হরি সিং। শ্রীনগরের সীমান্ত থেকেই সেদিন ফিরতে হয়েছিল নেহেরুকে। এক বছর পরে তাঁরই দরবারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে হাজির হ'লেন মহারাজা।

কিন্তু নিয়ম-অনুযায়ী ত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে পারে না। কাশ্মীর ত ভারতের অঙ্গ-রাজ্য নয়। তাকে সাহায্য করার জন্য ভারত যদি সৈন্য পাঠায় তাহলে অমনি পাকিস্তানও সৈন্য পাঠাবে কাশ্মীরে। হানাদারী আক্রমণ রুখতে গিয়ে সুরু হবে ভারত-পাকিস্তান রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

মহারাজ হরি সিং তখন ভারতে অন্তর্ভুক্তির জন্য লিখিত আবেদন জানালেন। ১৯৪৭ সালের ছাব্বিশে অক্টোবর কাশ্মীর ও ভারতের ইতিহাসে একটী উজ্জ্বল তারিখ।

আর কোন বাধা রইল না। সাহায্য পৌঁছাল সাতাশে অক্টোবর।

ভারতীয় সেনাদল মরণপণ লড়াই চালাল কাশ্মীরের উপত্যকায়। পিছু হটে গেল হানাদাররা। যুক্ত হল উরি-পুঞ্চ-বারমুলা-নৌশেরা-রজৌরী-জম্মু। পিছু হঠতে লাগল তথাকথিত আজাদ কাশ্মীরের মুজাহিদরা। সর্দার ইব্রাহিম খাঁ ও কায়দে আজম জিন্নার শয়তানী মতলব সফল হ'ল না ভারতীয় সেনাদলের বীরত্বে। কাশ্মীর রণাঙ্গনে সেদিন আরও অনেক ভারতীয় সেনার সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলেন কর্ণেল রণজিৎ রায় আর ব্রিগেডিয়ার ওসমান। কাশ্মীর যুদ্ধের উজ্জ্বল ইতিহাস তৈরী হয়েছিল বাঙালী ব্রিগেডিয়ার লওনেল প্রতীপ সেনের বীরত্বে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শয়তানিতে আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতলবে ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীর থেকে সেদিন সমস্ত পাকিস্তানী হানাদারদের বিতাড়ন করা সম্ভব হয়নি। ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রধুরন্ধররা কাশ্মীরে এক অলঙ্ঘ্যনীয় সমস্যা সৃষ্টি ক'রে চেয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা বিষময় সম্বন্ধ তৈরী করতে। যা'তে এ দু'টো প্রতিবেশী রাজ্য কোনদিন না শান্তিতে বাস করতে পারে, এই ছিল তাদের মতলব। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘের তদারকিতে তৈরী হ'ল সীজ-ফায়ার লাইন। দু'টুকরো করা হল গোটা কাশ্মীরকে। পরোক্ষে পাকি-স্তানের হানাদারী-বৃত্তিতে সাহায্য করল ইঙ্গ-মার্কিন-রাষ্ট্রযুথ।

সেদিন থেকে সৃষ্টি হল আজাদ কাশ্মীর।

কাশ্যমীর একটা প্রাচীন নাম। উত্তর ভারতে তখন আর্য্যদের একাধিপত্য। তখন কাশ্যমীর ছিল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। কহ্লন তাঁর রাজরতঙ্গিণী পুস্তকে কাশ্যমীরেব রাজা-রাজড়াদের কথা লিখে গেছেন। বৌদ্ধভারতেও কাশ্মীর রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। বৌদ্ধ-পরিব্রাজক গুণবর্মণ ছিলেন কাশ্মীরের যুবরাজ। রাজসিংহাসনের লোভ ত্যাগ কবে তিনি বহির্ভারতে ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন।

ঈশার জীবনীকাররা বলেছেন যে, ঈশা জেরুজালেম থেকে একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং কাশ্মীর ঘুরে সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। সে-সময় কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধধর্ম আলোচনার কেন্দ্রস্থল। ঈশা এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। খৃষ্টধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাই স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মুঘল সম্রাটরাও কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন।

আধুনিক জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছে মহারাজ রণজিৎ সিংএর আমল থেকে। মহারাজা তাঁর প্রিয় সেনাপতি গোলাব সিংকে জম্মু এবং তার আশ-পাশের জায়গাজমি জায়গীর দিয়েছিলেন। গোলাব সিং হয়েছিলেন জম্মুর প্রথম জায়গীরদার। পাঞ্জাব-কেশরীর মৃত্যুর পর গোলাব সিং দু'কোটি টাকার বিনিময়ে সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর ইংরেজ-সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে রাজা হয়েছিলেন। কাশ্মীর নামে স্বাধীন হলেও একজন রেসিডেন্ট (ইংরাজ) থাকতেন রাজধানী শ্রীনগরে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত পররাষ্ট্র ব্যাপারে নাক গলানোর ক্ষমতা ও অধিকার ছিল না কাশ্মীর রাজ্যের। এমন কি কাশ্মীর সিংহাসনে আসীন থাকা না থাকা নির্ভর করত ইংরাজ রেসিডেন্টের মর্জির উপর। বিগত শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপ সিংকে একবার ইংরাজ রেসিডেন্ট সরিয়ে দিয়েছিল অন্যায় ষড়যন্ত্র করে। মহারাজ নাকি রাশিয়ার জারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—এই ছিল ইংরাজ রেসিডেন্টের অভিযোগ। সাময়িকভাবে সিংহাসনে বসেছিলেন মহারাজার ছোট ভাই অমর সিং। ইংরাজ রেসিডেন্ট এবং অমর সিংএের ষড়যন্ত্রের কথা কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ায় বৃটিশ পার্লামেন্টে

সমালোচনা

আশোকাঞ্জলি—২য় খণ্ড—শ্রীশক্তিকুমার মল্লিক—প্রকাশক স্মৃতিমন্দির—মূল্য ১'৫০। পৃষ্ঠা ৭৭।

সুন্দর প্রচ্ছদপটের অভ্যন্তরে ৭১টি কবিতা। কবির সরল সহজ ভাবের সহিত বইখানার আঙ্গিক সাদৃশ্য আছে।

বেশীর ভাগ কবিতাতেই রয়েছে কবিমনের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সহজ প্রকাশ। প্রাকৃতিক গ্রামীন জীবনচিত্রও কিছু কিছু আছে। বীর পূজার কবিতাও দু' একটি রয়েছে। প্রায় কবিতাতেই কবি একটি নৈতিক ভাব তুলে ধরেছেন।

আধুনিক কবিতার দিক দিয়ে কবি যান নি। কবিতার জন্ম কবিতা সৃষ্টির প্রয়াসও তিনি পাননি। সব কবিতাগুলিই যে কাব্যোত্তীর্ণ এ কথা বলা চলে না। অক্ষর-গুণতি ছন্দ মিলাবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেজন্য নিষ্প্রয়োজনীয় শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রযোগ আছে। ভাষা ও ছন্দগত ত্রুটিবিচ্যুতির ঊর্দ্ধে রয়েছে কবির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সরল সহজ ভাবের অভিব্যক্তি। কবিতাগুলির সার্থকতা সেখানেই।

বর্ণালী—হাসিরাশি দেবী। অনন্যা প্রকাশনী, ১৭, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলকাতা। মূল্য দু' টাকা।

চল্লিশ পাতায় চল্লিশটি কবিতার বই 'বর্ণালী'। কোন এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতাগুলি। ঠিক ধরা যায় না যেন কে সে বন্ধু। কখনও মনে হয় যেন হারিয়ে যাওয়া কোন এক সত্যিকারের অন্তরঙ্গ বন্ধু; কখনওবা জীবন নিয়ে লীলাখেলার পরম বন্ধুকেই জীবনের সকল সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, স্মৃতি-বিস্মৃতি, হর্ষ-বিষাদের সরল অনুভূতি নিবেদন করেছেন কবি।

বেশীর ভাগ কবিতায় বিষাদের ছায়া পড়ে বর্ণালী নামটি আসঙ্গত করে তুলেছে।

—তাই এই শাস্তি কারো নয়
আমারই একার বলে নিশ্চিন্তে মেনেছি পরাজয়।
... ...
এখনও একাকী
কি এক প্রতীক্ষা নিয়ে এইখানে শুধু বসে থাকি।

জীবনের জয়গানও কবি গেছেন—

তবু হাওয়া বয়ে যায়, তবু খুশীভরে দেয় মন
অরণ্য যে কথা কয়—সে কথার জড়ান স্বপন।

আবার বলেছেন—

শীতের রাতির শেষ হল,
এই পথে যেতে যদি দাঁড়াই একটু
তা হলে কিসের ক্ষতি, জানালাটা যদি তুমি খোলো।

কবিমনের অতি সুন্দর আলেখ্য। রচনায় কবির শিল্প নৈপুণ্য ও ভাবময়তার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি রোমান্টিক সুর আছে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ।

মুদ্রণ-প্রমাদ ব্যতীত বর্ণশুদ্ধিও রয়েছে স্থানে স্থানে। কাগজ, ছাপা, গঠন পারিপাট্য ভালো বলা চলে না। দামটা একটু বেশী।

শ্রীজলধর বিশ্বাস

আমেরিকার ইতিহাসের রূপরেখা—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়তা বিকাশের চিন্তা এবং ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থে বিবৃত। 'ঔপনিবেশিক যুগ', 'স্বাধীনতা অর্জ্জন', 'জাতীয় সরকার গঠন', 'পশ্চিম-দিকে সম্প্রসারণ ও আঞ্চলিক বৈষম্য', 'আঞ্চলিক সংঘর্ষ', 'সম্প্রসারণ ও সংস্কারের যুগ', 'বিদেশে সংঘাত ও স্বদেশে সামাজিক পরিবর্ত্তন এবং 'আধুনিক বিশ্ব ও আমেরিকা'—এই মোট আটটি পরিচ্ছেদে আমেরিকার সুবৃহৎ ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তকরণের নিপুণতা গ্রন্থখানিতে লক্ষ্যণীয়। পুস্তকখানিকে আমেরিকার ইতিহাসের মুখবন্ধ বলা চলে। বইখানির শেষে আমেরিকার ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে। চিত্র, মানচিত্র, কাগজ, ছাপা, মুদ্রণ পরিপাট্য সবই আমেরিকার বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও অতুল ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য বহন করে। সাধারণের পক্ষে অল্পের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে জানার বিশেষ সহায়ক হইবে আলোচ্য বইখানি।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

ঝড় বইল। আবার সিংহাসনে বসেছিলেন মহারাজ প্রতাপ সিং।

মহারাজ হরি সিং নিঃসন্তান মহারাজ প্রতাপ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ষড়যন্ত্রকারী অমর সিংহের ছেলে। কাশ্মীর সিংহাসনে মহারাজ হরি সিং শেষ রাজা।

কাশ্মীরের রাজ বংশের ইতিহাসের মতন তার জনগণেরও একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস আন্দোলনের কাহিনীতে উজ্জ্বল। হিন্দু-মুসলমান জনতার মিলিত পদক্ষেপের ইতিবৃত্তে সমৃদ্ধ। বারান্তরে এই ইতিবৃত্ত ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য। (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

ভারত-যুদ্ধের স্থান ও কাল :

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-স্থিত "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি" বিভাগের নব প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টার মহাশয়ের আহ্বানে বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী এক আন্তঃবিশ্ব-বিদ্যালয় আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়। ভারতের প্রধান ২২টি বিশ্ব-বিদ্যালয় এই আলোচনাচক্রে যোগদানের জন্য আহূত হইয়াছিলেন এবং মাত্র ২।৩টি ছাড়া বাকী প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই অধ্যাপক-প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আলোচ্য বিষয় ছিল "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ" (Bharat War)। এইদিন সভাপতিত্ব করেন খ্যাত-নামা ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয় এইদিন দুইটি ভাষণ দেন। পূর্ব্বাহ্নে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল (Date of the Bharata War) সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সুদৃঢ় যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১৩৭ অব্দে ডিসেম্বর মাসে এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৮ দিন পরে পরবর্ত্তী সনের জানুয়ারী মাসে উহার সমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধারম্ভকালে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথি এবং ভরণী নক্ষত্র ছিল আর যুদ্ধের সমাপ্তি দিন ছিল অমাবস্যা তিথি। বক্তৃতার পর আলোচনা হয়। তাহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর বি. পি. সিংহ এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর রমা রাও। অধ্যাপক সিদ্ধান্তশাস্ত্রীর সুদৃঢ় যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ কেহই খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

এইদিন বিকালে "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্থান" (Venue of the Bharata War) সম্বন্ধে অধ্যাপক সিদ্ধান্তশাস্ত্রী আর একটি ভাষণ দেন। তিনি সুদৃঢ় প্রমাণাদির সাহায্যে প্রদর্শন করেন যে, প্রকৃত রণক্ষেত্র ৪০ মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্র ছিল। উভয়পক্ষের শিবিরসহ বিস্তৃততর রণক্ষেত্রের সীমা ছিল এই প্রকার—পূর্ব্বসীমা (উত্তর-দক্ষিণে) ৫৪ মাইল, পশ্চিম সীমা ৪০ মাইল, উত্তর সীমা (পূর্ব্ব-পশ্চিমে) ৪০ মাইল এবং দক্ষিণ সীমা ২৫ মাইল। এই রণক্ষেত্র বর্ত্তমান দিল্লীর অনতিদূরে অবস্থিত ছিল এবং ইহা উত্তরে সরস্বতী নদী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদী, পূর্ব্বে ব্রহ্মবর্ত্ত দেশ এবং পশ্চিমে কাম্যক বন ও পরীণ নামক নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। অধ্যাপক সিদ্ধান্তশাস্ত্রীর এই মতটিও কেহ খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষণ দুইটি রেকর্ড করা হইয়াছে। অন্যান্য বক্তৃতাবলীর সহিত সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ভাষণ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রবর্ত্তক ট্রাষ্টের বার্ষিক সাধারণ সভা :

অধ্যাত্ম যোগ-সংস্থা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের স্বাবলম্বন সাধনার প্রতীক প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট। গত ৯ই অক্টোবর বেলা আড়াই ঘটিকায় সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের পৌরোহিত্যে কলিকাতাস্থ প্রবর্ত্তক ভবনে ট্রাষ্টের ৩২৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৭১ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ পায়, আলোচ্য বর্ষে সাকুল্য খরচ বাদে ট্রাষ্টের উদ্বৃত্ত হইয়াছে ৬,১৫৮-৬৭ টাকা। ট্রাষ্ট পরিচালিত কোম্পানীসমূহের মধ্যে প্রবর্ত্তক কমার্শিয়াল করপোরেশন লিঃ ও প্রবর্ত্তক ফার্মিশাস লিঃ-এর লাভ হইয়াছে যথাক্রমে ১২,৭১৫-৮১ (আয়কর বাদে) ও ২৪,৮৯৩ ৪১ (আয়করসহ) টাকা এবং উভয় কোম্পানীই সাধারণ অংশের উপর যথাক্রমে ৪% ও ৫% লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী সম্পর্কিত নূতন আইনের আওতায় ট্রাষ্টের ম্যানেজিং এজেন্সী বিলুপ্ত হওয়ায় ট্রাষ্ট পরিচালিত কোম্পানীগুলির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ শ্রীইন্দুভূষণ রায় ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী প্রবর্ত্তক ফার্মিশার্স লিঃ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ প্রবর্ত্তক কমার্শিয়াল করপোরেশান লিঃ ও শ্রীফণিভূষণ রায় প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লি.-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। বিষয়টি লইয়া সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ শব্দ তত্ত্ব ১৫-০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲
॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

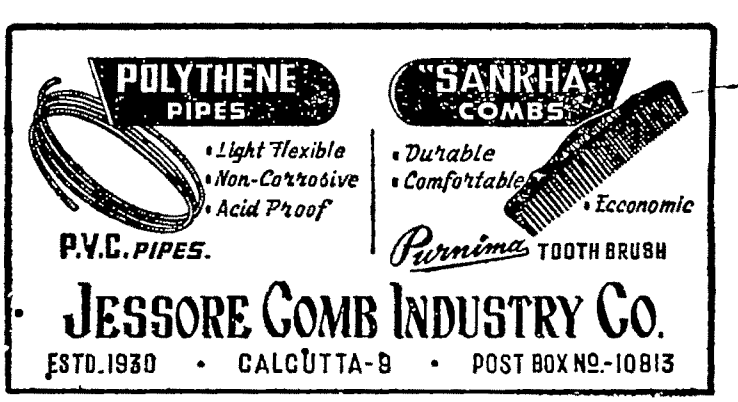

যোষ বিভিন্ন দিক্ দেখাইয়া এই অনভিপ্রেত পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করেন।

সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীদত্ত তাঁর দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণে সঙ্ঘসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, ট্রাষ্ট সঙ্ঘগুরুর অর্থন্যাস। কিন্তু উহা অধ্যাত্ম ন্যাস। এই ন্যাস ধারণে ও পালনে ন্যাসের ও ধারকেরও সার্থকতা। ইহার সূচনা ও পরিণতি শ্রীগুরুরই সাক্ষাৎ দায়িত্বে। প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট অর্থক্ষেত্রে সঙ্ঘত্বেরই রূপায়ন। সৃষ্টি ও সংহতি প্রবর্ত্তক ট্রাষ্টের সংযুক্ত প্রেরণা। যুগের আইনে প্রবর্ত্তক ট্রাষ্টের ম্যানেজিং এজেন্সী লুপ্ত হ'ল। ইহাতে সঙ্ঘবোধের কোন ব্যত্যয় হবে না। ব্যক্তিত্বের আধারে সঙ্ঘত্বের পূর্ণাভিব্যক্তি না হলে ব্যক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহা ব্যক্তিত্বের পূর্ণাভিষেক বলা চলে সঙ্ঘত্বে। এই সাম্প্রতিক রাষ্ট্রিয় বিধান কাঁচা 'আমির' সঙ্ঘসিদ্ধ পাকা 'আমি'তে রূপান্তরিত হওয়ারই সহায়ক হইল।"

সভাপতি শ্রীদত্ত ম্যানেজিং এজেন্সী বিষয়ক নূতন পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটি চমৎকার দিগ্দর্শন দেন। তিনি বলেন, "কোম্পানীর অংশীদারদের সঙ্ঘের সহযোগী, সাধারণ বা আজীবন সভ্য হিসাবে সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিলে অর্থনীতিক্ষেত্রে সঙ্ঘত্বেরই বিজয় হইবে না, পরন্তু যুগের অর্থসাধনার নূতন দিগ্দর্শনও দিতে পারিবে। ইহা কল্পনা নয়, বস্তুতন্ত্র সাধ্যবস্তু—গুরুকল্পিত অর্থ সৃষ্টির যুগোপযোগী বিবর্ত্তন।"

মেসার্স এন, চৌধুরী এণ্ড কোং আগামী বর্ষের জন্য পুনরায় হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। সভান্তে উপস্থিত সভ্যসভ্যাগণকে জল-যোগের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণ :

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ গত ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় মহাপ্রয়াণ করেন। অগণিত অনুরাগী-ভক্ত-শিষ্য ও দর্শকের উপস্থিতিতে স্বামীজীর নশ্বর দেহ পরদিন বেলা ৯ টায় বেলুড় মঠে সৎকার করা হয়। মাধবানন্দজীর গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল নির্ম্মল। ১৮৮৮ সালে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বাগআঁচড়া পল্লীতে তাঁর জন্ম। ১৯১০ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে আত্মোৎসর্গ করেন। স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ দীক্ষিত সন্তান ছিলেন। অত্যন্ত কঠোর নিষ্ঠাবান কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধক ছিলেন স্বামীজী। সংস্কৃত ও ইংরাজীতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ তাঁকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই তপঃপূত সন্ন্যাসী যে সংগঠনমূলক কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা মিশন-জীবনে দৃষ্টান্তস্থানীয় হইয়া থাকিবে। রামকৃষ্ণ মিশনের আজকের শ্রী ও সমৃদ্ধিতে মাধবানন্দ মহারাজের অবদান অপরিসীম।

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্ম্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

(সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়)

পুস্তকের বিষয় :

- প্রথম জীবন
- দেশের তৎকালীন অবস্থা
- স্বদেশী আন্দোলন ও শ্রীমতিলাল
- শ্রীমতিলালের সাহিত্যকৃতি
- শ্রীমতিলালের সংগঠনী শক্তি

ইত্যাদি

দাম মাত্র এক টাকা।

'প্রবর্ত্তক'এর গ্রাহক ও সভ্যসভ্যাদের জন্য শতকরা ২৫/. কমিশন।

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

প্রেমমন্দিরে মহামিলন :

গত ৩০শে আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যায় ৬টায় ভারতবিশ্রুত মহাত্মা শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী কয়েকজন শিষ্যসহ আকস্মিক রিষড়া প্রেমমন্দিরের বিগ্রহ ৺অর্দ্ধনারীশ্বর দর্শনে উপস্থিত হইলে শ্রীমৎ বালানন্দজীর সুযোগ্য শিষ্য মন্দিরস্থিত ব্রহ্মচারী তারানন্দ মহারাজ তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সাদর অভ্যর্থনা করেন। এ হৃদয়স্পর্শী যোগ ও ভক্তির মহামিলন উপস্থিত সকলকে প্রেমাপ্লুত করে।

শোক-সংবাদ :

চট্টল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর পরমারাধ্যা মাতৃদেবী গত ২৪শে ভাদ্র তদীয় মধ্যমপুত্র শ্রীনীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর ২২নং উপেন্দ্রলাল মুখার্জ্জি রোডস্থ (দক্ষিণেশ্বর) বাসভবনে পরলোক গমন করেন। বিগত ৫ই আশ্বিন তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি সনিষ্ঠাস্ত সম্পাদিত হয়। পাকিস্তানের সহিত সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বীরেন বাবুকে সময় মত মাতৃবিয়োগ সংবাদটিও দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীইন্দুভূষণ রায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রম সংশোধন :

গত আশ্বিন সংখ্যা প্রবর্ত্তকের ২৬০ পৃষ্ঠায় 'স্বাগত বিশ্বসমাজ' কবিতার চতুর্থ স্তবকের প্রথম ছত্রের 'নাবালক ছেলেমেয়েদের' পরে 'দায়' শব্দটি সংযোজিত হইবে এবং ষষ্ঠ স্তবকের প্রথম ছত্রের 'ভেজালদাতাদের' স্থলে 'ভেজালদায়ে' হইবে। এই সংখ্যারই ২৭৬ পৃষ্ঠায় 'রথযাত্রা' কবিতার ৮ম পংক্তিতে 'পাও সবে মিলি' স্থলে 'পাল সবে মিলি' এবং একাদশ লাইনে 'যদি আসে হেথা পুনঃ' স্থলে 'যদি আসে হেথা হুণ' হইবে।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

জয় জোয়ান, জয় কৃষাণ !

খাদ্যে ও শস্ত্রে স্বাবলম্বনের উপর নির্ভর করছে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কারখানা ও কৃষিক্ষেত্র আজ প্রাণকেন্দ্র। তাই ভারতের প্রিয় প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজীর শ্লোগান—জয় জোয়ান, জয় কৃষাণ। ভারতবাসী যে যেখানে আছে সকলেই সৈনিক—এই অম্লান চেতনা নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই যেন উদ্যত হই—হই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।

সর্বজন প্রশংসিত বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : [ফোন ৩৩-২৩০৩]

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]

বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি রুচিসম্মত কাপড়ের বিপুল সম্ভার। আধুনিক ডিজাইনের দেশী তাঁতের শাড়ী। গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার বিপুল আয়োজন।

An Important Announcement

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR ★ DOUBLE ENDED-GRINDER
★ POLISHING & BUFFING ★ FLEXIBLE SHAFT GRINDER etc. etc.

MANUFACTURED BY :

KSHAMA ELECTRO WORKS

146, SHYMNAGAR ROAD, DUM DUM, CALCUTTA-28. Phone : 57-2799

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র · প্রবর্ত্তক : অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	৩২৩
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	৩২৪
সম্পাদকীয়	...	...	
প্রাচ্যের জাগরণে চীন ও জাপানের ভূমিকা	প্রবন্ধ	শ্রীঅরবিন্দ অনুবাদক : শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়	৩৩১
তোমাদের প্রতি	কবিতা	শ্রীতারাশঙ্কর	৩৩৪
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	৩৩৯
জীবন-কাব্য	কবিতা	শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৯
বাংলার স্বরূপ	প্রবন্ধ	শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৪০
কালজয়ী	গল্প	শ্রীহংস	৩৪২
সৈনিক যদি শান্তি চাস্ তো—	গান	শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	৩৪৪
শ্রীঅরবিন্দ সরণি	স্মৃতিকথা	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৩৪৫
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	ইতিবৃত্ত	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৩৪৭
তুমি মিতা শুধু আলো	কবিতা	অধ্যাপক গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়	৩৫০
ভূস্বর্গ চঞ্চল	কাহিনী	শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার	৩৫১
চীন—যতটা হুস্‌কি ততটা নয়	নিবন্ধ	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৩৫২
জগদ্ধাত্রী	কবিতা	শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত	৩৫৩
পঞ্চাশ বছর আগে	সংকলন	শ্রীনির্ম্মলকুমার সেনগুপ্ত	৩৫৪
ভক্ত ও ভগবান	গল্প	শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৩৫৫
সৈনিক	কবিতা	শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩৬০
জাতিগঠনে খাদ্য	সমালোচনা	শ্রীরাধারমণ চৌধুরী	৩৬১
সাময়িকী	...	... ...	৩৬৪

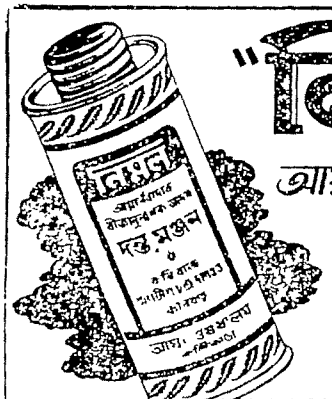

"নিমন"

আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অম্লজনিত দন্তের ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সুরভিত হয়।

আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা-১৭

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥

স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২·৫০

জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪·০০

Living Knowledge 4.00

(যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি বিশ্লেষণ নৈপুণ্য। মুমুক্ষু নিশ্চয়ই সাধনার আলো ও পথ পাইবেন)

॥ শুভঙ্করের ॥

মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪·০০

(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)

॥ শ্রীনবেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত ॥

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩·০০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

॥ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ)· ৭-৫০; **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ; **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত : "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক-পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় ○ ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নবেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াল পাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

মিষ্টান্ন জগতে বিশেষ আকর্ষণ

ইন্দ্র'র

- উৎকৃষ্ট দধি
- ক্ষীরের খাবার
- স্পঞ্জ রসগোল্লা ও চমচম্

বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে।
সকল অনুষ্ঠানেই সযত্নে অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৫-১৩৮৩

৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-২৫৩৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিলতৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃরোগে অব্যর্থ

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনসাধারণের উপর অপরিসীম

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স কলি:-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলি:-৬

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক; সম্পূর্ণাঙ্গ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইণ্ডিং কারখানা।
পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি:৬
ফোন: ৩৪-৩৭১১

৫০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | স্বুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

জীবনের আলো

আমাদের সম্মুখে যে যুগ উপনীত, সে যুগ ভারতের প্রসিদ্ধ চতুর্যুগের অন্তযুগ। কলি নামে ইহা খ্যাত। এই যুগে শত্রু মিত্র হইবে, মিত্র শত্রুরূপে পরিণত হইবে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, স্বামী পত্নীকে প্রবঞ্চনা করিবে। পিতার প্রতি পুত্রের, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর শ্রদ্ধা থাকিবে না, প্রণয়ের অভাব হইবে। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিতে খাদ্যশস্যের অভাব হইবে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। বর্ণ, আশ্রম নিশ্চিহ্ন হইবে। আত্মচৈতন্য হারাইয়া মানুষ স্বার্থের দায়ে সমাজ গড়িবে। সত্যচ্যুত হইতে কাহারও বাধিবে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে মানুষ অধিক উদ্যত হইবে। রাজদণ্ড দুষ্কৃতি দমনের নামে স্বধর্ম্মপরায়ণ লোকদেরই শাসন করিবে, বন্ধন করিবে। রাজার প্রতি প্রজার, প্রজার প্রতি রাজার চাতুরী বৃদ্ধি পাইবে। শান্তি ও সন্তোষ চিরবিদায় লইবে। স্বার্থাকাঙ্ক্ষার বারুদের গাদা লইয়া মানুষ হইবে এক একটা আণবিক বোমার মত বিপজ্জনক। কে কখন কাহার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহার ইয়ত্তা থাকিবে না। কলিযুগের ইহা পরিণত মূর্ত্তি। এই যুগকে আবার শূদ্রযুগও বলা হয়; কিন্তু শূদ্রযুগও আবার অনতিকাল মধ্যে তিরোহিত হইবে। সেইটাই প্রকৃত ম্লেচ্ছযুগ। শাস্ত্রে আছে, ম্লেচ্ছযুগে ভাগীরথী একটি রেখামাত্রে পরিণত হইবেন। বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধনজীও তিরোহিত হইবেন। এক কথায় পৃথিবী হইবে কালকূট বিষ-পাত্র। অমৃতের স্মৃতি থাকিবে—সন্ধান মিলিবে না। এই কঠিন কৃষ্ণ মূর্ত্তি যুগের সম্মুখে ভারতের এক শ্রেণীর মানুষ তিলে তিলে রক্ত দান করিবে ভবিষ্যতের আশায়। ইহাদেরই আত্মদানে ব্রহ্মণ্য-প্রতিভাদীপ্ত শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুযশার আবির্ভাব সম্ভব হইবে এবং এই বিষ্ণুযশার বীর্য্যে ও ঔরসে "ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে ধূমকেতুর" ন্যায় কল্কিদেবতার আবির্ভাব হইবে—যিনি আবার শাশ্বত সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের হিমালয় শিরে কৃতযুগের পতাকা উড়াইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিবেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। জগৎ পাইবে শান্তি ও আলো—আনন্দ ও অমৃত। সেদিন বহু দূরে হইলেও আসিবে সেদিন আসিবে। (১৩৫৩ সালের প্রবর্ত্তক হইতে সঙ্কলিত)

—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। অষ্টত্রিংশৎ সূক্তং।) ত্রয়োদশী-পঞ্চদশী ঋক্

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিং।

অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—"ব্রহ্মণস্পতিং" (লোকপালক দেবতাকে) "অগ্নিং" (অগ্নিদেবতাকে) "মিত্র" (সূর্য্যদেবতাকে) "ন দর্শতং" (লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না) "জরায়ৈ:" (স্তোত্রের দ্বারা) "অচ্ছা" (ঐসকল দেবতার অভিমুখে) "তনা" (তনয়া—দেবতাদের স্বরূপ প্রকাশক) "গিরা" (বাক্যের দ্বারা) "আবদ" (উচ্চারণ করুন) ॥ ১৩ ॥

সরলার্থ—হে ঋত্বিক সঙ্ঘ! লোকপালক ব্রহ্মণস্পতি, অগ্নিদেবতা এবং সূর্য্যদেবতাকে যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না, তথাপি স্তবের দ্বারা তত্তৎদেবতার অভিমুখে দেবতাদের স্বরূপ প্রকাশক স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণ করুন ॥ ১৩ ॥

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জ্জন্য ইব ততনঃ।

গায় গায়ত্রমুক্থং ॥ ১৪।

অন্বয়—হে ঋত্বিকগণ! "পর্জ্জন্যঃ" (মেঘ) "ইব" (যেমন) "ততনঃ" (বিস্তার করে) "আস্যে" (বদনে) "শ্লোকং" (মন্ত্রসমূহ) "মিমীহি" (উচ্চারণ করুন) "গায়ত্রং" (গায়ত্রীছন্দোযুক্ত) "উক্থং" (বেদমন্ত্র-সমূহ) "গায়" (পাঠ করুন) ॥ ১৪) ॥

সরলার্থ—হে ঋত্বিকগণ! মেঘ যেমন বিস্তৃত হয়, তেমনি মুখে মুখে মন্ত্রসমূহ বিস্তারলাভ করুক। গায়ত্রীছন্দোযুক্ত বেদমন্ত্রসমূহ পাঠ করুন ॥ ১৪ ॥

বন্দস্বং মারুতং গণং ত্বেষাং পণস্যুতমর্কিণং

অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—হে ঋত্বিকসঙ্ঘ! "তেষাং" (দীপ্ত) "পণস্যুং" (স্তুতিযোগ্য) "অর্কিণং" (অর্চ্চনাপ্রাপ্ত) "মারুতং" (মরুৎ সম্বন্ধীয়) "গণং" (সমূহকে) "বন্দস্ব" (কামনা করুন বা নমস্কার করুন) "অস্মে" (আমাদের) "ইহ" (এই কর্ম্মে) "বৃদ্ধা" (প্রবৃদ্ধ) "অসন্" (হউন) ॥ ১৫ ॥

সরলার্থ—হে ঋত্বিকসঙ্ঘ! দীপ্ত, স্তুতিযোগ্য এবং অর্চ্চনাপ্রাপ্ত মরুদ্দেবগণকে বন্দনা করুন। আমাদের কর্ম্মে মরুদ্দেবগণ প্রবৃদ্ধ হউন ॥ ১৫ ॥

বিশদার্থ—অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের শেষ তিনটি মন্ত্রই প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা মরুদ্দেবগণের নিকট। তাঁহাদের সহায়তায় মন্ত্রমুখে যেন ব্রহ্মণস্পতি, অগ্নি ও মিত্রদেব প্রকাশিত হন—এই আকুতিই ঋষি জানাইয়াছেন।

দেবতারা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট। প্রকাশকত্বই তাঁহাদের স্বভাব-ধর্ম্ম। কারণ, তাঁহাদের কোন স্থূল দেহ নাই। মন্ত্রই তাঁহাদের দেহ। সেইজন্য ঋষি ঋত্বিকদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আপনারা দেবতাদের স্বরূপ প্রকাশক স্তোত্র-মন্ত্র সকল উচ্চারণ করুন। কারণ তাঁহারা বাহ্যদৃষ্টির গোচরীভূত নন। মন্ত্র-মুখেই তাঁহারা প্রকাশিত। মেঘের বিস্তৃতির ন্যায় আপনাদের মুখে মন্ত্রসমূহও বিস্তৃতিলাভ করুক। আপনারা গায়ত্রীছন্দোযুক্ত বেদমন্ত্রসকল পাঠ করুন এবং উদ্গীথ গান করুন—তাহা হইলেই মরুদ্দেবগণের সহিত ব্রহ্মণস্পতি, অগ্নি ও মিত্রদেবতাও প্রবৃদ্ধ হইবেন। এই তিনটি ঋক্মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা, নিয়ম, নীতি ও বিধি সম্বন্ধেও সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

যজ্ঞের প্রয়োজন মানবকল্যাণ। মানবের হিতার্থেই ঋষিরা নিত্য নিয়মিতভাবে যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিতেন। সূক্ষ্মদেহধারী দেবতারা যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন এবং যথাকালে তাহা

একটি ভবিষ্যৎ

আনন্দ ভিক্ষু

শিল্পী যখন ছবি আঁকে, তখন তার পরিকল্পনা প্রথমে হয় চিত্তপটে, তারপর প্রতিফলিত হয় চিত্রপটে। অব্যক্ত জগৎ থেকেই সমস্ত ব্যক্ত বিশ্বের অভিব্যঞ্জনা—রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল তারা অনেক পরে। এমনি করেই যা অবাস্তব, যা অরূপ তাকে আমরা পাই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় জগতে।

আদর্শ শুধু স্বপ্নলোকের অসম্ভাব্য কিছু নয়, বাস্তবের মাঝেও সে সম্পূর্ণ, সার্থক হয়ে দেখা দেয়। সূক্ষ্ম জগতের ঘটনা, যাকে আমরা কল্পনা বলছি, তাকে আমাদের বাস্তব জগতে মূর্ত্ত করতে সময় লাগে, কিন্তু অন্তরের বুকে যেখানে কাল সীমাবদ্ধ নয়, যেখানে ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের পৃথক কোন অস্তিত্বই নেই, স্বতন্ত্র সত্তা নেই সেইখানে ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বের লীলা একই সময় প্রকটিত হচ্ছে। চৈতন্যের, সম্বিতের এমন একটা সত্তা আছে, যেখানে উন্নীত হতে পারলে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র বিধান আর নিগূঢ় নিয়তি উপলব্ধি করা সম্ভব।

চৈতন্যের সেই উচ্চভূমে যাঁরা আরূঢ়, যাঁরা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের মাঝখানেও সেই একের অপরূপ লীলা প্রত্যক্ষ করছেন, যাঁরা সেই নিগূঢ় নিয়তির পরম পরিণতি, বিধাতার বিচিত্র বিধান লক্ষ্য করছেন, তাদের কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি, আদর্শ বাস্তবকে সৃষ্টি করছে। বর্ত্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের প্রভাব সুস্পষ্ট। বৃক্ষের বীজের মধ্যে তার বৃক্ষত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে; বীজকে তার সমস্ত বাধা বিঘ্ন জয় করে মহান্ মহীরুহে পরিণত হতে হবে। ভবিষ্যতের বিরাট বৃক্ষ যা রয়েছে কল্পনায় তারই আদর্শে পরিচালিত হয়ে, তারই আকর্ষণে বীজ বৃক্ষত্বের অভিমুখে অগ্রসর হয়। বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা আছে, তা ক্রমাভিব্যক্তির। প্রাণ আপনাকে অভিব্যক্ত করবার প্রচেষ্টায় নব নব মূর্ত্তি গ্রহণ করছে, খনিজ জগতে সেই সমষ্টি প্রাণ আপনাকে অভিব্যক্ত করতে করতে যখন পরিণতি লাভ করেছে, তখন সে এসেছে উদ্ভিদ্-রাজ্যে। সেই জগতে তার গতি হয়েছে পূর্ব্বের চাইতে সবল ও লীলায়িত, আরও ব্যাপক, আরও চঞ্চল অভিব্যক্তির আবেগে সেই অব্যাকৃত প্রাণশক্তি প্রাণিরাজ্যের বিকাশ করল। সেখানেও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি, বিচিত্রতর—উন্নততর

আবার মানবকল্যাণেই প্রত্যর্পণ করিতেন। কিভাবে তাঁহারা যজ্ঞে আবির্ভূত হইতেন? ঋষি বলিতেছেন—"জরায়ৈঃ অচ্ছা তনা গিরাঃ"—স্বরূপ-প্রকাশক স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা।

যজ্ঞে যাঁরা ব্রতী হন, তাঁদের বলা হয় ঋত্বিক। তিনটি ঋঙ্মন্ত্রের কোনটিতেই কিন্তু ঋত্বিকের নামোল্লেখ নাই—অথচ আচার্য সায়ন প্রথমেই "হে ঋত্বিকগণ" বা "হে ঋত্বিকসঙ্ঘ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তার কারণ, সাধারণতঃ একটি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে চারি প্রকার ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু এবং উদ্গাতা। ব্রহ্মা ত্রিবেদজ্ঞ—তাঁরই পরিচালনায় যজ্ঞকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। হোতা—ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ করেন; অধ্বর্য্যু যজুর্মন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন; এবং উদ্গাতা সামমন্ত্রে উদ্গাথ গান করেন। হোতা, অধ্বর্য্যু এবং উদ্গাতা—এক একটি বেদে পারদর্শী হইলেই চলে—কিন্তু ব্রহ্মা যিনি হইবেন, তাঁহার তিনটি বেদেই সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—"যিনি ব্রহ্মা, তিনি যজ্ঞের চিকিৎসক। যজ্ঞে যদি ঋক্, যজু, সাম অথবা কোন অজ্ঞাত মন্ত্র হইতে আর্ত্তি ঘটে, তবে ঋত্বিকেরা তাহা ব্রহ্মাকেই জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মা সেই সেই বেদের মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া মন্ত্রশুদ্ধ করেন।"

এই তিনটি ঋক্‌মন্ত্রে ঋষি যেন স্বয়ং ব্রহ্মার আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যান্য ঋত্বিকদের নিজ নিজ বেদ-মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে বলিতেছেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলেও মরুদ্দেবগণসহ অন্যান্য দেবতারাও প্রবৃদ্ধ হইবেন। দেবতা প্রবৃদ্ধ হইলেই মানবকল্যাণ সিদ্ধ হইবে। "দেবান্ ভাবয়তানেন, তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথঃ।" গীতার বাণী ও বেদবাণী এক এবং অভিন্ন।

বিকাশ ব্যবস্থাপনার মহাসমারোহ বেয়ে সে অভিব্যক্ত করেছে মানব রাজ্য। মানব রাজ্যের উদ্ভাবন করে কি সেই মহাপ্রাণ তার অভিব্যক্তির জয়যাত্রা পরিসমাপ্ত করেছেন? —না, সে চলবে আরও এগিয়ে অতি-মানবতা ও মানবাতীত অভিব্যক্তির অভিমুখে?

মানব রাজ্যে এসে, এই অব্যাকৃত প্রাণশক্তি প্রথমে কেবল আদান করেছে, আত্মসাৎ করেছে, যা-কিছু করেছে, তা আত্মতৃপ্তির জন্য, আপনার অভিব্যঞ্জনাকে পরিপুষ্ট করার জন্য, কিন্তু অনন্তকাল তো এমনি করে চলতে পারে না; বিধাতার বিচিত্র বিধান তা নয় যে, মানুষ শুধু ভোগ করবে আত্মতৃপ্তির জন্য; দেহাত্মবোধেই তার চরম পরিণতি নয়, অথচ মানুষকে জোর করে কিছু করানও প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কারণ তা হলে মানুষ যে হয়ে উঠবে স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত এক যন্ত্রবিশেষ। প্রকৃতির প্রকৃষ্ট প্রেরণা মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে নিজেরই বিরুদ্ধে, তার ভাব, চিন্তা যত মার্জ্জিত হয়ে ওঠে, আবিলতাময় ভোগে ততই তার বেড়ে ওঠে অতৃপ্তি। সে সংগ্রাম করে চলে, প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, অপরের অধিকারকে বার বার ক্ষুণ্ণ করে।

জীবনকে সে এতদিন খণ্ডিত করে দেখেছে, সমগ্রকে সুসংহত, সুবিন্যস্ত করে দেখতে পায়নি, কিন্তু অতৃপ্তির ক্লান্তি তাকে বিশ্লেষণের, অন্তর-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিয়ে এলে, এখানে এসে সে বুঝতে পারল শান্তির পথ, তৃপ্তির পথ ও-নয়। বুদ্ধি দিয়ে সে এতদিন নিজেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখে এসেছে; এবার সে বোধির শক্তিতে বুঝতে পারল, আজ আর সে বিরোধ চায় না, বিদ্বেষ চায়না, চায় শান্তি, চায় বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে একান্ত যুক্তি—সকলের মধ্যে একাত্মবোধ করে। বৃহৎকে সে উপলব্ধি করতে চায়।

এই সম্যক্ সম্বোধি লাভ করবে বর্ত্তমানের মানুষ—যা বুদ্ধের জীবনে, যিশুর জীবনে, কন্‌ফুসিও ও জারাত্রষ্টবের জীবনে সম্ভব হয়েছিল—তাই সম্ভব হবে সমগ্র মানব জীবনে।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ তখন সুদূর পরাহত বলে মনে হবে না, তা হবে তখন মানব জীবনের এক অঙ্গীভূত বাস্তব সম্পদ। এই মহা আসুরিকতার ঘনঘটাময় মহা-তামসী রাত্রি নিশ্চিত অপসারিত হবে এবং বিশ্বে গড়ে উঠবে এক অন্তর সভ্যতায় দৃঢ় মানব সমাজ—যে সমাজে বিকশিত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অপরূপ সমন্বয়ে সৃষ্টি করবে এক অধ্যাত্মিক শক্তি সংহতি। তখন এক অভিনব সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হবে, বিশ্বের জ্ঞানী গুণী, প্রেমিক ও বিজ্ঞানীদের মিলিত শক্তি মানব সমাজের কর্ণধার হয়ে গড়ে তুলবেন এক মহান্ আদর্শময় বিশ্ব—যে বিশ্বে, শান্তি, সাহস, ঐক্য ও অহিংসা প্রকৃত ভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, যে শক্তি আজ আসুরিক প্রেরণায় বিশ্বধ্বংসের হুংকার ছেড়ে সমগ্র মানবতাকে অবমানিত ও লাঞ্ছিত করে চলেছে, সেই শক্তিই প্রতিজনে দেবে অমৃতের আনন্দ।

অভাবনীয় প্রাচুর্য্যের ছায়ায় অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ দৈন্য আর মানবতাকে উপহাস করতে পারবে না, ভ্রাতৃপ্রেমে তাকে ধূলো ঝেড়ে বুকে তুলে নেবে।

প্রত্যেক মানুষ জীবন সংগ্রামে সমান অধিকারে হাত ধরাধরি করে আনন্দের অমৃত-সাগরে সাঁতরে চলবে, কোথাও কোন প্রকারেরও এতটুকু দাসত্বের দীনতা থাকবে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটে উঠবে সহযোগিতায়, সমস্ত দেশের, সমগ্র মানবের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, সাধনা, সভ্যতা এক হয়ে গড়ে তুলবে এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান্ আদর্শ ও কর্ম্মময় স্বর্গলোক, এই সেই একটী যুগ-প্রাণ (Time-spirit) সমাগত। এরই জন্য চাই আমাদের ঐকান্তির আন্তর প্রস্তুতি, বিশ্ব মননক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদের নির্ভীক ঐক্যবদ্ধ কর্ম্ম প্রবর্ত্তনা।

সম্পাদকীয়

অখণ্ড ভারতের ভিত্তি অধ্যাত্ম জাতীয়তা :

গত সংখ্যা প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয় আমরা শেষ করিয়াছিলাম স্বামীজির একটা আশার বাণী শুনাইয়া—"A Wonderful, glorious India will come—a greater India than ever was." ইহা সম্ভবপর হইবে অধ্যাত্ম ভিত্তিতে এক বিশ্বপ্লাবী অধ্যাত্ম জাগরণে। এ-যুগের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথও কি বিশ্বমানবকে এই পুণ্যভূমি ভারতে মিলিতে আহ্বান দেন নাই—

এসো হে আর্য্য, এস হে অনার্য্য,
হিন্দু-মুসলমান!
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃষ্টান!
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমানভার
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ-নীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

এমন উদার সার্ব্বজনীন মিলনের ডাক, এমন অখণ্ড মানবতার মঙ্গল ঘট জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সবার স্পর্শে পূর্ণ করার উদাত্ত আহ্বান ভারত ভিন্ন আর কোন দেশের কবি কি কখন দিতে পারিয়াছেন? আরণ্যক যুগের ঋষিকবির 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' উদ্‌গানের মধ্যে মানুষের আত্মস্বরূপের পরিচয়টি ছিল, আর আধুনিক যুগের ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে এই স্বরূপ-সচেতন মানুষের মহামিলনের গান। কবীন্দ্রেরই উপলব্ধি: "মনুষ্যত্ব জিনিষ একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। এই মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কি পরিমাণে সত্য হইয়াছে, ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার।"

আজিকার আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যের পথে যে বাধা তাহা হইতেছে এই অখণ্ড মনুষ্যত্বের দৈশিক খণ্ড উপলব্ধি। রাষ্ট্রনীতির ছলচাতুরী, শক্তিদম্ভ, ঐশ্বর্য্য গৌরব, স্বজাতির স্বার্থবোধে প্রত্যেকটি জাতির বিচার-বুদ্ধি অন্ধ আচ্ছন্ন। একমাত্র আধ্যাত্মিকতাই আন্তর্জ্জাতিক একাত্মতার রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত করিতে পারে এবং একমাত্র ভারতবর্ষই এই সর্ব্বগ্রাসী আত্মিক আত্মীয়তার অধিকার রাখে। এই সর্ব্বজাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-শ্রেণীর মহামিলনের জন্য যাহা করণীয় সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নির্দ্দেশ দিয়াছেন: "The work which we have to do for humanity is a work which no other nation can accomplish—the spiritualisation of the race."

নিজেদের যুগ-যুগ সঞ্চিত সর্ব্বগ্রাহী সংস্কৃতি-সম্পদের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া বাহিরে পথ হাতড়াই বলিয়াই অন্ধ পরানুকরণতা আমাদের উপরিচর মনকে আচ্ছন্ন করে। ঠিক ঠিক আত্মপরিচয়টি সমাহিত হইয়া অনুধাবন করিলে অন্তরের সুপ্ত সিংহবীর্য্য শুধু মুক্তিলাভই করিবে না, ভারত তার সত্যকার 'মিশন' ও জাতীয় বিকাশের ধারাটিরও সন্ধান পাইবে। অতীতের উত্তরাধিকারীত্ব ও আপন ঐতিহ্যে গৌরববোধ না থাকিলে কোন জাতিরই প্রাণে সংবেগ আসিতে পারে না। জাপান, জার্ম্মানী, ফরাসী, ইংরেজ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও তার সংস্কৃতি-সচেতনতা ও স্বীয় জীবন বিকাশের ধারায় অটুট আস্থা তাকে এত বীর্য্যবান ও বিশ্বজয়ে প্রত্যয়ী করিয়াছে।

●

বর্ত্তমান সংখ্যা প্রবর্ত্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রশস্তিতে সদ্‌গুরুজী আগামী অধ্যাত্ম জাগরণ কল্পে একজন বিষ্ণু-যশার আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহা ভারতশাস্ত্রেরই অমোঘ বাণী যাহা ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও অভিজ্ঞতায় সত্য প্রমাণিত। এই আবির্ভাব যে-শোচনীয় পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে সম্ভবপর হইবে তাহার নিখুঁত চিত্রটিও তিনি আঁকিয়াছেন যাহা হুবহু আজকের দিনের অধঃপতিত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়া যায়।

পৌরাণিক যুগের রাম-কৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিগত আড়াই হাজার বছরের ভারতের অন্তর্গূঢ় ইতিহাস কয়েকজন দেবমানবেরই ইতিহাস বলা চলে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রমুখ এক-এক কালের দীর্ঘ পুঞ্জীভূত গ্লানি আপন জীবনমহিমায় প্রতিরোধ করিয়া সেই কালের বিপথগামী ঐতিহাসিক সঙ্কটের মোড় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা সম্ভব করিয়াছেন ব্যাপক আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়া।

বিগত আড়াই শত বছরের আধুনিক ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও ভারত-সত্তার ঐ একই আত্মিক অভিসন্ধিমূলক কার্য্যকারিতার পরিচয় মিলিবে। রবীন্দ্রনাথের কথা: "পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই সর্ব্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।"

ইংরাজের ভারতে আগমন, শাসন-শোষণ, তার ভাষা-সাহিত্য-মনন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তি, বস্তু-সর্ব্বস্বতা ভারতের ভাবজগতে যে অভূতপূর্ব্ব উন্মার্গগামী আলোড়ন আনে তার সমাহার ঘটে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণে। শ্রীঅরবিন্দের কথা: "In him (Sri Ramkrishna) the spiritual experience of the millions of saints who had gone before were renewed and united. Sri Ramkrishna gave to India the final message of Hinduism to the world." শ্রীঅরবিন্দ এ সম্পর্কে একটা গভীর তাৎপর্য্যগর্ভ ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন: "The movement of which the first outbreak was political, will end in a spiritual consummation."

শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের প্রথম অংশটী ফলিয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-উত্তর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় চেতনা দেশমুক্তি আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখা যায়। শেষাংশ 'spiritual consummation'—এক অখণ্ড অধ্যাত্ম-প্লাবনে পরিসমাপ্তিও নিশ্চয়ই ঘটিবে। অন্যথায় বিচিত্র জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-ভাষা লইয়া অখণ্ড ভারতে অখণ্ড এক জাতীয়তার তথা বিশ্বমানব মিলনের স্থায়ী বনিয়াদ রচিত হইতে পারে আর কোন্ ভিত্তিতে?

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-বাণী বিশ্বব্যাপী প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিম 'আনন্দমঠে' সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শ্লোগান তুলাইয়াছেন 'বন্দেমাতরম্'। এই দেশাত্মবোধ স্বষ্ট-পুষ্ট হইয়া বিংশ শতকের পাঁচটি দশক ব্যাপিয়া নানা রাজ-নৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়া ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

এই দেশ ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দেশাত্মবোধ ভারতে নূতন আমদানী বলা চলে। ইহা ইংরাজ তথা পশ্চিমের অবদান। ভারতে বিচিত্রের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্র বিদ্যমান ছিল। তার উদার আত্মিক বোধ মুস্‌লিম যুগপূর্ব্ব বহিরাগতদের আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে। বিদেশী মুসলমান ভারতে রাজ্যবিস্তার করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ভারতবাসীই হইয়া গিয়াছিলেন। মধ্যযুগের শান্ত ভৌগোলিক পরিবেশে নানা সংঘর্ষ-সংঘাতের মধ্যে ক্রমশঃ হিন্দু-মুসলমান নিকটতর হইতে-ছিল। মোঘল সম্রাট আকবরকে এই উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্যমূলক এক ধর্ম্মসাম্রাজ্যের ভাবনায়ও ভাবিত হইতে দেখা যায়। এই সমীকরণের ভাবনার ফলেই উদ্ভব হইয়াছিল বহু হিন্দু সাধু-সন্ত ও মুসলমান ফকীর যাঁরা উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক অন্তরতম মিলনের পথ আত্মিক সাধনায় পরিস্কার করিতেছিলেন। কিন্তু এই প্রযত্ন আর পরিণতি পাইতে পারিল না পশ্চিমের প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আবির্ভাবে। এই মিলনের পথ শত জটিলতায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ইংরাজ-আগমন ভারতের ভাগ্যবিধাতারই অমোঘ বিধান। ভারতের সামগ্রিক দেশাত্মবোধ জাগরণের জন্যই ইংরাজের আগমন ও শাসনের প্রয়োজন ছিল। সুগভীর সর্ব্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য সত্ত্বেও, যুগে যুগে ভারত বিদেশীর পদানত লাঞ্ছিত হইয়াছে এই সামগ্রিক দেশাত্মবোধের অভাবে। ভারতের এই রাজনৈতিক অসহায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদের ঋষি কার্ল মার্কস্ মন্তব্য করিয়াছিলেন: "ভারতের অতীত ইতিহাস

বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পর পর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস। আরবী, তুর্কী, তাতার, মোঘল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই হিন্দু-ভূত হয়ে গেছে; ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়মানুসারে বর্ব্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। ব্রিটিশেরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু অনধিগম্য।"

বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৫৩) লণ্ডনে নির্ব্বাসিত থাকাকালে কার্ল মার্কস্ ভারত সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন। কার্ল মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা হইতে ভারত সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করেন তাহা বাহ্য ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়া ঠিকই। কিন্তু ভারত সত্তার যে একটা নিগূঢ় সত্য দিক আছে তাহা মার্কেসর বস্তুসাপেক্ষ ইতিহাসের (materialistic interpretation of history) ব্যাখ্যা-বোধের অনধিগম্য। আজ যদি মার্কস্ জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, ভারতের উন্নততর নীতি, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবোধের প্রভাবে পরাভূত হইয়াই ইংরাজকে ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে রাজত্ব কায়েম করিতে না করিতেই। ইংরাজের দুষ্ট লুব্ধ বণিক-বুদ্ধি যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে তাহাও অনতিদূর আগামী-কালে যে অপনীত হইবে, ইহাও সুনিশ্চিত। কার্ল মার্কস্ ইংরাজকে "unconscious tool of history" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী ভারতবাসীরাও বিশ্বাস করি যে, সেই বিশ্বব্যাপিনী চিতি-শক্তির হাতের যন্ত্র হইয়াই বণিক ইংরাজ এদেশে আসিয়া রাজা বনিয়া গিয়াছিল। ইংরাজকে মারিবার অস্ত্র বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানস, রাজ্য ও রাষ্ট্রনীতি, জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা—ইংরাজের ভাষা ও সাহিত্যই বহন করিয়া আনিয়াছিল। এই সর্ব্বভারতীয় জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে দেশাত্ম তথা ভারতীয়ত্ব বোধের পরিচয় মিলিয়াছে সাম্প্রতিক পাক-চীন আক্রমণে যাহা ভারতীয় ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। ঋষিকবির সেই "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে" মঙ্গলঘট আজ সত্যই পূর্ণ হইতে দেখা গেল। "আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃষ্টান-শিখ-পারসিক সবাই মিলিত হইয়া 'বন্দেভারতম্' (মাতরম্) জয়ধ্বনি তুলিয়াছে। ইহাই দেশাত্মবোধ। পুণ্য ভারতভূমির পরীক্ষাগারে মহামানব মিলন-সাফল্যের প্রথম পদধ্বনি পাক-ভারত সংঘর্ষে শ্রুত হইল।

●

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাষ্ট্রনীতির ত্রি-স্তম্ভ—জোটনিরপেক্ষতা (neutrality), ধর্ম্মনিরপেক্ষতা (secularism), গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিকতা (Democratic socialism)। জোটনিরপেক্ষ হইয়াও মত-নিরপেক্ষ কিন্তু ভারত হইতে পারে নাই। ইঙ্গ-মার্কিন (প্রধানতঃ ব্রিটিশের) সাংবিধানিক কলমের চারা আমরা ভারতভূমিতে রোপন করিয়াছি। দুইটি জোটের বিপরীত জীবনবিকাশের ধারানিরপেক্ষ কোন তৃতীয় মত-পথের আবিষ্কার আমরা করিতে পারি নাই। ইহা করা কিন্তু সম্ভব হইত যদি ভারতীয় স্বকীয় প্রতিভার আনুগত্যে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের রূপান্তর সাধন করিতে পারিতাম। তাহা হইলে বিবাদমান জোটের সামনে একটা মিলনমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাইতে পারিত। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনশীল পর্য্যায়ে উহা সম্ভব না হইলেও, আগামীকালে উহা বিশ্বমানব কল্যাণের জন্যই বিচিত্র জাতি-ধর্ম্ম ও ভাষাভাষি পুণ্য ভারতভূমিতে সংঘটিত হইবে, ইহাই ভবিতব্য।

গণতন্ত্রের পুঁজিবাদী প্রবণতাকে রুখিতে গিয়া ভারতে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষেধক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কোন অনুন্নত দেশের বৈষয়িক উন্নতি সমাজতন্ত্র ছাড়া যে অল্প সময়ের মধ্যে হইতে পারে এমন নজীর ইতিহাসে নাই। প্রায় দু'শো বছরে যুক্তরাষ্ট্র যে বিস্ময়কর বৈষয়িক উন্নতির মানে পৌঁছিয়াছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া প্রায় ততখানিই মানোন্নত হইয়াছে মাত্র পঁচিশ বৎসরে। পঁচিশ বৎসর হিসাবে ধরিতেছি এই জন্য যে, রুশ-বিপ্লবের আটচল্লিশ বছরের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সময় গিয়াছে

সাম্রাজ্যবাদীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে। পিপলস্ রিপাবলিক অব্ চীন মাত্র ষোল বছরে একরকম এককই যে শক্তি অর্জ্জন কবিয়াছে তাহা বিশ্বত্রাসের হেতু হইয়াছে।

ডিমক্রেসী বা গণতন্ত্রের অভিধানগত অর্থ হইতেছে প্রজার দ্বাবা শাসন। জনগণের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রশাসক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শাসনকার্য্য চালাইবে। গণতন্ত্রের মহিমা হইতেছে সংবাদপত্র, ব্যক্তি ও মত-পথের স্বাধীনতা। ধার্ম্মিক, আর্থিক, সামাজিক ব্যাপারে স্বাধীন বিকাশের সুযোগ সুবিধা। মানুষের সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। উৎপাদন বণ্টনের কারচুপি, নির্ব্বাচন ব্যাপারে অর্থসঙ্গতি ইত্যাদি ব্যাপারে গণতন্ত্র শেষ পর্য্যন্ত ধনতন্ত্রে পরিণত হইয়া থাকে এবং হইয়াছেও। গণতন্ত্রের দুর্গ ইঙ্গ-মার্কিন উহার দৃষ্টান্ত। এখানে উপর ও নীচের তলার ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। পুঁজি-প্রবৃত্তিতে ইহাদের নীতি প্রভাবিত, বণিক বৃত্তি ইহাদের মজ্জাগত। গণতন্ত্র এই বণিকবৃত্তির অনুকূল বলিয়াই ইঙ্গ-মার্কিনের নিকট উহা বরণীয়। গণতান্ত্রিক ভারতের বিরুদ্ধে ডিক্টেটর-তন্ত্র পাকিস্তানকে সাহায্য করিতে ইহাদের বাধে না। ইহাদের সুবিধাবাদী নীতির কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদিকে চীন-প্রভাবিত ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ইংরেজ মালয়েশিয়াকে সাহায্য করে, অপর দিকে পাক-ভারত সম্পর্কে চীনের আঁতাত পাকিস্তানের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেও ব্রিটিশের বাধে না। যুক্ত-রাষ্ট্রকে দেখি, কম্যুনিষ্ট উত্তর ভিয়েৎনামকে রোখার জন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামে রক্তপাত করিতে, আবার তাবই অস্ত্রে গণতান্ত্রিক ভারতকে যখন চীনেব তল্পীবাহী পাকিস্তান ধ্বংস করিতে আগুয়ান তখন পাকিস্তানেরও সে নির্ব্বাক সমর্থক। সুতরাং গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়াই ভারত ইঁহাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পাইবে এমন ভরসা নাই। ভারতের গণতন্ত্র ধ্বংস হইলে এ্যাফ্রো-এশিয়া হইতে আলো নিভিয়া যাইবে, এইরূপ আশঙ্কায় গণতান্ত্রিক পুঁজীবাদী ইঙ্গ-মার্কিনের মাথাব্যথা নাই।

ভাবতবর্ষ এই ইঙ্গ-মার্কিন গণতন্ত্রের অনুকরণ করিয়াছে এবং আঠারো বৎসরে ইহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রেব গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাইতেছে ইহার আনুষঙ্গিক কুফল হইতেও ভারতবর্ষ মুক্তি পায় নাই। অর্থসম্পদ মুষ্টিমেয়র কুক্ষিগত হইয়াছে। ধনী ফাঁপিয়া-ফুলিয়া অধিকতর বিত্তশালী হইয়াছে, দরিদ্র আরও দরিদ্রতর হইযাছে। সমাজতন্ত্রের দ্বারাও উহা নিবারিত হয় নাই। বিপুল প্রাপ্তবয়স্ক অর্থসাপেক্ষ নির্ব্বাচনের ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠী ধনবানের আওতায় আনত। আনুষঙ্গিক দুর্নীতি, কালোবাজারী, ঠগ-প্রবঞ্চনা, আচারনীতিভ্রষ্টতা সর্ব্বস্তরে অনুপ্রবিষ্ট। স্বাধীনতার আস্বাদ জনচিত্তকে স্পর্শ করিতে পাবে নাই। কিন্তু ভারতবাসীর সহজ স্বাভাবিক স্বাদেশিকতা যে অনুপম তাহার নিদর্শন মিলিয়াছে চীন-পাক আক্রমণে। ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে জোট-নিবপেক্ষ ভারত বিশ্বে এক নবীন আদর্শেব একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিবে।

●

স্বকীয় প্রতিভা-বিকাশের উদ্দেশ্যে মুক্তি-সংগ্রাম-কালে ভারতের লক্ষ্য ছিল স্বরাজ—সবারই অভ্যুদয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিল উপায়। পশ্চিমী গণতন্ত্র আজ ব্যূহবদ্ধ স্বার্থপরতায় ও সজ্ঞান কুটিলতায় কলুষিত। নিছক বৈষয়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কি গণতন্ত্র, কি সমাজতন্ত্রে বিষয় বাসনা-কামনার দাবানল জ্বালিয়া প্রবৃত্তির অপরিসীম তৃষ্ণা মিটাইবার প্রযত্ন-প্রকল্পেরও একটা সীমা আছে। নিয়ম-সংযমের শাসন, নিবৃত্তিব পরিতৃপ্তি, চরিত্রের গরিমা, ত্যাগের মূল্যবোধের দ্বারা লোভের এই সীমা বাঁধিয়া না দিতে পারিলে কখনও স্থায়ী সুখ ও শান্তি সম্ভবপর নয়। আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত লুব্ধ মানুষ একদিন আপন উপকরণের ভারে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কোন তন্ত্রই বড় কথা নহে—তন্ত্রধারকই শেষ কথা। জীবন ও জগতের প্রতি অধ্যাত্মদৃষ্টি, নীতি, চরিত্র, মহৎ আদর্শের মূল্যবোধ, সংখ্যা নয়—গুণগত উৎকর্ষ, নিছক বুদ্ধি নয়—মানুষে মানুষের মধ্যে অখণ্ড সত্তার হৃদয়গত উপলব্ধি যে নীতি, যে তন্ত্রে বিদ্যমান তাহাই অধ্যাত্ম জাতীয়তার মৌলিক ভিত্তি। সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের বক্তব্য, পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে ভারত আপন অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার যুগোপযোগী বিকাশের পথ হইতে রাষ্ট্রীয় তথা আপন প্রতিভায় আত্মসংগঠনের স্বাধীনতা-লাভ করিয়াও, দূরে সরিয়া যাইতেছে। তথাপি আমরা নিরাশ নহি। ঋষিকবির কথারই জয়ধ্বনি তুলিয়া বলিব—"আমাদের বাণী বেদনার বাণী, সত্যের বলে যার বল, একদিন যাহা অন্য সকল কলগর্জ্জনের ঊর্দ্ধে ইতিহাস বিধাতার সিংহাসন তলে আসিয়া পৌঁছাইবে।"

প্রাচ্যের জাগরণে চীন ও জাপানের ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদ : শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

[প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু মানুষের কাছেই চীন দুর্বোধ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে চীন ছিল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পদানত, তাদের প্রতিকারহীন অত্যাচার ও অবিচারের যূপকাষ্ঠে সে ছিল মৃতপ্রায়। সেদিন প্রতিরোধ তো দূরের কথা প্রতিবাদ জানাবার পর্যন্ত তার সামর্থ্য ছিল না। তখন প্রচার করা হয় যে, চীন একটা শান্তিপ্রিয় আত্মনিরুদ্ধ জাতি। এই ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা আমরাও প্রভাবিত হয়েছি, চীনকে জানবার চেষ্টা করি নি। কিন্তু যারা দূরদর্শী তারা অনেকদিন হতেই চীন সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকার রাষ্ট্র-সেক্রেটারি জন হে বলেছিলেন, "পৃথিবীর শান্তি চীনের উপর নির্ভর করছে ; সুতরাং চীনকে যে বুঝতে পারবে, তার পক্ষে আগামী পাঁচ শ' বছরের পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে পারা হবে সম্ভব।" প্রায় এই সময়ই শ্রীঅরবিন্দ দৈনিক "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় 'India and the Mongolian' শীর্ষক প্রবন্ধে নব জাগ্রত এসিয়ায় চীন ও জাপানের ভূমিকা কী হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দেন। এই সতর্কবাণী শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ১৯০৮ সনের ১লা এপ্রিল। শ্রীঅরবিন্দের এই রচনাটি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'Sri Aurobindo and The new Thought' গ্রন্থে (১৯৬৪) সংকলিত হয়েছে। ১৯০৮ সনে উচ্চারিত শ্রীঅরবিন্দের সতর্কবাণী আজও সমভাবে মূল্যবান। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫০ সনে যখন আমরা অন্ধ আবেগে আত্মহারা হয়ে "হিন্দীচীনী ভাই ভাই" রবে দিগন্ত মুখর করে তুলেছিলুম ঠিক সেই সময়ই শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতির কোলাহল হ'তে বহুদূরে পণ্ডিচেরির এক নিভৃত কোণ হ'তে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে এবং সেই সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীকে সতর্ক করে বলেছিলেন, চীন অচিরে তিব্বত গ্রাস করতে চলেছে এবং তারপর সে এগিয়ে আসবে ভারতের দিকে। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন বলেছিলেন, আমেরিকার সমরশক্তিই শুধু হিমালয় সীমান্তের লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র চীনা সেনাবাহিনীকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। ১৯০৮ এবং ১৯৫০ সনে উচ্চারিত শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী অমোঘ বিধানের মতো সত্যে পরিণত হতে চলেছে। এখানে 'স্বদেশী-যুগে' প্রচারিত দ্রষ্টা ঋষির 'India & The Mongolian' রচনার অনুবাদ দেওয়া হলো। —প্রঃ সঃ]

ফেড়ারেশন ময়দানে ভাষণ দেবার সময় শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল যখন চীন ও জাপান কর্তৃক পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংস হবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তখন তার শ্রোতাদের মধ্যে কয়জন সে-কথা বুঝতে পেরেছিলেন অথবা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেন তার তাৎপর্য কয়জন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন? বৃহৎ চিন্তা, বিশাল দৃষ্টিভঙ্গী এবং যে অনুভূতি দিয়ে পৃথিবীর বড় বড় আন্দোলনগুলি ধারণা করা সম্ভব তা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এই বিরাট দেশ, এই বিশাল মহাদেশ এক সময় বিভিন্ন শক্তির প্রচণ্ড সংঘাতে ছিল মুখর, বিরাট সাফল্য এবং সমুচ্চ উচ্চাভিলাষে ছিল আন্দোলিত, বহির্জগতের আলোচনায় ছিল উচ্চকিত, কিন্তু সেই দেশ আজ পরিণত হয়েছে এক নগণ্য পল্লী অঞ্চলে। আর্য সম্রাটদের রাজপ্রাসাদ আজ রূপান্তরিত হয়েছে এক ঘৃণিত ক্রীতদাসের পর্ণ-কুটীরে। এই ক্রীতদাসের চিন্তাশক্তি সীমিত, উচ্চাকাংখা ঘৃণ্য, তার শির অবনত, দৃষ্টি আনত। সুতরাং সে মাথার উপর আকাশ দেখতে পায় না, সে দেখতে পায় না তার চারপাশে রয়েছে যে অপূর্ব শোভনা পৃথ্বী। অদূর ভবিষ্যতে তাকে যে-সব মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে হবে তার সম্ভাবনার কথা যদি কেউ উল্লেখ করে, অথবা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, রাজকুলে তার

আবির্ভাব, তা'হলে বক্তাকে সে মনে করবে উন্মাদ, মনে করবে যে সে প্রলাপ বকে চলেছে, এবং এর জবাব দেবে সে শুধু বিদ্রূপের হাসি হেসে। আমার মনে হয় ইংলণ্ড আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি যা করেছে তা হলো এই যে, সে আমাদের আত্মাকে অবনমিত করেছে, আমাদের কল্পনাশক্তিকে করেছে খর্ব। একমাত্র বিধাতার আশীর্বাদেই আমাদের মধ্যে আবার এসেছে জাগরণ, আমরা আর একবার আমাদের স্বর্গীয় উত্তরাধিকার এবং আমাদের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয়েছি আত্ম-সচেতন।

আমাদের মধ্যে যে-সব মানুষ ভগবানের সান্নিধ্যে এসে আন্দোলিত হয়েছেন, শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎসে অবগাহন করে সঞ্জীবিত হয়েছেন এবং যাঁরা সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের ভিতর শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল সব চেয়ে তীক্ষ্ণধী, যে চিন্তাধারা বর্তমান জগতকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে সে বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী সজাগ। তিনিই সর্বপ্রথম অনাগত যুগকে প্রত্যক্ষ করেন, এবং জাতীয় জীবনে বিধাতার আন্দোলন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেন। যে সময় অন্যান্য মানুষ ছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার ক্রীতদাস সেই সময় তাঁর মানসেই সর্বপ্রথম ধরা পড়ে ভারতের আকস্মিক অভ্যুত্থানের তাৎপর্য কী। তিনিই সর্বপ্রথম আন্দোলনের আত্মিক চরিত্রের কথা ঘোষণা করেন, তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, যুগ যুগান্তের ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে শুধু ভারতের দেহ নয় তার আত্মাও। বিগত শনিবার যখন বিপিনচন্দ্র ভারতবর্ষকে ইউরোপের মুক্তিদাতা বলে উল্লেখ করেন, তখন পুনরায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার বাণী, তিনিই আবার প্রায় অতি-মানবীয় দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এ-কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করবার মতো ক্ষমতা তাঁর শ্রোতাদের ছিল না; অনেকে নিশ্চয়ই বিদ্রূপের হাসি হেসেছেন, খুব কম মানুষই তাঁর প্রোজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল বক্তারও ধারণাতীত। এশিয়ার জাগরণ বিংশ শতাব্দীর একটা বাস্তব ঘটনা; এই জাগরণে নেতৃত্বের অধিকার পেয়েছে সুদূর প্রাচ্যের মোঙ্গল জাতিরা। জাপানের প্রতিভা, স্বদেশপ্রেম, দ্রুত অনুকরণের ক্ষমতা এবং চীনের নীরব নিখুঁত সম্পূর্ণতা ও তার অপ্রতিরোধনীয় সংগঠনের ভিতর বিধাতা এই মহান আন্দোলনের বাস্তব শক্তিকে খুঁজে পেয়েছেন। এই শক্তি ইউরোপের সঙ্গে মোকাবিলা করবে তারই নিজের হাতিয়ার দিয়ে। যে বিজ্ঞান, শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে ইয়োরোপবাসী বিশেষ গর্ব অনুভব করে সেই বিজ্ঞান, শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েই মোঙ্গলরা তাদের করবে পরাজিত। মোঙ্গল জাতিদের অভ্যুত্থানের ভিতর বিধাতার কোন্ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতিগুলি বুঝতে পেরেছে তাদের সহজাত রাজ-নৈতিক অনুভূতি দিয়ে। তাদের অন্তরে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়েছে, তাদের শক্তি অবশ হয়ে আসছে, তারা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রাচ্যের এই দুই শক্তি-দানবের প্রতি-মুহূর্তের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছে, প্রত্যেকে সবিস্ময়ে ভাবছে কখন মিকাডোর তরবারির আঘাত এসে পড়বে তার উপর, অথবা ভাবছে পৃথিবীর দৈত্যস্বরূপ চীন যখন তার নীরব, অটল ও অচঞ্চল প্রস্তুতি সমাধা করবে তখন কী ঘটবে! ঐক্যবদ্ধ, সুসজ্জিত রণধ্বনিতে মুখর ও সেনাবাহিনীর পদধ্বনিতে কম্পিত পশ্চিমদিকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত এমন চীনের কল্পনা তাদের কাছে একটা নিশীর দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোঙ্গলরা সুলভ শ্রমজীবীদের দ্বারা ইয়োরোপ প্লাবিত করে দিতে পারে, তাদের শিল্পগুলিকে কণ্ঠরুদ্ধ করে দিতে পারে, এমন একটা অর্থনৈতিক আক্রমণের ভীতি তাদের আশঙ্কাকে তীব্রতর করে তুলেছে। এই ভীতি পাশ্চাত্যকে করে তুলেছে প্রকম্পিত। এইজন্য আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায় আতঙ্ক জেগেছে, সামরিক দিক থেকে চীন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে তরবারি হস্তে তার প্রজাদের প্রবেশাধিকার সজোরে দাবী করবার পূর্বেই তারা ধিক্কারজনকভাবে এসিয়াবাসীদের বহিষ্কৃত করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইহাই হলো পীত-আতঙ্ক। প্রত্যেক ইয়োরোপবাসী অন্তরের অন্তরে জানে

যে নবজাগ্রত পৃথিবীতে তার দুঃস্বপ্ন-বাস্তবে পরিণত হবার জন্য প্রয়োজন শুধু আর কিছু সময়ের। কিন্তু একটা কথা পাশ্চাত্যের মানুষ বুঝতে পারেনি এবং সেটা হলো এই যে, মোঙ্গলরা উন্মাদ অভিযাত্রী নয়, এসিয়া স্বাধীন হবার পূর্বে তারা অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করবে না, স্যান্-ফ্রান্সিস্কো অথবা নিউ ইয়র্ক অবরোধ করে কামানের গোলা বর্ষণ করবে না। মোঙ্গলদের প্রথম আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল রাশিয়াকে, কারণ এসিয়ার পরপারে পশ্চিমদিকে বিধাতৃনির্দিষ্ট অভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাশিয়া। মোঙ্গলদের দ্বিতীয় আঘাত এসে পড়বে ইংলণ্ডের উপর, কারণ ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে পরাধীন করে রেখেছে।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান তাকে এসিয়ার চাবিকাঠিতে পরিণত করেছে। ভারতবর্ষ পশ্চিমের মুসলমানদের সুদূর প্রাচ্যের পৌত্তলিকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে; ভারতবর্ষ আবার এদের মিলন-ভূমিও। ভারতবর্ষ হতেই শুধু একটা মিলনের স্রোত-ধারা প্রবাহিত হতে পারে, ভারতবর্ষের মাধ্যমেই শুধু সম্ভব হ'তে পারে তাদের পারস্পরিক অনুধাবন ও পুনর্মিলন। এসিয়ার ঐক্যের জন্য প্রয়োজন ভারতের স্বাধীনতা। ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবর্ষ যে স্থান অধিকার করে আছে তা তাকে দিয়েছে পূর্ব এবং পশ্চিম এসিয়ায় প্রভাব বিস্তার করবার দুর্ভেদ্য শক্তি। ভারতবর্ষ যেন এক সুরক্ষিত দুর্গস্বরূপ। এখান থেকে সে পারসিক জাতিগুলি অথবা চীনা-জগতের উপর আক্রমণ চালাতে সক্ষম। এমন একটা দেশ পাশ্চাত্য-শক্তি কর্তৃক অধিকৃত হয়ে থাকাটা এসিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে সব সময়ই ভীতিপ্রদ। সুতরাং চীন-জাপান আঁতাতের প্রথম প্রবল প্রয়াস হবে ভারতবর্ষ হ'তে ইংরেজকে বহিষ্কৃত করা এবং এসিয়ার স্বাধীনতা ও ঐক্যের খাতিরে ভারতবর্ষকে অধিকৃত করে রাখা। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব ইংরেজ অথবা মোঙ্গলগণ কেউ-ই এড়িয়ে যেতে পারে না। গোপন এবং অনতিক্রমনীয় প্রয়োজনের বিরুদ্ধে পরস্পর বিবদমান স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের সর্বপ্রকার চুক্তি ও প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। গোপন এবং অনতিক্রমনীয় প্রয়োজন বিভিন্ন জাতিগুলিকে বিজ্ঞতা ও কূটনীতির নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করে না, তাদের বাধ্য করে পরিবেশের অনুশাসন মেনে চলতে।

যা অবশ্যম্ভাবী তা যখন ঘটবে, যখন চীনাবাহিনী ভারতের প্রবেশদ্বার হিমালয় সীমান্তে এসে আঘাত করবে, এবং জাপানের নৌবহর বোম্বের পোতাশ্রয়ে এসে উপস্থিত হবে, তখন ইংলণ্ড কোন্ শক্তি দিয়ে এই দুই শক্তির প্রচণ্ড সমাবেশ প্রতিহত করবে? সেনাবাহিনী দিয়ে? ট্রান্স্‌ভালের অশিক্ষিত ৪০ হাজার কৃষকদের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে যে সেনাবাহিনীর সময় লেগেছিল দু'বছর? নৌবাহিনী দিয়ে? যে নৌবাহিনী ট্রাফালগারের পরে আর কোন রণদক্ষ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেনি? ইংরেজগণ মোঙ্গলদের বিজ্ঞান ও দক্ষতার দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। এসিয়ার চাবিকাঠি চলে যাবে মোঙ্গলদের হাতে এবং ভারতের শক্তি—শিখ, রাজপুত, মারাঠা, মুসলমানদের শৌর্য, বাংলা এবং মাদ্রাজের নবজাত জাতীয়তাবোধের উদীয়মান শক্তিবত্তা তখন নিয়োজিত হবে মোঙ্গলদের নেতৃত্ব এবং তাদের স্বার্থে। ইংরেজের মতো মোঙ্গলরা ভারতের এই শক্তিকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবে না, তারা এই শক্তির অপচয় ঘটতে দেবে না, তাদের লক্ষ্য সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য তারা এই শক্তিকে সুতীক্ষ্ণ তরবারিতে পরিণত করবে; এসিয়া, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া হ'তে তারা ইয়োরোপবাসীদের বিতাড়িত করবে, ইয়োরোপের গর্বকে ধূলায় লুটিয়ে দেবে, পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতি, শক্তি ও সভ্যতাকে করবে হতমান এবং তাদের করবে প্রবল এসিয়ার নেতৃত্বের অধীন।

ধ্বংস দ্রুত এগিয়ে আসছে এবং ঠিক সময়েই বাংলা দেশে জাগরণ এসেছে ভারতবর্ষকে তার কর্মের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের একটা সুযোগ দেবার জন্য। সে যদি সমস্ত শক্তি দিয়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে, যদি সে জাগিয়ে তুলতে পারে আত্মচেতনা, তার ঐক্যবোধ, তার সহজাত সমরবৃত্তি, শিল্পে আত্মনির্ভরতা তা হলে ভারতবর্ষ নিজেকে মিত্ররূপে উপস্থিত করতে পারবে—

একটা যান্ত্রিক বাহনরূপে নয়, তা' হলে সম্ভবতঃ বিপিনচন্দ্র যেরূপ অনুমান করেছেন, ভারতবর্ষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার ভিতর মধ্যস্থতা করবার জন্য নিজেকে উপস্থিত করতে হবে সক্ষম। মানুষের অগ্রগতিতে এই দুই সভ্যতারই সবিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এর প্রতিবন্ধক মূলতঃ দু'টি। দৃষ্টিশক্তিহীন আমলাতন্ত্র ভারতের নব জাগরণকে ধ্বংস করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এই আশা নিয়ে যে; সে তার শাসন-ব্যবস্থা কায়েমী করে রাখতে পারবে। দুইটি বাধার মধ্যে এ' তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর চেয়েও বড় বাধা হলো জনসাধারণের আরও বেশী দৃষ্টিহীনতা, যদিও তা বহুল পরিমাণে মার্জনীয়। দৃষ্টিশক্তির অভাব বশতঃ আজও তারা তাদের ভবিষ্যতকে ইংলণ্ডের শাসনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখবার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে রাজি নয়। ইংরেজ শাসন যে বিধাতার বিধান এবং সেটা যে শাশ্বত, এই মোহ নরমপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের সমস্ত চিন্তা ধরে নিয়েছে যে বর্তমান ব্যবস্থা চিরন্তন এবং চিরদিন তাই থাকবে। দীর্ঘকাল ধরে অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত কোন কয়েদীর কারাকক্ষে হঠাৎ আলো প্রবেশ করলে সে যেমন তা চিনতে পারে না; তেমনি আমাদের দেশবাসী প্রভাত উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সত্যি সত্যিই ভোর হয়েছে। তারা ধরে নিয়ে বসে আছে যে এখনও রাত্রির অবসান হয়নি, ঘুম থেকে না উঠে এবং তাড়াতাড়ি দিনের কাজ সুরু না করে তারা বিছানার এক পাশে একটু নড়েচড়েই সন্তুষ্ট রইলো।

শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজজাতির কাছে যে সতর্কবাণী পাঠিয়েছেন সেটা ভারতবাসীর পক্ষেও প্রযোজ্য। ভারতে বৃটিশ শাসন চালু থাকতে পারে যদি ভারতবাসী তাতে সম্মত হয় এবং যদি সে সমস্ত বৈদেশিক শক্তির হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার মতো শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে। নবজাগ্রত ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতালাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা' হলে ভারতবর্ষ কি ইংলণ্ডের মিত্র হয়ে থাকবে এবং ইয়োরোপ ও বিজয়ী মোঙ্গলদের ভিতর মধ্যস্থতা করবে, না অনাগত অস্ত্রসংঘাতে সে মোঙ্গলদের সহায়তা দান করবে, সেটা নির্ভর করবে আমলাতন্ত্রের বর্তমান কার্যাবলীর উপর। এমন কি ভারতের আন্দোলন যদি ধ্বংস করেও দেওয়া হয়, তবুও একটা নবজাত জাতিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার অপরাধের বিনিময়ে ইংলণ্ড কোন সুবিধালাভ করতে পারবে না। অনতিকাল পূর্বেই মোঙ্গলরা ইংরেজকে ভারতবর্ষ হতে ঝাঁটা দিয়ে বিদায় করে দেবে। যে সুপ্ত শক্তিকে তারা কাজে লাগাতে পারে নি সেই শক্তিকে মোঙ্গলরা ব্যবহার করবে তারই বিরুদ্ধে অনেক বেশী দুঃসাহস ও অনেক বেশী চাতুর্যপূর্ণ রাজনৈতিক দক্ষতা সহকারে। ভারতবাসীদের অবশ্য তাদের বর্তমান কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আমলাতন্ত্রের চেয়েও তাদের উপর অনেক বেশী নির্ভর করছে, তারা কি বিধি-নির্দিষ্ট ক্রীতদাস ও ক্রীড়নক হিসাবে, না বন্ধু অথবা সমান শক্তি হিসাবে মোঙ্গলদের সম্মুখীন হবে, পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে যার মতামত অপর সকলের মতামতকে করতে পারবে পর্যুদস্ত। [প্রবর্ত্তক সাহিত্যচক্রে পঠিত]

তোমাদের প্রতি ঃ

শ্রীতারাশঙ্কর

মিনতি আমার : অনেক হ'য়েছে, ভালোবেসোনাকো আর
বরং পারো তো ব্যবধান রেখে থাকো।
অজস্র ভালোবেসেছো তোমরা কতোভাবে কতোবার ;
এবার প্রেমের পসরাটা তুলে রাখো।

পারো তো তোমরা আমায় এমন কিছু আজ দান
যা'র ফলে বোঝা হ'য়ে ওঠেনাকো ভারী ;
পারো তো দু' হাতে হৃদয় আমার এমনি অমৃতে ভরো,
যা'তে তোমাদের ভালোবেসে যেতে পারি।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : কার্ত্তিক সংখ্যার পর]

কম্বোজের রাজপ্রসাদের মন্ত্রণাকক্ষে গ্রহবর্মা স্বকীয় বিশিষ্ট সচিবের সঙ্গে পরামর্শ কোরছিল। মহাসাগরের ওপার থেকে একটার পর একটা যে সব সংবাদ আসছিল তাতে গ্রহবর্মাকে বেশ চিন্তিত ও উত্তেজিতই কোরে তুলেছে। ইন্দ্রনীল যে শীঘ্রই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য অভিযান সুরু কোরবে, এ কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। তাছাড়া রাজ্যের অভ্যন্তরে যে একটা চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে, তাও সহজে উপলব্ধি হয়। পারাবত-দৌত্যের কথাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। তাঁর আদেশ-অনুসারে সর্বদাই কৌশলী শবসন্ধানী সৈনিক রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে পাহারা দেয়। এদেরই হাতে বহু পারাবত মারা প'ড়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি সংবাদবাহী পারাবতও ছিল। গ্রহবর্মার নিকটে ইন্দ্রনীল ও কোদণ্ডের গতিবিধি আজ আর অবিদিত নয়। হাঁ, সংগ্রাম—বিরাট্ রক্তক্ষয়ী ধ্বংসকরী—সংগ্রাম আগতপ্রায়। গ্রহবর্মা তারই জন্য প্রস্তুত হোচ্ছে—তাই আজ স্বকীয় বিশিষ্ট সচিবের সঙ্গে এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু-আহ্বানকারী আক্রমণ প্রতিরোধের পরিকল্পনা ও কার্যপদ্ধতি নিরূপিত হোচ্ছে।

সচিব বোললো, মহারাজ! যদি অভয় দেন তো একটা কথা নিবেদন করি।

বলুন।

বোলতে সঙ্কোচ হোচ্ছে, তবু বলি, শত্রু নিয়ে ঘর করা—শত্রুকে ঘরে পোষা···

মন্ত্রিবর!—সচিবের কথা শেষ কোরতে না দিয়ে গ্রহবর্মা বলে, ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার অন্য কিছু যদি বলবার থাকে তো বলুন।

কিন্তু মহারাজ! রাজার কাছে রাজত্বই বড়, সেখানে ব্যক্তিগত···

সেটা অপরের প্রতি প্রযোজ্য—আমার প্রতি নয়, সচিব। মহারাজ গ্রহবর্মা বীর, তিনি নারীর বিরুদ্ধাচরণ ভয় করেন না। বিস্মৃত হবেন না—ক্রুদ্ধা সর্পিনী নিয়ে কেলি কোরতেই সর্পাঘাতী শিখীর আনন্দ! ইন্দ্রনীলকে যেমন আমি ভয় করি না, তেমনি তার ভগিনী শর্মিষ্ঠাকেও আমি ডরাই না। ভেবে দেখুন, আজ যদি আমি তাকে ত্যাগ করি তো তারই মহা সুবিধা হবে। শর্মিষ্ঠা আমাকে ঘৃণা করে, আর করে বোলেই তাকে আমি আমার কাছে রাখতে চাই। এই তার চরম দণ্ড।

মহারাজ বুদ্ধিমান্।

ওসব কথা বাদ দিন। এখন সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধি করুন,—তার জন্য অর্থাগমের অপেক্ষায় বিলম্ব কোরবেন না।

কিন্তু রাজকোষে···

হা হা কোরে গ্রহবর্মা হেসে উঠে বলে, সচিব! ভুলে যাচ্ছেন কেন—কম্বোজের প্রতিটি ঘরই তো আমার রাজকোষ! সৈন্যদের আদেশ দিন তা শূন্য কোরতে।

এর পর কম্বোজের ঘরে ঘরে শুরু হোলো গ্রহবর্মার সৈন্যদের নৃশংস তাণ্ডবলীলা। এই অত্যাচারের কবল হোতে নিস্তার পাবার যে একটিমাত্র পথ খোলা ছিল কম্বোজবাসীদের তা হোচ্ছে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়া। মুষ্টিমেয় যে কয়জন নোতুনভাবে বাহিনীতে যোগ দিল, শুধু তাদেরই ঘরগৃহস্থালি রক্ষা পেলো—অত্যাচারের হাত থেকে। নিষ্ফল আক্রোশে কম্বোজবাসী জ্বলতে লাগলো আর ইন্দ্রনীলের আগমন-প্রত্যাশায় কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকে সেই অমোঘ বিধানকারী বিধাতার সমীপে।

রাজপ্রাসাদের উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর ভেদ কোরে দেবী শর্মিষ্ঠার কর্ণগোচর হোলো—দেশবাসীর প্রতি এই নির্মম, নিষ্ঠুর, নিদারুণ অত্যাচারের যন্ত্রণা-কাতর ক্রন্দন-রোল।···শর্মিষ্ঠা উদ্বিগ্ন হোলো. চঞ্চল হোলো, ক্রুদ্ধ হোলো—কাতর হোলো। তার এতদিনের শিক্ষা, দীক্ষা সহ্য ও সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।—হাঁ, বধ কোরবে সে, নিজেই গ্রহবর্মাকে—আর সে ইন্দ্রনীল ও কোদণ্ডের জন্য অপেক্ষা কোরবে না। বিষ-প্রয়োগে অথবা নিদ্রিত অবস্থায় অন্য উপায়ে সে গ্রহবর্মাকে বধ কোরবে।—স্ত্রী হোয়ে স্বামীকে কাপুরুষের ন্যায় অসহায় অবস্থায় বধ কোরবে।—নীতিশাস্ত্র যাক ধুলোয়!—কম্বোজবাসী প্রাণে বাঁচুক, সে নিজে মুক্তি পাক ঐ নররক্তপিপাসু দস্যুর হাত হোতে। ভবিষ্য ইতিহাস তার নামে কলঙ্ক রটাবে, কিন্তু এই চলমান কাল কি তাকে আশিষ্ দেবে না? কিন্তু ..থম্‌কে দাঁড়ালো শর্মিষ্ঠা। গুপ্তহত্যা!—না, না, তা সে কোরতে পারবে না। তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হোচ্ছে মহাবলীদের বীর রক্ত! গ্রহবর্মাও তো গুপ্তহত্যা কোরে তার পিতাকে মেরে ফেলে। তা হোলে গ্রহবর্মা আর তাতে প্রভেদ রইলো কোথায়? অবশ্য গ্রহবর্মা কোরেছিল পররাজ্য গ্রাসের লালসায়। শর্মিষ্ঠার মনে তো কোন লালসা নেই। সে চায় শুধু কম্বোজবাসীর যম-যন্ত্রণার পরি-সমাপ্তি। আচ্ছা, সত্যই শুধুই কি তাই? লালসা না হোলেও তার মনে কি আর কোন কামনা নেই? ইন্দ্রনীলের সিংহাসনপ্রাপ্তি···কোদণ্ডের···হাঁ, আজও সে কোদণ্ডকে কামনা করে। কেন কোরবে না—হোক না সে বিবাহিতা। শয়তানকে সে স্বামী বোলে স্বীকার করে না। তার জীবনের পরমপুরুষ তো দেবাত্মা কেদণ্ড।—নির্ভীক, উদার, তেজস্বী, উন্নতদেহ কোদণ্ডকে সে অতি শৈশব থেকেই ভালবাসে—কোদণ্ডও তাকে ভালবাসে। এ ভালবাসার মধ্যে কোন মালিন্য স্পর্শ করেনি। পদ্মের কোরকের মধ্যে লুক্কায়িত পরাগের মতন ছিল সুপ্ত এই স্বপ্নময় প্রণয়। হয়ত এতদিন তা সার্থকতা লাভ কোরতো, কিন্তু সহসা প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় চারিদিক আচ্ছাদিত কোরে ধূমকেতুর ন্যায় ধেয়ে এল গ্রহবর্মা—সমস্ত গ্রাস কোরলো সে। শর্মিষ্ঠাকে আত্মসাৎ কোরলো! না—শর্মিষ্ঠাকে আত্মসাৎ করা অতো সহজ নয়। অচিরেই সে নিজেকে মুক্ত কোরে নেবে।

সামনে একটা দীর্ঘছায়া প'ড়লো।

কে?

আমি গ্রহবর্মা।

গ্রহ!—শর্মিষ্ঠা শ্লেষের সহিত বলে, হাঁ, কুগ্রহ! আমার জীবনে কুগ্রহের মতন উদয় হোয়েছ।

কথাটা মন্দ বলোনি সুন্দরী শর্মিষ্ঠা।

তোমার অস্ত যাবার সময় হোয়ে এসেছে।

না। উদয় হোলেই অস্ত যাওয়াই স্বাভাবিক,—তবে আমার অস্তের এখনো বহু—বহু বিলম্ব আছে। শোনো শর্মিষ্ঠা! তোমার অনেক ধৃষ্টতা, অনেক অন্যায় আমি সহ্য কোরেছি, কিন্তু আর নয়।

গ্রহবর্মা! তুমি কি এখন আমাকে শাসন কোরতে এলে?

হাঁ। গ্রহবর্মা ক্রুদ্ধস্বরে বলে, দাসী সাংপো কোথায়?

দাসী! শর্মিষ্ঠা আশ্চর্য হবার ভান কোরে বলে, স্তন্যদাত্রী পালিকা মাতা!

ব্যঙ্গ কোরোনা, শর্মিষ্ঠা। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। দাসদাসীদের সন্ধান রাখাটাও আমার কর্তব্য নাকি?

আগুন নিয়ে খেলা কোরছ, শর্মিষ্ঠা! তোমার প্রতি

আমার একটা অদৃশ্য আকর্ষণ আছে বলে মনে কোরো না যে তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা কোরবো।

ঘৃণ্য নরকের কীটের কাছে আমি ক্ষমার প্রত্যাশী নই। গ্রহবর্মা, সারা কম্বোজব্যাপী তুমি ত্রাসের সঞ্চার কোরে দিকে দিকে মুমূর্ষু জনগণের আর্তধ্বনি [redacted] দেশকে ছারখার কোরে শ্মশানে পরিণত কোরেছ।

হাঁ, তাই কোরেছি? কেন কোরবো না? কম্বোজ আমাকে কি দিয়েছে? দিয়েছে শুধু ঘৃণা আর অভিসম্পাত! সেই ঘৃণা ও অভিসম্পাত আমি কণ্ঠে ধারণ কোরে প্রেতের মতন আমারই তৈরি শ্মশানে আমি উল্লাস-নৃত্য কোরবো!

তুমি কি ভয়ানক!

হাঁ, আমি ভয়ানক, আমি পাষণ্ড, আমি নররক্তপিপাসু দানব!

প্রচণ্ড অট্টহাস্যে গ্রহবর্মা হেসে ওঠে; পরক্ষণে হাসি থামিয়ে শান্তকণ্ঠে বলে, কম্বোজ-নন্দিনী, এই দানবকে মানবে পরিণত কোরতে পারতে যদি তুমি তোমার ঐ ক্ষুদ্র বুকের অফুরন্ত সঞ্চিত সুধা থেকে বিন্দুমাত্র আমাকে দান কোরতে,—তা না কোরে তুমি কৃপণের মতন তা আঁকড়েই রইলে—নিজে দগ্ধ হোলে, আমাকে দগ্ধ কোরলে, আর তারই জন্য কম্বোজও দগ্ধ হোলো।

চমৎকার! নিজের পাপের বেশ সুন্দর সাফাই গাইলে।

না, না শর্মিষ্ঠা, এ আমার সাফাই গাওয়া নয়—এ আমার অন্তরের চরম সত্য কথা। শর্মিষ্ঠা, তুমি শুধু আমার প্রতি একটু সদয় হও—আমি এই মুহূর্তে কম্বোজের সিংহাসন ত্যাগ কোরছি; আসুক ইন্দ্রনীল, আমি নিজের হাতে তার মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে দেবো, আর আমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপঢৌকন দেবো আমার আদরের চম্পারাজ্য। দেবী, তুমি প্রসন্না হও।

আবেগে গ্রহবর্মা শর্মিষ্ঠার হাত চেপে ধরে। শর্মিষ্ঠা খিল্ খিল্ কোরে হাসতে হাসতে বলে, দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।

অতি ঘৃণার সঙ্গে শর্মিষ্ঠা নিজের হাত গ্রহবর্মার আবেগকম্পিত হাত থেকে মুক্ত কোরে নিল।

শর্মিষ্ঠা, আমাকে বিশ্বাস করো—বোলতে বোলতে গ্রহবর্মা এগিয়ে যেতেই শর্মিষ্ঠা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বোললো, না, না, তুমি আমাকে স্পর্শ কোরো না···

গ্রহবর্মা কঠোর কণ্ঠে বোললো, তুমি আমার স্ত্রী, তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

সে অধিকার আমি কোনদিনই স্বীকার করিনি। আর এগিও না, এগুলেই তোমার বিপদ হবে। গ্রহবর্মা! গ্রহবর্মা!···

চকিতে শর্মিষ্ঠা তার বস্ত্রাভ্যন্তর হোতে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকা বার কোরে গ্রহবর্মাকে ছুঁড়ে মারলো, গ্রহবর্মা ক্ষিপ্রগতিতে স'রে দাঁড়ালো—পশ্চাতের দীর্ঘ মুকুরে তা সবেগে আঘাত কোরলো। ঝন্‌ঝন্ শব্দে কক্ষতল ধ্বনিত হোলো।

শয়তানি!

গৃহবর্মার মুখমণ্ডল তখন হিংস্র-কুটিল। সে দৃঢ় পেশিবহুল হস্ত দ্বারা তরবারি কোষমুক্ত কোরলো। শর্মিষ্ঠা চীৎকার কোরে ওঠে, বধ করো, বধ করো আমাকে—আমার সব যন্ত্রণার শেষ হোক।

গ্রহবর্মা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কোরে তরবারি উত্তোলন কোরলো।

বাবা!—দ্বারপ্রান্ত হোতে বালক কণ্ঠের কাতর স্বর ভেসে আসে, গ্রহবর্মার হাত কাঁপতে থাকে।

তরণী,—শর্মিষ্ঠা বলে, তুই এখান থেকে চ'লে যা বাবা···

না, না,—আমি যাবো না—বালক ছুটে এসে তার ক্ষুদ্র দেহ দিয়ে মাকে আড়াল করবার প্রয়াস পায়।

তরণীসেন! ক্রোধকম্পিত বজ্রকণ্ঠে গ্রহবর্মা চীৎকার কোরে ওঠে। তরণীসেন বলে, যদি বধ কোরতেই চাও, বাবা, তো একসঙ্গে দু'জনকেই করো।

গ্রহবর্মার হাত থেকে তরবারি সশব্দে ভূমে প'ড়ে যায়। ক্লান্ত পদক্ষেপে কক্ষ হোতে সে প্রস্থান করে। শর্মিষ্ঠা পুত্রকে প্রগাঢ় স্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নেয়··· তখন নয়নে তার শ্রাবণের ধারা।

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ।

পরবর্তী কয়েকটা পক্ষ কাটলো শুধু ভীষণ রক্তক্ষয়ী রণের মধ্য দিয়ে। অবশেষে গৌড়ের পতন হোলো,—তার দুর্গশীর্ষে উড্ডীন হোলো পৌণ্ড্রবর্ধন রাজাধিরাজ স্থাণুদত্তর বিজয়-পতাকা। গুপ্তবংশের ভগ্নাবশেষ মাধবগুপ্ত মগধের পথে পলায়ন কোরলো। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিংহাসন স্থাণুদত্তের করায়ত্ত হোলো। বহু বৎসর পূর্বে এই গৌড়ের অধিপতি ছিল তাঁরই পূর্বপুরুষ। পরাক্রমশালী গুপ্তরাজাদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হোয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র পৌণ্ড্রবর্ধনে সামান্য সামন্ত রাজা হোয়ে বিষণ্ণ অন্তরে বহুদিন অতিবাহিত কোরেছিলেন। উচ্চাভিলাষী বীর্যবান্ স্থাণুদত্ত সর্বপ্রথম গুপ্তরাজের অধীনতা অস্বীকার কোরে স্বাধীনতা ঘোষণা কোরে ধীরে ধীরে রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। এতদিনে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন সফল হোলো। তাই ইন্দ্রনীলের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এখন তাঁর দৃঢ় ধারণা, ইন্দ্রনীলের সহযোগিতায় সারা ভারতবর্ষ জয় করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দ্রনীলকে তো ধ'রে রাখা সম্ভব নয়—তাকে যেতেই হবে তার পিতৃরাজ্য উদ্ধার-কল্পে। স্থাণুদত্ত যথাসাধ্য সাহায্য কোরতে তার নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ। গৌড় অধিকারের পর স্থাণুদত্তর বল, বিত্ত, সামর্থ্য বহুগুণে বর্ধিত হোয়েছে এবং ইন্দ্রনীলকে সাহায্যের জন্য যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন সেই নৌবাহিনী গৌড়ে যথেষ্ট আছে; আত্মরক্ষার জন্য যে বাহিনী তাঁর গৌড়ে রাখা আবশ্যক তার অতিরিক্ত সমস্তই তিনি দেবেন ইন্দ্রনীলকে।

গৌড়ের রাজসভা আজ জনসমাগমে গম্ গম্ কোরছে। আজই প্রথম রাজাধিরাজ ভট্টারক স্থাণুদত্ত গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন কোরবেন, প্রজাবৃন্দের কাছে পরিচিত হবেন।

তূর্যধ্বনি হোলো, ঘোষক উচ্চকণ্ঠে রাজাধিরাজ স্থাণুদত্তর আগমন বিঘোষিত কোরলো। সভাস্থল নিস্তব্ধ হোলো। স্থাণুদত্ত পশ্চাৎদ্বার দিয়ে মহারাণীর সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ ও সোপানাবলী অতিক্রম কোরে রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত উচ্চ বেদীতে আরোহণ কোরলেন। সেই সঙ্গে ইন্দ্রনীল, কোদণ্ড ও রাজকুমারী চার্বী ও বেদীর ওপর উঠলো। শত শত তুরি, ভেরী তুমুল শব্দে বেজে উঠলো। আসনে উপবিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ দণ্ডায়মান হোয়ে জয়ধ্বনি কোরলো। মহারাজ হাত তুলে স্নিগ্ধ হাস্যে তাদের মহোল্লাসের আন্তরিকতা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ কোরলেন। বেদজ্ঞ ব্র[redacted] হোয়ে মন্ত্র উচ্চারণ কোরে প্রসারিত উ[redacted] রাজাধিরাজকে আশীর্বাদ কোরলেন। সস্ত্রীক রাজা ব্রাহ্মণের আশিস্‌বচন ও পদধূলি গ্রহণ করে সিংহাসনে উপবেশন কোরলেন। আবার দ্বিগুণ কোরে জনতার জয়নিনাদ সুরু হোলো।

রাজাধিরাজের নিকটে শ্রেণীবদ্ধভাবে উপনীত হোলো সুসজ্জিত নরনারী বহুবিধ উপঢৌকন নিয়ে; রাজা সেইগুলি দক্ষিণ কর দিয়ে একে একে স্পর্শ কোরে, তাদের প্রত্যেকটির গ্রহণ স্বীকার কোরলেন। তারপর সুদেহী, সুবেশী, সুশ্রী নৃত্যপরা নর্তকীরা অভিবাদন কোরে দাঁড়ালো নৃত্যের আদেশ-প্রতীক্ষায়।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান মন্ত্রীর প্রতি রাজা প্রশ্ন কোরলেন, নর্তকীশ্রেষ্ঠা উগ্রতারাকে কি সংবাদ পাঠাননি?

পাঠিয়েছিলাম, মহারাজ, কিন্তু গৃহে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এর কারণ?

মহারাজ! উগ্রতারা তার সারা জীবনের সমস্ত কিছু সম্পদ, ঐশ্বর্য, এমন কি প্রাসাদ পর্যন্ত দীনদুঃখীদের দান কোরে আশ্রয় নিয়েছে ভানুবিহারে ভিক্ষুণী হোয়ে বুদ্ধের শরণ নিতে।

আশ্চর্য!—এই একটিমাত্র শব্দ রাজার মুখনিঃসৃত হয়। কিছুক্ষণ পরে তিনি নৃত্য আরম্ভ কোরতে আদেশ দেন। তারপর নৃত্যের শেষে সিন্ধুরাব-গম্ভীর-বাক্ রাজা দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ, বহুদিন পরে আবার আপনাদের মধ্যে স্থানলাভ কোরে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে কোরছি। আপনারা জানেন, গৌড়ের এ সিংহাসন আমার পরমারাধ্য পিতৃপুরুষগণেরই ছিল; (উদ্দেশে প্রণাম)। এ সিংহাসনে আমার জন্মগত দাবি ছিল,

আর সে দাবি আমি রাজা মাধবগুপ্তের নিকট হোতে স্বীকার করিয়ে নিয়েছি। মাধবগুপ্তের রাজ্য আমি গ্রাস করিনি—আমি আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার কোরেছি মাত্র। শৃঙ্খলিতা গৌড়-জননীর শৃঙ্খল মোচন কোরে আবার গৌড়ে পৌণ্ড্রবর্ধনের স্বাধীনতা-পতাকা উত্তোলন কোরেছি। এই গৌরব অর্জন কোরতে আপনারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য কোরেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতার—এই অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকারের নিদর্শনস্বরূপ আমি যেমন আপনাদের সুখে, শান্তিতে ও পর্যাপ্ত অন্নে প্রতিপালন কোরতে ধর্মতঃ বাধ্য,—সেইরূপ আপনাদের আপদ-বিপদে রক্ষা করাও আমার অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, আমার এই একনিষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদনে আপনাদের যথোচিত সহায়তা লাভে কখনো বঞ্চিত হবো না। (আবার শতকণ্ঠে উচ্চ জয়ধ্বনি) এই কঠোর কর্তব্য পালনই হবে আমার ইষ্টমন্ত্র, আমার সাধনা, আমার মরণান্তকাল পর্যন্ত পূত-ব্রত।

যে কথা আমার সর্বাগ্রে বলা উচিত ছিল, এইবার তার অবতারণা কোরছি—সশ্রদ্ধভাবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে। —আমার পিতৃপুরুষগণের গৌড়রাজ্য পুনরুদ্ধার করা কোনো ক্রমেই সম্ভব হোতো না, যদি কম্বোজ-যুবরাজ ইন্দ্রনীল ও তাঁর পরম সুহৃদ্ কোদণ্ডের সময়োচিত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও বীর্যবত্তার সহায়তা না পেতাম। এ কথা আমি এই প্রকাশ্য সভামধ্যে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কোরছি যুবরাজ,…

বাধা দিয়ে ইন্দ্রনীল বলে, মহারাজ!

আমাকে বাধা দিও না, যুবরাজ। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাই এই প্রকাশ্য জনসভায় তারস্বরে ঘোষণা কোরছি, আমি আমার গৌড়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য কোরবো তারও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারকল্পে। গৌড়ীয়গণ বীর—স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে—উভয় যুদ্ধেই তারা সমপারদর্শী—গৌড়ীয় নৌবাহিনী অবিলম্বে অভিযান কোরবে সাগরের ওপারে কম্বোজ অবধি। আমার পরম মিত্র, আমার সন্তানতুল্য যুবরাজ ইন্দ্রনীলের সফলতাই আমার সৌভাগ্যসূচক ঋদ্ধি। আপনারা সকলে আসন হোতে উত্থিত হোয়ে সমস্বরে যুবরাজ ইন্দ্রনীলের জয়ধ্বনি করুন।

জনতা দণ্ডায়মান হোয়ে সমস্বরে ইন্দ্রনীলের জয়ধ্বনি কোরলো—আকাশ-বাতাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হোতে লাগলো। জনতা শান্ত হোলে স্থাণুদত্ত আবার বোললেন, এই জয়ধ্বনির মধ্যে যুবরাজ ইন্দ্রনীলকে দেবার মতন আমার কিছুই নেই, কেন-না যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি কথা বোলছি এ মাটিই যে ইন্দ্রনীলের প্রদত্ত।

ইন্দ্রনীল মহারাজের হাত চেপে ধ'রে আবেগের সঙ্গে বলে, মহারাজ! মহারাজ…

স্থাণুদত্ত বোলতে থাকে, বীরের যোগ্য উপহার না দেওয়া পর্যন্ত মন তো আমার স্থির হয় না, যুবরাজ, তাই আমি সংকল্প কোরেছি, আমার রাজ্যের, আমার নিজস্ব যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তা তোমাকেই উপহার দিতে—বহু রাজপুরুষের আকাংখিত আমার কন্যা চার্বীকে তুমি গ্রহণ করো। তোমার কাছে আমার এ দান হয়ত তুচ্ছ, কিন্তু সে আমার বংশের কৌস্তুভমণি।

রাজসভায় সহস্র কণ্ঠে উচ্চ কলধ্বনি উঠলো। যুবরাজ ইন্দ্রনীল নতজানু হোয়ে করযোড়ে বোললো, মহারাজ! আমার এই অপ্রত্যাশিত অসীম সৌভাগ্যের জন্য আমি শুধু গর্ব অনুভব কোরছি না—পিতৃহারা ইন্দ্রনীল আজ বহুদিন পরে পিতাকে প্রাপ্ত হোয়ে কৃতকৃতার্থ—আজ সার্থক তার জীবন। মহারাজের পদধূলি ইন্দ্রনীল শিরোপরি গ্রহণ কোরলো।

(ক্রমশঃ)

জীবন-কাব্য

শ্রীচুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছলনার হাট নিঠুর সমাজ পীড়নের পরিবেশ,
হত্যা করিল মোরে তিলে-তিলে করে দিল নিঃশেষ ;
আমার স্বভাবে যাহা ভাল ছিল
সবকিছু তাহা বিফল হইল
কি আমি ছিলাম, কি আমি হলাম ভাবিতেছি বসি হায়—
ভাবিতে ভাবিতে বুকটা আমার ভরে যায় বেদনায়।

দেখেছি জগৎ দেখেছি তোমার ভীষণ কুটিল আঁখি,
তাই যে তোমায় জানিতে বুঝিতে মোটেই নেইকো বাকি।

বাংলার স্বরূপ

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈদিক সাহিত্য অনুশীলন করে বাংলা দেশের যে পরিচয় আমরা পাই তা' থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সেই যুগে বৈদিক সভ্যতার যে স্রোত বয়ে চলেছিলো ভারতের অন্য প্রান্তে সেই প্রবাহের বাইরে একটি নিজস্ব ধারা নিয়ে চলেছিলো বাংলা। বাংলা তাই সেই প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাত্য অর্থাৎ কিনা বৈদিক সংস্কৃতির চৌহদ্দির বাইরের একটি এলাকা। এই কারণে যে সব এলাকা নিয়ে এ কালের বাংলা সেই সব স্থানকে বৈদিক সংহিতা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছে। বেদের 'ব্রাহ্মণ' অংশে এই সব এলাকার উল্লেখমাত্র একবার আছে আর সেই উল্লেখ এতোই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যে ভরা যে তার কথা না বলাই ভালো। এই অবজ্ঞার কারণ হচ্ছে বাংলার অ-বৈদিক অনার্য সংস্কৃতি। বাংলা অনার্য জাতিদের বাসভূমি ছিলো। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বাংলার যে উল্লেখ আছে তা থেকে জানা যায় যে, উত্তর বাংলায় পুন্ড্র ও মধ্য ও পূর্ববাংলায় বঙ্গ—এই দুই জাতির বাস ছিলো। 'আচারাঙ্গ' সূত্রে জৈন লেখকেরা পশ্চিম বাংলাকে লাঢ়দের বাসভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। একালে যে জায়গাটাকে হুগলী জেলা বলা হয়, মহাভারত থেকে জানা যায় যে, সেই এলাকায় সুহ্ম জাতি বাস করতো।

এই অনার্য জাতিগুলি আর্যসভ্যতাকে সহজে আমল দেয়নি। আর্যসভ্যতা বহু বাধা পেয়েছে বাংলায় ও আর্যসভ্যতা বাংলায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে ভারতবর্ষের অন্য জায়গার তুলনায় অনেক দেরীতে। ভারতের অন্যান্য জায়গায় তার বিস্তার লাভের অনেক পরে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আর্যসভ্যতা প্রথম বারের মতো বাংলায় আসে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে বাংলায় জাতিগত মিশ্রণ হয়েছে বেপরোয়া ও অঢেল। উত্তর ভারতীয় লম্বা-মাথা (লং হেড) অর্থাৎ আর্য, আল্পস্-অঞ্চলীয় ছোটো-মাথা (সর্ট হেড) লোকের দল দ্রাবিড়-মুণ্ডা জাতীয় লম্বা-মাথা লোকরা, মৌঙ্গলীয় ছোটো-মাথা-ওয়ালা মানুষেরা এবং নিগ্রো—এই সব জাতির মিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব। নানা জাতির রক্তধারার এই মিশ্রণের ফলে কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা দিয়েছে বাঙালী জাতির জাতীয় সত্তায়। প্রথমে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকটা ধরা যাক। আকৃতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাঙালীর কোনো আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নেই। পাঞ্জাবী বলতেই একজন বিশেষ-আকৃতির মানুষের চেহারা মনে আসে। মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী বল্‌লেও কতকগুলি বিশেষ আকৃতির মানুষদের ছবি মনে ভেসে ওঠে। বাঙালীর কথা স্মরণ করলে কিন্তু কোনো আকৃতি-বৈশিষ্ট্য মনে জাগে না। এতো ভিন্ন ভিন্ন জাতির মিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়েছে যে, বাঙালী জাতির আকৃতিগত কোনো বিশেষ ছাঁদ যাকে টাইপ বলা হয় ইংরিজীতে, সেটি একেবারেই নেই। কেউবা খুব ফর্সা, কেউবা খুব কালো, কোনো বাঙালীর মুখের ছাঁদ উত্তর ভারতীয় অর্থাৎ কিনা আর্যমুখের ছাঁদ, কারো মুখশ্রী আল্পস্ ভূ-খণ্ডের উপবাসীদের ছাঁদে তৈরী, আবার কারো বা মুখমণ্ডলে নিগ্রোজাতির জাতীয় ছাপ সুস্পষ্ট।

নানা জাতির মিশ্রণ যে শুধু দেহের এলাকায় তার ছাপ রেখে গেছে তা নয়, বাঙালী জাতির মনের ছাঁদে এই মিশ্রণের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের ফলে কোনো একটি বিশেষ জাতির চিন্তাধারা একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করতে পারেনি বাঙালীর মনে। তাই সংস্কারবদ্ধতা ও গোঁড়ামি বাঙালীর মনকে ঠিক তেমনিভাবে শৃঙ্খলিত করতে পারে নি, যেমনটি করেছে ভারতের অন্য অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের মনকে। বাঙালীর মনন, হৃদয়াবেগ, ভাব, এই সবই আচারের বাঁধনের অত্যাচার ও সংস্কারের অর্থহীন জড়তা বার বার ভেঙে অ-শাস্ত্রীয় পথে অভিযান করেছে।

বাঙালীর মনের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন—"কাঠামোর ও রূপের

পরিবর্তন সাধন-ক্ষমতা ও চিত্তের নমনীয়তা এবং পূর্বে ছিল না এমন সব নতুন নতুন ছাঁদ তৈরী করবার ঝোঁক—বাংলাদেশের লোকদের এই যে বিশেষত্বগুলি আমরা দেখি, বাঙালীরা তাদের আর্য, দ্রাবিড়, কোল্লেরিয়ান, নিগ্রো ও মৌঙ্গলীয় পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে। বৌদ্ধধর্মের কৃপায় বাঙলায় এই মিশ্রণ হয়েছিলো অবাধ ও গভীর। তার ফলে বাঙলার লাভ হয়েছে—চিত্তের সংস্কারমুক্ততা ও স্বাধীনতা, অন্তরের উদার সহানুভূতি ও মনের কল্পনা-ধন্য প্রসারতা।"

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের এই কথাগুলি স্মরণীয়। আগেই বলেছি যে, বাংলা দেশে আর্যসভ্যতার প্রথম আবির্ভাব হয় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। তখন দক্ষিণ বেহার ও বাংলা নিয়ে যে রাজত্ব ছিলো সেই রাজত্ব বিস্তৃত ছিলো যমুনা থেকে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত। পঞ্চম খৃষ্টাব্দে বৈদিক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে বাংলা দেশে। বৈদিক সংস্কৃতির একচেটিয়া প্রভাব কিন্তু বাংলা দেশে থিতিয়ে বস্‌তে পারে নি। এইটেই হোলো বাংলার সৌভাগ্য। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর বাংলা ও নিম্ন বাংলায় বেশ কিছু অংশে জৈনধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিলো। 'কল্পসূত্রের সংকলন-কর্তা ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস 'গোদাসকণ' নামক একটি জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের চারটি শাখার মধ্যে তিনটি শাখার নাম ছিলো—তাম্রলিপ্তিক, কোটিবর্ষীয় ও পুণ্ড্রবর্ধনীয়। এই তিনটি শাখাই বাংলা দেশের তিনটি ভৌগোলিক অংশের নামের সঙ্গে যুক্ত। মথুরায় আবিষ্কৃত দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে রাধা-বাসী এক জৈন সাধুর অনুরোধে জৈনমূর্তি সংস্থাপনের খবর পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলারই নাম ছিল 'রাধা' এই যুগে। পাহাড়পুরের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বট-গোহালিতে জৈন বিহারের অস্তিত্ব ছিল চতুর্থ খৃষ্টাব্দে। হুয়েন-সাং লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সপ্তম খৃষ্টাব্দে জৈনরা উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বাঙলায় শক্তিশালী সম্প্রদায় বলে গণ্য ছিলেন।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, অশোকের রাজত্বের পূর্বেই বৌদ্ধধর্ম উত্তর বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিলো। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ মতবাদ যে উত্তর বঙ্গে প্রচলিত ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁচির শিলালিপি থেকে। পুণ্ড্রবর্ধনের দু'জন অধিবাসীর দানের কথার উল্লেখ আছে শিলালিপিতে। দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দের নাগার্জুন-কোন্ডার শিলালিপিতে বঙ্গের উল্লেখ আছে। গুপ্ত রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধমতবাদের প্রভাব খুবই গভীর ও ব্যাপক ছিলো। পঞ্চম খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গঙ্গার তীরে বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধভিক্ষুদের দেখেছেন। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সুদূর-প্রসারী হয়েছিলো বাংলাদেশে। বঙ্গভূমিতে বৌদ্ধধর্মের যে প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিলো তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন হুয়েন-সাং সপ্তম শতাব্দীতে। হুয়েং-সাং-এর লেখা বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তখন বাংলাদেশে সত্তরটি বৌদ্ধ বিহার ছিলো আর সেগুলিতে আট হাজার বৌদ্ধভিক্ষু বাস করতেন। পাল রাজাদের চারশতাব্দী-ব্যাপী রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম খুব উন্নতিলাভ করেছিলো বাংলাদেশে। একই সময়ে বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ, এই তিন ধারার প্রবাহ বাঙালীর চিত্তকে উর্বর করেছে। কোনো একটি ধারা বাঙালীর আত্মিক ফসলের ক্ষেতকে একচেটিয়া ভাবে দখল করে নেয় নি। তার ফলে দেখা যায় যে, সেই অতীতের বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও মতবাদগুলির মধ্যে স্ব-স্ব প্রধানতার ইতর রেষারেষি ছিলো না বল্‌লেই হয়।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজারা খুব উদার চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ধর্মপাল তৃতীয় ও বিগ্রহপাল—এই দুই নৃপতি বৌদ্ধ হলেও বর্ণাশ্রম প্রথাকে বিনষ্ট করেন নি। নৃপতি নারায়ণ পাল শিবমন্দিরের জন্যে অর্থ দান করেছিলেন। নৃপতি মদনপালের মহিষী চিত্রাতিকা মহাভারত শোনা পুণ্যকর্ম বলে মনে করতেন। রাণী প্রভাবতী বৌদ্ধ হলেও চণ্ডীমূর্তি স্থাপন করেন। বৌদ্ধ নৃপতি ধনদত্ত শৈব রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র কান্তিদেব বৌদ্ধ হলেও

কালজয়ী

শ্রীহংস

—ঈস্, কী সাংঘাতিক ঘেমে গেছ। একটু জিরিয়ে নাওনা। বোসো ঐ গাছ তলাটায়।

—কী সর্বনাশ, জিরোবার উপায় আছে? দেখছনা শত শত জোয়ান গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গেল এক মাস ধরে। শেষ আজ করতেই হবে। রাজার হুকুম। শেষ করার কথা ছিল তো তিনদিন আগেই, কিন্তু এত গাছের শিকড় কাটতে হলে কাজ এগোয় ?

—কাটছই বা কেন গাছগুলো। বেশ তো ছিল একটা ছায়া-ছায়া স্তব্ধ বিশালতা। একটা আরণ্য গাম্ভীর্য। কতো কালের একটা সুন্দর ঘুমকে কেন ভাঙতে এলে তোমরা? ওদিকের গাছগুলির দিকে তাকাও তো, কী সুন্দর স্নিগ্ধ মেঘল সবুজ। আর কী কদর্যই না করে ফেল্লে এদিকটা তোমরা।

—ও গাছও থাকবে না একটাও। সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

—তারপর ?

—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারত গড়া হবে এখানে। নতুন সহর বসবে। নতুন সভ্যতার বাণী এখান থেকেই দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে যাবে। এটা হবে আমাদের রাজার একটা অক্ষয় কীর্তি।

—কীর্তি না হয় হোলো, কিন্তু সে তো হবে তোমার রাজার। তুমি কেন খেটে মরছ ?

—আমি যে রাজার সেবক। তার আজ্ঞাবহ।

—কিন্তু তোমার প্রভুভক্তির চোটে আমার বুকের পাঁজরগুলি যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। তোমার ঐ সাবলের প্রতিটি কোপ টন্ টন্ করে লাগছে আমার বুকে? ব্যথা পাই বুঝতে পার না? মায়ের বুকে সাবল মেরে বেশ তো রাজার তোয়াজ করছ।

—মা তোমাকে বলি বটে। কিন্তু তোমাকে কুপিয়ে খুঁটিপে চষে পিটিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো না করলে যে তোমার প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। তুমি বাপু নির্যাতনই ভালবাস।

—আমি কি ভালবাসি তা কি তোমরা জানতে চেয়েছ কোনদিন? তার চেয়ে বল তোমরাই ভালবাস আমায় নির্যাতন করতে। আমার শান্তির ঘুম ভাঙিয়ে তোমরা নির্ভুর আমোদ পাও। আমার বুকে পাষাণ চাপিয়ে তোমরা ইমারত গড়, লাঙ্গল কোদাল চালিয়ে তোমরা পেট ভরাও। আমার ব্যথা, আমার খুন, আমার ক্ষুধা কোনটাব দিকে কবে চাইলে তোমরা ?

—তোমার ব্যথাটা তো বুঝলাম। আমরা ব্যথা না দিলেই তোমার সুখ তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোমার ক্ষুৎটা আবার কি বস্তু ?

—সুখ দুঃখটা তো বুঝেছ? এবার তাহলে সাবলটা রাখনা। থাম একটু।

তাঁর রাজকীয় শীলমোহরে সিংহ ও সর্প, বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রতীকের সমন্বয় সাধন করেন। পালবংশীর নৃপতি বৈদ্যদেব ধর্মনপাল, পরম-মাহেশ্বর ও পরম-বৈষ্ণব এই তিনটি উপাধি গ্রহণ করেন। অন্যদিকে দেখি শৈবমতাবলম্বী রাজা বৈদ্যগুপ্ত বৌদ্ধবিহারের জন্য অর্থ দান করছেন। পাহাড়পুরের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী জৈন বিহারের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ দান করেছিলেন।

এই হোলো বাঙালীর অন্তরের প্রকৃত মানচিত্র। যেসব উপাদানের মিলনের ফলে বাঙালীর অন্তরপ্রকৃতি এই বিশেষ রূপটি গ্রহণ করেছে, সেই উপাদানগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলে বাঙালী কখনো তার জাতীয় স্পর্ধা থেকে স্খলিত হবে না, কিম্বা গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও অনুদাবতাকে প্রশ্রয় দেবে না। অন্তরের ঐশ্বর্যের যে অনুপম প্রকাশের দ্বারা বিশ্বসভায় বাঙালী তার নিজের জন্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে, অন্ধতার ও অনুদারতার অধোমুখী আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করে সেই বরণীয় সম্মান বাঙালী কখনই তাহোলে খুইয়ে বসবে না।

[কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন বুরো হইতে]

—থামবার যে উপায় নেই। তুমি তো জাননা কত বড় ইমারত উঠবে এখানে। দশ বিশতলা উঁচু হবে। সারা দুনিয়ার লোক এসে দাঁড়িয়ে দেখবে আমাদের রাজার কীর্তি। এ ইমারৎ হবে কালজয়ী। [redacted]ইতো এর ভিৎ-এর কাজেই এত সময় নিচ্ছে অথচ [redacted] করতেই হবে। ভিৎটা মজবুত না হলে...

—তোমাদের ইমারত কালজয়ী হবে না, তাই তো?

—নিশ্চয়।

—আর খুব মজবুত ভিত হলে কতোদিন টিকতে পারে?

—ধরো কয়েক হাজার বছর।

—তারপর?

সাবল রেখে সত্যিই এবার ভাবতে বসল মানুষ। তাইতো—তারপর? আর মানুষের চিন্তাক্লিষ্ট কুঞ্চিত ললাটের দিকে তাকিয়ে শিশুর মত খিল খিল করে হেসে উঠল মাটি।

—তারপর কি হবে জান না? মাটি। প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার মশলা হিসেবে থাকতেও পারে ইঁট পাথরের দু' একটা টুকরো। তাই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে পাঞ্জা কষাকষি হবে।

—শুধু ইঁট পাথরের টুকরো নয়। তুমিতো জানোনা আমাদের রাজার পরিকল্পনা। এ ইমারতে সঞ্চিত থাকবে এ যুগের সভ্যতার নিদর্শন। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন সমস্ত বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বস্তু, শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার যা-কিছু সবই এখানে দেখতে পাবে ভাবী কালের মানুষ। তাইতো এটাকে কালজয়ী করে গড়বার এত চেষ্টা হচ্ছে।

—সে কাল মানে তো ঐ কয়েক হাজার বছর।

আবার হাসতে থাকে মাটি।

—হাসছ যে বড়?

—পাললিক পাহাড়ের নাম শুনেছ? তোমাদেরই দেওয়া নাম। গম্ভীর ভাবে বলে মাটি। পলিমাটির স্তর জমে জমে গড়ে ওঠে পাললিক পাহাড। যুগ যুগ সঞ্চিত পলিমাটি। অর্থাৎ আমার গায়ের ময়লা। আর শেষ ময়লার গায় লেখা থাকে তোমাদের নিষ্ঠুরতার কথা। তোমাদের সভ্যতার কথা। সেই পাহাড়ের সর্বাধুনিক স্তর হল মেনোজাইক শিলাস্তর। তারও আগে আছে মোসেজাইক স্তর। তারও আগে.....

—থামো থামো। এ সব তত্ত্বকথা শুনতে গেলে আমার বক্তব্য শেষ হবে না।

—কিন্তু ও শেষ করেই বা লাভ কি? ও ইমারতও তো একদিন.....

কি বলছ তুমি?

—ঐ যে বলছিলাম মেনোজাইক শিলাস্তরের কথা। একেবারে আধুনিক স্তর। মাত্র দশ কোটি বছরের কথা।

—দশ কোটি বছর! বিস্ময়ে চোখ গোল করে আবার সাবল রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে মানুষ।

—আর তোমার এই ইমারতের আয়ু কদ্দিন বল্লে যেন? সে যাক্‌গে হিসেব মিলিও পরে। শোনো, আমার বুকে প্রাণের ইতিহাস প্রায় ১২০ কোটি বছরের কাহিনী। এই প্রাণগুলি আমার বুকেই বাঁচা-বাড়া-মৃত্যুর পথ পরিক্রমায় এগিয়ে এসেছে এতদূর। এর মধ্যে মানুষের ইতিহাস আর ক'দিনের। অথচ মানুষ এসেই আমার দীর্ঘদিনের শান্তির ঘুম ভেঙ্গেছে নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে। আমায় নিষ্ঠুর করে তুলেছে। তাইতো আমার ক্ষুধা...

—তোমার ক্ষুধা?

—হ্যাঁ, ক্ষুধা। এই যে ইমারত তুমি গড়তে চলেছ আজ এর আগে এখানে কি ছিল জান?

—বিশাল অরণ্য।

—গাছগুলির বয়স কত মনে হল?

—তা বড়গুলির তো হাজার বছরও হতে পারে।

—তার আগে?

—কে জানে। হয়তো ছিল শূন্য প্রান্তর, না হয় ছিল সমুদ্রতলে। এ মাটিতে প্রথম ইমারত গড়ব আমরা।

হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ করে আবার শিশুর মত হাসল মাটি।

—কোটি কোটি বছর আগে যে অর্ধমানব পুরুষ এখানে গুহা-গৃহ নির্মাণ করেছিল সেও ভেবেছিল তাই। তারপর সে যাযাবর মানুষ গাছের ডালপালায় এখানে

অস্থায়ী আবাস নির্মাণ করল সে-ও ভাবল তাই। পাথরের দেয়াল ঘেঁষে যে মানুষ চিরস্থায়ী বসবাসের স্বপ্ন দেখেছিল সেও তাই-ই ভেবেছিল।

—এখানেই তারা ঘর বেঁধেছিল? বিশ্বাস হয় না। কোন চিহ্নই যে নেই। প্রায় তো বিশ ফুট খোঁড়া হয়ে গেল।

—চিহ্ন যে আমি রাখতে চাই না। তোমরাই নিষ্ঠুর করে তুলেছ আমায়। বাড়িয়ে দিয়েছ ক্ষুধা। তোমরাই নিজের স্বার্থে সর্বংসহা বলে আমায় প্রচার করেছ। কিন্তু আমি ক্ষমাহীন। আমি সর্বভুক। তোমাদের আজকের ইমারত তাই হয়ে যায় কালকের ফসিল। আমার যে অনন্ত ক্ষুধা। কতো মিশর ব্যাবিলন আসিরিয়া আমার ক্ষুধার ইন্ধন জোগাল, তোমাদের রাজার এই দুঃসাহসী দুঃস্বপ্নটাও তেমনি···

—তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন!

খিল খিল করে হাসতে হাসতে আবার বলে মাটি,—থাকতেও পারে হয়তো আমার ভুক্তাবশেষ এক-আধটা হাড়ের টুকরো। ভবিষ্যতের কোন পণ্ডিতের গবেষণাগারে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তার পরীক্ষা হবে। বারে বারে তোমাদের কাল নির্ণয়ে ভুল করবেন পণ্ডিতেরা। হয়তো বহু ভুল সমাকীর্ণ একখানা ইতিহাসও লিখে একালের। কিন্তু তাতে থাকবে কি তোমার এই কাল-মাসের ইতিহাস। কেন এত খেটে মরো একটু থাম। বিশ্রাম কর।

মানুষ তবু থামতে চায় না। তার বিশ্রাম নেই। সভ্যতার ইমারত তাকে গড়তেই হবে। তাকে হতেই হবে কালজয়ী। সঙ্কল্পে সে অটুট। মানুষের এই হাস্যকর সঙ্কল্পে ধরিত্রী ক্রুর হাসি হাসে, না করুণ কান্নায় মহাকালের কৃপা প্রার্থনা করে, সে প্রশ্নের উত্তর কি আজও পেয়েছে কেউ?

সৈনিক, যদি শান্তি চাস্ তো—

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

শান্তি যদি রে পরিহাস পেল
সৈনিক, তবু শক্তি হান
দুষ্ট দমনে, শিষ্ট পালনে
শক্তিসাধনে ভক্তি আন।

হৃদে শ্রীকৃষ্ণ শিরে শ্রীরাম
ডাকে অহরহ নাই বিরাম,
ন্যায়ের যুদ্ধে হুংকারি' বেগে
বীর ব্রতে আনুরক্তি আন—
মাভৈঃ সরোষে শক্তি হান,
শক্তি হান,
শক্তি হান্,
সৈনিক, যদি শান্তি চাস্ তো
শক্তি হান॥

শান্তির কাল আসেনি এখনো
কাঁদে বিরহিণী লাল গোলাপ,
কাকজ্যো'স্নায় গান গাহে পাখী
যদিও যায়নি রাতের পাপ।

দুশ্চরিত্র দুঃশাসন
অন্তঃপুরে আক্রমণ—
শান্তি-সমরে কোথা রে অমর
ভীম গদাধর শক্তিমান,
মাভৈঃ সরোষে শক্তি হান,
শক্তি হান
শক্তি হান্,
সৈনিক, যদি শান্তি চাস্ তো
শক্তি হান॥

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণ

শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

॥ ৭ ॥

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এবং দেশনেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রিয় ছাত্র শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য কয়েক বৎসর আমার অভিভাবক-স্থানীয় শিক্ষকরূপে ছিলেন। তাঁর অন্তঃকরণে দেশ-প্রেমের প্রেরণা যথেষ্ট ছিল; সদাচারী ব্রাহ্মণ হ'লেও ইংরাজী শিক্ষিত দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। হর্ষনাথবাবুও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তণ ছাত্ররূপে আমাকে স্বদেশীভাবে সর্ব্বদাই উদ্বুদ্ধ করতেন; এঁদের সঙ্গেই আমি কলিকাতার বড় বড় সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও গান শোনবার সুযোগ-লাভ করেছি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট "বেঙ্গলী" পত্রিকার অফিসে এঁরা একবার আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন; শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশীযুগের অবসানে সংশোধিত আইনসভায় পূর্ববঙ্গের জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে বাবা যখন দ্বিতীয়বার রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করেন, তখন তিনি সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বই বরণ করে নেন। গরমপন্থী চিত্তরঞ্জন তখন আইন ব্যবসা, সাহিত্যচর্চ্চা ও চরমপন্থী রাজনীতির চর্চ্চায় নিমগ্ন। আমার স্পষ্ট মনে আছে,—সুরেন্দ্রনাথ মধ্যাহ্ন ভোজন ও কিছু বিশ্রামের জন্য তাঁর নিজ অফিসে বসেছিলেন এবং তাঁর পুত্র ভবশঙ্করের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এই সময়ে শশীবাবু ও হর্ষনাথের সহিত তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী জেনে আদরের সহিতই আমাকে ডেকে তাঁর পাশের চেয়ারে বসালেন। শশীবাবুকে তিনি বললেন,—"আমি এইমাত্র গভর্ণরের সহিত দেখা করে আসছি (তখন গভর্ণর ছিলেন লর্ড রোন্যাল্ডসে বা জেটল্যাণ্ড)। আমি গভর্ণরকে স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বুঝাচ্ছিলাম, স্বামীজির ব্যক্তিত্ব কত মহান্ ছিল; স্বামিজী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী হলেও বৃটিশের শত্রু ছিলেন না। ইংরাজ জাতির সদ্‌গুণগুলি গ্রহণে তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। স্বায়ত্বশাসনই স্বাধীনতার প্রথম সোপান,—এ কথা আমি ব'লে থাকি। স্বামিজীও আপাততঃ স্বায়ত্ব-শাসন পেলেই সন্তুষ্ট হ'তেন।"

সুরেন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন ভোজনের কাল উপস্থিত দেখে আমরা তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ করলাম। আমার প্রণামের পর তিনি আশীর্ব্বাদছলে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন,—"Be strong and honest, জানবে এইটেই আমার জীবনের আদর্শ।"

স্বদেশীযুগে সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশীপ্রচারের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে পূর্ব্ববঙ্গে আসতেন। হর্ষবাবু (তখন স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক, সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে নানা গল্প আমাকে শোনাতেন। সুরেন্দ্রনাথ জনসভায় বক্তৃতাকালে মাঝে মাঝে নিজ পোষাকের ভিতর থেকে তাঁর বক্ষশোভিত উপবীতটি খুলে পৈতা হাতে সবাইকেই বলতেন—"দেখ আমি ব্রাহ্মণ সন্তান: দীক্ষাদানের অধিকার আমার আছে, আজ বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে তোমাদিগকে আমি দীক্ষিত ক'রতে এসেছি।"

একবার গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমারে পদ্মা-বক্ষের উপর দিয়ে যাওয়াকালে লৌহজং ষ্টেশনে সমাগত দর্শনার্থী জনতাকে সম্বোধন করে বক্তৃতাকালে নিজ পৈতা খুলে তাঁদের দীক্ষিত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ষ্টীমারের কেবিনে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর সামনের টেবিলে বাবুর্চি-খানসামাগণ খানা পরিবেশন ক'রে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। ঐ সময়ে ষ্টীমারের সহযাত্রী একজন মুখফোড় ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—আপনি তো উচ্চবংশীয় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ; তবে যবনের হাতে বিলাতী খানা গ্রহণ করেন কেন? তদুত্তরে সুরেন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে ব'ললেন,—"ব্রাহ্মণ হ'লেই কাঁচকলা সিদ্ধ খেতে হবে এমন কোন কথা নেই; ব্রাহ্মণের শরীরে জ্বলছে ব্রহ্মাগ্নি, সে আগুনে সব খাদ্যই ভস্মীভূত হয়ে যাবে, ব্রাহ্মণ সবই খেতে পারে।" হর্ষবাবু প্রায়ই ব'লতেন যে, তাঁদের ছাত্রজীবনে

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকে Surrender not Banerjee নাম দিয়েছিল। তিনি একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দকেই ভক্তির চোখে দেখতেন ; অপর কাবোরই নিকট তিনি মাথা হেঁট করেন নি।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ ও নেতৃত্ব একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও তিনি রক্ষণশীল কংগ্রেসের নেতা ছিলেন, তিনি ধীর অগ্রগতিবই পক্ষপাতী ছিলেন। অনেকে জানে না যে, বাংলার অগ্নিযুগে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের বৈপ্লবিক কাজেও সাহায্য ক'রতেন। পরবর্তী যুগে চরমপন্থীগণ তাঁকে মডারেট বা মদরত আখ্যা দিলেন। তিনি যে ভারতের এক সুদূরদর্শী নেতা ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দেশবন্ধু স্বরাজ পার্টির যুগে আইন সভার নির্ব্বাচনের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ক'বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই-ভাবেই সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেশবন্ধুকেও সুরেন্দ্রনাথের মত অনুযায়ী স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য লর্ড লিটনের সহিত পরামর্শ ক'রতে হয়েছিল এবং ডাঃ বিধানচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণ সিদ্ধির সময়ে সুরেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ ধরেই তিনি বাংলার নবগঠনের গোড়াপত্তন ক'রে গেছেন। এ কথা আজ আমরা অকুণ্ঠচিত্তে ব'লতে পারি যে, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় দেশনেতা ভারতের কর্ণধার-রূপে অধিষ্ঠিত থাকলে ভারত বিভাগ কখনই ঘটে উঠতো না ; ভারতের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিপদও দেখা দিত না।

যে বৎসর আমার সুরেন্দ্রনাথের দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে, সেই বৎসরেই লোকমান্য তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, সরোজিনী নাইডু, রবীন্দ্রনাথ ও অ্যানী বেসান্ত কলিকাতার কংগ্রেসে বক্তৃতাদান করেন। আমি ঐ কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলাম। কংগ্রেস উদ্বোধনকালে সুরেন্দ্রনাথের সিংহগর্জ্জন এখনও আমার কানে লেগে আছে। তিনি বক্তৃতামঞ্চে-দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে প্রথমেই ব'ললেন, "Oratory is a divine gift" অর্থাৎ "বাগ্মীতা ঈশ্বরপ্রসাদেই সম্ভব"। তার পরেই মুখ ফিরিয়ে ব'ললেন, "They say but not I." অর্থাৎ "ইহা সকলে বলে, কিন্তু আমি বলি না।" তার পরে তিনি সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা ক'রলেন, দৈবকৃপার উপরে ভরসা ক'রে থাকলে চ'লবে না। নিজের যা লক্ষ্য, তা পুরুষকারের সাহায্যে আয়ত্তাধীনে আনতে হবে। সুরেন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথের কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর সমগ্র কংগ্রেস প্রাঙ্গণে এক অপূর্ব মায়াজাল বিস্তৃত করে তুললো। অ্যানি বেসান্তকে আমরা ব'লতাম "অন্ন বাসন্তী।" নায়ক পত্রিকার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, "কলিকাতায় অন্ন হাতে অন্নপূর্ণা বাসন্তী দেবী আসছেন, তাঁর চরণে সকলে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কর।" এই সব সমারোহের মাঝখানে আমার ছাত্রজীবনের দুঃখগুলি কিছুদিন ভুলে ছিলাম ; কিন্তু দৈনন্দিন জীবন অতিরিক্ত নিয়ম শাসনের বেড়াজালে জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠছিল। আমার মনের সান্ত্বনার বাবা অভিভাবকদিগকে অনেক বুঝিয়ে আমার সঙ্গীত-চর্চ্চার একটি প্রাথমিক সুযোগের ব্যবস্থা করলেন, যে জন্য আমি স্বর্গত পিতৃদেবের নিকট চিরঋণী থাকবো।

পিতার বনিষ্ঠ বন্ধু ও সঙ্গীতশিক্ষক স্বর্গত এস্রাজী শীতল মুখোপাধ্যায় আমার অভিভাবকদিগের অনুমতি-ক্রমে মাসখানেকের জন্য দ্বারভাঙ্গা-দরবার থেকে ওস্তাদ আব্‌দুল্লা খাঁ স্বরোদীকে কলিকাতায় নিমন্ত্রণ ক'রে আনেন। ঐ সময়ে প্রত্যহ আমার বিদ্যাভবন থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য পিতৃভবন সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসায় গিয়ে আব্‌দুল্লা খাঁর স্বরোদ আলাপ শোন্‌বার সুযোগলাভ আমার ঘটতো। উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতের আলাপের মধ্যে যে অপার্থিব আনন্দের উৎস র'য়েছে, এই সময় থেকেই তার সন্ধান আমি পাই।

(ক্রমশঃ)

'প্রবর্ত্তকে'র পঞ্চাশ বছর

ডাঃ অমিয়কুমার সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

॥ ৭ ॥

মহাযুদ্ধের সময়ে, ১৯১৫ সালে, ভারত রক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনের বলে শাসকগণ বিভিন্ন অজুহাতে বাংলার বুকে অত্যাচারের বন্যা বহাইয়া দেন। অগণিত বাঙ্গালী বিনা বিচারে আটক হয়। গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র প্রচারে বাধা সৃষ্টি করিয়া জনমতের কণ্ঠরোধ করা হয়। "১৯১৭ সালের প্রথম নয় মাস বিনা বিচারে আবদ্ধদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চলে। সরকার ও পুলিশের উৎপীড়নের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ উড্‌রো উইলসনকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠান। এই পত্র লইয়া সরকারী মহলে খুব হৈ চৈ পড়িয়া যায়। পত্রে কি লেখা ছিল তাহার গুণাগুণ বিচারের বিষয় নহে—বিদেশী রাষ্ট্রপতির নিকট ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজার এই ধরণের পত্র লেখার বৈধতাই ছিল তর্কের বিষয়।" এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও অ্যানি বেশান্টের অন্তরীণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পত্র লিখেন; পৃথিবীময় এই পত্র প্রচারিত হয়।

সেই সময়ে প্রবর্ত্তকের ৩য় বর্ষ চলিতেছে। প্রবর্ত্তকে এই অন্তরীণ সম্পর্কে (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) 'খোলা কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে সমসাময়িক কালের চিত্রটিই শুধু প্রকাশ নাই, নূতন দিগ্‌দর্শনও দেওয়া হয়। উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

"সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেচারা অন্তরীণদিগের পক্ষ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে কার সাহেব সেই সকল প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা দেশের সংবাদপত্র সকলে তদ্বিষয়ের যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে এবম্বিধ উত্তরে বঙ্গের জনসাধারণ বেশ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। যাহাদের উপর শাসনযন্ত্রটা চালনা করা হয়, তাহারা যদি শান্তির বিনিময়ে ক্রমশঃ অশান্তি ভোগ করিতে থাকে তখন তাহাদের যতটুকু সাধ্য, তাহা দিয়াই এইরূপ শাসন-নীতির প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। এ দেশের রাজনীতিক মহান্দোলনই ইহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এই অন্তরীণ আইনে দেশের বাছা বাছা ছেলেগুলির ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। শচীন, হরিদাস আত্মহত্যা করিয়াছে, জ্যোতিশ্চন্দ্র উন্মাদ হইয়াছে, মণীন্দ্রনাথ, চণ্ডীচরণ নাগের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, গ্রাম্য রমণী সিন্ধু বালাদ্বয় এই আইনের ফলে সমাজচ্যুতা হইতে বসিয়াছে, এমন কি নিরীহ শান্ত কবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও অশান্তির ছায়াপাত হইতে বসিয়াছে। কাজেই জনসাধারণের মনে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাহারা সাধ্যমত ইহার প্রতিকারপরায়ণ হইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ইহার প্রতিবিধান শীঘ্র হইবে না।

"প্রবর্ত্তকের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা গোটা-কতক খোলা কথা বলিব।

"* * এই গুরুভার অন্তরীণ আইনের পাষাণ স্তূপ জাতির বুকে চাপান থাকিলেও বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় বিদ্বেষ বহ্নি হু হু করিয়া ব্যাপ্ত হইতেছে, বাহিরে তাহার যেটুকু প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রকৃত কিছুই নহে। বিপ্লববাদীরা বোধহয় এখনে শক্তি সংহৃত ও সমীকরণ করিতেই সচেষ্ট—গৌহাটিতে, পাতিপুকুরে যে সকল ঘটনা হইয়া গেল তাহাতে বিপ্লববাদীদের অস্তিত্ব চিহ্ন বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। * *

"আজ যাঁহারা অন্তরীণে আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কথার সারবত্তা নিশ্চয়ই বুঝিবেন, তাঁহাদের অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ, স্বদেশজননীর প্রতি অসাধারণ প্রেম কোন মতেই ব্যর্থ হইতে পারে না। এই সকল নিষ্কাম যোগীর কর্ম্মপ্রেরণা, এনার্কিজম বা বিপ্লববাদের প্রচারে নিরত এ কথা আমরা কোন

মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব এইরূপ অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত কর্ম্মবীর যুবকগণকে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক, তাহারা দেশ-সেবারূপ মহাব্রতের উচ্চ দীক্ষা বাঙ্গালার সমাজের স্তরে স্তরে প্রচার করুক, এইরূপ উন্নত ও মহান আদর্শের আবছায়ায় সঙ্কীর্ণ জটিল বিপ্লববিষ অচিরে ধ্বংস পাইবে।"

অতঃপর সংগঠনমূলক কর্ম্মে বিপ্লবীদের ব্রতী হইবার ইঙ্গিত "খোলা কথা"য় দেওয়াহ ইয়াছে: "যাহার ফলে অভিনব কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি হইবে, উহা এখনও পর্য্যন্ত ভাবগত থাকিলেও, ধীরে ধীরে উহা বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিবে। এইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রের বিকাশ দেখিয়া রাজকর্তৃপক্ষের সংশয়দৃষ্টি তখন আর সুবিধার হইবে না।"

ইহা লক্ষ্য করিবার যে, "খোলা কথা"র এই ইঙ্গিত নিষ্ফল হয় নাই। এই সময়ে বাংলায় বহু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই উহা বিপ্লবীদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। বহু জ্ঞানী গুণী বিপ্লবকে এই সময়ে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেও দেখা যায়। "খোলা কথা"য় বলা হইযাছে "আমরা আজ যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রের আভাস মাত্র দিতে চাই, উহা কাহারও দানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাঁদার খাতা লইয়া দেশের ধনকুবেরদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। * * ইহা হইবে আমাদের তপস্যা ও সাধনারই দিব্য রূপ।"

"খোলা কথা"র ভাবুক লেখক বিপ্লবী শ্রীমতিলালের এই ভাবনারই বাস্তব রূপায়ণ স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ।

পরিশেষে "খোলা কথা"য় আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর এই নবজাগরণ, ইহাব উচ্ছৃঙ্খলতার গতিকে আজও যদি আমরা সুসংযত ও সদভিমুখে পরিচালিত কবিতে অবসর না পাই—তাহা হইলে ইহারও অকাল মৃত্যু ঘটিতে পারে। জাতির এই অপমৃত্যু শাসক ও শাসিতের পক্ষে কিছুতেই শ্রেয়ঃ হইবে না। * * অবশেষে আমরা নূতন বাংলাকে সম্বোধন করিয়া বলি,—ইংরেজ রাজের উপর যে আমাদের ভবিষ্যৎ একান্ত পক্ষে নির্ভর করিতেছে এইরূপ নহে। * * বাঙ্গালীর মরা প্রাণে যে দিব্য প্রেরণার উদয় হইয়াছে, উহা শত বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া দিব্যযুগের প্রতিষ্ঠা করিবে।"

১৯১৭ সালের ৪ঠা আগষ্ট কলিকাতায় এই ভারত-রক্ষা আইনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ "কর্তার ইচ্ছা কর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তৎকালীন বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে (১৭ নভেম্বর, ১৯১৭) এই প্রতিবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করিযাছিলেন,—"অল্পদিন পূর্ব্বে কোন সভায় একজন বক্তা ভারতরক্ষা আইনকে নিরাপরাধ তরুণদিগকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য ভারতীয়-দিগের প্রতি অত্যাচারের আইন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এমনকি স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিতে তাঁহার নামেব ও সম্ভ্রমের গুরুত্ব থাকা অনিবার্য্য।"

ইহার পবে ডিসেম্বরের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং এই ইংরাজী অনুবাদের পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন: "আমার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পব, গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে ব্যবস্থাপক সভায় আমার কোন ইংরেজ বন্ধুকে আমার লিখিত পত্রের উল্লেখও করিয়াছেন। আমি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে চাহি—ভাবতরক্ষা আইনের বলে যাহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহাদিগের সকলের বা কাহারও অপবাধ বা অপরাধের অভাব সম্বন্ধে মত সেই পত্রে বা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হয় নাই। আমি এই কথা বলিতে চাহি যে, এ পর্য্যন্ত সরকার যেসব লোককে অপরাধী স্থির করিয়া দণ্ডদানে যে নীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আমার বহু স্বদেশীরা মনে করিয়াছেন দণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে নিরাপরাধ। কারাকক্ষে—কখন কখন নির্জ্জন কক্ষে লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখার প্রথা জনগণের নিকট সতর্কতা অবলম্বন না হইয়া প্রতিশোধ-বৃত্তি চরিতার্থ-করণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার মুক্তিলাভের পরও আটক আসামীকে পুলিশের অনুসরণে যেভাবে বিব্রত করা হয়—তাহা সেই কার্য্যের জন্য যাঁহারা দায়ী,

তাঁহারা অস্বীকার করিলেও, যাহারা বিব্রত হয় তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।"

রবীন্দ্রনাথের "স্বাধিকার প্রমত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রবাসীর মাঘ সংখ্যায় (১৩২৪ সাল) প্রকাশিত হয় এবং প্রবর্ত্তক পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ১৫ই মাঘ, ১৩২৪) উদ্ধৃত হয়। রচনাটি অনুধাবনযোগ্য। ইহাতে সেযুগের চিত্রটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে। প্রবর্ত্তক হইতে এই রচনার অংশবিশেষ এখানে তুলিয়া দিলাম।

"দেড়শো বৎসর পার হইয়া গেল, ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষকে আগাগোড়া দখল করিয়া বসিয়াছে। এ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইয়াছে কিনা সে তর্কে কোনো লাভ নাই, কারণ এ তর্কে অতীত মুছিবে না এবং বর্ত্তমানের দুঃখও ঘুচিবে না। কারণ অনেক তথ্য আছে যাহা গোপনে এবং নীরবে ছাড়া স্মরণ করিয়া রাখিবার হুকুম আমাদের নাই।

"অতএব যখন আমরা বলি যে, এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদের জড়ভারে চাপা পড়িয়া আমাদের হাড়ে মাংসে এক হইল, তখন সে কথা আমাদের শাসনতন্ত্রের অভিপ্রায় বা প্রণালীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভাবে বলি না। আজকের দিনে সে কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের ভালোমন্দকে ছড়াইয়াও অনেক দূর প্রসারিত। আমাদের নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি, আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে, শাসন করিতে পারে কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই, যে শক্তির বলে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়, যে সভ্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে। * *

"মুসলমানরা যখন এদেশে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রিক চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মত মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটা ধর্ম্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ের পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের অন্তরতম মিলন ক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেইখানে সত্য-অনুষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

"ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য-সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই।—রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড় ঘটনা। কারণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে আজকের পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্ব্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। * * আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহৎ ঘটনার জন্য তার ধর্ম্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই।

"বালক বয়সে এক প্রকার দুর্দ্দান্ত আত্মম্ভরিতা যেমন অসঙ্গত হয় না, কিন্তু বয়স হইলে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করিবার সময় আসে; তখনও যদি মানুষ পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে না শেখে তবে তাহাতে অন্যেরও অসুবিধা ঘটে এবং তাহারও চিরদিন সুবিধা ঘটে না। * *

"সেইজন্য দেখিতে পাই য়ুরোপ যখন কঠিন সঙ্কটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কূল পায় না।—এই সহজ সত্যটুকু তার ভাল করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মনুষ্যত্ব জিনিষ একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটা যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। * * ইতিহাসের এই বিচারের আমরা পূর্ব্বদেশের লোকেরা

প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসঙ্কোচে সত্য বলিতে হইবে। তাহার ফল আমাদেব পক্ষে যত কঠিন এবং অন্যের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদেব বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়। তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই—যেখান হইতে দেশ বিদেশ নতশিবে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধূলাব উপর দাঁড়াইযা আছি। যে পথে যুগযুগান্তরের যাত্রা চলিতেছে, যে পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা উডাইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধূলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যাবেলায় তারা ভগ্ন দণ্ড এবং জীর্ণ কন্থায় যাত্রা শেষ কবিল, কত সাম্রাজ্যেব অহঙ্কার ঐ পাপের ধূলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সন তারিখেব ভাঙ্গা টুকরাগুলা কুডাইয়া ঐতিহাসিক উল্টা পাল্টা কবিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনাব বাণী—সত্যের বলে যার বল। একদিন যাহা অন্য সকল কলগর্জ্জনের ঊর্দ্ধে ইতিহাস বিধাতাব সিংহাসনতলে আসিয়া পৌঁছিবে। * *

"আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবদ্ধ পশ্চিমেব কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা কবিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাদিগকে কি দিতে পারে? * * য়ুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পাবে না? যেহেতু তাহার নিজেব মন মুক্তি পায় নাই? তাব লোভের অন্ত কোথায়? * * যে মুক্ত, সেই মুক্তি দান করে। * * তাই বাহিবের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধবিয়া থাকি তবে বড়ই দুঃখেব মধ্যে সে ভুল ভাঙ্গিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিবে আমাদের বন্ধন। * * এই কথা জান, এবং এই কথা জানাও। মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান কর যে, কোনো কর্ম্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্য ব্যবসায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রেব নিদাকণতায় নয়, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

রবীন্দ্রনাথেব 'স্বাধিকার প্রমত্ত' সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রবর্ত্তকের পূর্ণ আট পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশিত। রচনায় শাশ্বত ভারতের মর্ম্মবাণী ঝঙ্কাবিত। সর্ব্বমানবিক সত্য ও মনুষ্যত্বের কথাই কবিগুরু এখানে বলিয়াছেন। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগ নাই এ কথা আমি মানি না, ধর্ম্মহীন রাজনীতি প্রাণহীন দেহের মত।"

সনাতন ভারতের এই মৌলিক সুরটি শ্রীমতিলালের মধ্যে অত্যন্ত শুদ্ধভাবে প্রকাশ হইতে দেখা যায়। তাঁর লেখাব ছত্রে-ছত্রে ইহার পরিচয় মিলে। সে যুগেব প্রবর্ত্তকে সমসাময়িককালের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারেরই আলোচনা স্থান পাইয়াছে এবং এইসব আলোচনায় ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতি-গঠনের দিগ্‌দর্শনই দেওয়া হইয়াছে।

তুমি মিতা শুধু আলো

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

তোমারে দেখেছি কতদিন আগে সে কথা তো মনে নাই,
দেখা দিলে আজি কেন তা জানি না শবতের দিনটিতে;
শূন্য হৃদয়ে চাওয়াব অতীতে কি যেন ফিবিয়া পাই,
সাতটি রাজার বাঞ্ছিত ধন পুবাতন ধরণীতে।

আলো-ঝলমল এই ধরাতল, নীলাকাশ, বনবীথি,
বন্ধু তোমাব পবশ লভিয়া সবই হ'ল নিরুপম
রিক্ত জীবনে আশা রাগিণীতে বাজে যেন কলগীতি,
দুঃখ-দৈন্য আজিকে বিগত আনন্দ অনুপম।

জীবনের এই বন্ধুব পথে কত পড়ি, কত উঠি,
কঠিন জীবন-যুদ্ধে বিজিত, পাই না তো সফলতা;
প্রাণপণে ধরি আশা-মবীচিকা, শিথিল বদ্ধ মুঠি,
শুধুই হতাশা ব্যর্থ নিরাশা—অশ্রু, বিষাদ, ব্যথা।

তমসায় ভরা এ জীবন মাঝে তুমি মিতা শুধু আলো,
তোমার পরশে মুছে যায় শত জীবনের ক্রন্দন;
মরুর বুকেতে একখানি মেঘ, বরষার বারি ঢালো
শরৎ-স্নিগ্ধ-মধুর প্রভাতে লও অভিনন্দন।

ভূস্বর্গ চঞ্চল

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

॥ ২ ॥

অতীতে একদিন কাশ্মীরে আর্য্যরা এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর বৌদ্ধধর্ম তার প্রভাব বিস্তার করেছিল কাশ্মীরে। পরবর্তীকালে ভারত-বিজয়ী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ভূস্বর্গ কাশ্মীরে, সে কাহিনীও পুরানো হয়েছে ভারতে ইংরাজ শাসনের কালেও। মহারাজার কাশ্মীর ছিল ইংরাজ-ভারতের সাহেব-সুবা, রাজা-মহারাজা, বড় আর ছোটলাটদের অবসর দিনযাপনের পীঠস্থান। নারী-সুরা-গেম্‌বার্ড—কোন কিছুর অভাব ছিল না। শালিমার বাগের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শিকারার উচ্ছল যৌবন-ফুল্ল রাত আর ডাল-উলার হ্রদের বুকে উড়ে-আসা অজস্র গেমবার্ড—ভারতের আর শুধু ভারতের কেন তামাম বিশ্বের রইস-আদমিদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসত সুন্দরী কাশ্মীরে।

আর এইসব রইস সাহেব-সুবাদের বিলাসিতার ভার সহ্য করত কাশ্মীরের সাধারণ হিন্দু মুসলমান জনতা। ওরা বলে মেরী পিয়ারী কাশ্মীর। পীর-পাঞ্জাল আর নহপ পর্বতের উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট বিস্তীর্ণ জমি। ঝিলামের দু'তীরে জাফরান আর সরষের অজস্র সমারোহভরা ক্ষেত। আপেল-কমলা-আখরোটের বাগিচা! কাশ্মীরীরা এখানেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে। মেয়ে মদ্দ, বাল-বাচ্চা সবাই খাটে—তবু দু'বেলার অন্ন জোটে না ওদের। পশমের শালের ফুল তোলে যারা তারা শাল গায় দেয় না—তাদের ছেঁড়া পোষাকের রন্ধ্রপথে তুহিন শীতল হিমেল হাওয়া প্রবেশ করে তাদের দেহ কাঁপায়। সরাভর্তি আগুনের স্পর্শেও সে দেহ উত্তপ্ত হয় না!

সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর পার্বত্য অঞ্চল। পার্বত্য সানুদেশ অরণ্য-কুহেলিতে ভরা। মোট আয়তন এগার হাজার সাতান্ন বর্গ মাইল। এর মধ্যে তিন হাজার ছ'শ ষাট বর্গ মাইল স্থান পাকিস্তানীরা অধিকার করে রেখেছে—এ' অঞ্চলের ওরা নাম দিয়েছে আজাদ কাশ্মীর। পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত ছোঁওয়া কাশ্মীরের একটা দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ অঞ্চল আজাদ কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় অংশের জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার ন'শ জন। আজাদ কাশ্মীরের লোকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। শাসন কার্যের সুবিধার জন্যে জম্মু-কাশ্মীরকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) পুঞ্চ ও চিনানি সহ জম্মু খণ্ড, (২) এ্যাস্টর সহ কাশ্মীর উপত্যকা, (৩) লাডাক, (৪) উত্তরের গিলিগিট অঞ্চল।

জম্মু কাশ্মীরের উত্তর এবং পূর্বে চীন ও তিব্বতের সুদীর্ঘ সীমান্ত, উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান এবং দক্ষিণে ভারত। সুবিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরাংশের ঝিলম ও সিন্ধু নদীর অববাহিকা গভীর বনে ঢাকা—ওয়ালনাট, আখরোট, গোলাপ কাঠ আর উইলোর জঙ্গল এখানে চোখে পড়ে। এ অঞ্চল ছ'মাস থাকে বরফে ঢাকা। লাডাক অঞ্চল মালভূমি—তিব্বতের মালভূমির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রয়েছে। পীর পঞ্জলের সানুদেশ জম্মুর সমভূমি—চন্দ্রভাগা নদীর জলে বিধৌত।

কৃষিসম্পদ ছাড়াও খনিজ সম্পদে কাশ্মীর উপত্যকা সমৃদ্ধ। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা-জিঙ্ক-তামা-দস্তা-বক্সাইট-শ্লেট-কেওনাইট আর এ্যাসবেস্টস্ প্রধান। কিছু কিছু সোনা এবং পদ্মরাগমণি পাওয়া যায়। কাশ্মীরের পশম জগৎ বিখ্যাত। কাশ্মীরি শাল এবং কার্পেট অমূল্য সম্পদ। কাশ্মীরের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ শাল এবং কার্পেট তৈরী করে জীবিকার্জন করে।

কাশ্মীরের নবজীবন সুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের ছাব্বিশে অক্টোবর থেকে—ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য মহারাজ হরি সিং সেদিন আবেদন করেন। তারপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের খবরদারিতে কাশ্মীরে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর কাশ্মীরে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছিল। শেষ ই কাশ্মীর শেখ আবদুল্লা হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন থেকেই কাশ্মীরে মহারাজ হরি সিং-এর রাজগীর দিন ফুরিয়েছিল। যুবরাজ করণ সিং

চীন—যতটা হুমকি ততটা নয়

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

ইউরোপে যাহারা এতদিন চীনের প্রশস্তি গাহিতেছিল, বর্ত্তমানে তাহাদেরই উক্তি—চীন যুদ্ধবাজ। পাক-ভারত সংঘর্ষের সুযোগে চীনের ভারত আক্রমণের চেষ্টা ও সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের হুমকির পর হইতেই ইউরোপের চীনা বিশেষজ্ঞ-মহল স্থানীয় সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশান মারফৎ নিয়মিতভাবে আলোচনা চালাইতেছে যুদ্ধবাজ চীনের সামরিক শক্তি সম্পর্কে। এইসব বিশেষজ্ঞদের মতে চীন বৃহৎ দেশ বটে, কিন্তু যতটা হুমকি ততটা নয়। চীনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশ হইতে পাওয়া। কিছু মার্কিন অস্ত্রও তাহাদের কাছে আছে। ঐ সকল অস্ত্র তারা চিয়াং কাইশেকের নিকট হইতে পাইয়াছে। ১৯৬২ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত চীন রাশিয়ার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে রুশ-সমরাস্ত্র পাইয়াছে। অবশ্য চীন নিজে পূর্ব্ব হইতে নানা ধরণের অস্ত্র তৈয়ার করিতেছে। ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ মহলের মতে সেই সকল অস্ত্রের পরিমাণ ভারতের অস্ত্রসম্ভার হইতে খুব বেশী নয়।

ভৌগোলিক অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেও তিব্বত-প্রান্তের যুদ্ধে ভারতের যতখানি সুবিধা, চীনের ততখানি নাই, তাহার উপর তিব্বতে অন্তর্বিপ্লব চলিতেছে। অধিকন্তু চীনকে চারিদিকে ঘিরিয়া আছে রাশিয়া, জাপান, মার্কিন সামরিকবাহিনী (ইন্দো চীনে)। ভারতের বিরুদ্ধে একমাত্র অন্তরায় পাকিস্তান। তবে পাকিস্তানের দুর্ব্বলতা পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব।

ইউরোপীয় চীনা বিশেষজ্ঞগণ ও যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞদের ধারণায় বর্ত্তমানে চীনে যে সামরিক শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আত্মরক্ষার পক্ষে চলিতে পারে, কিন্তু কোন বড় রকম আক্রমণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। অবশ্য চীনের সামরিক শক্তি একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে। বর্ত্তমানে চীন এ্যাটম বোম তৈয়ারী করিতেছে।

১৯৬০ সালে চীন রাশিয়ার নিকট হইতে ১২টি সাবমেরিন ক্রয় করে। ঐ সাবমেরিনে ক্ষেপণ-

---

কাশ্মীরের রাজা হ'ন নি—হয়েছিলেন সদর-ই-রিয়াসৎ, অর্থাৎ রাজ্যপাল।

কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার আবির্ভাব ঘটেছিল একজন সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতা হিসেবে। ১৯৩১ সালে শ্রীনগরে এক রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সুরু হয়েছিল। শেখ আবদুল্লা তখন মুসলিম কন্‌ফারেন্সের নেতা। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই আবদুল্লা তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। হিন্দু-কাশ্মীরীদের বাদ দিয়ে মুসলমান কাশ্মীরিরা বাঁচতে পারে না—মহারাজার শোষণে, রইস আদমিদের ভোগ-বিলাসের দুঃসহ নির্যাতনে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের জীবন পিষ্ট। আবদুল্লার পরিচয় ঘটল প্রগতিশীল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে।

মুসলিম কনফারেন্সের নাম হ'ল ন্যাশন্যাল কনফারেন্স—হিন্দু-মুসলমান জনতার নেতা হ'লেন বৃধ সিং, শেখ আবদুল্লা, বক্সী গোলাম মহম্মদ। মহারাজ হরি সিং-এর পতনের পর শেখ আবদুল্লা হাল ধরেছিলেন কাশ্মীরের।

কাশ্মীরের হিন্দু জনসাধারণ আবার আন্দোলনে নেমেছিলেন ১৯৫৩ সালের জুন মাসে। গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্যই তাঁরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সারা ভারত জনসঙ্ঘের নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সে সময় কাশ্মীরে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বন্দী করে জনতার মধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন শেখ আবদুল্লা। তখন শেখ আবদুল্লা স্বাধীন কাশ্মীর রচনার অলীক স্বপ্নে মশগুল ছিলেন। বিদেশী রাষ্ট্রগুরুদের এবং পাকিস্তানী প্ররোচকদের সমর্থন ছিল শেখ আবদুল্লার দিকে। বন্দী অবস্থায় শ্রীনগরে প্রাণ দিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

(ক্রমশঃ)

অস্ত্র বসাইবার ও ছুঁড়িবার ব্যবস্থা আছে। এই বিষয়টী নিয়া এখন রুশ ও মার্কিন সরকার একটু চিন্তিত।

চীনের সাধারণতন্ত্র দিবস (১লা অক্টোবর) উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ চেন ঈ ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে চীন মার্কিনদের সঙ্গেও লড়িবে। অবশ্য তার পরদিন চীনের প্রধান মন্ত্রী চু-এন-লাই বলিয়াছেন যে, চীনকে কোমর শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে এখনও বিশ হইতে ত্রিশ বৎসর লাগিবে অর্থাৎ বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চীন একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে পারে।

চীনের আছে ১৬০টী সামরিক ডিভিশানে ২৬০০,০০০ জন সৈন্য। ২০০০ হইতে ২৪০০ বিমান-বাহিনীর সৈন্য। নৌবহরে আছে ৮০,০০০ জন নাবিক ও ২৫টী সাবমেরিন। চীন সামরিক বাহিনীর মধ্যে পদাতিক সৈন্যসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। চীন বৎসরে ২০০ হইতে ৪০০ ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করে। এইসব ট্যাঙ্ক রুশ ট্যাঙ্কের অনুকরণে তৈযার হইতেছে। চীন রুশ মিগ বিমান-১৯ কয়েক বৎসর আগে তৈয়ার করিতে সুরু করিয়াছে। ইহা ব্যতীত চীন সরকার দুই কোটি তরুণ তরুণীকে সামরিক শিক্ষা দিতেছে। প্রযোজন-বোধে তাহাদিগকে কাজে লাগাইবে।

পাক-ভারত ঘোষিত যুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী সামরিক বিশেষজ্ঞগণের অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে ধারণা খানিকটা পাল্টাইয়াছে। পশ্চিমের বিশেষ মার্কিন মহলের ধারণা ছিল উন্নত আধুনিক মার্কিন অস্ত্রসজ্জিত পাক সামরিক-বাহিনী ভারতের সামরিক শক্তির চেয়ে অনেক উন্নত। মধ্যযুগের অস্ত্রসজ্জিত তিনজন ভারতীয় সৈনিক আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত একজন পাকিস্তানী সৈনিকের সমান। ভারতের নিজের তৈয়ারী অস্ত্রাদি ও নানা দেশ হইতে সংগৃহীত সমরসম্ভার সমরে পাকিস্তানের সামনে দাঁড়াইতেই পারিবে না। এমনকি যুদ্ধারম্ভে ইঙ্গ-মার্কিন অভিজ্ঞেরা সোল্লাসে এক রকম নিশ্চিত হইযাই ছিল যে, বিনা বাধায় দুর্ভেদ্য প্যাটন ট্যাঙ্কের সারি দিল্লী অবরোধ করিবে এবং আত্মরক্ষার্থ ভারত তাহাদের কৃপাভিখারী হইবে। কার্য্যকালে মার্কিন প্যাটন ট্যাঙ্ক ও সেবার জেটের পাখীর খাঁচার মত ধ্বংস-দৃশ্য বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করিল। বিভিন্ন দেশ হইতে অভিজ্ঞরা পঞ্জাব রণাঙ্গনে আসিযা এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল। কৌতূহলীর প্রশ্ন হইল—এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল? প্রমাণিত হইল, যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রই সব নহে, শৌর্য্য-বীর্য্য, রণকৌশল, সমরাস্ত্র চালাইবার দক্ষতাও প্রয়োজন। ভারতের এই সার্ব্বিক নৈপুণ্য হুমকি দিযা ও চীনের পশ্চাদপসারণ করার অন্যতম কারণ। ইউরোপ বিশেষ ফ্রান্সে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে মার্কিন অস্ত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে কটাক্ষপাতও করা হইয়াছে। গর্ব্বিত যুক্তরাষ্ট্রের অভিমান আহত হওয়া স্বাভাবিক। পাক পরাজয় যেন তারই পরাজয়। অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় পাকিস্তানকে তোয়াজ করার মধ্যে মুখ রক্ষা ভিন্ন আর কি হেতু থাকিতে পারে?

জগদ্ধাত্রী

শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত

পুষ্পের পূজায় হতাশ পেয়েছি, পূজিব তোরে মা বক্ষ চিরে;
আজ থেকে শুধুনীরবে কাঁদিব—ভাসাইব মোর অশ্রুনীরে।
রণ-রঙ্গিণী! রণাঙ্গনে আর কতদিন রইবি মা?
খড়্গ-কৃপাণ দূরে ফেলে দিয়ে, কোলে তুলে তুই নে মা উমা।"
সব ছেলে মোরা নাইকো সমান, ধূর্ত্ত হয়তো অনেকে আছি;
তবুতো গো সব তোরই যে ছেলে, সব দোষ ধুয়ে দে মা আজি।
প্রার্থনা মোরা কা'র কাছে করি?—আর কে আছে জগতে বল?
ব্যোমভোলা সেই বুড়ো বাবা মোর গভীর ধ্যানে বদ্ধ পাগল!
তুই না জাগালে কে জাগাবে তা'রে? সিদ্ধির নেশা ছাড়ে কি আর?
জাগা মা এবার, ডাকি বারবার, কাছে থেকে পূজা নে আমার।

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ :

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই উভয়বিধ গুণে জীব যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ আছে। এই বন্ধনদশাই সংসারলীলা। এত যে সুন্দর বৈচিত্র্যময় জগৎ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃগুণেই সংঘটিত হইয়াছে। অধিকাংশ মানব আপাতমধুর প্রেয়ের মোহে পড়িয়া হাসিকান্নার খেলাঘরে ক্রীড়াশীল। শ্রেয়ের বন্ধন ফাঁস দেওয়া, টানিলেই খুলিয়া যায়। প্রেমের বন্ধন কিন্তু টানিলেই জটিল ও দৃঢ় হয়। সাধক শ্রেয়োগুণ অবলম্বনে সংসার হইতে মুক্তির সন্ধান করিয়া থাকে।

তন্ত্রসাধনা :

জগতে তান্ত্রিক সাধনার অবসর বাড়িতেছে। তামসিক সাধন-প্রণালী সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মত অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইতেছে। সাধক তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইবামাত্র মায়ের সাক্ষাৎলাভ করিতেছে। এমন সুযোগ বুঝি পৃথিবীতে আর কখনও আসে নাই। মহাগুরু বহু মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ছদ্মবেশে জগতের সর্ব্বত্র আবির্ভূত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র সন্তান নব ধর্ম্ম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। তন্ত্রসাধনার দিনে প্রাচীন বিভিন্ন সংস্কারযুক্ত গলিত শবের মত পৌরাণিক সাধন ছাড়িয়া আত্মোন্নতিপ্রয়াসী ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান মহামন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ কর "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

প্রেমের কথা :

আমরা লোককে, দেশকে, ভগবানকে ভালবাসি সুখের আশায়, ভোগের আশায়, কিন্তু প্রেমের পরীক্ষা দুঃখে। যে প্রেমিক দুঃখের বজ্রকঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হয়, তার ভালবাসার মূল্য নাই। সংসারে প্রেমিকের সংখ্যা অতীব বিরল—অসাধারণ ব্যক্তি না হইলে প্রেমের অসাধারণ ব্রত কয়জন উদ্‌যাপন করিতে পারে ?

ধর্ম্মকে ভালবাসিয়া, ভগবানের সহিত প্রেম করিতে মহামতি খৃষ্ট ক্রুশবদ্ধ হইয়া জীবন হারাইয়াছিলেন। প্রেমময় পরম পিতার প্রেম স্মরণ করিয়া মরণের দুঃখ ভুলিয়াছিলেন।

ভারত উপাখ্যানে রাজা হরিশ্চন্দ্র, শ্রীবৎস, নল প্রমুখ রাজন্যবৃন্দ সত্যের প্রতি অনুরাগের জন্য কি কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র প্রাণীকে প্রেম দান করিয়া শিবি রাজাকে স্বীয় গাত্রমাংস স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য—পঞ্চপাণ্ডব এবং বিষ্ণু অবতার শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় প্রেমের পুরস্কারই দুঃখবরণ।

তাই বলিতেছিলাম, মনুষ্য জীবন লইয়া প্রেমের জন্য অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইতে সার্থক হইতে চায় কয়জন বল দেখি ? যে দেশে সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রেমের জন্য অসাধারণ লোকের অভ্যুত্থান হয় সে দেশ ধন্য, তার মাটি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

প্রেমের গতি ঊর্দ্ধমুখী—কাম নিরয়গামী।

মন্ত্রশক্তি :

মহাগুরু যে মন্ত্র যাহার কর্ণে আরোপ করেন, সেই তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা অমর-কোষে অথবা শব্দকল্পদ্রুমে অন্বেষণ করিতে হয় না। সদ্‌গুরু আধার অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রশব্দ সাধকের হৃদয়ে উপ্ত করেন। সাধক নিজের সাধনবলে মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া লয়। সাধকের অসাধারণ জলন্ত বিশ্বাস সংযোগে মহামন্ত্র অগ্নিবর্ণ ধারণ করিয়া তাহার অন্তরস্থিত সমুদয় আবর্জ্জনা দূর করিয়া দেয়। ক্ষেত্রস্থিত বীজের উপর আবশ্যকমত জল সিঞ্চন না করিলে যেমন তাহার অঙ্কুর সুবিধামত বিকশিত হইয়া উঠে না, বিশ্বাস অভাবে সাধকের ইষ্টমন্ত্রও সেইরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠে না। অতএব যে মন্ত্র লাভ করিয়াছ তাহার উপর জলন্ত বিশ্বাস আরোপ কর। মন্ত্রের শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার :

আমরা মানিকতলা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের সপ্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাহাদিগের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এবং ইহার অনুরূপে যে বাংলা দেশের বহু স্থানে নৈশ-বিদ্যালয় হইয়াছে ও হইতেছে ইহাতে আশান্বিত হইলাম। আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের গড়ে ছাত্রসংখ্যা ৩৯ জন, এই বর্ষে মোট জমা ৩১৭ টাকা, খরচ ২৫০ টাকা। যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক এই দরিদ্র শ্রমজীবিকুলের শিক্ষাকল্পে আপনাদিগের সামর্থ্য ও প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগের উদ্যম ও উদ্দেশ্য সার্থক হউক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত

ভক্ত ও ভগবান

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

ডাকাত, ডাকাত!

ঘরের লাইট্ নিবাইয়া, হারমোনিয়ম্ টিপিয়া, সুরে, ছন্দে, ভাবে অলকা একা বসিয়া গান গাহিতেছিল :

বঁধু কি আর কহিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি!

গাহিতে গাহিতে গান বন্ধ হইয়া গেল। কার পায়ের আওয়াজ না? অলকা চ'মকিয়া উঠিল। তার পরেই হাসি—

সুরে—এস, এস হে পরাণ বঁধু,
এস হে, বস হে
হৃদয় আসন পাতিয়া—

তুলে ফ্যাল্, তুলে ফ্যাল্। ময়লা হয়ে যাবে—পরাণবঁধু যে অনেক দূরে।—হেসে গড়িয়ে ব'ললে ললিতা।

অলকা—মাধ্যাকর্ষণে টপ ক'রেও ত' প'ড়তে পারে—

ললিতা—আপেলে ঢিল মেরেছিস নাকি?

অলকা—ঢিল নয় সখি, কোকিল কুহু কুহু করিছে মুহুমুহু। শোন কান পেতে—

ডাকাত, ডাকাত—আলো অলকা, আলো—হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এল রমা। ব'ললে, এই দেখ ভাই ডাকাতের অস্ত্র। ছিনিয়ে এনেছি।

অস্ত্র নিয়ে ললিতা গম্ভীর হয়ে বলে, তাইত তাইত এ যে বেলফুলের এ্যাটম্ বম্ব। ছাড়লে—ললিতা, রমা সব সেঁদুবে, যে যেথায় পাবে! বেচারা অলকা!

হাসতে হাসতে ডাকাত এসে উপস্থিত। বেচারা অলকা নয়। বেচারা যামিনী গোপন মারণ অস্ত্র, পরহস্তগত।

রমা—গোপন ব'লে গোপন! এমন কাঁচা লোকের হাতে দেয় এ!

যামিনী—ভয় কোর্ট মার্শালের। অস্ত্রও গোপন, অভিযানও গোপন। গোপন রইল না কিছুই—

অলকা—ও ভাই ললিতা, রমা—বাপ-মা বোধ হয় এলেন। আজ ত' আসবার কথা ছিল না—

ললিতা—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, ভালমানষের ঝি—কিন্তু মানিয়ে নিতে হবে আগাগোড়া। যাও যাও যামিনীবাবু, দৌড়ে বাবা মাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে আনতে। কথাবার্ত্তা যা হয় আঁচ দিও ফিরেই। টালবেটাল যা সামলাবার সামলাতে হবেই।

যামিনীকে দেখে শ্বশুরশাশুড়ী খুব প্রীত। অলকাকে একলা যে থাকতে হয়নি তার জন্য জামাতার উপর খুব সন্তুষ্ট।

সব কথা শুনে ললিতা যামিনীকে ব'ললে আড়ালে, কোর্ট মার্শাল বন্ধ হবে না ওতে?

—হের যুগল রতন—

অক্ষয়বাবু বেশ অবস্থাপন্ন। অলকা তাঁর একমাত্র কন্যা, বড় আদরের। মনোমত ঘর বরে সে পড়েছে। জামাতা যামিনী, অলকা-অন্ত প্রাণ। অলকা যামিনীকে নিমেষে হারায়।

অক্ষয়বাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করে আনান প্রায়ই।

খ্যাট-এর যোগাড়ে ফেরে যামিনীও, নানা অছিলায়।

অলকা একা। বাপ-মা তার থাকবে কোথায় ক'দিন। অমনি ডাকাতি ক'রতে তৈরী হ'য়ে এল যামিনী, যখন ললিতারাও থাকবে না। তা হ'ল না। ডাকাত ধরা প'ড়ল বামাল সমেত। মাত্র তাই নয়। তুমি আর আমি, আমি আর তুমির স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল বাপ-মা এসে পড়াতে।

যামিনীর নিরালা পেয়ে অলকা তাকে কুটিল কোপচক্ষু দেখিয়ে ব'ললে, আচ্ছা দিন দিন তুমি কি হচ্চ, এমন ক'রে আসো সবাই কি মনে করে।

তার চ'খে চ'খ মিলিয়ে আস্তে আস্তে যামিনী ব'ললে, তাদের অলকা থাকলে কিছুই ব'লবে না, যাদের নেই, বলা না বলায় কি এসে যায়! আমার অলকা কি বলে!

অলকার হাত দুটো ছিল যামিনীর হাতে। হাত

ছুটো একটু টেনে অলকা বললে, যাও কেবল কথা আর কথা। আর কিছু নয়।

তারপরে যা হ'ল, কথায় না ব'লে বলা যাক ললিতা ও রমার অর্থপূর্ণ হাসিতে। ললিতা রমার কানে কানে ব'ললে, আসামী কোর্ট মার্শালে খালাস।

—অঘটন—

পরদিন প্রাতে অলকাকে পেয়েই ললিতার ফুল্ল সম্ভাষণ,

সকালে উঠিয়া এ মুখ দেখিনু
দিন যাবে ওব ভাল।

অলকা কিন্তু যেন কেমন কেমন! বলে, ভাই ডান চ'খ নাচ্চে—

ললিতা—ওঃ বোধহয় সরম রাখতে নরম গরমে সরে যেতে চায়। খবরদার, তুই ভেরম্ ভেঙ্গে থেঁতলে দিবি—

অলকা—না ভাই, ওই শোন বাবা ব'লছেন, বেশত—

নাগর সত্যই শ্বশুরকে ব'লছিল তার শরীরটা কি রকম মনে হচ্চে, সে যেতে চায়। শ্বশুর তাকে বলেন, বেশত'।

রায় শুনে যামিনীর 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব। ললিতাকে দেখে তার কাছে এসে সে বলে, ছুটি মঞ্জুর। পোঁটলা পুঁটলি বাঁধা যাক, কেমন?

ললিতা—কেমন তেমনের বুঝদার ত' আমি নই। পোঁটলা পুঁটলিব মধ্যে—ওই যে পালাচ্চে—যাও বেঁধে-বুঁধে নাও—

ললিতাকে নিয়ে যামিনী গেল অলকার কাছে। অলকা দু'জনের একজনকেও বড় প্রশ্রয় দিলে না। কাজেই যামিনী ইতস্ততঃভাবে ব'ললে, শরীরটা বেশ জুতসই মনে হচ্চে না, একটু ঘুরে আসি, কেমন? বাবার হুকুম পেয়েছি।

অলকা হেসে বলে, হুকুম নিয়ে এসেছিলে এখানে?

যামিনী—না না, অভিমানের কথা নয়, সত্যিই ভাল আমি নেই।

অলকা—ভাল নেই যাবে—

কথা শেষ হ'তে না হ'তে যামিনী আচম্‌কা ঘুরে মাটিতে পড়ে-পড়ে। ত্রস্তে অলকা তাকে ধরে ফেললে। তখন যামিনী অচৈতন্য।

অন্য জল পৌঁছুবার পূর্ব্বে অলকার অশ্রুজলে সিক্ত হইল যামিনীর নয়নানন।

অক্ষয়বাবু প্রভৃতি বাটীর সকলেই ছুটিয়া আসিল। চিকিৎসকেরাও আসিল।

দেখিল সকলে যামিনী ও অলকা দুইজনেই অচৈতন্য।

—চৈতন্যেব আবেশে—

সুচিকিৎসায় যামিনীর জ্ঞান ফিরিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু অলকার চৈতন্য সম্পাদনে সবিশেষ চিকিৎসাও ফলপ্রদ হইবার চিহ্ন পাওয়া গেল না। চিকিৎসকদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা নাই।

অক্ষয়বাবু ও অলকা-জননী অন্নপূর্ণার বুক ভাসিতেছে চ'খের জলে। ললিতা ও মীরা বিষণ্ণ ভাবাবনত।

জ্ঞান লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের পরামর্শে ঘটনাস্থলে থাকিতে দেওয়া হয় নাই।

অন্নপূর্ণা দেবী হঠাৎ বলিলেন, দেখ, দেখ, অলকার ঠোঁট নড়ছে, ও যেন হাসছে।

উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাই বটে। প্রীত হইল তাহারা। চিকিৎসকেরা কিন্তু সমধিক চিন্তান্বিত।

বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসকেরা আন্দাজ করিল, অলকার ভিতরে ভিতরে চৈতন্য বিরাজ করিতেছে, পূর্ণভাবে। তাহাব যথাযথ বিকাশ বাহিরে না হওয়াতে তাহারা চিন্তান্বিত।

অলকাকে ধরাধবি কবিয়া সুকোমল শয্যায় শোয়ান হইয়াছে। ঘরের জানলা দরজা সব খোলা।

চিকিৎসকের মতে অলকার নাড়ী ও হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা সহজ ও সরল। বহির্জ্ঞানের বিকাশ তথাপি নাই। সমস্যার কথা।

উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার এই সন্ধিক্ষণে শুনা গেল, কাহারও

প্রশান্ত আগমনবার্ত্তা। বাবা অক্ষয়, মা অন্নপূর্ণা, আমি এসেছি, ঘরের মধ্যে আসছি।

ত্বরিৎ আসিলেন গৃহমধ্যে এক বিনয়-সৌজন্য ও ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি। সৌম্যদর্শন। যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই।

[redacted]গমনমাত্র পদমূলে প্রণত হইল অক্ষয় ও অন্নপূর্ণা [redacted] অভ্যাগতেরা আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া [redacted]।

শুভমস্তু। স্নেহভরে বললেন অভ্যাগত। দেখ, কাশীধাম হইতে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিবার সময়ে মধুর এক অনুভূতি মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে যন্ত্রচালিতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম এইখানে।

প্রভু দেখাইতে চাহিয়াছিলে বুঝি (অলকাকে দেখাইয়া) পরমানুরাগিণী তাঁহার এই সেবিকাকে।

ওঠ ওঠ কল্যাণী—

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং
ন গচ্ছামি।

সেই বৃন্দাবনে আসিয়া ধন্য আমি। ধন্য হও তুমি, বৃন্দাবন-রজ মাথায় তুলিয়া নিয়া।

বাবা অক্ষয়, মা অন্নপূর্ণা সার্থক জনম তোমাদেরও সন্তানরূপে এই কন্যাকে পাইয়া।

যে পথে ও যায় যাক, পথ রুদ্ধ করিও না। আমিও চলিলাম অসীম পথে। শুভমস্তু।

কে গাহিতেছে তখন

নবঘন শ্যাম, মুরতি মনোহর
হামারি হিয়াপর আওয়ে—

অলকা চ'খ চাহিল, যেন পরম সুখস্বপ্ন দেখিয়া। চারিদিকে চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

চিকিৎসকেরা হতবাক্। অক্ষয়বাবু ও অন্নপূর্ণা দেবী চকিত, চমকিত। ললিতা ও রমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

—কক্ষান্তরে—

কক্ষান্তরে যামিনী কায়িক সুস্থ কতকটা থাকিলেও, অলকার কারণে খুবই উদ্বিগ্ন।

যামিনীর মাতা কনিষ্ঠপুত্র ও কন্যাটিকে লইয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। আসিয়া অলকার খবরাখবরও করিয়াছে।

মনমরা সকলেই। বেশ কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে মাতা শুধাইলেন, হ্যাঁ বাবা, হঠাৎ অমন হ'লে কেন?

পুত্র—হঠাৎ নয় মা। আমার বুকে একটা শূন্যতার অনুভূতি হয়েছিল ভোরবেলা থেকে। (ভগিনীর দিকে চাহিয়া) দেখ মালতি, কি জানি আমার মনে হ'ল তোর বৌদি অন্য মানুষ হয়েছে। আমি তার কেউ নই। মন কেমন করে উঠল। জ্ঞান হারালাম। তার পরের কথা, জানিনা কিছু। অলকা কোথায়? এঁরা সব কোথায়?

মালতী—তালুইমশাই এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন। বললেন, বেয়ান ঠাকুরাণী ক্ষুণ্ণ যেন না হ'ন, খাতির-যত্ন ঠিক হচ্ছে না বলে। অলকা এখনও জ্ঞানহারা—

যামিনী—তারপর, তারপর, ওই যে ললিতা আসছে। (দ্রুত কাছে গিয়া) ললিতা, অলকা কেমন?

ললিতা—অলকা, অলোকসামান্যা! প্রেমময়ের সন্ধানে বিভোরা। তার মুখে আর অন্য কথা নাই, কেবল,

জীবনে মরণে জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি।

যামিনী—যাব আমি তার কাছে। সেতো অমনি করেই সমাদর আমায় করত—

ললিতা—তাই আপনার পদধূলি নিতে বাধ্য আমরা। খেলাঘরের খেলায় আপনাদের যুগল মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য চির জাগরূক থাকবে আমাদের প্রাণে। পট কিন্তু পরিবর্ত্তন হয়েছে। শুনুন।

আদ্যোপান্ত সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল ললিতা যামিনীকে। শুনিয়া যামিনী অস্থির হইয়া বলিল, যাবো আমি যাবো। দেখবো আমি অলকাকে। দেখুক সে আমাকে। তারপরে—

ললিতা—ধীরে বন্ধু ধীরে। বোঝাবুঝির সময় সন্নিকটবর্ত্তী। ব্যস্ততার প্রয়োজন কিছুমাত্র নেই।

ললিতা চলিয়া গেল। আসিল ধীরা। সকলকে

জানাইল সে অন্নপূর্ণা দেবী আসিতেছেন। অন্নপূর্ণা দেবী আসিয়া জানাইলেন, আপনাদের আর অসুবিধা ভোগ এখানে করা আমাদের ভাল লাগিতেছে না। অনুমতি করেন যদি, যামিনী থাকিয়া যাক। তবে তাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে আমরা থাকিতে বলি না।

যামিনী তাড়াতাড়ি বলিল, মা তোমরা সব এসো। আমি থাকি। সংবাদাদি সব ঠিক সময়ে পাবে। আমিও নিত্য বাড়ীতে আনাগোনা করব।

—ভাবতরঙ্গে অলকা—

হৃদয়-রাসমন্দিরে
দাঁড়াও গো ত্রিভঙ্গ হ'য়ে
হয়ে বাঁকা দাও গো দেখা
শ্রীরাধারে বামে লয়ে।

কথা কও, কথা কও, কেন অভিমান—তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণধন—তোমারি লাগিয়া ফিরি শয়ন স্বপন। কথা কবে না? বুকের পাঁজর দিয়ে এই প্রতিমা তোমার। মনঃপূত হয়নি? বেশ, ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলি তোমার এই প্রতিমা—হাসছ? হাসির ফাঁসি পরব না আমি।

দেখ আমি কি করি—

অলকা প্রতিমায় আঘাত করিতে উদ্যত। আঘাত-দণ্ড হল হস্তস্খলিত। করযুগল বেড়িল প্রতিমার পদযুগল। নয়ন ধাবিত অলকার প্রতিমার শ্রীমুখ পানে—

মধুর হাস্যে চন্দ্রানন জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতি বিকীরণের সাথে সাথে অস্ফুট গুঞ্জন—

এই ত' সবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। অলকা, ধৈর্য্যং, ধৈর্য্যং।

শুন শুন লো পরাণমণি
প্রেমের জোয়ারে যার
ভাসায়েছ প্রেমের তরণী
ভাঁটা পড়ি গতি তার
শ্লথ যেন নাহি হয় লো সজনী।

বিস্ফারিত নেত্রে অলকা—এ কি ইঙ্গিত—দেখিল অলকা, প্রতিমা-সান্নিধ্যে অস্পষ্ট একটা আবছায়া। দেখিতে দেখিতে স্মৃতির ঘোর ঘেরিল অলকাকে। আবছায়া আর আবছায়া রহিল না। রেখার পর রেখা পড়িয়া সুস্পষ্টভাবে দেখিল তাহারই মত রক্ত-মাংসের এক ক্রীড়নক—মোহমদিরা মত্ততায় মাতোয়ারা। অলকা চিনিল তাহাকে—সে আর কেহ না [redacted] খেলাঘরের খেলুড়ে যামিনী।

হৃদয় কম্পিত বা বিভ্রান্ত হইল না [redacted] চিত্তে শুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার চ'খের স[redacted] সে। সকাতরে জানাইল, খেলাঘরের সে [redacted] সর্ব্বস্ব। খেলাঘরের সে মধুর স্বপ্ন না ভা[redacted] গিয়াছে তাহা তাহাকে মধুরতর রমে[redacted] শুনাইয়াছে অপার্থিব সুরলহরী, মজাইয়াছে তাহা প্রাণে প্রাণে।

এর মূল তুমি। তোমার কৃপায় জাগতিক মোহ হইতে আমি বিচ্ছিন্ন। প্রার্থনা কর, যেন প্রেমের ঠাকুর আমার বুক জুড়িয়া থাকেন।

যামিনী শুনিল সব। চক্ষু হইল নত। আবেগ ভরে বলিল, বেশ তাই হ'ক। নূতন খেলায় সাথী হতে পারি কিনা, আমিও দেখি।

প্রতিমা পানে চাহিয়া অলকা দেখিল প্রভু হাস্যময়।

সুপরামর্শ জ্ঞানে, অলকা সম্বন্ধে কোনও বাধানিষেধ কোনও বিষয়ে তাহার পিতামাতার নাই।

প্রতিবেশীরা গায়ে পড়িয়া অলকার স্বামীগৃহে প্রায়ই কত কথা জানায়। তথায় কেহ কেহ তাহাতে বিচলিত হইলেও যামিনীর দৃঢ়তায় সে সব বানচাল হইয়া যায়।

ইহার উপর সকলে লক্ষ্য করে যামিনী অলকার সুসজ্জিত চিত্রাদি লইয়া সদা-সর্ব্বদা তন্ময়।

পুত্রের সেই তন্ময়তা তাহার মাতার হৃদয় স্পর্শ করে। কর্ত্তব্য নিরূপণ করা কিন্তু তাঁহার পক্ষে কঠিন হয়। এ বিষয়ে বৈবাহিকার পরামর্শ লাভ সমুচিৎ তাঁহার মনে হয়।

এই উদ্দেশ্যে অচিরে বৈবাহিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি যাত্রা করেন। তথায় অভ্যর্থিত তিনি হন ললিতা কর্তৃক। যামিনী-জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা অলকা ?

ললিতা উল্লাসভরে বলিল, তিনি এখন অলকানন্দা, [redacted] আরাধ্যা। ওই শুনুন—

বৃন্দাবন ধন,
গোপী-মনমোহন
কাঁহা মেরি হৃদয়ক রাজ।
শূন্য হৃদয়পুরী
আও আও আও হরি
তুঁহু বিনা পরাণে কি কাজ।

প্রাণ ভরিয়া গান শুনিতে শুনিতে দুইজনে উপস্থিত হইল ভজন-বিভোরা অলকা দর্শনে।

ললিতা ভক্তিভরে উচ্চারিল—

কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ

নাম শুনিয়া অধীরানন্দে অলকা চারিদিকে দেখিতে দেখিতে—

কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ
আমায় কৃষ্ণধনে এনে দে—

কে এনে দেবে! আনতে পারবে না কেউ। আসবে সে নিজে। আসতেই হবে।

যাক সে যেথায় খুসী
বসে হেথায় আমি টানব রশি—
দোদুল দোলে, হৃদয় দোলায়
দুলবে ও মোর পূর্ণশশী!
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে
কাঁদুক যেন হাতের বাঁশী
অলকা পড়িয়ে রবে
শ্রীচরণে দিবানিশি।

ভক্তিগদগদ চিত্তে গীতমাধুরী শুনিলেন যামিনী-জননী। মধুরতার অনুভূতি হইল, তাঁহার প্রাণ মন ভরিয়া দিল। তাঁহার অজ্ঞাতসারে অবনত হইল তাঁহার মস্তক শ্রদ্ধাভরে।

সঙ্গে সঙ্গে কে বলিল—

জয় ভক্তের, জয় ভক্তাধীনের!

প্রেমের দায়ে যে তিনি সদাই বাঁধা। অলকা তখন প্রতিমা বক্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ।

জয় রাধে শ্রীরাধে
বাঁশী বাজত বাঁশী বাজত
জয় রাধে শ্রীরাধে
রাধা সুরে (আমার) সাধা বাঁশী
(বাজ) জয় রাধে শ্রীরাধে
মন মজিল, সখি রে কালার বাঁশীতে,
মনে করি ভুলে থাকি, ভুলিতে পারি না সখি
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে।

জগত রাধাময় ওই বাঁশীতে। জগদারাধ্যা শ্রীরাধা তাঁর আরাধনা করিতে সচঞ্চল। প্রেমময়ী অলকা দেবী তুমি স্থির থাক সাধ্য কি তোমার!

তোমার—

মধুর মুরতি মধুর ভাষ
মধুর চলনি মধুর হাস।

মধুময় করিয়াছে তোমার খেলাঘরের সর্ব্বস্বকে। বাঁশীর সুরে যে মজিবার মজুক আমি মজিয়াছি তোমার মধুর বংশীধ্বনিতে। চাইনা আমি গোলোক, চাইনা আমি শ্রীবৃন্দাবনের পদরজ। যেখানে স্পর্শ করে তোমাব পদ-যুগল সেই আমার শ্রীবৃন্দাবন, সেই আমার পরম লোক।

মনে পড়ে জাগতিক আচারে বিবাহকালীন শুভদৃষ্টিক্ষণ। অনুভূতি তখনই হয়েছিল, তুমি আমার, আমি তোমার। সে অনুভূতি ষড়রিপুর কোনও রিপু কলুষিত করে সাধ্য কি! সে অনুভূতির তোমার পরম প্রেমময়ের বংশীরোলের উতরোলও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে না বিন্দুমাত্র।

আমার অস্তিত্বের মূলই—তুমি আমার আমি তোমার। প্রিয়াপেক্ষা প্রিয় আমার তোমার ইপ্সিত পথে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হও তুমি। তোমার দেবদুর্লভ প্রেম-প্রীতি আদর-সোহাগের শুদ্ধ স্মৃতি নিয়ে আমার পথে অগ্রসর হবার বাধা যেন না ঘটে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা

করি—তোমার দিব্যজ্যোতি বিকীরণ যেন তাতে হয়। শ্রদ্ধা সহকারে এই আমার বিনীত ভিক্ষা।

সুসজ্জিত অলকার চিত্রালেখ্য সমক্ষে যামিনী উন্নত শিরে যখন এই ভাবে তদ্গত, যামিনী-জননী পুত্রের শিরস্পর্শ করিয়া স্নেহাভিভূত হইয়া বলিলেন, বাবা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

দৈববাণীর ন্যায় যামিনীর কানে তাহা সুধাবর্ষণ করিল। যামিনী ভক্তিভরে জননীর পদধূলি লইল।

আমায় নিয়ে
বেড়ায় হাত ধরে
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে
বলতে হয় না জোর করে।

হাসছ ঠাকুর। যেতে হবে। হবেই ত'। গৃহবাস! সে ত তোমার পদতল।

যুগল প্রতিমার দিকে চাহিয়া—ঠাকুর, ঠাকুর, অলকা চলল। কাঠামোটা থাক। তোমরাও চল অন্তর আমার আলো করে।

বৃন্দাবন ধন, গোপিকারঞ্জন
কাঁহা মেরি হৃদয়ক রাজ
অলকাপুরী শূন্য করি
কাঁহা মেরি বংশীধারী
(রাধিকা রমণ বনসাজ)।

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, ক্ষণেক তিষ্ঠ। আসছে অলকা বৃন্দাবনে গড়াগড়ি দিতে।

অলকা ছুটিল গৃহ ছাড়িয়া। পথ তাহার মুক্ত থাকিলেও অতি সন্তর্পণে তাহাকে তাহার গন্তব্য-স্থানাভিমুখী করান হইল।

কোনও দিকে অলকার দৃষ্টি নাই। মুখে এক একবার শুধু বলিতেছে কতদূর আর কতদূর।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবামাত্র অলকার জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে বৃন্দাবন যেন পুলকিত সচকিত।

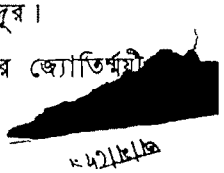

অলকার কানে গেল মধুর গীতি

বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব,
খেলব কত ছুটাছুটি বাঁশী বাজাব।

চক্ষু মুদিয়া অলকা ইঙ্গিত করিল—

শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দির কাঁপাইয়া পড়িল মন্দিরাভ্যন্তর হইবামাত্র, অলকা মন্দির-দেবতার পাদমূলে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে বিকীরিত হইল দিব্যজ্যোতি। অলকা বুঝি মিলাইয়া গেল, ভগবত অঙ্গে, তাহার পার্থিব দেহ স্থান পাইল, খেলাঘরের খেলুড়ে যামিনীর ক্রোড়ে।

ক্রোড়ে অবস্থিত অলকার দেহ লইয়া যামিনী হাস্যমুখ কিন্তু নীরব নিশ্চল প্রাণহীন পুত্তলিকা মাত্র।

মন্দির প্রাঙ্গণ তখন প্রতিধ্বনিত কীর্ত্তন গানে,—

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা
হের রে নয়ন,
মরি মরি কিবা শোভা
রাধার পাশে মদনমোহন।

অক্ষয়বাবু, অন্নপূর্ণা দেবী ও যামিনী-জননী বাক্য-রহিত। শুনিলেন তাঁহারা কে-যেন বলিতেছে বৃন্দাবনের রজের তুলনা বৃন্দাবন—ভক্তের ও ভগবানের প্রেম মিলনে। বৃন্দাবনের এ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

সৈনিক

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম দুস্তর ঘোর, অন্ধকার রাতে
যাত্রা মোর, এক আমি, নাহি কেহ সাথে।
একক সৈনিক আমি, পেয়েছি যে দুরান্তের ডাক
প্রেয়সীর ডাক ঐ, থাক সে যে, থাক, দূরে থাক
চুম্বন মদিরা সেও, নহে আজ মোর তরে নহে,
প্রিয়া মোর একা ঐ, শয্যা 'পরে, আপনি সে দহে,
কাণ্ডারী বিহীন নাও, চলিয়াছে, ঐ দূর পথে,
সে নাওয়ের যাত্রী আমি, থামায়োনা, তারে কোনমতে।

জাতিগঠনে খাদ্য*

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

দেশবিদেশের সমাজের সকল স্তরের নিবিড় অভিজ্ঞতা, জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলস্বরূপ এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর লিখিত হলেও ভাষা এত প্রাঞ্জল এবং বক্তব্য এত সরলভাবে বুঝানো হয়েছে যে, বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কাহারো ইহা বুঝিতে আদৌ কোনও অসুবিধা হবে না। লেখকের সাহিত্যানুরাগের সঙ্গে দরদী মনের সমাবেশের ফলেই লেখা এত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। মুখবন্ধে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন।

এই পুস্তকের সম্যক্ মূল্যায়ন করতে হলে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন যার অবসর এখানে নেই। পুস্তকখানির প্রত্যেকটি অধ্যায়ই অশেষ অমূল্য তথ্যে ভরপূর। পুস্তকের অধ্যায়গুলির উল্লেখ করলেই পুস্তকের মূল্য ও প্রয়োজন বুঝা যাবে। অধ্যায়—জাতিগঠনে খাদ্য (মুখ্যতঃ খাদ্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের নির্যাস), খাদ্য—যুগে যুগে, পরিপাক যন্ত্র ও তার ক্রিয়া, খাদ্যোপাদানের পরিচয়—কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ, প্রোটিন (আমিষ পদার্থ), লবণ পদার্থ, জল, ভাইটামিন। ভাইটামিনের আবিষ্কার, বিভিন্ন ভাইটামিন সম্বন্ধে আলোচনা, আমাদের প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যে ভাইটামিনের পরিমাণ, বয়স্ক লোকের ভাইটামিন ও অন্যান্য উপাদানের দৈনিক চাহিদা, খাদ্য ও শক্তি, স্কুলের ছেলেমেয়েদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ, আমাদের খাদ্যপদ্ধতির সমালোচনা, বালক-বালিকার খাদ্য, মায়েদের খাদ্য, শিশুর খাদ্য ও দুগ্ধ, বৃদ্ধের খাদ্য ও বার্ধক্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ রোগ, অম্লরোগ, স্থূলতা বা রোগ। খাদ্যসমস্যা সমাধানে গোল আলু; টমাটো, গাজর, শাক, দেশী আম, কলা, নারকেলের খাদ্যমূল্য, ডালের বড়ি, বাংলার পিঠে। সংক্ষেপে অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুনরালোচনা।

খাদ্য নির্বাচন ও খাদ্যের অনুপাত বিষয়ে গ্রন্থকার লিখেছেন।—"আমরা ভাতডাল, রুটি মাংস, মাছ, ডিম, ফলমূল তরিতরকারী যত রকমের খাদ্যই খাই না কেন, বিজ্ঞানী কিন্তু এগুলি বিশ্লেষণ ক'রে ছয়টি প্রধান উপাদানের—কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার ও শর্করা), স্নেহপদার্থ, প্রোটিন, লবণ পদার্থ, ভাইটামিন ও জলের সন্ধান পেয়েছেন। পাকাবাড়ির ছাদ ঢালাই করার সময় লোহার দণ্ড, পাথর কুচি, বালি, সিমেন্ট ও জলের মধ্যে যেমন নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখতে হয়, আমাদের আহার্য থেকে ষোল আনা ফল পেতে হ'লে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তেমনি একটা সুনির্দিষ্ট অনুপাত রাখা অপরিহার্য। দেবদেবীর পূজার উপকরণ যেমন নিয়মবাঁধা—কোন একটির অভাবে যেমন পূজার অঙ্গহানি হয়, আহারের বেলাতেও তাই। পশ্চাত্যজাতিরা এই সত্য উপলব্ধি করে কার্যতঃ প্রতিপালন করায় তারা শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান এবং দীর্ঘজীবী। আমাদের দারিদ্র্য প্রবল, তবে মুষ্টিমেয় যাঁদের সচ্ছলতা আছে তাঁদেরও অনেকের মধ্যে জাতিগত ঔদাসীন্য, এবং অপর অনেকের মধ্যে ইহলোকের চেয়ে পরলোকের চিন্তা প্রবল ব'লে খাদ্য-বিষয়ে আমরা বড় একটা মাথা ঘামাই না, তাই অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যু আমাদের পেয়ে বসেছে। অনেকে আবার খাওয়ার খরচা কমিয়ে সেই পয়সায় থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখেন, সৌখীন সামগ্রী কেনেন বা বাড়িগাড়ি করেন—কিন্তু সে-সব ভোগ করবার আর অবসর তাঁরা পান না।"...

খাদ্য—যুগে যুগে অধ্যায়ে—ভারতচন্দ্র, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙালী কবির কাব্যের মৎস্যাদি রান্নার পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার লিখেছেন—"তৎকালে প্রচলিত মাছ শাক পরমান্ন পিষ্টকাদি রান্নার যে পরিচয় পেলাম তাতে ক'রে সত্যই মনে হয়, এরূপ আহার্য জুটলে খাদ্যবিজ্ঞান পড়ার দরকার হয় না—খাদ্যের যাবতীয় উপাদানই এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান।—আর এইরূপ খাদ্যের বলে অসীম দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান বাঙালী সন্তানেরাই তো ভারতের স্বাধীনতা-

* ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস, এম. এস্‌সি., ডি. ফিল. প্রণীত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে মুদ্রিত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। রয়েল সাইজ, ৫৮ পৃষ্ঠা—মূল্য আট আনা মাত্র।

যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে সেই সুজলা সুফলা পূর্ব-বাঙলা থেকে আজ আমরা চিরনির্বাসিত। খাদ্যের দিক দিয়ে, জাতি হিসাবে বাঁচবার পক্ষে এ যে কত বড় মর্মান্তিক আঘাত তা ভাবলে জ্ঞানহারা হতে হয়।..... আজ সংস্কার বর্জন ক'রে, বিকল্প আমিষ খাদ্য গ্রহণে (খৈল বা পত্রজ বিলাতী আমদানি আমিষ নয়!) অভ্যস্ত হয়ে জাতিকে বাঁচবার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে। শুধু ডাল ভাতে জাতি বেশীদিন টিকতে পারে না—বাঁচার মত বাঁচতে পারে না।"

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হ'লেও আমাদের যা ভাল তার উল্লেখে লেখক কুণ্ঠাবোধ করেন নি। খাদ্যপদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"আমাদের রান্নাই যত দোষের বলে অনেকে হা-হুতাশ করেন। যত অসুখ বিসুখ, স্বাস্থ্যহীনতা সবই রান্নার দোষে ঘটেছে ব'লে এঁদের ধারণা। আর কাঁচাখেকো সাহেবদের খাদ্যরীতির-অজস্র প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখ। সাহেবদের খাদ্যের উপকরণগুলির প্রতি কেউ লক্ষ্য করেন না। শীতের দেশে ক্ষুধা বেশী পায়, মাছি না থাকায় এবং ঠাণ্ডার দরুণ খাদ্যে দূষিত জীবাণু প্রবেশের আশঙ্কাও কম কাজেই মশলা প্রভৃতি ওদের তত দরকার হয় না। পাচক এবং হোটেলওয়ালাদের দায়িত্বজ্ঞানও ওদেশে উচ্চস্তরের। ওদের সাধারণ গরীব লোকেরাও জাতির কল্যাণকে সবচেয়ে বড় ধর্ম বলে মনে করে—খাদ্যে ভেজাল দেওয়া ওদের মনে ঠাঁই পায় না। তাই অবলীলাক্রমে তারা কাঁচা লেটুস বা কপিপাতা নির্ভয়ে চিবিয়ে খায়। আমাদের গরমের দেশে ব্যাধিজীবাণুর এত আধিক্য এবং প্রাবল্য—তারপর পচনক্রিয়া এদেশে এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে, হলুদ, সরসের তেল ও ব্যাধিজীবাণুনাশক ও বায়ুপ্রশমক বিবিধ মশলার ব্যবহার না করলে চলে না। মাত্রাধিক্য অবশ্যই দূষণীয়।"

শাকের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন—"শাকে বুদ্ধি মল, বলেই জানি কিন্তু ইহা যে এত উপকারী তা বিশ্বাস করাই কঠিন। পালংই একমাত্র উপকারী শাক নয়। ন'টে, কলমি, পুঁই, মটর, খেঁসারি, হোলা শাক, লাউ কুমড়ো হিঞ্চে, সরসে, মুলো, কচু বা পাট শাক কিছুই ফেলনা নয়। শাক যত টাট্‌কা সতেজ সবুজ হবে তা তত বেশী উপকারী। মাছের তেল সহ শাক রান্নাতে ভাইটামিন 'এ' যথেষ্ট পাওয়া যায়। কাসুন্দি যোগে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের নতুন কলমি ও নটে শাক যেমন মুখরোচক তেমনি উপকারী। কাসুন্দির তৈলাংশ শাকের ক্যারোটিনকে শরীরে গ্রহণোপযোগী করে ভাইটামিন 'এ'র চাহিদা মেটায়।"

কিঞ্চিৎ অবান্তর হলেও বলে রাখি—লেখক ডঃ বিশ্বাস আমার আকিশোর পরিচিত। গ্রামের (কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী, বর্ত্তমান পাকিস্তান) মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মাহিষ্য সন্তান। শৈশবে বৈশাখ মাসে মাঠের নবোদ্ভিন্ন যে রক্তাভ কলমি শাক তুলতেন, বাল্যে গৃহপ্রাঙ্গণে যে নটেশাক বুনতেন তা তাঁর মনে এখনও উজ্জ্বল রয়েছে। ইনি বেঙ্গল কেমিক্যালের ল্যাবরেটরিতেই শুধু সোনা ফলাচ্ছেন না, পরন্তু গত ৩০ বৎসর যাবৎ কারখানার পতিত জমিতে সকল ঋতুতেই বিভিন্ন শাক-শবজি ও অপর্যাপ্ত কলা ফলিয়ে কারখানার শ্রমিক ও বন্ধুদের বিতরণ ক'রে আসছেন। বিস্তীর্ণ বাগানে এবার টনখানেক পুঁই ও নটেশাক ফলেছে। লাউ জন্মে অপর্যাপ্ত, বাঁধা, ওল-কপি ও ফুলকপিও সেই পরিমাণে।—'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়' কথার ইনি মূর্ত প্রতীক। পাট-শাকের প্রতি এঁর টান—তাঁর মাটির মায়া কাব্যগ্রন্থেই (১৯৪২) পেয়েছি—"পাটকারবারে বিদেশী বণিক পায় টাকা লাখে লাখে—বাংলার চাষী হা-ভাতে আমরা খাই শুধু পাটশাক।"

টমাটো ও গাজরের গুণকীর্তনে ও-গুলির মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা বিদ্যমান। দেবভোগ্য দেশী আম কলা বেল নারকেলের এবং মধু, গুড় ও গব্যের প্রতিও লেখক আমাদের লোভাতুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অশেষ তথ্যপূর্ণ ডালের বড়ির প্রতি নতুন আলোকসম্পাত সত্যই অভাবনীয়। 'বাংলার পিঠে' পল্লী-বাঙলার শাশ্বত প্রাণ-স্পন্দনে অনুরণিত এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে পরম উপাদেয় বলে প্রমাণিত।

বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সস্তা পুষ্টিকর টিফিন

সম্বন্ধে লিখছেন—"বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে চিড়া গুড় কলা, আম-চিড়া (চিড়ার পরিবর্তে আটার রুটি) এবং সময়োপযোগী ফল—শশা, পেয়ারা, টমাটো ঐ সঙ্গে খেলে উত্তম পুষ্টিকর টিফিন হবে। পাড়াগাঁয়ে যে সব স্থানে আলু বেশী জন্মে সেখানকার স্কুলের ছেলে-মেয়েরা আলুসিদ্ধ গুড় বা আলু সিদ্ধ, লবণ এবং যাদের বাড়িতে হাঁস-মুরগি আছে তারা আলুসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ ও তৎসঙ্গে টমাটো শশা কলা খেলে প্রকৃত পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে সবল হ'য়ে উঠতে পারে।" আশা করি, বিদ্যালয়ের সহৃদয় শিক্ষকবর্গ এবং গ্রামের অভিভাবকগণ এ বিষয়ে যত্নবান হয়ে জাতি-গঠনে সত্যিকারের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন।

'বৃদ্ধের খাদ্য ও বার্ধক্য' অধ্যায়টি গ্রন্থের অভিনব বিশেষ আকর্ষণীয় সংযোজন। লেখকের অভিজ্ঞতা ও শ্রমসাধ্য সংকলন অপরগুলির মত এ অধ্যায়টিকেও অতিশয় মূল্যবান ক'রে তুলেছে। বাঙালী মনীষীদের অকালমৃত্যু বাঙালী জাতির চরম অভিসম্পাতরূপে পরিগণিত এবং দেশবাসী এর জন্য যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত ও মর্ম্মপীড়িত। শ্যামাপ্রসাদ, মেঘনাদ সাহা, বীরেশ গুহ ছাড়া অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসকের অকাল মৃত্যু বাংলা দেশকে শোচনীয়ভাবে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে। তাই বাঙলার শিক্ষিত সমাজকে এই অধ্যায়টি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ ক'রে এর নির্দেশগুলি জীবনে প্রতিপালনের বিষয়ে আবেদন ও বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। প্রীতিভাজন গ্রন্থাকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিক্ষিত বাঙালীমাত্রকেই আমি মনে রাখতে বলি—

"দিনান্তের প্রসন্নতা যেমন পরম রমণীয়, স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ বার্ধক্যও তেমনি লোভনীয়। স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল বার্ধক্য জীবনের পরিপূর্ণতা ও পরিণতির দিব্যমাধুর্যে গৌরবময়। সুতরাং মানুষের জন্মগত এই সুমহান্ অধিকার লাভ ও উপভোগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা এবং তজ্জন্য পূর্ব হইতেই সমুচিত প্রস্তুতি সর্বদা অপরিহার্য।"

উপসংহারে অত্যন্ত সন্তর্পণে জানাতে চাই যে, প্রোটিনের জন্য গ্রন্থে জান্তব মাংসের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরাও এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা তাই দিয়েও থাকেন। নিছক দেহাত্মবাদী দৃষ্টি খাদ্যের উপাদানগত প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। খাদ্যের গুণ প্রকৃতি প্রবৃত্তি খাদকের মানস গঠনের সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্কিত। অবশ্য আজকের খাদ্য-দুর্ভিক্ষের দিনে এসব ভাবাও বাতুলতা। হয়তো অনতিদূর আগামীকালে কেঁচো, তেলাপোকা, পোকামাকড়, কাক-শকুনির মাংস নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়বে। এমন অবস্থায় এমনি একখানি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ খাদ্যবিষয়ক অত্যন্ত কম মূল্যের বই বাংলার প্রতি গৃহস্থ ঘরে রক্ষণীয়। এই হতভাগ্য দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে এতদিন এরূপ বইয়ের অন্ততঃ দশ মিলিয়ন কপি বিক্রী হয়ে যেত।

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫-০০ শব্দ তত্ত্ব ১৫-০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲
॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

সাময়িকী

বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ :

গত ২২-এ নভেম্বর অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় বঙ্গীয় বিশ্ব-হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ব-হিন্দু পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী চিন্ময়ানন্দজী দীর্ঘ এক ইংরাজী ভাষণে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি এবং আজিকার দেশের যুবশক্তির লক্ষ্যভ্রষ্টতার কথা বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হিন্দুধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় নহে, ইহা এক উদার জীবন-বিকাশের ধারা। বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, এমন একটা স্থায়ী বিশ্বব্যাপী সংগঠন করা যাহা হিন্দুত্বের সংরক্ষণ ও সর্ব্বত্র ইহার বাণী প্রচার করিতে সাহায্য করিবে। এই সভায় মরিসসের হিন্দু প্রতিনিধি শ্রীভুবনেশ্বর মোহুও ভাষণ দেন। বিভিন্ন বক্তা বিশ্বব্যাপী হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। আগামী প্রয়াগের কুম্ভমেলায় বিশ্ব-হিন্দু পরিষদের প্রথম সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে। গত বৎসর বিশ্ব-বৌদ্ধ সম্মেলন বৌদ্ধ গয়ায় এবং বিশ্ব ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সম্মেলন বোম্বাই সহরে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বিশ্ব-হিন্দু সম্মেলনে ভারত সরকার ও ভারতীয় হিন্দু কতখানি উৎসাহ বোধ করিবে তাহাই দ্রষ্টব্য।

অভিনব বিবাহ :

স্বনামধন্য কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এই 'অভিনব বিবাহ-সম্পর্কিত সংবাদটি দিয়াছেন : বাংলার খ্যাতনামা প্রবীণ কবি কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বর্দ্ধমানের বিখ্যাত বৈষ্ণব পরিবারের বংশধর। এই বংশেই একদিন পদকর্ত্তা লোচনদাস জন্মিয়াছিলেন। রাঢ়ের কড়ুই গ্রাম নিবাসী কবিশেখরের পূর্ব্বনিবাস বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে ছিল। এই গ্রামে বর্ত্তমান বাংলার প্রাচীনতম প্রবীণ কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এখনও নিজ নিবাসে বসবাস করিতেছেন।

আলিপুরের উকিল শৈলেন্দ্রনাথ সেন হালিসহরের শাক্তসাধক রাম-প্রসাদ সেনের বংশের সপ্তম পুরুষ। রামপ্রসাদ, রামমোহন, জয়নারায়ণ, গোপালচন্দ্র, কালীপদ, মানসরঞ্জন এবং তস্ত পুত্র এই শৈলেন্দ্রনাথ।

বৈষ্ণব কবিশেখর কালিদাস তাঁর চারটি পুত্রের ছোট দুইটি যমজ পুত্র শ্রীমান্ কবিরঞ্জন রায়ের ও শ্রীমান্ কবিকঙ্কণ রায়ের সাথে, এই ১৯৬১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে শাক্ত শৈলেন্দ্রনাথের দুটি সুন্দরী যমজ কন্যা অঞ্জলিকা ও মঞ্জুলিকার শুভ বিবাহ ঘটিয়েছেন। বৈষ্ণব ও শাক্তের দুইটি যমজ পুত্রের সাথে দুইটি যমজ কন্যার বিবাহ, বর্ত্তমান যুগে বিনা পণে সুসম্পন্ন হওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুসংবাদ বটে। কবিশেখর তাঁহার চারিটি পুত্রের বিবাহে কপর্দ্দকও ঋণ গ্রহণ করেননি। পুত্র-বিক্রয়লব্ধ অর্থ লইয়া নৈষ্ক্য জাহিরের জঘন্য রেওয়াজ তাঁহাদের পুণ্যবংশে প্রচলিত নাই।

চাষের খবর :

একই জমিতে ধান ও কলাইয়ের চাষ করিয়া কিভাবে লাভবান হওয়া যায় সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিদপ্তর হইতে এই সংবাদটি পরিবেশিত হইয়াছে : "ধান কাটার পর ঐ জমিতে রবিশস্যের চাষ করা যুক্তিযুক্ত। কলাই এইরূপ একটি আয়কর শস্য যা' ধানের পর ক্ষেতে বোনা যেতে পারে এবং যার দ্বারা ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত বলা চলে। প্রায় তিন বৎসর গবেষণা চালানোর পর উড়িষ্যায় কৃষি-বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে সক্ষম হয়েছেন যে, কলাই ও ধান পর্য্যায়ক্রমে চাষ করলে ধানের উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং ঐ সঙ্গে প্রতি শস্যচক্রে কলাই চাষ করলে কৃষকের একরে সাড়ে তিন মণ কলাইও উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ধানের সঙ্গে কলাই-এর আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ কলাই-এর বদলে মুগ কলাই-এর চাষও এক শস্যচক্রে করা চলে, তবে ধানের পর মুগকলাই-এর চাষ করা হলে সে ক্ষেত্রে ধানের উৎপাদন মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।"

জাতিস্মর :

একটি সংবাদে প্রকাশ নাভকোট জেলার ওয়াকার গ্রামের পাঁচ বৎসর বয়স্কা বালিকা তাহার পূর্ব্বজন্মের ইতিকথা বলিতে সক্ষম। বালিকাটি তাহার পূর্ব্বজন্মের পিতামাতার হুবহু বর্ণনা দিয়াছে। পিতা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী। মাতাপিতা উভয়েই বানিয়া-বংশজাত। কন্যার পূর্ব্বজন্মের বাড়ীঘরের এবং তত্রস্থ শিবমন্দিরের বর্ণনা শুনিয়া তাহার পিতামাতা সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য কন্যার বর্ণিত স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পান মেয়েটির বর্ণনা হুবহু সত্য। মেয়েটিকে জাতিস্মর বলা যায়।

সাধারণ বুদ্ধির অগম্য :

একটি সংবাদে প্রকাশ, সাম্প্রতিক পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় পাকিস্তানের নির্ব্বিচার বোমাবর্ষণের ফলে পূর্ব্ব পাঞ্জাবের সীমান্তবর্ত্তী এক গণ্ডগ্রামে বহু অসামরিক নরনারী হতাহত হয় এবং ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়। একটি কুটির একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই কুটিরের একটি কুলুঙ্গিতে রক্ষিত দেবী দুর্গার একখানি পটচিত্র একেবারে অক্ষত অবস্থায় রহিয়া যায় এমন অবস্থায় যাহা সম্ভবপর নহে। এই ঘটনা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস ও বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে।

পরলোকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অশোক গুহ :

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের কৃতী সাহিত্যিক শ্রীঅশোক গুহের গত ৯ই অক্টোবর অকালে পরলোকগমন অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। শ্রীগুহের মৃত্যুতে অনুবাদ-সাহিত্যক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। টলষ্টয়, পার্ল বাক্, রোমা রোলাঁ, আঁদ্রে জিদ, ফ্লবেয়ার, টুর্গেনিভ প্রমুখ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেরা সাহিত্যিকদের গ্রন্থ শ্রীগুহ বাংলায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। শেক্সপীয়ারের প্রায় সমস্ত রচনারই বঙ্গানুবাদ করিয়া

তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এদিক দিয়া শ্রীগুহের অবদান অনুপম। 'গোরা-কালার হাট' প্রভৃতি তাঁর মৌলিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মানুষ হিসাবেও শ্রীগুহ অত্যন্ত আদর্শনিষ্ঠ অমায়িক ছিলেন। একদা 'প্রবর্ত্তক'-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

কুইকোটা বিবেকানন্দ আশ্রম :

গত ২রা অক্টোবর বিবেকানন্দ আশ্রমের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐ শুভদিনে গান্ধী-জয়ন্তী, শহীদ-দিবস, হরিজন-সপ্তাহ, সমাপ্তি উৎসব ও শ্রীশাস্ত্রী জয়ন্তীও পালিত হয়। সকালে প্রভাতফেরী ও পল্লী-প্রদক্ষিণের পর জাতীয়-সংগীতের মধ্যে জাতীয় পতাকা তোলেন অধ্যাপক শ্রীউমাপদ নাথ। অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে অধ্যক্ষের ভাষণের পর শহীদ স্মরণে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে কিছু মিষ্টিমুখের পর আশ্রম-পাঠশালার ছাত্রছাত্রীরা পল্লী-সাফাই করে। বৈকালিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জেলাশাসক শ্রীভবতোষ চক্রবর্ত্তী এবং প্রধান-অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন উপ-পৌরপতি শ্রীরাজকুমার মিশ্র। সূতাকাটা, প্রার্থনা, জাতীয়-সংগীত, আবৃত্তি, ব্রতচারী ও যুদ্ধকালীন সেবাকার্য্য প্রদর্শনের দ্বারা এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

১৯৬৩র ২রা অক্টোবর, ডুলে-বাউরী-মুচি প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের ডাকে, আদর্শনিষ্ঠ সমাজসেবক সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যা-বিনোদ তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী শ্রীমতী কণা দেবীর সাহচর্য্যে এই বিবেকানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং অক্লান্ত তপস্যার মধ্য দিয়া এই নিঃস্বার্থ সেবা প্রতিষ্ঠানটিকে অগ্রবহ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। আশ্রমের বিচিত্র ইতিবৃত্ত বারান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আদর :

আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে শিক্ষাব্রতী বিনিময়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিউ ইয়র্ক বিশ্বালয়ের উচ্চতর শিক্ষার অধ্যাপক ডঃ ফ্রেডারিক এল, বেডিকার ১৯৫৫ সাল হইতে কয়েকবার এই উদ্দেশ্যে ভারত সফর করিয়া যান। ১৯৬২ সালে প্রায় চল্লিশজন এবং এ বৎসরেও প্রায় ৪৮ জন মার্কিন শিক্ষাব্রতী ভারত সফর করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল-কলেজসমূহে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতের পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহই ছিল এই সফরের উদ্দেশ্য। গত মে মাসে ২০ জন ভারতীয় শিক্ষাব্রতীও যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার অনেকগুলি মাধ্যমিক এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পঠন-পাঠন প্রবর্ত্তিত

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-১

বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

(সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়)

পুস্তকের বিষয় :

- প্রথম জীবন
- দেশের তৎকালীন অবস্থা
- স্বদেশী আন্দোলন ও শ্রীমতিলাল
- শ্রীমতিলালের সাহিত্যকৃতি
- শ্রীমতিলালের সংগঠনী শক্তি

ইত্যাদি

দাম মাত্র এক টাকা।

'প্রবর্ত্তক'এর গ্রাহক ও সভ্যসভ্যাদের জন্য শতকরা ২৫/- কমিশন।

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

হইয়াছে। এই শিক্ষাব্রতী বিনিময় সম্পর্কে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোল্‌জ সুন্দর একটি মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই পরিকল্পনা মহাকাশযাত্রীদের চন্দ্র বা মঙ্গল গ্রহে অবতরণের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অন্তরে অবতরণের, মানুষে মানুষে মিলন সাধনের প্রয়োজন এখন খুব বেশী।"

প্রবর্ত্তক সাহিত্য চক্র :

গত ৩০শে অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় প্রবর্ত্তক ভবনে (কলিকাতা) প্রবর্ত্তক সাহিত্য চক্রের সুসাহিত্যিক ডঃ মতিলাল দাশের পৌরোহিত্যে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিমতি সঙ্ঘসেবিকা আরাধনা গুপ্তা'র উদ্বোধন সঙ্গীতের পর কার্য্যারম্ভ হয়। দেশ ও জাতির বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও কর্ত্তব্যমূলক ভাষণ, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও আলোচনার মাধ্যমে সম্মেলনটি সার্থকতায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ভাষণ দেন প্রাক্তন বিপ্লবী শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক ও অধ্যাপক শ্রীসুখীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী। কবিতা পাঠ করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দু ঘোষ, শ্রীইন্দু গুপ্ত, শ্রীকুলদারঞ্জন মজুমদার। প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, শ্রীপরেশচন্দ্র সেন ও শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী। গল্প পাঠ করেন শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়, শ্রীকৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বালিকা শিখা বড়ুয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করে। প্রবর্ত্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ধন্যবাদ দেন। সভান্তে সামান্য জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

পৃথিবীর কনিষ্ঠতম গণিতজ্ঞ :

পশ্চিম জার্ম্মানীর মিউন্সিক সহরে আট বছর বয়স্ক বালক এডেরের গণিতে প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। চার বৎসর বয়সেই অঙ্কশাস্ত্রে তাহার বুৎপত্তি জন্মে এবং আট বৎসরে সে মাষ্টারমহাশয়কেও অঙ্ক শিখাইবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। তার বাবা তাহাকে এই বিষয়ে খুব উৎসাহ দেন এবং নানা রকম শক্ত অঙ্ক শেখান, এডেরও চটপট সব শিখিয়া নেয়। পদার্থবিজ্ঞানেও এডের খুব পারদর্শী। সে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বুঝে এবং ইলেকট্রোনিক কম্পিউটার চালাইতে পারে। বালকের এই অসাধারণ মেধা জন্মার্জ্জিত জ্ঞান ছাড়া আর কি বলা যায়?

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

সর্বজন প্রশংসিত বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : [ফোন ৩৩-২৩০৩]

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]

বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি রুচিসম্মত কাপড়ের বিপুল সম্ভার।

আধুনিক ডিজাইনের দেশী তাঁতের শাড়ী। গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার বিপুল আয়োজন।

An Important Announcement

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR ★ DOUBLE ENDED-GRINDER

★ POLISHING & BUFFING ★ FLEXIBLE SHAFT GRINDER etc. etc.

MANUFACTURED BY :

KSHAMA ELECTRO WORKS

146, SHYMNAGAR ROAD, DUM DUM, CALCUTTA-28. Phone : 57-2799

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকপিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আপনার বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হোক...

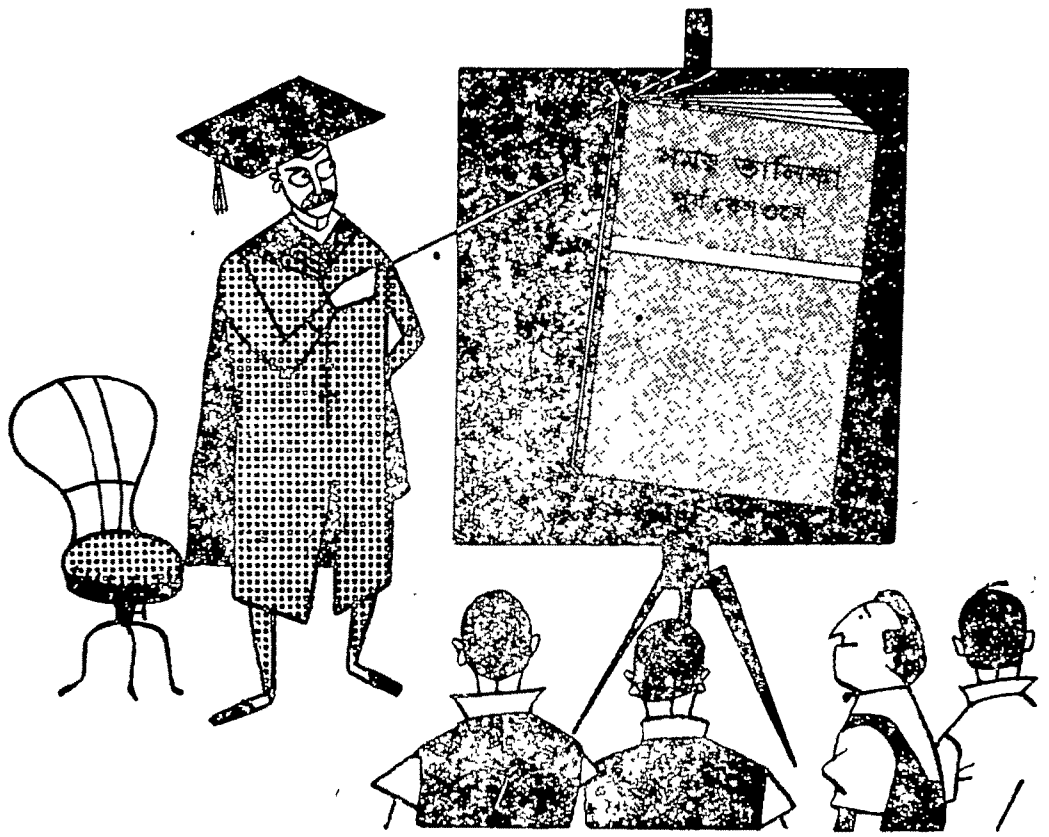

...ভ্রমণ-পুস্তিকার মধ্যে রেলওয়ের সময়-তালিকাই সর্বাধিক প্রচারিত পুস্তিকা। কর্ম-কেন্দ্রে, গৃহে এবং ভ্রমণ কালে ভ্রাম্যমান জন-সাধারণের নিত্যসঙ্গী এই পুস্তিকার মুদ্রণ ও বিক্রয় সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী।

ব্যাপক ও স্বল্পব্যয় প্রচারের জন্য ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় প্রচারিত এই ষাণ্মাসিক প্রকাশন নিঃসন্দেহে বিক্রয়-বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুসন্ধান করুন ঃ
কমার্শিয়াল পাবলিসিটি অফিসার, পূর্ব রেলওয়ে
১৪-১৬, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট, কলিকাতা-১
ফোন নং ২৩-২০০৬-৭-৮

পূর্ব রেলওয়ে

মিষ্টান্ন জগতে বিশেষ আকর্ষণ

ইন্দ্র'র

- উৎকৃষ্ট দধি
- ক্ষীরের খাবার
- স্পঞ্জ রসগোল্লা ও চমচম্

বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে।
সকল অনুষ্ঠানেই সযত্নে অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৫-১৩৮৩

৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-২৫৩৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃরোগে অদ্বিতীয়

অর্দ্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স কলিঃ-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিঃ-৬

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক; সম্পূর্ণাঙ্গ; নির্ভরযোগ্য বুক বাইণ্ডিং কারখানা।
পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ৬

ফোনঃ ৩৪- ৩৭১১

সূচীপত্র · প্রবর্ত্তক : পৌষ, ১৩৭২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	৩৬৭
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	৩৬৮
নির্ব্বিশেষ জীবন	প্রবন্ধ	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	৩৬৯
সম্পাদকীয়	...	...	৩৭১
ভারতবর্ষ	উদ্ধৃতি	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭৭
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	জীবন-স্মৃতি	ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	৩৭৮
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	৩৮০
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত শোলোকফ	আলোচনা	এম. ম্যাক্‌সিমোভা	৩৮৩
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	ইতিবৃত্ত	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৩৮৫
ভিতরে-বাহিরে	কবিতা	মানসী গুপ্তা	৩৮৯
হার	গল্প	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯০
শ্রীঅরবিন্দ সরণি	স্মৃতিকথা	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৩৯২
সাধনবিজ্ঞানের মৌল তথ্য	প্রবন্ধ	মহর্ষি প্রেমানন্দ	৩৯৪
মানুষের কাজ মানুষ করা	আলোচনা	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৯৬
এক বাড়ী, আট ঘর	গল্প	অনিলকুমার সমাজদ্বার	৪০০
ভূস্বর্গ চঞ্চল	প্রবন্ধ	ভৈরবপ্রসাদ হালদার	৪০২
শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর তিরোভাবোৎসব	বিবরণী	আশ্রমী	৪০৩
পঞ্চাশ বছর আগে	সঙ্কলন	নির্ম্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত	৪০৫
সাময়িকী	...	... ...	৫০৭

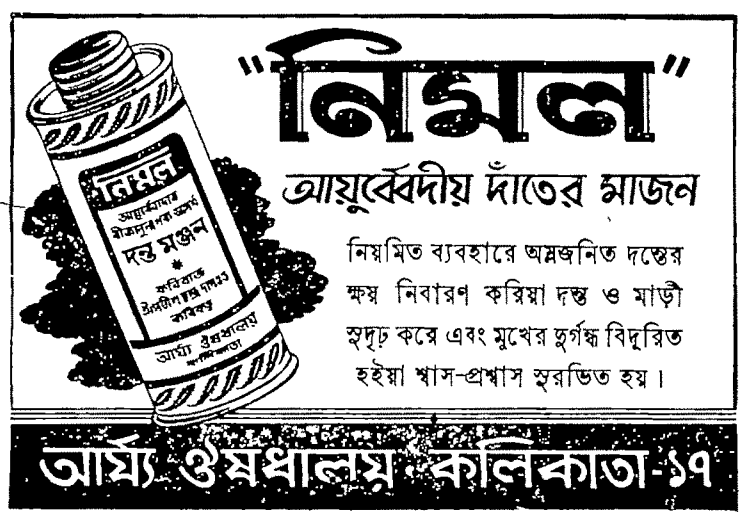

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥
স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২·৫০
জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪·০০
॥ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্র গুহরায় প্রণীত ॥
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল—১৲
(সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়)
॥ শুভঙ্করের ॥
মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪·০০
(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)
॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত ॥
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩·০০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় ○ ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নবেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াল পাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

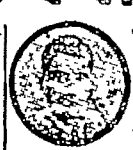

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এফ,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

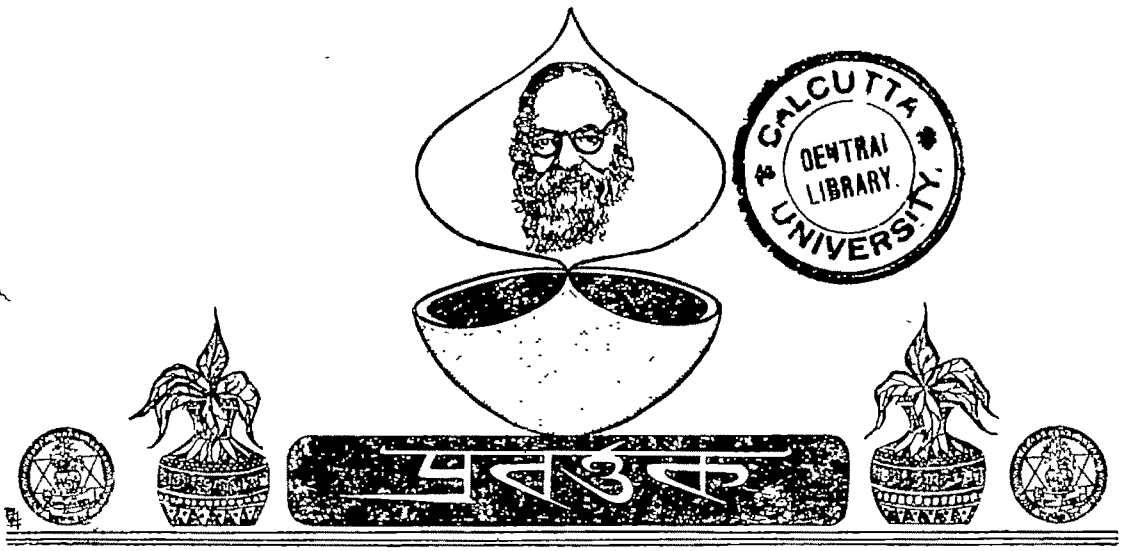

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৫০ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা | সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | পৌষ, ১৩৭২

জীবনের আলো

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরই বিদ্যমান আছেন। তিনিই হইয়াছেন স্থাবর জঙ্গমাদি পৃথিবী। মানুষের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ স্থান। হৃদয়রাসমন্দিরেই তাঁর সন্ধান মিলে। ভারতের যে জাতি অভ্যুত্থান চাহে—যাহাদের রক্তধারার ইতিহাসে গোত্র প্রবর নামের আশ্রয়ে জাগ্রত ঋষিবৃন্দ, তাহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস দৃঢ় রাখিতে হইবে। জাতির আত্মাকে জাগরণের জন্য **ঈশ্বর-বিশ্বাসই** সর্ব্বপ্রথম সোপান। এই সোপানে আরোহণের জন্য চাই নিত্য নিয়মিত উপাসনা। যোগী, মুনির জন্য অব্যক্ত, অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা-বিধি শাস্ত্রে আছে; কিন্তু জাতির জন্য চাই মূর্ত্ত ভগবান। মূর্ত্ত ভগবানে মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া নিত্য যুক্ত হইয়া উপাসনা করিতে হইবে। ভারতের ভগবান তাই **গুরুরূপে** আবির্ভূত হইয়াছেন। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ভারতের বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বিতীয় সোপান মূর্ত্ত ভগবানরূপে কলেবর ধারণ করিয়াছেন। এই গুরুমূর্ত্তির মধ্যে ঈশ্বরত্বের অনুভূতি হয় ইন্দ্রিয় জয়ে। শম-দমাদির সাধনায় অন্তর ও বাহির শুদ্ধ না হইলে শ্রদ্ধা লাভ হয় না। শ্রদ্ধাই জ্ঞানের বীর্য্য। শ্রদ্ধার দ্বারাই পরমকে লাভ করিতে হয়। জাতীয় অভ্যুত্থানের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। ভারত-জাতীয়তার অভ্যুত্থানের মূলে যেমন ঈশ্বর-বিশ্বাস দৃঢ় রাখিতে হইবে, গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হইবে, তেমনি **শাস্ত্রবিধিও** পালন করিয়া চলিতে হইবে। শাস্ত্র—কালধর্ম্ম নহে, বুদ্ধিপ্রসূতও নহে—ইহা সনাতন অর্থাৎ নিত্য। সংরক্ষণ ক্ষমতার অভাবেই অধঃপতন। নতুবা শাস্ত্র জীবনেরই বিধান। জীবন পঙ্গু করে যাহা, তাহা ভারতের শাস্ত্রে নাই। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়—এই ত্রি-প্রস্থানই ভারতের মুখ্য শাস্ত্র-গ্রন্থ। ইহার বিধান পালনেই ভারতের অভ্যুত্থান অপরিহার্য্য। সদাচারপরায়ণ যে মানুষ, সেই মানুষের মধ্যেই গুরুরূপী ভগবান পুরুষোত্তমরূপে বিরাজ করেন। দেব এবং অসুর প্রকৃতিভেদে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভারতের জাতীয়তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা অসুরের জীবন। দেশাত্মবোধ ও স্বজাতীয়তার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেবচরিত্রের লক্ষণ। দেবভূমি ভারতবর্ষ। দেবজাতি আমাদের লক্ষ্য। বিজাতীয় ভাব ও আদর্শের আসুরিক ভাব বর্জ্জনে শিবাজীর মত মানুষ, জীবানন্দ, প্রতাপাদিত্যের মত মানুষ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের মত মানুষই জাতিকে প্রবুদ্ধ করে। তাই **মানুষ** হওয়ার সাধনাই জাতীয় অভ্যুত্থানের চতুর্থ সোপান। আর **কর্ম্ম** জাতীয় জীবন-সাধনের পঞ্চম সোপান। জাতির অভ্যুত্থান কর্ম্মে। সাধনার নামে নৈষ্কর্ম্ম্য নরকের পথ প্রস্তুত করে।

(১৩৫৩ সালের প্রবর্ত্তক হইতে)

—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। উনত্রিংশৎ সূক্তং।) প্রথমা ঋক

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

প্র যদিত্থা পরাবতঃ শোচির্নমানমস্যথ।
কস্য ক্রত্বা মরুতঃ কস্য বর্পসা
কং যাথ কং হ ধূতয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়—"ধূতয়ঃ" (হে স্থাবরাদি কম্পনকারী) "মরুতঃ" (মরুদ্‌গণ) "যৎ" (যখন) "শোচির্ন" (সূর্য্য-রশ্মির ন্যায়) "মানং" (বল, প্রভাব) "পরাবতঃ" (অতি দূর হইতে) "ইত্থা" (ইহলোকে, ভূমিতে) "প্রাস্যথ" (প্রক্ষেপ করেন) "কস্য" (কাহার, কোন্ অর্চ্চনাকারীর) "বর্পসা" (স্তোত্রের দ্বারা) "কস্য" (কাহার, কোন্ অর্চ্চনাকারীর) "ক্রত্বা" (কর্ম্মের দ্বারা) "কং" (কোন্ অর্চ্চনাকারীর উদ্দেশ্যে)) "যাথ" (গমন করেন) "হ" (এবং) "কং" (কে, সে) ॥ ১ ॥

সরলার্থ—হে স্থাবরাদি কম্পনকারী মরুদ্দেবগণ! সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় আপনাদের প্রভাব যখন অতি দূর হইতে ইহলোকে প্রক্ষেপ করেন, তখন কোন্ অর্চ্চনাকারীর স্তোত্রের দ্বারা, কোন্ অর্চ্চনাকারীর কর্ম্মের দ্বারা, কোন্ অর্চ্চনাকারীকে উদ্দেশ করিয়া আপনারা গমন করেন এবং কে সে?

বিশদর্থ—উনচত্বারিংশৎ সূক্তের এইটি প্রথম ঋক। এই সূক্তটিও মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধে রচিত। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষিই এই মন্ত্রেরও উদ্গাতা। পর পর তিনটি সূক্তই মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধে উদ্গীত। এইরূপ সূক্ত পরে আরও পাওয়া যাইবে। আমরা উপস্থিত মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধীয় তিনটি সূক্ত পাইলাম—সপ্তত্রিংশৎ, অষ্টাত্রিংশৎ ও এই উনচত্বারিংশৎ। অন্য দুইটি সূক্ত হইতে এই সূক্তটির একটি অভিনবত্ব আছে। অভিনবত্ব ইহার ছন্দ। এই সূক্তে দুই প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—"অযুজো বৃহতী ও যুজো সতো বৃহতী"। 'অযুজো বৃহতী' ছন্দে প্রথম পাদের ষোলটি অক্ষরের আট অক্ষরে যতি থাকে এবং দ্বিতীয় পাদের কুড়িটি অক্ষরের প্রথম বার অক্ষরে ও শেষ আট অক্ষরে যতি থাকে। 'যুজো সতো বৃহতী' ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় দুই পাদেই কুড়িটি করিয়া অক্ষর এবং তাহার প্রথম বার অক্ষরে ও শেষ আট অক্ষরে যতি। এইরূপ দুইটি ছন্দে এই সূক্তটি গঠিত। সূক্তটিতে মোট দশটি ঋক্ আছে।

উনচত্বারিংশৎ সূক্তের এই প্রথমা ঋকে আমরা দেখিতে পাই ঋষির এক ধ্যানময় মূর্ত্তি। মরুদ্দেবগণকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁর অণু চৈতন্য বিরাট বিভু চৈতন্যে লয় হইয়া এক মহাচৈতন্যময় সত্তায় পরিণত হইয়াছে। তদ্‌গতচিত্তে তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছেন অন্তরীক্ষ লোকে মরুদ্দেবগণের প্রচণ্ড প্রভাব। সেই প্রভাব দেখিয়া তিনি যেন চিন্তা করিতেছেন—অতি দূর অন্তরিক্ষ লোক হইতে ঐ যে সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় মরুদ্দেবগণের প্রচণ্ড প্রভাব মর্ত্ত্যলোকে আপতিত হইতেছে—এই ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? অভিভূত হইয়া তাই তিনি যেন মরুদ্দেবগণকেই প্রশ্ন করিতেছেন—কাহার অনুপ্রেরণায়, কাহার প্রার্থনায় এবং কাহাকেই বা অনুগৃহীত করার জন্য মর্ত্ত্যের বুকে আপনাদের এই প্রভাব বিস্তার? আপনাদের প্রেরকই বা কে এবং অনুগ্রহ-গ্রহণকারীই বা কাহারা?

নির্ব্বিশেষ জীবন

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

আমাদের দেশ ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তি নির্ভর করে—ইহা কোন পুরুষের বাণী নহে, ইহা অপৌরুষেয় বেদ-বাণী। কিন্তু যে চারিটি কারণে আমরা সত্য বঞ্চিত হই, সেই কারণগুলি আমাদের বুদ্ধিব মূল ছিন্ন করিয়াছে। সেই কারণগুলি হইতেছে—প্রথম, আমরা নির্ব্বিচারে ধর্ম্মের বিজ্ঞাপন দেখিয়া অধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি; দ্বিতীয় শ্রুতবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া শ্রুতির অপমান করিতেছি; তৃতীয় যে বস্তু যাহা নহে সেই বস্তুকে তাহা মনে করিয়া বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইতেছি; এবং চতুর্থ, লৌকিক প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মাচার আশ্রয় করিতেছি। এই অবস্থায় ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় আমাদের ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, সন্ন্যাস সবই যে নিরর্থক হইবে, এ বিষয়ে আর সংশয় কি?

জাতির পতনযুগ যখন আসে, তখন এইগুলি অনিবার্য্য হয়। পতন—যুগধর্ম্মেই আসে। এইজন্য প্রতিবাদের কিছু নাই। প্রারব্ধ-ক্ষয়ের জন্য যে কর্ম্ম, তাহা অদৃষ্ট বলিয়া আমরা স্বীকার কবি; কিন্তু ক্রিয়মান অবস্থায় পুনঃ ভবিষ্যৎ রচনার পুরুষকারকে আমরা অস্বীকার কবিব কেন? ইহাতে পতনের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইবে। মানুষ গড্ডালিকা-প্রবাহ নহে। ধর্ম্মানুশাসন মানুষেরই বুদ্ধি-গ্রাহ্য হয়। ঈশ্বর-বিগ্রহ মানুষের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ। এই মানুষ কালজয়ী হইবে, পরম পুরুষার্থ লাভ করিবে। যুগের ধর্ম্ম বলিয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করিবে, এমন হইতে পারে না।

দুষ্কৃতজনেরা হেয় কর্ম্ম করে, সমাজের অধম স্তর তাহাদের বিচরণ ক্ষেত্র। সুকৃতিভাজন বলিয়া আমাদের মহাপুরুষেরা যদি ধর্ম্মের কিম্বদন্তীতে লোকপ্রবাদমূলক সাফল্যের মরীচিকা দেখিয়া নির্ব্বিচারে বিপর্য্যয় আনয়ন করেন, ইহাপেক্ষা অধিক অপরাধ আর কি হইতে পারে? এরূপ দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে। একটা উদাহরণ দিই। সৃষ্টিমানসে ঈশ্বর স্বয়ং যখন সৃষ্টিধর হইলেন, তখন তাহা হইতে যে "জয়গণের" আবির্ভাব হয় তাঁহাদের তিনি জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া অন্তর্হিত হন। কিন্তু জীবন ক্ষয়বৃদ্ধিশীল। জীবনের উত্থান-পতনও আছে। এই দোষদর্শনে তাঁহারা জীবনবিমুখ হইয়া যুক্তিপ্রার্থী হন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদের—"লোকে ময়ানুজ্ঞাতঃ কঃ স্বাতন্ত্র্য-মিহার্জতি"। অর্থাৎ জগতে আমার অনুজ্ঞা ব্যতীত কে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারে?—এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তিনি তাঁদের বলিয়াছিলেন, আমি যখন সমস্তই ব্যাপ্ত হইয়া আছি, তখন "কো মাং লোকেঽভিসন্ধয়েৎ"—কে আমাকে অতিক্রম করিতে পারে?

কল্পান্তকাল স্থায়ী এই বিশ্বজগতে ঈশ্বরেচ্ছায় যে জীবনপ্রবাহ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অনতিক্রমণীয়। কত হাজার হাজাব বৎসব পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনুর যুগে যে সপ্তর্ষিব পুণ্যাবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময়ে জনলোক হইতে তাঁহাদের পুনরাবির্ভাব স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ইতিহাস। আমরা দেখি—ভারতের পতনযুগে পূর্ব্বোক্ত "জয়গণের" ন্যায় জীবনবাদে বিতৃষ্ণ হইয়া সাধুজনেরা মোক্ষপ্রার্থী হইয়াছেন, ইহা শ্রুতি-বিরুদ্ধনীতি। জীবন বলিতে মর্ত্ত্যজীবনই নহে। আমি নির্ব্বিশেষ জীবনের কথাই বলিতেছি। জীবন হইতে মুক্তির জন্য যে আকুতি, তাহা সত্য পথ নহে, বিপথ। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন শিষ্টজন এই পথেই চলিয়াছেন। তাঁহারা মহাজন বলিয়া পূজিত হওয়ায় ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের চিত্ত এই ভ্রান্তপথেই আকৃষ্ট করে। এইজন্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা আজ কেহ প্রত্যয় করিতে পারে না। অথচ ধর্ম্মের আকর্ষণমুক্তও কেহ নহে। অতএব ভারতীয় সংস্কৃতি আজ বিশৃঙ্খল ও জটিল সমস্যাপূর্ণ।

ধর্ম্ম জীবনের জন্যই। ধর্ম্ম আমাদের শাশ্বত সুখ দেয়, শান্তি ও গতি দেয়; ধর্ম্ম—কর্ম্মের পবিণতি। মানুষ প্রথমেই ধর্ম্মের সন্ধান পায় নাই, কর্ম্মই পাইয়াছিল। কর্ম্ম করিতে করিতেই তাহারা বুঝিয়াছিল, কোন্ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ, কোন্ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ নহে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিয়াছিল—যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই অভ্যুত্থানেব হেতু, তাহাই অমৃত। তাই মানবজাতি ধর্ম্মামৃতে অভিষিক্ত হইয়া জীবনকেই শাশ্বত বলিয়া স্বীকার

করিয়াছিল। এই ইতিহাস ভারতের অভ্যুত্থান যুগের। তারপর ধর্ম্ম-বৈকল্যে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়; জাতির এই পতনযুগই আমাদের সম্মুখে। এই যুগে কি ধর্ম্ম, কি ধর্ম্ম নহে, এই বিচার লইয়া মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ক্রমে মতভেদে জ্ঞানপার্থক্যে জনগণ নানাবিধ শাস্ত্র প্রচার করিতে থাকে। জ্ঞানপার্থক্য নিবন্ধন জাতি কর্ম্মবিপর্য্যয়ে পরস্পর বিদ্বেষী হইয়া জীবনবাদের বেদী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। এই অবস্থাই আমাদের আসিয়াছে। দলাদলি আজ সর্ব্বক্ষেত্রে। মতামতের অনৈক্য পুরা মাত্রায় রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে বার রাজপুতের তের হাঁড়ির ন্যায় আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়া দিতেছে। দুর্দ্দিনে এমনই হয়। সুদিনের আয়ুঃ শেষ হইলে, মৃত্যুলীলার এই লক্ষণ অনিবার্য্য। কিন্তু জীবন-সূত্র ছিন্ন হইবার নহে, আবার পুনরুত্থানও অবশ্যম্ভাবী।

আমি অধঃপতনের প্রকরণ প্রদর্শন করিয়া এবার অভ্যুত্থানের অব্যর্থ বিজ্ঞানের কথা বলিব।

মতভেদে বুদ্ধিভেদ হয়। যে মত পুরুষের, সে মত জন্মাদিজনিত অশুদ্ধিগ্রস্ত। এইজন্য ভারতের জাতি শ্রুতি ভিন্ন অন্য মত গ্রহণ করিত না। শ্রুতি অপৌরুষেয় এবং শাশ্বত। শ্রুতি প্রমাণ ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ। যাঁহারা শ্রুতি-বিরুদ্ধ-নীতি আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব মত-প্রাধান্য রক্ষাকল্পে সম্প্রদায় সৃজন করেন, তাঁহাদের ভিত্তি ধর্ম্ম নহে—অথচ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বলিয়াই তাহা অভিহিত হয়। এইজন্যই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিদ্বেষ, যত দম্ভ, এমন সাধারণ ক্ষেত্রে নাই। বিপর্য্যয় আশ্রয় করা হেতুই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কাজেই এই সকল ধর্ম্ম-মত-বৈচিত্র্যে মানুষ সনাতনধর্ম্মহীন হইয়া বাক্য, মন ও কর্ম্মজনিত দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে; তারপর নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জাতিকে অবসাদগ্রস্ত করে।

নির্ব্বেদের মাত্রা যত ঘনীভূত হয়, ততই বাক্য, মন ও কর্ম্মজনিত দুঃখ হইতে মুক্তির জন্য মানুষের মনে বিচার-শক্তি জাগ্রত হয়। বিচার হইতেই বৈরাগ্যের আবির্ভাব। বৈরাগ্যের সমুজ্জ্বল অগ্নিশিখায় গলদের সন্ধান মিলে। কোন্ দোষে জাতির অধঃপতন, ইহার অবধারণ হয় জ্ঞানে। জ্ঞানবান সনাতনধর্ম্মী সাধুজন সমষ্টিবদ্ধ হইয়া পতনযুগের অজ্ঞান-ঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া, আবার জাতিকে অভ্যুদিত করার নূতন আলোক প্রদর্শন করেন।

এই প্রকরণ লক্ষ্যভেদে বিপরীতগামী হয়। মোক্ষ যদি লক্ষ্য হয়, তবে নির্ব্বেদের প্রেরণায় দুঃখ-বিষয়ের বিচার করিতে গিয়া যে বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হয়, সেই বৈরাগ্য তাহাকে জীবন-বিমুখ করিবেই। কিন্তু জীবনবাদী এই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, জাতীয় জীবনের অধঃপতনের হেতুবাদ আবিষ্কারের জন্য ঋতময় জ্ঞানের আগুন প্রজ্জ্বলনপূর্ব্বক মানবতার জয়কেতন উড়ায়। ভারতের শাস্ত্র ও সংস্কৃতির পরিপন্থীরূপে অজ্ঞানজনের প্রচারিত ধর্ম্মমতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহারা জাতির মৌলিক সংস্কৃতিমূলক জীবন-নীতিই প্রবর্ত্তন করে।

আমি ভারত-সাধনার সকল পর্য্যায় কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করিয়াছি। কোন পর্য্যায়ের প্রতি আস্থাহীন হই নাই। কিন্তু সকলেরই সীমা থাকায়, সব কিছুই অতিক্রান্ত হইয়াছে; শেষে উদাত্ত কণ্ঠেই বলিব—বেদ আমাদের শাস্ত্র। বেদের বাণী সত্যই অপৌরুষেয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরম বিজ্ঞান বেদেই আছে। এই বেদধর্ম্ম আত্মগোপন করিলেও ইহা যুক্তিযুক্ত। বেদধর্ম্মের অসাধারণ জীবন দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল নয়। এই অপার্থিব সংস্কৃতির ইতিহাসও আছে এবং ইহা বিজ্ঞান-সঙ্গতও।

দেবজননি ভারতভূমি! তোমার ক্রোড়ে এমন শত শত সন্তান কি জন্মে নাই মা, যাহারা ভারতীর দুয়ারে নতজানু হইয়া, তোমার বরদৃপ্ত টীকা ললাটে ধারণ করিয়া হাঁকিয়া বলিবে—'আমরাই সেই অমৃতের পুত্র! নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই জাতির পুনর্জ্জন্ম আমরাই আনয়ন করিব। আমরা জানি, ধর্ম্মের লক্ষ্য মোক্ষ নহে—জীবন। নির্ব্বিশেষ জীবন। অখণ্ড ভাগবত জীবন!!'*

* ১৩৪৮ সালের প্রবর্ত্তক হইতে রেণুকণা ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

সম্পাদকীয়

যুগভূমিকায় সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলাল :

এ যুগের যে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, যে অর্থ, সমাজ ও সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাত, যে পুঞ্জীভূত সঙ্কটময় জীবন-সংগ্রাম তার পরিপ্রেক্ষিতে আপাতঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শ্রীমতিলালের জীবন ও কর্ম্ম, তাঁর সুদীর্ঘ সাধনা ও দর্শনের বুঝিবা কোন সার্থকতাই নাই। মানব-ইতিহাসের তরঙ্গায়িত ধারা অবরুদ্ধ হইয়া নাই, বহিয়াই চলিয়াছে—কখনও ঋজু, কখনও কুটিল গতিতে। চলমান ঘটনাপ্রবাহের নিরিখটি নির্ভর করে দৃষ্টিকোণের উপর এবং এই দৃটিকোণের পার্থক্যই অবধারণেরও তারতম্য ঘটায়। যে মরমী দৃষ্টিকোণ অনুষ্ঠান-আঙ্গিকের গভীরে সত্তার সন্ধান পায় তাহা আজও অস্বচ্ছ বলিযাই মতিলালের জীবন-সাধনার তাৎপর্য্যটি এখনও পর্য্যবেক্ষণের আওতায় আসিতে পারে নাই।

বিগত দু'শো বছরের বাংলার নব-জাগৃতির কোন মৌলিক নিগূঢ় ও অখণ্ড ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই—যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ড ও প্রাসঙ্গিক মাত্র। ইহাতে এই নব জাগরণের মূল সুরটি, জাতীয় সত্তার অভিব্যক্তির অন্তরঙ্গ অভিসন্ধিটি ধরা পড়ে নাই—কোথাও কোথাও পড়িলেও তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট, ক্ষেত্র-বিশেষে কার্পণ্য কুণ্ঠিতও বলা চলে। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস', শ্রীযোগেশ বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ অখণ্ড ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে সহায়ক গ্রন্থ বলা যায়, কিন্তু বাংলা তথা ভারতীয় রেনেসাঁর মূল মর্ম্মটি উহাতে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মোহিতলাল মজুমদারের 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে উহার আভাসমাত্র মিলে। ভূপেন দত্ত, বিনয় ঘোষ প্রমুখ আরও অনেকে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপর গ্রন্থ লিখিয়াছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে। বাংলার মর্ম্মে ফল্গুর মত প্রবাহিত অধ্যাত্ম-জাতীয়তার সুরটি উহাতে প্রস্ফুট হয় নাই—হয় নাই সম্ভবতঃ এখনও উহা অস্পষ্ট বলিয়াই। এ যুগের ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের রচনায় একটা দরদী মন ও সংস্কৃতিপ্রাণতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনের আদিযুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সুবৃহৎ 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থ সামগ্রিকতাব দিক দিয়া সার্থক সৃষ্টি। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপ, "বাংলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালী কখনও মানুষ হইবে না"—অনেকখানি পূরণ করিয়াছে। তাৎকালিক ঐতিহাসিক রচনা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একদা খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "বাংলার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, বাংলার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র।"

বাংলার সত্যকার ইতিহাস মিলিবে বাংলার মৌলিক মনস্বী, স্বকীয় প্রতিভাধর ও দিব্য জীবনাধার গুরুমণ্ডলীর সাধ্য ও সাধনার অবগাহনে। ইঁহাদের জীবনী লিখিত ও পর্য্যালোচিত যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে—দেশ ও জাতিসত্তার অভিব্যঞ্জনার মূল সূত্রটি ধরিয়া নহে। এই সত্তাকে বাদ দিয়া বহিরঙ্গের বর্ণনা আধুনিক কালের রম্যরচনামূলক ইতিহাসের অন্যতম ত্রুটি। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথায় "জগতে যে-সকল জাতি আছে তা কেবল ব্যক্তির এক একটা রাশি নয়, প্রত্যেক জাতির এক একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। প্রত্যেকের একটা নিয়তি আছে, সে নিয়তি নির্ণয় করতে হলে তার অতীত ইতিহাসের প্রতি সংযম ও শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টিপাত করতে হবে।"

একটা জাতির বিশেষ ভারতবর্ষের সত্যকার ইতিহাস বলিতে আমরা এই অলক্ষ্য সংগুপ্ত সত্তার বিকাশ-ব্যঞ্জনার ইতিবৃত্তই বুঝিব। অন্যথায় জাতীয়

ইতিহাস শুধু মিথ্যা আর মেরুদণ্ডহীন হইবে না, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া জাতিকে দিশাহারাই করিবে। রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়ই বলি "বনস্পতিকে বাহির থেকে দেখি ডালপালা, পত্রপুষ্প। যেটাকে দেখি না সেটা তার প্রাণদেবতা। তাকে ধরা যায় না। গাছের মর্ম্মস্থানে সে থাকে। সেটি না থাকলে গাছ মরে যায়। যেটা দেখা যায় না, তার যে সার্থকতা আছে তা মনে হয় না। সব কিছুর অন্তরের মধ্যে প্রাণদেবতাকে অনুভব না করলে সত্য দর্শন হয় না।" বাংলার জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুজ্য।

বিগত পাঁচশো বছরের ভাবময় বাংলার ইতিহাসে যেদিন এই সত্যদর্শনটি হইবে সেইদিন যুগভূমিকায় সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের স্থান ও দান কি তাহা সুনিশ্চিত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সেইদিনই আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য হইতে সমন্বয়ের অবতার রামকৃষ্ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, রবীন্দ্র-অরবিন্দ, প্রণবানন্দ প্রমুখ গুরুমণ্ডলীর সাধনার ধারাক্রমে যে জাতিসত্তাব নিয়তি মহামানব মিলন লক্ষ্যে পরিণতির পথে প্রবহমান তাহারই যুগপ্রকাশ শ্রীমতিলাল। মতিলালের সাধ্য ছিল অধ্যাত্ম-জাতীয়তা যাহারই পরীক্ষানিরীক্ষা তিনি একটা সমষ্টিব ক্ষেত্রে নীরব সমাহিত চিত্তে জীবনভোর করিয়া গিয়াছেন। পুণ্যভূমি ভারতে বিচিত্র জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-ভাষা-সম্প্রদায়ের মহামিলনমূলক পরীক্ষাগাবে যে মহতী সম্ভাবনাকে সম্ভবপব করিয়া তোলার এক উদার হৃদয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহাব ভিত্তি হইতেছে অধ্যাত্ম জাতীয়তা। ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্র হইতে এই অধ্যাত্ম-জাতীয়তার বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ প্রচেষ্টায় অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি জাতীয় জীবনবিকাশের বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রায়োগিক প্রযত্নে সঙ্ঘগুরুজী বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও স্বমহিমায় বিরাজিত। আগমীকালে ভারতে যাহা হইবে তাহারই ভূমিকা প্রস্তুতের প্রচেষ্টা তিনি কবিয়া গিয়াছেন। মানব-ইতিহাসের এক সর্ব্বোত্তম প্রকাশ আজ কালের যবনিকার আড়ালে অপেক্ষমান। ভারত-ইতিহাসের এই সুমহৎ সম্ভাবনাময় আয়োজন আজকের মানুষের প্রত্যক্ষের বাহিরে বলিয়াই উহা অবাস্তব কল্পনা নহে। কোনদিনই ইন্দ্রিয়জ দৃষ্টি উপস্থিতকে অতিক্রম করিয়া দেখিতে পায় না। কিন্তু ঋষি-দর্শন বর্ত্তমানের বাহিরে ভবিষ্যের গহনে প্রসারিত। ইতিহাসের গতি থামিয়া নাই, বর্ত্তমান প্রতিটি মুহূর্ত্তে অতীত হইয়া যাইতেছে—অনাগত সমাগত হইয়া সঙ্ঘগুরুজীর জাতীয় অভিসন্ধির সাধন ও সিদ্ধ করার ভূমিকাটি নিশ্চয়ই অনতিদূর আগামী কালে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

●

বিগত ইংরাজ আমলের বাংলার নব জাগরণেব প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটি প্রবৃত্তি লক্ষ্যে পড়ে। —এক ভাঙ্গার, দ্বিতীয় সংস্কারের, তৃতীয় নিজস্ব মৌলিক সুরটির যুগোপযোগী উপস্থাপনের। এই তৃতীয় ধারাটির বিশিষ্ট চিহ্নবাহক হইতেছেন বঙ্কিম, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ-রবীন্দ্র এবং বাংলার গুরুমণ্ডলীক্রমে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। সমসাময়িক সমস্ত চাঞ্চল্যের মধ্যে বাংলার সত্তার এই স্বকীয়তাতে প্রত্যাবর্ত্তনের লক্ষণটি দূরদর্শী চিন্তাশীল মনস্বী বিপিনচন্দ্রের মনশ্চক্ষে সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টিতে "From the very begining the modern movement in Bengal, though in its outer expression a movement of revolt against existing religious faiths and social institutions, was really in its soul and essence a movement of revival and return."

বিপিনচন্দ্রের এই সত্য দর্শন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "while others were the slaves of western ideals, his (Bipinchandra Pal) mind first caught the meaning of the sudden arising of India, first proclaimed the spiritual character of the movement, first discovered that it was not only the body but the soul of India that was awaking from the sleep of the ages."

আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীঅরবিন্দের ইঙ্গিতপূর্ণ এই আত্ম-সত্তার জাগরণের ইতিহাসটি এখনও ঠিক লিখিত হয় নাই, অথচ ইহাই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া

বিংশ শতকের পথ বাহিয়া পূর্ণ পরিণতির লক্ষ্যে চলিয়াছে। এই চলার পথেই সঙ্ঘগুরুজীর আবির্ভাব ও অবদান। এই অধ্যাত্ম গতির বেগেই ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও জাতীয়তা মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় "It is the Sanatan Dharma which for me is nationalism and that nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith." ইহাই অধ্যাত্ম-জাতীয়তা। সঙ্ঘগুরুজীর জীবনসাধনায় ইহারই বাস্তব রূপায়ণের একটা প্রযত্ন-প্রকল্প দৃষ্ট হয়!

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জাতীয় চেতনার বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গ ক্রমশঃ থিতাইয়া দেশমুক্তি সাধনার লক্ষ্যে একাগ্র হইয়া উঠে যাহারই ফলশ্রুতি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভিক অগ্নিবিপ্লব। জাতীয় চিত্ত এই বিপ্লবাগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া যে অমৃতের সন্ধান পাইল তাহাই দিব্য জাতীয়তা। বিপ্লবী মতিলাল তাঁর স্বদেশী যুগের স্মৃতি-চিত্র আঁকিতে গিয়া ইহার দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন: "এই নব জাগ্রত জীবনের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য প্রকাশের যুগ কালে একটু স্থির হইয়া আসিলে নবযুগের ঋষি দিব্য জাতীয়তার উৎসমূল মুক্ত করিয়া দিলেন, সে মন্দাকিনী ধারায় বাঙালী স্নিগ্ধ হইল, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের প্রশমনে জাতি অন্তর্ম্মুখী হইল।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দে নবযুগের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ এই অধ্যাত্ম-জাতীয়তার সঙ্কেতমাত্র দিয়া মুক্তি সাধনার প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে সরিয়া ভারতের একপ্রান্তে পণ্ডিচেরীতে আত্ম-সাধনায় সমাহিত হইলেন। তথাপি শ্রীমতিলালের ভরসা: "শ্রীঅরবিন্দের নিক্ষিপ্ত বীর্য্য অব্যর্থ ফল প্রসব করিবে। বাংলায় সে যুগ আসিবে—বাঙালী তাহার অপেক্ষায় দিন গুণিতেছে!"

ইহার পর হইতে শ্রীমতিলালের ও বিপ্লবী জীবনের ও ক্রমশঃ মোড়-পরিবর্ত্তন হইল। শ্রীমতিলাল শুধু বসিয়া বসিয়া দিন গণেন নাই, বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে এই অধ্যাত্ম-জাতীয়তার সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটাইয়া তুলিতে পরবর্ত্তীকালের অসহযোগ আন্দোলনের কলকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া চন্দননগর ভাগীরথী তীরে নিজেকে নিয়োগ করিলেন। এখনও ইহার আত্মপ্রকাশ তেমন-ভাবে ঘটে নাই যাহাতে যুগভূমিকায় সঙ্ঘগুরুজীর সুদূর-প্রসারী অবদান তৃতীয় পক্ষের নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে। তথাপি তাঁর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতার আলো, তাঁর প্রযোজিত ধার্ম্মিক, সামাজিক, আর্থিক পরিকল্পনা ও নীতি একদিন সর্ব্বমানবমিলনের অমোঘ দিগ্‌দর্শন দিবে।

●

ভারতে দেশ ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দেশাত্মবোধ ইংরাজ তথা পশ্চিমের অবদান—পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের ফলশ্রুতি। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' এই দেশাত্মবোধেরই ভারতীয় সংস্করণ—যে মন্ত্র বিংশ শতকের পাঁচটি দশক ব্যাপিয়া নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতারূপ ফল ফলাইবার সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' শেষ কথা নহে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহার প্রেরণাপ্রদ কার্য্যকারিতা স্বাধীনতা-উত্তর কালে কতখানি ফলপ্রসূ হইবে তাহা অবশ্যই চিন্তনীয়। ইতিমধ্যে উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সময়োপযোগী করিতে হইয়াছে। বিশ্বের সমগ্র জাতি, বিচিত্র ভাষা, ধর্ম্ম, মতবাদ যে ক্ষেত্রে আসিয়া মিলিয়াছে, সেই একত্রিত হরেকরকম জনসংঘট্টকে একাত্ম করিবার বীর্য্য কি 'বন্দেমাতরম্' দিতে পারিবে?

এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়াই বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের উদ্ভব। জীবিকা অর্থাৎ জীবন-সংগ্রাম-সমস্যার সমাধান ও ইহার সাম্য বিধান এই মতবাদের ভিত্তি। জীবনসংগ্রামের বিবর্ত্তন-ইতিহাসই মানুষ ও মানব-সভ্যতার ইতিহাস বলিয়া এ ক্ষেত্রে স্বীকৃত। উৎপাদন ও বণ্টন-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ ইহার উপকরণ। ইহাই ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বলিয়া সমাজ-বিজ্ঞানীদের অভিমত। এই মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শন বিশ্বের সর্ব্বকালের বৃহত্তম রুশ-বিপ্লব আনে। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র গত্যন্তর না পাইয়া এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিজাত বৈষয়িক সমাজতন্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছে। আমরা—অধ্যাত্ম-জাতীয়তায় বিশ্বাসীরা বলিব, আত্ম-

চৈতন্যের-জাগরণভিত্তিক অধ্যাত্ম-জাতীয়তার অভিব্যক্তি লক্ষ্যে বর্ত্তমান ভারত-রাষ্ট্রনীতি একটি পর্য্যায় মাত্র। অন্যথায় ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। ভারত-ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতার অভিসন্ধিও ইহা নহে। যেহেতু শাশ্বত ভারতবর্ষের মৌলিক লক্ষ্যপথে জীবিকা গৌণ—মুখ্য লক্ষ্য জীবন-চৈতন্য। জীবনধারণের প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক নিয়মে পশুরাও করিয়া থাকে। মনুষ্যত্বের—আত্মচৈতন্যের বিকাশই মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের কথায়—"জীবিকার লক্ষ্য কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে। সকল প্রয়োজনের উপরে সে।"

ভারতের স্বকীয় জাতীয়তার আত্মপ্রকাশের পথে বর্ত্তমান ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকে একটি পর্য্যায়মাত্র বলার হেতু আছে। ইহা আমাদের সমালোচনা মাত্র নহে। এই অধ্যাত্ম-জাতীয়তার স্বপ্নদ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দের জীবনসাধনা অনুধাবন করিলেই ইহা স্পষ্ট হইবে। শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রীয় মুক্তি-সাধনার কাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত,—মাত্র একটি দশক—বিংশ শতকের প্রথম দশক বলা চলে। কিন্তু উহা অত্যন্ত তাৎপর্য্যগর্ভ। আগামী কালের একটি মহৎ সম্ভাবনার বীজ তিনি এই সময়েই উপ্ত করিয়া যান—যাহা সমস্ত মানবমুক্তির হেতু হইবার সম্ভাবনা রাখে। শ্রীঅরবিন্দের বাংলার মুক্তি আন্দোলনে যোগদান, তাঁর কারাবরণ ও মুক্তি, 'ধর্ম্ম' ও 'কর্ম্মযোগিন' পত্রিকার সম্পাদনা ও নব দিব্য জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার, তাঁর 'Open letter to my countrymen', পরিশেষে চন্দননগরে শ্রীমতিলালের আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস ও পণ্ডিচেরীতে দিব্য জীবন ও নিখিল মানব মুক্তি লক্ষ্যে একান্ত সাধনার মর্ম্ম অবধারণ করিলেই অধ্যাত্ম-জাতীয়তার নিগূঢ় সঙ্কেতটি ধরা পড়িবে।

শ্রীঅরবিন্দের নব যুগ ও নব জাতির সৃষ্টি-সাধনার ইঙ্গিতটি তাঁরই কথায় বলি: "we have worshiped the country, the National Mother as God. That was well, that carried us far. But it was only a stage to bring the Europeanised mind back to spirituality. It was the worship of a *rupa*, an *usta* by which to rise to the worship of God in His fullness. We used the Mantra 'Bandemataram' with all our heart and soul and so long as we used and lived it, relied upon our strength to overbear all difficulties, we prospered. But suddenly the faith and the courage failed us, the cry of the mantra began to sink and as it rangled feelby, the strength began to fade out of the country. It was God who made it fade and falter, for it had done its work. A greater mantra than 'Bandemataram' has to come. Bankim was not the ultimate seer of Indian awakening."

শ্রীঅরবিন্দের অবধারণে বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বকীয় ভারত জাতীয়তার শেষ ঋষি নহেন, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রও ছিল একটা পরিবর্ত্তনশীল পর্য্যায়ের জন্য বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট। এই-জন্যই আমরা বন্দেমাতরমকে পশ্চিমী জাতীয়তার ভারতীয় সংস্করণ বলিয়াছি।

এখন প্রশ্ন হইল, বন্দেমাতরমের পরে নির্ভেজাল ভারত-জাতীয় মন্ত্রটি কি হইবে যাহা স্বাধীনতা-উত্তর পরিবর্ত্তিত ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পারসী, ইহুদী প্রভৃতি বিচিত্রকে একাত্ম ও প্রেমৈক্যবদ্ধ করিতে পারিবে? শ্রীঅরবিন্দই ইহার বীজমন্ত্র জাতির কর্ণে শুনাইয়া গিয়াছেন—"It is a national 'Atmasamarpana'—self-surrender that God demands of us and its must be complete—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—Then the promise will come true."

শ্রীঅরবিন্দ যদি এই অধ্যাত্ম-জাতীয়তার তত্ত্ব হন, শ্রীমতিলাল ছিলেন এই তত্ত্বের ভাষ্য। শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া বীজমন্ত্র শ্রীমতিলাল জীবনভোর সাধন ও সিদ্ধ করারই প্রযত্ন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতিলালের সাধ্য ছিল এই অধ্যাত্ম-জাতীয়তা এবং সাধন ছিল আত্ম-সমর্পণ। সদ্গুরুজীর জাতি ও জীবনদর্শনের নিগূঢ় চাবিকাঠি ইহাই। এই ভারত জাতীয়তার ক্রমাভিব্যক্তির

ইতিহাস যখন লিখিত হইবে তখন এ-যুগের ভূমিকায় সঙ্ঘগুরুজীর যে কি বিরাট্ অবদান তাহা অপরিহার্য্য-রূপেই ধরা পড়িবে।

●

সঙ্ঘগুরুজীর যুগ-ভূমিকাটি, তাঁর জীবন ও জাতি-দর্শন আকস্মিক নহে—ঐতিহাসিক ক্রমেই ইহা তাঁর সিদ্ধ স্বরূপে আশ্রয় পাইয়াছে।

১৮৮২ সালে শ্রীমতিলালের জন্ম। তাঁর জন্মের অগ্র-পশ্চাৎ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বিশেষ বাংলার নব জাগরণের প্রকৃতির দিক্-পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নববিধান-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র (১৮৮৪) এবং সনাতন ভারতীয় বিধানের পুনরুজ্জীবক ঠাকুর রামকৃষ্ণ (১৮৭৬) লীলা সংবরণ করেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সে-সময়কার উত্তেজনা-আন্দোলন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সমাহৃত হইয়া হিন্দুজগতে এক যুগান্তর আনয়ন করে যাহা পণ্ডিতাগ্রগণ্য শশধর চূড়ামণি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন ও শত তর্কযুক্তির অবতারণা করিয়াও করিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়েই সেই ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি-সাধনার বীজ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৬) রোপিত হয়। ১৮৮৬ সালেই সারা শতকের উত্তাল জাগরণ-চঞ্চল তরঙ্গ-ভঙ্গে নাকানি-চুবানি খাইয়া বিদ্রোহী বিজয়কৃষ্ণের জীবনের মোড় পরিবর্ত্তিত হইয়া যুগগুরুর আসনে সুপ্রতিষ্ঠা পায়। এই যুগগুরুর কণ্ঠে চিরকালের ভারতবর্ষ পুনশ্চ স্বকীয়তার ঘোষণা করে: "শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন যদি অন্য পথ ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় তাহাও যাইবে না। শাস্ত্র, ঋষিবাক্য, সদাচার, মহাজনদিগের আচরণ, ইহা ভিন্ন আর সবই অসার।"

ইহাই বিপিন পালের ভাষায় Revival & Return.

গত শতকের শেষার্দ্ধে বাংলার চিত্তাকাশে আত্মস্থ হইবার এই যে চিদ্‌কম্পন, ইহা কি শুদ্ধ সত্ত্ব বালক মতিলালের চিত্তে নীরব স্পন্দন তোলে নাই?

সমসাময়িক কালের আর দুইজন যুগন্ধর পুরুষ ব্রহ্ম-বান্ধব আর বিবেকানন্দ। ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়া খৃষ্টান হইয়াও পুনরায় মাথা মুড়াইয়া হিন্দুই হইলেন না, ভারত জাতীয়তারও হইলেন বলিষ্ঠতম প্রবক্তা। রামকৃষ্ণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিবেকানন্দের শক্তিগর্ভ জীবনের সংবেগ বিশ্বে ভূ-কম্পন তুলিল। তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রাণের দৃপ্ত ঘোষণা: "We must conquer the world or die. There is no other alternative."

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ লীলা সংবরণ করেন ১৯০০ সালে এবং বিবেকানন্দ ১৯০২-এ। শ্রীমতিলাল তখন ২০।২২ বৎসর বয়স্ক যুবক। এই সময়েই বাংলার মুক্তি-সাধনায় শ্রীঅরবিন্দের সক্রিয় যোগদান এবং ১৯১০-এ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ। ত্রিশ বৎসরের মতিলালের জীবনেরও বিপ্লব হইতে ক্রমশঃ দিক্‌পরিবর্ত্তন ঘটিল। জীবনের 'মিশন'-এর সন্ধান তিনি পাইলেন। সে পথের কথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন: "এ দেশ চণ্ডী-দাসের, নিমাইয়ের। এ দেশ রামকৃষ্ণের। শক্তি ও প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় মিলিত হইয়াছে রঘুনন্দনের ন্যায়ের বিধান। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান কবিয়া উঠিলেন দুই মহাপুরুষ। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ। আমাকে এই দুই ক্ষেত্রের ধূলি কুড়াইয়া মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে ঈশ্বরবিধানে। আজ এই দুই মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। তিন ক্ষেত্রেরই কর্ম্ম অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।"

অতঃপর প্রায় দুইটি দশক ব্যাপী মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনও শ্রীমতিলালকে ভারতাত্মার এই অসমাপ্ত কর্ম্মকে সমাপ্ত করার সাধন-নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই—এমন কি গান্ধীজীর আহ্বান সত্ত্বেও।

যুগ-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অদ্বৈত বেদান্তী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন: ধর্ম্ম নয়, রুটি—রুটিই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রয়োজন।.....কি ধর্ম্ম তুমি ভারতকে শেখাতে পার, সে এমনিতেই মহৎ ও পবিত্র। দাও তাকে কর্ম্মবিস্তারের সুবিধা। কলকারখানা বসাও, জীবিকার ক্ষেত্রে ডাক দাও, তা যদি না পার, ধর্ম্মের ধ্বজা আর তুলতে যেও না।"

ভারতবর্ষে জীবনবোধ ও জগত-দর্শনের যে-ত্রুটির জন্য জাতীয়তা সংহত হইতে পারে নাই, যে প্রাণের অভাবে

এই বিশাল ভারত বার বার বিদেশীর পদানত হইয়াছে তাহারই প্রতিবাদ স্বামীজির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে নৈষ্কর্ম্ম ও মুষ্টিভিক্ষা প্রশ্রয় পাইয়া ভারতে ধর্ম্ম শুধু বীর্য্যহীন হয় নাই, হেয়ও হইয়াছে। এই বিবেকানন্দ-ভাবনার বাস্তব রূপকৃৎ হিসাবে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিগঠনের ক্ষেত্রে সঙ্ঘগুরুজী আগামীকালে আদর্শ হইয়া থাকিবেন। ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে কলকারখানা বসাইয়া, ব্যবসা পত্তন করিয়া, সন্ন্যাসীকে জীবিকার ক্ষেত্রে পাঠাইয়া তিনি স্বামীজির জাতি-সাধনার অসমাপ্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করারই প্রয়াস করিয়াছেন। ইহা কি শুদ্ধ জাতিগঠনে ভারতাত্মারই যুগ-প্রকাশের সাক্ষ্য বহন করে না?

শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড জাতি-সাধনার মূল মন্ত্র—অধ্যাত্ম-জাতীয়তা ও আত্মসমর্পণ যোগেরও বাস্তব রূপকৃৎ ছিলেন শ্রীমতিলাল। বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-গোত্রের এক সমষ্টি-জীবনে শ্রীমতিলাল এই অধ্যাত্ম জাতীয়তার গঠন দিবার নীরব সাধনা আমৃত্যু করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৪ সালের অক্ষয় তৃতীয়ায় তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ইহার সিদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সালে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ১৯২৫ সালে সমাগত সাধকমণ্ডলীকে আত্ম-সমর্পণমূলক যোগদীক্ষা দিয়া তিনি সঙ্ঘগুরুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৯-এ এই যোগের সিদ্ধ রূপ প্রথম প্রকট হয় তাঁরই সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর শুদ্ধ আধার আশ্রয়ে। এই তথ্য শ্রীমতিলাল তাঁর দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন: "১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২২-শে অগ্রহায়ণ সৃষ্টির বীর্য্য প্রকাশ হয় যোগাশ্রয়ে। যোগ আশ্রয় পায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। দ্বাদশ বর্ষ পরে যোগমাতা দীক্ষামন্ত্র দিতে আসন গ্রহণ করেন আশ্রমের বিল্ব-মূলে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের যোগকে তিনিই সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধ করেন।** সঙ্ঘের সৃষ্টি বস্তুর যোগাযোগে নহে। যুক্তি লাভ করিয়াই আজিকার সৃষ্টি মূর্ত্ত হইয়াছে। ইহার রূপান্তর আছে, কিন্তু এই যোগপ্রকাশের লয় নাই। সঙ্ঘের অমর ইতিহাস নষ্ট হইবার নহে।"

১৯৩২-এ এই ভাবময় যোগসৃষ্টির বাস্তব ও বিস্তৃত পরীক্ষাক্ষেত্র হিসাবে কর্ম্মচঞ্চল মহানগরী কলিকাতার বুকে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তক ট্রাষ্টের প্রতিষ্ঠা। এই সময় হইতেই সঙ্ঘগুরুজীর দ্বন্দ্বময় জীবন সর্ব্বপ্রভাব মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ অভিনব এক গঠনমূলক মৌলিক খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এমনকি শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশিত আত্মসমর্পণ যোগও জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের সমন্বয়ে সনাতন ভারতের শীলসম্মত ভারতীয় ঋষি-সিদ্ধ পথে এক অভিনব রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। সেই গোঁসাই বিজয়কৃষ্ণের—"শাস্ত্র, ঋষিবাক্য ভিন্ন আর সবই অসার"—যুগোপযোগী পুনরাবির্ভাব দেখা যায় সঙ্ঘগুরুজীর মাধ্যমে। সব্যসাচী ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন মিশনের—অধ্যাত্ম-জাতীয়তার সিদ্ধিকল্পে তিনি ছিলেন অনন্ত উন্মাদ। ইহারই অনুকূলে শ্রীমতিলাল শ্রুতির ত্রিপ্রস্থানের ভাষ্য করিয়াছেন, গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখিয়াছেন, অর্দ্ধশতেরও অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া প্রতিদিন প্রভাত-বাণীতে একটা সমষ্টি জীবনক্ষেত্রে আত্ম-সমর্পণ-ভিত্তিক অধ্যাত্ম-জাতীয়তার সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে তিনি যে বস্তুতান্ত্রিক যুগসম্মত আঙ্গিকে জাতীয় জীবনধারা বিকাশের সাধন-বিজ্ঞান, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, তত্ত্ব-দর্শন দিয়া গিয়াছেন তাহা একদিন সাম্যবাদের ঋষি কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' (The Capital) গ্রন্থের মতই সুনিশ্চিত সমাদৃত হইবে। যুগ-ভূমিকায় সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল যে কি এবং কতখানি ছিলেন তাহা অনতিদূর অনাগতকালে নিশ্চয় নির্ণীত হইবে।

●

বিগত শতকের ধার্ম্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর মুক্তিসাধনা বিশেষ বিপ্লব যুগের মর্ম্মগত অভিসন্ধি ছিল ব্যক্তি ও সমষ্টির পূর্ণাঙ্গ জীবন-গঠনের। এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বলিতে সঙ্ঘ-গুরুজীর ধারণা ছিল: "শুধু শাস্ত্রবাক্য নয়, আহারে-বিহারে জীবনের সর্ব্বাচারের মধ্য দিয়া ঈশ্বর-চৈতন্যের প্রকাশ—ঈশ্বরকে, ভূমাকে, বৃহৎকে জীবনের সর্ব্বস্তরে অনুভব করা।" এইরূপ ভাগবত চেতনার উপর প্রতিষ্ঠ জীবনের সমষ্টি যদি জাতির মধ্যে আবির্ভাব ঘটে ও রাষ্ট্রকর্ণধার হয় তাহা হইলে অধ্যাত্ম-জাতীয়করণ সহজ ও সুগম

হইতে পারে। উপরিচর রাজনীতি-আচ্ছন্ন মানসে ধারণাটি এখনও হয়তো আকাশ-কুসুমের মত প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহা ব্যতীত আর কোন্ জীবন ও জাতিদর্শনে ভারত মানব-মহামিলনের কেন্দ্র হইতে পারে? বিশ্ব-মানবের আলো ও অমৃতের দিশারীইবা আর কোন্ খণ্ড-চেতনায় সম্ভবপর? এক অখণ্ড অস্তিত্ববোধে, এক সর্ব্বব্যাপী সত্তার সম্বন্ধে সত্তান্বিত না হইলে খণ্ড বিচ্ছিন্ন মানুষের প্রেমৈক্যবদ্ধ ও একাত্ম সম্বন্ধান্বিত হওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নাই। সাময়িক ভাবে প্রবৃত্তিমূলক জাতীয় জীবন বিকাশের সাম্য আর সুবিধা অস্ত্র আর আইনের দ্বারা সম্ভবপর হইলেও, উহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না।

এযুগের একজন মনীষির দৃষ্টিতে এই পূর্ণাঙ্গ জীবনের তথ্য ও সঙ্ঘগুরুর জীবনদর্শনের মর্ম্ম পরিচয়টি ধরা পড়িয়াছিল। সঙ্ঘগুরুজী বিদেহী হইলে (১৯৫৯) মনীষী সমালোচক অতুল গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন: "সে যুগ (এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশক) কিছু মানুষকে গড়েছে যাঁরা অসামান্য, সকল দেশের অসামান্যদের মধ্যেই অসামান্য। তেমনি একজন অসামান্য মানুষ ছিলেন মতিলাল রায়। তাঁর ভাব, কর্ম্ম ও মননের জগৎ যেমন বিস্তৃত, তেমনি বিচিত্র। যে পূর্ণ জীবন, ব্যক্তি ও সমাজের, সে যুগে বাংলাদেশ কল্পনা করেছিল, মতিলালের জীবন তার আদর্শ।** জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের কথা আমরা অতি সহজে বলি। কিন্তু সে সমন্বয় অতি অল্প মানুষের, এমন কি অতি অল্প মহাপুরুষের জীবনেও প্রকৃত দেখা যায়। মতিলাল রায় ছিলেন সেই অল্প মানুষের একজন।"

বাংলার পূর্ণ জীবন-গঠনের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হইবে না। এদিক দিয়া যুগ-ভূমিকায় শ্রীমতিলালের অনন্য অসামান্যতা কালই স্পষ্টতর করিয়া তুলিবে।

ভারতবর্ষ

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই।...ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।...ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম—তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবন ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।...এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘকায় আজানুলম্বিত ভুজ, শ্বেতশ্মশ্রু আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-ঘর ও দালান সবেগে অতিক্রম করতেন, আমরা ছাত্রদল তখন পাশে দাঁড়িয়ে তাঁহার সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শিতা ও শিশু-সুলভ সরলতা স্মরণ করে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করতাম। অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তার সঙ্গে তাঁহার ছিল অনাড়ম্বরতা, বিনয় ও দাক্ষিণ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কোন ব্যক্তি দীর্ঘ বৎসর ধরে হাজার হাজার ছাত্র ও অধ্যাপকদের এমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন কখনও পান নি।

বিদেশ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কমিশনের সভাপতিরূপে স্যাডলার বাংলাদেশে এলেন। আচার্য্য শীলের সঙ্গে তিনি তুলনা দিলেন অ্যারিষ্টটলের। দার্জ্জিলিঙের পর্বত নিবাস তাঁহার নিকট নূতন বেটায়া পইকিল হয়েছিল, স্যাডলার হলেন শিষ্য ও গুরু হলেন অ্যারিষ্টটলস্বরূপ ব্যাখ্যান-ব্রতী আচার্য্য শীল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯১১ সালে যখন ভারতীয় অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন লেখার খসড়া (The foundations of Indian Economics) নিয়ে তাঁহার বৈঠকখানায় কম্পিত হৃদয়ে উপস্থিত হলাম তখন সুগভীর পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁহার হাস্য-সমুজ্জ্বল অকৃত্রিম ঔদার্য্য ও দাক্ষিণ্যই আমায় অভিভূত করেছিল। তখন হতে দশ বৎসর যাবৎ তাঁহার নিকট যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী পেয়েছিলাম তাহা আমার চিন্তাজীবনের অমূল্য সম্পদ।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত শিষ্য ও ভক্ত আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে তুলনামূলক সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের সূত্রপাত করেন তাঁহার দুইটী মৌলিক গবেষণায়। একটী বৈষ্ণব ও খৃষ্টান ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Studies of Vaishnavism and Christianty) ইতালীর প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে পঠিত হয়েছিল। আর একটি মানবজাতির উদ্ভব (Race Origins) রোম নগরে প্রথম বিশ্বমানব-সম্মিলনে পঠিত হয়। তাঁহার গবেষণার মূল সূত্র হচ্ছে এই যে, মানবের বা সমাজের অভিব্যক্তি এক পথ অনুসরণ করে না। বিভিন্ন পটভূমিতে তাহা নানা আকার ও ভঙ্গী গ্রহণ করে। সুতরাং ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা এক সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে না করলে সমাজবিজ্ঞানের কোন তত্ত্বই ব্যাপক ও সার্ব্বজনীন হতে পারে না। আধুনিক বিভিন্ন সমাজবিদ্যা একদেশদর্শী। এই চিন্তাসূত্র অবলম্বন ও বিস্তার করে আমার (Principles of Comparative Economics) তুলনামূলক অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Democracies of the East) গ্রন্থ রচিত হয়। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের এই ধারণাই প্রবল ছিল যে, পাশ্চাত্য কৃষ্টির ধারা ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি অনুসরণ করেই প্রাচ্য প্রগতির পথে অগ্রসর হবে। এ ধারণাটার এখনও সম্যক্ সংশোধন হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে নানা দিক হতে নতুন মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাহায্যে এক বিরাট পক্ষপাতহীন, তুলনা-মূলক সমাজ-দর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিশ্ব ভুলে না যায়, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের প্রথম দিগ্দর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করতে।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ যৌবনে সাহিত্য-সমালোচনা (Esays in Literary Criticism) সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লেখেন। মানবহৃদয় কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে একই চিন্তার স্তরে কখনও বিক্ষোভ, কখনও শান্তি ও স্তব্ধতার ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকুশলতা খোঁজে তিনি তাহা দেখিয়েছেন। একটা মহনীয় দার্শনিক কাব্য তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। সংখ্যাতত্ত্ব (Theory of Numbers) সম্বন্ধে তাঁহার আর একটী পুস্তক অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য নিপুণতার সাক্ষ্য দেয়।

বিভিন্ন বিষয়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল কয়েক বৎসর ধরে আলোচনা করে তিনি একটী বিরাট রিপোর্ট লেখেন এবং আমাদের কিছু কিছু পড়ে শুনান। সংখ্যা-বিজ্ঞানের (Statistics) নানা

নূতন সূত্র তখন তিনি আবিষ্কার করেন। রিপোর্টটা খুব সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়। অনেক মৌলিক গবেষণা নিদারুণভাবে লুপ্ত হয়ে গেল।

আচার্য্য শীলের প্রাচীন হিন্দু পদার্থ-বিজ্ঞানেরও (Positive Sciences of the Ancient Hindus) এই দশাই ঘটতো। তাহার কয়েক পাতা একেবারে কীটদষ্ট হয়েছিল। বইখানা আচার্য্য শীলের আলমারী হতে উদ্ধার করি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও আমি। পরে তা' বিলাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

মহীশূরে যখন তিনি উপকুলপতি ছিলেন তখনদেশের কি প্রকার শাসন বিন্যাস প্রজাসাধারণের উপযোগী হয়, তাহাদের মধ্যে কর্ম্মদক্ষতা জাগায় এবং অতীত ও বর্ত্তমান পঞ্চায়েৎ শাসনধারার সমন্বয় সাধন করিতে পারে, এ সম্বন্ধে তিনি একটী গভীর চিন্তা প্রসূত রিপোর্ট মহীশূর দরবারে পেশ করেন। ঐ রিপোর্ট বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই।

আচার্য্য শীলের চিন্তাধারার বিশেষত্ব এই যে, তিনি যে কোন বিচারই হউক না কেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সমাদর করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক মানবিক আধারে তাহাদের সমন্বয়ের পথ উন্মুক্ত করতেন। তাই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা গবেষক, জিজ্ঞাসু ও রসিক তাঁহার বৈঠকে নিয়মমত আসতেন। আমরা বুঝতে পারতাম, যত জটিল ও সূক্ষ্ম সমস্যা উত্থাপন করা হউক না কেন, সংশয় মিটবে, সমাধান আসবেই। সুপণ্ডিত শিশিরকুমার মিত্র, হরিদাস ভট্টাচার্য্য, সুশীল-কুমার মিত্র আসতেন নানা প্রশ্ন নিয়ে, আরও আসতেন বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত মহলানবীশ ও সাহিত্যিক অজিত চক্রবর্ত্তী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে কম আলোচনা করেন নি। বিপিনচন্দ্র পাল তখন নিউ ইণ্ডিয়া ও হিন্দু পত্রিকা সম্পাদন করতেন। তিনিও কত না কঠিন রাজকীয় সমস্যা নিয়ত উত্থাপন করতেন। গভীরভাবে ভাল-বাসতেন তিনি মানবকল্যাণব্রত, লোকসেবা। লোকশিক্ষা বিস্তারকল্পে যখন কলিকাতায় ও মুর্শিদাবাদে আমি বহু সংখ্যক শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় খুলি, যেগুলি অচিরেই পুলিশের নজরে ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপে আসে তখন তিনিই ছিলেন আসল পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা।

অমন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আর (polymath) এ যুগে পৃথিবীতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নি। গ্রীসের আরিষ্টটল ও মধ্য ইউরোপের অ্যাকিইনাসের সমকক্ষ তিনি। আগামী যুগে তাঁহার তুলনামূলক গবেষণ-রীতি সমাদর লাভ করলে মানবজাতির কল্যাণ হবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার রচনাবলী কিছুদিন পূর্ব্বে আমি নানা বিভাগে সাজিয়ে কলকাতায় রেখে এসেছি, সেগুলি যাতে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

বর্ত্তমান ভারতের এই শ্রেষ্ঠ মনীষী, মানবজাতির আধুনিক চিন্তাধারার একজন প্রধান যুগনির্দ্দেষ্টার প্রতি ভারতবর্ষ সমুচিত শ্রদ্ধা ও সমাদর দেখান নি। বার বার তিনি বলতেন "কালোঽয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী"। শিল্পী বিধাতা মানবচিন্তাপটে রেখা আঁকছেন কত বিচিত্র করে, নূতন রঙে সমগ্র জগতের কত দেশের কত মনীষির তুলিকা দিয়ে। কোন রেখা যদি অস্পষ্ট থাকে বা পূর্ণ না হয়, আরেকজন মনীষী আসবেন তা স্পষ্ট করতে, পূর্ণ করতে আগামীকালে। পৃথিবীতে মৌলিক-তার দাবী বা গর্ব্ব কেউ না করে, এই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক দেবদুর্লভ আধ্যাত্মিক নম্রতা—যার সামনে কীটাণুকীট আমরা স্তব্ধ, নতজানু হয়ে যেতাম। বিদ্যার আস্ফালন কেউ যেন না করে, বিদ্যা যেন সকলকেই বিনয় দেয়। তৃণের মত সুনীচতা, তরুর মত সহিষ্ণুতা, নিজকে সম্মান না দিয়ে অপরকে মান দেওয়া, এই হচ্ছে কেবল ধর্ম্মের নয়, অধ্যাত্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা। আচার্য্য শীল কি বিদ্যানুশীলনে, কি ধর্ম্মসাধনে ও কি সমগ্র জীবনে তাহাই দেখিয়েছিলেন।*

* আচার্য শীলের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত বক্ষ্যমান রচনাটি কমিটির সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর]

মহাশিল্পী পৃথুল মহাস্থান নগরে নিজের পর্ণকুটিরে সামান্য শয্যায় শায়িত ছিল। গবাক্ষপথ দিয়ে তন্দ্রালু নয়নে অবলোকন কোরছিল তাবাভরা কৃষ্ণপক্ষের আকাশ। ঐ অসংখ্য তারার মতন তার জীবনেরও অসংখ্য ঘটনার কথা ঝিক্‌মিক কোরছিল তার মানস-আকাশে। সামান্য কারিগর থেকে আজ সে মহাশিল্পী-রূপে প্রতিষ্ঠিত। মান, যশ, প্রতিষ্ঠা সবই তার করতলগত। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ঐশ্বর্য ?—না, ঐশ্বর্য, অর্থ তার কাম্য নয়। এই পর্ণকুটিবেব যৎসামান্য সামগ্রীর মধ্যেই সে সন্তুষ্ট। অনাড়ম্বর জীবন আর চিরসুন্দরের ধ্যানই তার চির-কালের কাম্য। তবু···হাঁ, সে ভুল কোরেছিল। রাজকুমারী চার্বীকে সে চিনতে পারেনি। না জেনে সে চার্বীর সঙ্গে কি বালসুলভ ব্যবহারই না কোরেছেন! ছি! কিন্তু কি অসীম মমতাময়ী ঐ চার্বী!—পৃথুলের এই ছেলেমি সে হাসিমুখে সহ্য কোরেছে—রাজকুমারী হোয়েও সাধারণ নারীর মতন তার কার্যে সহায়তা কোরেছে। অথচ···রাজকুমারী চার্বীর কাছে পৃথুলের লজ্জার অবধি নেই—মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনই পৃথুল জানতে পারে চার্বীর আসল পরিচয়। তাই সে সকলের অলক্ষ্যে উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই পৃথুল নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে তার এই পর্ণকুটিরের গণ্ডীর মধ্যে। তার কুটিরে লোকজনের আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ। নিঃসঙ্গ জীবনে শিল্পীসুলভ চিন্তার মধ্যেই কাটে দিন। এরই মধ্যে শরতের এক ঝলক রৌদ্রের মতন এসেছিল উগ্রতারা। প্রশ্ন কোরেছিল সে, দেব, এই নিঃসঙ্গ নির্জন-বাসের কারণ কি ?

পৃথুল বোলেছিল, তুমি ভুল কোরছ উগ্রতারা। এ আমার নিঃসঙ্গ নির্জনবাস নয়—এ আমার নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামকাল। তুমি তো জানো, যখন আমি আমার কল্পনার রূপ প্রস্তরে প্রতিফলিত করি, তখন বিশ্রাম কি তা আমি ভুলে যাই, তাই কার্যান্তে যদি আমার দেহে ও মনে আসে ক্লান্তি, আসে অবসাদ—তা কি নিতান্তই অঘটন ?

না আর্য!—উগ্রতাবা বলে, কিন্তু ঐ প্রচণ্ড পরিশ্রমের মধ্যেও আপনার দেহে ও চোখে যে জ্যোতি আমি লক্ষ্য করেছি, আজ এই অবসরকালে যে তার একবিন্দুও দেখতে পাচ্ছি না, দেব। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। রাজার ঐশ্বর্য যার হস্তামলক তার কেন এই দীন বেশ, জীর্ণ কুটির ?

পৃথুল বলে, উগ্রতারা, রাজার রাজা আমার উপাস্য। শঙ্কর তো শ্মশানবাসী দীন যোগী মাত্র। কিন্তু উগ্রতারা, তোমার এ বেশ কেন? এই অনাড়ম্বর, অনলঙ্কার, পরিহিত-চীবরাসা ?—যেন উদাসিনী, সংসারত্যাগিনী, যৌবনে যোগিনী!

হাঁ, শিল্পী, সংসার আমি ত্যাগ কোরেছি; ভগবান

বুদ্ধের শরণ নেবার উদ্দেশ্যে আমি ভানুবিহারে চ'লেছি। যাবার পথে আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। তাই অনুরোধ কোরতে এসেছি—আপনি মহান্ শিল্পী, সার্থক কলা সৃষ্টি করাই আপনার ধর্ম। আপনি এই নিঃসঙ্গ জীবন ত্যাগ কোরে নব নব উন্মেষশালিনী রচনার মধ্যে ফুটে উঠুন।

উগ্রতারা, আমার মতন তুমিও তো শিল্পী। তবে তুমিইবা কেন তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কোরে বৈরাগ্যের পথে পা বাড়িয়েছ?

না, আর্যপুত্র, আমি বৈরাগ্যের পথে যাচ্ছি না—আমি চির শান্তি পাবার আশায় মুক্তির পথে চ'লেছি। জানি না, শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছাব!

পেছনে ডাকার মতো তোমার কি কেউ নেই? পৃথুল স্নেহময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

আছে। বহু মানুষের অনন্ত লালসা। আপনি সুন্দরের পূজারী, সুন্দর পুরুষ। আপনি আশীর্বাদ করুন আমি যেন সব লালসার আহ্বান সব লিপ্সার হাতছানি তুচ্ছ কোরে সেই করুণাঘন পুরুষোত্তমের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ কোরে ধন্য হই।

উগ্রতারা মস্তক অবনত কোরে পৃথুলের পদতলে প্রণতা হয়। তারপর বলে, আমি যাই; যাবার আগে আবার বোলে যাই, একটা বিরাট্ প্রতিভা এভাবে নষ্ট কোরবেন না—আমাকে কথা দিন।

শিল্পী পৃথুল নিরুত্তর রইলো। তার পলকহীন নেত্রে গভীর নীরবতা বিরাজ কোরছে। সে নীরবতার ভাষা উগ্রতারা-উপলব্ধি কোরতে পারলো না।

হতাশার সঙ্গে বললো উগ্রতারা, পাষাণের মূর্তি গ'ড়ে গ'ড়ে পাষাণ হোয়ে গেছ! বিদায় হে মহাশিল্পী পৃথুল, বিদায়।

উগ্রতারা চলে গেল। মুক্তদ্বারের কবাট মৃদু বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হোয়ে স্থির হোলো।

এর পরও হিমালয়ের আরো কতো জলরাশি নদ নদী দিয়ে প্রবাহিত হোয়ে সাগরে গিয়ে একাকার হোলো। উগ্রতারার বিদায়ের পর দেবী বসুন্ধরার মার্তণ্ডদেব পরিক্রমা বহুবার হোলো,—কিন্তু পৃথুল একাকীই নিজেকে আবদ্ধ রাখলো।—তার মনে হোলো তার জীবনের আরব্ধ কার্য শেষ হোয়ে গেছে। জগতে তার প্রয়োজন নিঃশেষ হোয়েছে,—তবু মনে হোচ্ছে কি যেন কোথায় কোন্ ক্ষুদ্র কার্য বাকি থেকে গেছে। কি সে ক্ষুদ্র কার্য, তা ভেবে সে কূলকিনারা পায় না!

মুক্তদ্বারে এক দীর্ঘ পুরুষের আবির্ভাব হোলো। দীপের স্বল্প আলোকেও সে মুখ চিনতে পৃথুলের বিলম্ব হোলো না। বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, যুবরাজ ইন্দ্রনীল!

হাঁ, শিল্পী। গৌড় থেকে কাল আমি মহাস্থানে এসেছি;—কিন্তু এ কি দশা কোরেছেন আপনি! আপনার সেই লাবণ্যভরা সুকুমার দেহ যে এতো বেদনা-দায়ক ক্ষয় ক্ষীণ কালিমময় হোতে পারে স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

যুবরাজ! প্রতি মানুষ তার নির্দিষ্ট কর্ম শেষ কোরে বিদায় নেয় এই নশ্বর জগৎ হোতে; আমার বিধি-নির্দিষ্ট কর্ম সমাপ্ত হোয়েছে—এইবার মহাযাত্রার সময় সমাগত।

এ আপনার ভ্রম শিল্পী,—মহাভ্রম। জগৎকে দেবার এখনো অনেক কিছু আছে আপনার। আপনি উঠুন, দাঁড়ান, ধরুন আমার হাত—আমি আপনাকে নিতে এসেছি...

কোথায়?

কম্বোজে। কম্বোজে প্রত্যাবর্তনের সব আয়োজন প্রস্তুত। যাবার আগে আমি আমার প্রিয় মহাস্থান নগরের কাছ হোতে বিদায় নিতে এসেছি, আর আপনাকে নিতে এসেছি।

কিন্তু যুবরাজ, ঐ সমুদ্রের ওপারে গিয়ে আমি কি কোরবো?

আপনি রচনা কোরবেন আপনার অমর সৃষ্টি—গৌড় তথা সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির গৌরব ঘোষণা কোরবে বৃহত্তর ভারত!

কিন্তু...

ইন্দ্রনীল বোলতে থাকে, এ শুধু আমার অন্তরের আহ্বান নয়—এ দেবী চার্বীরও একান্ত অনুরোধ।

পৃথুলের ঘনকৃষ্ণ মানসপটে—মনের ভিতর তলায় যে

মন আছে সেখানে—সহসা স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা ছড়িয়ে পড়লো—পৃথুল সেই জীর্ণ মলিন শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—তখন যেন সে নব বলে বলীয়ান্, নব তেজে দীপ্যমান! তবু মোহগ্রস্ত ভাবে শিল্পী জড়িত কণ্ঠে বলে, দেবী চার্বীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমি যাবো সমুদ্রপারে সেই নূতন দেশে।

ইন্দ্রনীল ডাকলো, কোদণ্ড! কোদণ্ড কুটিরে প্রবেশ কোরলো। ইন্দ্রনীল বলে, মহাশিল্পীকে এখুনি সসম্মানে প্রাসাদে নিয়ে যাও—ইনি কাম্বোজ অভিযানে হবেন আমাদের সহযাত্রী। আমি নগরটি আর একবার শেষ-বারের মত ঘুরে প্রাসাদে আসছি।

ইন্দ্রনীল কুটির হোতে বাহির হোয়ে অশ্বচালনা কোরতে লাগলো নগরের পথে পথে অনির্দেশভাবে। দূর আকাশের গায়ে একটি উজ্জ্বল আলোক দেখতে পেলো ইন্দ্রনীল; বুঝতে পারলো, অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়ায় যে দীপ্ত আলোক জ্বালা হয়—ওই সেই আলোক। অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরের কথা স্মরণ হোতেই অনেক কথা তার মনে পড়ে গেল। মনে প'ড়ে গেলো সেই প্রখর বুদ্ধিমতী, অনুপম সুন্দরী, সুনিপুণ কলাবতী উগ্রতারার কথা। মন তার আনমনা হোয়ে উঠলো—ভাঁটার টানে যা সাগরে চ'লে গিয়েছিল তা আবার জোয়ারের প্রবল স্রোতোবেগে ফিরে এল।

ইন্দ্রনীল অশ্বপৃষ্ঠ হোতে মন্দিরের সামনে অবতরণ কোরে সোপানাবলী অতিক্রমান্তে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হোলো—তখন মন্দির প্রায় জনশূন্য; পুরোহিত গৃহে প্রত্যাগমনোদ্যত। আবছা অন্ধকারে চারিদিক ব্যাপ্ত। ইন্দ্রনীল ক্ষণেকের তরে একটা প্রস্তর-স্তম্ভে হাত রেখে দাঁড়ালো। —হাঁ, এইখানেই প্রথম সে দেখেছিল উগ্রতারার সেই মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম নৃত্য!..... সহসা সেই মন্দিরের অস্পষ্ট আঁধার দূরীভূত হোলো—আলোয় আলোয় সব ভ'রে গেল; মৃদঙ্গের তালে তালে নূপুরের রিনিঝিনি-শব্দে মন্দিরপ্রকোষ্ঠ গুঞ্জরিত হোয়ে উঠলো। হাঁ, ওই তো উর্বশী উগ্রতারা বিচিত্র চারু ভঙ্গিমায়.....না, না—এ কী ভাবছে ইন্দ্রনীল! কোথায় উগ্রতারা! মন্দির হোতে দ্রুত পদে বার হোয়ে এল ইন্দ্রনীল।

কে?

না, এও তার মনের ভ্রম! আজ আর অন্ধকারে কেউ তার হাত চেপে ধরেনি—আজ আর কেউ দেবী উগ্রতারার আমন্ত্রণ নিয়ে আসেনি!

অশ্বের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর কোরলো ইন্দ্রনীল। ...একি! এ কোথায় এসে উপস্থিত হোয়েছে সে! সম্মুখে বিখ্যাত বৌদ্ধ ভানুবিহার। এখানে কেন এল সে?

মহাশয় কি রাত্রের আশ্রয়ের সন্ধান কোরছেন?—ইন্দ্রনীল দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে এক বৌদ্ধ শ্রমণ প্রশ্ন কোরছে।

ইন্দ্রনীল বোললো, না দেব, আমি একজনের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বলুন কে তিনি।

আমি দেবী উগ্রতারার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোরতে চাই।

দেবী উগ্রতারা?—ও বুঝতে পেরেছি আপনি ভিক্ষুণী ধর্মমিত্রার কথা বোলছেন। কিন্তু তিনি তো এখানে নেই।

নেই?

না, তিনি নালন্দার পথে গমন কোরেছেন; হয়ত এতদিন সেখানে পৌঁছে গেছেন। তা রাত্রি অধিক হোয়েছে—আজকের মতন আমাদের অতিথিশালায় রাত্রিবাস করুন।

ধন্যবাদ। আমি নালন্দার পথে যাই।

সপাৎ কোরে সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত কোরেই ইন্দ্রনীল চমকে ওঠে—এ কশাঘাত যেন নিজের পৃষ্ঠদেশেই হোলো! অশ্বের হ্রেষাধ্বনির সঙ্গে ইন্দ্রনীলের অন্তররুদ্ধ বাতাস বার হোয়ে গেল। অশ্ব ছাড়্তোকে—চার-পা তুলে ছুটলো। মুখ ঘুরিয়ে শ্রমণের উদ্দেশে সে বোললো, না, আমি যাচ্ছি আমার কাজের পথে। ভিক্ষুণী ধর্মমিত্রার ধর্মের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। জয় তথাগতের জয়, জয় ধর্ম, সংঘ, বুদ্ধের জয়।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যে নোবেলপুরস্কারপ্রাপ্ত শোলোকফ

এম. ম্যাক্‌সিমোভা

[বিশ্ববিশ্রুত সোভিয়েত্‌ লেখক মিখাইল শোলোকফ এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। 'সোভিয়েত্‌ দেশ' পত্রিকায় সোভিয়েত্‌ সমালোচিকা ম্যাক্‌সিমোভা এই বিশ্ববিশ্রুত লেখকের সাহিত্যকর্ম্ম সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।—প্রঃ সঃ]

বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় থেকেই সোভিয়েতের মানুষ শোলোকফের উপন্যাসের নায়কদের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু বিস্ময়কর মনে হলেও এই নায়করা কালের গতিতে আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যান না, বরং আমাদের বারে বারেই শোলোকফের নায়কদের কাছে ফিরে আসতে হয়। বার বার আমরা আবিষ্কার করি যে গ্রীগরি মেলেকফের পরস্পরবিরোধী ও জটিল চরিত্র শেক্সপীয়রের চরিত্রগুলিরই সমগোত্র; আবিষ্কার করি, আকসিনিয়ার গাঢ় প্রেম ও বিয়োগান্তক মৃত্যু জুলিয়েটের ট্র্যাজেডি অপেক্ষা আমাদের কম অভিভূত করে না।

কেন এ রকম হয়? কেন এই সোভিয়েত্‌ ঔপন্যাসিকের, এই মহান্‌ লেখকের সাহিত্যকর্ম্ম তাঁর জীবিতাবস্থায়ই অনেকদিন আগেই চিরায়ত সাহিত্যের মর্য্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে? গত ২৪শে এপ্রিল মিখাইল শোলোকফের ৬০তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়েছে। এটা আর গোপন নেই যে, তাঁর পুস্তকের সংস্করণ প্রকাশিত হয় লক্ষ কোটি কপি ও তিনি ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, নরওয়ে ও কিউবায় —বস্তুতঃ সারা দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু শোলোকফ বড বড় সভা-সমিতিতে উপস্থিত হওয়া পছন্দ করেন না, তাড়াহুড়ো করে লেখেন না। তিনি প্রকাশকদের তাঁর উপন্যাস দিয়ে ফেলেন না। দক্ষিণ সোভিয়েত্‌ ভূমির কুবান অঞ্চলে, ডন নদীর তীরবর্ত্তী ভেশেনস্কায়া গাঁয়ে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন তিনি। তথাপি জনসাধারণের হৃদয়মনের উপর তাঁর বিপুল প্রভাব —এই প্রভাব বিস্তার করেছেন মাত্র তাঁর প্রতিভা ও জীবন সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের দ্বারা।

১৯২৩ সনে শোলোকফ রচনা করেন তাঁর প্রথম গল্পগুলি, যেগুলি পরে "ডনের কাহিনীগুচ্ছে" সন্নিবিষ্ট হয়। ১৯২৫ সনে তিনি তাঁর উপন্যাস "ধীর প্রবাহিনী ডন" রচনা সুরু করেন। ১৯৩২ সনে তিনি "অহল্যাভূমি জাগলো" উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সনের প্রাক্কালে তাঁর "একটি মানুষের ভাগ্য" প্রকাশিত হয়, আর ১৯৫৯ সনে "অহল্যাভূমি জাগলো" উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচনা সমাপ্ত হয়। আমরা সবাই জানি শোলোকফ বর্ত্তমানে "এঁরা নিজ দেশের জন্য লড়েছিলেন" উপন্যাসটি রচনায় ব্যাপৃত আছেন। যুদ্ধের সময় তিনি নিজে যা দেখেছেন ও শুনেছেন তার ভিত্তিতে রচিত এই উপন্যাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের নাটক ও বিজয়ের এক পরিদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসের ভিত্তি ঘটনাবলী সম্পর্কে শোলোকফের গভীর চিন্তা ও দার্শনিক বিচার। সমরাঙ্গন থেকে শোলোকফ যেসব রিপোর্ট পাঠাতেন সেগুলি আমাদের স্মরণে আছে। এইসব রিপোর্টে যেমন ক্রোধ ফুটে বেরুত তেমনি ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যে আদর্শের জন্য সোভিয়েত্‌ সৈনিকরা লড়াই করেছিলেন সেই আদর্শের ন্যায্যতা সম্পর্কেও আস্থাশীল ছিল এইসব রিপোর্ট। এ রকম একজন সৈনিক আন্দ্রেই সোকোলফ (একটি মানুষের ভাগ্য)। মনে হয়েছিল তিনি যুদ্ধের সময় হারিয়েছিলেন সবকিছু—তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর বাড়ীঘর, তাঁর সুখী পরিবার। তাঁর হৃদয় হয়েছিল ছিন্নভিন্ন, তবু অত্যাচারে তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি—নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি তিনি। তৎসত্ত্বেও আত্মিক দিক থেকে তিনি হয়ে পড়েছিলেন দেউলিয়া। কোন কিছুই আর তাঁকে স্বদেশের জীবনের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারবে বলে মনে হত না। কিন্তু তখনই আবির্ভূত হল একটি ছোট বালকের মূর্তিতে এক ঝলক উষ্ণতা। যুদ্ধে অনাথ এই ছোট্ট সবুজ চারাগাছটিকে বাঁচিয়ে রাখার

জন্য প্রতিপালনের প্রয়োজন ছিল। আর এই প্রতিপালক হবার সিদ্ধান্তই করেছিলেন আন্দ্রেই সোকোলফ।

কিন্তু দুনিয়ায় "ধীর প্রবাহিনী ডন"-ই শোলোকফের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম্ম হিসাবে, এবং খুব সঙ্গতভাবেই বিবেচিত হয়। নবীন সোভিয়েত্ রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম যখন তুঙ্গে, সেই সময় যে কসাক গ্রীগরি মেলেকফ সহানুভূতি ও বিরূপতার মধ্যে দোদুল্যমান ছিল তার ট্র্যাজেডি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে এমন একজন মানুষের ট্র্যাজেডি হিসাবে যে, তৃতীয় এক সমাধান খুঁজছে, সে কোন পথ অনুসরণ করবে তা বেছে নিতে ইতস্তত: করছে। কিন্তু তৃতীয় সমাধান কিছু নেই। হয় হ্যাঁ, নয় না—হয় বিপ্লবের পক্ষে, নয় বিপক্ষে। মেলেকফের ট্র্যাজেডি শোলোকফ যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা ঐতিহাসিকভাবে যুক্তিসিদ্ধ। তাঁর শিল্পসম্মত শব্দের চমৎকার পটে সামাজিক প্রক্রিয়াকে মনে হয় অপরিবর্ত্তনীয়। অনন্য চরিত্রাবলী, খুঁটিনাটির অননুকরণীয় বর্ণনা এবং মহাদৃশ্যের সঙ্গে মিলে এ সবই "ধীর প্রবাহিনী ডন"-কে করে তুলেছে প্রকৃতই এক মহাকাব্যের মর্য্যাদাসম্পন্ন।

বহু বছর আগে শোলোকফ যখন অপরিণত যুবা তখনই তিনি ডন নদীর তীরে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি ও তার ক্ষেতখামারের সৌরভ, জননী ডন নদী তাঁকে চিরতরে তাঁর শৈশব ও যৌবনের লীলাক্ষেত্রে বেঁধে ফেলল। তাছাড়া, ভেশেনস্কায়ায় তাঁকে কত কিছু করতে হবে, কত লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে! ভলগোগ্রাদ থেকে তাঁর কাছে এল তরুণ পইওনীয়াররা। স্থানীয় যৌথ খামারের চাষীরা তাঁকে বললেন তাঁদের সভায় বক্তৃতা দিতে। বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখিকা গামেলা জনসন ও লেখক চার্লস্ স্নো ভেশেনস্কায়ায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, এখানেই সাক্ষাৎ হল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফিন্‌ল্যাণ্ডের মার্ত্তি লার্নির সঙ্গে। কয়েকদিন ধরে শোলোকফ কথা বললেন সাহসী ও যুদ্ধে পঙ্গু এক সেনানায়কের সঙ্গে। তাঁর বইয়ের পক্ষে এই কথাবার্ত্তা এতই প্রয়োজনীয়! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন লেনিনগ্রাদ "কিরফ" কারখানার শ্রমিকরা, কারণ "অহল্যাভূমি জাগলো" উপন্যাসে যে সেমিয়ন দেভিদোফকে চিত্রিত করা হয়েছে সে যে তাঁদেরই শহরের বাসিন্দা।

ঘনিষ্ঠ সৃজনশীল প্রীতিবন্ধনে শোলোকফ উক্রাউন, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, কাজাক ও অন্যান্য সোভিয়েত্ লেখকদের সঙ্গে বাঁধা রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ও লেনিন পুরস্কারের অধিকারী ও অ্যাকাডেমিশিয়ান শোলোকফ সোভিয়েত্ ইউনিয়ন ও বিদেশ থেকে হাজার হাজার চিঠি পেয়ে থাকেন; তাঁর কাছে আসে তাঁর বইয়ের নতুন নতুন সংস্করণের বহু প্যাকেট ও নবীন গ্রন্থকারদের পাণ্ডুলিপি। মিখাইল শোলোকফকে যে কাজ করতে হয় তার বিপুলতার যথাযথ ধারণা এ থেকে প্রায় পাওয়াই যাবে না। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে বসে ও অতি প্রত্যুষে লেখবার সময় স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন তিনি।

শোলোকফের উপর জনগণের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। এক সময় তিনি বলেছিলেন: "সম্ভবত: আমাদের কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এমনভাবে লেখা যাতে আপনি যা লিখছেন তার জন্য সবসময় দায়ী থাকতে পারেন।....." তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার জন্য শোলোকফের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জনগণের। জনসাধারণ তাঁর কাছ থেকে আশা করে আছেন নতুন নতুন বই, নতুন নতুন সৃজনশীল আবিষ্কার; জনসাধারণ সোভিয়েত্ সাহিত্যের চমকপ্রদ উন্নতির সঙ্গে শোলোকফের নামকে জড়িত রাখতে চান। ['সোভিয়েত্ দেশ' হইতে]

'প্রবর্ত্তক'-এর পঞ্চাশ বছর

অঃ অরবিন্দ সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

॥ ৮ ॥

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবাসীর চৈতন্যকে সাধারণভাবে সজাগ করিয়া তুলে। এই যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কুফল—ট্যাক্সের ঘোষণা ইত্যাদি—ভারতের গণমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে যে স্বাধীনতা-স্পৃহা মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এবার তাহা 'হোমরুল' আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। বেশান্ত ও তিলকের নেতৃত্বে এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন পত্রিকার প্রচারের মারফৎ হোমরুল-এর দাবী বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই আন্দোলনের ফলে সরকার খানিকটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। সেই সময় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস হইতে বেশান্তের "হোমরুল" ও মুস্‌লিম লীগের সহিত সহযোগিতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। মুস্‌লিম লীগ অধিবেশনেও কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য হিসাবে বিপিনচন্দ্র পাল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অধিবেশনেব সভাপতির অনুরোধে 'ভারত রক্ষা' আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিযা বক্তৃতা করেন, তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বাংলার বিপ্লবীদের স্বদেশভক্তির সমর্থনে মন্তব্য করেন : 'বাঙ্গলাদেশে এনার্কিষ্ট বলিয়া কেহ নাই, বাঙ্গলার বিপ্লবীরা স্বদেশভক্ত বীর; যদি এই স্বদেশভক্তির অভিব্যক্তিকে গলা টিপিয়া হত্যা করা না হইত তবে কখনই বৈপ্লবিক স্বদেশপ্রেমের জন্ম হইত না।'

এই সময়ে প্রবর্ত্তকের ৩য় বর্ষ চলিতেছিল। প্রবর্ত্তকে তৎকালীন এই মুক্তি আন্দোলনও স্থান পায়। ৩য় বর্ষের ১১শ সংখ্যায় "আন্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় যে, "জগৎ জুড়ে আজ যে দুঃখ দেবতার প্রচণ্ড লীলাখেলা চল্‌ছে তার ভীষণ আবর্ত্তে আমাদের বাংলাদেশ যে পড়ে নাই এমন নয়। ফ্রান্সে এন-ও-ওয়াজ নদীর তীরে উভয় সভ্য জাতির সংঘর্ষে নররক্তনদী বয়ে যাচ্ছে, দেখে জগৎ শিউরে উঠেছে, কিন্তু এ কথা কি কেউ ভেবে দেখে যে, এক বাংলাদেশেই কোন মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করেও যমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ লোকের পরমায়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। * * বাঙ্গলাদেশে বিপ্লবীদের খুব বড় রকমের দল যে আছে, তা তাদের বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্যকলাপ দেখে রাজা-প্রজা উভয়ে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন, কিন্তু তাই বলে কি বাংলার পারিজাত পুষ্পগুলি এমনই নির্ম্মমভাবে বিদলিত হয়ে যাবে? অন্ধকাব কারাকক্ষে তাদের উজ্জ্বল জীবন-প্রদীপগুলি আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাবে নির্ব্বাপিত হয়ে যাবে? * * বাংলার এই উৎকট প্রারব্ধ অতি ভীষণ হলেও অবিচলিত চিত্তে ভোগ করতে হবে।"

অতঃপর প্রবন্ধে তদানীন্তন বাংলার করুণ চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে : "শস্যশ্যামলা বঙ্গের নরনাবী বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায়, মাতৃস্বরূপা নারীমূর্ত্তির অঙ্গ হতে বস্ত্র অপহরণেও বাঙ্গালীর আজ ঘৃণা নাই, এই দারুণ বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের প্রতিকারপরায়ণ হয়ে কেউ কেউ কার্পাস চাষের মন্তব্য প্রকাশ করছেন। এটা একটা উপায় বটে, কিন্তু তা এখন কার্য্যকরী হবে কিনা সে বিষয় ঘোর সন্দেহ আছে। এই মুহূর্ত্তে অসংখ্য নরনারীর বস্ত্রাভাব দূর করবার জন্য কাহারও হৃদয়ে মহতী প্রেরণার উদয় হল না। বাংলার নেতৃসমাজ একযোগে মানুষের এই ভীষণ দুরবস্থার প্রতিকার করবার জন্য বস্ত্রব্যবসায়ীদের অসম্ভব আয়ের পথ ত রোধ করে দাঁড়াল না—কেবল বাধাহীন সরল পথই বাঙ্গালী নেতৃমণ্ডলীর পরিচিত। কেবল প্ল্যান, কেবল স্কীম, এও তোমার জন্মগত মহাপাপ, এর প্রায়শ্চিত্ত বাঙ্গালী তুমি ভিন্ন অপরে করিবে কেন? বাংলার চতুর্দ্দিকে এইরূপ ভীষণ হুতাশন দাউ দাউ করে জ্বলছে, বাঙালী অস্থিমজ্জা মেদ সব তাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, জানি না এই পর্ব্বতপ্রমাণ ভস্মস্তূপে

সঞ্জীবনী-সুধা ছড়িয়ে কোন্ দেবতা বাঙালীর নবজীবন সম্পদান করিবে?"

সে সময়কার নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপের উপর কটাক্ষ-পাত করিয়া প্রবন্ধে বলা হইয়াছে: "একটি কথা আছে 'বার রাজপুতের তের হাঁড়ি'। আজ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত তথাকথিত নেতৃগণের মধ্যে অসংখ্য দলের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের আশা ও উদ্দেশ্য আকাশের চেয়ে বৃহৎ, সমুদ্রের অপেক্ষা গভীর। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের বুকে যে সকল শেলবিদ্ধ হয়ে তার প্রাণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তার একটিও উপ্‌ড়ে ফেল্‌বার সাধ্য তাদের কাঁক নাই, মরজগতে সবচেয়ে যে শ্রেষ্ঠ অধিকার, জাতীয় মুক্তি, ইহাই তারা চালাকির দ্বারা আপনার সকল জিনিষ বজায় রেখে কেবল আন্দোলন আবেদনে হস্তগত করবে—কি দুরাশা! কি লঘুতার পরিচয়!"

প্রবন্ধের উপসংহারে দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে:

"বাঙ্গালীর মর্ম্মতলে যে কথা যে ভাব গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে, বাংলাদেশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্যে জগদ্ধিতায় যে সমষ্টি শক্তি এখনও তপঃনিরত, জানিনা তাঁহাদের আবির্ভাবকাল সমাগত কিনা—আমরা খুব জোর করে, খুব স্পষ্টভাষায় বল্‌তে চাই, বাংলার যে নূতন দল, তাদের বাহিরের আচরণ রাজশক্তির চক্ষে অপ্রিয় হলেও, তারা রাজবিদ্বেষী নহে। তাদের বাহিরের আচরণ রাজশক্তিচক্ষে অপ্রিয় হলেও তারাই ষোল আনা এক করে পৃথিবীর এই প্রবল সমরানল নির্ব্বাপিত করিতে চায়, কিন্তু অন্তরে বাহিরে মুক্তি না পেলে তাদের জাগরণ সম্ভবপর নয়।....."

তপঃপূত খাঁটি চরিত্রের একদল মানুষ সৃষ্টির ইঙ্গিত প্রবন্ধ-শেষে আছে যাহারই ফলে প্রবর্ত্তক-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সংগঠিত করেন।

১৯১৭ সালের কথা। সেই সময় বাংলাদেশ তেমন-ভাবে হোমরুল আন্দোলন সমর্থন করে নাই। অধিকন্তু সুরাট কংগ্রেসের পর বাঙ্গালার রাজনৈতিক দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সেই সময়কার অবস্থা প্রবর্ত্তকে (৩য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা) "রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গালী" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা চিত্রিত হয় তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল: "বোম্বাই কংগ্রেসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিব সমাবেশ হইতে বাঙ্গালীজাতি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহারই একটু একটু প্রতিধ্বনি "বরিশাল হিতৈষী"তে প্রকাশ হইয়াছে। সহযোগী বলেন, রাজনীতি চর্চ্চায় বাঙ্গালী যেন একটু পশ্চাদপদ হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচন সভায় বাঙ্গালী অপেক্ষা মাদ্রাজী ও বম্বেবাসী অধিক মূল্যবান আলোচনা সৃষ্টি করে।" বাঙ্গালীজাতির এইরূপ পিছাইয়া পড়ার একটা কারণও ইনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন: 'এ কথা ঠিক যে, বাংলার রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদের প্রচেষ্টা রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে বহু অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে।'

"কথাটা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে। সুপ্ত বাঙ্গালীর অন্তরে যেদিন কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিল, দেশাত্ম-বোধের অমব প্রেরণায় তার জীবনে যখন প্রবল বন্যার মত প্রবাহিত হইল, তখন সে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া উপর্য্যুপরি এইরূপ বিচিত্র বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি করিয়া বসিল যে, তাহাতে দেশের অধিকাংশ নূতন শক্তিই এইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। অপরাংশ স্তম্ভিত হইয়া ইহার পরিণতি দেখিবার আশায় বসিয়া রহিল, ফলে বাংলার আত্মদর্শনের যে বিরাট সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কিছুদিনের জন্য স্থগিত হইয়া গেল।

"তারপর রাজার কঠোর বিধান বাংলার প্রাণ-শক্তিকে নিপীড়িত করায় সে ক্রমশঃই পঙ্গু হইয়া পড়িতে লাগিল। এই অবসরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, একদিকে লোকমান্য তিলক অপর-দিকে বিদূষী বাসন্তী বিবির প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক সাধনায় কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গেল। গত ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস উপলক্ষে সকল প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া, ইহাই আমরা লক্ষ্য করিয়া-ছিলাম। 'বরিশাল হিতৈষী' এই অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতে চাহে 'কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া, সমগ্র জেলাগুলি বিশেষভাবে রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনায় নিবিষ্ট হউক।' কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে আজন্ম দেশবাসীর সেবা করিয়া, একটা সামান্য অছিলায় সুরেন্দ্রনাথ এই ঘোর

আবর্ত্তনে দেশকে ফেলিয়া স্বচ্ছন্দে অনুদ্বিগ্ন চিত্তে নিরাপদ পথটি অবলম্বন করিলেন। দেশের সুখ দুঃখের কথা তাঁহার মুখ দিয়া আর বাহির হইবে না। কেননা তিনি আর প্রজা-প্রতিনিধি নহেন। রাজপক্ষের সুবিধা অসুবিধার কথাগুলি অতঃপর তাঁহার ভিতর দিয়া শুনিতে হইবে। * * অবশ্যই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে ভারতে গান্ধী, তিলক, অরবিন্দের মত খাঁটি খুব অল্পই জন্মিয়াছেন। কিন্তু কেবল রাষ্ট্রীয় মতামত খুব কৌশলে এবং অভিনব প্রথায় আলোচনা করিতে পারিলেই আমরা যে বড হইয়া উঠিব এ কথা আমাদের আর বিশ্বাস হয় না। * * পাশ্চাত্য ধরণের রাজনীতি চর্চ্চায় আমরা আরও অধিক পারদর্শী হইতে পারি, কিন্তু স্বজাতির বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্য আমরা কি করিতেছি, তাহার জন্য কয়টি কেন্দ্রে, কয়টি সভায়, কয়টি প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি? আমরা যদি খাঁটি মানুষ হইয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে মানুষের যে যোগ্য অধিকার তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে কে? * * তেত্রিশ বৎসর কংগ্রেসের ফল যে কিছুই হয় নাই এ কথা আমরা বলি না।* * এ কথা আমরা হাজারবার বলিব। আমরা দেখিতেছি বাঙ্গালী পিছাইয়া পড়ে নাই, আবার রাজনীতি-চর্চ্চায় সে আর সময় ও শক্তি অপচয় করিতে চাহে না। দুই দশজনে একত্র হইলেই সংবাদপত্রে একটা নামের বিজ্ঞাপন দিয়া কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করায় যে অসারতা তাহা দূর হইয়াছে। বাঙ্গালী নীরবে শান্ত সমাহিত চিত্তে কাজ করিবে। বাঙ্গালী সর্ব্বাগ্রে আপনাকে জানিবে। স্বজাতি, স্বদেশ, সমগ্র বিশ্বের সন্ধান লইবে—ইহার জন্য প্রয়োজন যে সাধনা, যে তপস্যা সে তাহা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। * * বিলাতি ধরণের কেন্দ্র, শাখা সমিতি গঠন, তাহার সভাপতি, সম্পাদক, এই সকল যে অভিনয়, তাহাতে বাঙ্গালী আর হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। * * আজ তেত্রিশ বৎসর বৈদেশিক পদ্ধতিতে রাজনীতি আলোচনার যে ফল, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, গান্ধী, বাসন্তী, মালব্য প্রভৃতি মনীষিবর্গ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তাহা হইলে জাতির জীবনে ঐক্য যে সমতা তাহা এই পদ্ধতি অনুসারে চলিলে যে কতদিনে আসিবে তাহা ভগবান জানেন।

"আমরা বাঙ্গালার প্রতি নরনারীকে বলিতেছি তাঁহারা যেন স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। সংহতি না হইলে কার্য্যসিদ্ধি আসে না। তাই বলিয়া যেমন ব্যষ্টি সংহতি হইলে, যেমন অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট করিয়া দেয় ইহাও তদ্রূপ করিবে। বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর প্রথম শক্তি বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্যই যেন প্রতিজনের হৃদয়ে স্বরাজ্য বিস্তারের যে মহান শিক্ষা তাহারই প্রচার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। তবেই বাঙ্গালী নূতন মুক্তিতে আবার ভারতের সম্মুখে মুক্তি-মন্ত্র সর্ব্বাগ্রে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে।"

'রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙালী' শীর্ষক লেখাটির উদ্ধৃতি একটু বিস্তৃতভাবেই দিলাম এইজন্য যে, ইহাতে প্রবর্ত্তক পত্রিকা তথা প্রবর্ত্তকের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলালের মানস-পরিচয় মিলিবে। বিপ্লবী মতিলাল শুধু বিপ্লব নয়, রাজনীতি হইতেও দিক পরিবর্ত্তন করিয়া স্বকীয়তামূলক সংগঠনের দিকে যে ঝুঁকিতেছেন, তাহা এই প্রবন্ধে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

১৯১৮ সালে ১৫ই পৌষ (১৩২৫) প্রবর্ত্তকের ৩য় বর্ষ ২৪শ সংখ্যায় "আমাদের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে তৎকালীন বাংলা দেশের পত্রিকাসমূহের অভিমতের একটা নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধটি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি। "অমৃতবাজার পত্রিকা সংবাদ পাইয়াছেন, বহু সংখ্যক রাজনীতিক বন্দী খালাস পাইয়াছে, সেইজন্য সহযোগী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃই প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি যুদ্ধান্তে বাংলার এই কঠোর শাসনবিধির শেষ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। দেশভক্ত বিপিনচন্দ্রের দিল্লী প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, যে কারণে এইরূপ হইয়াছিল সে কারণ আর নাই, অতএব বিপিনবাবু দিল্লী আগমন করিতে পারেন। * * যে কারণে বাংলায় অন্তরীণ আইন প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, যুদ্ধশেষে সে কারণ আর নাই···অতএব এই কঠোর প্রথা দূর করিয়া, গভর্ণমেণ্ট

কোটি কোটি বাঙ্গালীর আন্তরিক রাজভক্তি ও অনুরাগ অর্জ্জন করিতে পারেন। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র এতটা আনন্দ প্রকাশের আমরা কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলাম না, এখন ইংলিশম্যান কাগজের জবাব দিবার ছলেই এই কথাগুলি বলা হইয়াছে। অবশ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনেক আবদ্ধ যুবককে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু শুনিতে পাই, সকলকেই একটা security দিয়া ছাড়ান পাইতে হইতেছে। এই security দিতে গেলে আবদ্ধ ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতই যাহারা অপরাধী তাহারা এইরূপ ভাবে মুক্তিলাভ করিয়া আবার যদি আপনাদের জীবনটাকে সত্যপথে চালিত করিতে পারে, তাহা খুব সুখের কথা এবং এই কার্য্যের জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু যাঁহারা নিরপরাধী তাঁহারা কেন এইরূপ করিবেন? অতএব গভর্ণমেণ্ট যদি এই বিষয়ে জেদ বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে জানি না কতদিন এই সব নিরীহ ভদ্রসন্তান অনর্থক কষ্ট পাইবেন। অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র, যাহার ভিতর দিয়া আমরা হাজার হাজার দেশবাসীর মর্ম্মবাণী শুনিতে পাই। আশা করি সহযোগী আমাদের কথাটা তলাইয়া বুঝিবেন এবং এই নিরপরাধ যুবকগণের একটা প্রতিবিধান যাহাতে হয় তাহার দিকে দেশনেতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।"

অতঃপর প্রবন্ধের শেষে প্রবর্ত্তক পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, "প্রবর্ত্তক" প্রচারে আমরা অনেক বাধা পাইয়াছি—খুব বড় বাধা—দুষ্টলোকে রটাইয়াছে, প্রবর্ত্তক রাজবিদ্বেষ প্রচার করে। অন্যতম নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কুতবদিয়া অন্তরীণ case-এর সময় প্রবর্ত্তকের বিষয় উত্থাপন করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। * * প্রবর্ত্তক কোন সম্প্রদায়বিশেষের মুখপত্র নহে। কোন সম্প্রদায় গঠন করিবার উদ্দেশ্য তাহার নাই—প্রবর্ত্তক প্রচার করিতে চায় তিনটী কথা। প্রথম কথা, আমাদের জীবন ভগবানের জন্য, অতএব আমাদের যাহা কিছু তা সমুদয়ই ভাগবত উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে হইবে। দ্বিতীয় কথা, ভগবানকে প্রত্যেকেই জানিবে ও পাইবে। তৃতীয় কথা—যে প্রতিষ্ঠান-ক্ষেত্রের উপর আমাদের অধিষ্ঠান সেই মর্ত্ত্যভূমিকে দেবনিবাসে পরিণত করিব। এই মহান্ উদ্দেশ্য আমাদের কেহ দেয় নাই, জীবনে এইগুলিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবর্ত্তক সর্ব্বপ্রথমেই সমগ্র দেশকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে। ওঁ কালী।"

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীমতিলালের রাজনৈতিক জীবনের উপর যবনিকাপাত উপরের উক্তি হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রবর্ত্তকের রাজনৈতিক মতও এই সময় হইতে ক্রমশঃ ভগবন্মুখী হইতে দেখা যায়। ১৯১৮ সালের জানুয়ারী (১৩২৫) মাসে প্রকাশিত 'নবতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ (প্রবর্ত্তক ৩য় বর্ষ, ২৪ সংখ্যা) অনুধাবন করিলেই প্রবর্ত্তক তথা মতিলালের মতবাদিক মোড়-পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। 'নবতন্ত্রে' বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখানো হইয়াছে শ্রীমতিলালের নবোদ্ভাসিত ভাগবত আলোতে। নবতন্ত্র হইতে খানিকটা উদ্ধৃতি দিলাম: "বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া, ভগবানের করুণাধারা যেদিন বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক স্পর্শ করিল, সেইদিন হইতে জাতির জীবনে এক নূতন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এই জাগরণ কাহা কর্ত্তৃক সংসিদ্ধ হইল, এই লইয়া দেশের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর কর্ত্তৃত্বাভিমান ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভগবান নানা ঘটনার ভিতর দিয়া দেশকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সে জাগরণ সফল করিয়া তোলার জন্য তিনি যন্ত্রস্বরূপ বহু আধার অবলম্বন করিয়াছেনও, যন্ত্রের গৌরব করিবার কিছু নাই। ইহা তাঁহার ইচ্ছা। পরস্পর সংঘাতে দেশে ধীরপন্থী, চরমপন্থী, বিপ্লবপন্থী বহু পন্থীরই আবির্ভাব হইল, কিন্তু ভগবানের অদৃশ্য হস্তখানি স্মরণ না রাখায় সকলেরই কি দুরবস্থা হইল তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। সুরাট কংগ্রেসের পর নরমপন্থী কত দল সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সহিত যোজনা করিল। কিন্তু ফল শূন্য ভিন্ন আর কিছু হইতেছে না। জাতীয় দল ক্রমাগত নির্য্যাতনের মধ্যে আপনাদিগকে পুষ্ট করিয়া তুলিলেও, এই আত্মাভিমানবশতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য আদর্শটি জাতির জীবনে সুস্পষ্ট করিয়া

তুলিবার যে সৎসাহস তাহার অভাবে, ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না। বিপ্লবপন্থীরা অধিকতর বিপন্ন—তাহারা আজ আন্দামানে, কারাগারে, বনে-জঙ্গলে, অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করিতেছে। আমরা চাহয়াছিলাম য়ুরোপের শিক্ষা দিয়া ভারতবর্ষকে উন্নত করিয়া তুলিতে, ভগবানের প্রেরণাটিকে রাজসিক অহঙ্কারে পরিণত করিয়া এই বিকৃত পথটি ধরিয়া চলিতে, সেইজন্য ভারতের সকল সাধনাই পণ্ড হইয়াছে।

"আমরা দেশকে জাতির জননীরূপে পূজা করিয়াছি। দেশসেবাকেই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে আকুল হইয়াছি। * * আমাদের জাতির জীবনের পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার-রূপে অবস্থান করিয়া এই বিশাল জাতিটিকে মঙ্গল ও আনন্দলোকে পরিচালিত করিতেছেন। তাঁরই প্রদত্ত "বন্দেমাতরম" মন্ত্রে দেশ একদিন দীক্ষিত হইয়া আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত করিয়াছিল।…

"জাতির পূর্ণ জাগরণ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র নহেন। তিনি সাধারণভাবে জাতির জীবনে এক নবচেতনা আনাইয়া দিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব তপঃশক্তি সিদ্ধ হইয়াছে। এইবার "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র অপেক্ষা মহোত্তর মন্ত্রের আবির্ভাব হইবে। ঋষি বঙ্কিম জাতির জীবনে যে অমর মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আজ সার্থক হইয়াছে। কিন্তু নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য ভগবানের আহ্বান আমাদের কাণে ধ্বনিত হইতেছে, তিনি অভয় আহ্বান জানিয়েছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

বাংলার বিপ্লব তথা রাজনীতির গতি-প্রকৃতির পরিচয় এই উদ্ধৃতি হইতে খানিকটা মিলিবে। এ সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল তাঁহার অনুপম "জীবন-সঙ্গিনীতে" উল্লেখ করিয়াছেন—"বাংলার এই বিপ্লবযুগের ইতিহাসও তেমনই প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। ইহাও চিরকাল হয়ত গোপন থাকিয়াই যাইবে। কেননা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার বিপ্লবযুগের পরিপূর্ণ ইতিহাস অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয় জাগরণের পর বাংলার বিপ্লবযুগের একটি প্রলয়ঙ্কর অঙ্কের যবনিকাপাত এই সময়ে হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে ধরণের মনোবৃত্তির উপর বাংলার বিপ্লব-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তারপর তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। যে মেধা ও মস্তিষ্ক লইয়া বাংলার বৈপ্লবিক সূচনা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।" (ক্রমশঃ)

ভিতরে-বাহিরে

মানসী গুপ্তা

সবখানেই ভাই, হেথায় হোথায় বিশেষ সীমায় নয়,
আলোকে-আঁধারে ভিতরে-বাহিরে নিখিল বিশ্বময়,
দেবতা-দেউলে, পতিতার গেহে, ঘাতকের ঘরে—তাও;
আকাশে-বাতাসে মরু-প্রান্তরে যেখানে যে-ভাবে চাও—
সবারে ল'য়ে সে—তারি ল'য়ে সব দোসরা নাহিক হায়,
সে যে অতুলন অমৃতের তরু সৃষ্টি ফলেছে তায়।

হার

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'নম্বর শীতলাতলা লেনের এই বাড়ীতে এসে অনীতা খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছে। একান্নবর্তী পরিবারের দম বন্ধ-হওয়া আবহাওয়ার মধ্যে সে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলো, আরো কিছুদিন থাকলে হয়তো একটা কিছু অঘটনও ঘটে যেতে পারতো।

স্বামী নিখিলেশ অবস্থাটা যে সময়মতো বুঝতে পেরেছিলো এবং একরকম জোর ক'রেই সেখান থেকে চ'লে এসেছিলো, এর জন্যে ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একমাত্র তিন বছরের ছোট মেয়ে রুবি আর অনীতাকে নিয়ে নিখিলেশের এই ক্ষুদ্র সংসার। একটা বাংলা সংবাদপত্রের অফিসে সে অনুবাদকের কাজ করে। মাইনে যা পায়, তাতে এই আড়াইজনেরও গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, তাই অনীতাকে কাছাকাছি একটা মেয়েদের স্কুলে চাকরী নিতে হ'য়েছে। তাতে কোনরকমে চলে।

গৃহস্বামী ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালোমানুষ। পরিবেশটিকেও রুচিসম্মত বলা যায়। চারপাশে শিক্ষিত লোকেরই বসবাস বেশী।

বাড়ীর মাঝখানে একটি ছোটখাটো উঠোন আছে। টিনের বাড়ী। চালের উপরে লাউ আর কুমড়োর লতা। দরজার পাশেই একটা জবা ফুলের গাছ। তারই গা ঘেঁসে তুলসী-মঞ্চ। বেশ খোলামেলা চারদিক।

বাড়ীর বাইরে ছোটখাটো দুটো পুকুরও আছে, তাতে সকাল বিকেল হাঁসেরা সাঁতার কাটে। এসব দেখেশুনে রুবি খুব খুশী!

একদিন সকাল বেলা ঘটনাটা ঘটলো। মেয়ের হাত ধ'রে নিখিলেশ বাইরে বেড়াতে বের হচ্ছিলো—এমন সময়ে রুবি সেই নীচু তুলসী-মঞ্চ থেকে চট্ ক'রে একটা গাঁদা ফুল তুলে নিলে। নিখিলেশ ব্যাপারটার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিলো না—কিন্তু বেড়িয়ে ফিরবার সময়ে রুবি যখন দ্বিতীয়বার তার লোভ-লোলুপ হাত বাড়িয়ে আরেকটা ফুল নিতে গেলো, তখন নিখিলেশ বললে, ওটা পুজোর ফুল, নিওনা মা!

মেয়ে কিন্তু কিছুতেই শুনলো না, আরেকটা ফুল সে তুলে নিলে।

ঘটনাটা গৃহস্বামীর স্ত্রী রমা দেবী লক্ষ্য ক'রেছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি হাসতে হাসতে কাছে এগিয়ে এসে বললেন, ও ফুল নিও না রুবি, ওগুলি পুজোর ফুল, কাল লক্ষ্মীপুজো ক'রে ওখানে আমি রেখে দিয়েছি!—

কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে, রুবি কিছুতেই সে ফুল দুটি হাতছাড়া করতে রাজী নয়!

অনীতাও গোলমাল শুনে রান্নাঘর থেকে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বললে, জানো, কালও রুবি এইখান থেকে ফুল নিয়ে এসেছিলো—ঠাকুরের পুজোর ফুল, কি হবে বলো তো? যদি পায়ে-টায়ে লাগে—দিয়ে যাও বলছি! ব'লে মেয়ের দিকে সে তেড়ে এলো!

রুবি নিখিলেশের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, না, আমি দেবো না! তারপরেই তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ ক'রে দিলে।

অনীতা তখন জোর ক'রে সেই ফুল কেড়ে নিতে গেলো, কিন্তু রুবিও নাছোড়বান্দা, সেও উঠোনে শুয়ে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করলো।

শেষ পর্যন্ত নিখিলেশকেই ব্যবস্থা করতে হোল। অনেক কষ্টে মেয়েকে ভুলিয়ে যথাস্থানে ফুলগুলিকে রেখে দিল সে। তারপরে নিজের ঘরে এসে দরোজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

হাতে খানিকটা সময় ছিলো। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম সাম্‌নে টেনে নিয়ে বসলো নিখিলেশ।

অনীতা সকালের দ্বিতীয় কাপ চা নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

নিখিলেশ বললো, তোমার সময় আছে? একটা কথা বলতাম!

অনীতা হেসে বললে, অতো ভূমিকার দরকার কি? সোজাসুজি কথাটা ব'লেই ফেলো না!

নিখিলেশও হাসলো, বললে, চিন্তাটা আমার অনেক দিনের, আজকের ঘটনায় সেটা যেন এখন আমার মাথার মধ্যে নতুন ক'রে চেপে বসেছে!

—বেশতো বলোই না! অনীতা বললে।

নিখিলেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললে, এই

ফুলের কথাটাই ভাবছিলাম, ছাখো মানুষ যে কতোখানি সংস্কারের দাসত্ব করে তার একটা প্রমাণ আজ স্পষ্ট চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেলাম!

অনীতা বললে, কি রকম?

—ধরো ওই পূজোর গাঁদাফুলগুলোর কথাই বলছি। যতোক্ষণ গাছে ছিলো ততোক্ষণ ওর মূল্য আলাদা ছিলো, কিন্তু যে মুহূর্তে ওগুলিকে গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে এসে পূজো করা হোল, সংগে সংগে ওর দাম অনেক বেড়ে গেলো, অথচ তুমি নিজে জানো এর পিছনে আসলে কোন জিনিষটা কাজ করছে?

অনীতা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো এবারে, বললে, ছাখো, তর্কের গন্ধ পেলে আমি কাজকর্ম সব ভুলে যাই এ কথাটা জানোতো—তবু জেনেশুনে আজ আমার সব কাজ মাটি ক'রবার মতলবটা কেন শুনি?

—কি আশ্চর্য! নিখিলেশ দাড়ি কামাতে কামাতে উত্তর দিলে, তোমাকে কি তাই ব'লে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছি? এ শুধু আমার নিজের জীবনের একটা উপলব্ধির কথা মাত্র!

—বুঝলাম সব! কিন্তু তুমি যেটা বল্‌তে চাইছো, সেটা খুব সাদা আর সহজ কথা। তোমার বক্তব্য এই তো যে, পৃথিবীর যা-কিছু সবই তো সেই পরম করুণাময় জগদীশ্বরেরই সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্ট জিনিষ দিয়েই তাঁকে পূজো করা হ'চ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ফুলটা পূজোর পর তো আর বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হয়ে উঠ্‌ছে না,—আসলে যেটা হচ্ছে সেটা আমাদের মনের মধ্যে যে সংস্কারটা আছে সে-ই ফুলটার ওপরে বিশিষ্ট একটা গুণের আরোপ করছে—এইতো?

একটু বিস্মিত হোল নিখিলেশ। হেসে বললে, চমৎকার ধ'রেছো অনু, আমি নিজে হয়তো এ জিনিষটা এতো ভালো ক'রে তোমাকে বোঝাতে পারতাম না! কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, কথাটা তুমি এতো তাড়াতাড়ি ধরলে কি ক'রে?

এবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অনীতা, তেম্‌নিই হেসে বললে, তোমার সঙ্গে ঘর করছি পুরো দশটি বছর, সুতরাং তোমার চিন্তার জগৎটার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকা কি এতোই অসম্ভব?

—ভারী খুসী হোলাম শুনে, নিখিলেশও হাস্‌লো এবারে, বললে, তা হ'লে স্বীকার করছো, বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তুমি যদি বিচার করো, তাহ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে—শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়, ভালোবাসা সবগুলির পিছনেই কাজ করছে সংস্কার? প্রয়োজন হ'লে সেটাকে আমরা ঝেড়েও ফেলে দিতে পারি?

—হ্যাঁ, তা-ও পারি! এ যুগে কিছু কিছু দিচ্ছিও তো, ব'লে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো অনীতা, বললে, দুধটা জ্বাল দিতে হবে, চলি এবার!

—এসো, তবে আর একটা কথা জেনে যাও, রুবির হাতে পূজোর ফুল দেখে তার অমর্যাদা হবে এই আশংকা ক'রে তুমি যেভাবে আজ সকালে চম্‌কে উঠেছিলে, তা দেখে তখন কিন্তু আমার খুব হাসি পেয়েছিলো।

—তাতো পাবেই! কিন্তু এ কথাটাও মনে রেখো, মানুষের জীবনে নির্মম আর নিরাবরণ রূঢ় সত্যটাই শেষ কথা নয়, কিছু পতন, কিছু স্খলন আর কিছু মিথ্যারও আবরণ দরকার। জীবনকে যদি তুমি মৃত্যুর অভিসারিকা মনে করো, তাহ'লে এই স্খলন, পতন ত্রুটীগুলিকে আমি বলবো, তার অঙ্গের অলংকার!

—বাপ্‌রে, এইবার কাব্য আর দর্শন আরম্ভ হ'য়ে গেলো তো? নিখিলেশ বললে।

—সে তুমি যা-ই বলো, আমি বলবো, এইটাই মানুষের যথার্থ সত্যোপলব্ধি। ব'লে সে হাস্‌লো।

—কিন্তু অনু, তুমি তো জানো, আমি এক সময়ে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম এবং মনে মনে এখনও আছি।

—তা থাকো, কোন আপত্তি নেই, আমার এখন বেলা হচ্ছে, দুধটা জ্বাল দিতে হবে।

অনীতা আর দাঁড়ালো না, রান্নাঘরে চ'লে গেলো।

* * *

পরের দিন যথারীতি রুবিকে নিয়ে নিখিলেশ বেড়াতে বের হচ্ছিলো। তুলসী-মঞ্চের কাছে এসে রুবি শুধু থম্‌কে দাঁড়ালো একবার, আগের দিনের মতো

শ্রী অরবিন্দ-স্মরণ

শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

॥ ৮ ॥

আমাদের ছাত্রজীবনে নৈতিক শাসন ও আচারের অত্যাচার আমাদের সমাজে অনেক উদীয়মান প্রতিভার বিকাশের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাই স্বাধীনতা ও আনন্দের আবহাওয়ায় তাঁর বিদ্যাশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের সমাজে তাঁর আদর্শের প্রভাব প্রসারিত হ'তে সুদীর্ঘকাল কেটে গেছে। আমাদের কৈশোর ও প্রথম নিগ্রহবাদের কুফলের জীবন্ত নিদর্শন। আমার ক্ষেত্রে এই প্রভাব দৈহিক অপটুতা ও দুরারোগ্য দীর্ঘস্থায়ী স্নায়বিক অবসাদ সৃষ্টি ক'রেছে। আমার বিদ্যাভবনের দু'তিন বৎসরব্যাপী কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের "অবসাদ বায়ু" বা "হাইপোকন্‌ড্রেয়া" নামক স্নায়বিক রোগ দেখা দিল। এর ফলে বাবাও চিন্তিত হয়ে প'ড়লেন; যদিও আমার পড়াশুনার কৃতিত্ব ও খ্যাতি গোড়া থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল, তথাপি অহোরাত্র এক অজ্ঞাত আতঙ্ক ও মৃত্যুভয় আমাকে ঘিরে থাকতো। এই ধরণের মানসিক ব্যাধি কায়েমী হ'লে, পরে সংসার জীবনে ও জমিদারী পরিচালনায় আমি অকেজো হ'য়ে প'ড়বো, এরূপ দুর্ভাবনা বাবা ও অভিভাবকগণেরও মনে উদিত হ'লো। মা তখন তীর্থবাসিনী; রুগ্নদেহে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান ক'রতেন। তবে তাঁর সান্নিধ্যে আমার মনোবিকার দূর হবে বিবেচনায় স্বর্গত সাধক ও সুধী রামদয়াল মজুমদার ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কোনও গ্রীষ্মাবকাশে আমাকে মায়ের মন্দির-ভবনে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলও অনেক পরিমাণেই হিতকর হয়েছিল। মাতাঠাকুরাণী তখন স্থায়ীভাবে ছোড়দিদি স্বর্গীয়া বসন্তবালা দেবীর তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুভদ্রা মন্দিরে অবস্থান ক'রতেন। পাশেই তাঁর গুরুমাতা স্বর্গীয়া সাধুমাতাঠাকুরাণী সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে গৌড়ীয় মঠ স্থাপন ক'রেছিলেন। মঠাধীশ স্বর্গীয় কিশোরানন্দ স্বামী তখন স্বদেহে বিরাজমান। আমাদের সুভদ্রা মন্দিরের দুটি বাহিরের কক্ষে রামদয়ালবাবু ও পণ্ডিতমহাশয় সহ আমার থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ভক্তিমার্গের সাধনার বিশেষ অনুকূল ছিল। এখানকার আচার-অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধ আমার মন-প্রাণের উপরে কোন প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি ক'রতো না। ভক্তির রাজ্য—প্রেম ও সেবার রাজ্য; বৈধী ভক্তির মধ্যেও একটা প্রসাদগুণ সর্ব্বদাই ঘিরে থাকে। সাত্ত্বিক আচার, আহার, বিহার প্রভৃতিতে নিপীড়নের অনুভূতি থাকে না। ভক্তির পথে পূজা, নামকীর্ত্তন, প্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি সরস ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মন ও প্রাণ স্বাভাবিক ভাবেই স্বত্ত্বগুণের অভিমুখী হয়। তবে যথার্থ সাধুসন্ত ও মহাত্মাদের আবহাওয়াতেই এরূপ

সেদিনো পাঁচ ছ'টি বড়ো বড়ো পূজো-করা গাঁদাফুল প'ড়ে আছে। কিন্তু আগের দিনের মতো আজ আর সে তার লোভ-লোলুপ হাতখানিকে বাড়িয়ে দিলো না, বরং দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো সে, বললে, বাবু ও-পুল নিতে নেই, ও তাকুরের পুল—নমো করতে হয়, তুমি নমো করো বাবু-উ-উ-উ!

শিশুকণ্ঠের সেই অপূর্ব সুর মুহূর্তে সমস্ত বাতাসে যেন রিন্ রিন্ ক'রে বেজে উঠ্‌লো! নিখিলেশ হাত জোড় ক'রে পরম ভক্তিভরে নমস্কার করলো। তার পরে মেয়েকে হাত ধ'রে ফিরে এলো অনীতার কাছে, রান্নাঘরে, বললে, শোনো, তোমার কাছে আজ আমার হার হ'য়েছে!

একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অনীতা বললে, মানে?

—মানেটা পরে বলবো! নিখিলেশ রুবিকে নিয়ে বেড়াতে বের হলো।

স্বাভাবিক সাত্ত্বিক পারিপার্শ্বিক গ'ড়ে ওঠে। তাঁরা যখন ইহলোক ত্যাগ ক'রে চ'লে যান, তখন তাঁদের পরিত্যক্ত স্থানে সাত্ত্বিক আনন্দের পরিবর্ত্তে শুষ্ক আচার-বিচারের জঞ্জালই গজিয়ে ওঠে। সাধনার রসস্রোত যখন শুকিয়ে যায়, তখনই গোঁড়ামী ও নিগ্রহবাদের জন্ম হয়।

কলেজে বিদ্যাভ্যাসকালে গ্রীষ্মাবকাশের এই পুরীবাস আমার জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। রামদয়ালবাবু ও কেদার পণ্ডিতমহাশয়ও যথেষ্ট উন্নত সাধক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপরে তাঁদের জীবন ও সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষতঃ রামদয়ালবাবু খুবই রসিক ছিলেন; নানা সরস গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি উপদেশ বিতরণ করতেন। কলিকাতায় তাঁর ও পণ্ডিতমশায়ের একটা সতর্ক প্রহরা থাকৃতো,—পাছে তাঁদের ছাত্র ও শিষ্যগণ বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত নামকরা লোকদের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত না হয়। কিন্তু পুরীতে গিয়ে তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্ত্ত ও চলাফেরায় আনন্দের মধ্যে সময় অতিবাহিত ক'রতেন এবং একটি সরস আবহাওয়ার সৃষ্টির দ্বারা আমার মানসিক ব্যাধি সারিয়ে তোলাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য-বস্তু ছিল; তবে এ কথাও স্মরণীয় যে, তাঁরা ব্যক্তিগত-ভাবে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির এবং শ্রীমৎ কিশোরানন্দ ও সাধুমাতা দেবীর প্রভাব সম্পূর্ণ এড়িয়ে চল্‌তেন। তাঁরা কখনও মঠাধীশ ও সাধুমাতার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দেন নি। যদিও মাতাঠাকুরাণীর গুরুস্থানে আমার গতিবিধিতে তাঁরা বাধা দিতেন না, তথাপি শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির ও পুরীর নানা প্রাচীন দেবস্থানে আমাকে দর্শনে নিয়ে যাওয়ার দিকেই তাঁদের আগ্রহ প্রবল ছিল। তাঁরা ছিলেন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী; এই পথেও ভক্তির স্থান আছে; তবে এই ভক্তি জ্ঞানানুগা। পক্ষান্তরে কিশোরানন্দ ও সাধুমাতা যে ভক্তি প্রচার ক'রতেন, তার চরম পরিণতি রাগানুগা। এই পথেও জ্ঞানের স্থান আছে; কিন্তু এই জ্ঞানের আসল তত্ত্ব অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া রামদয়াল-বাবু ছিলেন জাতিমূলক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এক বড় প্রতিভূ; আর সাধুমাতা সন্ন্যাসী ভক্তদের ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট মতানুযায়ী জাতিভেদের চিহ্ন রাখতেন না; যদিও গৃহীদের ক্ষেত্রে তিনিও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পূর্ণ সমর্থন করতেন। যাহা হউক, আমি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রামদয়াল-বাবুর সঙ্গে সাধুমাতার সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা ঘটিয়ে তুলতে পারলাম না। আমার পক্ষে অদৃশ্য এঁদের উভয়ের সঙ্গই বিশেষ প্রীতিকর ছিল। সাধুমাতা আমাকে কোনও শুভমুহূর্ত্তে শক্তি সঞ্চার সহ শ্রীহরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছিলেন। তিনি নামগুরু ও মাতৃগুরু এবং এই দুই কারণে আমার নিকট চির প্রণম্যা। পুরীধামে সেবার অতি আনন্দেই আমি দিন কাটিয়েছি; নিত্য সমুদ্র স্নান আমার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করে। তখনকার দিনের উৎসববহুল ধর্ম্ম ও মন্দিরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের প্রাণের সাড়া যথেষ্ট ছিল। পাণ্ডাদের সঙ্গে নানা মন্দির পরিভ্রমণ ও প্রসাদ সেবনের পরিতৃপ্তি কম ছিল না। বিশুদ্ধ খাদ্য ও খাঁটি ঘি-দুধের তখন অভাব ছিল না। জগন্নাথের আনন্দবাজারে জাতিভেদের স্থান নাই। শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী রামদয়াল ও পণ্ডিতমহাশয়ের ন্যায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণও চণ্ডাল পরিবেশিত মহাপ্রসাদ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সহিত সেবন ক'রতেন। তখন পুরীধামে প্রবীন কবিরাজ মাণ্ডনী মিশ্র চিকিৎসকদের মধ্যে অগ্রণী স্থানীয় ছিলেন। উড়িষ্যাবাসীগণ তাঁকে ধন্বন্তরী আখ্যায় ভূষিত ক'রতেন। তিনি মাতাঠাকুরাণীর কঠিন রোগের উপশম সাধন ক'রেছিলেন এবং আমার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাও তিনি অনেক পরিমাণেই সারিয়ে তুললেন। প্রসাদের পুণ্যময় প্রভাব ছাড়াও মহাপ্রসাদের পুষ্টিকারিতা ও শারীরিক বিবিধ উপকারিতার বিষয়ে তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন। সেদিনের পুরীধাম ও বর্ত্তমানের পুরীক্ষেত্রের মধ্যে কালের যে ব্যবধান ঘটেছে, তার ফলে পুরীদর্শনে গেলে এখন অশ্রুপাতই আমাদের সম্বল হয়ে ওঠে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের দৃশ্যই সকল তীর্থের ন্যায় পুরীতেও উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। (ক্রমশঃ)

সাধন-বিজ্ঞানের মৌল তথ্য

মহর্ষি প্রেমানন্দ

জড়-বিজ্ঞান আর দর্শন-বিজ্ঞানের একই কথা, একই সমাধান। বিপুল বিশ্ব ধ্বনির পরিণাম। ধ্বনির অন্তর্গত চিন্ময় বিদ্যুৎশক্তি (Electricity) কম্পন নিরন্তৈর্য্যের বিবৃদ্ধির ফলে ক্রম-রূপায়ণের ধারায় বিকশিত হইয়াছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপে। পঞ্চতন্মাত্রিক জগতে প্রথম তন্মাত্রা "শব্দ"। ক্রম কম্পন নিরন্তৈর্য্যের ফলে (frequency of vibration) ইহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ দিয়াছে অপর চারিটির—স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। প্রকাশ করিয়াছে ক্ষিতিতত্ত্ব,—স্থূল রূপধারা। বিশাল বিকাশ দিয়াও কিন্তু সেই "শব্দ" স্তব্ধ হয় নাই। তার অনুরণনের ধারা নিয়ত অনুরণিত হইতেছে প্রতিটি অণুতে অণুতে। সৃজনেব প্রবাহকে শাশ্বতরূপে প্রবহমান রাখিয়াছে এই শব্দেরই অনুরণনা। ইহার গতি যেদিন হইবে স্তব্ধ—সৃজনপ্রবাহও সেদিন হইবে রুদ্ধ। ধ্বনি বা শব্দ না থাকিলে সৃষ্টি করিবে কে? রূপায়ণের চিন্ময়ী বিদ্যুৎশক্তি উদ্‌গত হইবে কোথা হইতে? মানব-দেহও ধ্বনি বা শব্দেরই ঘনীভূত রূপ। তাই মানব-দেহে এই শব্দের অনুরণনের ধারা নিয়ত অনুরণিত হইতেছে "অনাহত"রূপে। জীবের ইচ্ছাহত নয় সে, স্বেচ্ছাহত তার গতিভঙ্গী।

সৃজনীধারায় শক্তি আসে সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে; আবার প্রলয়ে ফিরিয়া যায় ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে। শক্তির এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবের খেলা কেন্দ্র হইতে বিসারিত —পরমাণুপুঞ্জেও বিরাজমান। জীবদেহে আত্মারূপে সমষ্টিভাবে, জীবদেহস্থ প্রতি কোষে (cell) ব্যষ্টিভাবে নিত্য স্থিতি—আবার প্রতি কোষেও ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাব প্রোটোপ্লাসম্ ও নিউক্লিয়াস রূপে। তেমনি প্রতিটি পরমাণুতেও আছে ইলেকট্রণ, প্রোটন এবং ফোটন ও আয়রণরূপে।

বাসনাচঞ্চল আত্মা হইতেই মনের প্রকাশ। ভূত-গ্রামের তৎপরতায়ই ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ। মনের অভিমানিনী শক্তি (অহং) যখন বিস্মৃত হয় তাহার আত্মিক সম্বন্ধ, তাহাব চিরশুদ্ধ পরধর্ম্মী "চরম অহং" সম্বন্ধে হয় অচেতন তখনই প্রভাবিত হয় ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে। তখন সে আর ইন্দ্রিয়াধীশ নয়, হয় ইন্দ্রিয়ানুগ। এই ইন্দ্রিয়ানুগ মানস-চাঞ্চল্যে জীবের বায়ুভূত প্রাণসত্তাও হয় চঞ্চল। সংহত প্রাণসত্তা এই চাঞ্চল্যে বিক্ষিপ্ত হয় বিভিন্ন মুখে। সংহত প্রাণসত্তাই জীবের জীবন। চিরশুদ্ধ নিশ্চল মনের সাথে সংযোজিত হইয়া সংহত প্রাণসত্তাই আবার জীবের স্বরূপ স্মৃতির, আত্মিক জ্ঞানের ধারক ও বাহক।

জ্যোতির তত্ত্বই স্বরূপ তত্ত্ব, আত্মিক তত্ত্ব। ইহাই "হরি" (হরি=অগ্নি বা জ্যোতিঃ)। জ্যোতির লীলা কীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তনই ত্রিকালের "হরিনাম" কীর্ত্তন। অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় হরির কোন ধ্যানমন্ত্র নাই। কারণ তাঁহার কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রতীক নাই। যিনি মহদ্‌যশা তাঁহার আবার প্রতীক কি! উপনিষদের ভাষায়—"যদ্ যচ্ছরীরং আদত্তে তেন তেন সঃ রক্ষতে।"

এই হরিই সৃজনীশক্তিতে "ব্রহ্মা", পরিপালিনী শক্তিতে "বিষ্ণু"। বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণসত্তা। এবং সংহারে "শঙ্কর"। জীবের স্বরূপ স্মৃতি উদ্বোধনের জন্য সর্ব্ব-যুগে যুগোপযোগী করিয়া এই হরিনামই জগতে প্রচারিত হইয়াছে। বেদান্তের ধারায় "হরি ওঁ" এবং শ্রীচৈতন্যের ধারায় "হরি বল" ইত্যাদি ভাবে। অতএব এই যুগে জীবের কল্যাণ হবি নাম বা জ্যোতির তত্ত্বই প্রচারিত হইবে যুগধারায়, বিজ্ঞানের ভিত্তিতে। কারণ, বর্ত্তমান যুগ-মন যুক্তি ও বিজ্ঞানধর্ম্মে প্রতিষ্ঠ। অন্ধ ভাবালুতার স্থান এই যুগে নাই।

জ্যোতির উৎসমূল ধ্বনি। শাস্ত্র বলেন "ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতিম্"। ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়াই জীব পায় জ্যোতির সন্ধান। তাইত খণ্ড, অখণ্ড বিভিন্ন বীজমন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই চলে জীবের আত্মিক সাধনা। এইটিকে বাদ দিয়া আত্মিক সাধনাব কোন ধারা জগতের কোন ধর্ম্ম-দর্শনেই নাই। আত্মিক সাধনায় আক্ষরিক এবং অনাক্ষরিক এই উভয় ধারায়ই ধ্বনিতত্ত্ব আশ্রয়ে বিদ্যমান। আক্ষবিক ধ্বনিতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ হইল

একটু পিছাইয়া পথ চলা। কারণ এখানে থাকে কৃতি। আক্ষরিক ধ্বনি তত্ত্বের অক্ষর ক্রমে ঝরিয়া পর্য্যবসিত হয় অনাক্ষরিকে। সে সময়ে সাধকের কোন কৃতি থাকে না, থাকে শ্রুতি। শ্রুতিতে পৌঁছিয়াই সাধক পায় সিদ্ধ-পথের সন্ধান—পায় চিত্তবিলয়ের সুখকর, অব্যয়, উত্তম পথের সন্ধান। পায় জ্যোতির উদ্ভাস। প্রথম হইতেই অনাক্ষরিক ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়াও অধ্যাত্ম-পথ পরিক্রমা করা যায়। ইহাই আমাদের শাস্ত্রোক্ত "নাদসাধন"-প্রণালী।" "গীতায়" আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এবং আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার "যোগতারাবলী" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ উপদেশ দিয়াছেন।

জীবের স্বরূপ অনুভূতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই তাহার নিজস্ব সম্পদ। অন্তরলোকে স্থিত। শাশ্বতরূপে সকলই তাহার নিত্য ক্রিয়াশীল। তথাপি জীবের স্বারূপ্যানুভূতির অত ন্যূনতা কেন? জীব আত্মজ্ঞানে অত হতচেতন কেন? ইন্দ্রিয়ানুগ মনো-প্রভাবে জীব নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ, আত্মানুগ মনোপ্রভাব মুক্তির কারণ। ইন্দ্রিয়ানুগ মানস চাঞ্চল্য ঘটায় বায়ুভূত প্রাণচাঞ্চল্য। যোগশাস্ত্র বলে—"মনশ্চ বধ্যতে যেন পবনস্তেনৈব বধ্যতে"। আবার ইহাও বলে—"চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলো ভবেৎ"। মন ও প্রাণ (বায়ুভূত) একীভূত অবস্থায় স্থির প্রশান্ত ভূমিতে না যাওয়া পর্য্যন্ত জীবের অন্তর্লীন অনাহত নাদ শ্রবণও হয় ব্যাহত। ধ্বনির সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞানতার বন্ধন ছিন্ন করাও সম্ভব নহে। আত্মার আলোও উদ্ভাসিত হয় না সাধকের দৃষ্টিতে।

মন, প্রাণ, আত্মা এবং অনাহতরূপে মহাজাগতিক নাদের অনুরণনা সকল জীবের স্বীয় দেহেই অবস্থিত। তাইত "নাদসাধন"-প্রণালীতে "অহং গ্রহ উপাসনার" এত বৈশিষ্ট্য। রাজযৌগিক সাধনার ইহাই ধারা। আত্মজ্ঞান তথা ভগবদ্‌জ্ঞান লাভের ইহাই যুখ্যতম কৌশল। সে কারণেই জাবাল দর্শনের দিগ্‌দর্শন—

"অন্তস্থং মাং পরিত্যজ্য বহিস্থং যস্তু সেবতে।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহেৎ কূর্পরমাত্মনঃ॥"

ধ্বনির বিক্ষিপ্ততায় বিচিত্র জগৎ। প্রাণের বিক্ষিপ্ততায় বৈচিত্র্যময় মানস ব্যাপার। মন আর প্রাণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিক্ষিপ্ত প্রাণসত্তা যখন সংহত হয় তখন মনোভূমি হয় প্রশান্ত। সেই প্রশান্ত মন অনাহত নাদের সন্ধান লাভ করিয়া পায় "প্রহ্লাদ জ্যোতির" দর্শন। এইত যোগ। বিক্ষিপ্তকে সংহত করিয়া অবিচ্ছিন্নতায় পুনঃ সংযোগ স্থাপনই যোগযুক্তি। যে শক্তিবলে সাধক বিচ্ছিন্নতাকে অপসারিত করিয়া বিযুক্তি লাভ করে, উহাই তাহার নৃসিংহ শক্তি। নৃসিংহ শক্তিতে হিরণ্যকশিপু বধ হয় প্রহ্লাদের উপস্থিতিতেই। এই ত অধ্যাত্ম-সাধনার যোগযুক্তির মূল সূত্র—ইহাই বিজ্ঞান। বিস্মৃত জীবকে এইটুকু শিক্ষা দিতেই অত মত, অত পথ ও অত ধর্ম্মগ্রন্থাদির রচনা এবং অত বিচিত্র অনুষ্ঠানের আড়ম্বর।

মৎ প্রবর্ত্তিত গীতাভারতীর সাধনার ধারা উপরোক্ত পথেই অভিগমিত। বিক্ষিপ্ত প্রাণসত্তাকে সংহত করিয়া, স্থির মনকে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয় অনাহত নাদের সাথে। তখন সাধক সেই ধারায় ব্রজের মুরলী, নূপুর, শঙ্খ, ডমরু প্রভৃতি নাদ শুনিতে শুনিতে অগ্রসর হয় ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জনের পথে। উপনিষদোক্ত যোগসিদ্ধির লক্ষণগুলি হয় ক্রমে তার নিকট প্রকাশিত।

"নীহারধূমার্কানিলনলানাং
খদ্যোতবিদ্যুতস্ফটিক শশীনাম্।
এতানিরূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তি করানি যোগে॥"
(শ্বেতাশ্বতর—২।১১)

এই পন্থা ঠিক ঠিক অনুসরিত হলে তিনদিনের মধ্যে সমাধিশক্তি স্ফুরিত হইতে পারে। ব্রহ্মের সূচক বর্ণ, জ্যোতিঃ, ধ্বনি—এই তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে (কখনো বা তিনটিরও) সাধক গুরুনির্দ্দেশে সাধন-ক্রিয়া অনুসরণ করিলে অচিরেই সমাধি স্ফুরিত হইতে থাকে। সাধক অনুভূতি পায় তার যোগযুক্তির। অবশ্য এই যোগযুক্তি স্থায়ীত্বের জন্য জাগ্রত সচেতন থাকার প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাইবেল বলিয়াছেন—

"...Destroy this temple, and in three days I will raise it up."—(St. Jhon. 2/19)

এই ধারায় আত্মিক জ্ঞান তথা ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ সূর্য্যের

আলোচনা

মানুষের কাজ মানুষ করা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এই পৃথিবীতে মানুষের বয়স পঞ্চাশ হজার বছর। সামান্য 'আমিবা' থেকে যে প্রাণীজগতের সূত্রপাত হয়েছে তারই শেষ সৃষ্টি মানুষ,—প্রাণীজগতের শেষ বিকাশ। পঞ্চাশ হাজার বছর ধবে এই বিকাশ পূর্ণতা লাভের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই পূর্ণতার গতিকে বার বার ব্যাহত করছে বিবোধী শক্তি—অসুর-ভাবেব সঙ্গে দেব-ভাবের সংঘাত ঘটেছে বার বার, কিন্তু প্রতি-বাবেই অসুর-শক্তিকে হারিয়ে দেবশক্তি জয়ী হয়েছে, মানুষ এগিয়ে এসেছে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার দিকে, এই পূর্ণতাই একদিন তাকে দেবত্বে পৌঁছে দেবে।

মনুষ্যত্ব লাভেব সবচেয়ে বড় পন্থা শিক্ষা। পুঁথির পাতাই যে শিক্ষার সব কথা নয়, মনকে ষডবিপু থেকে রিক্ত কবে সৌম্যভাবের সম্যক্ সাধনাই সেই শিক্ষা। পুঁথির বিদ্যা ও গুরুদত্ত জ্ঞান থেকে তার আরম্ভ মাত্র। মনোবিকাশের এই শিক্ষা ভারতের একান্ত নিজস্ব বলা চলে। বেদান্তে আমাদের ঋষিরা তার শেষ কথা বলে গেছেন। যেদিক থেকে আমাদের মনুষ্যত্ববোধ জগদ্বাসীর অনুকরণীয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বার বার নানা উৎপাতে বিপর্যস্ত হয়ে আমরা যথার্থ আদর্শে এখনও পৌঁছাতে পারিনি। এই না পাবার মূলে আছে বৈদেশিক উৎপাত, তার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ অসুব-শক্তিও কম নেই।

এই আভ্যন্তরীণ উৎপাত নানাভাবে এসেছে ও বর্তমান রয়েছে। প্রথমেই বলতে হয় শিক্ষাব কথা। পুঁথিগত শিক্ষা মনুষ্যত্ব সাধনার প্রথম তোবণ বলতে পারি। এই তোরণে প্রবেশ করতে অনেকেই পারছে না। কোথাও পারে না দারিদ্র্যের জন্য। আবার কোথাও পারে না অবস্থার জন্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা সে সম্পর্কে মীমাংসায় পৌঁছবাব জন্য বহু আলোচনা, সমালোচনা ও সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়। কিন্তু দারিদ্র্যের প্রতিরোধ ক্ষমতা আমরা এখনও আয়ত্তে আনতে পারিনি। আশ্রম এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে দাবিদ্র্যকে জয় করার দিকে এদেশে কাজ কবেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবং এই ধরণের আরো অনেক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু দেশের ব্যাপকতা ও জনসংখ্যার তুলনায় এই সব আশ্রমিক সঙ্ঘের শক্তি পর্যাপ্ত নয়। ব্যক্তিগত দানকে সম্বল করে দেশব্যাপী কাজ করা সম্ভব নয়। একটা বালকাশ্রমে কতজন বালককে আশ্রয় দেওয়া যায়? সরকারী রাজস্ব না থাকলে দেশব্যাপী আশ্রম গড়ে তোলা যায় না। আমাদের দেশে দেশব্যাপী আশ্রম করাই আজ প্রয়োজন। শুধু শিক্ষা-আশ্রম—গরীব ছেলেরা সেখানে খাবে, থাকবে, লেখাপড়া শিখবে আর শিখবে ব্রহ্মচর্য ও সংযম।

সরকারী অর্থ এদিকে নিয়োগ না হলে, যতদিন না হবে ততদিন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই ধরণের আশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। আদর্শ তো থেমে থাকতে পারে না। পাবে না বলেই বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় অনাথ ছেলেমেয়েদের কুড়িয়ে আনে আশ্রমের সন্ন্যাসীরা, মানুষ করে তুলতে চায় তাদের।

অনেকে হয়তো মনে করেন, এ বিষয়ে আমরা এক। তা নয়। অনাথ ছেলেদের মানুষ করাব জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অন্যান্য দেশেও আছে।

আলোর ন্যায় স্বচ্ছ এবং সূর্য্যোদয়ের ন্যায়ই ধ্রুব। এই সৃজন-বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় আত্মিক সাধনা কখনো ব্যর্থ হইবার নয। ব্যাকুল সাধকের সাধনা কখনো বিফলতায় ভরিয়া উঠে না। এই ধাবায় সাধনার জন্য সাধকের প্রয়োজন সুগভীর আকুলতা ও আর্ত্তিভাব।

এখানেই নিহিত আছে অধ্যাত্ম-সাধনায় সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়েব মূল সুর। মহাজাগতিক সাধনার ধারায়, শাশ্বত সার্ব্বজনীন রূপ। এই সত্য, সুস্পষ্ট ও সিদ্ধ ধারাকে হারাইয়াই জাতি আজ অধ্যাত্ম-জগতে দেউলিয়া হইয়াছে। হইয়াছে বহু সংস্কারাচ্ছন্ন, অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব।

প্রথমেই মার্কিন মুলুকের টেক্‌সাস অঞ্চলের প্যান-হাণ্ডেলের কথা ওঠে। 'বয়েজ রাঞ্চ' বলে ছেলেদের একটা বাড়ী আছে, সেখানে ৪ বছর থেকে ১৬ বছর বয়সের ছেলে আছে ৩২৫ জন। এরা অনেকেই বস্তি-অঞ্চলের ছেলে, বাপ হয়তো মাতাল কি গুণ্ডা, কারও বাপ হয়তো জেল খাটতে গেছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করতে করতে এদেরও কেউ কেউ হয়তো চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। এদের জোগাড় করে এনেছেন ক্যাল ফারলি। ক্যালের জন্ম এক চাষার ঘরে। সংসার চালাতে না পেরে বাপ গৃহত্যাগী হন। কোনমতে প্রাইমারী ইস্কুলের পড়াশুনা শেষ করে জীবিকা-অর্জনের জন্য ক্যাল্ বেস্‌বল খেলা আর কুস্তি দেখাতে সুরু করলেন। বছর পঁয়ত্রিশ বয়সে ইনি দেখলেন যে, খেলাধূলা ও কুস্তি করার বয়স আর নেই। সুরু করলেন ব্যবসা। কারবারে কিছু পয়সা করে ইনি ছেলে মানুষ করার দিকে মন দিলেন। নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। জুলিয়ান বিভিন্ন নামে এক বড়লোককে ধরে তার একটা পল্লীভবন জোগাড় করলেন। ক্যানেডিয়ান নদীর ধারে এক কারখানার পাশে পুরানো এক বাড়ী, সেখানে কয়েকটি বস্তির ছেলে যোগাড় করে নিয়ে তিনি সুরু করলেন—বালক-ভবন। একে একে ছেলে বাড়তে লাগলো, বাড়ীঘরও বাড়তে লাগলো। এখন এদের ৩৩টি বাড়ী হয়েছে, ৯৩০০ একর চাষের জমি হয়েছে, আর তারই সঙ্গে হয়েছে একটি ইস্কুল, সাঁতারের ক্লাব ও একটি গীর্জা। এগুলি দিয়েছে স্থানীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। ২০ জন শিক্ষকের বেতন দেন সরকার। এক রুটিওয়ালা বিনা-মূল্যে রুটি দেয়, এক খামারওয়ালা তার অবিক্রীত ফলমূল পাঠিয়ে দেয়, স্থানীয় ডাক্তাররা ফী না নিয়ে ছেলেদের চিকিৎসা করেন। এখন এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানটির বয়স ১৮।১৯ বছর। ১৬৫০ জন ছেলে এখানে মানুষ হয়েছে ও হচ্ছে। এক একটি বালক-আবাসে ৩৬জন করে ছেলে থাকে। নিজেরাই নিজেদের কাজকর্ম করে, সেজন্য তারা মাইনে পায়। সেই টাকায় তারা জামা কাপড় কেনে, আর ব্যাঙ্কে জমায়। ১৭ বছর বয়সে ইচ্ছা করলে তারা এই আবাস ছেড়ে চলে যেতে পারে।

ক্যাল্ বলেন—ছোটরা একটু স্নেহ চায়, চায় দরদ ও সহানুভূতি, সেইটুকুই আমরা দেবার চেষ্টা করি। প্রত্যেক পাঁচজন ছেলে পিছু একজন করে দেখাশুনা করার মানুষ আছে। এবং এই মায়ে-খোদনো-বাপে তাড়ানো ছেলের দল গুণ্ডা-বদমায়েস না হয়ে ভদ্র ও শিক্ষিত হয়ে সহজ কর্মক্ষেত্রে জীবিকা-অর্জন করছে। কেউ হয়েছে মিস্ত্রি, কেউ প্লাম্বার, কেউ ইলেক্‌ট্রিসিয়ান, আবার কেউ মোটর মেকানিক্। কেউ কেউ আবার চাকরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাও নিচ্ছে।

ক্যাল ফারলির বয়স এখন ৭০ বছর।

ক্যাল ফারলি গোড়া থেকেই সুবিধামত পরিবেশ পেয়েছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার সিস্টার ডালসে সে পরিবেশ পান নি, তাঁকে বিরূপ অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে, যা আমাদের দেশের পরিবেশের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিলে যায়।

ব্রেজিলের বাহিয়া নগরে এক মিশনারী শিক্ষিকা মেরিয়া রিটা ডালসে। সাড়ে ছ'লাখ মানুষ থাকে বাহিয়া নগরে, তার মধ্যে এক লাখ গৃহহীন ছন্নছাড়া। পথের ধারে চট ঝুলিয়ে তারা রাত কাটায়। কোনদিন খেতে পায়, কোনদিন পায় না। নে খেয়ে, ভিক্ষা মেগে পথে ঘুরে ঘুরে কেউ কেউ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়ে। পথেই একদিন জীবন শেষ করে। এদের পানেই প্রথম নজর পড়ে সিস্টার ডালসের অভাবিত ভাবে। ১৯৫১ সালের এক বিকাল বেলায় সিস্টার ডালসে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি বালক পথের পাশ থেকে ডাকলো—সিস্টার, আমি মরতে বসেছি!

পথের পাশে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে এক বছর বারোর বিবর্ণ ছেলে ঠক ঠক করে কাঁপছে। ডালসে এগিয়ে গেলেন। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন—ছেলেটির গা জ্বরে পুরে যাচ্ছে। তিনি এক মুহূর্ত ভাবলেন কি করবেন। পরক্ষণেই চোখে পড়লো সামনে এক সারি

বস্তির ঘর খালি করা হয়েছে। তখনই এক পথিক যুবককে ডেকে তিনি বললেন—একখানি ঘর খোলো।

—তালা দেওয়া যে!

—দরজা ভাঙো, আমি দায়ী হবো।

যুবক দরজা ভেঙে ফেললো। ডালসে ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর ছুটলো তাঁর গীর্জায় খাবার ও ওষুধের চেষ্টায়।

সাতদিনের মধ্যে পথের কগ্ন মানুষে সেই বস্তি-বাড়ীটি পূর্ণ হলো। তারপর দরকার পড়লো তার পাশের বাড়ী, তারপর তার পাশে।

বস্তির মালিক আদালতের হুকুম নিয়ে সবাইকে পথে বের করে দিলে। সিস্টার ডালসে এবার আশ্রয় নিলেন গীর্জার সামনে এক পথের পাশে। সেখান থেকেও তাদের জোর করে সরিয়ে দেওয়া হলো। এবার একটা ভাঙা বাজারের মধ্যে ডালসে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার অজুহাতে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তারা তাদের উচ্ছেদ করলো। এবার ডালসে এক গীর্জার গোশালায় আশ্রয় নিলেন।

এই সময় সিস্টার ডালসে অসাধ্য সাধন করে বসলেন। রুগ্নদের শুশ্রূষা করা, ওষুধ দেওয়া এবং প্রায় শতাধিক আশ্রিতের মুখে দৈনিক অন্ন জোগানো।

এবার কিছু মানুষের চোখ পড়লো সিস্টার ডালসের কাজের উপর। তাঁরা সংগঠন করতে সুরু করলেন। বিশ্বচিকিৎসা সহায়ক সমিতি থেকে আসতে লাগলোওষুধ, খাদ্য ও শান্তি সমিতি পাঠাতে লাগলো খাবার। ক্যাথলিক সাহায্য সমিতি পাঠাতে লাগলো গুঁড়া দুধ, ডালসের আতুরাশ্রমের স্বপ্ন এবার সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিল। ১৯৫৯ সালে ডালসে ১৫০ বেডের এক আতুরশালা নির্মাণ করলেন, সেজন্য এক লাখ ডলার চাঁদা উঠে এলো অনায়াসে। তিনতলা হাসপাতাল, নাম হলো এলবার্গ সন্তো এন্তোনিও। এবার অনেক স্বেচ্ছা-সেবকও এসে ডালসের কাজে যোগ দিলেন।

সিস্টার ডালসে বস্তির ছেলেদের কার্যকরী শিক্ষা-দানের ব্যবস্থাও করলেন, এদের তিনি নাম দিলেন 'ক্যাপটেন অব দি স্যাণ্ড'—বালুকা-সর্দার।

বছরে চল্লিশ হাজার ছেলে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়। এই কাজ করতে গিয়ে ডালসেব শরীর ভেঙে গেছে, কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হননি, তিনি বলেন—এতো মানুষের সাহায্যের দরকার, আমি চুপ করে থাকি কেমন করে, কাজ তো করতেই হবে।

ওদেশে এখন আরেক ধরণের সেবাকর্ম দেখা দিয়েছে। কোরিয়ায় বোমা পড়াব ফলে কোন ছেলে অনাথ হয়েছে। সেবাব্রতী পাদ্রী তাকে পথ থেকে তুলে এনেছে আশ্রমে। সেখান থেকে সারা বিশ্বের গীর্জায় গীর্জায় খবর যায়,—কোরিয়ার এক অনাথ বালককে কেউ মানুষ করবে কি?

কোন সদাশয় সাহেব হয়তো বললেন—এই ছেলেকে আমি মানুষ করবো।

তখনই খবব গেল কোরিয়ার সেবাব্রতী সমিতির কাছে, সেই কোরিয়ার অনাথ বালক জাহাজে রওনা হলো আমেরিকার পথে। অনাথ কোরিয়ান হলো মার্কিন পরিবারের পোষ্যপুত্র।

এইভাবে বহু বালকবালিকার জীবনের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ইউবোপে আরেকটা সমিতি গড়ে উঠেছে—ফস্টার পেবেণ্টস্ প্ল্যান—পালকপিতা পরিকল্পনা। কোথাও কোন বালক কি বালিকা অর্থাভাবে পড়াশুনা করতে পারছে না, পালকপিতা সমিতি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। এরা ইস্কুলের মাইনে দেবে, বই কিনে দেবে, জামাকাপড় দেবে, অসুখে চিকিৎসাও করাবে। টাকা জোগাড় হয় সদস্যদের কাছ থেকে। এদের সদস্য সংখ্যা ছ'লাখ। যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, সংঘ বা সমিতি এর সদস্য হতে পারেন। মাত্র এক বছর মাসিক ৭০৲ টাকা করে পাঠালেই এর সদস্য হওয়া যায়। প্ল্যানের কর্মকর্তারা সেই টাকাটা খরচ করেন এক বছর ধরে একটি ছেলের জন্য। দাতা নিজের রুচিমত বলতে পারেন—আমার টাকাটা অমুক দেশের অতো বয়সের ছেলের জন্য কি মেয়ের জন্য খরচ করতে হবে। প্ল্যানের কর্মকর্তারা তা-ই করবে। ছেলের ফটো ও পরিচয় আসবে পালক-

পিতার কাছে। ছেলের কাছেও যাবে পালকপিতার ফটো। কিন্তু দুজনের কেউ কারও ঠিকানা জানাবে না। চিঠিপত্র লিখতে পারবেন উভয়েই, তবে তা চলবে প্ল্যানের কার্যালয় মারফৎ। প্ল্যানের কার্যালয়ে প্রয়োজনমত চিঠিপত্র অনুবাদ করিয়েও পাঠাবে। এক গ্রীক ছেলের পালকপিতা হলেন মার্কিন যুক্তরাজ্যের এক ইংরেজ। পাঁচ বছরের গ্রীক ছেলে সাহায্য পেয়ে পাঠশালায় পড়তে লাগলো। প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে গ্রীকভাষায় চিঠি লিখলো পালকপিতার কাছে। প্ল্যান-আপিসে সেই গ্রীক চিঠি ইংরাজিতে অনুবাদ করে মার্কিন মুলুকে পাঠালো। আবার ইংরাজ পালকপিতা শুভেচ্ছা জানিয়ে ইংরাজিতে চিঠি লিখে দিলেন। প্ল্যান-আফিসে তার গ্রীক অনুবাদ হয়ে ছেলেটির কাছে গেল। পরস্পরকে ঠিকানা জানানো হয় না। তার কারণ স্বেচ্ছায় তিনি ৭০৲ টাকা মাসে মাসে দিচ্ছেন, পোষ্যপুত্র আরো কিছু বেশী পাবার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করতে না পারেন। আবার যিনি মাত্র এক বছরের জন্য টাকা দিলেন, তাঁর কাছে সরাসরি আরো টাকা দেবার জন্য দাবী না জানায়।

এই প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি ছাড়া সংঘ সদস্যও আছেন। একটা ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে মাসে ৭০৲ টাকা পাঠাতে লাগলো। একটা কোন কলেজের একদল ছাত্র হয়তো সদস্য হ'লো। জেলখানার একদল কয়েদী বললো—আমরা এখানে যা রোজগার করি তা থেকে মাসিক ৭০৲ টাকা পাঠাবো। কেউ মাত্র ১ বছরের জন্যই টাকা দেয়, আবার কেউ হয়তো ছেলেটি উপার্জনক্ষম না হওয়া অবধি দিয়েই যায়। আবার এমন মানুষও সংঘে আছে যে পাঁচটি ছেলের জন্য মাসিক ৩৫০৲ টাকা করে দিচ্ছে। আমেরিকার এক ইস্কুলের এক ক্লাবের ৩৩জন ছাত্র টিফিনের পয়সা জমিয়ে প্ল্যান অফিসে পাঠিয়ে দিল,—একটা মেয়ের ইস্কুলে ভর্তি হবার টাকা। গ্রীসে এক গরীব ছেলের বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একদল মার্কিন ছেলে বড়দিনের সময় লোকের বাড়ী-বাড়ী পুতুল বেচে ৫৬৭ ডলার প্ল্যান-অফিসে পাঠিয়ে দিল—এই টাকায় ওই ছেলেটির নতুন বাড়ী করে দেবেন।

এই প্ল্যানের প্রধান কার্যালয় নিউ ইয়র্ক সহরে। বিশ্বের অনেক বড় বড় সহরে এর শাখা-অফিস আছে। এর কাজ সুরু হয় ১৯৩৭ সালে। এই ২৮ বছরে সারা বিশ্বে প্রায় এক লাখ ছেলেমেয়েকে এরা মানুষ হতে সাহায্য করেছেন। পোষ্যপুত্র যখন উপার্জনক্ষম হয় তখন প্ল্যান-অফিস থেকে পালকপিতার ঠিকানা জানিয়ে দেয় পোষ্যপুত্রকে। পরস্পরের কাছে তখন আর অজানার বাধা থাকে না। চিঠিপত্রে সম্পর্ক চলে সারা জীবন। সমুদ্র পেরিয়ে দেশদেশান্তরে মানুষে মানুষে দেখা হয় না বটে, কিন্তু ফটো ও চিঠি শ্রদ্ধা ও স্নেহকে সঞ্জীবিত করে রাখে। আর তারই সঙ্গে পালকপিতা বা পিতৃসঙ্ঘের একটা গর্ব থাকে যে একটি বালক অথবা বালিকাকে তারা মানুষ করতে পেরেছে।

পর পর চারটি বৈদেশিক উদাহরণ দিলাম। আমাদের দেশী উদাহরণও আছে। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ও অন্যান্য বহু সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। কিন্তু ৪৫ কোটি মানুষের দেশে এঁদের কাজ পর্যাপ্ত নয়, তার প্রধান কারণ অর্থ। আমাদের দেশে এই অর্থের সঙ্কুলান হতে পারে খুব সহজেই, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে সাহেবদের মত সচেতন নই। আমাদের কাজে রাজনীতিককে নিয়ে যে মাতামাতি হয়, কোন সমাজসেবীকে পরিচিত করার জন্য সে চেষ্টা হয় না। নির্বাচনের সময় দিনের পর দিন ধরে 'অক্লান্তকর্মীদের' যেভাবে পরিচয় পেতে থাকি, সেবাব্রতীর পরিচয় একদিনের জন্যও সেইভাবে পাই না। যদি তা হতো তাহলে এদেশে পথে পথে এতো মানুষ ভিক্ষে করতো না। ছোট ছেলে-মেয়েকে চুরি করে এনে বিকলাঙ্গ করে ভিক্ষে করানো আমাদের দেশেই সম্ভব হয়।

আমরা ওই সাহেবদের মত হতে পারবো কবে? আমাদের দেশেই বাইশশো বছর আগে পৃথিবীর প্রথম আতুরশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক। আমাদের দেশেই সংঘ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা ও সেবার আদর্শে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভগবান তথাগত বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগে, রাজা ও শ্রেষ্ঠীরা এগিয়ে এসেছিলেন সেই মানুষ গড়ার কাজে সহযোগিতা করতে। আজ রাজা নেই, কিন্তু শেঠরা তো আছেন, কিন্তু অনাথপিণ্ডদ যে সৎসাহসে নিঃস্ব হয়েছিলেন, সেই জাতের শেঠজী আজ আর কি নেই? ভারতভূমি কি মানবিকতার মহত্ত্বে আজ নিঃস্ব হয়ে এসেছে?

এক বাড়ী, আট ঘর

অনিলকুমার সমাজদ্বার, সাহিত্যশ্রী

ফ্লাট বাড়ী। ছোট ছোট সব পরিবার। ওপর নীচে মিলিয়ে আটটি ফ্লাট—সবাই মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবার। যেমন মন-কষাকষির আর প্রতিযোগিতার বিরাম নেই,—ঠিক তেমনই সুখ-দুঃখের ভাগাভাগিও আছে। সকলের সঙ্গে সকলের অন্তরঙ্গতারও বিরাম নেই।

ওপরের চারটি ফ্লাটের কোণের ঘরে থাকে রীতা, তার স্বামী আর ছোট খোকাকে নিয়ে। পাশেই থাকে রেখা, কন্যা বেলা আর বেলার বাবা। তার পাশের ফ্লাটে থাকে মালতী—কলেজে পড়ে দাদা ব্রতেন—ল কলেজে যাতায়াত আছে—ওদের মা আর বাবা। মালতীদের পাশে অনু আর সুখেন। ছেলেপেলে হয় নি।

নীচের ফ্লাটের একটা ঘরে মারা গেল তিন বছরের মেয়েটি। ডুকরে কেঁদে উঠলো মা মনীষা। বাড়াবাড়ি চলছিলো ক'দিন থেকেই। মারা গেলো আজ বিকেলে। তিন-চার বছরের সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি। বাপ-মা আদর করে ডাকতো বাবুই বলে। মুখে মিষ্টি হাসি সব সময়েই লেগে থাকতো। রঙীন ফ্রকটা পরে সাদা মোজা জুতো পরে যখন ঘুরে বেড়াতো মনে হতো বিলিতি কোন পুষ্টিকর বিজ্ঞাপনের ছবি।

বাড়ীময় একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো—অস্বস্তির ছায়া ঘনিয়ে এলো সমস্ত পরিবারে। মারা যাওয়ার সময়টা নেহাৎ অসময় বিশেষ করে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে যাওয়ার পক্ষে। সমস্তা 'আহা' 'উহু' করবার পক্ষে।

রীতা ময়দা মেখে জলখাবার বানাতে বসেছে—উনুন প্রায় ধরে উঠেছে—এ সময় গেলে অন্ততঃ সেখানে আধ ঘণ্টা বসতে হবেই। কয়লা পুড়বে অযথা, কয়লার যা দুর্ঘট। রেখার কাজ কম—স্বামী এক্ষুনি আসবে। জলখাবার মিষ্টির দোকান থেকে কিনেই আনবে অবশ্য তবে চা করে দিতে হবে আর খাবার সময় সামনে বসতেই হবে। রোজই বিকেলে তাকে সেজেগুজে প্রস্তুত থাকতে হয়—অফিস-ফেরৎ স্বামীর অপেক্ষায়। জলযোগান্তে তাব সাথে রোজই বেড়াতে যেতে হয়। চোখে সুর্মা দিয়ে মুখে পাউডারের প্রলেপ দিয়ে ভাল সাড়ী পড়ে প্রস্তুত হয়েছে সে—এখন নীচে শোকাতুরা মায়ের কাছে বসতে গেলে স্বামী অফিস থেকে ফিরে কষ্ট পাবেন, অসন্তুষ্ট হবেন। একই বাড়ী...না গেলে খারাপ দেখায়। উভয় সংকট। কী করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। রীতাকে ডেকে বললো—রীতাদি, আপনি যখন যাবেন আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন।

মালতীরা আজ পাশ পেয়েছে। থিয়েটার দেখতে যাবে—প্রসিদ্ধ নাটক 'সেতু' দেখতে। সবাই যাবে ওরা—বাবা, মা, মালতী আর দাদা। গিন্নী অসম্ভব মোটা। মালতী বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে—বিভিন্ন পোজের মুখভাব বিভিন্ন কোণ থেকে নিরীক্ষণ করছিলো—প্রসাধন শেষ করে চোখে সুর্মার টান দিচ্ছিলো আর আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে গাইছিলো—বোল রাধা বোল সংগম হোগা কী নহী...আর্তনাদে হোঁচট্ খেয়ে থেমে গেলো গান :

: মেয়েটা বোধ হয় মারা গেল রে মলি। তাড়াতাড়ি সেরে নে। নীচে ওদের কারো সাথে দেখা হলে লজ্জায় পড়তে হবে। মা বললেন।

: ঠিক্ বলেছো মা। টপ্ করে চুপি চুপি আমরা বেরিয়ে পড়ি। কাঁধের কাছে সাড়ির কুঞ্চিত অংশ থেকে সোনার পিনটা চতুর্থবার লাগাতে লাগাতে মলি বললো।

গিন্নী মেয়ের দিকে পিছু ফিরে সাড়িতে তার গোড়ালি দু'টো ঠিকমত ঢেকেছে কিনা—মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে কর্তাকে বললেন : কই গো—তোমার হলো? বুড়ো বয়সে তোমার আবার অতো সাজবার দরকার কি বাপু.....

নিজের মুখ নানাভাবে দেখতে দেখতেই মালতী বললো...'হুঁ'।

মা জ্বলে উঠলেন—নিজেকেই নিয়ে মেয়ে ব্যস্ত।

কট্‌মট্‌ করে মেয়ের দিকে চেয়ে তাকে ভেংচে উত্তরের প্রতিধ্বনি করলেন "হুঁ! একটু ভালো করে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারো না?"

মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে—নিজেই আয়নার সামনে এসে বেশ-বিন্যাসে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চোখ দু'টোর দৃষ্টি যতটা সম্ভব পেছনে নিক্ষেপ করে পেছনটা দেখে নিলেন। শরীরের অত্যধিক স্থূলতাব জন্য দৃষ্টি নিতম্বেই রুদ্ধ হয়ে যায় গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছয় না। মায়ের রকম দেখে মেয়ে হেসে ওঠে। "তাড়াতাড়ি চলো না মা, দেরী হয়ে যাচ্ছে যে··· "

যা ভয় করছিলো ঠিক তাই হলো—চুপিচুপিই সিঁড়ি দিয়ে তারা নামছিলো—বাবুইর বাবা রণবীরবাবু রুক্ষু উস্কুখুস্কু চুল, মুখে বিশ্বের বিষাদ কালিমা—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিলেন বোধ হয় ওপরতলার ভদ্রলোকদের সাহায্য প্রার্থনা করতে—সৎকারের জন্য। কিছু না বলা একেবারে অশোভন—মালতীর বাবা আনন্দোজ্জ্বল মুখখানাকে কৃত্রিম বেদনার আভাস এনে ধরা গলায় শুধোলেন: বাবুইর কি হয়েছিল?

সদ্য সন্তানহারা পিতার বুকে মানুষ বিশেষের ওপর কোন মান অভিমান থাকে না। ঢোক গিলে বললেন –টাইফয়েড···জমাট কান্নার একটা ঢেলা গলা থেকে বেরিয়ে এলো ছিট্‌কে যেন। পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

থিয়েটারে যাওয়া হয়তো ভাল দেখায় না—একবার ওদের ঘরে না গিয়ে। মালতীর বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, মালতী আর তার মা ভেতরে ঢুকলেন। মুখে সদ্য প্রসাধন করা উজ্জ্বলতাকে যথাসম্ভব করুণ করে'।

একটা ধব্‌ধবে ফর্সা চাদরে বাবুইর সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখটি শুধু খোলা দিব্যি চোখ বোজা—যেন ঘুমিয়ে আছে···সকালের ফোটা ফুল সন্ধ্যায় যেন ঝরে পড়েছে। মা আগলে বসে আছে···চোখে পলক নেই · মুখে ভাষা নেই—পাশে অনু।

সুখেন অফিস থেকে ফিরেই প্রস্তুত হচ্ছিলো বাবুইদের ফ্লাটে যাবার জন্য। স্ত্রী অনু সেই সকাল থেকেই ওখানে—দু'জনেই আজ অভুক্ত—গত রাতেও পালা করে স্বামী-স্ত্রী বাবুইকে আগলেছে।

মালতীদের প্রসাধন করা দেখে পাশের ফ্লাটের একটি মুখরা মেয়ে শুভ্রা বললো—আপনাদের থিয়েটারের দেরী হয়ে যাচ্ছে যে মলিদি'।

চকিত হলেন মালতীর মা···বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে শুভ্রার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে।

একে একে সকলেই এলো সমবেদনা জ্ঞাপন করতে। "পৃথিবীতে কেউ কারু না", "জীবনটা পদ্মপত্রে জল··· আত্মা অমর—সবই মায়া—নিয়তি কেন বাধ্যতে", "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়", "দেহি নো স্মিন্ যথা দেহ কৌমারং যৌবনং জরা—তথা দেহান্তর প্রাপ্তি-ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি"···ইত্যাদি নীতিকথা বললো···।

কার মামাতো বোনের ননদের ভাসুরঝির ছেলের কি হয়েছিলো আর তার মারা যাবার প্রসঙ্গে খুঁটিনাটি কোন কথাই বাদ গেল না—তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে—যাই···অনেক ইয়ে—বাকী আছে বলে একে একে উঠে পড়ে তারা।

মায়ের বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসা হাহাকার বাড়ীময় ছড়িয়ে থাকে।

রাত বারোটার পর কলরব করে বাড়ী ফিরলো মালতীরা। তখনও থেকে থেকে ভেসে আসছে মৃতা কন্যার মায়ের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস। মালতীরা 'সেতু' দেখতে পায়নি। দেখে এসেছে একটা হিন্দী সিনেমা—'সীমান'। একটা গানের কলি গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে মলি বললো—কী প্যাথেটিক সিন মা. নিজের লাভ লেভিকে অন্যকে সঁপে দিয়ে নিজে স্বেচ্ছায় কেমন প্রাণ বিসর্জন দিলো মা! আমি তো কেঁদেই ফেলেছিলুম।

মা বললেন—আমিও!

রাত প্রায় একটা দেড়টায় সিক্তবস্ত্রে বাবুইর বাবা আর সুখেন ফিরে এলো; মা আবার কেঁদে উঠলো।···

ভূস্বর্গ চঞ্চল

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

॥ ৩ ॥

তারপর ঝিলমের বুকে অনেক ঢেউ উঠেছে আবার মিলিয়ে গেছে বুদ্বুদের মতন। মহারাজ হরি সিং সিংহাসন হারিয়েছেন, রাষ্ট্রবিরোধী হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল বন্দী থেকেছেন শের-ই-কাশ্মীর আবদুল্লা। বক্সী গোলাম মহম্মদ ছিলেন বিপ্লবী কাশ্মীরের নেতা। তিনিও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দীর্ঘকাল—কিন্তু কাশ্মীরী জনসাধারণের জীবন-সমস্যা দূর করতে পারেন নি। কাশ্মীরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ বক্সী গোলাম মহম্মদও অনুপস্থিত। দু' দু'জন কাশ্মীরী নেতার স্বতন্ত্র কাশ্মীর রচনার মোহজালে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ ধরা পড়ে নি। বরং অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজ্য আজ কাশ্মীর। তার নিজস্ব আইন সভা রয়েছে। বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভার সভ্যরা নির্বাচিত। যুবরাজ করণ সিং এখন রাজ্যপাল। লোকসভায় কাশ্মীরের ছ'জন সদস্য রয়েছেন।

জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংশোধন হয়েছে। জমির মালিকানা হার এখন নির্দিষ্ট। আটষট্টি বিঘা চাষযোগ্য জমির বেশী জমি কেউ নিজের অধিকারে রাখতে পারে না। এই আইন বলবৎ হওয়ার ফলে সরকারের হাতে যে কয়েক হাজার একর জমি এসেছিল তা' গরীব প্রজাদের মধ্যেই বিলি করা হয়েছে।

কাশ্মীরের সেদিনকার জনজীবনে যে বিপুল পরিবর্তনের সুরু হয়েছিল তার জন্যে যে মানুষটির দান ছিল সবচেয়ে বেশী তিনি হ'চ্ছেন শেখ আবদুল্লা। কাশ্মীরের মানুষ তাঁকে ভালবেসে নাম দিয়েছিল শের-ই-কাশ্মীর। অর্থাৎ কাশ্মীরের বাঘ। ব্যাঘ্র-প্রতিম এই মানুষটির জীবন ছিল বিচিত্র। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরলেন আবদুল্লা। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক হিসাবে জীবনও সুরু করলেন। কিন্তু নিছক শিক্ষকতা করার জন্যে আবদুল্লা জন্মান নি। আলিগড়ে পড়বার সময় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। মুস্লিম-জাতিতত্ত্বের অলীক ভাবধারায় তাঁর তরুণ হৃদয় ভরপুর ছিল।

কাশ্মীরের মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য আবদুল্লা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলেন—নূতন দল সৃষ্টি হল। মুস্লিম কন্‌ফারেন্স। কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজার অত্যাচারে দরিদ্র মুস্লিমদের জীবন পিষ্ট। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারে তাদের জীবন আচ্ছন্ন—এ থেকে মুস্লিমদের জীবন মুক্ত করতে হবে। নূতন সংগঠিত দলের কার্যক্রম নিয়ে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করছিলেন।

এমন দিনে একটা ঘটনা তাঁর চোখের সামনে ঘটল।

আর সেই ঘটনা তাঁর ধ্যান-ধারণা বদলে দিল।

শ্রীনগরের কাছাকাছি একটা গ্রামের আপেল বাগিচার মধ্য দিয়ে শেখ আবদুল্লা হাঁটছিলেন। সহসা একটা আপেল গাছের ডাল ভেঙ্গে সেই সঙ্গে ছিটকে পড়ল একজন মজুর। আর খসে পড়ল অনেকগুলো কাঁচা-পাকা আপেল।

চাবুক হাতে ছুটে এল আপেল-বাগিচার মুসলমান মালিক।

মজুরটি হিন্দু; গাছে চড়ে পাকা আপেল সংগ্রহ করছিল। অসাবধানে ডাল ভেঙ্গে পড়ে গেছে। অনেক টাকার ফল নষ্ট হয়েছে। কুৎসিৎ গালাগালি দিয়ে মালিক মজুরটির পিঠে চাবুক বসিয়ে দিল। তার মজুরি বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখাল।

সেদিনকার মুস্লিম কন্‌ফারেন্সের তরুণ নেতা তাঁর চোখের সামনে দেখলেন যে, কাশ্মীরের একজন হিন্দু মেহনতী মানুষ নিগৃহীত হচ্ছে একজন ধনী কাশ্মীরী মুসলমানের হাতে। যেমন হিন্দু মহারাজ শোষণ করে গরীব মুসলমানকে। অর্থাৎ শোষণকারী জাত বাছে

শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর তিরোভাবোৎসব

[আশ্রমী]

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৭২ সাল পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর 'ছত্রিশ বর্ষীয়' তিরোভাবোৎসব সনিষ্ঠ ভাবঘন পরিবেশের মধ্যে চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে সুসম্পন্ন হয়। আশ্রমের মাতৃমন্দির প্রাঙ্গণে, সুসজ্জিত মণ্ডপতলে, পূর্ব্বদিন, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় অধিবাস মুখে সমবেত উপাসনা। উপাসনার পূর্ব্বে প্রবর্ত্তক কন্যাগণের উদ্বোধন সঙ্গীত ও পরে দেবী স্তুতি—দশ মিনিট নীরব ধ্যানে মায়ের স্মরণ, মনন, অনুধ্যান—পরে নবসঙ্ঘে প্রকাশিত "সঙ্ঘমাতৃকা" লেখাটি পাঠ করেন সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। লেখাটিতে সঙ্ঘের অন্তর সাধনারই তিনটি যোগপর্ব্বের আলোচনা—প্রথম উৎসর্গ যোগ, দ্বিতীয় আত্মসমর্পণ যোগ, তৃতীয় অধ্যাত্ম যোগের সম্পূরণে পূর্ণ যোগে প্রতিষ্ঠা। গুরুশক্তি তথা সঙ্ঘের মাতৃশক্তি দেহ বিসর্জ্জনে গুরু হৃদয়স্থিত হয়ে সঙ্ঘশক্তিরূপে আবির্ভূতা। শ্রীগুরুমন্দির প্রতিষ্ঠায় এই তত্ত্বই প্রকটিত হইবে। সঙ্ঘশক্তিই নব-রূপান্তরে জাতি-শক্তিতে পরিণত হইবে—ঋষি বঙ্কিমের কমলাকান্ত যে মাতৃরূপের স্বপ্ন দর্শন করেছিলেন তাঁরই কল্প-দৃষ্টিতে, সঙ্ঘোৎসবে সেই মাতৃশক্তিরই আজ আবাহন, আরাধনা। শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃবন্দনা এই সুরেই ছন্দিত হয়। তিনি বলেন, ইষ্ট-বিরহিণী মা তাঁর মন্দির পার্শ্বে গুরুমন্দিরে তাঁকে বসিয়ে যে মিলনের আনন্দ পাবেন, সেই আনন্দ রসেই হবে সঙ্ঘজীবনের নূতন সৃষ্টি। সকলে পাব হৃদয়ে নূতন প্রেমের স্বাদ—সেই রসাস্বাদনেই হবে সঙ্ঘত্বের নবজন্ম—বিশুদ্ধ জাতি শক্তিরূপে। সঙ্ঘের মধ্যে সুপ্ত গুপ্ত হয়ে রয়েছে সেই জাতিশক্তি, উহারই প্রকাশ পরিচয় তখন পাওয়া যাবে। এই বিশুদ্ধ জাতীয়তা শুধু মুখের বস্তু নয়, শুধু আদর্শ কথা নয়—ইহা সাধ্য বস্তু। ইহার সাধন-প্রকরণও আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কর্ম্মী সেবক সকলকে নিয়ে আমাদের বলতে হবে, তারা যে জাতিরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—আমরা যে সত্য জাতীয়তারই উপাসনা ও আবাহন করে চলেছি, ইহাই প্রতিপন্ন হবে আমাদের কর্ম্মে, আমাদের সাধনায়, আমাদের উৎসবে। আগামী বর্ষের ২২শে অগ্রহায়ণ থেকে ২২শে পৌষ পর্য্যন্ত যে উৎসব পর্ব্ব, তার মর্ম্মই হবে এই সকল সংগঠনী আয়োজন।

সঙ্ঘাচার্য্য শ্রীসূর্য্যনারায়ণ তর্কতীর্থ স্বভাবোচিত শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায় সতী-শিরোমণি সঙ্ঘজননীর স্মরণে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পরদিন ২২শে অগ্রহায়ণ। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনটিতেই মায়ের তিরোভাব ঘটে—তাই এই দিনটি বিশেষভাবে কায়মনোবাক্যে পালন করা হয়। এবার এই দিনটিতে আবার পূর্ণিমা তিথির সংযোগ ঘটায় এইদিন প্রাতঃকালে মাতৃস্তুতি ও সঙ্ঘবাণী পাঠের পর সমবেত উপাসনান্তে পূর্ণিমা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়।

না। কারণ গরীব, গরীব। সে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। অতএব গরীবের পক্ষে যে দাঁড়াবে তারও জাত বাছলে চলবে না। গরীবের মধ্যে ভেদাভেদের আড়াল তুলে ধরলে শোষণকারীর শোষণ আরও দৃঢ় হবে।

মুস্লিম কন্‌ফারেন্স ভেঙ্গে দিয়ে নূতন সংগঠন গড়ে তুললেন আবদুল্লা—ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স। তখন থেকে আর কেবল মুসলমানদের নেতা রইলেন না। নেতা হলেন সমগ্র কাশ্মীরের হিন্দু মুসলমান গরীব মানুষদের।

উনিশ শ' আটচল্লিশ সালে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শেখ আবদুল্লা গরীব কাশ্মীরীদের ভুললেন না। ওরা তাঁর বহুদিনের সাথী—বহু আন্দোলনের কমরেড। তাদেরকে শোষণের হাত থেকে বাঁচান তাঁর পবিত্র কর্তব্য। তাদের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আর দরিদ্র কাশ্মীরীদের উন্নতি করতে হলে সমগ্র কাশ্মীরের ভূমি-ব্যবস্থার সংশোধন প্রথম প্রয়োজন। শেখ তা' বুঝেছিলেন। (ক্রমশঃ)

একটি সঙ্গীতের পর পূর্ণিমান্তিক ভাষণে সঙ্ঘ-সভাপতি "সঙ্ঘমাতৃকা" লেখাটিরই মর্ম্মকথা বিশেষভাবে পুনশ্চ পরিবেশন করেন।

২২শে অগ্রহায়ণর সারাদিন মাতৃচেতনা, মাতৃ-অনুধ্যান ও মাতৃনাম জপেই অতিবাহিত হয়। উপাসনা-পর্ব্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর পর চলে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ, সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ, ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা ও আরতি। তৎপরে মধ্যাহ্ন হইতেই একদিকে "সচ্চিদানন্দময়ী মা"—মাতৃনামের অনাহত জপ-ধারা—অন্য দিকে অবিরাম "ওঁ হ্রীং শ্রীং সঙ্ঘমাতৃকায়ৈ স্বাহা" মন্ত্রে সাজ্য বিল্বপত্রাহুতি—হোমশিখায় আশ্রমভূমি উদ্ভাসিত, মন্ত্ররবে আবাবিত, আপূর্ণ সারাদিন এক স্থির শান্ত গভীর গম্ভীর মহাভাব। পূর্ণাহুতির পর সঙ্ঘগুরুদেবের দিনলিপি হইতে তাঁর সময়োপযোগী বাণী পাঠ করেন শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। পরে পবিত্র ভস্ম-তিলকের তর্পণ ও ললাটে লেপন—হিন্দুভারতের এ এক অভিনব পবিত্র চিত্র। দলে দলে নরনারী এই পবিত্র হোমটীকা গ্রহণে সাগ্রহে আগুয়ান। আজ সমগ্র আশ্রম ক্ষেত্রে মাতৃভাবেরই আবহাওয়া। নবান্ন প্রসাদ গ্রহণে উপবাসীদের উপবাস পারণের সঙ্গে সঙ্গে সমাগত সমস্ত নরনারী আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই নবান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২৩শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার পর্য্যন্ত কথকতা। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীঅমূল্যকুমার গোস্বামী মহোদয় চৈতন্য-চরিতামৃত অবলম্বনে প্রথম দিনে রাসবিলাসে শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপ প্রসঙ্গে গোলক, বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ—রাস, মহারাস ও মহামহারাস—প্রেমেরই ত্রিলীলা—পূর্ণ, পূর্ণতর ও নাম-মাহাত্ম্যের পূর্ণতম রূপ, বাংলার স্ব-প্রতিভা সৃষ্টিতে এই মহিম্ন বোধ গোস্বামী মহাশয়ের পরিবেশনে বেশ পরিস্ফুট হয়। দ্বিতীয় দিনের বিষয়বস্তু ছিল—"জাতির চেতন শ্রীচৈতন্য", গোস্বামীজী অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন। বাংলার এক দুর্দ্দিনে যুগ-বিপ্লব নিয়ে আসেন শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় চেতনায়। অতি তথ্যপূর্ণ আলোচনায় বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করে তোলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের কথকতার আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে "পরশমণি শ্রীচৈতন্য" ও "ভারতীয় সাধনায় মুক্তিদিশারী শ্রীচৈতন্য" অতি সুন্দর তত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত সহযোগে গোস্বামীজী পরিবেশন করেন। তত্ত্বগুলি শাস্ত্রমূলক—বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত সূত্র—দৃষ্টান্তগুলি জীবন থেকে, বাংলার সাধক সাধিকার দৃষ্টান্ত থেকে গৃহীত। গোস্বামীজীর প্রতি কথায় বাংলা ও ভারতের সংস্কৃতির গৌরবের অনুভূতি ফুটে উঠেছিল।

রবিবারের উৎসব সভাও ছয় দিনের ভাবধারারই অনুরূপ মাতৃমুখী পরিবেশই সৃষ্টি করে। সভানেত্রী দমদম সরোজিনী নাইডু কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীবীণা সেন-গুপ্তা মাতৃভাবেরই ধারিকা ও বাহিকারূপেই সভাক্ষেত্রে আসীনা হন। তাঁর বক্তৃতার মধ্যেও মায়ের গুণপনা, মায়ের মহিমময়ী চরিত্রই স্ফুট হয়ে উঠে। সভানেত্রীর পরিচিতি, মায়ের কথা—সভার উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত সবই মাতৃমুখী। ত্রিযুগান্তে মাতৃতিরোভাবোৎসব যেন এক জমাট মাতৃমহিমারই মহিম্ন স্তুতিরূপে এবারকার উৎসবে ঘনাইয়া উঠে।

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

ধ্যান :

অনিত্য ধনের চিন্তা হইতে মনকে নিত্য বস্তুতে আরোপ করাই ধ্যান। যতক্ষণ মন নিত্যে অবস্থান করে ততক্ষণ সাধকের বহির্জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, সে নির্ব্বিকল্প আনন্দে মাতিয়া থাকে। শরীরজ্ঞান তিরোহিত হয়। সুখদুঃখ জগতের যাবতীয় ভৌতিক, মানসিক পীড়া হইতে সে মুক্তি লাভ করে। এরূপ ধ্যান অভ্যাস করিতে হইলে জীবনে সর্ব্ববিধ কামনা বিবর্জ্জিত হইতে হইবে। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ ব্যতীত এ অবস্থা লাভ করা সুদূরপরাহত।

সংসার ও সন্ন্যাস :

সংসারের চৌদ্দ আনা সংসারী লোকই মনে করেন ধর্ম্মসাধনা তাঁহাদের ভাগ্যে নাই। না করিলে যেন নয় এইভাবে যে কোনও প্রকারে ইষ্টমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য ছুটাছুটি করেন। বাকী দুই আনা লোক উৎকট-তপস্যার অনুরাগী। তাঁহারা প্রচার করেন সংসারী লোকের মুক্তি নাই—সংসার করিলেই বাসনা-কামনার বেড়াজালে আবদ্ধ হইতে হয়। বস্তুতঃ বাহির হইতে ইহা দেখায় বটে কিন্তু ইহাই কি বাস্তব ?

সংসারী কে নহে ? আমি স্ত্রী, পুত্রপরিবার প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া ইষ্টকনির্ম্মিত ভবনে বাস করিতেছি, তুমি শিষ্যশিষ্যা প্রভৃতি লইয়া বাস করিতেছ ; আমার উপাদান পুত্রকলত্র, তোমার সংসারের উপাদান হয়ত ধর্ম্মবন্ধু ছাত্রমণ্ডলী—যাহার যেমন সংগ্রহ সে সেইমত সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সংসার-রঙ্গমঞ্চে লীলা করিতেছে। তুমি ভিক্ষার ঝুলি লইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছ, শাস্ত্রবচন বিতরণ করিয়া দশের অর্থ একত্র সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রের সেবা, সন্ন্যাসীর মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেছ, আমি ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, দরিদ্র ছাত্রদিগের অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করিতেছি। তুমিও তোমার মণ্ডলীর জীবন চালাইয়া উদ্‌বৃত্ত অর্থে সদনুষ্ঠান করিতেছ, আমিও আমার পরিবারমণ্ডলীর অত্যাবশ্যকীয় খরচ সঙ্কুলান করিয়া দশের ও দেশের কার্য্যে সাহায্য করিতেছি। এইরূপ হইলে তোমার সন্ন্যাসে ও আমার সংসারে প্রভেদ কি ? ত্যাগধর্ম্ম ও ভোগজীবনের মধ্যে এই বিরোধ দীর্ঘ-যুগের।

বর্ত্তমানে এই বিরোধ মিটাইয়া সাম্যপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রচার করিতে হইবে—ভগবান তাঁর সকল লীলার মধ্যেই বর্ত্তমান। কেবল বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেই চৌদ্দ আনা সংসারী লোক দেশের বোঝা বৃদ্ধি করিতে কোনও যুগেই দৌড়াইবে না। স্ব স্ব অবস্থাতে থাকিয়াই সনাতন শিক্ষা অবলম্বনে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মচৈতন্যের উন্মেষ করিতে হইবে। উপায় কি ?

উপায় ভগবান। সমাহিত চিত্তে তাঁহার চরণাশ্রয় করিলে আমরা জটিল লীলারহস্য অবশ্যই বুঝিব। বিদ্যাভিমান, ঐশ্বর্য্যাভিলাষ, সাম্প্রদায়িক ভাব সকলই ত্যাগ করিতে হইবে—একমাত্র ভগবানকেই আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তখনই আমরা খণ্ডতার মোহ মুক্ত হইয়া পূর্ণতার আস্বাদ পাইব। তখনই বুঝিব এতদিন যাহা বুঝিয়াছি সবই ভ্রম। কি বুঝিব। বুঝিব যে বাসনা পরিত্যাগ-কল্পে সংসার ত্যাগ করিতে চলিয়াছি সে বাসনা সংসারে জড়ান নাই—আছে আবেগময় মনে, এই মন লইয়া যেখানে যাইব সেইখানেই বিষয় সংস্পর্শে বাসনার জাল বুনিয়া ফেলিব। মূর্খতায়, হীনতায়, অজ্ঞানতায় আমরা বাসনার মধ্যে আনন্দের অন্বেষণ করি, কিন্তু ভগবান বিষয়রূপে আছেন ইহা বুঝি না ; এই অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলেই "পাঁকাল মাছের" মত সংসারে আমরা বাসনা-পরিশূন্য হইয়া নিয়ত ভগবৎ-সঙ্গই লাভ করিয়া সদানন্দে থাকিতে পারিব। আমরা যে তাঁহারই যন্ত্র, তাঁহারই শক্তি সঞ্চালনে নানা রঙ্গ করিতেছি। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন —"বাজীকরের মেয়ে শ্যামা—যেমন নাচাও তেমনি

নাচি"। একবার কায়মনোবাক্যে স্পর্দ্ধা করিয়া বল "তোমাদের সমস্ত কর্ম্ম ভগবানের"। সংসার ত্যাগ করিলেই যদি ভগবান লাভ হইত তাহা হইলে বল ত অমৃতে কাহার অরুচি, শঙ্করচার্য্যের আহ্বানে জগতের সব লোকই সন্ন্যাসী হইত। তাহা হয় নাই, হইবে না, মানুষ যে অবস্থায় আছে তাহা তাহার ইচ্ছাকৃত নহে, ভগবানের ইচ্ছাতেই সকল অবস্থার সংঘটন। তবে দারিদ্র্যতার পীড়নে, প্রাচুর্য্যের সম্ভোগে, সংসার-নাট্যে, সন্ন্যাস-বৈরাগ্যে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র তাঁহাকে পাওয়া যাবে না কেন? এই সরল কথাটা বুঝিয়া হে মোহগ্রস্ত বাংলার কোটী কোটী সন্তান, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও অবস্থায় থাকিয়াই অমৃতের অনুসন্ধান কর।

আত্মকথা :

প্রবর্ত্তকের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হল—আজ তার হিসাব-নিকাশের দিন।

নবযুগে ভারতবর্ষ যে বাণী শ্রবণ করেছে, সে মানুষের নহে, কোন সম্প্রদায়বিশেষের নয়, সে মর-জগতেরও নয়—সে অপার্থিব বিধাতার, সে শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খের গম্ভীর নিনাদ যে মরজগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের নিগূঢ় সঙ্কেত—তাই আমাদের গতি অপ্রতিহত পাহাড় ভেদিয়া সাগর ছেঁচিয়া আমাদের পথ প্রস্তুত করতে হবে—এ যে ভগবানের আহ্বান।

আমরা এই এক বৎসর ধরে অতি ক্ষীণ স্বরে গেয়ে গেছি বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে আমাদের হৃদয়-সঙ্গীত—আমরা জানতে চেষ্টা করেছি আমাদের লক্ষ্য কি? আমাদের কিসের আকাঙ্ক্ষা? আমরা ইঙ্গিতে বলেছি আমাদের পথে কত বাধা, কত বিভীষিকা, কত বিপদ, জানি না আজ একজনও আমাদের অস্ফুট বাণী বুঝেছেন কিনা—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন কিনা—আমাদের মর্ম্মবেদনার অংশভাগী হয়েছেন কিনা?

আমরা সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেশের হৃদয় জয় করতে চাই, আমাদের আদর্শের পথে দেশই যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। পুরাতনের গতিবেগকে অন্তর্হিত করে দেশকে নূতনের অধিকারে আনতে চাই। ভগবানের খণ্ড আদর্শ ভেঙে তার পূর্ণ স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। অসংখ্য আত্মবিলসিবের মধ্যে যে কপট আত্মপ্রতিষ্ঠার লোলুপ রসনা বিস্তার করছে তার ভুল ভেঙ্গে দিতে চাই—ব্যক্তিগত জীবনের প্রাধান্যের তলে দাঁড়িয়ে যারা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়বিশেষের সৃষ্টি করতে উদ্যোগী তাদের সে পুরাতন প্রথা অবসারিত করে দিতে চাই। চাই ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড সত্যের উপাসক করে তুলতে—চাই ভোগের ও যোগের সমন্বয় সাধন করে এই জগতেই স্বপ্নলব্ধ সে স্বর্গরাজ্যের স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করতে। আত্মশক্তির উদ্বোধন করে ঋতময় জীবনলাভ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষকেই দেবলীলার ক্ষেত্র করে তুলতে।

আমরা সারা বর্ষ ধরে এই সঙ্গীতই গেয়ে এসেছি। আমরা এই মহান আদর্শেরই উপাসক—আমরা আত্ম-শক্তির দ্বারাই আমাদের অতীত এক শক্তির উপলব্ধি করব। আমাদের ভোগও তাঁর, আবার ত্যাগও তাঁর—আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্দেশ্য সব তাঁরই নির্দ্দেশে; যখন মানুষের স্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা এসে আমাদের এই যোগ ভঙ্গ করবার উদ্যোগ করবে তখন তাঁরই কথা গেয়ে আত্মজয় করব।

মচ্চিতঃ সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।

শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত

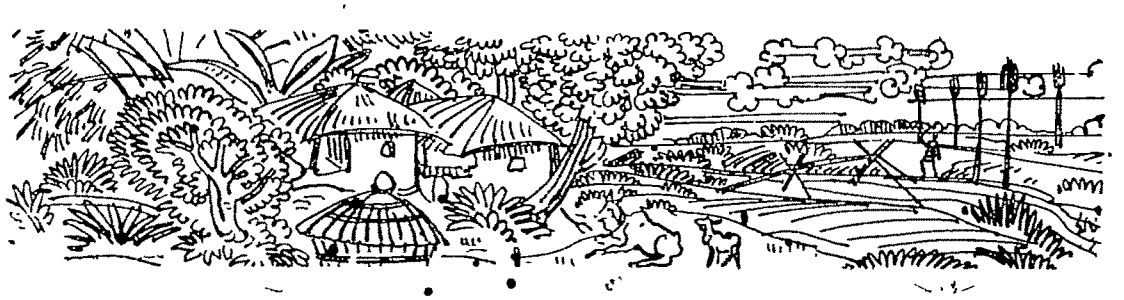

সাময়িকী

বাংলা ও ফরাসী সাহিত্যের সম্পর্ক :

গত ২০-এ নবেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানে ফরাসী রাষ্ট্রদূত মঃ জাঁ দারিঁদ গ্রন্থাগারিক শ্রী ওয়াই. এম. মুলের হাতে ৫৪খানি নির্বাচিত ফরাসী পুস্তক উপহার দেন। এই উপলক্ষে বক্তৃতাকালে ফরাসী রাষ্ট্রদূত বাংলা ও ফরাসী-সাহিত্যের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী প্রাচীন সংযোগের কথা উল্লেখ করেন। মঃ দারিঁদ বলেন, গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথম ভাগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভেরসাইয়ে একশটি সনেট রচনা করেন। উভয় দেশের সাহিত্য সম্পর্কের এটাই সূত্রপাত। মঃ দারিঁদ বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক আঁদ্রে মরোয়ার কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক গ্রন্থাগারই আন্তর্জাতিক বুঝাপড়ার কেন্দ্র। ফরাসীরা এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যথার্থ আনন্দ লাভ করে এবং তাদের কাছে গ্রন্থ উপহার দেবার মত আর কিছু নেই।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ শ্রীগুরুমন্দির :

বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, প্রাতঃ ৭॥০ ঘটিকায় চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে, শ্রীগুরুভবনে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের সভাপতিত্বে শ্রীগুরুমন্দির নির্ম্মাণ কমিটির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে পূর্ব্ব অধিবেশনের রিপোর্ট প্রকাশ, ১৩৭২ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত স্মৃতি তহবিলে মোট অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে ৬৬,১২১·৬৪ টাকা। সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মূল সঙ্কল্প-ব্রতটির প্রসঙ্গে বলেন—শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রহই আমাদের মূল ব্রত নয়। আমরা, যাঁরা তাঁর দীক্ষিত সন্তানসন্ততি—তাঁরা প্রত্যেকে অন্যূন ৫০ জন দেশবাসীর নিকট অন্তরের বিশ্বাস ও আদর্শের কথা নিবেদন করার উপরই নির্ভর করিতেছে শ্রীগুরুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। ভাবপ্রচার এবং অর্থসংগ্রহ যুগপৎ সঙ্কল্প ব্রত পূরণেই সিদ্ধ হইবে। ব্রতপূর্ত্তির আর মাত্র ৭ মাস বাকী। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রত যাহাতে পূর্ণ হয় তাহার দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে স্থির হয় উহা কলিকাতার প্রখ্যাত ভাস্কর জি. পাল এণ্ড সন্স-এর শ্রীমণি পাল দ্বারাই করান হইবে। উঁহাদের সহিত ব্যবস্থাদির ভার দেওয়া হয় সম্পাদকের উপর। পরিশেষে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, আগামী ২২শে পৌষ শ্রীগুরু দেবের আবির্ভাব দিবসে যে সহযোগী সঙ্ঘের সম্মেলন হইবে তাহাতে এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ভারতে ব্রিটিশ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী :

ব্রিটিশ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী মিঃ ডেভিড বেলামি ডারহাম (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি লইয়া ভারতে আসিয়া গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার গবেষণার কাজ চালান। মিঃ বেলামির গবেষণার বিষয়—স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও তার ওপর মানুষের প্রভাব। মিঃ বেলামি বলেন, "প্রকৃতি ও মানব প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই উৎপাদন ও খাদ্যসরবরাহ বৃদ্ধির উপায়। এটি একটি বিশ্বসমস্যা এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যা। সেই কারণেই আমি ভারতকে আমার কাজ করবার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি।"

ভক্তিভারতী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের ৭৪ জন্মোৎসব :

নিবিড় নিষ্ঠা ও ভক্তিপ্লুত আবহাওয়ার মধ্যে গত ১লা পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় বাগবাজার ৭ডি, রামকৃষ্ণ লেনস্থ ভবনে 'সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী'র উদ্যোগে পরম ভাগবত শ্রীমৎ বঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তি-ভারতী মহাশয়ের ৭৪তম জন্মজয়ন্তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আচার্য্য শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং পৌরোহিত্য করেন ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। মঙ্গলাচরণ করেন পণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণবচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়। অনুষ্ঠান আরম্ভে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাস ভাগবতভূষণ সমবেত ভক্তবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তৎপরে কবি শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ স্বরচিত কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র সেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ভক্তিভারতীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

॥ শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস. ॥
শব্দার্থ তত্ত্ব ৫·০০ শব্দ তত্ত্ব ১৫·০০
বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৲
জাতিভেদ ১৲
॥ পণ্ডিত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ॥
শ্রীশ্রীনামামৃত ২-২৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ৩-৫০
॥ কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥
পরার্থকথা ২-২৫
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

করিয়া ভাষণ দেন প্রভুপাদ পশুপতিনাথ গোস্বামী, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস গোস্বামী, মহান্ত মহারাজ (পুরী গম্ভীরা মঠ), কবিবর শ্রীপান্নালাল মাইতি, প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, শ্রীউমাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, অ্যাডভোকেট শ্রীপতিতপাবন চট্টোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট শ্রীআশুতোষ দাস, রাণী রাসমণি মিশনের সম্পাদক শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ভক্তিরত্ন প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমৎ বঙ্কিমচন্দ্র সেনকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করেন। পুরী হইতে শ্রীমৎ ওঁকারনাথ মহারাজ পত্রযোগে এবং প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী উপস্থিত হইয়া ভক্তিভারতী শ্রীসেনের দীর্ঘায়ুঃ কামনা করেন।

শনির রহস্য সম্পর্কে গবেষণা :

আলমা-আতা-"তাস" সংবাদপত্রে ১৮ই অক্টোবর তারিখ প্রকাশ হইয়াছে কাজাকাস্তানের জ্যোতির্পরার্থ বিদ্যা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা অধিকতর উচ্চ পর্য্যায়ে শনি গ্রহের বহু সংখ্যক আবহাওয়া প্রণালীর গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ইহার সহিত বৃহস্পতির আবহাওয়া গঠনের মিল আছে। উভয় গ্রহেরই আবহাওয়ায় কিরণের বিশ্লেষণ বন্টনে পরিবর্ত্তন একই প্রকার। এই অনুমানের সমর্থনে গবেষকেরা তথ্য পাইয়াছেন। উক্ত পত্রিকার সংবাদদাতাকে ইনস্টিটিউটের প্রধান অধ্যক্ষ হেইফেল জানান যে, ১৯৭৬ সনের বসন্তকালে শনি গ্রহের রহস্যজনক বলয় অদৃশ্য হইবে। ইহাতে গ্রহ-পৃষ্ঠে মিথেনের মলিকুলার বিশ্লেষণ বন্টন সম্পর্কে গবেষণা সহজতর হইবে। সেই সময় বিশেষ পর্যবেক্ষণে শনির বলয় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না। এই উদ্দেশ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৫০০ মিটার উচ্চে তিয়েন শান পর্বতমালার উপত্যকায় ৭০ সেন্টিমিটারের যে গ্রহ টেলিস্কোপ বসানো হইয়াছে তাহা ব্যবহার করা হইবে।

পূর্ণিমা সম্মেলন :

গত ৮ই নভেম্বর সোমবার রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের উদ্‌যাপন সভা অনুষ্ঠিত হয় গুরুনিষ্ঠ ভক্তপ্রবর সঙ্ঘের সহযোগী সভ্য শ্রীসৌরীন্দ্র ঘোষের ৪৮।৪ নং বেলেঘাটা লেন রোডস্থ বাসায়। সমবেত উপাসনা, ভজন প্রভৃতি সনিষ্ঠ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশে উৎসব সম্পন্ন হয়। সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সভ্য শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। শ্রীসৌরীন্দ্রের শুভাকাঙ্ক্ষী অগ্রজপ্রতিম ভক্তিপ্রাণ শ্রীজহরলাল চক্রবর্ত্তী এই উৎসব সভায় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, বহুকাল পূর্ব্বে জলপাইগুড়িতে শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষের বাসায় সঙ্ঘগুরুকে সন্দর্শন করার প্রথম সৌভাগ্য তাঁর হয়।

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

॥ কয়েকখানি সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থ ॥

॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু ॥

কর্ম্মবীর রাসবিহারী বসু—৫·০০

॥ বিপ্লবী নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ॥

বিপ্লবীবীর রাসবিহারী—৫·০০

॥ শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ॥

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—৫·০০

॥ ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ॥

অমৃতের সন্ধান ৬॥০

॥ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক ॥

মহাভারত কথামৃত—১০·০০

শঙ্করাচার্য্য ৫৲ **সাঁওতালী কথা** ২৲

॥ মনীষী পণ্ডিত গুণদাচরণ সেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (২য় সং) ৫·০০

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—১·৫০

॥ ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥

ভক্তের আলো ৪৲ **প্রজ্ঞার আলো** ১।০

॥ শ্রীমৎ স্বামী উপানন্দ মহারাজ ॥

আত্মার আলো ১·২৫

॥ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী ॥

গীতার আলো ১।০ **মহামায়া** ১।০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

সজ্ঘগুরুর সোনার কান্তি অঙ্গ হইতে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়া তিনি মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত হন। শ্রীচক্রবর্ত্তী শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন করেন এবং সজ্ঘগুরুজীর দিব্য আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। অতঃপর সমাপ্তি সঙ্গীত ও পূর্ব প্রশস্তির সঙ্গে উৎসব সমাপ্ত হয়।

বেলঘরিয়া প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ :

বিগত ১৪ই নভেম্বর বৈকাল ৩টায় প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থীপীঠের (বালক বিভাগ, বেলঘরিয়া) নব নির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক নির্ব্বাচন উপলক্ষে ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকারের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রীসরকার বলেন, যখন এই অঞ্চলে পূর্ব্ব-বঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু অসম্ভবভাবে ভারাক্রান্ত হয় এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তখন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ১৯৫২ সালে এই স্থানে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৫৩ সালে উক্ত বিদ্যালয় দুই শাখায় (বালক ও বালিকা) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ক্রমে উভয় স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপ নেয়। ১৯৫৩ সালের মার্চ্চ মাসে সজ্ঘগুরু এইখানে আসিয়া বিদ্যাপীঠকে আশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীযুত বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, শ্রীযুত রমেন্দ্রনাথ সরকার যথাক্রমে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন।

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী :

সংবাদে প্রকাশ, পুরানো ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর মালিকানা ও সম্পত্তির (১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত) প্রশ্নটি তিনজন বিচারক লইয়া গঠিত একটি ট্রাইবুনালের হাতে দিতে ব্রিটেন ও ভারত সম্মত হইয়াছে। জানা গিয়াছে, প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটী হইতে এই বিচারকদের গ্রহণ করা হইবে।

রিষড়া প্রেম-মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব :

প্রতি বৎসরের মত এবারও ২২-এ পৌষ '৭২ রিষড়া প্রেম-মন্দিরে আশ্রমাধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রী৺অর্দ্ধ নারীশ্বর দেবতার বাৎসরিক উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলাদেশে এইরূপ উৎসব অভিনব। এবার উৎসবের বিশেষ আকর্ষণীয় কর্ম্মসূচী—সন্ধ্যায় দেওঘর রামনিবাস আশ্রমের মোহন্ত পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজীর কীর্ত্তন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতৃ-গুরু শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীজী উৎসবে সবাইকে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

ব্রিটিশ-সুতী-শিল্পে ১৭শ শতাব্দীর ভারতীয় নক্সা :

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, তিন শতাব্দী পূর্বে ভারতে মুঘল আমলের শিল্পী রচিত নক্সা ওয়েষ্ট কাম্বারল্যাণ্ডের স্যার নিকলাস সেকার্স-এর সুতীশিল্প প্রতিষ্ঠান সুতী বস্ত্রে সার্থকভাবে তুলিয়াছেন। এই শিল্প-নমুনাগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। দুটি নক্সা লওয়া হইয়াছে

॥ সজ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ); ৭-৫০ **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ; **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত : "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

সপ্তদশ শতাব্দীর শ্বেতপাথরের ফায়রি থেকে। তৃতীয়টি আগ্রার কবরের দেওয়ালের নক্সা থেকে। এবং চতুর্থটী দিল্লীর লাল কেল্লার ভাস্কর্য্য থেকে।

কমনওয়েল্‌থ প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য পত্রিকা :

লণ্ডন হইতে ৭ই নভেম্বর এই পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে। এই বৎসরের মধ্যেই ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। অতঃপর এই পত্রিকা ষাণ্মাসিক রূপ-পরিগ্রহ করিবে। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকাটির ২ জন ভারতীয় ব্যক্তির রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান ডঃ বালচন্দ্র রামণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন "ভারতীয় ধর্ম্ম"। অপর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বোম্বাই-এর মিথিবাই কলেজ অব আর্টস্-এর ইংরেজীর অধ্যাপক মিঃ নিসিম এজেকিয়েল পত্রিকার আদর্শ কমনওয়েলথের ব্রিটেন ভিন্ন অন্যান্য দেশের সাহিত্য-সম্পদ ও প্রতিভার পরস্পর সংযোগ ও পরিচয় স্থাপন।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

২২-এ পৌষ : বর্ত্তমান পৌষের ২২-এ প্রবর্ত্তক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ পূজ্যপাদ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের ৮৪-তম আবির্ভাবোৎসব চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে সমবেত উপাসনা, প্রার্থনা, দীক্ষাযজ্ঞ, সহযোগী সভ্য ও ভক্ত-সম্মেলন, পূর্ণিমা-সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। ২৫-এ পৌষ ৯ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় উৎসব-সভাধিবেশন হইবে। এই মঙ্গলানুষ্ঠানে দেশবাসীর সহৃদয় উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

সর্বজন প্রশংসিত বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : [ফোন ৩৩-২৩০৩]

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]

বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি রুচিসম্মত কাপড়ের বিপুল সম্ভার। আধুনিক ডিজাইনের দেশী তাঁতের শাড়ী। গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার বিপুল আয়োজন।

An Important Announcement

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR ★ DOUBLE ENDED-GRINDER
★ POLISHING & BUFFING ★ FLEXIBLE SHAFT GRINDER etc. etc.

MANUFACTURED BY :

KSHAMA ELETRO WORKS

146, SHYMNAGAR ROAD, DUM DUM, CALCUTTA-28. Phone : 57-2799

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

দেশের গান

০·৫০

জাতিগঠনে খাদ্য

ডাঃ হরগোপাল বিশ্বাস

০·৫০

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা-বিভাগ)

(ক) জানুয়ারী—মার্চ, ১৯৬৪ (খ) এপ্রিল—জুন, ১৯৬৪ (গ) জুলাই—সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

প্রতি খণ্ড : ২·০০

॥ আইন সংক্রান্ত পুস্তিকা ॥

* পশ্চিমবঙ্গ ভূমি (সংগ্রহ ও গ্রহণ) (আদেশ বৈধকরণ) আইন, ১৯৬৫
* পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র (নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন আইন, ১৯৬৫
* ভূমি-গ্রহণ (পশ্চিমবঙ্গীয় সংশোধন) আইন, ১৯৬৪
* পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ (সংশোধন) আইন, ১৯৬৩
* হাওড়া সেতু (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫
* পশ্চিমবঙ্গ বেতন ও ভাতা (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫ * আরক্ষা পশ্চিমবঙ্গীয় (সংশোধন) আইন, ১৯৬৪
* কলিকাতা পৌরসংঘ (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫ * পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও সংস্থা (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫
* পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাষা (সংশোধন) আইন, ১৯৬৪ *

প্রতি খণ্ড : ০·১২

এবং

পশ্চিমবঙ্গ জিলা-পরিষদ আইন (১৯৬৩)—০·৬০
পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন (১৯৫৭)—০·৪০
পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ (সংশোধন) আইন (১৯৬০)—০·৭০
পশ্চিমবঙ্গ অ-বাসারিক নির্গমন আইন (১৯৬৫)—০·১৯
পশ্চিমবঙ্গ ওজন ও মাপের মান নির্ধারণ (বলবৎকরণ) (সংশোধন) আইন (১৯৬৫)—০·২৫
পশ্চিমবঙ্গ উপযোজন আইন (১৯৬৫)—০·৫০

—ঃঃ প্রাপ্তিস্থান ঃঃ—

নগদমূল্যে বিক্রয়-কেন্দ্র

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র,
নিউ সেক্রেটারিয়েট,
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড,
কলিকাতা—১

ডাকযোগে অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ,
প্রকাশন-শাখা,
৩৮, গোপালনগর রোড,
কলিকাতা—২৭

W. B. (I & P. R.) Adv. D 986/66

মিষ্টান্ন জগতে বিশেষ আকর্ষণ

ইন্দ্র'র

- উৎকৃষ্ট দধি
- মুগ-নারিকেলের খাবার
- সরেস দরবেশ ও মিহিদানা

বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে।
সকল অনুষ্ঠানেই সযত্নে অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ | ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৫-১৩৮৩ | ফোন : ৩৪-২৫৩৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃরোগে অদ্বিতীয়

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স কলিঃ-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিঃ-৬

ভারত শিল্প নিকেতন
আধুনিক; সম্পূর্ণাঙ্গ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইণ্ডিং কারখানা।
পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোনঃ ৩৪- ৩৭৯১

সূচীপত্র · প্রবর্তক : মাঘ, ১৩৭২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সদ্গুরু শ্রীমতিলাল	৪১১
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	৪১২
সম্পাদকীয়	...	...	৪১৩
সংগ্রাম ও শান্তির নির্ভীক নায়ক	জীবনী	শ্রীতারাশঙ্কর	৪১৬
শান্তিসেনা লালবাহাদুর	কবিতা	শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার	৪১৮
সভ্যতা বনাম কাব্য	প্রবন্ধ	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	৪১৯
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	৪২২
পাকা পাতার বাণী	কবিতা	শ্রীসুধীর গুপ্ত	৪২৬
স্বামী প্রণবানন্দ প্রসঙ্গে	স্মৃতি-চিত্র	শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২৭
বাংলা শিশুসাহিত্যে মূল্যায়ন	প্রবন্ধ	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ	৪৩০
ইরাবতী	কবিতা	নীতিশ মজুমদার	৪৩৩
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	ইতিবৃত্ত	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৪৩৪
পিতার স্বর্গলাভ	গল্প	শ্রীরাধাবল্লভ দে	৪৩৯
পঞ্চাশ বছর আগে	সঙ্কলন	শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত	৪৪১
সাময়িকী	...	... ...	৪৪৩

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় — ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৫০ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা | সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | মাঘ, ১৩৭২

জীবনের আলো

জানি কলি যুগ। নাম-কীর্ত্তন ছাড়া অন্য গতি নাই। যুগ-প্রবাহে ধর্ম্ম ভেসে যায়—তাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ করে ধর্ম্মানুভূতি অবধারণের উপায় নাম। আমি সর্ব্বাপেক্ষা না হলেও অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থাপিত করছি। নামও করতে হয় সাধ্য। আত্মসমর্পণ স্বতঃই হয় সিদ্ধ। হে মানব! ভগবানে আত্মসমর্পণ কর! তুমি শ্রীভগবানের। তোমার হৃদয়, তোমার বুদ্ধি, তোমার প্রাণ তাঁহাতে বাঁধা—এই বিশ্বাস রক্ষা করিও। বিশ্বাস হারাইও না। যেখানে দুইজন, পবিত্র সম্বন্ধের বন্ধন, সেইখানেই মূর্ত্ত নারায়ণ। একজন উৎসর্গের দীপ, অন্যজন জাগ্রত বিগ্রহ। এই উত্তম রহস্য উপলব্ধি কর।……নাম-সঙ্কীর্ত্তনের পরিণতি আত্মনিবেদন। আজ চারিশত বৎসরের অধিক—নাম-সঙ্কীর্ত্তন পর্য্যায় জাতি অতিক্রম করিয়াছে। চাই আজ জাতির আত্মসমর্পণ।…সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর। চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ সবকিছু অন্যের হাতে তুলে দাও, শ্রদ্ধাব ক্ষেত্রে উপনীত করে দাও—ধন্য হবে।……সাধন তো ভগবানকে নিয়ে নয়, সাধনা নিবেদনের অর্ঘ্য নিয়ে। পুষ্প, দুর্ব্বা, নৈবেদ্য প্রভৃতি সংগ্রহ ও রচনা পূজার কর্ম্ম। তদ্রূপ—বিশ্বাস, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম তোমায় সঞ্চয় করতে হবে তিলে তিলে। কারণ বিশ্বাসেব আগুন বুকের ভিজা পাঁজরায় জ্বলে না। ফুৎকার দিয়া অগ্নি রক্ষা কর; নিষ্ঠার পবিত্র ঊর্দ্ধশিখা জীবন সমুজ্জ্বল করবে। আলোর জগতে ভক্তি ও প্রেম যেন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ঝলমল করে। মানুষের ঐশ্বর্য্য ধন, প্রতিপত্তি নয়—দিব্য অন্তঃকরণ। কুণ্ঠাহীন হৃদয়ই বৈকুণ্ঠ। ভক্তিঘন মনই বৃন্দাবন। শ্রীভগবানেব ইহাই তো বিহার-ক্ষেত্র। কি আর চাও মানুষ! অন্তরের মণিকোঠায় যদি শ্রীভগবান বিরাজ করেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাওয়ার বস্তু মোহবশতঃ অবহেলা কর না।… ঈশ্বরচন্দ্রের দেবালয় এই দেহ, আর কিছু নয়। শোধন কর, সাধন কর দেহের। বিশুদ্ধ রাখ অন্তর, বাহির। দিব্য দেহে দেবতার আবির্ভাব। তাই আজ দেবজন্মের কথা। ইহা যুগবাণী। যুগের ধর্ম্ম গ্রহণ কর। শোন ভগবানের পাঞ্চজন্য। সান্ত্বনাব বাণী—"অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি"। অতএব উদ্যত হও। উৎসর্গ কর। ধন্য হও আত্মসমর্পণের মন্ত্রদীক্ষায়।

—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

(১৯৩৬ সালের দিনলিপি হইতে)

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। ঊনত্রিংশৎ সূক্তং।) দ্বিতীয়া ঋক

(সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

স্থিরা বঃ সন্তায়ুধা পরাণুদে বীলু উত প্রতিষ্কভে।

যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়—"বঃ" (আপনাদের) "আয়ুধা" (আয়ুধসমূহ) "পরাণুদে" (শত্রুনাশের নিমিত্ত) "স্থিবা সন্তু" (স্থির হউক) "উত" (আরও) "প্রতিষ্কভে" (শত্রুগণের প্রতিবন্ধক নিমিত্ত)) "বীলু" (দৃঢ় হউক) "যুষ্মাকং" (আপনাদের) "তবিষী" (বল) "পনীয়সী" (অতিশয়রূপে স্তবযোগ্য হউক) "মায়িনঃ" (ছদ্মচারী) "মর্ত্তস্য" (শত্রুর প্রভাব) "মা" (সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত হউক) ॥ ২ ॥

সরলার্থ—হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের আয়ুধসমূহ শত্রুনাশের নিমিত্ত স্থিব হউক; এবং শত্রুদের প্রতিবন্ধক নিমিত্ত দৃঢ় হউক। আপনাদের শক্তি আপনাদের স্তবনীয় হউক। ছদ্মচারী শত্রুর প্রভাব সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত হউক ॥ ২ ॥

পরা হ যৎ স্থিরং হথ নরো বর্ত্তয়থা গুরু।

বি যাথন বনিনঃ পৃথিব্যা ব্যাশাঃ পর্ব্বতানাং ॥ ৩ ॥

অন্বয়—"নরঃ" (হে নেতা মরুদ্‌গণ) "যৎ" (যখন) "স্থিরং" (স্থির, অবিচলিত) [বস্তুকে] "পরাহথ" (নির্ম্মূল করেন) "হ" (এবং) "গুরু" (ভারী. গুরুত্বপূর্ণ) "বর্ত্তয়থা" (প্রেরণ কবেন বা দূবে নিক্ষেপ করেন) তদা "পৃথিব্যাঃ" (তখন পৃথিবীর) "বনিনঃ (বনসকল) "বিযাথন" (বিযুক্ত হয়) "পর্ব্বতানাং" (পর্ব্বত-সকলকে) "ব্যাশাঃ" (বিচ্ছিন্ন করে) ॥ ৩ ॥

সরলার্থ—হে নেতা মরুদ্‌গণ! (অন্তরীক্ষলোকে) যখন আপনারা স্থির বস্তুকে নির্ম্মূল করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করেন; তখন পৃথিবীর বনানীকুঞ্জও বিযুক্ত হয়; পর্ব্বতসকলও বিচ্ছিন্ন. হইয়া পড়ে ॥ ৩ ॥

ন হি বঃ শত্রু বিব্বিদে অধিদ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদশঃ।

যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নু চিদাধ্বষে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—"হে রিশাদশঃ" (হে শত্রুনাশক মরুদ্‌গণ) "হি" (নিশ্চযই) "দ্যবি" (দ্যুলোকের) "অধি" (উপবে) "বঃ" (আপনাদের) "শত্রুঃ" (হিংসাকারী) "ন বিবিদে" (থাকিতে পারে না) "ভূম্যাং" (পৃথিবীতেও) "ন" (নাই) "রুদ্রাসঃ" (হে রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ) "আধৃষে" (শত্রুগণকে ধর্ষণ করিবার জন্য) "যুষ্মাকং" (আপনাদের) "তবিষী" (বল) "যুজা" (যোজনা দ্বারা) "নু চিৎ" (শীঘ্রই) "তনা অস্তু" (বিস্তৃত হউক) ॥ ৪ ॥

সরলার্থ—হে শত্রুনাশক মরুদ্‌গণ! আপনাদের শক্তিপ্রভাবে নিশ্চয়ই দ্যুলোকের উপরে আপনাদের হিংসাকারী কেহ থাকিতে পারে না। পৃথিবীতেও নহে। তথাপি হে রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ শত্রুগণকে ধর্ষণ কবিবার জন্য আপনারা সমবেত শক্তি লইয়া শীঘ্র বিস্তৃত হউন ॥৪॥ [এই তিনটি ঋকের বিশদার্থ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য]

সম্পাদকীয়

মৌন-বিষাদ

আমাদের কালে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অভূতপূর্ব্বপ্রায় একটি ঐতিহাসিক মহামৃত্যু আজকের বিশ্বমানুষ প্রত্যক্ষ করিল। ঘৃতপ্রদীপের স্নিগ্ধ শুচিতায় সে জীবনের মৃদু আলো ছিল মহিমান্বিত। প্রদীপের প্রসন্নতায় সেই প্রাণদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিজেকে নীরবে নিঃশেষ করিয়া গেল দেশহিতায়। সে-জীবন ঘিরিয়া বিজলী বাতির চমক ছিল না—না ছিল রাজসিক আড়ম্বরের বিস্ময় বিমূঢ়তা। উত্তেজনার কবতালি-ধ্বনির অভিনন্দন ছিল না—ছিল মৌন আত্মনিবেদনের পুণ্য আবেদন—ছিল শুচিতা, সদাচার আর সাত্ত্বিকতার দাক্ষিণ্য কারুণ্য। উত্তরাধিকারের জৌলুষ ছিল না, ছিল না কোন পরিচয় পত্র। ছিল আত্মতপস্যার পূতাগ্নির পুণ্য কিরণ-দীপ্তি। একটা অসীম প্রতিভার প্রতিশ্রুতি বিকাশোন্মুখ হইবার মুখেই অকালে রহস্যময় কালগর্ভে মিলাইয়া গেল। লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে আমরা হারাইয়াছি। হারাইয়া বুঝিয়াছি তিনি কি এবং কতখানি ছিলেন। মরণ তাঁর সত্য স্বরূপের পরিচয়টি উদ্ঘাটন করিয়া গেল। শাস্ত্রিজীর মৃত্যুর আকস্মিকতায় মর্ত্ত্য-মানুষ আমরা অভিভূত, বেদনার্ত্ত।

স্বর্গীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী

মাত্র উনিশটি মাস শাস্ত্রীজী ছিলেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু এই পদমর্য্যাদাই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন দরিদ্র ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতিভূ। অতি সাধারণ ঘরের মানুষ। বাল্যে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতেন, খেয়া-ভাড়া না থাকায় সাঁতরাইয়া নদী পার হইতেন, যৌবনে জুটিয়াছে অনাহার, কারাগার ও পুলিশের অত্যাচার। তারপর দিল্লীর মন্ত্রীতক্তে তিনি বসিয়াছেন, কিন্তু অতীতকে তিনি মুছিয়া ফেলেন নাই। রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া ফেলেন নি, সরল জীবনধারা, সহজ শিষ্টতা, বিনম্র চালচলন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি ধুতি-কামিজ পরিয়াছেন এবং আহার ও আচরণের শুচিতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

এই শতকে ভারতের পুণ্যভূমিতে বহু মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। শাস্ত্রীজী তাঁহাদের মধ্যেই নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজির সারল্য, নেহেরুজির শান্তিপ্রিয়তা, সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়তা এই মানুষটির মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছিল। নির্ম্মলতাকেই জীবন চর্য্যার শ্রেষ্ঠ পাথেয় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। শুভবুদ্ধি ও হৃদয়াবেগকেই তিনি সকল কর্ম্মের মূলসূত্র বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। সেইজন্যই প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণে তিনি দ্বিধা করেন নাই, আবার শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী হইতে তাঁহার নিষ্ঠার অভাব হয় নাই। শুধু কাগজে-কলমে কিম্বা বক্তৃতামঞ্চের সৌখীনতা লইয়া তিনি বিলাস করেন নাই। তাঁহার কর্ম্মে ছিল সত্যনিষ্ঠা ও প্রাণের উত্তাপ। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে ভারতের সাধারণ মানুষের একান্ত আপনার করিয়া তুলিয়াছিল এবং তারই মাঝে তাঁহাকেও করিয়া তুলিয়াছিল মহীয়ান্।

ভারতের আটচল্লিশ কোটি মানুষের কল্যাণ কামনায় শাস্ত্রীজী ছিলেন সদাজাগ্রত। মানবিকতার ক্ষেত্রে সেই কল্যাণের স্বাক্ষর তিনি রাখিয়া গেলেন তাসখণ্ডের শান্তি-চুক্তিতে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও বিরোধ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনি মুক্তি দিলেন মরণ বরণ করিয়া। তাঁর মৃত্যু বিভক্ত পাক-ভারতের মধ্যে সৌহার্দ্যের সেতু রচনার সুযোগ করিয়া দিল।

শাস্ত্রীজী মরণ বরণ করিয়াছেন বলিলে সবখানি বলা হয় না। তিনি প্রাণ দান করিয়াছেন—যে দান শুধু শুভেচ্ছামূলক কূটনীতিভিত্তিক তাসখণ্ড-চুক্তিরই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে নাই, পরন্তু সমস্ত বিশ্বপ্রাণে স্পন্দন তুলিয়া পাক-ভারত তথা বিশ্বমানব মিলনের রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত করিয়া দিবার সূচনা করিল। এই আত্মভোলা দেহাত্ম-বোধবর্জ্জিত প্রাণদান মৃত্যুকে মহিমান্বিত করিল। মৃত্যুর নির্ব্বিচার নিষ্করুণ রূপই সাধারণতঃ চোখে পড়ে, কিন্তু লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আত্মদানে মরণের মহিমা, দাক্ষিণ্য-কারুণ্যের অজানা রূপটি পরিস্ফুট হইতে দেখা গেল। ঋষিকবি এই অজানার জয়ই গাহিয়াছেন,

"কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।"

এইখানেই শাস্ত্রীজী মরিয়াও অমর হইয়াছেন। ভারতবর্ষ অবশ্য বিশ্বাস করে 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' —দেহের বিনাশে দেহী বিনষ্ট হয় না। এক নিত্য প্রাণ-পটভূমিকায় জীবনের অনন্ত প্রবহমানতা। শ্রুতির দিগ্‌দর্শন 'যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং—যাহা অল্প, যাহা তুচ্ছ তাহাই মরণশীল। ব্যষ্টিবোধের উদার বৃহৎ ভৌম মুক্তির মাঝেই জীবনের নিত্যতা। আপনার দেহ, গেহ, স্বজন-সম্পর্কের সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে দেশ ও দশের, ব্যাপক মানব কল্যাণ লক্ষ্যে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত শাস্ত্রীজির এই জীবন-উৎসর্গ তাঁকে অমরত্ব দান করিয়াছে। অতিসাধারণ অ-সাধারণ হইয়াছে—শাস্ত্রীজীর সহজ সরল ব্যক্তিত্ব পাইয়াছে সাড়ম্বর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা।

আত্মীয়-স্বজন-পরিজন হইতে বহুদূরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক অনাত্মীয় পরদেশে শাস্ত্রীজির অভাবিত আকস্মিক নাটকীয় জীবন-দৃশ্যান্তরালে গমনের বুঝিবা তাঁর ভাগ্যদেবতার অলক্ষ্য হস্ত বিদ্যমান। গীতার সেই 'নিমিত্তমাত্র ভব্য সব্যসাচীন' তিনি হইলেন। মরণের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তটিও চমৎকার! তাসখন্দ-ঘোষণার একদিন আগে বা দু'দিন পরে এই অঘটন ঘটিলে মৃত্যু এত যশোসৌভাগ্যদায়ী, এমন দেশপাত্র নির্ব্বিচারে সার্ব্বজনীন মানবতার উজ্জীবক, এমন ব্যাপক বেদনায় মর্ম্মরিত, এত আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল হইতে পারিত না। আজিকার খণ্ড চেতনাজর্জ্জরিত দ্বেষ-হিংসায় উন্মত্ততার মধ্যে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরলোকগমন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত এই সত্যটিকে প্রকাশ করিয়া গেল যে, মনুষ্যত্ব এক অখণ্ড, মানবিকতা অবিচ্ছিন্ন—যাহা আন্তর্গোষ্ঠী ও জাতির নিত্যদিনের স্বার্থান্ধ ব্যবহার ও আদান-প্রদানের মধ্যে অ-ধরাই থাকিয়া যায়। দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মের পার্থক্য সত্ত্বেও, সত্তাগতভাবে দুনিয়ার মানুষ যে এক অখণ্ড, একই বৃহত্তর মানব-সমাজের অঙ্গীভূত ইহার বাস্তব দৃষ্টান্ত সাময়িক হইলেও শাস্ত্রীজির এই অভাবনীয় মৃত্যু উপলক্ষে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করিল।

আঠারো বছরের স্বাধীন ভারতে গান্ধী-নেহেরু-উত্তর শাস্ত্রীজির মাত্র উনিশ মাসের প্রধানমন্ত্রীত্বে ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে একটা নূতন দিগন্ত দেখা দিয়াছিল—যে দিগন্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠায়, ভারতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে, পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে ও নিস্পৃহ নিষ্ঠায় সুস্পষ্ট স্বকীয়তা-মণ্ডিত—যাহা গান্ধীও নয়, নেহেরু নয়, পরন্তু খাঁটি ভারতীয়। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে শাস্ত্রীজী ত্রি-স্তম্ভ নেহেরু-নীতির—জোটনিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অনুসারী হইলেও, জীবন ও রাষ্ট্র-দর্শনে শাস্ত্রীজী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও নেহেরুপ্রভাবমুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শাস্ত্রীজির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল হিংসা-অহিংসা নয়, শান্তি-সংগ্রাম নয়, অনুগ্রহ-নিগ্রহ নয়, পরন্তু গীতার সেই দ্বন্দ্বাতীত যোগভূমির যুক্ত-জীবনের নিমিত্তমাত্রতা।

লালবাহাদুর নাই। অবিশ্বাস্য স্বল্পকালের মধ্যে তিনি বিশ্ববরেণ্য হইতে পারিয়াছেন তাঁর সহজ সরল নির্ভেজাল ধার্মিক ভারতীয় সংস্কৃতিসম্মত চরিত্রের বিনম্র ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যে। ভারতবর্ষের আত্মস্থ হইবার বিবর্ত্তন পথে ভারত-ইতিহাসের গতিক্রমে শাস্ত্রীজির জীবন ও কর্ম্ম যে পদচিহ্ন রাখিয়া গেল তাহা আমামীকালে আলোর দিশারী হইয়া থাকিবে।

স্বাগত

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর পদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্ব্বাচনে এক নূতন ইতিহাস রচিত হইয়াছে। শুধু ৪৮ কোটি ভারতবাসীর কাছেই নহে, বিশ্বের সর্ব্বত্রই ভারত-রাষ্ট্রের এই কর্ণধারত্ব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য বহন করে। ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধার পদে শ্রীমতী গান্ধী প্রথম মহিলা এবং বয়সের হিসাবেও সর্ব্বকনিষ্ঠা। এদিক দিয়াও এই নির্ব্বাচনেব নূতনত্ব আছে। গত ১৯-এ জানুয়ারী সংসদীয় কংগ্রেস দলের অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী ৩৫৫ ভোটে (৬৭·৭%) দলের নেতৃত্বপদে নির্ব্বাচিতা হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীমোরারজী দেশাই এই নির্ব্বাচনে ১৬৯ ভোট (৩২·২) লাভ করেন। রাজ্য ও লোকসভার মোট ৬৫১ জন সদস্যের মধ্যে ৪৬৭ জন এই নির্ব্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। দুইটি ভোট বাতিল হইয়া যায়।

শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইবাব একটি সুলক্ষণ এই যে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব রাজ্যের রাজধানী বিশেষ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েৎ রাশিয়া সমান উল্লসিত হইয়াছে।

নির্ব্বাচনের আঙ্গিক—মতৈক্য, মতসমন্বয় বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যাহাই হউক, ভারতবর্ষ মাত্র আঠার বছরে তার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারিয়াছে এবং এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মনে কবা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে ভারতভূমিতে গণতন্ত্র অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আনুকূল্যে সুদৃঢ় বনিয়াদ্ ইতিমধ্যেই রচিত হইয়াছে।

এত বড় বিশাল ভারতের রাষ্ট্রকর্ণধার প্রাথমিক পর্য্যায়ে দলপতি হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাষ্ট্র-পরিচালক, দল-উপদল নির্ব্বিশেষে দেশনায়ক, বর্ণ-ধর্ম্ম-শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সবারই ভাগ্য-নিয়ন্তা। দলীয় ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধে সামগ্রিক দেশ-সত্তার সহিত ঐক্য, এ-দেশের জলবায়ু, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির মর্ম্মগত নিবিড় পরিচয়, সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার আড়ালে সহানুভূতিশীল কারুণ্যঘন একটি দরদী মনই কেবল ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে চাষীর মাঠে, শ্রমিকের কারখানায়, পথের সর্ব্বহারা—সর্ব্বত্র সর্ব্বোদয়ের যোগ্যতা বহন করিতে পারে।

নেতৃপদে নির্ব্বাচিত হইবার পরক্ষণেই শ্রীমতী গান্ধী দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিবেদনের সঙ্কল্পের কথা জানাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে বৃত হইয়াই তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নেহেরু-শাস্ত্রী অনুসৃত মত ও পথেই চলিবার নীতির কথাও ভারত তথা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়াছেন। নেহেরুর রাষ্ট্রনীতি ছিল জোট-নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এই ত্রয়ী ভিত্তির উপর পণ্ডিত নেহেরু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নব ভারত রচনার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। নেহেরুরই স্বাধীনতা দিবসের (১৯৫৪) বাণী: "The message of New India is that all people must have equal rights politically, socially and as far as possible economically."

আদর্শ বা নীতিই সবখানি নয়—শেষ কথাও নহে। নীতির ধারকের ব্যক্তিচরিত্র ও প্রকৃতির উপর নীতির ভাল-মন্দ, কার্য্যকারিতা অনেকখানি নির্ভর করে। এই বিচিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জগতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-ভেদ থাকিবেই। একই নীতির অনুসাবী হইয়াও শাস্ত্রীজী নেহেরু হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিবেন, এই আশা করি। মানুষ আশাবাদী, ভবিষ্যতের অঙ্গীকার অবলম্বন করিয়াই তার পথ চলা। তাই আমাদের নূতন প্রধান মন্ত্রীকে আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণের স্বাগত জানাই এবং তাঁর সামগ্রিক সাফল্যের জন্য ভারতের ভাগ্যবিধাতার নিকট প্রার্থনা করি।

সংগ্রাম ও শান্তির নির্ভীক নায়ক

শ্রীতারাশঙ্কর

মাত্র দেড় বছর বয়সে পিতৃহীন। মাতামহের দরিদ্র সংসারে প্রতিপালিত। বসবাস : বেলওয়ের জংশন স্টেশান কেন্দ্রিক গ্রাম মোগলসরায়ে। স্থানীয় পাঠশালা থেকে আপাব প্রাইমারি স্ট্যাণ্ডার্ডের লেখা-পড়া শেষ ক'রে সাত মাইল দূরে গঙ্গার অপর তীরে কাশীর এক হাই স্কুলে পরবর্তী শিক্ষালাভ। স্কুল-ছাত্রের জীবন নিতান্তই দারিদ্র্যক্লিষ্ট। খেলা-ধূলার স্পৃহা মেটাতে হয় তাকে সমপর্য্যায়ের দবিদ্র কয়েকটি ছেলের সঙ্গে পুঁটলি-বাঁধা ছেঁড়া কাপড়ের তৈরী ফুটবল নিয়ে।

হাই স্কুলেব ছাত্রাবস্থাতেই তা'র আশ্চর্য অনুরাগ জাতীয় আন্দোলনের প্রতি। তিলক ও গান্ধীজীর বক্তৃতা শোনে সে ধ্যানমৌন একাগ্রতায়। জাতীয়তা-বাদী পত্র-পত্রিকা পাঠ করে নিবিড় মনোযোগ দিয়ে। স্বদেশী আন্দোলনের শোভাযাত্রা ও সমাবেশে স্বেচ্ছা-সেবক হ'য়ে যোগদান করে একান্ত নিষ্ঠাব সঙ্গে। আইরিশ ও রুশ বিপ্লবের ইতিহাস প'ড়ে আর শুনে উচ্ছৃংখল উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে ওঠে কিশোর বালক। রক্তক্ষরা বিপ্লবের প্রতি অপরিণত বয়স্ক এই বালকের অন্ধ আকর্ষণকে শেষ পর্যন্ত প্রশমিত করেন তারই এক শিক্ষক। সেই শিক্ষকেরই অনুপ্রেরণা ও প্রভাবে দেশপ্রেমী দরিদ্র বালক কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলো।

গান্ধীজীর এক ভাষণে অভিভূত হ'য়ে তরুণ বালক দুইটী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রলো সেদিন। প্রথম : সামাজিক কৌলীন্য ও আভিজাত্যের পরিচায়ক পৈতৃক উপাধি "শ্রীবাস্তব" ত্যাগ ক'রে সেদিন থেকে সে হ'লো শুধু লালবাহাদুর। আর দ্বিতীয় : ইংরেজ সরকার পরিচালিত হাইস্কুল সে ত্যাগ করলো।

বিজাতীয় সবকার পরিচালিত শিক্ষালয় বর্জনের উদ্দেশ্যে, গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাশী-বিদ্যাপীঠে যোগদান করলো তরুণ যুবক লালবাহাদুর উচ্চশিক্ষার প্রেরণা নিয়ে। সুযোগ্য অধ্যাপকদের অধীনে সে ইতিহাস, দর্শন ও ইংরাজী ভাষা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি প্রকাশ পায় তা'র গভীরতর আকর্ষণ।

কাশী বিদ্যাপীঠের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়াব পুরস্কার স্বরূপই "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ। এর পর থেকেই লালবাহাদুর শাস্ত্রী সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে। সুতরাং বিদেশী শাসকদের অপশাসনে ফললাভ হ'লো তাঁর পুনঃপৌনিক কারাবাস।

এই কারাগারই তাঁর জ্ঞানার্জনের বিশ্ববিদ্যালয়। নিভৃত কারাকক্ষ থেকেই তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন কবেন দর্শন ও রাজনীতি-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি। মার্কস্ ও লেনিনের রাজনৈতিক দর্শন তাঁকে অভিভূত করে। টলস্টয়ের অ্যানা ক্যারেনিনা তিনি সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নাগাড়ে (at one sitting) প'ড়ে ফেলাব জন্য খ্যাত। বিজ্ঞানেও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পায়। মাদাম ক্যুরীর আত্মজীবনী পাঠে তিনি এতোই অনুপ্রাণিত হন যে, ওই গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পরবর্তী কালে জাতীয় সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কর্মব্যস্ত জীবনেও তাঁর জ্ঞান-পিপাসা অনির্বাণ। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে তাই বিভিন্ন বিষয়ের যে অজস্র বই তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে স্থান পেয়েছে : "World peace through world Law", "Nuclear Explosions And their Effects", "Atomic Physics", "History of Urdu Literature" ইত্যাদি.....

রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে শ্রীশাস্ত্রী যে তিনজন প্রভাবশালী জননেতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে কাজ করেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিভংগীতে ছিলো সুস্পষ্ট ভিন্নতা। বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ছিলেন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-নেতা। আচার্য নরেন্দ্রদেব শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ ক'রে সোস্যালিষ্ট পার্টির সংগঠনে আত্মনিয়োগ

করেছিলেন। আর জহরলাল নেহেরু তাঁর স্বকীয় রাজনৈতিক মতবাদের জন্য সুচিহ্নিত। চিন্তাধারার এই ত্রিবেণী-সংগমের প্রভাবই শ্রীশাস্ত্রীর রাজনৈতিক দর্শনে এক লক্ষ্যণীয় উদার সহনশীলতা ও সমন্বয় বোধ এনে দিয়েছিলো। আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি সকল দলের শ্রদ্ধা ও আস্থা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লাভ ক'রে গেছেন।

শ্রীনেহেরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা পোষণ করেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সরকারী শীর্ষ আসনের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আসক্তি ছিলো। কিন্তু শ্রীশাস্ত্রী ছিলেন সে মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর অপর বৈশিষ্ট্য: সর্বদাই তিনি দলাদলির কোঁদল থেকে নিজেকে সর্বতোভাবে দূরে সরিয়ে রাখতেন। শ্রীনেহেরুর অপরিসীম স্নেহ, সঠিক পথনির্দেশ ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতাই শ্রীশাস্ত্রীকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি ও পরিশেষে প্রধানমন্ত্রীত্বের গৌরবময় আসন এনে দিয়েছিলো। শ্রীশাস্ত্রী নিজের জীবনীকারকে ব'লে গেছেন: জহরলালজী উপযুক্ত অবসর পাওয়া-মাত্রই আমাকে গুরুতর কার্যভার সম্পন্ন করবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিতেন।

তাঁর এ উক্তির সমর্থন হিসাবে আমরা দেখেছি যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীনেহেরু তাঁর সুযোগ্য অনুগামী শ্রীশাস্ত্রীকে যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। আবার উনিশ শো একান্ন সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরই শ্রীনেহেরু শ্রীশাস্ত্রীকে এ. আই. সি. সি.-র সম্পাদক-পদ অধিকারের সুযোগ দেন।

নির্ভীক ও দ্রঢ়িষ্ঠ শ্রীশাস্ত্রীর কোনোদিন কণামাত্রও লোভ ছিলো না সরকারী উচ্চপদের খাদ বেয়ে আসা ক্ষীর-সর-ননী-মাখনের পসরার প্রতি। দুর্নীতির প্রভাব-মুক্ত এক অক্লান্ত কংগ্রেসকর্মী হিসাবেই শ্রীশাস্ত্রীর স্বীকৃতি ও খ্যাতি। আর সেই কারণেই শ্রীনেহেরুর অবর্তমানেও, এবং ক্ষমতাবান ক্ষমতালোভী মোরারজী দেশাই, এস. কে. পাতিল, জগজীবনরাম প্রভৃতির প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অবশেষে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদ্রকায় ও শান্ত-প্রকৃতির শ্রীশাস্ত্রীই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর গৌরবময় আসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীনেহেরু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রগাঢ় আস্থা পোষণ ক'রে গেছেন শ্রীশাস্ত্রীর প্রতি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার যোগ্যতম ব্যক্তি শ্রীশাস্ত্রীতেই বর্তাবে। এবং তিনি জানতেন That was TO BE. আর তাই তিনি জীবন-সায়াহ্নে বহুজনের দাবী ও পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও যে তাঁর পরবর্তী নেতা হবে, তাকে নিজে চিহ্নিত না ক'রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে গণ-প্রতিনিধিদের নির্বাচনের ওপরেই নিশ্চিন্ত নির্ভর করতে পেরেছিলেন।

শ্রীশাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীত্বের আয়ুষ্কাল মাত্র উনিশ মাস। পরমায়ু যদি তাঁর হাতে প্রয়োজনীয় সময় দিতো তাহ'লে তিনি কী করতে পারতেন, অথবা তাঁর নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে কতোখানি ঐশ্বর্যসুষমায় মণ্ডিত ও মহত্ত্বে মহীয়ান ক'রে তুলতে পারতো—সে সত্য গুহানিহিত। কিন্তু মাত্র আঠারো মাসের প্রধানমন্ত্রীত্বকালেও শ্রীশাস্ত্রী যে প্রখর বুদ্ধিমত্তা, গভীর দূরদৃষ্টি, দুর্লভ পরিমিতি-জ্ঞান, অপরিসীম দৃঢ়তা, দুর্ধর্ষ সাহস ও একান্ত স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে গেলেন, ভবিষ্যৎ যুগ তা' শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে। ভারত আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে ওই নিরীহ, বিনম্র ক্ষুদ্রকায় মানুষটির মধ্যেই আমরা দেখেছি এক দুর্ধর্ষ সৈনিকোচিত নায়ককে, বিজয়মাল্য যাঁর কণ্ঠ ভূষিত করলেও, তিনিই আবার অনতিবিলম্বে দেখা দিলেন শান্তির মহান নায়করূপে।

অল্পায়ু প্রধানমন্ত্রীত্বের অবসরে হয়তো শ্রীশাস্ত্রী দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারেন নি। হয়তো আমাদের খাদ্যসমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তর দৃষ্টিভংগী ও কঠোরতর কর্মপন্থার অভাবেই আমাদের খাদ্যমন্ত্রীকে ভিক্ষাপাত্র হাতে আমেরিকার দরজায় ধর্ণা দিতে হ'য়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পাকিস্তানী আগ্রাসণের বিরুদ্ধে তেজোদৃপ্ত তাঁর অসামান্য কৃতিত্বই চুয়াল্লিশ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়াসনে তাঁকে স্মরণীয় ও বরণীয় নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলো।

সীমান্ত-যুদ্ধের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা শ্রীশাস্ত্রী যে

আশ্চর্য পারদর্শিতার সঙ্গে করেছিলেন, সমান পারদর্শিতার সঙ্গেই তেমনি আবার তিনি তাশকেন্টে শান্তির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তিনি-জীবন উৎসর্গ করলেন। প্রিয়-পরিজন ও মাতৃভূমি থেকে সুদূর ব্যবধানে লেনিনের লাল দেশের মাটিতে মৃত্যু বরণ করলেন লালবাহাদুর, বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনায়। সংগ্রাম ও শান্তি উভয় ক্ষেত্রেরই সার্থক নায়ক শ্রীশাস্ত্রীর আকস্মিক তিরোধানে তাই আজ সমগ্র বিশ্ববাসী শোকবিহ্বল চিত্তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

অজস্র দুর্ধর্ষ যুদ্ধনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ইতিহাসের। সাক্ষাৎ হয়েছে বহু প্রণম্য শান্তিনায়কের সঙ্গেও। কিন্তু কী সংগ্রামে, কী শান্তিতে সমপারদর্শী নায়ক ইতিহাসেও দুর্লভ। ভারতবর্ষে তেমন একজনের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিলো আজ থেকে ২২৬৮ বছর আগে। তিনি সম্রাট অশোক। আর যুগ-যুগান্তর পরে তেমন দ্বিতীয়জনকে দেখলাম আমরা শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে। যাঁর বিমল্র আন্তরিকতা, অপ্রমত্ত সত্যদৃষ্টি এবং অনাড়ম্বর ব্যক্তি-জীবনের আদর্শ ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শান্তির যে আলোক-বর্তিকা তিনি নিজের জীবনের উত্তাপ দিয়ে প্রজ্জ্বলিত ক'রে গেলেন, তাকে অনির্বাণ রাখা অথবা নির্বাপিত ক'রে দেওয়ার দায়িত্ব,—যারা রইলো, তাদের। তবে বিশ্ববাসী এ বিষয়ে আশা-বাদী। কারণ, দেশজয়ের চেয়ে দুষ্কর কাজ ক'রে গেছেন শ্রীশাস্ত্রী। মন জয় করে গেছেন তিনি। শুধু তাঁর সমর্থকদেরই নয়। শত্রুদেশের নির্মম নেতারও। এর প্রামাণ্য দলিল নয়টি প্রস্তাব সম্বলিত শাস্ত্রী-আয়ুবের যুগ্ম স্বাক্ষরবাহী তাশকেন্ট-ঘোষণাপত্রের চেয়েও মর্মস্পর্শী দলিল তাশকেন্ট বিমান বন্দরের সেই ঐতিহাসিক ছবি, যা'তে নত মস্তক পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব শ্রীশাস্ত্রীর শবাধার বহন ক'রে চলেছেন। আর সাক্ষী হিসাবে তাঁর দক্ষিণে রয়েছেন শবাধারবাহী রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন।

ঈশ্বর শ্রীশাস্ত্রীর আত্মাকে শান্তি দিন। সান্ত্বনা দিন তাঁর শোকসন্তপ্ত প্রিয় পরিজনদের। আর জয়যুক্ত করুন তাঁর আরব্ধ শান্তির সংগ্রামকে।

শান্তি-সেনা লালবাহাদুর

শ্রীনির্মলকুমার সরকার

আর একটি মহাপ্রাণ হ'য়ে গেল শেষ।
তবুও ভুলিনি তাঁরে, ভুলিবে না, ভোলে নাই
সারা বিশ্ব-দেশ।
সহসা আসিয়া তুমি উল্কার মত,
সফল করিয়া গেলে জীবন-ব্রত;
ক্ষণিক জীবনে তব কীর্তিগাঁথা,
জানি, জানি, কভু তার
হবে না শেষ।
এই ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বে যারা হ'য়েছিল হীন—
আজ তাদের জীবনে পুনঃ আনিতে সুদিন,
তাসখন্দ শান্তি-যাগে হোতা কোসিগিন
সে এক বিশ্বের বিস্ময়!
তার চেয়ে বিস্ময়
তব শেষ নিঃশ্বাস!
বার বার ভাবি মনে
তবু হয় নাতো বিশ্বাস!
দৃঢ়-কঠিন তুমি, লক্ষ্যে অটল
আদর্শ তব জানি বিশ্বে বিরল
শান্তির সেনা আজ প্রণাম লহ—
আমরাও আছি পিছে,
আছে সারা দেশ!
তব হবে নাক শেষ!

সভ্যতা বনাম কাব্য

অধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

সভ্যতা কৃত্রিম। কাব্য অকৃত্রিম। কৃত্রিমতা যান্ত্রিক। অকৃত্রিমতা আন্তরিক। প্রথমটির মনন থাকলেও, হৃদয় নেই। তাই সে রসজ্ঞ নয়, বিশেষজ্ঞ। সে কেবলি জড় করে কিন্তু কিছুকেই প্রাণবন্ত করে না। সে কোন কিছু গড়েও না, ছাড়েও না। অনুসন্ধানেই তার অফুরন্ত কৌতূহল ; পদে পদেই তার অনুমান আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

কাব্য কিন্তু নিত্যকালের চিত্তবৃত্তি। সে মননেও আছে, হৃদয়েও আছে। সর্বত্রই তার পাণিপদ। তার প্রাপ্তি চিত্তে, তার ব্যাপ্তি বিশ্বলোকে। আদতে সে হৃদয়ের সামগ্রী, মননের মাণিক্য। আসমান জমিতে তার সজাগ্র নেত্র, অনুভূতির চেতনা জুড়ে তার রসের ক্ষেত্র। তাই অনুভূতি থেকে উপলব্ধি, অনুস্মৃতি থেকে অনুধ্যান আছে কাব্য-কর্মে। এই কারণে উপলব্ধির তাপ, আর ব্যক্তি-সত্তার ছাপ থাকে তার সর্বাঙ্গ জুড়ে। তাই কাব্যে ভব্যতাও নেই, সভ্যতার বাহুল্যও নেই। অথচ আছে দেশাচার আর লোক-সংস্কৃতির প্রভাব। আর আছে ভাবীকালের ভাবনা এবং এক আশ্চর্য সম্ভাব্যতা।

অন্যদিকে সভ্যতা চায় উদ্ভাবন, আর নব নব উদ্‌ঘাটন। তার অনুপ্রবেশ বিশ্লেষণের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে। কাব্যের লক্ষ্য উদ্ভাসন আর ঊর্ধ্বায়নের দিকে। সংশ্লেষণ আর সমন্বয় তার ধর্ম। অখণ্ডতায় তার অবস্থিতি, অভিন্নতায় তার বিধৃতি।

তাই কাব্য-সভ্যতার ভেদ প্রকৃতিগত। স্বভাবে আচরণে তার প্রকাশ। মেজাজ মর্জিতেও তাদের মিল নেই। অনেক ক্ষেত্রে তাদের উপাদান এক হলেও, সমাধান এক নয়। তাদের মত ও পথ আলাদা। তাই "অন্তরে" 'যন্ত্রে' কোন মিল নেই। বরং যান্ত্রিকতার জোর প্রতিবন্ধক।

তাই উগ্র সভ্যতা কাব্যিক সম্ভাব্যতার প্রতিকূল। সভ্যতা যেন কাব্য-ভাবনার সতীন। সে আধুনিক প্রগতির ঘর করতে নারাজ। কাজেই সভ্যতার গতির সঙ্গে কাব্যিক মতিগতির মিল নেই। আর বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানেই সভ্যতার প্রগতি। বিজ্ঞান ডেকে আনে প্রগতি ও প্রতিযোগিতা। আর বিবর্তন ঘটায় নানা দিকে। তার সে কাজ প্রায়শঃ জৈবিক প্রয়োজনে, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনে, কিন্তু মানুষ কদাচ মানব-কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত, নিয়ন্ত্রিত করে।

সেখানে নিখুঁত গাণিতিক উদ্ভাবন-প্রসূত সামগ্রীর দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। এ হেন যান্ত্রিক বিষয়বস্তুর অভিযোজনায় আমরা ক্রমশঃ ক্লান্ত হ'য়ে প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসি। ফলে বিজ্ঞানের এই সব অমানবিক পরিকল্পনার কাছে মানুষের আবেগ ও স্বভাবের অপমৃত্যু ঘটে। এইভাবে কৃত্রিম সভ্যতা-যন্ত্র-বিজ্ঞান আমাদের স্ব-ভাব নষ্ট করে দেয়, আমাদের নিত্য অভাবকে বাড়িয়ে তোলে।

বিজ্ঞানের যান্ত্রিক শক্তি অন্ধ। তা' আবার অমানবিক পরিকল্পনায় দুর্মদ অমানসিক হয়ে উঠে। তখন তার ক্রমবর্ধমান লোভ শৃঙ্খলার নামে চরম বিশৃঙ্খলা ঘটায়, এমন কি তার যা'-কিছু মহান এবং শ্রেষ্ঠ সে তাকেই বিনষ্ট করে তারই উপর চেপে বসে। তখন সেটা সভ্যতার ভয়াবহ অবস্থা। কবিরাও সেই পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠেন, তাঁদের কাব্যিক ভাবনা যেন সোচ্চারে বলে উঠে : This world is too much with us.

তা' হ'লে সভ্যতার কৃত্রিম যান্ত্রিকতা কাব্যিক ভাবোন্মেষের পরিপন্থী। তা' হ'লে কি প্রগতিশীল সভ্যতায় কাব্য ভাব প্রকাশের কোন পরিবেশই নেই ? হ্যাঁ, আছে। আর সে কাব্য আছে মানুষ প্রকৃতির সমন্বয়ে, তত্ত্ব-সত্যের মিলনে। একজন পাশ্চাত্য সমালোচক তাই বলেছেন, Poetry is where war and peace compromise with the beauty, truth

and virtue of man in science snd science in man. অর্থাৎ সেখানেই কাব্য আছে, যেখানে যুদ্ধ এবং সন্ধি অঙ্গাঙ্গী হয়েছে সেই মানবিক সৌন্দর্য, সত্য এবং স্বধর্ম সমন্বয়ে, ওতঃপ্রোত হয়েছে বিজ্ঞানেব মধ্যে এবং সেই বিজ্ঞান চেতনা সক্রিয় হয়েছে মানুষের মধ্যে।

তা' হ'লে কি জীবনই কাব্যের প্রাণকেন্দ্র? নিশ্চয়। কাব্যই তো প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের সম্যক্ আলোচনা। কেননা real life of poetry is life. কিন্তু সভ্যতার প্রাণহীন মরুভূমিতে যতই এই মানবিক চেতনার উৎস-গুলো শুকিয়ে আসতে শুরু করে, প্রাণের আনন্দরসের ধারাটি রুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই কবিতার অপমৃত্যু ঘটে।

বিজ্ঞান যতক্ষণ না সভ্যতার এই আচ্ছন্ন দৃষ্টিকে মোহমুক্ত করতে পারছে, যতক্ষণ না বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা-গুলির মধ্যে সক্রিয় মানবিকতা আত্মপ্রকাশ করছে, ততদিন ভোগসর্বস্বতায়, ধর্মান্ধতার ও প্রাণহীন কৃত্রিমতার মৃত দেয়ালে কেবলি মাথা ঠুকে মরবে মানুষের কাব্যসৃষ্টির উদ্যমগুলো। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা যেন কেবলি দুর্মদ লোভের অক্টোপাশ হয়ে লেহন করতে চাচ্ছে মানুষের সুকুমার চিত্তবৃত্তিগুলোকে। ফলে কৃত্রিমতার সঙ্গে স্বাভাবিকতার অন্তর বিপ্লব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। এইখানেই সভ্যতার সঙ্গে কাব্যিক মর্জির দ্বন্দ্ব।

এই কারণে ঘর-বার নিয়েই কবিতার জন্ম। ঘর হ'লো ভাবুকের মন, বার হ'লো এই বিশ্বপ্রকৃতি। এই প্রকৃতি ও মনের শুভদৃষ্টি না হলে, কাব্য-সৃষ্টির মালাবদল হয় না। সভ্যতার আসরে এ হেন আনন্দ-বাসর বিরচিত না হলে, কে কাব্য-ভাবের মিলনডালা সাজাবে? কাব্যের মধ্যে যে প্রকরণ বিজ্ঞান আছে, তা' ছড়িয়ে আছে এই পৃথিবীর শ্যাম শষ্পদলে, যদি সে তৃণগুচ্ছ হয় মানবিক প্রেমের শিশির সিক্ত, ভাবানুরাগে অভিষিক্ত। এই কথারই প্রতিধ্বনি করে একজন বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন যে, science of poetry is in the green grass bedewed with the dews of human love.

অবশ্য সভ্যতার এই যান্ত্রিকতাব প্রভাব অনেকটা আপেক্ষিক সত্য। আমাদের মানসিকতার উপরই তা' বহুলাংশে নির্ভরশীল। কেননা আমরা জগৎকে দেখি নিজস্ব চোখ দিয়ে, জীবনকে বিচার করি ব্যক্তি-মানসের আলোকে। এ হেন দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের জীবন-বোধকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং সেই মানসিকতায় যে ভাবনার জন্ম হয়, সেই ভাব-চিন্তাই কাব্য-সৃষ্টির উৎসমূল। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিকও তাই বলেছেন যে, Life is a commedy to those who think, a tragedy to those who feel.

নানা-সমস্যা-কণ্টকিত আজকের সভ্যতার বুকে ক্রমেই যেন অসন্তোষ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। তার এক দিগন্তে অশান্তির আসন্ন ঝড়, অন্য দিগন্তে নৈরাশ্যের অন্ধকার। এর মধ্যে মানুষ যেন কোন বিশ্বাসের ছবি, কোন বলিষ্ঠ সম্ভাবনার আলো দেখতে পাচ্ছে না। তাই আজকের কাব্য-ভাবনায় দুঃসহ নৈরাশ্যবাদ প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে কোন উদার আশাবাদের আলো, কোন মহৎ আদর্শের পথ দেখাতে পারছে না।

তার কারণও আছে। ইলিয়ট তা' বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বলেছেন যে, আজকের উৎকট জীবন-বোধ, সমস্যাকীর্ণ-শ্বাস-রুদ্ধ-কর্মব্যস্ততা, সভ্যতার ঊর্ধ্বশ্বাসী প্রতিযোগিতা, যেন ক্রমশঃই স্বাভাবিক কাব্যিক ভাবনার শ্বাসরোধ করছে। এ হেন আগ্রাসী ভাবনা থেকে রেহাই পেতে হ'লে, আমাদের ঢেলে সাজতে হবে। প্রথমতঃ দরকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। দেখার চোখকে এবং চিন্তার উৎস মনকে নতুন চৈতন্য বোধেব আলোয় উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে।

আর ঘুচিয়ে ফেলতে হ'বে ছোট ছোট ভৌগোলিক ব্যবধানগুলোকে। আদতে আমরা অসীম অনন্তের বাসিন্দা। আমাদের মাথার উপরে দিগন্ত প্রসারী অনন্ত নীলিমা, পায়ের নীচে অখণ্ড পৃথিবী; আর আমরা ডুবে আছি অগাধ বায়ুব সমুদ্রে, আব আমরা বিচরণ করছি আদি-অন্তহীন সময়-সৈকতে। এই অনন্ত সত্য আর সভ্যতার নিত্যই—আজকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

এ হেন অখণ্ডতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ মাত্রই কীটাদপি কীট, কাল-সমুদ্রের নগণ্যতম চৈতন্যের এক একটি বুদ্‌বুদ মাত্র। মানুষ যখন এতই সীমিত, অনন্ত

অখণ্ডের এক একটি অংশ মাত্র, তখন বিজ্ঞানের দম্ভে কোন কিছু ধ্বংস করবার অধিকার তার নেই। এইভাবে বিজ্ঞান যদি সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে বৃহত্তর আশ্বাসের অন্য এক নতুন দিগন্তকে দেখাতে পারে, তা' হ'লে প্রগতিশীল সভ্যতার প্লাবনেও সৃষ্টি হবে নতুন কাব্যের ফসল।

কেননা কাব্য-বিজ্ঞান পৃথক নয়, অভিন্ন। যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, সেখানে কাব্যের আরম্ভ। যেমন পূর্ব দিগন্তের প্রান্তেই পশ্চিম দিগন্তের শুরু, ঠিক তেমনি বিজ্ঞানের শেষে কাব্য এবং কাব্যের শেষে বিজ্ঞান এক অখণ্ডতায় বিধৃত হ'য়ে আছে।

কাজেই এ হেন মানবিক বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞানের শুদ্ধি ঘটাতে হবে। কাব্যের মধ্যে যে বিজ্ঞান আছে বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে যে কাব্য-ভাবনা আছে, তাকে বুঝতে হবে সামগ্রিকভাবে অখণ্ডতার দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা বিজ্ঞান বা প্রকৃতির কাব্যই তো প্রগতির কাব্য, সভ্যতার ইতিবৃত্ত। একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাই বলেছেন যে, Poetry in science and nature is the poetry of progress in civilisation.

এইখানেই কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে মিল আছে। তাঁরা উভয়েই প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা। তাঁরা আবিষ্কারকও বটেন। এই বিশ্ব-সত্য উদ্ঘাটনেই কবি ও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং সুদূর-প্রসারী কবি-কল্পনা না থাকলে কখনই মহাকবি বা বিজ্ঞানাচার্য হওয়া যায় না। সেক্‌স্‌পীয়ার আদতে কবি হ'লেও, তাঁর মধ্যে এক নিপুণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ছিল। তা' না হ'লে জীবন-নাট্য প্রকরণের বিচিত্র সূত্রগুলোকে এমন মানবিক সুখ দুঃখের অন্তর্দ্বন্দ্বে, এমন ঘটনা সংঘাতের দৃশ্যে কখনই তিনি এমন উপভোগ্যরূপে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতেন না। অন্যদিকে নিউটন বা আইনষ্টাইনের মধ্যে প্রকৃতি-প্রেমিক কবি-সত্তা না থাকলে, তাঁরা কখনই নিগূঢ় তত্ত্ব এবং জাগতিক সত্যগুলোকে এমন করে আবিষ্কার করতে পারতেন না। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই একই অর্থে একাধারে যে কবি ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

আজ মানবিক চক্রান্তে প্রাণবন্ত বিজ্ঞানের স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সভ্যতার সময়-সমুদ্রে নানা সমস্যা-সঙ্কুল তরঙ্গে মানুষ আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। এ হেন জীবন সমুদ্রে আজ মানবিক উদ্যমের দাঁড় টেনে টেনে প্রাণ-তরীকে নিয়ে যেতে হ'বে সমাধানের তীরে, মীমাংসার সৈকতে। ফলে জীবন-ধর্মী কাব্যের সেই জীবন্ত সত্তা আজ কবরস্থ হয়েছে নৈরাশ্যের মৃত দেয়ালের নীচে। সেই যে জীবন প্রতি পদক্ষেপে কাব্যিক প্রেরণা উদ্দীপ্ত হ'ত, আশাবাদের নতুন পথ দেখাত, সেই জীবন আজ আগ্রাসী সভ্যতার চাপে হাঁপিয়ে উঠেছে; তাই আজ বিশ্ব-কাব্যের এ হেন মুমূর্ষু দশা।

আজকের সভ্যতা যেন বদ্ধ জলার অপেয় জল। তা দেখে দেখে দিশা মেটে হয় তো, কিন্তু কোন মানবিক তৃষ্ণা মেটে না। তাই অতৃপ্তির দহে নানা সন্দেহের মধ্যে আমরা আজ বাস করছি। সভ্যতা আজ আমাদের মানবিক কোন চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করছে না, বরং সে তার শক্তির আস্ফালনে, ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে পদে পদে আমাদের প্রলুব্ধ করছে। ফলে আমরা লোভ আর লালসার রাজ্যে পৃথিবীর প্রকৃত কাব্যকে হারাতে বসেছি। কাজেই মানুষ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যা' অবশ্য জ্ঞাতব্য, যা নিয়ে চিরকালের কাব্য রচিত হ'তে পারে; আজকের নানা সমস্যা-বিভ্রান্তির অন্ধকারে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না বলেই, সত্যিকার কাব্যকে পাচ্ছি না।

তার ফলে আজ 'the science of earth and poetry of civilisation make us all fools to live to know what is to be known of man and nature.' যেদিন এই সম্যক্ জানার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে মানুষ, সেদিন বিজ্ঞান গর্বিত সভ্যতার কোন সমস্যার অন্তরায়, কাব্য সৃষ্টির উৎসকে অবরুদ্ধ করতে পারবে না। আর তখন পৃথিবীর কাব্য কখনই মরবে না।

সমুদ্রশাসন

অজিত সরকার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : পৌষ সংখ্যার পর]

জল—জল—আর জল। দিনের পর দিন এই অসীম জলরাশি দেখে দেখে রাজনন্দিনী চার্বীর মন ক্লান্ত হোয়ে আসে। তবে এ বিপুল নৌবাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধ, কর্মময়, উত্তেজনাপূর্ণ জীবনধারার মধ্যে আছে একটা উচ্ছল নূতনত্ব। এর মধ্যে সবচাইতে বেগবান্ একটি প্রাণ, আর সেই প্রাণটিকে আবেষ্টন কোরে ঘূর্ণায়মান এই চঞ্চলতা! এই প্রাণের বড় অদ্ভুত, বড় মনোহর সুঠাম আধারটিই হোচ্ছে ইন্দ্রনীল। প্রতিদিন সারাক্ষণই নব নব রূপে ধরা দেয় এই প্রাণটি চার্বীর প্রশান্ত হৃদয়ক্ষেত্রে; কিন্তু পূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে নিত্য নূতন জ্যোতির্ময়ী সুধা পান কোরেও তার হৃদয় অপূর্ণ থেকে যায়।

স্বামীর সঙ্গে স্বামীর গৃহে চ'লেছে চারুশীলা চার্বী। সেখানে কিন্তু নববধূর সাদর আহ্বানের মঙ্গল শঙ্খধ্বনির পরিবর্তে হবে রণভেরীর বজ্র নির্ঘোষ। অস্ত্রের ঝনৎকার কোরবে বধূবরণ, রণ-কোলাহলের মধ্য দিয়ে হবে বধূর পতিগৃহে প্রথম পদক্ষেপ। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

তরঙ্গের তালে তালে অর্ণবপোত হেলেদুলে চ'লেছে, —চার্বীও দুলে দুলে ভেসে চলে তার মানসসরোবরে। ইন্দ্রনীলের আগমন তার শান্ত অধ্যয়ননিরত জীবনে একটা দীপ্ত আলোকের বন্যার মতন। সারা প্রাণমন —জীবন আলোয় আলোয় ভ'রে গেছে তার। ইন্দ্রনীল যেন সেই পুরাণে বর্ণিত বীরের ন্যায় আবির্ভূত হোয়ে সমস্ত বাধাবিঘ্ন সবলে ছিন্নভিন্ন কোরে অধিকার কোরলো চার্বীকে। চার্বী দেখলো—মুগ্ধ হোলো—নিজেকে হারালো! অথচ চার্বী জানে ইন্দ্রনীলের প্রেম অসীম—বহুপ্রসারিত।—চার্বীই তার জীবন-পথে উপনীত প্রথম নারী নয়। ইন্দ্রনীল দুর্ধর্ষ ও ক্ষমতাশালী, কিন্তু কঠোর নয়। তার অন্তঃকরণ শিশুর চাইতে কোমল। ভালবাসা—একটু স্নেহ পেলেই ইন্দ্রনীল মুগ্ধ হয়—তাকে একান্ত কোরে পেতে চায়। তাই বোলে সে উচ্ছৃঙ্খল নয়, অমিতাচারী নয়। ভালমন্দ বোঝবার ক্ষমতা তার অদ্ভুত। নিজের কর্তব্যের প্রতি, সংকল্পের প্রতি, সত্যের প্রতি আছে তার অচলা নিষ্ঠা। তাই তো চার্বীর এতো ভাল লেগেছে ইন্দ্রনীলকে।

উগ্রতারার কথা মনে প'ড়লো চার্বীর। ব্যথা পেয়েই তো ঐ সুন্দরী মেয়েটি সবকিছু ছেড়ে চ'লে গেল ভিক্ষুণী হোয়ে···। ইকা। হাঁ। ইকাও ইন্দ্রনীলকে ভালবাসতো—যদিও সে বহুপূর্ব থেকেই গভীরভাবে অন্যজনে অনুরক্তা। তাতো হবারই কথা—ইন্দ্রনীলকে দেখলে তাকে ভাল-না-বেসে থাকবার উপায় নেই। ইকার বিদায়মুহূর্তটি করুণ হোলেও বড় সুন্দর। বিচিত্ররূপিণী ইকার জীবনটাও বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ?

সুদূর ইরানের চক্ষু নদীর তীরে খর্জুরবৃক্ষের ছায়া-ঢাকা ছোট এক পল্লীর মেয়ে সে। সেই পল্লীরই এক

দুরন্ত তরুণ পরভীন-এর সঙ্গে হোয়েছিল তার প্রথম প্রণয়। এই প্রণয়ের স্থায়ী ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে যখন সে সপরিজনসহ উপস্থিত ছিল সূর্যমন্দিরে···সহসা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার উন্মত্ততায় অশনিবেগে সেখানে উপস্থিত হয় একদল হূণদস্যু। সুখের সৌধ নিঃশেষে চূরমার হোয়ে গেল। আর্তের চীৎকারে আর পৈশাচিক বিকট অট্টহাস্যের মধ্যে ইকা হারিয়ে গেল গাঢ় অন্ধকারের কবলে। অত্যাচার আর লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তর, গহণ অরণ্য, দুর্গম পর্বত পার হোয়ে নররূপী হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে সে এসে পৌছালো ভাবতে সিন্ধু-নদের তীরে। আঘাতের পর আঘাতে মন যখন বিকারবিহীন জড়ত্বে পরিণত হোয়েছিল, তখনই একদিন আচম্বিতে তাঁবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ পরভীন। অব্যক্ত বেদনায় ইকার সারাটা মন হাহাকার কোরে উঠেছিল। তারপর বহু আয়াসে নির্জনে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য তাদের সাক্ষাৎ হোয়েছিল। কতো চেষ্টাই না কোরেছিল দুজনে গোপনে পালাবার, কিন্তু হূণদের সতর্ক দৃষ্টি তাবা অতিক্রম কোরতে পারেনি। তারপর ইকা বিক্রীত হোতে হোতে হিন্দুস্থানের এক হাট হোতে অন্য হাটে—শ্রেষ্ঠীর হাত হোতে রাজার হাতে—শেষে সেই রাজার হাত হোতে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত হোয়েছে মহারাজ-সমীপে। এইভাবেই ইকা আশ্রয় পায় মহাস্থানগড়ে। পরভীন কিন্তু হাল ছাড়ে নি—ছায়ার মতন বরাবর অনুসরণ কোরেছে ইকাকে। ইকা যখন যে দেশে যেখানে গেছে, পরভীনও তখন সেই সেই স্থানেই হাজির। তৃষ্ণাতুর পথিকের ন্যায় মরীচিকার পেছনে পেছনে ছুটে চ'লেছে পরভীন—ক্লান্তিহীন তার যাত্রা, বুকে তাব অসীম-অনন্ত আকাংক্ষা। এমন কোরেই পরভীন মহাস্থানে এসে শেষে প্রাসাদের রক্ষিশ্রেণীভুক্ত হয়। দুজনায় সাক্ষাৎ ক্বচিৎ কখনো হেয়েছে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ওরা সারাক্ষণ অনুভব কোরতো পবস্পরের সান্নিধ্য। তাইবা কম কি!

ইন্দ্রনীল কম্বোজ-যাত্রার পূর্বে ইকাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। চার্বীও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। ইন্দ্রনীল বোললো, ইকা, তুমি শুনেছো বোধহয়, আমাদের যাত্রার সব কিছু প্রস্তুত।

হাঁ, দেব।

তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

আমি ক্রীতদাসী। আপনার···

না, ইকা, তুমি আমার ক্রীতদাসী নও। আমার অনুরোধে মহারাজ তোমাকে মুক্তি দিয়েছেন। এখন তোমার ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা।

যুবরাজ। বিস্ময়ে ইকার চক্ষু বিস্ফারিত হোয়ে যায়। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলে, এতো সৌভাগ্যও আমার ভাগ্যে ছিল! এ যে আমার·····

ইকা, কম্বোজে তোমাকে যেতে হবে না। ইন্দ্রনীলের মুখে যেন ঈষৎ হাসিব রেখা!

ইকা ঘাড় নিচু কোরে বোললো, সূর্যদেব আপনার মঙ্গল করুন।

চার্বী পেটিকা মুক্ত কোরে একরাশ স্বর্ণমুদ্রা ইকাকে দিয়ে বোললো, যাও, ইকা, প্রাসাদের বাইরে তোমার জন্য পরভীন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোবছে। এই মুদ্রা কটা দিয়ে তোমাদের নোতুন সংসার পেতো।

রাজনন্দিনী! রাজনন্দিনী! আপনি···ইকার চোখ-দিয়ে আনন্দ অশ্রু ঝবতে থাকে।

রাজনন্দিনী মিষ্টি হেসে বলে, আমার চোখ সব সময় গ্রন্থে নিবিষ্ট থাকে বোলেই মনে কোরনা আর সকল দিক্ আমার কাছে আঁধার। এ তোমার ভুল ধারণা। আমি সব জানি—বহুদিন থেকেই জানি। পবভীন বড় ভাল ছেলে। তোমরা সুখী হবে।

ইকা এগিয়ে এসে চার্বীর হস্ত চুম্বন কোরলো; তারপর ইন্দ্রনীলের নিকটে এসে ক্ষণেকের তরে থেমে বোললো, রাজকুমারী। যাবার আগে আমার দেবতাকে একবার শেষবারের মতন অর্ঘ্য নিবেদন কোরতে ইচ্ছা করি।

স্বচ্ছন্দে। দেবতা কারো নিজস্ব হন না। দেবতা সকলেরই দেবতা!

ইকা ভারতীয় প্রথায় ভূমিষ্ঠ হোয়ে ইন্দ্রনীলকে প্রণাম কোরে মুখ তুলে তাকালো—তার পিঙ্গল চক্ষু টল্ টল্

কোরে উঠলো ; পরমুহূর্তেই বিদেশিনী দীর্ঘাঙ্গিনী নারী মৃণালভুজ দ্বারা ইন্দ্রনীলের কণ্ঠ বেষ্টন কোরে একটা বিলম্বিত চুম্বন তার কপোলে স্থাপন কোরে ক্ষিপ্রপদে বিদায় নিলো !

কক্ষের ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে এক ঝলক দামাল হাওয়া ঢুকলো। চার্বীর সামনে খোলারাখা গ্রন্থের তালপাতা-গুলো খর্ খর্ করে বাঙ্ময় হোয়ে উঠলো। তালপত্রের লিপিগুলো নয়ছয় হোয়ে গেল।

ক্যাঁচ কোরে শব্দ হোলো। দ্বার ঠেলে ইন্দ্রনীল কক্ষে প্রবেশ কোরলো। চার্বী মুখ তুলে তাকালো। ইন্দ্রনীলের দীর্ঘ দেহের জন্য তার মস্তক প্রায় কক্ষের ছাদ স্পর্শ কোরছে। ইন্দ্রনীল বোললো, তোমার পাঠের ব্যাঘাত কোরলাম নাকি ?

না। চার্বী হেসে বলে, এমনি চুপ কোরে ব'সে-ছিলাম। এস, কাছে এসে একটু ব'সো। সারাক্ষণ এতো কাজে ব্যস্ত থাকো যে. তোমাকে বেশিক্ষণ কাছে পাওয়াই দুষ্কর।

ইন্দ্রনীল অল্প হেসে বোললো, চুপ কোরে কি ভাবছিলে ?

ভাবনার কি অন্ত আছে।

তা তো বটেই।—নিজের জন্মভূমি, আপন প্রিয়জন ছেড়ে চ'লেছ কোন্ এক অদৃশ্য বিপদের মুখে। সত্যই, চার্বী, লোভের বশে তোমাকে বিবাহ কোরে আমি অন্যায়ই কোরেছি। ভারতের বহু বিখ্যাত রাজন্যই তোমাকে বিবাহ কোরতে উদ্‌গ্রীব ছিল। কিন্তু···

থামলে কেন, বলো। আমার শুনতে বেশ লাগছিল।

ইন্দ্রনীল হা-হা কোরে হেসে উঠলো। পরিচারিকা কক্ষে প্রবেশ ক'রে অভিবাদন কোরলো। চার্বী জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে তাকালো।

পরিচারিকা বোললো, প্রধান সেনাপতি মহামান্য কোদণ্ডদেব···

অপেক্ষা কোরতে বলো। ইন্দ্রনীল বোললো, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

পরিচারিকা চ'লে গেল। চার্বী কপট অভিমানে বলে, আচ্ছা যুবরাজ, তোমার এই বন্ধুটির প্রাণে কি কোন রস নেই ? কাজ ছাড়া কি আর কিছু কোন সময়ে তিনি ভাবতে জানেন না ?

কোদণ্ড ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ অনন্যমনা—একাগ্রচিত্ত ; যখন যেটা সে ধরে সেটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ও অন্য কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকে।

আচ্ছা, আবার জিজ্ঞেস করি, কোদণ্ডদেবের জীবনে কখনো কি কোন নারীর সমাগম হয়নি ?

আমি যতদূর জানি—হয়নি।

আশ্চর্য ! তবু তোমাদের মধ্যে এতো বন্ধুত্ব !

তার মানে ?

মানে অতি সোজা। তুমি তো সুন্দরী কন্যা দেখলেই প্রেমে প'ড়ে যাও, অথচ তোমার প্রিয় বন্ধু নারীকে ঘৃণা করে।

কথাটা তুমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভুল বোললে। প্রথমতঃ আমার কথা—আমি হোচ্ছি একজন দীন ভক্ত—সুন্দরের পূজারী মাত্র। সেটা যদি আমার অপরাধ মনে করো, তা হোলে নিশ্চয়ই আমি অপরাধী। আর দ্বিতীয়তঃ কোদণ্ড কখনই কোন নারীকে ঘৃণা করে না—বরং শ্রদ্ধাই করে। তুমি তার আবরণগুলো একটু বিশেষ কোরে লক্ষ্য কোরলেই নিজেই তা জানতে পারবে।

তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কোরতে চাই না। তবে উল্কার সঙ্গে তোমার বন্ধুর ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ় বোলেই মনে হয়।

দেখ, চার্বী, সকলের রুচি সমান নয়। তৃষ্ণা পেলে ইন্দ্রনীল অপেক্ষা কোরতে পারে না, কোদণ্ড পারে।

আচ্ছা, আবার আমার প্রশ্ন—উগ্রতারা যদি ভিক্ষুণী না হোয়ে যেতো, তাহোলে তুমি কি কোরতে ?

এ প্রশ্নের উত্তর চট কোরে দেওয়া যায় না।

ভাল কথা ; তার মানে উগ্রতারার সম্বন্ধে পাকা-পাকি কিছু করার আগে তুমি কবতলে গণ্ড সংন্যস্ত কোরে, মানে-গালে হাত দিয়ে নিভৃতে নিশ্চয়ই কিছু চিন্তা কোরতে !

হাঁ, উগ্রতারা অতি ভাল মেয়ে।

ইকার যদি ঐ ব্যবস্থা না হোতো তা হোলে তুমি কি কোরতে ?

ইকা যদি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসতে রাজি হোতো, তাকে আমি নিয়ে আসতাম।

তুমি হয়ত জানো না, উল্কা আসতে চেয়েছিল আমাদের সঙ্গে, মানে কোদণ্ডর সঙ্গে ; কিন্তু তোমার বন্ধু, নারী বোলে—সামান্য একজন ক্রীতদাসী বোলে ওই সরল নিষ্পাপ মেয়েটিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

না, কোদণ্ড তাকে সরিয়ে দেয়নি। যাক, তাতে উল্কার ক্ষতি কি ?

উল্কা নারী—বঙ্গনারী। হতভাগী কোদণ্ডদেবকে ভালবেসেছিল।

কাজটা যদিও সে অন্যায় করেনি, তবে পাষাণে মাথা ঠুকে আঘাতই পাওয়া যায়—উল্কাও তাই পেয়েছে। যাই হোক, উল্কা কোথায় ?

জানি না।—চার্বী একটু থেমে বলে, তার কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। মনে হয় সে আত্মঘাতী হোয়েছে।

প্রেমের বিচিত্র গতি। আমি যাই, কোদণ্ড আমার জন্য অপেক্ষা কোরছে।

ইন্দ্রনীল চ'লে গেল। কক্ষের দ্বার বারকয়েক আন্দোলিত হোয়ে থেমে গেল। চার্বী পুঁথি বন্ধ কোরে লঘু পদে কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালো। পরিচারিকা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো। চার্বী নীরবে অগ্রসর হোলো। তারপর ইতস্ততঃ কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জন স্থানে এসে সে দাঁড়ালো। সূর্যদেব তখন অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন। গলিত স্বর্ণের মতন তাঁর কিরণধারায় চারিদিক প্লাবিত। ঊর্ধ্বে—বহু ঊর্ধ্বে শুভ্র তুলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছে কয়েক খণ্ড হাল্কা জলদ। নিরবচ্ছিন্ন বাতাসে বেশ-বাস ও কেশরাশি অবিন্যস্ত কোরে দেয়—বার বার হেমবর্ণা তনুশ্রীর আচ্ছাদিত অংশ অনাচ্ছাদিত হোয়ে যায়। চঞ্চল পবনের কাছে পরাজিত হোয়ে চপলা চঞ্চলার মত ছুটে পালিয়ে যায় চার্বী নিজ কক্ষে যাবার পথ ধ'রে। একটা বিরাট তরঙ্গের আঘাতে অর্ণবপোতটি একপাশে একটু বেশি কাত হোয়ে প'ড়লো। চার্বী পথচ্যুত হোয়ে একদিকে ট'লে গেল, আর চার্বীর দেহভারে পাশের কক্ষটির দ্বার খুলে যেতেই সে হুমড়ি খেয়ে কক্ষের ভেতর প'ড়ে গেল।

বিস্মিতভাবে কর্মনিরত মহাশিল্পী পৃথুল মুখ তুলে তাকালো। অনাগত দিনের কোন এক দেউলের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য নির্মাণে নিযুক্ত ছিল শিল্পী। চার্বী নিজেই লজ্জাজড়িত পদে উঠে দাঁড়ালে শিল্পী সহাস্যে বোললো, দেহে কি তেমন বিশেষ আঘাত লেগেছে।

না, আপনার কার্যে অকারণে বাধা দেওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। নিশ্চয়ই আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হোয়েছেন।

রাজকুমারী ! এমন অভাবনীয়ভাবে আপনার আগমনে আমি অবাক্ হোয়েছি বটে, কিন্তু অসন্তুষ্ট হবো কেন। যাঁর উপস্থিতিতে চারদিক্ সৌরভে ভ'রে যায়, যাঁর প্রতি পদক্ষেপে কমলকলি ফুটে ওঠে, হাসিতে যাঁর মুক্তা ঝরে, বাক্যে যার সুধা বর্ষে···

চার্বী বিব্রত হোয়ে উঠে, শিল্পীর কথা শেষ কোরতে না দিয়ে বলে, আমি যাই।

আসুন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কিসের জন্য এই অহেতুক ধন্যবাদ, শিল্পী ?

পৃথুল বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে বলে, ক্ষণিকের তরে আমার জীবন মধুময় কোরে দেওয়ার জন্য।

সলজ্জ একটুখানি হাসি হেসে চার্বী শিল্পীর কক্ষ হোতে নিষ্ক্রান্ত হোলো। প্রশংসায় পরিতৃপ্ত হয় না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। প্রশংসার নামান্তর স্তুতি তথা স্তব। তাই স্বর্গের দেবতাদেরও স্তুতি দ্বারা তুষ্ট করবার কি অসাধারণ প্রচেষ্টাই না আদিম মানব হোতে আরম্ভ হোয়ে আজ পর্যন্ত উন্নত পরিণত মানবে সমানে চ'লে আসছে।

অপরিসর পথে একটি কমনীয় কিশোর সম্মার্জনী দিয়ে পথ পরিষ্কার কোরছিল। চার্বীকে দেখে অতি সংকুচিত হোয়ে সে একপাশে স'রে দাঁড়ালো। এই কিশোরটিকে চার্বী পূর্বেও কয়েকবার দেখেছে। চার্বীকে দেখলেই

সে সসংকোচে মুখ নিচু কোরে তড়িৎগতিতে দূরে সরে যায়; আজ কিন্তু পথটি সংকীর্ণ বোলে তার পালাবার উপায় হয়নি। চার্বী মিষ্টি গলায় প্রশ্ন কোরলো, তুমি আমাকে দেখে পালিয়ে যাও কেন, বলো তো।

লজ্জায় কিশোরটি কোন উত্তব দিতে পারলো না, শুধু তার মাথা আরো নুয়ে প'ডলো। চার্বী আবাব প্রশ্ন করে, তোমাব নাম কি?

অস্ফুট স্বরে আনত নয়নে সে উত্তর দেয়, দেবদত্ত।

বা! বেশ নাম তো। তা দেবদত্ত, তুমি আমাকে দেখে লজ্জা পাও—না ভয় পাও? কি। কথাব উত্তর দিচ্ছ না কেন?

এমন সময় কাঠের ওপর ভারি পায়ের আওয়াজ হোলো, দেখা গেল কোদণ্ড এই দিকেই আসছে। তাই না দেখে, চার্বীর উপস্থিতি অগ্রাহ্য কোরে দেবদত্ত ত্রস্ত হরিণের ন্যায় ছুটে পালিয়ে গেল।

চার্বী হাসতে হাসতে বোললো, মিত্রটিকে কোথায় রেখে এলেন?

যথাস্থানে। একা এখানে কি কোরছেন?

এমনি ঘুবছিলাম। আচ্ছা, ঐ যে বালকটি এখনই এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল ওকে চেনেন?

হাঁ, এই পোতের একজন আজ্ঞাবহ। আমি শুনেছি বালকটি খুবই কাজের।

এখানে ওর কোন আত্মীয় আছে নাকি?

হাঁ, ও একজন রক্ষীর সহোদর।

বালকটিকে আমাব বেশ ভাল লাগে, কেমন যেন পরিচিত বোলে বোধ হয়।

আশ্চর্য।—কোদণ্ড বলে—আমারও তাই মনে হয়; কিন্তু বড় চঞ্চল, আমাকে দেখলেই পালিয়ে যায়।

চার্বী হেসে বলে, ওতো আমাকে দেখেই পালায়—তা আপনার মত বিশাল বিরাট্ পুরুষ দেখলে তো পালাবেই। তার ওপর আপনি যা গম্ভীর।

আসলে কিন্তু আমি মোটেই গম্ভীর নই।

মানতে রাজি আছি, যদি নিজের আসল রূপটি প্রকাশ করেন।

একজন সৈনিক দ্রুতপদে এসে অভিবাদন কোরে কোদণ্ডের সম্মুখে দাঁড়ালো।

কোদণ্ড প্রশ্ন করে, কি সংবাদ?

যুববাজ এখনি আপনাকে স্মরণ কোরেছেন।

কোথায় তিনি—তাঁর কক্ষে?

না; তিনি অধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বোলছেন।

সৈনিক অভিবাদন কোবে প্রস্থান কোরলো। কোদণ্ড চার্বীর দিকে চেয়ে বোললো, আমাকে যাবার অনুমতি দিন, রাজকুমারী।

চার্বী হেসে বোললো: দুই বন্ধুতে ছাড়াছাড়ি না হোলেই পারেন। তা হোলে পাঁচজনকে আর এতো ছুটাছুটি কোরতে হয় না। (ক্রমশঃ)

পাকা পাতার বাণী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শীতের বাতাস হীহীকার ক'রে বয়;
পাকা পাতা ঝরে ভরিয়া কানন-বীথি।
কচি পাতা ভাবে,—"একী নিষ্ঠুর নীতি
পাকা পাতাদের কেন হায় হবে লয়?"
পাকা পাতা বুঝি ঝরিতে ঝবিতে কয়,—
"তোমাদেরই মাঝে রহিল মোদের স্মৃতি—
আমাদের ভীতি, গীতি আর যত প্রীতি;
পথ ক'বে দিতে মোদের ঝরিতে হয়।

কচি কিসলয় জীবনের জয় গাও;
পরিবেশ হ'তে শুষে লও রস-ধারা;
জীবনই যে বড়ো,—মরণেরে ভুলে যাও;—
তোমাদের মাঝে আমাদেরই পাবে সাড়া।
বংশ-ধারায় যা'র যাহা দেয় দাও,
মরণে তা'হলে হয় না তো আয়ুহারা।"

স্বামী প্রণবানন্দ প্রসঙ্গে

আচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[বক্ষ্যমান লেখাটি পাঠাইবার কয়েক দিন পরেই আচার্যদেব দেহরক্ষা করেন। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার শেষ রচনা। প্রঃ সঃ]

বহু বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ সহরে একটি নিভৃত কক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের সঙ্গে "শক্তি ও মুক্তি" সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তাঁর সাথে আমার সৌহার্দ্দ্য ছিল তারও অনেক পূর্ব্ব থেকে,—তখনও তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ভারত-বিখ্যাত স্বামী প্রণবানন্দ হন নাই। শুধু তপঃপরায়ণ "বিনোদ ব্রহ্মচারী" ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের প্রধান সূত্র ছিল,—একই অলোকসামান্য যোগিরাজ মহাপুরুষের চরণে উভয়েই আশ্রয় পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে উক্ত আলোচনা যে সময় হয়েছিল, তখন সর্ব্বক্ষেত্রে আপনার তপস্যাকে তিনি রূপায়িত করেছেন, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দেশের বহু যুবক তাঁর জীবন ও কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, অনেক যুবক তাঁর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে আরম্ভ করেছে। এই আলোচনায় তাঁর তাৎকালিক মত ও পথ যা বুঝেছিলাম, তা তাঁর ভাষা ও আমার ভাষা মিশিয়ে প্রবর্ত্তকের পাঠকবর্গকে এতকাল পরে উপহার দিতে অকস্মাৎ ইচ্ছা জন্মিল। কথাপ্রসঙ্গে আলোচনাটী আরম্ভ হয় 'বেদান্তের মুক্তিবাদ' এবং দেশের সাধারণ বৈদান্তিক পণ্ডিত ও সাধুদের জীবনধারা নিয়ে।

"বেদান্তের মতবাদ ও সাধনাদর্শ একাধারে পরম অমৃত এবং হলাহল বিষ"—এটী স্বামী প্রণবানন্দেরই সুগম্ভীর বাণী, তাঁরই মুখের ভাষা। যাঁরা খেয়ে হজম করতে পারেন, তাঁরা হন সাক্ষাৎ নীলকণ্ঠ মহাদেব,—কিন্তু হজম করতে না পারলে বিনাশ,—'ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ'। বেদান্ত হজম করে অমৃতত্ব লাভ করবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। অনেকেই শুধু বুদ্ধি দ্বারা বেদান্ত আলোচনা ক'রে, ফলতঃ নাস্তিক ও জড়ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। তারা দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম, জাতির সাধনধারা, ঈশ্বর ও দেবদেবীর পূজার্চ্চনা, সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, তীর্থস্থানাদির পবিত্রতা ও তীর্থযাত্রাদির আবশ্যকতা প্রভৃতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। জীবনের সকল বিভাগকে সমুন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শে সুনিয়ন্ত্রিত ও অনুপ্রাণিত করবার যে অপূর্ব্ব কৌশল ঋষিমুনি শাস্ত্রকারগণ নিজেদের সাধনা-গবেষণা ও তপস্যাপ্রসূত নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা আবিষ্কার ক'রে সকল শ্রেণীর নরনারীর কল্যাণের নিমিত্ত শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে এরা নিজেরাও বঞ্চিত হয়, এবং তাদের আন্তরিক অনুভূতিবিহীন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচার দ্বারা দেশবাসীদের বিভ্রান্ত করে। পক্ষান্তরে, বেদান্তের মুক্তিবাদের যথার্থ তাৎপর্য্যও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয় না, যথার্থ বৈরাগ্যের আস্বাদনও তাদের হয় না, আত্মার স্বরূপও তাদের চিত্তে প্রতিভাত হয় না। তারা শুধু হারায়, পায় না কিছুই। তাদের জীবন দেখে ও যুক্তিবিচার শুনে অকপট জিজ্ঞাসুদের চিত্তও নানাপ্রকার সন্দেহে দোলায়মান হয়।

স্বয়ং যোগেশ্বর শিব বৈদান্তিকের আদর্শ,—বেদান্তের চিরজীবন্ত বিগ্রহ। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদের আধারভূতা অন্নপূর্ণা আদ্যাশক্তি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহার সেবায় নিরতা; কিন্তু তাঁহার কোন অভিমান ও মমত্ববুদ্ধি নাই, তিনি উদাসীন, দ্রষ্টা, সর্ব্বত্যাগী, আত্মসমাহিত, নিজের আন্তর-মহিমায় নিত্য পরিপূর্ণ। তিনি আশুতোষ, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, সকল জীবের সকল অভাব পরিপূরণে তিনি সমর্থ; কিন্তু তাঁহার কোন কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি নাই, নিজের ভোগে তাঁহার কোনই আবশ্যকতা নাই, তিনি ছাল বাকল প'রে গায়ে ভস্ম মেখে শ্মশানে মশানে থাকেন। তাঁহার যত সম্পৎ, তাঁহার শক্তির যত বিকাশ, সব তাঁর পূর্ণ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান। তিনি আপনার থেকে পৃথক কাকেও দেখেন না; নিজের সত্তাকে তিনি সীমাবদ্ধ দেখেন না; অসীম অনন্ত সত্তায়, নিরাবিল অপরিচ্ছিন্ন পরমানন্দে তিনি নিত্য বিরাজমান। এরই নাম ত বেদান্তের মুক্তি, বেদান্তের বৈরাগ্য, বেদান্তের জ্ঞান। বেদান্তের মোক্ষ পরিপূর্ণ জীবন,—মৃত্যু ছায়াবিহীন, দুঃখলেশবিহীন, পরিচ্ছিন্ন-

অহন্তা-মমতাবিহীন, অনন্ত আনন্দময় স্বয়ংপূর্ণ জীবন। ইহার মধ্যে কোন জড়তা নাই, দুর্ব্বলতা নাই।

সংসারে যার কোন শক্তি নাই, কোন সম্পদ্ নাই, কোন সুখ-সম্ভোগ নাই, তার আবার ত্যাগ বৈরাগ্য কোথায়? যারা অন্নহীন, অর্থহীন, গৃহহীন, যাদের দেহে শক্তি নাই, মনে শক্তি নাই, বুদ্ধিতে শক্তি নাই, যারা সংসারক্ষেত্রে জীবন সংগ্রামে অসমর্থ, যারা পেটের দায়ে ভিক্ষা করে, শত্রুর আক্রমণ হ'লে প্রাণভয়ে পালায়, কেউ বিপদে প'ড়ে আশ্রয় চাইলে যারা আশ্রয় দিতে পারে না, বিপদের প্রতিকার করতে পারে না, তাদের সংসার ত্যাগেরইবা অর্থ কি, বিষয়বৈরাগ্যেরই বা অর্থ কি, "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"—এই বচন উচ্চারণেরই বা অর্থ কি? তাদের পক্ষে মুক্তি ত আত্যন্তিক জড়ত্ব ও মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। তাদের মুক্তিমন্ত্র আওড়ানোর মানে, বেঁচে থাকতেই মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে দুঃখানুভূতির কিঞ্চিৎ লাঘব করা, দুঃখকে সহনীয় ক'রে তোলা। ভিতরে বাসনা-কামনা সত্ত্বেও নিজের শক্তির সমুচিত বিকাশের প্রচেষ্টা না ক'রে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার সাধনায় আত্মনিয়োগ না করে, শক্তিহীনতা ও পরাজয়কেই তারা বেদান্তের দোহাই দিয়ে আদর্শস্থানীয় করে তোলে, আত্মবিনাশকেই তারা মুক্তি নাম দিয়ে অনুসরণ করে, গল্পের শৃগাল যেমন আঙুরকে টক্ বলে ত্যাগ করল, তেমনি তারা সংসারের সুখ-সম্পদকে মিথ্যা ব'লে তৎপ্রতি বাহ্যতঃ উদাসীন হয়, দুঃখকে সত্য অনুভব ক'রেও মিথ্যা ব'লে সহনীয় ক'রে নেয়।

বস্তুতঃ বেদান্তের সাধনা দুর্ব্বলের জন্য নয়, কাঙ্গালের জন্য নয়, কাপুরুষের জন্য নয়, জীবনযুদ্ধে অসমর্থের জন্য নয়, প্রাণ রাখতে যাদের প্রাণান্ত, তাদের জন্য নয়। বেদান্তের মুক্তি আত্মবিনাশ নয়, আত্মলাভ;—জীবন ও জগতের বিনাশ সাধন নয়, জীবন ও জগতের পরিপূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি;—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি হৃদয়হীন ঔদাসীন্য নয়, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত নিজের অভিন্নতার সপ্রেম আস্বাদন। বাস্তব জীবনে দুঃখ-দৈন্য-বিপদাপদের বাহুল্য দেখে জগৎকে দুঃখময় অনিত্য ও মিথ্যা বলে ধারণা ক'রে তা থেকে অব্যাহতি লাভের যে তামস প্রচেষ্টা হয়, তা যথার্থ বৈদান্তিক মুক্তির সাধনা নয়। সংসারে বিচিত্র শক্তি ও বিচিত্র সম্পদের বিনাশ দেখেও, সমস্ত শক্তি ও সম্পদ্ অপেক্ষা আত্মা যে বড়, আত্মাই যে সমস্ত শক্তি ও সম্পদের আশ্রয়, এবং সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে অতিক্রম ক'রেও আত্মা যে নিজের মহিমায় পরিপূর্ণ ও নিজের সর্ব্বগত সত্তার অপরিসীম আনন্দে নিত্য ভরপুর, এই অনুভূতি থেকে শক্তি ও সম্পদের প্রতি যে বৈরাগ্য জন্মে, বাহ্য খণ্ড জগতের প্রতি যে ঔদাসীন্য হয়, আত্মস্বরূপে সজ্ঞান অটুট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা হয়, তাহাই বস্তুতঃ বৈদান্তিক মুক্তি সাধনা।

বেদান্তের ধর্ম্ম বস্তুতঃ বীরের ধর্ম্ম, শক্তিমানের ধর্ম্ম, সুমহান্ প্রাণের ধর্ম্ম, জাগতিক সুখৈশ্বর্য্যের সহিত সুপরিচিত তেজস্বী মানবাত্মার ধর্ম্ম। মহাবীর মহাকর্ম্মী ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজর্ষিদের তত্ত্বজিজ্ঞাসু চিত্তেই উপনিষদের ত্যাগের বাণী, বৈরাগ্যের বাণী, "নেতি নেতি" বাণী, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" বাণী, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাণী, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" বাণী প্রকাশিত হয়েছিল। মহাবীর পরন্তপ অর্জ্জুনের নিকটেই বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা উপদিষ্ট হয়েছিল। বেদান্ত মানুষকে জ্ঞানবৈরাগ্যের নামে ক্লীবে পরিণত করবার জন্য উপদিষ্ট হয় নাই, সর্ব্বপ্রকার ক্লৈব্য থেকে, দেহ-মনঃ বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার অবসাদ ও নির্ব্বীর্য্য ভাব থেকে, সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, তামসিকতা, ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত করবার জন্যই উপদিষ্ট হয়েছে। জীবমাত্রেরই আত্মার অনন্যসাধারণ গৌরব সম্বন্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যেই বেদান্তের বাণী মানবসমাজে প্রচারিত হয়েছে। মানুষকে আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধাবান, মানবজীবনের সুমহান্ আদর্শের প্রতি উন্মুখ সংসারক্ষেত্রে নির্ভীক নিঃস্বার্থ অনপেক্ষ কর্ম্মদক্ষ উদার চরিত্র সর্ব্বজীবপ্রেমিক ক'রে তোলবার জন্যেই বেদান্তের ভাবধারা ভগবৎকৃপায় জগতে প্রবাহিত হয়েছে।

কিন্তু এই সুমহান্ বেদান্ত—ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম ফলস্বরূপ এই সর্ব্বকল্যাণনিদান বেদান্ত—

যদি যুগে যুগে যুগোচিত ভাবে ও ভাষায় শিবকল্প আচার্য্যগণ দ্বারা ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত না হয়, যদি শুধু কতকগুলি শুষ্ক যুক্তিতর্কের সাহায্যে, প্রাণহীন টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে ও কতকগুলি শ্রুতিমধুর বুলির সাহায্যে সাধারণ লোক বেদান্তের আদর্শ বুদ্ধিগত করতে প্রয়াসী হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই বেদান্তের বিষক্রিয়া হয়। আমাদের দেশে কয়েকশত বৎসর ধ'রে তাই হয়ে আসছে। বেদান্তের বদ্‌হজমের ফলে জাতির মধ্যে ক্লীবতা প্রশ্রয় পেয়েছে, তামসিক ভাবধারা দ্বারা দেশ আচ্ছন্ন হয়েছে, সাধুতার নামে জড়তার অনুশীলন চলছে, বৈরাগ্যের নামে আলস্যের জয়গান চলছে, মুক্তির নামে বিনাশের দিকে জাতি এগিয়ে চলেছে। যে "কর্ম্মবাদ" মানুষের পুরুষকারকেই তার জন্মজন্মান্তরের, ইহলোকের ও পরলোকের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা ব'লে প্রচার করছে, সেই "কর্ম্মবাদ", "নিয়তিবাদে" পরিণত হয়ে, মানুষকে নিয়তি বা অদৃষ্টের ক্রীড়াপুতুলরূপে উপস্থিত ক'রে তার স্বাভাবিক পৌরুষকেই বিনষ্ট ক'রে ফেলতে চাচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই দেখছি,—"উল্টা বুঝিলি রাম"।

জাতিকে আবার বেদান্তের যথার্থ উত্তরাধিকারী ক'রে তুলতে হ'লে, বেদান্তের মর্ম্মাবধারণে সমর্থ ক'রে তুলতে হ'লে, কিছুকাল জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ বালক ও যুবকদের মধ্যে, বেদান্তের চরম মুক্তির কথা, পর-বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা, ব্রহ্মসত্যত্ব ও জগন্মিথ্যাত্বের কথা বন্ধ ক'রে রাখতে হবে, তাদেরে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে। তাদেরে শিখাতে হবে, দৈহিক মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য থেকে মুক্তিলাভের মন্ত্র; ক্ষুদ্রতা, নীচতা, ক্লীবতা, স্বার্থপরতা থেকে মুক্তিলাভের মন্ত্র, হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্তিলাভের মন্ত্র; অবসাদ, বৈরাগ্য, আত্মাবমাননা ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভের মন্ত্র। 'তারা ব্রহ্ম' এ কথা শেখাবার আগে তাদেরে শেখাতে হবে, 'তারা হিন্দু', তারা এক বিশ্ববিজয়িনী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, তাদের ভিতরে রাম, কৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ব্যাস, শঙ্কর প্রভৃতির প্রাণশক্তি প্রবাহিত হয়ে এসেছে, সেই সংস্কৃতি ও সেই প্রাণশক্তিকে তাদের বাস্তব জীবনে জাগিয়ে তুলতে হবে। হিন্দুত্বের একটা অপরিসীম গৌরব বোধ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের অন্তরে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। জাগতিক জীবনসংগ্রামে জয়লাভের শক্তি যে তাদের ভিতরে নিহিত রয়েছে, তৎসম্বন্ধে তাদেরে সজাগ করতে হবে, এবং সেই শক্তিকে সুসংযত সুব্যক্ত সুদক্ষ ও কার্য্যক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল করবার কৌশল তাদেরে শেখাতে হবে। পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রিক জীবনে, আর্থিক জীবনে—জীবনের সকল ক্ষেত্রে যাতে তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পায় এবং তা কাজে লাগাতে পারে, তেমন ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক হিন্দুকে আত্মশ্রদ্ধাসম্পন্ন বীর্য্যবান্ হিন্দু করে তুলতে হবে।

হিন্দু বালকগণ যদি নিজেদের ভিতরে শক্তির সন্ধান পায় এবং সেই শক্তিকে চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তবে তারা না করতে পারে কি? তারা প্রত্যেকে যে অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার, তা তারা জানে না বলেই নিজেদেরে দুর্ব্বল বোধ করে, পরের অনুগ্রহে যেন-তেন-প্রকারেণ জীবিকা অর্জ্জন করতে পারলেই জীবনকে সার্থক মনে করে, পরাধীনতা ও পরাজয়কে বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান বলে মেনে নেয়। তাদের চরিত্রে যত অসংযম, যত উচ্ছৃঙ্খলতা, যত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, যত জড়তা, সকলের মূলে দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতাই পাপ, দুর্ব্বলতাই সকল প্রকার দুঃখ দৈন্যের নিদান। আমাদের জাতীয় চরিত্র থেকে দুর্ব্বলতা দূর করবার যদি কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা যায়, তবে সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। দুর্ব্বল বলেই হিন্দুরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে, মনেপ্রাণে পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়ে, সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করতে পারে না। অন্তরে যত শক্তির অনুভূতি হয়, জড়তা ভীরুতা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ততই তিরোহিত হয়। শক্তিমানেরাই যথার্থ জ্ঞানী ও প্রেমিক হতে পারে, জ্ঞান ও প্রেমের ধর্ম্ম শক্তি-মানেরই ধর্ম্ম,—দুর্ব্বলেরা হয় কামের দাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার দাস।

শুধু উপদেশে শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। পারিবারিক

বাংলা শিশু-সাহিত্যের মূল্যায়ন

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ

সম্প্রতি আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্য গড়ে তোলবার জন্য দিকে দিকে একটা সাড়া পড়ে গেছে। মূল্য তার কম নয়। বাংলা দেশে ছেলেমেয়েদের জন্য এই সাহিত্য রচনার ইতিহাস খুব অল্পদিন হলেও, এত কম সময়ের ভেতর যে, দেশের চারিদিকে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে, এটা খুব আশার ও আনন্দের কথা। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, দেশের দিকে তাকিয়ে দেখলে নিজের দেশের জন্য একটা গভীর বেদনা জাগে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও হয়। এখন সে লজ্জা মুছে ফেলার দিন এসেছে। যে জাগরণে আজ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করা হয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। শুধু তাই নয়, শিশু সাহিত্য রচনায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের কর্মধারা যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সাহায্য ও সহায়তা করবার জন্য দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বর্তমান সময়ে শিশু-সাহিত্য রচনার দিকে শিশুদের মনের চাহিদা কী এবং কতখানি এ সংবাদটুকু পরিপূর্ণভাবে সকলের জানা প্রয়োজন। কারণ সৌন্দর্যপিয়াসী অতৃপ্ত শিশুমন চিরদিন রূপকথা রহস্যের লুকোচুরি গল্প, কাহিনী শোনার কৌতূহলে মত্ত থাকে। তাই নিবিড় আনন্দে পরিপূর্ণ, বিচিত্র রহস্যের সুরে ভরা যে গল্প, কাহিনী, কথা গড়ে উঠবে, তার দিকে বিচার করা উচিত তাদের জন্ম-পরিবেশের ভিতর দিয়ে। সে দৃষ্টির রূপ হবে শিশুমনের কল্পনায় রঙীন আশা ও আশঙ্কায় আসা রাজপুত্র রাজকন্যাদের মধ্যে। কখনও কল্পনায় দেখা—রাক্ষস-খোক্কসদের মধ্যে আবার কখনওবা আবিষ্কারের নতুন তত্ত্ব কাহিনীর ঘটনাতে। শিশু-সাহিত্যিকদের কল্পনায় যেমন এটা একেবারে অবাস্তব নয়, ঠিক তেমনি শিশুপাঠকদের কাছে ঐগুলি এক-একটি একান্ত শিকার তাদের শিশুমনের খোরাক মেটাবার জন্য। স্বভাবতঃ এর মধ্যে বাধা প্রতিবন্ধক থাকলেও শেষে একটা মিলনের আনন্দ আছে।

সুতরাং, এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শিশু-সাহিত্য বহু বিচিত্রতার মধ্যে একদিকে যেমন প্রাণখোলা নির্মল হাসির মূল্য আছে, অপরদিকে তেমনি মূল্য আছে মর্মস্পর্শী কান্নারও। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিষাদের দোলায় না উঠতে পারলে মনের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কোনটিরই স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা দেয় না। অপরের বেদনাকে নিজের অন্তরের মাঝে উপলব্ধি করবার সুযোগ দেওয়াই তো সাহিত্যিকের কাজ। তাই শিশু-সাহিত্যের উপাদান হিসাবে হাসি ও কান্নার প্রবাহকে অস্বীকার করা চলে না। যেমন দেখা যায়, রাজপুরী থেকে বিতাড়িত ন-রাণী ও ছোট রাণী তাদের সন্তান বুদ্ধু-ভুতুমকে নিয়ে কাঠ কুড়িয়ে দুঃখের দিনগুলি চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেও, তারা জীবনের সার্থকতার সন্ধানে

অনুষ্ঠান, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,—সকল ক্ষেত্রে এমন বিধি-ব্যবস্থা দরকার, যাতে শক্তির জাগরণ হয়, আত্মশ্রদ্ধার উদ্বোধন হয়, জাতীয় গৌরব বোধের উদয় হয়। বাস্তব জীবনে মুক্তির আস্বাদন, স্বাধীনতার আস্বাদন, বন্ধন-হীনতার আস্বাদন প্রথম আবশ্যক। তারপরে চরম মুক্তির কথা, সর্ববিধ বন্ধন থেকে আত্যন্তিক মোক্ষ-লাভের কথা, ব্রহ্মাত্মবোধ ও বিশ্বাত্মবোধের কথা।

সব শেষে স্বামীজী আরো গম্ভীরভাবে মৃদু স্বরে বলিলেন,—'শ্রীগুরু কৃপাই আমার জীবনের সম্বল, তাঁহারই কৃপায় আমার অন্তরে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, তদনুসারে আমি কার্য্যে ব্রতী হয়েছি, ফলাফল তাঁরই হাতে।' বহিঃপ্রকোষ্ঠে স্বামীজির শিষ্য ও ভক্তগণ কর্তৃক তাঁহাদের গুরুর সুসজ্জিত আসনের সম্মুখে "গুরু কৃপাহি কেবলম্"—গান চলছিল। আমি শ্রদ্ধায় নতশির হয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম।

ছুটতে কসুর করেনি। একদিন দেখা যায় ঐ অবহেলিত বন্ধুভুতুমই বীরত্বের সাধনা করে লাভ করলো অতুল ঐশ্বর্য, ফিরে পায় পিতার স্নেহ, আনে মায়ের সুখ। জগতে এমনি করেই তো ঘটে অন্যায়ের অবসান। কল্পনার প্রসার এমনি রকমের বিষয়বস্তুর মধ্যেই তো সবচেয়ে বেশী করে খেলে বেড়ায়। এই পথেই বিচরণ করে 'গালিভার', ঘুরে বেড়ায় 'এলিস', ভ্রমণ করে 'ওন কুইক্ সোট্', আবার 'রাজকাহিনী'র বা ঠাকুরমার ঝুলির রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুরও সবাই চলেছে এই পথ দিয়েই।

এমনি একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও ঔৎসুক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রূপকথার ৺দক্ষিণারঞ্জন ফিরে তাকিয়েছিলেন প্রাচীন বাংলার অবলুপ্তপ্রায় কথা-সাহিত্যের দিকে। কারণ, আজ থেকে শত বছর আগে রূপকথার ভাষা ছিল অপ্রকাশিত। পল্লীগীতি, প্রাচীন বাংলা গান, ছড়া, পাঁচালীর মধ্যে লুকিয়েছিল বাংলার প্রাণ-সাহিত্য। তখনকার দিনে মানুষেব মুখে মুখে মানুষ গল্প শোনবার প্রয়াসী ছিল এবং সে গল্প শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল গ্রামের বটবৃক্ষ, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি স্থান। এই কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত গ্রাম্য-সাহিত্যের অবগুণ্ঠন মোচন করে বাংলা ভাষায় শিশু-স্যাহিত্যের অপূর্ব রত্নবাজির সন্ধান দিলেন ৺দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। দক্ষিণারঞ্জনের সুললিত ভাষায় আত্মপ্রকাশ ক'রল রূপকথার সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, রাজপুত্তুর-রাজকন্যারা আর জীবন্ত হয়ে উঠল দৈত্য-দানব ডাইনী রাক্ষস-খোক্সের দল। শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও সেই রূপকথাব ঝুলি পেয়ে আনন্দে উতরোল হয়ে উঠলেন।

বাংলা ভাষায় শিশুমনের অপূর্ব ভাব-বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় এমন ধরণের কল্পনাপ্রধান স্নেহরস-সিঞ্চিত সাহিত্য হিসাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' এবং শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ক্ষীরেব পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'নালক' বহুদিন শিশুমনকে প্রভাবিত করবে। অন্যদিকে উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনীর বই', জসীমউদ্দীনের 'হাসু' ও 'একপয়সার বাঁশী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আম আঁটির ভেপু', সুখলতা রাও-এর 'পড়াশুনা' ও 'গল্প আর গল্প', সুকুমার রায়-এর 'হ-য-ব-র-ল' এবং যোগেন্দ্র-নাথ গুপ্তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই 'শিশু-ভারতী' বইগুলি শিশু বা বয়স্কদের কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয়।

শিশুমনের অপূর্ব ভাব-বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় এমন ধরণের কল্পনাপ্রধান সাহিত্য হিসাবে 'স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পাতালপুবীর কাহিনী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গল্প আর গল্প', ৺সুনির্মল বসুর 'ছন্দের টুংটাং', ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'অসি বাজে ঝন্ ঝন্', লীলা মজুমদারেব 'পদিপিসীর বর্মী বাক্স', বুদ্ধদেব বসুর 'এলোমেলো', ইন্দিরা দেবীর 'সব সেরা সঞ্চয়', কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের 'জয়ডঙ্কা', মৌমাছির 'নাচ, গান হল্লা', আশা দেবীর 'ঘুমতি নদীর ঢেউ', অন্নদাশংকর রায়ের 'রাঙা ধানের খৈ', তাবাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীপঞ্চমী', জগন্নাথ পণ্ডিতের 'জগন্নাথের খেয়ালখাতা', বুদ্ধু ভুতুমের 'গল্প', বন্দে আলি মিঞার 'মেঘকুমারী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শিশুপাঠ্য হিসাবে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

আনন্দের কথা, আধুনিক যুগের সাহিত্যিকরা শিশু-মনে রেখাপাত করবার জন্যে উপেক্ষিত, কুণ্ঠিত গ্রাম্য-সাহিত্যের প্রতি নতুন আগ্রহ ও কৌতূহল দেখিয়েছেন। জাতীয়তার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সঙ্গে মিলন এবং ভবিষ্যতের শিশুদের মনের খোরাক মেটাবার প্রচেষ্টায় সাহিত্যিকদেরই মহা আদর্শের পরিচয় দিতে হবে! তাই রূপকথা, গল্প, কাহিনী, ছড়া লেখাটা সাহিত্যিকদের কেবল আনন্দবিলাস নয়, এ একটা বিশেষ কর্তব্য।

এই রূপকথা, গল্প, ছড়া বা কাহিনী শোনবার জন্য অদম্য যে কৌতূহল তা শিশুমনের চঞ্চলতাকে প্রদীপ্ত করে। এমনকি বিচিত্র এই কল্পকথার মধ্যে শিশুদের সঙ্গে বয়স্করাও সেই কথা আর কাহিনীর সংগ্রহ পেয়ে প্রচুর আনন্দ পান। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষের একটি ছোট্ট অপরিণত সংস্কার হিসাবে শিশুকে দেখলে চলবে না। শিশু, সেতো পূর্ণ পরিণত শিশুই। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর, জীবনের এই তিনটি

স্তরেই আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও পরিপূর্ণতা। তাই ছোটদের সাহিত্যক্ষেত্রে শিশু, বালক ও কিশোরের মানসিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আলাদা, আলাদা তিনটি পূর্ণ পরিণত স্তর থাকা প্রয়োজন। আমাদের শিশু-সাহিত্যে এই বিভাগত্রয় নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে শিশুর কল্পনাবিলাসী মন যখন রূপকথার স্তর পেরিয়ে আসে তখন সে বাস্তবের মাধ্যমে পুরাতে চায় তার অভিযানপ্রিয় মনের অভিলাষ। রহস্যময় 'ডিটেক্‌টিভ' গল্প তখন তার সে অভিলাষ পূরণ করে বাস্তব পরিবেশের মধ্য দিয়ে। রূপকথার রাজপুত্রের স্থানে যখন তরুণ 'ডিটেক্‌টিভ' এসে দাঁড়ায় তার শাণিত বুদ্ধির কৌশল নিয়ে তখন শিশুমন মুগ্ধ হয় তার বুদ্ধি-চাতুর্যে, অভিভূত হয়ে পড়ে তার সন্ধানকৌশলে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় রহস্যমূলক "ডিটেক্‌টিভ" গল্পও শিশুদের প্রিয়।

সুতরাং সাহিত্যকে বাদ দিয়ে যদি কোন বিশেষ বয়সের অনুযায়ী বলে ধরে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তবে রহস্যমূলক ডিটেক্‌টিভ গল্প গিয়ে পড়বে কৈশোরের উপযোগী সাহিত্যের মধ্যে। এই বয়ঃসন্ধিক্ষণ শৈশবের সর্বপ্রকার প্রকৃতিগত বিশেষত্বের পুনঃ সংস্করণের সময় বলেই মনস্তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন। কিন্তু শিশুর মধ্যে তা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে আর তার জন্যই কিশোর শিশু কর্মচঞ্চল, কর্মপ্রিয় হয়ে ওঠে; তার উদ্দাম প্রবৃত্তি তখন তাকে অভিযানপ্রিয় করে তোলে। তাই তার সাহিত্যের মধ্যে সে চায় দুঃসাহসিক অভিযানের কথা, তার খানিকটা তৃপ্তি পায় সে 'ডিটেক্‌টিভ' গল্পের মধ্যে। তার সহজাত বৃত্তিকে উন্নত প্রকারে সঞ্চালিত করতে গেলেও তার হাতে অভিযানমূলক কাহিনী দেওয়ার প্রয়োজন এসে পড়ে। তাই কিশোর-সাহিত্যে 'ডিটেক্‌টিভ' রহস্য গল্প এত গুরুতর স্থান অধিকার করেছে।

কিন্তু, 'ডিটেক্‌টিভ' কাহিনী শিশুদের কাছে চমকপ্রদ হলেও এ বিষয়ে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই 'ডিটেক্‌টিভ' বা রহস্যমূলক কাহিনী যেন অবাস্তবতা দিয়ে অপরাধকে ঘনীভূত করা না হয়। বাংলাদেশের পরিবেশে স্বতঃ অপস্রিয়মান লৌহযন্ত্র বা বোতাম টিপে সমস্ত বাড়ীটিকে রসাতলে নিয়ে যাওয়া এবং মানুষের জীবন হরণ করার পক্ষে যতই অদ্ভুত হোক না কেন, অনগ্রসর বৈজ্ঞানিক পরিবেশে এ একটি অবাস্তব আব্‌-হাওয়াই সৃষ্টি করে আসছে। কোন কিছুর অবতারণা নেই, হঠাৎ আকাশে শ্বেতপদ্মের আবির্ভাব যতই চমকপ্রদ হোক না রহস্যগল্পে, অবাস্তব কতকগুলি ব্যাপারের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই একে বলা চলে না। সে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে শিশু বা মানুষের অন্তরের শিশু অভিযান অভিলাষের পরিতৃপ্তি খুঁজে বেড়ায় যেখানে, সে বাস্তব পরিবেশের অভাবে চমকপ্রদ কাহিনী মনকে যতই রোমাঞ্চিত করুক না কেন, রহস্যমূলক কাহিনীর মূল উদ্দেশ্যই হয়ে যায় ব্যর্থ।

সুতরাং শিশু-সাহিত্য রচনার সময় কাহিনীকারকে কঠিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেও যদি কাহিনীর মাধ্যমে আনতে হয়, তাহলে এমনভাবে আনতে হবে যেন গল্পের আবহাওয়ার সঙ্গে সে আপনা থেকেই মানিয়ে যায়। আজকাল ছোটদের সাহিত্য সৃষ্টির নামে 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার' শ্রেণীর উপন্যাসের বই প্রচলনই বেশী করে দেখা দিয়েছে। এর দুটো দিক—প্রথমতঃ বিদেশী রোমাঞ্চকর কাহিনীর অনুবাদ অথবা অনুকরণ এবং দ্বিতীয়তঃ মৌলিক রচনা। অসম্ভব কাল্পনিক ভৌতিক ধরণের এই গল্পগুলি কল্পনা-বিলাসী বাঙালীজাতির পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়। এই জাতের সস্তা খেলো বই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। অন্যদিকে মৌলিক রচনার মাধ্যমে বাংলা ও অপরাপর ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছোটদের আনন্দমঠ', শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ধূপের ধোঁয়া', রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান', তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা', গিরিন চক্রবর্তীর 'দেশবিদেশের সেখা,' মৌমাছির 'জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড', স্বপনবুড়োর 'বিশ্বশর্মা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিবাজী মহারাজ', মোহিতলাল মজুমদারের 'রূপকথা',

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'নতুন যুগের নতুন মানুষ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

আজকের এই স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের বাংলা-দেশের ছেলেমেয়েদের মনকে যদি শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর অবধি সুপথে পরিচালিত ও গঠিত করা না যায়, তা হলে আমাদের দেশের মানবসম্পদই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কথাটি স্মরণ করে যদি আমরা শিশু-সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হতে পারি, তবেই দেশের কল্যাণ। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি শিশু-সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। তাই যদি হয়, ঐগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে 'সংগ্রহ' বা 'সঞ্চয়িনী' বা 'চয়নিকা' নামে যে সমস্ত বই বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয়ে থাকে তাদের পদ্যাংশে যদিওবা কিছুটা শিশুমনের খোরাক থাকে, গদ্যাংশে তো এর নিদর্শন মেলে না। পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাব ও বিষয় এতই সীমাবদ্ধ এবং গঠনপদ্ধতিও এতই প্রাচীন যে, সুপরিসর সাহিত্যের বিরাট প্রাংগণে ছাত্রছাত্রীরা আদৌ উপস্থিত হতে পারে কিনা সন্দেহ আছে। তাই, শিশুদের মনে যদি বইয়ের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণীয় সম্পর্ক গড়ে না ওঠে, অথবা এই সম্পর্কটি যদি শুধু বিদ্যালয়ের কঠোর, গম্ভীর পাঠ্যপুস্তকেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে শিশুদের যা ক্ষতি হয় তা পরে আর পূরণ করা সম্ভব হয় না।

শিশু-সাহিত্য বিষয়ে আর একটি কথা বলা দরকার যে, বর্তমানে বিদেশ থেকে আমরা কৌটার দুধ আমদানী করে বাংলার ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তার পরিণাম যে শুভ হবে না এটা যেমন অনুমান করা যায়, সেই রকম বিদেশ থেকে এদেশে শিশু-সাহিত্যের নানা বই আমদানীর একটা ঝোঁক কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে। এবং নামমাত্র মূল্যে ঐ সমস্ত বিদেশী বই এ দেশের রাস্তাঘাটে প্রচার হওয়ায় বাংলার ছেলেমেয়েরা তাদের নিজস্ব রূপকথা, ছড়া, গল্প, কাহিনী ভুলে যেতে বসেছে। আর অন্যদিকে বইএর প্রকাশক ও লেখকদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর একমাত্র কারণ আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই আমাদের ইচ্ছে যে, বাংলার শিশুরা বাংলার মাতৃস্তন্যেই লালিত হোক, বাংলার ছেলেমেয়েরা যেন বাংলার ঐশ্বর্যময় শিশু-সাহিত্য থেকে বঞ্চিত না হয়। এই জন্যেই প্রার্থনা করি সকলের কাছে—

বাংলা পড়, বাংলা লেখ, বাংলায় কথা কও
বাংলার ভাই, বাংলার বোন, বাঙালী সবে হও।*

* প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের অধিবেশনে পঠিত।

ইরাবতী

নীতীশ মজুমদার

প্রাগ্-ঐতিহাতিক তুমি আর তোমার নামটি
আজো রয়ে গেছে রহস্যাবৃত—
অনেক আবেগ আর অনেক মমতা
যেন জড়িয়ে রয়েছে ঐ নামটির অস্পষ্ট শরীরে।
কেন আজি বিস্ময়ের অবগুণ্ঠনে
আর ঝড়ের ইসারায়
তুমি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলে আজ।
সেই অনেক .....অনেক আগে
স্বচ্ছ দৃষ্টির গভীরতায়
বুঝি মুক্ত পাথরের ইঙ্গিত ছিল।
নীচে আকাশের নীলিমায় বুঝি
তাও হারালো।
তারপর.....
তারপর বহুকাল বহু শতাব্দী
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গেছে
ভাবনার স্রোতে।
অশান্ত তোমারি উদ্বেগ-স্রোতের মত
সেই প্রাক-পৌরাণিক আরণ্যক-পদধ্বনি
পর্ব্বত শিখরে আর রাত্রির অন্ধকারে
অস্পষ্ট ছায়ার মিছিল
এগিয়ে চলে—, এগিয়ে চলে অলক্ষ্যের পানে।
.....
ঘুম নেই
ঘুমন্ত-স্বপ্নগুলোও বুঝি হারিয়ে গেল।
হারিয়ে গেল কি স্বপ্নাচ্ছন্ন ঐ নামটির মদির আবেশ?

'প্রবর্ত্তক'-এর পঞ্চাশ বছর

অঃ অরাপ্রসন্ন সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

॥ ৯ ॥

১৩২৫ সাল, ৩০শে কার্ত্তিক প্রবর্ত্তক পত্রিকার ৩য় বর্ষের ২১শ সংখ্যার প্রায় সবখানি জুড়িয়াই "মাতা মৃণালিনী", "অরবিন্দের তিনটী পাগলামী" ও "অরবিন্দ প্রসঙ্গ" শীর্ষক তিনটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত উক্ত সংখ্যায় "আত্মশাসন" ও "ইচ্ছা" এই দুইটী ছোট প্রবন্ধ মাত্র ছিল। এই সংখ্যাকে অরবিন্দ সংখ্যা বলা যাইতে পারে। সংখ্যাখানিতে মাতা মৃণালিনী ও অরবিন্দ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। এই সব রচনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমতিলালের সংযোগ সম্বন্ধে অনেক কথা মিলে।

১৯০৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' ও 'No Compromise' নামক দুইখানি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করেন। তৎপর বারীন ঘোষের তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান গ্রে ষ্ট্রীট ও রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের বাটীর দোতলা হলঘরের একটি কোণ ঘিরিয়া কম্পোজ করার ব্যবস্থা ছিল। ঐস্থানে বসিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে এই পুস্তিকা দুইটির কম্পোজ কার্য্য চলিত এবং ঠন্‌ঠনিয়া গুপ্ত প্রেসে শেষ রাত্রে উহা ছাপাইয়া লওয়া হইত। 'No compromise' বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত আপোষরফা বিরোধী একখানি পুস্তিকা। "ভবানী মন্দির" পুস্তিকার মর্ম্ম ছিল, নিভৃত পর্ব্বতগুহায় ভবানী মন্দির হইবে এবং সেইখানে সাধনায় সিদ্ধ আধারে ভগবতী বিগ্রহান্বিত হইয়া দেশকে মুক্তিযজ্ঞে দীক্ষা দিবেন। শ্রীঅরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত এই গুপ্তচক্রের কাজ ও ধারা ছিল তীব্র আত্মভোলা ত্যাগ ও ভগবানে সমর্পণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঐশী মহাশক্তির কৃপা ও সাধনা বিনা ভারতের মুক্তি অসম্ভব। সুরাটের কংগ্রেস-দক্ষযজ্ঞের পর ১৯০৭ সালে শ্রীঅরবিন্দ নর্ম্মদার কূলে সিদ্ধ ত্যাগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকায় মুক্তি আন্দোলনে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার করিতে থাকেন। ইহার পর আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িত হইয়া তিনি আলিপুর জেল-হাজতে প্রেরিত হন। জেল-হাজতে থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দের বাসুদেব দর্শন হয়। আলিপুর বোমার মামলার পর তিনি ক্রমশঃ রাজনীতি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে থাকেন। এই নির্জ্জন কারাবাস শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের দিক্-পরিবর্ত্তন আনে।

মুক্তির পর পুনরায় দৈব-নির্দ্দেশে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে শ্রীমতিলালের গৃহে (১৯১০, ফেব্রুয়ারী) আশ্রয় লন। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় শ্রীমতিলাল অতঃপর চন্দননগরে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছাড়া শ্রীশ ঘোষ, বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মহারাষ্ট্রীয় পারার—এই তিনজন সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইঁহারা চারিজন চুঁচুড়ার এক নির্জ্জন উদ্যানে মিলিত হইতেন। রাসবিহারী বসুও এখানে আসিয়া মিলিত হন। এই বিষয়ে শ্রীমতিলালের কথা :

"১৯১০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে উপস্থিত হন। চন্দননগরে বিপ্লবগুরু ৺চারুচন্দ্র রায়, ফরাসী রাষ্ট্র আইনবলে আলিপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া তখন ঘরে ফিরিয়াছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হইলে, শ্রীঅরবিন্দ আমার বাটীতে আশ্রয় লাভ করেন। বাংলার বিপ্লবযুগের ইতিহাস এই যোগাযোগের ফলেই নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। বিপ্লবী-বাংলার প্রধান ঋত্বিকরূপে তাঁর সমস্ত কর্ম্মভার ধীরে ধীরে চন্দননগরের উপরেই ন্যস্ত হইল। তিনি শক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আত্মসাধনে রত হইলেন। সেই সময় তিনি আমার নিকটে "কালী" নামেই আত্মপরিচয় দিতেন।"

হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের বিপ্লব কাহিনী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"রাসবিহারী তখন দেরাদুনে থাকিতেন। শ্রীশ ঘোষ তাঁহার আত্মীয়। শ্রীমতিলালের বন্ধু। রাসবিহারী শ্রীমতিলালের কাছে শ্রীঅরবিন্দের যোগতত্ত্বের সন্ধান

পাইলেন। আত্মসমর্পণ যোগ তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। এই রাসবিহারীও অনেক সময় চন্দননগরে আসিতেন এবং শ্রীশবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন। ১৯১৫ সালে তিনি যে দেশ ছাড়িয়া যান তাহাও শ্রীমতিলালের ও শ্রীশবাবুর সহায়তায়।

"অনুশীলন সমিতির সভ্যগণকে চন্দননগরে আনিয়া ইহার সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। এই যোগাযোগ হয় অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রধান কর্ম্মী অমৃত হাজরার দৌত্যে। অনুশীলনের সহিত চন্দননগরে সংযোগ ঘটিল।

"প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে যখন উত্তরপাড়ায় সম্মিলন হয় তখন চন্দননগরের শ্রীমতিলাল, শ্রীশচন্দ্র, শ্রীঅমর চট্টোপাধ্যায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তে রাসবিহারীও বিশেষ উৎসাহ লাভ করেন।

"১৯১৮ খৃঃ চন্দননগরের প্রধান কর্ম্মী শ্রীশবাবু হাওড়া ষ্টেশনে ধরা পড়েন। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমতিলালকে লেখেন—"Arya and Bomb should not be forever together", শ্রীমতিলাল শ্রীঅরবিন্দের কথা মাথায় পাতিয়া নিলেন। বিপ্লবীগণের চরিত্র গঠনের প্রতি শ্রীমতিলালের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি কোন কোন যুবকের পদস্খলনে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং পরে তাঁহার কর্ম্মধারা গঠনমূলক কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়। তাহারই ফলস্বরূপ চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ বাংলাদেশে গৌরবময় প্রতিষ্ঠান" (ভারতের বিপ্লব-কাহিনী—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত)।

১৩২৫ সাল, ২রা পৌষ, পূর্ণিমা তিথিতে মাতা মৃণালিনী দেবী দেহত্যাগ করেন। এই মহীয়সী মহিমময়ী রমণীর পুণ্যস্মৃতি স্মরণে প্রবর্ত্তক ৩য় বর্ষের ২১শ সংখ্যায় তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ৩০এ কার্ত্তিক। বোধ হয় সেই সময় বিশেষ কোন বিপর্য্যয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুই মাস পরে এই সংখ্যাটী প্রকাশিত হইয়াছিল। "মাতা মৃণালিনী" শীর্ষক তাৎপর্য্যপূর্ণ লেখাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"বজ্রপাতের মত মাতা মৃণালিনীর মৃত্যুসংবাদ আমাদের হৃদয় ও মনকে যুগপৎ স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য কঠোর বিধানে, আমাদের আশা ও কল্পনার সুবর্ণ প্রসাদ আজ ধূলিশায়ী। ১৯০১ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দের অঙ্কশোভনা হইয়াও, তুমি এ পৃথিবীর সুখে সুখী হইতে পার নাই···তোমার স্বামী যে চীরখণ্ড কটিতটে জড়াইয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—অযাচিত ঐশ্বর্য্য তাঁর চরণতল বেড়িয়া কাঁদিয়া মরিল—তিনি কঠোর দারিদ্র্য ব্রতকেই সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন। যে জন্য তিনি জগতের সকল বিলাস অবহেলে পরিত্যাগ করিয়া আজও সুদূর প্রবাসে যোগনিমগ্ন। যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমার মত সতীসাধ্বীর সঙ্গসুখকেও তিনি পরিহার করিয়াছিলেন। সেই তাঁর তিনটী পাগলামীর কথা তোমার হৃদয়ে যে গাঁথিয়া গিয়াছিল। মা, তাই তুমি আজ এক বৎসর পূর্ব্বে, স্বামীর ব্রত গ্রহণের অভিলাষিণী হইয়া তাঁরই চরণতলে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়াছিলে, ঘটনার প্রতিকূলতায় তোমার এবং আমাদের সে সাধ অপূর্ণ রহিয়া গেল। * * তোমার মত আমরাও তিনটি পাগলামীতেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। * * কিন্তু ২রা পৌষ মঙ্গলবার পূর্ণিমা আমাদের হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ করিয়া দিল।"·····

এই সঙ্গে শ্রীমতিলাল মাতা মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু-প্রসঙ্গে 'জীবন সঙ্গিনী' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন: "সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃতির পথে শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন আমার ইষ্টস্বরূপ লক্ষ্য। ইষ্টশক্তি মৃণালিনী দেবীকে "মা" বলিয়া আমি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম, তাঁহারই পবিত্র নামে বস্ত্র-বয়ন কার্য্যালয়ের নামকরণ হইয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে, ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ মঙ্গলবার, পূর্ণিমা তিথিতে মাতা মৃণালিনীর পরলোক গমনের সংবাদ আমাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিল। দেবী মৃণালিনীর সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে নাই। কিন্তু ভারতীয় জীবন-সাধনায় ইষ্টের সহিত ইষ্টশক্তির আবির্ভাব আমার হৃদয় আলো করিয়াছিল। তাঁহার তিরোধান-সংবাদে আকুল হইয়া "প্রবর্ত্তকে" লিখিয়াছিলাম, "দেবী কালে অতল তলে নিমজ্জিতা হইলেন।

সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জিতা হইল। সহস্র সন্তানের হাহাকার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে—মা, মা, জগতের অন্তরায় হইতে মুক্ত অজস্র ধারায় শক্তি তোমার পৃথিবী ছাইয়া ফেলুক; ভারতের যে অশুদ্ধ শক্তি উৎবময় জনপদ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করে, তাহার বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা কর। কোটি কোটি সন্তান হর্ষে, আনন্দে তোমার অনুসরণ করিবে।

"১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ দেবী মৃণালিনীর পাণি-গ্রহণ করেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ স্বামীসোহাগিনী হওয়ায় কঠোর তপস্যাই দেবী করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গিনী হওয়ার জন্য তাঁর যে আকুতি, উহা পূর্ণ হওয়ার কাল আসন্ন হইলে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। বিধাতার এই দুর্জ্ঞেয় নীতির মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে, সে বিচার আজও আমার শেষ হয় নাই।

"শ্রীঅরবিন্দ আই. সি. এস. হইয়াও অতি সস্তায় বরোদা রাজ্যের নিকট যখন বিকাইয়া গিয়াছিলেন, তখন কে জানিত দেশাত্মার জাগরণযুগে অকস্মাৎ বাঙ্গালাদেশ হইতে আসমুদ্র হিমাচল তাঁর বিদ্যুচ্ছক্তি প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। দেশহিতব্রতী পরম যোগী শ্রীঅরবিন্দ বাংলার অন্ধযুগের আবরণ দূর করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়া, ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে এক অসাধারণ রাষ্ট্র-জাগরণের আন্দোলন আনিলেন। রাজসম্মান, আরাম, ঐশ্বর্য্য, রূপলাবণ্যময়ী যুবতী ভার্য্যার আসক্তি তিনি ত্যাগ করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রে তিনি দেশ-প্রীতির অমৃত ঢালিয়া দিলেন। ধর্ম্ম ও ভাগবত-প্রীতির বিশ্বাসের অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া, তিনি জাতি আত্মাকে জাগাইয়া তুলিলেন। মাতা মৃণালিনী শ্রীঅরবিন্দকে স্বামীরূপে যতবার ধরিতে গিয়াছেন, নাগাল পান নাই। শ্রীঅরবিন্দ নিজেরই তিনটি পাগলামীর কথা উল্লেখ করিয়া পত্নীর নবজন্ম চাহিয়াছিলেন।

"মাতা মৃণালিনীর মৃত্যুসংবাদে শোকের তীব্র কশাঘাত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। আমরা সেদিন শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গ লইয়া কত কথা আলোচনা করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে" লিখিয়াছিলেন, "সতীর পতি বড়, তার চেয়েও পতিধর্ম্ম বড়।" শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম্মপত্নীকে তিনটি পাগলামীর ভিতর দিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। এই সকল কথার আলোচনা আমার গৃহদেবীর মুখশ্রী নির্ম্মল উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিজের জীবনধর্ম্মে আস্থা ও প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল। ধর্ম্মের জন্য, ভগবানের জন্য শ্রীঅরবিন্দ অসাধারণ ত্যাগের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'শ্রীঅরবিন্দের অনুগ্রহ প্রসাদে তুমিও ধন্য হইলে।' শ্রীঅরবিন্দের আমার বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁর স্থির সৌম্যশান্ত মূর্ত্তির স্মরণে তিনিও বলিতেন, 'এই তিনটি পাগলামির নেশায় তাঁহার বিভোরতা আমিও দেখিয়াছি'।" শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যায়, 'শ্রীঅরবিন্দের তিনটি পাগলামি' শীর্ষক বহু বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মৃণালিনী দেবীকে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের এই তিনখানি পত্র আলিপুর মামলা সম্পর্কে গ্রে ষ্ট্রীটস্থ শ্রীঅরবিন্দের বাসায় খানাতল্লাসীর সময় পুলিশের হস্তগত হয় ও আদালতে উহা দাখিল করা হয়। ইহা পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা প্রবর্ত্তকে (৩য় বর্ষ, ১, ১) শীর্ষক লেখাটি আজিকার দিনে অরবিন্দ প্রসঙ্গের উপর নূতন আলোকপাত করিবে। প্রবন্ধটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"জীবনের ষোল আনা যিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া সমতা লাভ করিয়াছেন, প্রকৃতির যত কঠোর বিধানই তাঁর নিয়তি হউক না তিনি অটল অবিচল চিত্তে সমস্তই সহাস্যে বরণ করিয়া লইবেন। দেবী মৃণালিনীর মৃত্যুসংবাদও শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়ে একটা ক্ষুদ্র আঘাতও করিবে না, তাহা আমরা জানি।

"* * শ্রীঅরবিন্দ বাংলার অন্ধযুগের আগমন আভাস পাইবা মাত্র, অশুদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া সুদূর প্রবাসে তাঁহার প্রবল অধ্যাত্মশক্তি সহযোগে জগতের ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটনে ব্যাপৃত—দেশ কি তাঁর এই অধ্যাত্ম শক্তিটীর নীরব উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। জাগ্রত দেবতাটির পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবে না! অধুনা সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি সর্ব্বক্ষেত্রেই

নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, এই বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত জন্ম-সন্ন্যাসী শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ আমাদের পাইতেই হইবে। * * আজ বিপন্ন বাংলায় এই যোগসিদ্ধ পুরুষের আগমন সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য বাঙ্গালীর সাধনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে। * *

"যে ১৮৭২ খৃঃ নবযুগের নূতন প্রভাতে ১৫ই আগষ্ট, সে দিনটি বাঙ্গালী মনে করিবে কি—যেদিন তিনি কলিকাতা মহানগরীতে কর্ম্মবীর ৺মনমোহন ঘোষের বাটীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন? শিশু বলিয়া বিধাতার করুণা বিন্দু এই নূতন দেবতার পূর্ণতা আনিতে এক মুহূর্ত্তও ইতস্ততঃ করে নাই মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, চার বৎসরের শিশুটি একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশিনীদের হস্তে তাঁর শিক্ষার জন্য প্রদান করিলেন। উদর পূরিয়া মাতৃদুগ্ধ পানও অদৃষ্টে ঘটে নাই। দার্জ্জিলিং কন্‌ভেণ্টে শিশুজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। হায় জন্মভূমি! তোমার জন্য ভবিষ্যতে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিবেন, তাঁর পূর্ব্ব সূচনা কি অপূর্ব্ব, কি প্রহেলিকাময়। * * দার্জ্জিলিং কন্‌ভেণ্টে মাত্র এক বৎসর যাপন করিতে না করিতে ১৮৭৯ খৃঃ লণ্ডনে আসিতে হয়, মাতৃভাষার সহিত পরিচয় হওয়া দূরের কথা—কোন দেশে তাঁহার জন্ম এ কথাই তাঁর জানা হয় নাই। লণ্ডনে নিয়ত এক আশ্রয় হইতে অপর আশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন। কোন গৃহস্থের প্রতি আসক্ত হইবারও অবসর তাহাকে দেওয়া হয় নাই। প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব লীলা!

"ভবিষ্যতে, রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের অদূরদর্শিতার জন্য, বিনা দোষে তাঁহাকে যে এক বৎসর নির্জ্জন কারাবাস করিতে হইবে, ধর্ম্মের জন্য, ভগবানের জন্য, তাঁহাকে যে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখই হাসিমুখে সহ্য করিতে হইবে, ইহার জন্য বিধাতা তাঁহাকে আজীবন প্রস্তুত করাইয়াই তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৭৯ খৃঃ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাকে যে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল তাহার তুলনায় কারাক্লেশ বা প্রবাসে শত অসুবিধা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। * * বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশা ও আকাঙ্ক্ষা সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হওয়া, অরবিন্দ এমন সুযোগ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। * * বরোদার রাজ ২০০৲ টাকা বেতনে শ্রীঅরবিন্দকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন; আসিয়াই দেখিলেন পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। তিনি তাহাতে কাতর হইলেন না।

"১৯০১ সালে তিনি রায় বাহাদুর শ্রীভূপালচন্দ্র ঘোষের কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীকে হিন্দুমতে বিবাহ করেন। ৫৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁর বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, পরে ৭০০৲ টাকা বেতনে তিনি যখন রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল, বাংলায় তখন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিয়া উঠিল। তিনি একেবারে সন্ন্যাসীর বেশে বাংলার পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন—সেদিন অলক্ষ্যে ভারতজননী মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া দিলেন—এমন সন্তান তিনি যে বহুদিন ধারণ করেন নাই।"

তৃতীয় বর্ষের প্রবর্ত্তকের প্রতি সংখ্যায়ই শ্রীমতিলালের শুদ্ধ সংগঠনের আকুল প্রেরণা বাণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। নমুনাস্বরূপ এইসব রচনার স্থানবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"ওগো ঋষি তপস্বী আর্য্যসন্তানগণ, ভাষা যে নীরব হইয়া যায়—এখনও কি বুঝিতে পার নাই কাহার আহ্বান আসিয়াছে? যে তোমাদের জীবন—তাঁহারই চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া হৃদয়কে শশ্মান করিতে হইবে। মহাকালী যে শ্মশানেই নৃত্য করিতে ভালবাসেন। কে তাঁর দৈবীলীলার জন্য হৃদয় পাতিয়া দিবে। 'বর্ষ-আরম্ভ' (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।"

"দুর্ব্বল পরাধীন জাতির জীবনে, দৈবানুগ্রহে কর্ম্ম-প্রেরণা আবির্ভূত হইয়া—তাহাদের অশুদ্ধ অসারজনিত নানা অনার্য্যদুষ্ট কর্ম্মপ্রেরণা ঘটাইয়াছিল, কিন্তু পূত আর্য্যশোনিতপ্রবাহী হিন্দু জীবনে আসুরিক রীতি-নীতির প্রবর্ত্তন ঘটাইলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। * * ভগবানের অঙ্গুলি সঙ্কেতে যে সাধক জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাঁহার ভয় তাঁহার লাভক্ষতি জ্ঞান, তাঁহার গোপন করিবার কি আছে? এই বর্ত্তমান মহাসমস্যার কুটিল আবর্ত্ত হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে

বাঙ্গালীকে সর্ব্বাগ্রে এই কঠোর তপস্যার পথে চলিতে হইবে ('আহ্বান', ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

"কোন্ পথটিতে জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিলে আমরা বিপদসঙ্কুল পথে চলিয়াই, আমাদের সনাতন চরিত্রকে দিন দিন বিকশিত করিয়া তুলিব, ইঙ্গিতে ইসারায় প্রবর্ত্তক ছত্রে ছত্রে এ কথা ব্যক্ত করিয়াছে। * * আমরা প্রবর্ত্তকের ছত্রে ছত্রে বলিয়া আসিতেছি, একদিকে যেমন অশুদ্ধ রাজসিকতা (Anarchism) প্রভৃতি দেশের প্রভূত অনিষ্টকর, অন্যদিকে তমোপূর্ণ আড়ষ্টভাব ও অস্পষ্ট সংশয়পরতা 'সদা তরে তরে চলো, ফিরে ফিরে চাওয়া' ভাবও তেমনি হানিজনক। একটি সবল মনুষ্যত্ব, একটা সতেজ চরিত্রবল, একটা নির্ভীক উদার চিত্ত সরল সত্যের পথে গর্ব্বোন্নত শিরে অভিযান —আমরা বাংলাদেশের সকল নূতন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে ইহাই দেখিতে চাই। স্বামীজির সেই বলপ্রদ কথাটি ভুলিলে চলিবে না—'face the danger and the danger will fly' সমস্ত মহৎ চেষ্টার মূলে থাকা চাই প্রেম, সত্যানুরাগ এবং মহাবীর্য্য—তাহারই দ্বারা সমস্ত বিভীষিকা ও অন্তরায় নিষ্কাষিত হইবে, চালাকির দ্বারা নহে। * * বাংলা নূতন কর্ম্মপ্রেরণাসমূহ ভাঙ্গিবার পরিবর্ত্তে গড়িয়া তুলিবারই উত্তরোত্তর পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে যে নূতন সৃজনশক্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে, নূতন বনিয়াদে দেশের ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথ খুঁজিতেছে—"প্রবর্ত্তক" সে নবশক্তির হস্তেই আপনাকে পত্রস্বরূপ উৎসর্গ করিতেছে। (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 'কর্ম্মধারা')।"

শ্রীমতিলাল এই ৩য় বর্ষের প্রবর্ত্তকেই আগামী দিব্যযুগের আহ্বান দিয়াছেন :

"মনে রাখিও এতদিন তাঁর ইচ্ছাই তোমার জীবন দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তোমার সংস্কার ও অহমিকার আবেশে বিভোর ছিলে তাই বুঝিতে পার নাই। দিব্যযুগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মথিয়া পিষিয়া এই ঘোর কলিতে পরিণত করিতে শ্মশানকালীর কত আনন্দ, কত নৃত্য। আজ তোমার আমার চক্ষে অশ্রুধারা বহিতেছে, কিন্তু জানিও যাঁর ইচ্ছায় ব্যাধি, মৃত্যু, অবিচার নির্য্যাতন, প্রতিহিংসার কালানল জ্বলিয়া জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে—তিনি আনন্দের জন্যই এই সকল প্রকটন করিতেছেন। এই বিরাট ধ্বংসের পরই দিব্যযুগের ভিত্তি স্থাপিত হইবে।" ('সংস্কারানুরাগ' ৩য় বর্ষ প্রবর্ত্তক, ১ম সংখ্যা)।

সমসাময়িক কালের সংস্কারের বাড়াবাড়ির একটি ঘটনা লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতিলাল প্রবর্ত্তক ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় 'উদ্বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন :

"সেইদিন সংবাদপত্রে কলিকাতার উপকণ্ঠে এক সতীর কথা পড়া গেল। স্বামীর মৃত্যুর পরই সাধ্বী কেরোসিন জ্বালিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে বহু নরনারীর পূজা ও সম্মানলাভ করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এইরূপ জীবন বিসর্জ্জন মানুষের অধ্যাত্মশক্তির একান্ত অভাব এবং অসমর্থতা ও দুর্ব্বলতারই প্রকট দৃষ্টান্ত। কেননা স্বামীর সঙ্গে ইহজগৎ ত্যাগ অপেক্ষা স্বামীর বিরহ বুকে ধরে জগৎ হিতের জন্য তপোপরায়ণা যে সকল [illegible] তিল তিল করে জীবনের দিন গুণে যায়, তাঁদের পথ অধিকতর কঠোর, অধিকতর তপস্যা এবং অধিকতর সম্মান ও গৌরবের।" (প্রবর্ত্তক ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 'উদ্বোধন')।

"সংসারের সহস্র বন্ধনের মধ্যে মুক্তির অপার্থিব আস্বাদ যে অল্পায়াসে লাভ করা যাইতে পারে, এ কথার বিশ্বাস তাঁহাদের নাই। ভাগবত প্রেমের নর্ম্মদা-প্রপাতে অবগাহন করিতে হইলে তাহাকে সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহ সংসারের যে খেলা তাহা অনিত্য, অতএব সেই সমস্ত হইতে বিরত হইয়া কোন এক সংসার-জ্বালা-বিবর্জ্জিত অনির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিতে হইবে—ইহাই আজকালকার ধর্ম্মপ্রবণ মানুষের বদ্ধ ধারণা। বৌদ্ধযুগের এই দৃঢ় সংস্কারটি আমরা জাতির মন হইতে একেবারে মুছিয়া দিতে চাই।" ('প্রেরণা' প্রবর্ত্তক ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)।

"বাসনা ও চেষ্টার সম্যক্ নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃতির অমোঘ শক্তি আমাদের জীবনে ছড়িয়ে পড়বে, মানুষের জন্মার্জ্জিত এই অহঙ্কারের একান্ত নিরসন করাই সাধনা" ('প্রকৃতির সাধন', প্রবর্ত্তক, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)।

পিতার স্বর্গলাভ

শ্রীরাধাবল্লভ দে

বিমু ওরফে বিমল ছাত্রাবস্থায় মনে করিয়াছিল—লেখাপড়া শেষ করিলে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ না হোক বড় রকমের মোটা মাহিনার চাকুরি সে একটা পাইবেই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিল ব্যাপারটা তত সোজা নয়। চাকুরির দরখাস্তে বি. এ. খেতাব জুড়িয়া দিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কত জায়গায় চেষ্টা করিবার পর অতি কষ্টে সওদাগরী আপিসের একটি একশত টাকা বেতনের কেরাণীর চাকুরি পাইল। পিতা এখন গতাসু। বিধবা মা এবং নিজেকে নিয়াই তার ক্ষুদ্র সংসার। আট বৎসর যাবৎ মা সাধ্যসাধনা করিয়াও পুত্রকে সংসারী করিতে সমর্থ হন নাই। এখন বিবাহ-যোগ্য বয়স তাহার উত্তীর্ণ হইয়াছে। বয়স ৩৪। এতদিন পরে সে বিবাহ করিতে রাজী হইল। মা পুত্রের বয়সোযোগী এক সুন্দরী বয়স্থা কণে'র সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন। পুত্রবধূর নাম বিমলা। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক শিক্ষকের কন্যা। এখন তাহারা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের স্বামী-স্ত্রী। বৈচিত্র্যহীন জীবন। স্বামীর কাজ সকালে হাটবাজার, দিনে অফিস এবং রাত্রে আর একটা ছেলে পড়ানোর কাজ। নব-পরিণীতার উপর ন্যস্ত হইল রন্ধনশালার যাবতীয় কাজ, অধিকন্তু স্বামী এবং বৃদ্ধা শাশুড়ীর পরিচর্য্যা। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে প্রতি প্রাতে শাকশব্জী তরিতরকারীর ভিতর যখন যেটা তার সাধ্যের ভিতর আসে সেইটিই বিমল কিনিয়া আনে। মাছটা প্রায় চুনোমাছের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে। গরীব স্বামী ও অল্প আয়, কিন্তু সেই সামান্য আয়েই সুন্দর সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে বিমলা

"ভারতের জাগরণ বিধাতার ইচ্ছা। ভারতের কর্ম্মরথের সারথি হইবে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান, তিনি এখনও যোগনিদ্রায় মগ্ন। তপস্বীর উদাত্ত কণ্ঠে যে আহ্বান মন্ত্র আজ গগনে ধ্বনিত হইয়া বাজিতেছে তাহা শ্রবণগোচর হইতেছে। আমরা আজ তাহারই ইঙ্গিত অনুভব করিতেছি।" (ভারতের আয়োজন ৩য় বর্ষ, প্রবর্ত্তক ১০ম সংখ্যা)।

"আমাদের জীবন এখনও শক্তিময় হইয়া উঠে নাই। আজ একটি সাধক তার আত্মজ্ঞানে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতেছেন, ভবিষ্যতের দৃষ্টিও তাঁর চক্ষে দীপ্ত ও অমোঘ। তুমি অন্ধের মত অনেক করিতেছ কিন্তু সাধক একটি আঘাতেই শক্তির প্রস্রবণ খুলিয়া দিবে—ভারতের প্রাণে অমর শক্তি সঞ্চারিত হইবে।" ('শক্তি ও তাহার বিকাশ' প্রবর্ত্তক, ৩য় বর্ষ, ১১ম সংখ্যা।)

"নূতন সাধককে সর্ব্বাগ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে, কাহারও দানের অথবা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সে যেন জগতে দাঁড়াইবার কল্পনা না করে। স্বাধীনবৃত্তিই আত্মপোষণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। প্রত্যেক সাধক এই আত্মমর্য্যাদার কথাটি স্মরণ রাখিয়া যেন কর্ম্মক্ষেত্রে আগাইয়া যায়—যার নিজের সৃষ্টিসামর্থ্য নাই, যে আপনার আহারের সংস্থানভার সমাজের উপর দিয়া সমাজ সেবায় অগ্রসর হয়, তাহার দ্বারা আপাত কিছু হইবে এইরূপ মনে হইতে পারে কিন্তু ক্রমশঃ এইরূপ লোক দ্বারা সমাজ ভারাক্রান্ত হইয়া স্থবির হইয়া পড়িবে।" ('স্বাবলম্বন' প্রবর্ত্তক ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।)

'অন্নচিন্তা', 'অন্তর্বিজ্ঞান', 'অসীমের খেলা', 'আত্ম-শাসন', 'আমাদের কথা', 'আমার কথা', 'ইচ্ছা', 'আত্মসমর্পণ', 'চতুঃশক্তি', 'দুর্দ্দিনের প্রতিকার', 'দুঃখের দেবতা', 'নির্দ্দেশ', 'নূতন সমস্যা', 'প্রেমের মন্ত্র', 'ভারতকর্ম্ম', 'ভালবাসা', 'ভাবকুসুম', 'ভাবপ্রবাহ', 'মিলন', 'মৈত্রী', 'পথের সন্ধান', 'বর্ত্তমান সমস্যা', 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য', 'ব্যষ্টিশক্তি', 'ব্রাহ্মণের কথা', 'সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠা', 'সমাজ', 'নারীশক্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই তৃতীয় বর্ষের প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের কথা' শীর্ষক চিন্তাগর্ভ রচনাটি ধারাবাহিক তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সব রচনাই অগ্নিপ্রেরণাপূর্ণ এবং জাতিগঠনের ইঙ্গিতবাহী। (ক্রমশঃ)

সংসার চালাইয়া লয়। আহারে কোন আড়ম্বর নাই। তবু প্রত্যেক আহার্য্য বস্তু বর্ণনাতীত মাধুর্য্যে পূর্ণ। ঠিকে ঝি, সুতরাং জামা কাপড় ধোয়া এমনকি স্বামীর জুতা-পালিশ পর্য্যন্ত তাহাকে স্বহস্তে করিতে হয়। সাংসারিক কাজকর্ম্মে যতটা সম্ভব বিমল স্ত্রীকে সাহায্য করে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তাহাদের দিন এইরূপেই অতিবাহিত হয়। চিত্ত-বিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে কোন ভাল ছবি দেখিতে সিনেমা যায় মাত্র।

বিবাহের পর ৭।৮ বৎসর অতিবাহিত হইল, বিমলার ছেলেমেয়ে কিছুই হইল না। স্ত্রীলোকের সন্তান না হওয়া যে কতবড় অশান্তি তাহা স্ত্রীলোকরাই জানে। শাশুড়ী এবং পুত্রবধূ কত দেবতার মন্দিরে কত মানত, ধর্না দিবার পর বিমলা এখন সন্তানসম্ভবা হইয়াছে। আজ তাহার নারীজীবনের চরম সার্থকতা পূর্ণ হইয়াছে। এই সন্তানের জন্য স্বামীরও যে অন্তরে দারুণ মনোকষ্ট ছিল না তা নয়। তবে এই প্রসঙ্গ উথাপনে স্ত্রীর অন্তরের গূঢ় সুপ্ত বেদনা আলোড়িত হইবে বলিয়া এ প্রসঙ্গ যতদূর সম্ভব বিমল এড়াইয়া চলিত। বিমলারও আজকাল আনন্দের সীমা নাই। দিনরাত্রে তার একটুকুও অবসর নাই। সময় পাইলেই কাঁথা সেলাই করে। মনের আনন্দে বিমল একদিন দামী সিল্কের জামা এক বাণ্ডিল বিমলার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। বিমলা বাণ্ডিল খুলিয়া অবাক হইয়া গেল। কহিল, "এসব কি হবে?" গম্ভীরভাবে বিমল উত্তর দিল, "খোকা পরবে।" সামান্য লজ্জিত হইয়া বিমলা কহিল, "এত দামী দামী সিল্কের জামা! আর এত বড়! ওর গায়ে এগুলো কি লাগবে?'

—"না লাগে আবার কিনে দেব।'

বিমলা লজ্জিতা হইয়া বলিল, "না না, সে কথা আমি বলিনি, বলছিলাম যদি মেয়ে হয়।"

—"মেয়ে কখনও হবে না, আমি বলে দিলাম তুমি দেখো।" এমনি করিয়া অনাগত শিশুর জন্য নানাপ্রকার জিনিষপত্রাদিতে ঘর পূর্ণ হইয়া গেল। অনাগত শিশুর কি নাম রাখিবে এই নিয়া উভয়ের ভিতর কত গবেষণা চলিতে লাগিল। স্বামী-স্ত্রীর আনন্দের অন্ত নাই।

হিন্দু আচারে প্রবাদ আছে যে পুত্রের হাতে পিণ্ড না পাইলে মানুষ স্বর্গে যাইতে পারে না। নরপতি দশরথ পুত্রবধূ সীতার হস্তের পিণ্ড খাইয়া তবে বহুদিন পরে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। এ হেন পুত্রের মুখ দেখা পিতামাতার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

অতঃপর বিমলার একদিন প্রসববেদনা উঠিল। পাড়ার মেয়ে পুরুষে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। স্থানীয় বড় ডাক্তার এবং ভাল নার্স আসিয়াছে। আঁতুর ঘরের যাহা প্রয়োজন তাহা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বিমলের আঁতুরঘরে ডাক পড়িল।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "অনেক চেষ্টা করলাম বিমলবাবু, আপনার পুত্রসন্তানটিকে বাঁচাতে পারলাম না। জন্ম হবার পর কয়েক মিনিট মাত্র বেঁচেছিল। প্রসূতির জ্ঞান হ'লে তাকে জানাবেন না যেন শিশুটি মারা গেছে! কারণ হার্টটা তাঁর দুর্ব্বল। পুরুষমানুষ আপনি—ধৈর্য্য ধরুন, বৃদ্ধা মাকে সান্ত্বনা দিন।" এক নিঃশ্বাসে বিমল সব শুনিল। তাহার বুকে কি হইতেছিল তাহা শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন।

বৃদ্ধা নার্স শিশুটিকে লইয়া আসিল। সদ্যোজাত শিশুটির পানে চাহিয়া বিমলের হৃদয় জুড়িয়া অব্যক্ত বেদনার একটি দীপ্ত তড়িৎশিখা খেলিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল যে, সে একবার নাড়া দিয়া দেখে শিশুটি বাঁচিয়া আছে কিনা। কাঁথা আর সিল্কের বাণ্ডিলটি ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সে নার্সের হাতে দিয়া বলিল, "এই কাঁথার উপরে শিশুটিকে রাখিয়া সিল্কের জামা পরাইয়া দিন। এই আমার তাকে প্রথম আর শেষ আশীর্ব্বাদ।

অভিজ্ঞ নার্স সান্ত্বনার সুরে বলিল, "এর জন্য দুঃখ কি বিমলবাবু? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আপনার মত ভাগ্যবান কয়জন? ছেলের মুখ তো দেখলেন, এতেই আপনি স্বর্গে যাবেন।"

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

মহিমা :

ভারত বিপর্য্যস্ত। অন্নাভাবে দীনহীন কাঙ্গালের মত সে দিন যাপন করিতেছে বটে, কিন্তু বল দেখি কত-দিনের প্রাচীন আমাদের এই দেশ—কত প্রতিকূল সংঘাতের প্লাবন তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে—কত উৎপীড়ন, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া আত্মমহিমা সে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। জগতে কত দেশ, কত জাতি উঠিয়াছে পড়িয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভারত তাহার সনাতন ধর্ম্ম লইয়া আপনার অস্তিত্ব সমানভাবেই সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

ভারত বিজয়ের আশায় গ্রীক আসিয়াছে, পারসিক আসিয়াছে, মোগল-পাঠান-পর্ত্তুগীজ আসিয়াছে—আজ তাহারা কোথায়—তাহাদের কি আছে? ভারতবর্ষের এই জীর্ণ দেহের এতই লাবণ্য যে, আজও কত নূতন নূতন জাতি তাহাতে প্রলুব্ধ—ভারত অমর, দীর্ঘযুগ ধরিয়া সে কত দেখিল—বুঝি জগতের শেষদিন পর্য্যন্ত সে দেখিবে—কামধেনুর মত সে সমস্ত জগৎকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ।

বিপুলকায় বলিয়া ভারত শ্রেষ্ঠ নহে—ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া ভারত শ্রেষ্ঠ নহে—সে ঐশ্বর্য্য তাহার গিয়াছে—বিদেশী বাণিজ্য নীতিতে। বীর প্রসবিনী ভারত শ্রেষ্ঠ নহে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতে তাহার সে গৌরবের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? তবে ভারতের শ্রেষ্ঠতা কিসে?

ভারতের প্রতিষ্ঠা মহিমায়।

এ মহিমা কি? দুর্দ্দম দ্বন্দ্ব-ভয়ঙ্কর ভেদ, বিচিত্র বিরোধের সামঞ্জস্য বিধানই মহিমার লক্ষণ—'মহিমা মাধুরিমা নহে, বিফলতাও নহে'—সমস্ত দ্বন্দ্বের মিলন ঘটাইয়া ভেদবহুলতার মধ্যে অভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া সে চিরযুগ বর্ত্তমান, সেই মহিমায় মহিমান্বিত। ভারত নিত্যযুগ ধরিয়া এইরূপ বৈচিত্র্যের সমতা সম্পাদন করিয়াছে—সে গ্রাস করিয়াছে জগতের সকল ধর্ম্ম, গ্রীকের সকল দর্শন, মহম্মদের একেশ্বরবাদ, পাশ্চাত্যের ঈশামুসা ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী হিন্দু চরিত্রে একতার অভাব দেখিয়া ভয়চকিত হয়েন—আমরা ভারতের প্রাণের সন্ধান পাইয়াছি—সেখানে কি বিমল শান্তি, কি নির্ম্মল প্রেম, কি একতার মিলনের মধুর অচ্ছেদ্য বন্ধন।

এই ফল্গুনদীর মত অন্তঃসলিলা ভারতের প্রাণ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেই সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—সাধক উপরের বৈষম্য দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন, ভারতের অসংখ্য হিন্দুর বাহ্য জীবন দেখিয়া চমকিত হইলে চলিবে না। নানাবিধ বেশভূষার পার্থক্য, ভাষাগত বিষম বৈষম্য, আচার-ব্যবহারের ভিন্নতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিকাশ মাত্র। কিন্তু প্রতি হিন্দুর অন্তঃকরণে একই বেদের মন্ত্রশক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে—একই ভাগীরথী কেবল উত্তর-পশ্চিমবাসী ও বাঙ্গালীর উপাস্য নহে—সমগ্র ভারতবাসী গঙ্গাবারি স্পর্শে পবিত্র হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে—একই তীর্থক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন পরিচ্ছদধারী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী আসিয়া এই দেবতার উপাসনা করে—ভেদ কোথায়? দাক্ষিণাত্যের শঙ্কর, রামানুজ; উত্তর-পশ্চিমের শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বঙ্গের গৌর-নিতাই, রামকৃষ্ণ সমগ্র ভারতের যখন উপাস্য দেবতা তখন ভেদ কোথায় ভাই? ভারত এক প্রাণ, এক মন, এক জাতি, একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত।

তবে এমন কেন? কি হইয়াছে ভারতের? অনুদার শিক্ষা ও ধর্ম্মমতে তোমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে—ভারতের মহিমা দর্শনে অসমর্থ হইয়াছে তাই আপনাদের অসার ও অপদার্থ মনে করিয়া বালকের মত চঞ্চল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতেছ।

স্থির হও—যোগদৃষ্টি লাভ কর—মায়ের লীলা দেখিয়া শান্তি লাভ করিবে।

দ্বন্দ্ব জয় :

সুখদুঃখ, হাসিকান্না, জীবনমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের লীলা-ভূমি এই পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবীর লোক সুখ চায়, হাসি চায়, জীবন চায়, দুঃখ-কান্না-মৃত্যু কেহই প্রার্থনা করে

না, সুতরাং দ্বন্দ্বের হাত হইতে জীব নিষ্কৃতি লাভে অসমর্থ হইতেছে। সুখের জন্য, প্রিয়প্রাপ্তির জন্য আমরা ভগবানকে ডাকি, দেবতার আরাধনা করি, পরন্তু দেব-স্বভাব পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি না। ভগবানের নিকট মৃত্যু প্রতীক্ষমান-এর জীবন ভিক্ষা, অথবা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা প্রভৃতি নীচ প্রার্থনা কখনও করিব না। কোনও কাম্যলাভের জন্য আমরা যেন তাঁহার শরণাগত না হই।

মানুষ জগতে আসিয়াছে দেবতার মত শক্তিশালী হইতে। সকল প্রকার দুর্ব্বলতাকে দূরে ফেলিয়া সর্ব্বাবস্থাকে তুল্যবোধে আলিঙ্গন করাই জীবনের চরমাদর্শ। প্রকৃতির সকল প্রকার অত্যাচার ও আক্রমণ প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করিব। ভিতরের অনন্ত শান্তি, অটুট আনন্দ যেন চঞ্চল না হয়।

এই পৃথিবীর দ্বন্দ্বগুলির বুকের উপর দিয়া আমায় ছুটিতে হইবে—আমার অবিরাম গতির প্রতিবন্ধক কাহাকেও হইতে দিব না। এইরূপ চরিত্রের অনন্ত শক্তির আধার নবনারীকেই এই নূতন সাধনা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছি। ভগবানকে লইয়া যারা নাকি সুরে কাঁদিবে মাত্র, আমরা এরূপ হীনবীর্য্য অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন অধম মানুষ চাহি না। যারা রোগের প্রতিকারপরায়ণ হইয়া তারকেশ্বরে হত্যা দেয়, সন্তানের জীবনরক্ষাকল্পে কালীঘাটে পূজা দেয়, অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় সত্যপীরের সিন্নি মানে—এমন হীন, সঙ্কীর্ণচেতা নরনারীর জগতে আবশ্যক নাই বলিলেও চলে।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তিশালী পুরুষের ভিতরই তিনি সহজে প্রকাশিত হয়েন। জগতের দ্বন্দ্বগুলিকে জয় করিয়া শক্তির পরিচয় দাও। বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেবতার আরাধনা অরণ্যে রোদন-স্বরূপ হইবে। আত্মজয়ী পুরুষ ভগবদুপায় বিপদ ও দুঃখের আগুনেই আত্মজয়ের গুপ্ত মন্ত্র সকল আছে—হে বীর, সেই এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত

॥ সদ্যগুরু শ্রীমতিলাল ॥

বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ); ৭-৫০ **গীতা** (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫৲, **জীবনসঙ্গিনী** (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫৲; **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী** ২-৭৫।

রাজমোহন নাথ, তত্ত্বভূষণ

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, **গোরক্ষ-বাণী** ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ পঃ; **মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা** ৩-০০, **নাথযোগী তত্ত্ব**—৭৫ পঃ।

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪-০০

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। 'যুগান্তর'এর অভিমত: "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়, বিভিন্ন পাঠচক্রে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাবলিশার্স: কলিকাতা-১২

সাময়িকী

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর আবির্ভাবোৎসব :

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ পূজনীয় সঙ্ঘগুরু শ্রীশ্রীমতিলাল রায় মহোদয়ের ৮৪তম আবির্ভাবোৎসব গত ২২-এ পৌষ চন্দননগর সঙ্ঘের মূল কেন্দ্রে সঙ্ঘের দীক্ষিত সন্তান, অনুরাগী ও ভক্ত-সমাবেশে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। আগের দিন ২১-এ পৌষ সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন হয় ভজন, সমবেত উপাসনা, গুরু-ধ্যান ও দীক্ষাক্ষেত্রে দীপদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে।

২২-এ পৌষ ৭ই জানুয়ারী প্রভাতে সঙ্ঘ-মন্দিরে ভজন, উপাসনা, সঙ্ঘবাণী পাঠ ও প্রণতি পর্ব্বের উদ্‌যাপনান্তে সঙ্গীত শোভাযাত্রায় পল্লী-পরিক্রমা করা হয়। তারপর আশ্রমে দীক্ষাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। দীক্ষা-হোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সঙ্ঘাচার্য্য শ্রীসূর্য্যনারায়ণ তর্কতীর্থ মহোদয়। দীক্ষার বীজমন্ত্র এবং মন্ত্রের প্রাণসঞ্চারে দীক্ষার্থী-গণকে চিহ্নিত করেন সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয়। এইবার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীবিনয় বসু ও শ্রীমতী লীলা বসু, শ্রীযামিনী-মোহন দাস ও শ্রীমতী স্নেহলতা দাস (মধ্যমগ্রাম), শ্রীসুনীলকুমার বিশ্বাস (নদীয়া), শ্রীকালীপদ আদক (হুগলী), শ্রীমতী সবিতারাণী পাল (দমদম), শ্রীমতী তারারাণী ভট্টাচার্য্য (যশোহর), শ্রীমতী রেণুকা ঘোষ (দফরপুর, হাওড়া), শ্রীমতী রেণুবালা দে (প্রবর্ত্তক মহিলা সদন) ও কার্ত্তিকরঞ্জন বসুসহ মোট ১১ জন।

২৫এ পৌষ সমাপ্তি দিবসে অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় এই উপলক্ষে একটি জনসভার অনুষ্ঠান হয় এক অপরূপ ভাবগম্ভীর পরিবেশে। ইহাতে পৌরোহিত্য করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সুযোগ্য সহকর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগর্ভ ভাষণের পর ডক্টর ভট্টাচার্য্যের তথ্যনিষ্ঠ ভাষণে বাঙালীর জীবনসাধনা ইতিহাসের পথে বিবর্ত্তিত হইয়া যে সঙ্ঘগুরুর সাধনায় যুগরূপ পাইয়াছে তাহা সুপরিস্ফুট হয়। তাঁর চিন্তাগর্ভ ভাষণ উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সপ্রশংস শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে। সভাপতি এক বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতায় দেশের স্বাধীনতার সাধনায় নেতাজীর অমর অবদান, বর্ত্তমান রাষ্ট্রের চিত্র এবং শ্রীমতিলালের নির্ম্মাণধর্ম্মী জীবন-সাধনার মর্ম্ম সম্বন্ধে অভিব্যক্তি দেন। সভাপতির মনোজ্ঞ ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরে অপূর্ব্ব প্রেরণা সঞ্চার করে। অতঃপর সঙ্ঘগুরুর পটচিত্রে সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মাল্য প্রদান করা হইলে, উপাসনা ও পূর্ণমদঃ মন্ত্রে উৎসব সমাপ্ত হয়।

শুভেচ্ছামূলক পত্র :

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে প্রবর্ত্তক-সম্পাদককে লিখিত দেওঘর দেবসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীজির এই পত্রখানি অধ্যাত্ম সম্বন্ধের দিগ্‌দর্শন হিসাবে অনুধাবনযোগ্য। পত্রখানির সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ হইতে ১০ই অগ্রহায়ণ ও ৩রা পৌষের আমন্ত্রণ চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। সঙ্ঘজননী ও সঙ্ঘগুরুর উৎসবে যোগদান করিতে পারিলে খুবই তৃপ্তিলাভ করিতাম সন্দেহ নাই। শরীর তথায় উপস্থিত না হইলেও মন আপনাদের সান্নিধ্যেই ছিল। প্রাণ যুক্ত ছিল আপনাদের প্রাণের সঙ্গে। মহাপুরুষদের মহাপ্রাণ বিরাট ব্যাপক। দেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহাদের সত্তা বিলুপ্ত হয় না। তাই তাঁহাদের স্পর্শ দূর হইতেও অনুভব করি। 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'। আমরা ত দেহীকেই ভালবাসি। দেহীর সঙ্গেই দেহীর মিলন ঘটে মনের আবরণ কাটিয়া গেলে। তাই উৎসবের প্রাঙ্গণে দেহ নিয়া উপস্থিত না হইলেও, সঙ্ঘজননী ও সঙ্ঘগুরুকে দূর হইতেও লাভ করি। তাঁহাদের স্পর্শ অনুভব করি। আপনাদের আমন্ত্রণ পত্র সেই তৃষ্ণাকে জাগাইয়া দেয়।"

পরলোকে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী :

টাকির বিখ্যাত জমিদার-পরিবারের রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী গত ২রা মাঘ রবিবার রাত্র ১০টা ৫৫ মিনিটে তাঁহার বরাহনগরের বাসভবনে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহারের
সদ্য প্রকাশিত
কর্ণ-কুন্তী
বাংলা কাব্যসাহিত্যে
অভিনব সংযোজন।
মূল্য ২·৭৫ প:
পুরাণ-কাহিনীর বলিষ্ঠ উপস্থাপন। ·
নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। উপহারযোগ্য।
পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী : কলি:-৭

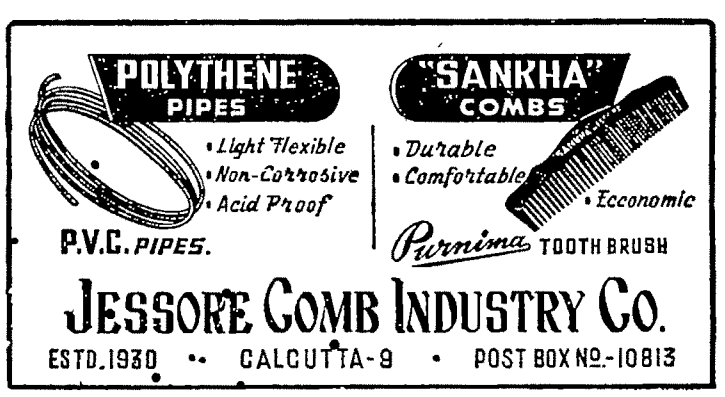

"মুনসি হাউসে" ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা এবং বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরায়চৌধুরী কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। পরে এম. এ., বি. এল. হন। তিনি ১৯২১ হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৪ সন পর্য্যন্ত আইনসভার সদস্য থাকেন। ১৯৪৮ সনে শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং ঐ বৎসরই বাঁকুড়া হইতে বিধানসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪২ সনে নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় পরাজিত হন। পুনরায় ১৯৫৮ সনে নির্ব্বাচিত হইয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৩ সনে মন্ত্রীত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীরায়চৌধুরীর পরলোকগমনে বাংলার অভিজাত জমিদারের গৌরব-স্মৃতি প্রায় বিলুপ্ত হইল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীগীতার একখানি বাংলা ভাষ্যও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। আদর্শপরায়ণ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন শ্রীচৌধুরী। তিনি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের একজন অনুরাগী সুহৃদ ছিলেন। শ্রীভগবানের নিকট তাঁর অমর আত্মার ঊর্দ্ধগতি প্রার্থনা করি।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষারীতি :

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ আশ্বাস দিয়াছেন, "দেশে শিক্ষার প্রসারে সরকার যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন।" এদিকে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০০০ শিক্ষক পরীক্ষা বর্জ্জনের সিদ্ধান্তে অটল। তাঁদের বর্দ্ধিত বেতনের দাবীর কথায় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিংহ মন্তব্য করিয়াছেন, "শিক্ষকদের দাবী মেটাবার মত অর্থসংস্থান সরকারের হাতে নাই।" পরীক্ষা বর্জ্জন করিলে ১ লক্ষ ২০ হাজার পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় যে ব্যাঘাত ঘটিবে তাহার সমাধান কি এবং কে করিবে?

উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা :

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী প্রাপ্ত শ্রীঅরুণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি উচ্চশিক্ষার্থ যুক্তরাষ্ট্রের লুনিয়ানা ষ্টেট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছেন। অরুণেন্দুপ্রসাদ সেখানে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণা করিবেন। তিনি ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের প্রবীণ কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীমান অরুণেন্দ্র বেলঘরিয়ার প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজেরও একজন কৃতী ছাত্র। ছাত্রজীবনে প্রত্যেক পরীক্ষাতেই বরাবর প্রথম বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রশংসনীয়ভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন আমরা শ্রীমান অরুণেন্দুপ্রসাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

॥ কয়েকখানি সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থ ॥

॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু ॥

কর্ম্মবীর রাসবিহারী বসু—৫-০০

॥ বিপ্লবী নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ॥

বিপ্লবীবীর রাসবিহারী—৫-০০

॥ শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ॥

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—৫-০০

॥ ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ॥

অমৃতের সন্ধান ৬॥০

॥ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক ॥

মহাভারত কথামৃত—১০-০০

শঙ্করাচার্য্য ৫৲ সাঁওতালী কথা ২৲

॥ মনীষী পণ্ডিত গুণদাচরণ সেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (২য় সং) ৫-০০

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—১-৫০

॥ ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥

তন্ত্রের আলো ৪৲ প্রজ্ঞার আলো ১।০

॥ শ্রীমৎ স্বামী উপানন্দ মহারাজ ॥

আত্মার আলো ১-২৫

॥ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী ॥

গীতার আলো ১॥০ মহামায়া ১॥০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা ১২

সারা বাংলা সাহিত্য মেলা :

বীরভূম জেলার নলহাটি-বরলায় সারা বাংলা সাহিত্য মেলার ৩ দিন ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক বিরাট অধিবেশন গত ৩১শে ডিসেম্বর সুরু হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হওয়ায় পত্রযোগে মেলার উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন সাহিত্য শাখায় বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয় দিন বেলা ৩টায় সার্বজনীন মেলা প্রবীণ কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীশশাঙ্কশেখর সিংহ। সার্বজনীন মেলা ৫ ঘণ্টা ব্যাপী স্থায়ী হইয়াছিল এবং সকলেরই অশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। তৃতীয় দিন সাধারণ অধিবেশনে কার্য্যকরী সমিতি ও বিভিন্ন উপসমিতি গঠিত হয়। শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনমজুমদার সভাপতি, অধ্যাপক বিমলেন্দু দাস ও অধ্যাপক আনন্দ বাগচী সহ-সভাপতি এবং শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। গণতান্ত্রিক ও সমবায় জীবনযাপন, শহর ও গ্রামীন গুণীদের সাহিত্য মেলায় গ্রহণ, মাতৃভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কথা ও কাজ :

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ঘোষণার প্রাক্কালেই ভরসা দেওয়া হইয়া থাকে যে ইহাতে জাতীয় আয় অনেক বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৬১ সালে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯৬৫-৬৬ সাল তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বছর। এই পরিকল্পনায় জাতীয় আয় যাহা বৃদ্ধির কথা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাহা বাড়ে নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বছরে শতকরা ২·৬; দ্বিতীয় বছরে ১·৯; তৃতীয় বছরে ৪·৫ ও চতুর্থ বছরে ৭·৩ ভাগ জাতীয় আয় অন্ততঃ কাগজ কলমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পঞ্চম বছরে আয় না বাড়িয়া হ্রাস হইয়াছে শতকরা ৪ ভাগ। উল্লেখনীয় যে তৃতীয় পরিকল্পনায় সাড়ম্বরে ঘোষিত হইয়াছিল যে, পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৬ ভাগ। দেখা যাইতেছে সরকারী ও বেসরকারীভাবে কয়েক হাজার কোটী টাকার বিনিয়োগে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল মাত্র শতকরা ৪ ভাগ। ইহাতে সরকারী পরিকল্পনার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা থাকে কি করিয়া?

পরলোকে অমরেন্দ্রনাথ :

বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ যাদবপুর কলোনীর নিজ বাসভবনে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রবীণ সহযোগী সভ্য ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ রায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল ঢাকার দৌলতপুর গ্রামে। সেই যুগে সঙ্ঘগুরুর নির্দ্দেশে অমরেন্দ্রনাথ প্রতি পূর্ণিমায় নিজ গ্রাম হইতে চন্দননগর সঙ্ঘের মূলকেন্দ্র পূর্ণিমা সম্মেলনে নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া বর্ষব্যাপী ব্রত রক্ষা করেন। ১৯৩০ সালের ৭ই জানুয়ারী অমরেন্দ্রনাথ ও হাওড়া দফরপুরের শ্রীসত্যচরণ ঘোষ সর্ব্বপ্রথম

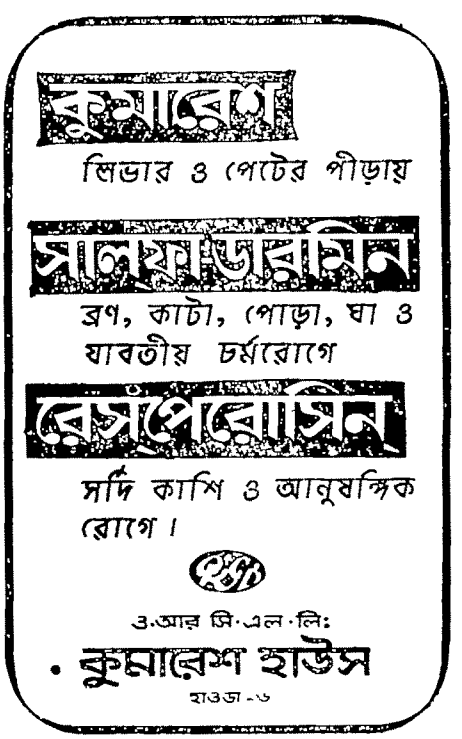

সঙ্ঘের সহযোগী দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষান্তে সঙ্ঘগুরুজী বলেন, "গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে এই আমার প্রথম অভিযান। তোমরাই ইহার অগ্রণী। তোমাদের সংসার বিশুদ্ধ ও পবিত্র হউক। তোমাদের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক। পবিত্র হৃদয় লাভ কর। তোমাদের প্রতি রক্ত-কণিকাটুকু ভাগবতময় হয়ে উঠুক, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

শ্রীগুরুর এই আশীর্ব্বাদ উভয়ের জীবনেই অব্যর্থ সার্থক হইতে দেখা যায়। অমরেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীমান অনিলকুমার চন্দননগর প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থী ভবন হইতে শিক্ষালাভ করিয়া পরে এ জুয়েট হন এবং বর্ত্তমানে লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার দপ্তরে কর্ম্মরত থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন। যোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র হিসাবে শ্রীমান অনিল সঙ্ঘে দীক্ষালাভ করিয়া আদর্শ গৃহস্থজীবন যাপন করিতেছে। গত ১২ই ডিসেম্বর রবিবার প্রবর্ত্তক আশ্রমস্থ মাতৃ-মন্দিরে সঙ্ঘবিধানে অমরেন্দ্র-নাথের শ্রাদ্ধবাসর উদ্‌যাপিত হয়। সঙ্ঘের সভ্যসভ্যাবা অমরেন্দ্রনাথের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে তিল-তর্পণ করেন ও তাঁর জীবন-স্মৃতির অনুধ্যান করেন।

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

গত ডিসেম্বর মাস হইতে প্রবর্ত্তক প্রেসে দীর্ঘ শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্য পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল। এজন্য আমরা দুঃখিত। পত্রিকার পুনরায় নিয়মিত প্রকাশের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

প্রবর্ত্তক সাধারণতঃ প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং ৯ ও ১০ তারিখে ডাকযোগে প্রেরিত হয়।

বর্ত্তমান চৈত্রে (১৩৭২) প্রবর্ত্তকের সুবর্ণ জয়ন্তী (৫০) শেষ হইবে। আমরা আশা করিব, প্রবর্ত্তকের সহৃদয় গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহাদের দক্ষিণা এখনও অনাদায়ী আছে তাঁহারা উহা যথাশীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া পত্রিকা-পরিচালন কার্য্যে আনুকূল্য করিবেন। ইতি—

পরিচালক : প্রবর্ত্তক

সর্বজন প্রশংসিত বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : [ফোন ৩৩-২৩০৩]

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক ঃ উলের জিনিষ ঃ বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]

বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি রুচিসম্মত কাপড়ের বিপুল সম্ভার।

আধুনিক ডিজাইনের দেশী তাঁতের শাড়ী। গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার বিপুল আয়োজন।

An Important Announcement

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR ★ DOUBLE ENDED-GRINDER

★ POLISHING & BUFFING ★ FLEXIBLE SHAFT GRINDER etc. etc.

MANUFACTURED BY :

KSHAMA ELETRO WORKS

146, SHYMNAGAR ROAD, DUM DUM, CALCUTTA-28. Phone : 57-27

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর ঃ সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ ঃ পরিতোষ ঃ প্রফুল্ল ঃ নির্মল ঃ পিরামিড ঃ অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড ঃ কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-১

॥ কয়েকখানি সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থ ॥

॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু ॥

কর্ম্মবীর রাসবিহারী বসু—৫-০০

॥ বিপ্লবী নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ॥

বিপ্লবীবীর রাসবিহারী—৫-০০

॥ শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ॥

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—৫-০০

॥ ডঃ হবেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ॥

অমৃতের সন্ধান ৬॥০

॥ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক ॥

মহাভারত কথামৃত—১০-০০

শঙ্করাচার্য্য ৫৲ **সাঁওতালী কথা** ২৲

॥ মনীষী পণ্ডিত গুণদাচরণ সেন ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত (২য় সং) ৫-০০

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—১-৫০

॥ ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥

তন্ত্রের আলো ৪৲ **প্রজ্ঞার আলো** ১॥০

॥ শ্রীমৎ স্বামী উপানন্দ মহারাজ ॥

আত্মার আলো ১-২৫

॥ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী ॥

গীতার আলো ১॥০ **মহামায়া** ১॥০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা১২

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥

স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২-৫০

জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪-০০

॥ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্র গুহরায় প্রণীত ॥

সঙ্ঘগুরু শ্রীমভিলাল—১৲

(সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়)

॥ শুভঙ্করের ॥

মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪-০০

(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)

॥ শ্রীনবেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রবীন সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত ॥

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স. কলি-১২

"নিমল"

আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অম্লজনিত দন্তের ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সুরভিত হয়।

আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা-১৭

মিষ্টান্ন জগতে বিশেষ আকর্ষণ

ইন্দ্র'র

- উৎকৃষ্ট দধি
- মুগ-নারিকেলের খাবার
- সরেস দরবেশ ও মিহিদানা

বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে।
সকল অনুষ্ঠানেই সযত্নে অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-১৩৮৩

৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-২৫৩৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিলতৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিস্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃরোগে অদ্বিতীয়

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স কলিঃ-১২

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিঃ-৬

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক; সম্পূর্ণাঙ্গ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইণ্ডিং কারখানা।
পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সূচীপত্র · প্রবর্ত্তক : ফাল্গুন, ১৩৭২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	৪৪৭
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	৪৪৮
বাংলার শাক্তধর্ম্ম ও শাক্তগান	নিবন্ধ	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য	৪৫০
সম্পাদকীয়	...	...	৪৫১
আন্তর প্রস্তুতি	প্রবন্ধ	আনন্দ ভিক্ষু	৪৫৬
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	৪৫৮
শ্রীঅরবিন্দ-সরণি	স্মৃতি-চিত্র	শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	৪৬২
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	ইতিবৃত্ত	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৪৬৪
লালবাহাদুর শাস্ত্রী	জীবনী	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৪৬৮
দুই আর দুই-এ	গল্প	ইন্দু গুপ্ত	৪৬৯
দ্বার খোলো	কবিতা	কবি পার্থসারথি	৪৭০
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীর ধ্যান	নিবন্ধ	শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র	৪৭১
অক্ষয়-স্মৃতি	প্রবন্ধ	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত	৪৭৪
অন্তঃস্রোত	গল্প	শ্রীঅজিত দাস	৪৭৮
পঞ্চাশ বছর আগে	সঙ্কলন	শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত	৪৮০
সাময়িকী	...	... ...	৪৮১

ভ্রম-সংশোধন : গত মাঘ সংখ্যা প্রবর্ত্তকে 'প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক প্রবন্ধের ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের প্রথম প্যারায় প্রথম লাইনে 'শ্রীভূপাল চন্দ্র ঘোষের' স্থলে 'শ্রীভূপাল চন্দ্র বোসের' হইবে। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন)সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

CALCUTTA UNIVERSITY
DEUTRAI LIBRARY.

৫০ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা | স্বুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৭২

জীবনের আলো

রঙ, রঙ, রঙ! পাতায়, ফুলে, মেদিনীর শষ্পশয্যায় রঙের খেলা—রঙের আলিপনায় সব সুন্দর, সব মধুর!···নদীর জলে ঢেউ, উজান যাত্রা, দক্ষিণা বাতাসের ঘায়ে উছ্‌লে পড়ে হীরকচূর্ণের মত—রঙের বিদ্যুৎ শোভায়! দুলে উঠে কিশোরীর ভরা বুকে স্বজনের বীর্য্য! চ্যুতমুকুলে, কুসুম-কোরকে, জীবের হিয়ায় হিয়ায় মদন নৃত্য! বিশ্ব দুলে উঠে হর্ষে! রতি-রসের হিল্লোলে এই যৌবনশ্রী দুলে দুলে কে কাকে ছোঁয়া দেয় হিসাব থাকে না। সম্বন্ধের বাঁধন, বিধিনিষেধের গণ্ডী ভেঙ্গে রঙের পিচকারী ছুটে—সব গেল ভেসে, কেবল রঙ, রঙ আর রঙ!···রঙীন বিশ্ব! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, অনন্ত নীলিমা, নব বর্ণে উদ্ভাসিত—তরুলতা, বনভূমি আবীর-রঞ্জিত! অন্তর বাহির শ্রীভগবানচন্দ্রের প্রেম-মদিরায় মাতোয়ারা! চরণের ছন্দ আজ হারিয়েছে! এই বসন্তের প্রভাতে সব গেছে টলে, সারা জগৎ আজ চলে দুলে দুলে প্রেমের স্পর্শে! স্বর্গের অমৃত বর্ষণ হ'য়ে গেছে কাল নিশীথে, আজ সব মাতাল—কণ্ঠে বিজয়-সঙ্গীত—দোল, দোল, দোল!···দুলুক চরণপদ্ম, বাজুক নূপুর তালে তালে, দুলুক জঘন উরু নিতম্ব, চন্দ্রহার ঝিনিকি ঝিনিকি বাস্ত-ধ্বনি করুক! আজ পীযূষধারা ধারণে উদ্‌গ্রীব উন্নত পয়োধর, স্বজনের আনন্দে নাচুক উল্লাসে, বদনকমল ধীর সমীরে কবরীভারে দুলে উঠুক! কিশোরীর বিচিত্র শোভায় মাতাল হোক নিখিল ধরণী—রঙের মদিরায় ঘুচে যাক হিসাব-নিকাশ, বিচার-বিতর্ক—সবাই বল, দোল, দোল আর দোল! আর কণ্ঠে আজ উঠুক উলুধ্বনি। রাসচক্রের পর বসন্তের মধু প্রভাত ভবিষ্য স্বজনের ভাগবত বীর্য্যসম্ভার অবধারণ-শোভায় নব প্রস্থতির হৃদয়ে আজ উৎসবের ধুম! আকাশে চন্দ্র, পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরশ-সুধায় অমৃতলহরী—শোভায় শোভায় দশদিক মাতোয়ারা। দোলের রঙে আত্মহারা ত্রিপুরারি—নগ্ন বেশ ঢেকে, ধুতুরা আকন্দের কুসুম শয্যায় মনোহর মূর্ত্তি ধ'রে শিঙায় ফুঁ পেড়ে তোলে বেদধ্বনির নূতন ছন্দ! উমাপতির এই রঙে উৎসবের কৌতুক কাণায় কাণায়! কণ্ঠের হলাহল আজ আর কৃষ্ণ বর্ণ নয়, উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির ন্যায় পরম শোভা! রুদ্রও নাচে দুলে দুলে—হে মানব! তোমরাও দুলে দুলে নাচ। এই প্রেমের মদিরায় উন্মত্ত হয়ে দুলে দুলে চল! সম্মুখে প্রেমময়—প্রেমে ঢল ঢল হয়ে চল, চল দুলে দুলে চল। বল, আজ যে দোলযাত্রা! দোল! দোল!! দোল!!!

—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

(১৯৩৬ সালের দিনলিপি হইতে)

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং । ঊনচত্বারিংশৎ সূক্তং ।) পঞ্চমী ও ষষ্ঠী ঋক্

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত দুই, তিন ও চার সংখ্যক ঋক্‌মন্ত্রেই শত্রু বিনাশের প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনা মন্ত্র অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শত্রু স্থূল জগতের নয়। স্থূল জগতের শত্রু আমরা দুই প্রকারের দেখিতে পাই। এক—অন্তরের কামক্রোধাদি ষড়রিপু, দ্বিতীয়—বাহিরের প্রতিকূল শক্তি বা প্রভাব। বাহির বিশ্বে যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-সংঘর্ষ, অন্তর জগতেও তেমনি—ইহা আর্য্যদের নিত্য প্রত্যক্ষ ও অনুভব্য। এই উভয় প্রকার শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার সাধনা ও বিজ্ঞানও আমাদের আয়ত্তে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ ও অনুভব্য বিষয় অন্তরীক্ষলোক বা সূক্ষ্ম জগৎ। সেখানে যে সংঘাত প্রতিনিয়তই চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

অন্তরীক্ষ লোকে মেঘসকল যখন উৎপন্ন হয়, তখন বায়ুমণ্ডলে সূর্য্য-কণিকার মধ্যে যে কি ভীষণ আলোড়ন-বিলোড়ন সংঘটিত হয়, কি প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন তাহাদের হইতে হয়—ইহা মনীষীরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। কারণ সূক্ষ্মত্বের তারতম্য থাকিলেও পাঞ্চভৌতিক উপাদানেই অন্তরীক্ষ লোকে পর্জ্জন্যের সৃষ্টি। আমাদের কাছে এ সৃষ্টি-রহস্য অমূর্ত্ত। কার্য্যরূপে যখন ইহা স্থূল জগতে নামিয়া আসে তখনই ইহাদের মূর্ত্তরূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। ভীম প্রভঞ্জনের প্রবল প্রতাপে পৃথিবীর বনানীকুঞ্জ যখন বিযুক্ত হইয়া পড়ে বা পর্ব্বতসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—তখনই বায়ুর ক্ষমতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং আমরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি। কিন্তু নিজেদের শক্তি দিয়া প্রকৃতির এই উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্যকে প্রতিরোধ করিতে পারি না। পৃথিবীর বুকে প্রচণ্ড বায়ুর এই মূর্ত্ত রূপ প্রকটিত হওয়ার পূর্ব্বেই অন্তরীক্ষ লোকে ইহার অমূর্ত্ত রূপ ঋষিদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কারণ সাধনার দ্বারা আর্য্য ঋষিরা দূর শ্রবণ, দূর দর্শন প্রভৃতিতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সমাধিযোগেও সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহারা সমর্থ ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন কি ভাবে অন্তরীক্ষ লোকে বাত-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝা প্রভৃতির সৃষ্টি হইতেছে। যেমন, 'কারণে যাহা থাকে, কার্য্যে তাহাই রূপ নেয়' সেইরূপ অন্তরীক্ষ লোকে যাহা সৃষ্ট হয়, মর্ত্ত্যলোকে তাহাই রূপায়িত হয়। মর্ত্ত্যের পক্ষে কি কল্যাণপ্রদ আর কি নহে—মানব কল্যাণকামী ঋষিরা তাহা অবগত ছিলেন—সেইজন্যই পৃথিবীর পক্ষে যাহা অকল্যাণের কারণ হইবে তাহাই পৃথিবীর শত্রু, মানবজাতির শত্রু—এই শত্রুকে অন্তরীক্ষ লোকেই প্রতিরোধ করা বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হওয়ায় যে-যে উপাদানে অনিষ্টকারী মরুতের উদ্ভব, সেই-সেই উপাদানের অধিদেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া দৃক্‌সিদ্ধ আর্য্য ঋষিগণ ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ২—৪ ॥

প্র বেপয়ন্তি পর্ব্বতান্ বিবিঞ্চন্তি বনস্পতীন্

প্রো আরত মরুতো দুর্ম্মদাইব দেবাসঃ সর্ব্বয়া বিশা ॥৫ ॥

অন্বয়—"মরুতঃ" (হে মরুদ্দেবগণ) "পর্ব্বতান্" (পর্ব্বতসকলকে) "প্র" (প্রকৃষ্টরূপে) "বেপয়ন্তি" (কম্পিত করেন) "বনস্পতিম্" (বনস্পতিসমূহকে) "বিবিঞ্চন্তি" (বিশেষভাবে বিযুক্ত করেন) "দেবাসঃ" (হে দেবতাগণ) "সর্ব্বয়া" (সকল) "বিশা" (প্রজাগণের সহিত) "প্রো" (প্রকৃত) "দুর্ম্মদাইব" (স্বেচ্ছাচারীর ন্যায়) "আরত" (আগমন করেন) ॥ ৫ ॥

সরলার্থ—হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা সুদৃঢ় পর্ব্বতসকলকেও বিশেষরূপে কম্পিত করেন; দৃঢ়মূল বৃক্ষসকলকেও ভগ্ন ও পরস্পর বিযুক্ত করেন। হে দেবতা! সকল প্রজার সহিত আপনারা প্রকৃত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় অথবা মদোন্মত্ত পুরুষের ন্যায় আগমন করেন।

উপো রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্वং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ।
আ বো যামায় পৃথিবী চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—[মরুদ্দেবগণের] "উপো রথেষু" (রথসমীপে) "পৃষতী" (নানা বর্ণবিশিষ্ট মৃগী) "অযুগ্ধ্বং" (যোজনা করা হইয়াছে) "প্রষ্টি" (যুগবিশেষ) "রোহিতঃ" (লোহিত বর্ণ) "বহতি" (বহন করে) "বঃ" (আপনাদের) "যামায়" (গমনের সময়) "পৃথিবী" (অন্তরীক্ষ) "চিৎ" (নিশ্চিৎ) "আশ্রোৎ" (শব্দ শুনিতে পায়) "মানুষাঃ" (মনুষ্যগণ) "বীভয়ন্ত" (ভীত হয়) ॥ ৬ ॥

সবলার্থ—মরুদ্দেবগণের রথসমীপে নানা বর্ণবিশিষ্ট মৃগী সংযোজিত হইয়াছে। লোহিতবর্ণ প্রষ্টি অর্থাৎ যুগবিশেষ সেই রথ বহন করিতেছে। তাঁহাদের গমনের সময়ে অন্তরীক্ষ লোকে যে নিশ্চিৎ শব্দ উত্থিত হয়, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যগণ ভীত হয় ॥ ৬ ॥

বিশদর্থ—ঋষি শুধু "কবি" নন, "মনীষী" নন, তিনি রসিক সাহিত্যিকও। আমরা কল্পনা নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখি, রাত্রির দূষিত বাষ্পকে বিদূরিত করিয়া নবোদিত সূর্য্যের নির্ম্মল কিরণরাজিকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য রাত্রির চতুর্থ যামে ভারতের পুণ্য তপোবনে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে—আর অমনি আকাশের বুকে ঝড়ের পূর্ব্বাভাস প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ দুহিতা ঊষার রক্তরাঙা আভাকে পশ্চাৎ করিয়া তীরবেগে ঝড়ের আবির্ভাব—যেন চিত্রবিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট রথে মরুদ্দেবগণের "দুর্ম্মদাইব" আগমন আর সেই আগমনের গতিবেগে অন্তরীক্ষ লোকে যে প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ঋষি কিন্তু স্থির অবিচলিত—তিনি স্রুক হস্তে প্রকৃতির সেই তাণ্ডবলীলা "পাগলা হাওয়ার" সেই মাতামাতি, সেই স্বেচ্ছাচারিতা উদার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সন্দর্শন করিতেছেন আর আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাবিতেছেন—হাঁ, ক্ষমতা বটে! দেবতা ভিন্ন এমন অঘটন ঘটান কি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়? মানুষী শক্তি কখনও কি সুদৃঢ় পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারে? না, বাহুবলে দৃঢ়মূল বনস্পতির অপসারণ সম্ভবপর? এঁদের স্বেচ্ছাচারিতা সত্যই অভিনন্দনীয়। আনন্দে ঋষিকণ্ঠে তাই উদ্গান উঠিল—"প্রো আরত মরুত, প্রো আরত" ॥ ৫-৬ ॥

বাংলার শাক্তধর্ম্ম ও শাক্তগান

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

তন্ত্রশাস্ত্র ও শাক্তদর্শনের উৎপত্তি খুব সম্ভবতঃ এই বাংলাদেশেই। অন্ততঃ উইন্‌টারনিট্‌জ্‌ সাহেব তাই বলেন। শাক্তধর্ম্মে ও দর্শনে প্রদেশভেদে নানা বৈচিত্র্য আছে। তবে শাক্তদর্শনে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। আগমবাগীশের লেখায় বাংলার শাক্ত-সাধনা যা প্রকাশ পেয়েছে ঠিক তার মতো জিনিস দক্ষিণ ভারতের শ্রীবিদ্যার সাধনায় দেখা যায় না। কাশ্মীরের তন্ত্রবিদ্যা ও কৌলসাধনাও ভিন্ন জিনিস। নেপালের সাধনার মধ্যে কতকটা বাংলার প্রভাব আছে। কাশীতে তৈলঙ্গ স্বামী ছিলেন অন্ধ্রদেশীয় তন্ত্রসাধনার অনুবর্তী। তাঁর সাধনার স্থানে এখনও পাথরের তৈরি সব তাঁর সাধনার যন্ত্র ও চক্রগুলি আছে। প্রভাস, মালাবার, কোচিন প্রভৃতি নানা দেশে তন্ত্রের নানা রূপ দেখা যায়। তান্ত্রিকদের মধ্যে সর্বত্রই কায়ার মধ্যে চক্রভেদ প্রভৃতি আছে। বাংলার যতি পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও ষট্‌প্রকরণে যে ষট্‌চক্রনিরূপণ ও তার কালীচরণ, শংকর, বলদেব ও বিশ্বনাথন টীকাতে বাংলারই বিশেষত্ব আছে।

শাক্তদের নিজস্ব সব গান আছে। বাঙালী-শাক্ত তার উপাস্য দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেমে যুক্ত। সে প্রেম একেবারে মানবীয়। আগমনী ও বিজয়া গানে ঘরে ঘরে গৌরীর জন্য কন্যাবিরহবিধুর পিতামাতারা দল বেঁধে আকুল। দেবীকে মা বলে ডেকে দেওয়ান রামদুলাল, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত কত বেদনাই না জানিয়ে গেছেন। এই সব মানবীয় ভাব নিয়ে শাক্তদের বহু মালসী গান এদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উৎসাহের অভাবে সেগুলি প্রায় সবই এখন বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে। সেই মালসীতে দেবীকে মানবীয় সম্বন্ধ দিয়েই ঘনিষ্ঠ করে দেখা হয়েছে। বাউলদের মধ্যে ভগবানকে যেমন নানা মানবীয় ভাবে দেখা হয়েছে মালসীতেও তাই। প্রেম-মাত্র সম্বল বাংলাদেশকে ধন্য করতে গিয়ে দেবী এখানে শুধু মা হয়ে তৃপ্ত হন নি, তিনি প্রণয়িনী হয়েও বাংলাদেশকে ধন্য করে গেছেন। সাধক দ্বিজদেব তাঁকে পেলেন কন্যারূপে, রাঘবানন্দ পেলেন পত্নীরূপে।

পূর্ব্বাংলায় দুইটি তান্ত্রিক গুরুপরম্পরাই প্রধান। একটির নাম সর্ববিদ্যাবংশ। তার প্রবর্তক মেহারের সাধক সর্বানন্দ। অন্য ধারা হল মিতড়ার ঠাকুরদের পূর্বপুরুষ রাঘবানন্দের প্রবর্তিত। এই ধারাকে বলে অর্ধকালীর ধারা।

ময়মনসিংহ জেলায় আলাপসিংহ পরগণায় পণ্ডিত-বাড়ী গ্রামে দ্বিজদেবের ঘরে দেবী কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়ে রাঘবানন্দের পত্নীরূপে নারীলীলা দেখিয়ে যান। নিমন্ত্রণে অন্ন পরিবেশনকালে তাঁর মাথার ঘোমটা খুলে গেল। দুই হাতে খাদ্যের থালা। তাঁর লজ্জা কিসে রক্ষা হয়? হঠাৎ আর দু'খানি হাত দিয়ে তিনি ঘোমটা সামলে নিলেন। সবাই তা দেখলেন। সবাই টের পেলেন রাঘবানন্দ-গৃহিণী মানবীরূপে দেবী। তাই এই বংশের সন্তান মিতড়ার গুরুঠাকুরদের বংশকে বলা হয় অর্ধকালীবংশ।

সম্পাদকীয়

অধ্যাত্ম জাতীয়তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ :

দ্বিজাতি-কণ্টকিত দ্বিখণ্ডিত ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসিয়াছিল, কিন্তু অখণ্ড ভারত-জাতীয়তার স্বপ্ন দূর দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছিল! জীবনবোধ, জগৎ ও জাতিদর্শনে গান্ধীজী ও নেহেরুর আমল ভারত জাতীয়তার অভিব্যক্তিক্রমে একটা পর্য্যায় মাত্র। রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি ও মতাদর্শে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র নিরন্ধ্র পরানুকরণে আপন বৈশিষ্ট্য বর্জ্জিত হইতে চলিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এমনটি আরও চলিলে সুপ্রাচীন কালের ভারতবর্ষের সুমহান্ আদর্শ হইতে বিশ্বের আর কিছু গ্রহণ করিবার থাকিবে না। ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকিবে না—পাশ্চাত্যের বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করিবে।

জাতীয়তার ক্ষেত্রে বিশাল ভারতে বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন প্রান্ত ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদের মাত্রা শুধু প্রকট হইয়াই উঠে নাই, কোথাও কোথাও বৈরিতার নগ্ন রূপও প্রকাশ পাইয়াছে এবং পাইতেছে। প্রাক্ স্বাধীনতাকালে এই জাতীয় ঐক্য ছিল নেতিমূলক—বিটিশ শাসন-মুক্তির লক্ষ্যে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহাতে এই উপ-মহাদেশের ভৌগোলিক ঐক্যই কেবল বিনষ্ট হয় নাই, একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র এবং জাতিকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই কি বিভক্ত ভারতে অখণ্ড জাতীয়তার সমস্যার সমাধান হইয়াছে? সমাধান যে হয় নাই তাহা আজও ভারত-সরকারের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য মাথাব্যথা হইতেই বুঝা যায়। ভৌগোলিক সংস্থান মোটামুটি বজায় রাখিয়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে যুক্ত থাকিয়া এক অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রের প্রতীতি দৃঢ় করিলেও, মনের দিক দিয়া, সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের ক্ষেত্রে এবং স্বার্থ-সচেতনতায় পার্থক্য যে উৎকট হইয়া উঠিতেছে, ইহা নিত্যদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। এরূপ ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রাণের ঐক্য সাধনের লক্ষ্যে অধ্যাত্ম জাতীয়তার বিষয়টি নিশ্চয়ই বিবেচ্য।

গত পৌষ সংখ্যা প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিগত ও বর্ত্তমান শতকের বিভিন্নমুখী জাতি-সাধনার ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম জাতীয়তার আবির্ভাবের একটা ইঙ্গিত আমরা দিয়াছিলাম। ইহার স্পষ্টতা ও সংবেগ পর্য্যবেক্ষণের আওতায় ধরা পড়িবার মত পর্য্যায়ে পৌঁছায়নি বলিয়াই সম্ভবতঃ রাজনীতিমুখ্য হিংস্র-বিপ্লব বা অহিংস কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই অধ্যাত্ম জাতীয়তার দিগ্দর্শন আলোচিত হইতে দেখা যায় না। ভারতে অখণ্ড জাতি সাধনার ভিত্তি অধ্যাত্ম জাতীয়তা। ইহার ধারণা ইতিহাসের পথেই বিংশ শতকের প্রারম্ভে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায় স্পষ্টীকৃত হইতে দেখা যায় এবং এই শতকেরই মধ্যাহ্নে যত অপরিণতই হোক, ইহারই বাস্তব রূপায়ণের যুগ-ভূমিকা গ্রহণ করেন সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। এই ধর্ম্মভিত্তিক জাতি-সংগঠন লক্ষ্যে অবশ্য বাংলায় অন্যত্রও প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। শ্রীমতিলালের সাধ্য ছিল অধ্যাত্ম জাতীয়তা এবং এই লক্ষ্যেই তিনি একটি সংহত সমষ্টি জীবনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সুপ্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যে মধ্য ও আধুনিককালে বার বার পরপদানত হইয়াছে, পরাজয়ের গ্লানিতে হেয় লাঞ্ছিত হইয়াছে তার প্রধানতম কারণ জাতি ও রাষ্ট্রের ঐক্য-সম্পর্কের অবিচ্ছিন্ন নিবিড়তার অভাব। অখণ্ড অধ্যাত্ম ভারত-জাতীয়তার তথা সঙ্ঘগুরুজীর জীবন ও জাতি-দর্শনের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নির্ণয় সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে অতীত ভারতের জাতি বিকাশের ধারাকে এখানে পরিক্রমা করা হইতেছে।

●

বিগত ও বর্ত্তমান শতকের ঐতিহাসিক গবেষণার আলোতে এ কথা আজ বিনা বিতর্কে বলা চলে যে, মানব সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে দ্বাদশ শতক

অর্থাৎ মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত-সভ্যতা কেবল অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না, ইহা বিশ্বমানবকে ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, নীতি দান করিয়াছে। ব্যবহারিক, ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সভ্যতা উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছিল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন: "আর্য্যরা ভিন্ন দেশ থেকেই আসুক বা ভারতের আদিম অধিবাসীই হোক, এ কথা সত্য যে, আর্য্যদের বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়েছিল এবং বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে দুই বা ততোধিক সভ্যতার মিলন হয় এবং তার ফলে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে—তারই নাম ভারতীয় বা হিন্দুসভ্যতা। শুধু যে একাধিক সভ্যতার মিলন হয়েছিল তা নয়, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহের আদান-প্রদান দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন একটি জাতিও গড়ে উঠেছিল—তারই নাম হিন্দুজাতি। পরবর্ত্তী যুগে শক, হূণ, গুর্জ্জর প্রভৃতি অন্যান্য জাতিও হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে অবিচ্ছেদ্য রূপে এক হয়ে যায়। * * ভারতীয় সভ্যতা যেমন কোন জাতিবিশেষের সভ্যতা নয়, তেমনি কোন বর্ণ-বিশেষেরও নয়। * * অতএব এটা ধরে নেওয়া যুক্তি-সঙ্গত যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সমবেত হিন্দুজাতির হিন্দুসভ্যতা।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় তথা হিন্দুসভ্যতার এই প্রাণ-সংবেগের গোপন তথ্যটি তাঁর অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন: "পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইন্দ্রজালই এই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।"

ভারতবর্ষের এই জাতি-প্রতিভার ইন্দ্রজাল ক্রমশঃ অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে সম্পূর্ণ বিজাতীয় প্রাণবন্ত মুসলিম আক্রমণ ও বিজয়ের পরে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জাতীয়তাবোধ মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় অধিকার সংরক্ষণের যে আনুকূল্য করিতে পারে নাই, তার সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করিতেছে। জাতীয়তা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সুনিবিড় ঐক্য-বন্ধন না থাকাই ইহার কারণ। প্রাচীনকালে বিশাল ভারতে এক অখণ্ড ধর্ম্ম-সংস্কৃতির সফল প্রতিষ্ঠা পাইতে দেখা যায় শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় তথা গুরু-মন্ত্র-প্রতিমার অকাট্য প্রামাণিকতায়, নদী-তীর্থ-একান্ন শক্তিপীঠের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে, ঋষি-শাস্ত্র-গুরুমণ্ডলীর আনুগত্যে, রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের সার্ব্বজনীন প্রভাব প্রভৃতিতে। অখণ্ড ভারত-রাষ্ট্রের কল্পনা হয়তো প্রাচীন ভারতে ছিল, কিন্তু ইহা কখনও স্থায়ী বাস্তব রূপ পাইয়াছে এমন নজীর নাই। ডঃ ঘোষ তাঁর 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়েও একত্বের ভাব রয়েছে। রাজচক্রবর্ত্তী বা এক রাজার অধীনে অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ে তোলার ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের তথ্য সেই ভাবকেই দৃঢ় করে। যদিও প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষ এক রাজার অধীনে কখনও আসেনি, তবুও সমস্ত রাজ্যই যে এক স্বার্থসূত্রে গ্রথিত ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তার প্রমাণ। সেই যুদ্ধে দ্বারকা, আসাম, গান্ধার প্রভৃতি ভারতের সকল প্রদেশ থেকেই রাজসৈন্যেরা গিয়ে সমবেত হয়েছিল।"

কেবল অখণ্ড নয়, খণ্ডিত বিভিন্ন রাজ্যেও সে-সময়ে জাতীয়তা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সমতা ছিল না, থাকিলে দ্বাদশ শতাব্দীতে সুদূর বিদেশাগত মুসলমান আক্রমণ ও বিজয় প্রতিরোধ করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইত। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ জনগণ ও রাষ্ট্রের সমস্বার্থ-সচেতনতার সমান লক্ষ্যে সমবেত উদ্যম-সক্রিয়তার ইঙ্গিত বহন করে। সেই অবৈজ্ঞানিক যুগে সংহত মুষ্টিমেয় আরবের কাছে

অগণিত হিন্দু জনতার উদাসীন-বৈশ্যতা স্বীকার এই জাতীয়তারই অভাব সূচিত করে। এই হেতুই তৈমুরের সর্ব্বাত্মক নির্ব্বিচার ধ্বংসকার্য্য অবাধ হইতে পারিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি (১৭৫৭) পলাসীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস—কার্ল মার্কসের কথায়—পরাজয়েরই ইতিহাস। ইহার ঐতিহাসিক কারণ আর যাহাই হোক, ইহা দিনের মত স্পষ্ট যে, স্ব স্ব সংস্কৃতি সত্ত্বেও, রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণের রাজনৈতিক আনুগত্যের কোন অবসর ছিল না। মোটের উপর তখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা জাতীয়তার পরিপোষক ছিল না।

অধ্যাপক এম. মুজীব মধ্যযুগের ভারতের কথা বলিতে গিয়া ঠিকই মন্তব্য করিয়াছেন, "আজ ভারতের অবস্থা অন্য রকম হত যদি ভারতের শাসকেরা প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন করে গজনীর লুঠতরাজের বাধা দিবার চেষ্টা করতেন। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলে জেনারেল সিহাবুদ্দীন ঘোরী কখনই এমনভাবে রাজ্য দখলে সমর্থ হ'ত না। প্রকৃতপক্ষে পৃথ্বীরাজও কেন যে সিহাবুদ্দিন ঘোরীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেও, পাঞ্জাব থেকে গজনীর সুলতানদের হটিয়ে দিলেন না তা বোঝা মুস্কিল। কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা না করার ফলে মাত্র ৮ বছরের মধ্যে সুলতানেরা সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা দখল করতে সমর্থ হয়েছিল।"

সামগ্রিক দেশপ্রেমের অভাবে, একদিকে যুদ্ধরত রাজ্যের প্রজাসাধারণ স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিত, অপরদিকে স্বার্থান্বেষী প্রজারা, এমন কি রাজার জ্ঞাতিগোষ্ঠীও আক্রমণকারীর আনুকূল্য করিয়া আপন স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজিত। মধ্যযুগে শুধু রাজনীতি নয়, সংস্কৃতিও মৃত সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল, ধর্ম্ম তার প্রাণবীর্য্য হারাইয়া অনড় আনুষ্ঠিকতায় পরিণত হইয়াছিল। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল মুখ্যযুগের এই ধার্ম্মিক অধঃপতন প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, "হাজার হাজার ব্রাহ্মণ চক্ষু বুজে বসেছিল সোমনাথের মন্দিরে। ধর্ম্মের উপর ছিল তাদের প্রচুর আস্থা। মামুদ গজনী এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেল বিশ্বাসের ফাঁকি। সোমনাথ রক্ষা হল না। কাশীর বিশ্বনাথ মুসলমান বাদশার ভয়ে জ্ঞানকূপে ডুব পাড়লেন। মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ উঠলো। চোখের সম্মুখে এ দৃশ্য এখনও বর্ত্তমান। কোথাও বিষ্ণুমন্দিরের লৌহকবাট এমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, ম্লেচ্ছদল সেখান থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যায়—এই উড়োকথায় দেববিগ্রহের উপর প্রত্যয় রক্ষা করা হয়। ভারতবাসী ছিল অসহায়। আসলে মানুষ চাহে নাই তার আত্মশক্তিকে জাগাতে। সে বোঝেনি যে বাহু দু'টো চক্ষু বুজে বসে থাকলে জোর পায় না, জঠরজ্বালাও তাতে নিবারিত হয় না। ধর্ম্মের নামে এই প্রত্যক্ষ সত্যটা অস্বীকার করা নিছক পাগলামী।"

সঙ্ঘগুরুজীর এই রূঢ় সত্য কথা একটু বিস্তৃতভাবেই এখানে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতের দীর্ঘ পরাধীনতা শুধু রাজনৈতিক কারণেই নহে, ধার্ম্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণের পঙ্গুতাও ইহার অন্যতম হেতু। সেদিনের মানুষ শুধু রাষ্ট্র ব্যাপারে নহে, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমষ্টিগত প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এক কথায় বলা যায়—কি ধর্ম্ম, কি রাষ্ট্র সর্ব্ব বিষয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় সেদিনের মানুষের চিত্ত আচ্ছন্ন ছিল। ধর্ম্মের নামে, পাল-পার্ব্বণে বিভিন্ন প্রত্যন্তের বহু নরনারী একত্রিত হইলেও, কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যে একাত্ম হইবার শিক্ষা দীক্ষা ছিল না—যাহাকে জাতীয় সংহতির অন্তরায় এবং অখণ্ড জাতীয়তাবোধের অভাব বলা যায়।

সঙ্ঘগুরুজীর ধ্যানে ভারতীয় অখণ্ড জাতীয়তার যে রূপটি ফুটিয়াছে তাহা ভারতের উদার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি তথা সার্ব্বজনীন অধ্যাত্মভিত্তিক। মধ্যযুগাগত ধর্ম্মবিলাস ও আধ্যাত্মিক রহস্যময়তা (mysticism) সম্পর্কে সতর্ক হইতে বলিয়া ধার্ম্মিক জীবনের লক্ষণটি যেমন হওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধেও তিনি কেবল ইঙ্গিতই দেন নাই, একটা সঙ্ঘবদ্ধ সংস্থাকে সেইভাবে গড়িয়া তুলিবারও প্রয়াস জীবনভোর করিয়া গিয়াছেন। তাঁর নির্দ্দেশ: "আপনাকে জাগাও ধ্যানে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে। তোমার প্রতি রক্তবিন্দুরআছে যে দান তা যদি কুণ্ঠায়

ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে, সত্যকে হত্যা করবে। ধর্ম্মের এই কলঙ্ক রেখে যাবে—ধর্ম্ম বীর্য্যহীন, অক্ষম, অত্যাচার প্রতিকারের শক্তি ধর্ম্মের নাই। ধর্ম্ম যদি জীবন না দেয় তো সে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন কর। ধর্ম্মের বিজয়ী শক্তি বাহুবল হোক, হৃদয় বিদ্যুৎপূর্ণ হয়ে উঠুক। কণ্ঠে ভাষা, জানু কর্ম্মক্ষম, দেহ নীরোগ, পরমায়ু দীর্ঘ হোক। পৃথিবী আমার আবির্ভাবে মনে করুক সে নিরাপদ, আর অসহায় নয়। আমার জীবন-দান ধরিত্রীকে অলঙ্কৃত করে তুলুক। ধর্ম্মের এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হোক। দিব্য সৃজনের রাগিণী উঠুক বিশ্বে। ধর্ম্মের বীর্য্য প্রকাশ কর কর্ম্মে পণ্যে পৃথিবী ছেয়ে দাও। বসুন্ধরার বুক চিরে শস্য উৎপাদন কর। মেদিনীর গর্ভ থেকে তুলে আন মণি-মাণিক্য বিচিত্র ধাতু পদার্থ। বলভদ্রের ন্যায় হলায়ুধ যন্ত্রে ভূমি কর্ষণ করে সৃষ্টিকে অভিনব মূর্ত্তি দাও।"

প্রাক্-মুসলিম ভারতে ধর্ম্ম ক্রমশঃ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মুসলমান আমলের ভারতে প্রাণের বীর্য্য হারাইয়া অনড় আচারে পর্য্যবসিত হইয়া ধর্ম্ম কোন রকমে আত্মরক্ষা করে। ধর্ম্মের সেই গতানুগতিকতার ধারা আজও রুদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্মই যে জীবন, ধর্ম্মই সে জগন্মূর্ত্তি ধরিয়াছে, এই জীবন ও জগৎ দর্শন সঙ্ঘগুরুজী আনিতে চাহিয়াছেন জাতিগঠন লক্ষ্যে। সঙ্ঘগুরুজীর যে অধ্যাত্ম জাতীয়তা তাহা বস্তুতঃ ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-ভিত্তিক মানবতাবাদ।

●

আধুনিক কালে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়ার যে নব জাগরণ তাহা জাতীয়তাবাদেরই জাগরণ বলা চলে। প্রাচ্যে ইহা পশ্চিমের দান। জার্ম্মান মনীষী হার্ডারকে (১৭৭৪-১৮০৩) আধুনিক কালের জাতীয়তার প্রবর্ত্তক বলা যায়। হার্ডারের জাতীয়তার গোড়ার কথা ছিল। জার্ম্মানদের ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে সংহত করিয়া তাকে বেগবান করিয়া তোলা। 'নয়া বাংলা' আন্দোলনের প্রবর্ত্তক অধ্যাপক বিনয় সরকার হার্ডারের জাতীয়তাকে 'অ-রাষ্ট্রিক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এইজন্য যে, ইহার সঙ্গে রাষ্ট্র-সংগঠনের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রাচীন ভারতের যে ধার্ম্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য তাকে অনেকটা এই রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ জাতীয়তা বলা যাইতে পারে। জার্ম্মানীতে এই জাতীয়তার রাষ্ট্রীয় রূপদানের পথিকৃৎ ছিলেন বিস্‌মার্ক (১৮১৫-৯৪)। জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র-সংগঠন ও সংহত করিয়া বিস্‌মার্ক জার্ম্মানীর অপ্রতিহত অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া তোলেন। রাষ্ট্রী স্বাধীনতার প্রেরণা ও প্রাণসঞ্চার করেন জার্ম্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (১৭৬২-১৮১৪)। এই সময়ে য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লব জাতীয়তাকে আগ্রাসী সাম্রাজ্য-বাদে পরিণত করে—যার ফলে প্রায় গোটা দুনিয়াই পশ্চিম ইউরোপের শক্তি গোষ্ঠীর পদানত হয়। ব্রিটিশের সাম্রাজ্য স্ফীতি তাকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর (Rule Britania, Britania rules the waves) গৌরবে গর্ব্বান্ধ করিয়া তুলে। বর্ত্তমান শতকের চার্চ্চিল আর হিট্‌লার এই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তার উৎকট পরিণতি। এই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তা সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার ধারক না হইয়া বাধকই হইয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে সংগ্রাম, সংঘর্ষ ও অশান্তি। এই জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির মধ্যে নির্লজ্জ স্বার্থবিস্তারকল্পে কাড়াকাড়ি, মারামারির ইতিহাসই বিগত অষ্টাদশ হইতে বিংশ শতকের ইতিহাস। জার্ম্মাণীর ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ, ফ্রান্স-বৃটেনের শতাব্দীব্যাপী সংঘর্ষ, বিংশ শতকের দুইটি মহাযুদ্ধের কারণও ইহাই। মানব-কল্যাণ লক্ষ্যে নয়, বিজ্ঞানের যে অবিশ্বাস্য উন্নতি তাও এই আগ্রাসন ও মারণ-কৌশলেরই আনুকূল্যে। ইউরোপের নবজাগরণ (Renaissance), জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বৈপ্লবিক সমাজ-বিবর্ত্তনের সদিচ্ছা আজও তাই সর্ব্বমানবের অভ্যুদয়ের হেতু হইতে পারে নাই, পরন্তু সঙ্ঘবদ্ধ শোষণ-পীড়নেরই কারণ হইয়াছে।

বিগত প্রায় তিনশত বৎসরের পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের মোটামুটি ফলশ্রুতি দাঁড়াইয়াছে: (১) সাম্রাজ্যবাদী জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া সংঘর্ষ-সংগ্রাম, (২) স্ব স্ব দেশের অভ্যন্তরে কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিত জনগণ বিশেষ সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যুত্থান, (৩) ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অধিকৃত দেশের

অধিবাসীদের জাগরণ, জাতীয় চেতনার সঞ্চার ও স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বিগত দু'শো বছরে জাতীয়তার ক্রমবিবর্ত্তনের পথে বিপ্লবের যে সব ঐতিহাসিক পদচিহ্ন পড়িয়াছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬), ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯, এবং বিশ্বের বৃহত্তম রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব (১৯১৭) ও চীনের গণবিপ্লব (১৯৫০)। ইহাতে শোষিত মেহনতী জনসাধারণের রাষ্ট্র ও মানবিক অধিকার অর্জ্জিত হইয়াছে প্রধানত দুইটি ধারায়—গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক।

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু সুন্দর সামাজিক রূপায়ন দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্রে (৪ঠা জুলাই ১৭৭৬) বিবৃত হইয়াছে, "আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করি যে সমস্ত মানুষই জন্মলাভ করে সমান অধিকার লইয়া এবং সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট হইতে এমন কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার পায় যাহার অন্যতম জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও সুখ সমৃদ্ধি লাভের অধিকার।" ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোল্‌জ সম্প্রতি এই ঘোষণার মর্ম্ম বিস্তার করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "যদিও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি, তবুও আমরা যা বুঝেছি তাতে, তা স্বাধীনতার একটি দিক মাত্র। অধিকন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য এমন এক পৃথিবীর প্রয়োজন যেখানে প্রতিটি মানুষ যুদ্ধের আতঙ্ক ও আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত থাকবে এবং যেখানে সে সর্ব্বাধিক আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে।"

বর্ত্তমান শতকে মুখ্যতঃ পুঁজিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ ও বিনাশ লক্ষ্যে গণ-বিপ্লব ও সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজের নীতিতে ইহার আন্তর্দেশিক প্রচার ও প্রয়োগ। অর্থনীতি-মুখ্য সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক সম্বেগে জাতীয়তা ছিল অস্বীকৃত। প্রত্যেকটি দেশে সাম্যবাদী সমাজে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বৈজ্ঞানিক বিধি-নিয়ম সুস্পষ্ট রেখাঙ্কিত করা হইয়াছে। তা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতায় সমাজতন্ত্রে অবশ্য বিভিন্ন দেশের জাতীয়তা বিকাশের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্র প্রত্যেকটি জাতির প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ক্রমেই রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। সমাজতন্ত্রের প্রধানতম প্রবক্তা লেনিন বহুদিন পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন: 'ইউরোপের রুচিহীন বাক্যবাগীশেরা কখনও ভাবতেও পারে না যে, বিপুল জনসমষ্টিপূর্ণ ও সামাজিক অবস্থার অনেক বেশী বৈচিত্র্য-ভর্ত্তি প্রাচ্যের দেশগুলিতে পরবর্ত্তী বিপ্লবসমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রকট হবে রুশ-বিপ্লবের চেয়েও অনেক বেশী বৈশিষ্ট্য।"

জাতীয়তা সংহত জীবন-বিকাশের আশ্রয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির আত্মবিকাশের দুইটি ধারা ও ধারণায় একটিতে (গণতন্ত্রে) জাতীয়তা, ধর্ম্ম ও সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকৃত, অপরটিতে (সমাজতন্ত্রে) অপ্রয়োজনীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়াই অপ্রশ্রিত। আদর্শ ও লক্ষ্যে দুইটিই এক—মানুষের রাজ-নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক এক কথায় পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও সুখভোগের পথ সুগম করা। এই একই উদ্দেশ্য সাধনের পথে গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তির বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা অবিঘ্নিত, সমাজতন্ত্রে খর্ব্বিত। বিধান ও আইনের অক্টোপাশে বাঁধিয়া উভয় ধারায়ই মানুষের সহজ আত্মকেন্দ্রিক লোভকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা বিদ্যমান। আজকের দুনিয়ায় তথাকথিত 'মুক্ত' ও 'অ-মুক্ত' ব্লক আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে পরস্পরের সম্মুখীন। তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতাদর্শে এই দুইটি ব্লক দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। সর্ব্বাত্মক বিধ্বংসী মহাপ্রলয় অথবা সদিচ্ছা প্রণোদিত সামঞ্জস্য—কোন্‌টির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান নিহিত তা কালগর্ভে সংগুপ্ত।

দুইটি জোটবদ্ধ মানব সভ্যতার এই সঙ্কট কি ভাবে এবং কোথায় সমাধান হইবে তার ইঙ্গিত ঋষিকবির দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ আশা করিয়া-ছিলেন: "মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।" * * এক প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলার ইঙ্গিতই ঋষিকবি দিয়াছেন। আসুরিক ইহসর্ব্বস্ব সভ্যতার ইহাই অনিবার্য্য পরিণাম।

আন্তর প্রস্তুতি

আনন্দ ভিক্ষু

সংখ্যা গণনার কোন্ এক অতীত প্রত্যুষে এক অগ্নিময়ী যুগে, অন্তহীন বিশ্বপ্রবাহের কোন্ এক বিশেষ পর্ব্বে এই মৃণ্ময়ী মা-টি, সৃষ্টির আদিম অন্তরখানি বুকে নিয়ে কালের গর্ভ থেকে জেগে উঠেছিলেন—তারপর কত কত যুগ-যুগান্তের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হতে হতে ক্রমাভিব্যক্তির দুর্জ্ঞেয় জটিল পথ বেয়ে আজকের পরিণতিতে এসে পৌঁছেছেন, আমরা সকলে এঁরই সন্তান, তাঁরই ক্রমাভিব্যক্তির গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েই আমরা তাঁরই সঙ্গে এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম সুরু করে চলেছি।

এইতো ত্রিগুণান্বিতা (তম রজ সত্ত্ব) পঞ্চভূতময়ী (ক্ষিত্যাদি) জলস্থলমেখলা, শ্যামায়িত কানন-কুন্তলা, সংখ্যাতীত বৈচিত্র্যে বিস্ময়ময়ী, বৃক্ষে, লতায়, ফুলে, ফলে, পাতায়, শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, গন্ধে, জলচর, স্থলচর, অন্তরীক্ষচর কোটি কোটি বিচিত্রভঙ্গী অতীত প্রাণীর অন্তহীন শোভাযাত্রায় চিরন্তন উৎসবময়ী, নব বর্ণ-ছটায় সদাই উচ্ছ্বসিত লাস্যময়ী। এঁরই সঙ্গে আমাদের অনন্তকালের সংগ্রাম—এ সংগ্রাম এক মুহূর্ত্তও যদি থেমে যায়—আমাদের অস্তিত্বও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইনিই প্রকৃতি।

কোন্ এক আদিম যুগে—ভোগলালসাতুর অসুরবুদ্ধি—শুম্ভনিশুম্ভ (শুম্ভ—"তামস অহং", "নিশুম্ভ—desire to aquaire") এঁকেই তাঁর অতৃপ্ত বাসনার ইন্ধনরূপে জয় করতে চেয়েছিল—সেইদিন এঁর "কোপেন চাস্যা মসীবর্ণমভূত্তদা"—বদন ক্রোধে মসীবর্ণ ধারণ করেছিল, কপালে ফুটে উঠেছিল কুটিল ভ্রুকুটি। তিনি হুংকার দিয়ে বলেছিলেন 'রে কামনাতাড়িত অসুর, শোন্,—"যো মাং জয়তি সংগ্রামে…"

যে পারবে আমাকে (অপরা বহিঃপ্রকৃতিকে) সংগ্রামে জয় করতে, আমার দর্পকে পারবে ব্যাহত করতে, ভূভুর্ব্বাদি সপ্তলোকে আমার (বহিঃপ্রকৃতির) চাইতে শক্তিশালী যে, সেই আমাকে ভোগ করতে বা ভর্ত্তা হতে পারবে। কামনাতুর অসুরবুদ্ধি আজও প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছে প্রকৃতিকে তার ভোগ্যরূপে জয় করতে,—প্রকৃতিও চলেছেন তার সংগ্রাম অব্যাহত রেখে, জলে, স্থলে, আকাশে, দিকে-দিগন্তরে তাঁর অযুত আয়ুধ সদা উদ্যত, বজ্রে বিদ্যুতে, শিলাপাতে, প্লাবনে, ভূকম্পে, লাভায়, শীতাতপে, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিতে, মড়কে মহামারীতে সহস্র বৎসরের মানবীয় বিজয় গৌরবকে মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছেন, দিনরাত্রির দুটি ভয়ঙ্কর দন্তপাটিতে সমগ্র বিশ্ব নিঃশেষে চর্ব্বিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

এ যে কত কত কলম্বাস্, লিভিংষ্টোন্, মার্কো পোলো, কত ডায়াজ, ম্যাগীলন্, কুক্, এডুইন্, পীয়ারী, স্কট্,

---

ভোগসর্ব্বস্ব ঐহিকতার ভূমিতে এ সঙ্কট মোচন কখনও সম্ভবপর নহে। যাহা গোঁজামিল তাহার মিল মরীচিকার মতই অসার আর শূন্যগর্ভ। ইহা কখনও স্থায়ী ফলপ্রসূ হইতে পারে না—আপন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। একমাত্র অধ্যাত্মভূমিতেই বিশ্বকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে বিশ্বের অন্তরে উপলব্ধি করার রহস্য নিহিত। এই আত্মতত্ত্বের অনুভবেই সমগ্রের স্বীকৃতি এবং বিচিত্রের ঐক্য ও সমন্বয়। একাত্মতা ও সুসমাহার, ইহাই মানবজীবনের—ব্যষ্টি ও সমষ্টির—পরম চরিতার্থতা। ভারত সভ্যতার অন্তরতম সত্তার গতি দেশ-কালে বিবর্ত্তিত হইয়া এই লক্ষ্যাভিমুখেই ক্রমাভিব্যক্ত। অধ্যাত্ম জাতীয়তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ইহারই সমষ্টিগত সিদ্ধরূপ যাহার অনুকূল অভ্যুদয়ের স্থান হইবে ভারত বিশেষ পূর্ব্বাঞ্চল এই বাংলাদেশ। ইহার কালও অতি আসন্ন। অনতিদূর আগামীকালে একটা রক্তক্ষয়ী বিধ্বংসী বিপ্লবের মধ্য দিয়া এই পূর্ব্বাঞ্চলে যে অনিবার্য্য জনজাগরণ ঘটিবে তাহা ধিতাইয়া আসিলে মানব বিশেষ বাঙালীর চেতনায় অধ্যাত্ম জাতীয়তার নবদিগন্ত বিস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সৃজ্যগুরু শ্রীমতিলাল ইহারই পদধ্বনি শুনিয়া উহার আগমনী গান গাহিয়াছেন।

ম্যালোরী প্রভৃতি দুরন্ত প্রাণের রক্তে হোলো মানব বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিচয়ের রাখীবন্ধন; কত গ্যালিলিও, কোপার্ণিকাস, কেপ্‌লার, দেকার্ত্তে, লিবোনিজ, ল্যাপ্লাস্, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, ফ্যারাডে, ওয়াট্, এডিসন, ডারউইন্, মাক্সওয়েল্—তাঁদের মস্তিষ্ক দিয়ে ভোগ বিজ্ঞানের বিশাল বনেদ্ গড়ে তুললেন—কই, তবুওতো প্রকৃতিকে জয় করা গেল না—আজও তাব আয়ুধ নিঃশঙ্ক অমোঘ—আসুরিক ভোগলালসা বহিঃপ্রকৃতির ত্বচা, মাংস ভেদ করে তার অস্থির সন্ধান পেয়েছে, যা দিয়ে তার অস্থি গঠিত সেই পরমাণু বিশ্লেষিত হয়ে গেছে—কিন্তু তবু জয় কই? প্রকৃতি আজ তার কূট যুদ্ধ-কৌশলে গোটা মানবজাতিটাকে নিশ্চিত "সার্ব্বিক্ ধ্বংসের" একেবারে কিনারায় এনে কোণঠাসা করে ফেলেছেন—আজ আমাদেরই আবিষ্কৃত তাঁর "অস্থি পরমাণুর" ভয়ে, আদিমতম পশুর মত গোটা মানবগোষ্ঠী সদাসন্ত্রস্ত হয়ে মাটির তলায় (air raid shelter) মুখ লুকাতে বাধ্য হচ্ছে। সভ্যতার চোখ ধাঁধান আলোক-সজ্জা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে (black-out) বর্ব্বরের মত আমরা আমাদের পরাজিত মুখ লুকাতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদেরই গড়ে তোলা শুভ্র, অভ্রলেহী সৌধচূড়ায় পরাজয়ের কালিমা। মানুষকে প্রকৃতি তার সম্পূর্ণ দাসত্বে এনেছে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আজ গোটা মানবজাতি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত—চরম ও সার্ব্বিক মৃত্যুর একেবারে প্রান্তসীমায় কোণঠাসা হয়ে গেছে। আসুরিক, মহাতামস নেতৃত্ব বুদ্ধি এক মহাতামস যুক্তিবাদ আবিষ্কার করে সমগ্র মানবজাতির দৈববুদ্ধিকে প্রতারণা ও অবমানিত করে চলেছে।

অমৃত তবে কোথায়? মানবের অব্যাকৃত চেতনার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি সেই শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ···সেই "মৃতোর্মামৃতংগময়"—কোথায় আজ সেই মহান্ বিজয়ী রণবিশারদ নেতৃদল—প্লাটো, যাজ্ঞবল্ক্য, এরিষ্টটল, পতঞ্জলী, সক্রেতিস, সিদ্ধনাগার্জ্জুন, যীশু, বুদ্ধ, কনফুসী, মহম্মদ, জারাত্রষ্টর, কপিল, সিঁটো, পাইথাগোরাস্ প্রভৃতি আদর্শবাদীরা যাঁরা জানিয়েছিলেন যে, বহিঃপ্রকৃতি অজেয়া, তাই তাঁরা অন্তরপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সংগ্রাম চালিয়ে আহরণ করেছিলেন "অমৃতত্ব"—পরাপ্রকৃতির অমিতশক্তিশালী আয়ুধ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টিকেই তাঁরা জয় করেছিলেন। তাঁদেরই নেতৃত্বে এই মহান জয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল এক মহান আন্তর ঐক্যময় সভ্য বিশ্বভ্রাতৃজীবন (যা এখন অবলুপ্ত)। বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক পরম অনুশাসন ব্যষ্টি জীবনের সঙ্গে সুসংহত ও একাকাব হয়ে "অমৃতের" উৎসারণ করত। আজ গোটা মানব চেতনা, আচ্ছন্নের মত মৃত্যুর মধ্যে, পরাভবেব মধ্যে শেষ আহুতি হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। বিশ্ব ভ্রাতৃকুল—ফের পরিবর্ত্তন কর তোমাব যুদ্ধক্ষেত্র। জয়ের ক্ষেত্র laboratory নয়, Atom plant নয়, ordnance factory নয়—আমাদের অদ্বৈত বুদ্ধ শুদ্ধ চিত্ততলই প্রকৃতিকে পরাস্ত করার প্রশস্ততম ক্ষেত্র। হাঁ—ওগো লাস্যময়ী জননী! পরা পরমা পরমাসি, তোমার সন্তানেরা জানে কোন্ ক্ষেত্রে, কি অস্ত্রে, কি কৌশলে তুমি বার বার পরাজিতা হয়েছ?

তাই ওগো ত্রিগুণাত্মিতা, পঞ্চভূতময়ী বিশ্বমাতৃকা! অদ্বৈত বুদ্ধ, অমৃতময়, বিজয়ী, দুরন্ত সন্তানদের সম্মুখে বিজিতার মত হও নিরস্ত্র, কোটি কোটি প্রণতি গ্রহণ কর বিজয়ী সন্তানদেব। তাদের শেখাও আরো পূর্ণতর, আরো মহত্তর, আরো গাঢ়তর অমৃতময়, আনন্দময় নির্ভয় এক স্বর্গীয় আন্তর-সভ্যতার পথ বেয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আনন্দময় লোকে পৌঁছতে। এইভাবে চাই অন্তর প্রস্তুতি তবেই আমরা পাবো অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সম্মত ঐক্যবদ্ধ কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার দিশা—অমৃত চাই-ই, জ্যোতি চাই-ই, ঈশ্বরত্ব চাই-ই—

The homogenous human consciousness
must have his share of Elixir,
Rex-Lux in his Divine sight and Divinity
of ONENESS.

অসৃরাসৃগ্‌বসা পঙ্ক চর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বং নতাবয়ম্।

সমুদ্রশাসন

অজিত সরকার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : মাঘ সংখ্যার পর]

কোদণ্ড যখন ইন্দ্রনীলের পাশে এসে দাঁড়ালো, তখন সে তাকিয়েছিল দূরে দিক্‌চক্রবালের দিকে। তার চোখে-মুখে একটা চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ। কোদণ্ডও সেইদিকে তাকালো। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো কালো বিন্দুতে দিক্‌চক্রবাল তখন পরিপূর্ণ। ধীরে ধীরে সেই বিন্দুগুলি বর্ধিত হোতে থাকে। মাস্তুলের ওপর অবস্থিত লোকটি জানালো, অসংখ্য রণতরী তীরবেগে ছুটে আসছে। তরণীগুলোর উপরিভাগ সুবর্ণদ্বীপাধিপতি মহাধিরাজ শৈলেন্দ্রের পতাকা শোভিত। যুদ্ধ! যুদ্ধে ইন্দ্রনীল ভয় পায় না। তবে যে বিশেষ-অভিযানে সে চ'লেছে তার পথের এই বাধা যদিও সে অতিক্রম কোরতে পারে তবু তার শক্তির খানিকটা ক্ষয় হওয়া অনিবার্য। কি চান মহাধিরাজ শৈলেন্দ্র? ইন্দ্রনীল যদি তাঁর বন্ধুত্ব প্রার্থী হয়? কিন্তু এর প্রার্থিত মিত্রতার মূল্যস্বরূপ যদি তিনি কোন অনুচিত, অন্যায্য সর্ত উপস্থাপিত করেন?

ইন্দ্রনীল কোদণ্ড ও সমরসচিবের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পরামর্শ কোরতে আরম্ভ করে; ততক্ষণে ছোট বড় নানা শ্রেণীর রণতরীতে সমুদ্রের এক বিশাল অংশ ছেয়ে যায়। মন্ত্রণায় স্থির হোলো অবিলম্বে শ্বেত পতাকা উত্তোলন করা, আর মহারাজ শৈলেন্দ্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত হবার জন্য তাঁর নিকট দূত পাঠানো।

একখানি ক্ষুদ্র তরী নিয়ে স্বয়ং কোদণ্ড হাজির হোলো দূতরূপে শৈলেন্দ্রের সুবৃহৎ অর্ণবপোতের সন্নিকটে। একজন সৈনিকের প্রশ্নের উত্তরে কোদণ্ড জানালো যুবরাজ ইন্দ্রনীলের দূত হিসাবে সে এখানে এসেছে। এই জলবাহিনীর প্রধান সেনাপতির সে সাক্ষাৎপ্রার্থী।

প্রধান সেনাপতি তোমার সম্মুখে, দূত! উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মধ্যবয়সী এক বলিষ্ঠ পুরুষ গম্ভীর স্বরে বললো। মস্তক অবনত কোরে অভিবাদন জানিয়ে কোদণ্ড ঘোষণা কোরলো, প্রধান সেনাপতির জয় হোক!

বাধা দিয়ে প্রধান সেনাপতি বলে, বলো মহারাজাধিরাজ সমুদ্রাধিপতি শৈলেন্দ্রের জয়। এস আমার সঙ্গে।

কোথায়?

মহারাজ-সকাশে।

মহারাজাধিরাজ বীরকুঞ্জর শৈলেন্দ্র? তিনি স্বয়ং এই বাহিনীতে উপস্থিত আছেন?

হাঁ, যুবক।

শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যের মধ্য দিয়ে প্রধান সেনাপতি ও কোদণ্ড অগ্রসর হোলো।

দাঁড়াও। আদেশের ভঙ্গিতে সেনাপতি বোললো। কোদণ্ড দাঁড়ালো। সামনে কাষ্ঠনির্মিত উচ্চ বেদীর ওপর মহারাজ দণ্ডায়মান ছিলেন। মহারাজ কৃশকায়, খর্বাকৃতি—মুখমণ্ডল অর্ধাংশক ঘন শ্মশ্রুতে সমাচ্ছন্ন, চক্ষুর্দ্বয় তীক্ষ্ণোজ্জ্বল, নাসিকা খগচঞ্চুসম সুগঠিত—

ললাটে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। তিনি সম্পূর্ণ রণসাজে সজ্জিত। মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রাণ, বর্মাবৃত উন্নত বক্ষ, বামকর স্বর্ণ অঙ্গুলিত্রাণশোভিত। মহারাজের পশ্চাৎ দেশে এক ভীমকায় ব্যক্তি বৃহৎ সুদৃশ্য স্বর্ণময় ছত্র তাঁর শিরোপরি ধারণ কোরে নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। চতুর্দিকে মহারাজের বল, বীর্য, ঐশ্বর্যের প্রভূত নিদর্শন। মহারাজ শৈলেন্দ্রের প্রতিদিনের রাজস্ব যে দুইশত মণ স্বর্ণমুদ্রা তা আজ তাঁর এই আবেষ্টন হোতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কোদণ্ড অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে রাজাকে অভিবাদন কোরলে, তিনি বোললেন, দূত! কি সন্দেশ নিয়ে এসেছ তুমি?

কোদণ্ড অতি বিনীতভাবে উত্তর দেয়, কম্বোজের যুবরাজ ইন্দ্রনীল রাজাধিরাজের মিত্রতা কামনা করেন।

উত্তম। কিন্তু দূত! ইন্দ্রনীল তো কম্বোজের ভূতপূর্ব যুবরাজ। তবে, হাঁ—বর্তমানে তিনি যে গৌড়েশ্বরের জামাতা, তা আমি জানি।

ধৃষ্টতা মার্জনা কোরবেন, রাজন্! যুবরাজ ইন্দ্রনীলকে আমরা কম্বোজের আজন্ম যুবরাজ বোলেই মনে করি। তিনিই কম্বোজের সিংহাসনের একমাত্র জন্মজাত উত্তরাধিকারী আর সেই অধিকারেই তিনি আজ চ'লেছেন কম্বোজে। সুতরাং সবিনয় নিবেদন করি, এ ক্ষেত্রে ভূতপূর্ব অভূতপূর্ব প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন বোলেই মনে হয়।

মিষ্ট হেসে বোললেন মহারাজ, সেই জন্মজাত অধিকার বজায় রাখতে হোলে চাই ক্ষমতা, দক্ষতা—সাহসিকতা! তোমার ইন্দ্রনীলের তার একটাও নেই। ইন্দ্রনীলকে ভালয় ভালয় ফিরে যেতে বলো তার শ্বশুরালয়ে। আমি চ'লেছি কম্বোজ অধিকার কোরতে অসিব সাহায্যে। যাও সন্দেশবহ, ইন্দ্রনীলকে ফিরে যেতে বলো তার বিবাহের যৌতুক গৌড়ীয় ঐ নৌবহর নিয়ে।

ধীর গম্ভীর স্বননে, বীরত্ব-ব্যঞ্জক কণ্ঠে কোদণ্ড জিজ্ঞাসা করে, আর তিনি যদি না ফেরেন?

তাহোলে এই সমুদ্রগর্ভেই হবে সেই হঠকারীর স্বজনসহ চিরশয়ন।

নিজ বিবর মধ্যে শৃগালও নিজেকে সিংহ মনে করে।

দূত!—শৈলেন্দ্র গর্জন কোরে উঠলেন, নিমেষে অসংখ্য তরবারি কোষমুক্ত হোয়ে সূর্যালোকে ঝক্‌মক কোরে উঠলো।

একটু প্রকৃতিস্থ হোয়ে মহারাজ বোললেন, দূত অবধ্য। যাও, সেই অর্বাচীন অপোগণ্ডকে অবিলম্বে প্রস্তুত হোতে বলো—কে শৃগাল আর কে সিংহ এখনি জানতে পারবে।

কিন্তু মহারাজ! যুবরাজ মহারাজের মিত্রতাই চেয়েছিলেন।

মিত্রতা! মিত্রতা হয় সমানে সমানে—রাজায় রাজায়!

যুবরাজ ইন্দ্রনীল রাজা না হোলেও রাজপুত্র তো বটে।

বেশ। আমার কম্বোজ অভিযানে তোমার রাজপুত্র সহযোগিতা করুক। কম্বোজ অধিকার কোরে আমি ইন্দ্রনীলকেই কম্বোজের সিংহাসনে বসাবো আমার প্রতিনিধিরূপে।

ঈষৎ হেসে কোদণ্ড বোললো, ইন্দ্রনীলকে আপনি একজন ভুক্তিশাসকরূপে (প্রদেশশাসক) নিযুক্ত কোরতে চান?

স্পষ্ট কথায় তাই দাঁড়ায়। সেনাপতি, দূতের ফিরে যাবার ব্যবস্থা করো। আর দূত জেনে রাখো, কল্য সূর্যোদয় পর্যন্ত ইন্দ্রনীলের উত্তরের অপেক্ষা কোরে পরবর্তী কার্য আরম্ভ হবে।

কোদণ্ড ফিরে এল তাদের পোতে। মহারাজ শৈলেন্দ্রের ঐ ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনে যুবরাজ ইন্দ্রনীল তো ক্রোধে অগ্নিশর্মা। ক্ষমতায় মত্ত হোয়ে শৈলেন্দ্র ধরাকে সরা জ্ঞান কোরছে! ইন্দ্রনীল ক্ষুদ্র হোলেও তুচ্ছ নয়। তার ধমনীতে বীরের শোণিত প্রবাহিত হোচ্ছে। মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী! তবে কিজন্য শৈলেন্দ্রকে ভয়?—এই মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যেই হোক তার ভাগ্যের জয় পরাজয়ের নির্ধারণ। শৈলেন্দ্রের অধীন সামন্তরাজ

হওয়া অপেক্ষা সম্মুখ সমরে বীরের মৃত্যুই পরম কামনীয়। হুঙ্কার দিয়ে ইন্দ্রনীল বোলে উঠলো, আমার প্রিয় মিত্র কোদণ্ড! দুরভিলাষী শৈলেন্দ্রকে এই বার্তা পাঠাও যে, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কাল উষার প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গেই তোমার দক্ষ ধানুকীরা ধনুকে টংকার দেবে।

তরণীতে তরণীতে সাজ সাজ রব প'ড়ে গেল। সারা দিনরাত শুধু যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্য দিয়েই কাটলো। নিঝুম আঁধারে রণতরীগুলো ব্যূহ রচনা কোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে। হাজার হাজার ধনুর্কধারী ধনুকে শর যোজনা কোরে একটি মাত্র সংকেতের অপেক্ষায় ক্ষণ গুণছে। শুধু অশান্ত বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ আর অর্ণবপোতগুলোর ওপর আছাড় খেয়ে-পড়া তরঙ্গের ছপাৎ ছপাৎ শব্দ ছাড়া আর সবই নিস্তব্ধ।

ক্রমে আঁধারের ঘোর কাটতে লাগলো—পূর্বগগন স্বচ্ছ হোতে ক্রমশঃ স্বচ্ছতর হয়—গোলাবী বর্ণের অতি সূক্ষ্ম ওড়নার মতন আলোকাভিসার সুরু হোলো। ওকি! শত্রুপক্ষের দিক্ হোতে আঁধারে আঁধারে একটি ছোট তরণী আসে কেন? ইন্দ্রনীল উদ্‌গ্রীব হোয়ে সেই দিকে তাকালো। পূর্বগগন রক্তিম রাগে রঞ্জিত হোলো। তরীখানি ইন্দ্রনীলের অর্ণবপোতে এসে লাগলো। সূর্য উদিত হোলো।

তরীস্থিত আগন্তুক চীৎকার কোরে বোললো, আমি রাজাধিরাজ শৈলেন্দ্রের বারতা নিয়ে এসেছি যুবরাজ ইন্দ্রনীলের নিকট।

অর্ণবপোতের ওপর থেকে দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হোল। আগন্তুক উঠে এল।

কোদণ্ড বিস্ময়ে বোলে উঠলো, একি! প্রধান সেনাপতি!

প্রধান সেনাপতি বোললো, বর্তমানে শান্তির দূত।

শান্তি!—ইন্দ্রনীল বোলে উঠলো, পরিহাসের সময় এখন নয়!

প্রধান সেনাপতি অভিবাদন কোরে বোললো, আমি নিশ্চয়ই যুবরাজের সঙ্গে কথা বোলছি……ইন্দ্রনীল সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

প্রধান সেনাপতি বোলতে থাকে, তবে শুনুন যুবরাজ! রাজাধিরাজ শৈলেন্দ্র আপনার বীরত্বের কথা—সাহসের কথা পূর্বে অনেক শুনেছিলেন। এখন সেই সাহসেরই পরিচয় তিনি উপলব্ধি কোরতে পেরেছেন। আপনার এই গৌড়বঙ্গবাহিনী যতই রণকুশল হোক না কেন, সমুদ্রাধিপতি শৈলেন্দ্রের বাহিনীর তুলনায় অতি সামান্য। এই সামান্য বাহিনী নিয়েও, যদি তর্কের খাতিরেও মেনে নেওয়া যায় যে, আপনিই জয়ী হবেন, তবু এটা তো ঠিক সেই জয়ের মূল্য আপনাকে প্রভূত পরিমাণে দিতে হবে। অবশিষ্ট যা থাকবে সেই সৈন্য নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই কম্বোজ পুনরধিকার কোরতে পারবেন না।—এ কথা জেনেও যে আপনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে প্রস্তুত হোয়েছেন…তাই দেখে মহারাজাধিরাজ চমৎকৃত। তিনি আপনার ন্যায় অসমসাহসী বীরের মিত্রতা কামনা করেন,—শুধু তাঁর একটিমাত্র অনুরোধ আছে আপনার কাছে—যা তাঁর ধারণা নিশ্চয়ই রক্ষিত হবে।

ইন্দ্রনীল অল্প আশ্চর্যান্বিত হোয়ে বলে, মহাধিরাজ শৈলেন্দ্রের মিত্রতা তো আমি পূর্বেই প্রার্থনা কোরে-ছিলাম—সে তো আমার সৌভাগ্য। বলুন, সেনাপতি, কি তাঁর সামান্য অনুরোধ।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, রাজাধিরাজ শৈলেন্দ্র শুধু অজেয় বীরই নন, তিনি শিল্পের একনিষ্ঠ পূজারী—সকল কলাবিদ্যায় তিনি পারদর্শী, হিন্দুধর্মের তিনি পরম ভট্টারক, পরোপকারী, হৃদয়বান্।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর কীর্তিকলাপ অনেক শুনেছি।

প্রধান সেনাপতি অতি বিনয়ের সঙ্গে আবার বলে, দেবাদিদেব মহাদেবের কালজয়ী এক সুরম্য দেবায়তন নির্মাণ করার বহুদিন থেকেই তাঁর বাসনা।

রাজাধিরাজ তো বহু দেবালয় নির্মাণ করিয়েছেন।

সে কথা ঠিক্ তবে তাঁর মনোমত, তাঁর চিরপোষিত দেউল আজও নির্মিত হয়নি। তাই তাঁর একান্ত বাসনা আপনার সহযাত্রী মহাশিল্পী পৃথুল-কর্তৃক এক কৃষ্ণবর্ণ দেউল নির্মাণ করানো। রাজাধিরাজ সেইজন্য

মিত্রতার নিদর্শন-স্বরূপ মহাশিল্পী পৃথুলকে মহাসম্মানের সহিত নিয়ে যেতে চান সুবর্ণদ্বীপে।

দূত। মহারাজ শৈলেন্দ্রের এ অনুরোধ সামান্য নয়—অসামান্য, আমার কম্বোজের সিংহাসন অপেক্ষা বিরাট্! তাছাড়া মহাশিল্পী পৃথুল আমার নিজস্ব সম্পত্তি নন। তিনি আমার সুহৃদ্ হোলেও আমার উপাস্য দেবতা! আপনি মহারাজকে আমার অক্ষমতা জানাবেন। তাঁর মিত্রতা আমার কাম্য, কিন্তু তার জন্য এতো মূল্য আমি দিতে পারবো না।

যুবরাজ। আপনি একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা কোরে দেখুন। রাজাধিরাজ আবো বোলেছেন, আপনার কম্বোজ অভিযানে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে সহযোগিতা কোরবেন। মহাশিল্পীকে তাঁর চাই-ই। তিনি ইতিপূর্বে ভারত থেকে শিল্পীকে নিয়ে আসার জন্য অনেক চেষ্টা কোরেছেন, কিন্তু সব চেষ্টাই তাঁর বিফল হোয়েছে।

আজ সুবর্ণ সুযোগ তাঁর সামনে! না, সেনাপতি তা হবার নয়—তা হবে না।

তা হোলে?

যুদ্ধের জন্য আমি প্রস্তুত। মহারাজ শৈলেন্দ্রকে সেই কথাই জানাবেন।

যুবরাজ ভেবে দেখুন, একটি প্রাণের জন্য আপনি অসংখ্য প্রাণহানি কোরতে চান! অবশেষে তাঁকেও কি ধ'রে রাখতে পারবেন?

অধিক কথার প্রয়োজন নেই। আপনি ফিরে যেতে পারেন আপনার মহারাজের সমীপে।

প্রধান সেনাপতি অভিবাদন কোরে অগ্রসর হয়।

দাঁড়াও, দূত, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

দূত থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে; ইন্দ্রনীল কোদণ্ডর দিকে ফিরে তাকায়।

প্রশান্ত পদক্ষেপে মহাশিল্পী পৃথুল এগিয়ে এল। ইন্দ্রনীল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, শিল্পী, আপনি কি বোলছেন?

স্নিগ্ধকণ্ঠে পৃথুল বলে, আমার প্রিয় যুবরাজ, আমাকে বিদায় দিন। আপনি ভেবে দেখুন, একটিমাত্র প্রাণের জন্য একটা ভয়ানক রক্তক্ষয় যুদ্ধের কি প্রয়োজন? তাছাড়া যে সংকল্প নিয়ে আপনি যাত্রা কোরেছেন তার ব্যাঘাত আমার জন্য হয়—এটাও নিশ্চয়ই আপনার কাম্য নয়।

ইন্দ্রনীল বলে, আপনি নিজের ইচ্ছায় যেতে চান, তাতে আমি বাধা দেবো না, কেন-না আমার ন্যায় নগণ্য মানুষের ক্ষমতা নেই আপনার মত মহান্ স্রষ্টাকে ধ'রে রাখবার।

যুবরাজ, অভিমান কোরে নিজেকে আপনি ছোট কোরবেন না; আপনার বাহুবলের অপেক্ষা হৃদয়বল আরো প্রচণ্ড। সেই প্রচণ্ড হৃদয়বলের স্নেহাকর্ষণ ছিন্ন কোরে যেতে আমি যে অনন্ত বেদনা···

না, না আপনি আমাকে ত্যাগ কোরে যাবেন না—আবেগে ইন্দ্রনীল পৃথুলকে জড়িয়ে ধ'রে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, হে সৌন্দর্যস্রষ্টা পৃথুল, কম্বোজের সিংহাসন চাই না, আমি চাই আপনাকে।

অবুঝ হোওনা, ইন্দ্রনীল; আমাকে তুমি এতো ভালবাস বোলেই তো আমি তোমার স্নেহপাশ ছিন্ন কোরে বিদায় চাইছি। মহারাজ শৈলেন্দ্র আমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন, আমি যাচ্ছি,—এতে দুঃখ বা অভিমানের স্থান কৈ? এতে বিমর্ষ হবার কি আছে? কম্বোজে গিয়ে দুষ্ট দুঃশাসন গ্রহবর্মাকে ধ্বংস কোরে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তোমার কিছু সময় লাগবেই। মনে করো সেই সময়ের মধ্যেই আমি না হয় মহারাজ শৈলেন্দ্রের ইচ্ছা পূরণ কোরে এলাম। তুমি হৃষ্টমনে আমাকে অনুমতি দাও।

ইন্দ্রনীল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, কোদণ্ড তরণী প্রস্তুত কর, আমি স্বয়ং মহাশিল্পীকে পৌঁছে দিয়ে আসবো মহারাজাধিরাজ শৈলেন্দ্রের সমীপে।

দূত বোলে ওঠে, না না, যুবরাজ, আপনার যাবার দরকার নেই—মহারাজ আমায় বোলেছেন, শিল্পী পৃথুল আসতে সম্মত হোলে, তিনি নিজে এসে তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যাবেন। আমি যাই, এই শুভ সংবাদের অপেক্ষায় রাজাধিরাজ উদ্‌গ্রীব হোয়ে আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণ

শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

॥ ৯ ॥

১৯২৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পরীক্ষার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফাল্গুন মাসে আমাদের ভদ্রাসন গৌরীপুরে (ময়মনসিং) স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবীর সহিত আমার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। উত্তরজীবনে ইন্দিরা দেবী প্রাচ্যকলা বিভাগে বাংলার মহিলা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ ক'রেছেন। কৈশোর জীবনে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরেরই উপযোগী ছিল; কেননা তিনি আবাল্য কোল্‌কাতায় পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত বংগীয় ব্রাহ্মণসভার সম্পাদক স্বর্গীয় কবিরাজ শরৎচন্দ্র সাংখ্য-তীর্থের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। কবিরাজ মহাশয় পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ ও রামদয়ালবাবুর বিশেষ সুহৃদস্থানীয় ছিলেন। আমার বিবাহের বহু বৎসর পূর্ব্ব হ'তেই ব্রাহ্মণসভা ও সামাজিক বিবিধ ব্যাপারে বাবার সহিত কবিরাজ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তবে আমার বিবাহ ব্যাপারে প্রধান ঘটক ছিলেন স্বর্গীয় এস্রাজবাদক শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি বাবার বয়স্যস্থানীয় ছিলেন এবং আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সহিত তাঁর নিবিড় সৌহার্দ্দ্য ছিল। শীতলবাবুর নিকট ইন্দিরা দেবীর নানা গুণ-রাজির বর্ণনা এবং সুকণ্ঠের বিষয়ে শুনতে পেয়ে আমি তাঁর সহিত বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দান করি। আমাদের বিবাহ উৎসবে গৌরীপুরে নানা গুণী, জ্ঞানী ও পণ্ডিতের সম্মেলন ঘটেছিল। বিবাহের পর বি. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আমি কোল্‌কাতায় চ'লে আসি এবং তখন থেকেই কোল্‌কাতায় আমাদের বসবাসের ব্যবস্থা সুকিয়া ষ্ট্রীটে পিতৃগৃহেই পুনরায় অবলম্বিত হয়।

ঐ বৎসরই আমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তার সুযোগ লাভ করি। তিনি তখন স্বরাজ পার্টি গঠন ক'রে বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদে যোগ দিয়ে-ছিলেন। বাবাও তখন জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে উক্ত পরিষদের অন্যতম সভ্য ছিলেন। স্বদেশী যুগের ন্যায় এই যুগেও আইন সভার কাজে চিত্তরঞ্জনের সহিত বাবার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দেশীয় মন্ত্রীদের মধ্যে ফজলুল হক, আব্দুল হালিম গজনবী, রাজা মণিলাল সিং বৃটিশ সরকারের মনোনীত ছিলেন। কিন্তু প্রভাস মিত্র সরকারবিরোধী দলে যোগদান করেন; জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাবাকে সরকারী ও বিরোধী দুই দলের সহিতই খাতির রাখতে হ'তো। তবে দেশবন্ধু বিরোধী দলের নেতা হ'লেও জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়ান নি। তিনি স্বদেশী যুগে জমিদারদিগের অবদান সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। বাবাকে তিনি বলতেন যে, তাঁর আদর্শগত স্বরাজ পরিকল্পনায় জমিদারী প্রথা না থাকলেও দেশ সংগঠনে যে সকল বৃহৎ সমবায়মণ্ডলী স্থাপিত হবে, সেগুলিতে বৃহৎ অংশীদাররূপে জমিদারগণ যোগ দিতে পারবেন; তাতে দেশের কাজে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে, অথচ তাঁদের স্বার্থ ও উচ্চ পদ অনেকটা অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে,—একদা বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থা পরিষদের সময় তিনি আমাদের কোলকাতার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। ঐ সময় আমি ও ইন্দিরা দেবী তাঁর সহিত কথাবার্ত্তার সুযোগ লাভ করি। তার কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল পরে শ্রীঅরবিন্দের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা ঘ'টেছিল। আমি দেশবন্ধুকে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলে, তিনি ব'ললেন—"অরবিন্দের সম্বন্ধে কিছুই কথা ব'লে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নাই; যদি জীবন্ত বুদ্ধদেবকে দেখতে হয় তবে তিনিই শ্রীঅরবিন্দ।" পরে আমি দেশবন্ধুর সহিত শ্রীঅরবিন্দের এই শেষ মিলনের প্রসঙ্গে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। দেশবন্ধু এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পর যখন লোকান্তরিত হ'লেন, তখন দেশবন্ধু সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব জানতে চাওয়ায়,

শ্রীঅরবিন্দ একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন, সকল সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হ'য়েছিল। সেই বাণীতে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ ক'রেছিলেন—"লোকমান্য তিলকের পর ভারতের জন্য সফল স্বরাজ একমাত্র চিত্তরঞ্জনই আনতে পারতেন। চিত্তরঞ্জনের স্থান দেশে অপূরণীয়।" লোকান্তর গমনের এক বৎসর পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন যখন পণ্ডিচেরীতে যান, তখন তিনি সারা ভারতে স্বরাজ পার্টি গঠনে অগ্রসর হ'য়েছিলেন; এ বিষয়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুজী তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন। দেশবরেণ্য এই নেতৃদ্বয় এক সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কর্ণধার ছিলেন। কিন্তু মহাত্মাজীর সহিত ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পার্থক্য ছিল। তাই ১৯২১ সালের প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শেষ হ'লে যখন দেশবন্ধু ভারতের পূর্ণ স্বরাজ-পরিকল্পনা নিয়ে স্বরাজ পার্টি গঠিত ক'রলেন, তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বিনা দ্বিধায় এই পার্টিতে যোগদান করেন। ভারতীয় নানা প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে যোগ দিয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় অধিকার বিস্তার এই পার্টির একটি প্রধান কর্ম্মনীতি-রূপে ধার্য্য হ'য়েছিল। স্বয়ং দেশবন্ধু তাই বাংলার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সদলবলে যোগ দেন; স্বরাজ পার্টির মধ্যে তাঁর কর্ম্মনীতির সাফল্যের জন্য তাঁর অনুবর্ত্তী তিনজন দেশনেতার নাম চিরস্মরণীয়—

১। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, যিনি তখন সদ্য আই. সি. এস. পাশ ক'রে দেশে ফিরে সরকারী চাকরী গ্রহণের পরিবর্ত্তে এক চরমপন্থী বিদ্রোহী দলের নেতৃত্বপদ অধিকার করেন।

২। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ইনি দেশবন্ধুর গঠনমূলক রাজনীতির এক প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস নির্ব্বাচিত দলের নেতৃত্বলাভ ক'রে উচ্চ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদ বহু বর্ষ ধরে অলংকৃত করেন।

৩। শ্রীঅনিলবরণ রায়; যিনি অগ্নিময়ী বক্তৃতার সাহায্যে দেশমাতার সেবায় তরুণ বাঙালীদের উদ্বুদ্ধ ক'রেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বত্যাগী দেশসেবকরূপে দেশবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। অনিলবরণ পরবর্ত্তী জীবনে হিন্দুধর্ম্মের এক প্রধান সংস্কারকরূপে সারা দেশে সমাদৃত হন, তবে দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর শ্রীঅরবিন্দের নিকট যোগদীক্ষা লাভ ক'রে তাঁর অন্তেবাসীরূপে বিগত চল্লিশ বৎসর পণ্ডিচেরী আশ্রমে সাধন জীবন যাপন করছেন। সেখানে থেকেও ইনি ভারত ও জগতের জন্য শ্রীঅরবিন্দের প্রদত্ত গীতার আদর্শ লেখনীর সাহায্যে প্রচার ক'রে আসছেন।

সুভাষ, সত্যেন্দ্র ও অনিলবরণ এই তিনজন মহৎ ব্যক্তি দেশবন্ধুর রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন, একথা বলা চলে। তাছাড়া স্বরাজ পার্টির গঠন ও ব্যবস্থা পরিষদের কাজে তাঁর অনুবর্ত্তী নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধি, অর্থ ও কর্ম্মের দ্বারা দেশবন্ধুর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের নামও এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য।

যথা: ১। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ২। শরৎচন্দ্র বসু, ৩। নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, ৪। নলিনীরঞ্জন সরকার, ৫। তুলসী গোস্বামী।

পরবর্ত্তী যুগে ইঁহারা বাংলার রাজনৈতিক জগতে সর্দ্দার পঞ্চক (Big five) আখ্যা লাভ ক'রেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে, এঁদের মধ্যে আমাদের স্বজেলাবাসী নলিনীরঞ্জন সরকার আজীবন বাবার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে বাবার নিজ পরিচালিত দেশের কাজে স্বেচ্ছাসেবকরূপে বাবার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বাবার ইচ্ছাক্রমেই তিনি Hindusthan Co-operative Insurance Society-র কর্ম্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তুল্য ও আমাদের গৌরীপুর ঘরের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। স্বদেশীযুগের পর বাবার সহিত কংগ্রেসের গোপন ও প্রকাশ্য আর্থিক ও সর্ব্ববিধ যোগাযোগ তাঁর মাধ্যমেই বাবা রক্ষা ক'রে চলতেন।

দেশবন্ধু স্বরাজ পরিকল্পনায় শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করেছে। এই পরিকল্পনার কথা তিনি শ্রীঅরবিন্দকে একাধিক পত্রে লিখেছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দও দু' তিনটি পত্রে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ দেশবন্ধুকে বিশদভাবে লিখে জানান। আমি নিজে সে

'প্রবর্ত্তক'-এর পঞ্চাশ বছর

অঃ অরবিন্দের সহকর্মী

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

॥ ১০ ॥

বাংলা ১৩২৫ সাল ৩০শে পৌষ (ইংরেজী ১৯১৮ জানুয়ারী) প্রবর্ত্তক ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করে। এই বর্ষের প্রথম সংখ্যায় "নববর্ষ" শীর্ষকে আত্মীয়তাসুলভ আহ্বান (লেখকের নাম নাই, সম্ভবতঃ শ্রীমতিলালেরই লেখা) জানানো হইয়াছে :

"আজ প্রবর্ত্তকের শুভদিনে আমরা আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে সাদর আলিঙ্গন করিতেছি, তাঁহারাও সকলে যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করেন। আমাদের পরস্পরের শক্তি পরস্পরে মিলিয়া যেন সেই মহাশক্তিকে জাগরিত করে, যাহার অপেক্ষায় আমরা বসিয়া আছি, যাহার সাধনায় এই তিন বৎসর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যে সাগরবক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র তরীখানি ভাসাইয়া দিয়াছি, কূল নাই, কিনারা নাই, কেবলই অসীম বীচিবিক্ষোভমালা কূলহারা উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে, সেখানে আমাদের আছে একটি ধ্রুবতারা, তাহাকেই জানি—তাহাকেই চিনি, সেই আমাদের গতিনির্দ্দেশক। * * * * তাই আজ ভাল করিয়া দেখিব, বুঝিব, চিনিব সেই লক্ষ্যটি। তাই আজ আবার বলিব আমাদের জীবনদেবতার কথা। আমরা কোথায়, কি করিতে চলিয়াছি ? আমাদের উদ্দেশ্য কি ? আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের যে ভাগবত সত্তা আছে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণরূপে নিজের ভিতর উপলব্ধি করিব, নিজের জীবনে প্রকট করিব, তারপর সেই জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া জগতে ছড়াইয়া দিব, প্রতিষ্ঠা করিব। আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীর উপর স্বর্গকে বহিয়া আনা, এবং সেখানে তাহাকে অটুটভাবে ধরিয়া রাখা। পৃথিবীর উপর স্বর্গরাজ্য আনিব। * * * * এই স্বর্গরাজ্য কি ? ইহা হইতেছে দিব্য বা ভাগবত জীবন। জীবনের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা—ইহাই আমাদের লক্ষ্য। ভগবান হইতেছেন পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ আনন্দ—এই জ্ঞানে, এই শক্তিতে, এই আনন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত, পরিচালিত। এই জ্ঞানের, এই শক্তির, এই আনন্দেরই মূর্ত্ত রূপ হইতেছে এই যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু দেখিতেছি, এই পূর্ণ জ্ঞান, এই পূর্ণ শক্তি এই পূর্ণ আনন্দই আমার অন্তর্য্যামী দেবতা, আমারই অন্তরাত্মা, আমিই ; কিন্তু এ জ্ঞান, এই শক্তি, এ আনন্দ আছে আমার ভিতরে, আমার বাহিরে—সে শুধু ছায়াটি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।"

উপরি উদ্ধৃত লেখা হইতে বিপ্লবী মতিলালের মধ্যে যে একটা দিব্যভাবের উন্মেষ হইতেছে তাহা বেশ বোঝা যায়। অন্যথায় এমন লেখা কি সম্ভব ? এই সময়কার তাঁর অন্তর্জীবনের কথা তিনি জীবনসঙ্গিনী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছিলেন :

"জীবনে এই প্রথম ডাকিয়া সাড়া পাইলাম। নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পদ্মাসনে বসিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে কত

সব পত্রের অনুলিপি পাঠ করেছি ; আশ্রম ছাড়াও অধুনা দিল্লীবাসী উকিল শ্রীকুমুদবন্ধু বাগচী মহাশয়ের নিকট টাইপ করা এই সকল অনুলিপি রয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ শ্রীঅনিলবরণ রায় পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে প্রকাশ করেছেন। দেশবন্ধুর নিকট লিখিত শ্রীঅরবিন্দের চিঠিপত্রে তাঁর গ্রন্থের মৌলিক সূত্রগুলি সন্নিবদ্ধ হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ থেকে আরম্ভ করে শহর, জেলা, প্রদেশ প্রভৃতি স্বাধীনভাবে গড়ে উঠুক ; ক্ষুদ্র কেন্দ্রগুলি থেকে বৃহতের গঠন হবে, উপর থেকে কোনও শাসন চাপানো হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার হবে নিম্ন হতে ক্রমানুসারে গঠিত মণ্ডলগুলির দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মেলন স্থল।

(ক্রমশঃ)

দীর্ঘ সময় একাগ্রচিত্ত হওয়ার সাধনা করিয়াছি, কত রাত্রি নির্ব্বাত জ্বলন্ত দীপালোকের দিকে চাহিয়া চঞ্চল মন স্থির করার জন্য ব্রাটক অভ্যাস করিয়াছি। মন্ত্র জপ করিতে করিতে চিত্ত আমার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রোত্থিত ধ্যানভঙ্গে একটা আরাম অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আজ এই ভবিষ্যতের দিকে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ প্রাপ্তির প্রার্থনায় হৃদয় মন এমন এক অভিনব আনন্দে অভিষিক্ত হইল, যাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবে না। চক্ষে পুলকাশ্রু, সমস্ত মেরুদণ্ডটি অকম্পিত। চাহিয়া আছি কিন্তু দৃশ্যমান কিছুই নাই। আত্মচেতনা আছে, শরীরের স্থূলানুভূতি নাই। একটা জ্যোতির্ম্ময় জগতে যেন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তারপর হাতখানা কে যেন জোর করিয়া তুলিয়া ধরিল, লেখনী হস্তে ধরাইয়া পরিষ্কার প্যাডের উপর এক ছত্র লেখা বাহির হইল "wait, all will come."

প্রবর্ত্তক ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যা 'নববর্ষে' শীর্ষক লেখা শ্রীমতিলালের জীবনের ভবিষ্য পরিণতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

এই সময়কার প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠা একক শ্রীমতিলালের রচনায়ই পূর্ণ হইত। চতুর্থ বর্ষের অধিকাংশ রচনাই ছিল ধর্ম্ম ও ঐশীপ্রেরণামূলক। এইসব রচনা তাঁর জীবনগতির পরিচয় বহন করে। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম যথা—'সাধনা', 'শৃঙ্খল', 'যোগ কি'?, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, 'উৎসব', 'সৎকথামৃত', 'স্বামী শুদ্ধানন্দের আদর্শ', 'মনঃস্থৈর্য্য', 'জ্বালা', 'সাধনার কথা', 'সমাজ কথা', 'জীবন-সাধনা', 'স্বর্গমর্ত্ত্য', 'মাভৈঃ', 'তন্ত্রের সাধনা', 'আর্য্য শিক্ষা', 'ধ্যান', 'সাধন পথ', 'বর্ষার প্রলাপ', 'পাগলের 'সিদ্ধমার্গ', 'জীবনযোগ', 'মর্ম্মব্যথা', 'ধর্ম্মপ্লাবন', চিঠি, 'কর্ম্মকথা', 'আত্মসমর্পণের দীক্ষা', 'সিদ্ধমন্ত্র', 'সহজ সাধন', 'দিব্য প্রেরণা', 'তন্ত্রের কথা', 'জীবনসূত্র', 'আমাদের প্রার্থনা', 'ধর্ম্ম ও কর্ম্ম', 'আত্মনিবেদন', 'সেবাধর্ম্ম', 'ব্রহ্মদৃষ্টি', 'জ্ঞানযজ্ঞ', 'আদর্শ', 'আত্মসাধনা', 'সিদ্ধ যজ্ঞ', 'প্রশ্ন' 'প্রশস্তি', 'উৎসর্গ রহস্য' প্রভৃতি।

১৯১৮ সালে ১১ই নবেম্বর চারি বৎসর তিন মাস নিরন্তর যুদ্ধের পর অকস্মাৎ ইউরোপে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হইল। জার্ম্মেনী অন্তর্বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া পড়িল—যুদ্ধ করার শক্তি তাহার আর ছিল না। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও অর্ডিনান্সের নিয়মানুসারে ভারত রক্ষা আইন আরও ছয় মাস বলবৎ থাকিতে পারিবে। কাজেই বাঙ্গালাদেশের বহু রাজবন্দী জেলে আটক রহিয়া গেল। সেই প্রসঙ্গে ৪র্থ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা (৩০-এ আশ্বিন, ১৩২৬) 'অন্তরীণ প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল এই উদ্দেশ্যে যে, ইহা বাংলার স্বদেশ-সাধনার ইতিহাসের উপাদান যোগাইবার সহায়ক হইবে।

"সেদিন সহযোগী "Pioneer" পত্রে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে: "It is understood that the Internment camps is Bengal have been ordered to be dissolved and detenues are being removed to the Presidency Jail. Many of them have released and it is probable that all of them will be released by the next month. It is further stated that the strength of the force in the Intelligence and the special branch of the C. I. D. are going to be appreciably reduced. অর্থাৎ শুনা যাইতেছে বাংলার অন্তরীণ শিবিরগুলি তুলিয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অবরুদ্ধ বন্দীগণকে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। তাহাদের অনেককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, সম্ভব আগামী মাসের মধ্যে সকলেই মুক্তি দেওয়া হইবে। উপরন্তু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে সাধারণ এবং বিশেষ দারোগা বিভাগ বিশেষ ভাবেই কমাইয়া দিবার আয়োজন চলিতেছে। কথা সত্য হইলে এই সংখ্যার "প্রবর্ত্তক" পাঠকের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই অন্তরীণগণ মুক্তি পাইবে।

"আজ চারি বৎসরের অধিককাল এই অন্তরীণ আইনে বাংলার বহু যুবক আবদ্ধ থাকায় কত গৃহস্থ পরিবার শ্রীহীন, কত জননী পুত্রবিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে। কত সতী রমণী পতির জন্য উন্মাদ হইয়াছে। কেহবা আত্মহত্যা করিয়াছে, কত সংসার ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি আমাদের একজন

পরিচিত বন্ধু অন্তরীণ হইতে মুক্তি পাইয়া লিখিয়াছেন : "সদাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আমায় মুক্তি দান করিয়াছেন। উপস্থিত আমি নিঃস্ব। অন্তরীণ অবস্থায় মাতাঠাকুরাণী ৩০০৲ টাকা ঋণ করিয়া সংসার চালাইয়াছেন, এক্ষণে তাহা দিতে পারি নাই। গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াও পাই নাই। এমন কত ঘটনা আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

"যুদ্ধান্তে ছয় মাস পরে এই সর্ব্বনাশা রাজবিধি উঠিয়া যাইবে, এই আশায় বিপন্ন বাঙ্গালীর ম্লানমুখে হাসি দেখা দিয়াছে। উক্ত সংবাদ সত্য হইলে, বাঙ্গালীর নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যে তবু একটু সুখের রেখা ফুটিয়া উঠিবে।"

এই মুক্ত বন্দীদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও শ্রীমতিলাল নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় বিপ্লব হইতে সরিয়া সংগঠনের দিকে তিনি ঝুঁকিতেছেন। নির্দ্দেশের অংশ বিশেষ এখানে তুলিয়া দিলাম :

"তারপর উদীয়মান তরুণদিগকে আমরা একটি কথা বলি, মুক্তি আমাদের পাইতে হইবে। কিন্তু সে মুক্তি সর্ব্বাগ্রে আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল কর্ম্মফল উৎসর্গ করিয়া সমাজজীবনকে স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রধান দেশ, তরবারি বন্দুকই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র অস্ত্র নহে। আমাদের জ্ঞানবলকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং এ কার্য্যের জন্য এই মুহূর্ত্তেই আমাদের জীবনগুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া তুলিতে হইবে। বাহিরে যাহারা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে, তাহাদের ব্যর্থ জীবন একদিন ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে। সুতরাং ঐ সকল দিকে আমাদের উপস্থিত লক্ষ্য করিবার অবসর নাই। আইস স্ব স্ব জীবনকে উন্নত করিয়া তুলি এবং সে উন্নতি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, আত্মদর্শনের সাহায্যেই উহা সম্পন্ন হইবে। আত্মদর্শী ঋষিকুলই আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে, অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার তপস্যাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। সুতরাং অসার রাজনীতি বা পুরাতন বিপ্লববাদের সংস্রব যতই আমরা পরিহার করিব অন্তরের বল ততই আমাদের বাড়িবে, সম্মুখে যে উত্তাল তরঙ্গ তাহাকে অতিক্রম করিবার জন্য এই অন্তঃশক্তিরই প্রয়োজন।"

প্রবর্ত্তক ৪র্থ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা (৩০শে কার্ত্তিক, ১৩২৬) "অবরুদ্ধের মুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধেও শ্রীমতিলালের ঐ আত্মগঠনমূলক সুরই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :

"আমরা রাজনীতিক বন্দীগণের কথাই বলিতেছি। স্বদেশপ্রেমের অমর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা যে তন্ত্রে পরিচালিত হইয়াছিলেন তাহা ভুল হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের দেশহিতৈষণা মিথ্যা নহে। জননী-জন্মভূমির সহিত যাহার পরিচয় নাই, স্বদেশের প্রতি যাহার মমতা নাই, শ্রদ্ধা নাই, ভক্তি নাই, স্বজাতি অথবা রাজশক্তির সত্যমঙ্গল তাহার দ্বারা কোনকালেই সংসাধিত হইবার নহে। আজ যাঁহারা পুরাতন কর্ম্মপ্রবাহে ভাসিয়া অবরুদ্ধ জীবনে, আন্দামানে, কারাগারে, বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে হতাশ নয়নে মুক্তি প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কথা ভাবিবার লোক কি বাংলাদেশে কেহ নাই?

"কেহ কি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে না যে, বাংলায় নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গালীর মানসিক ভাবের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালী দেশসেবায় উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। ভবিষ্যতে কোনও নবীন দেশসেবক, রাজসিক উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, পাশ্চাত্যের পৈশাচিক এনার্কিজমে যোগদান করিয়া অনাচার আনয়নে উদ্যোগী হইবে, না—এই আগামী শান্তি-উৎসবে বাঙ্গালার সকল রাজনীতিক বন্দীর মুক্তি দেওয়া হউক?

"কথাটা উদ্ভট নহে। সম্প্রতি "কেশরী" পত্রিকায় প্রকাশ, বোম্বাই প্রদেশে এক আবেদনপত্র স্বাক্ষর হইতেছে—বোম্বাইয়ের রাজনীতিক বন্দীগণকে মুক্তি দিবার জন্য। দুর্ভাগ্য বন্দীগণের প্রতি দেশনেতৃগণের এই সহানুভূতি প্রশংসার্হ, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে এইরূপ প্রচেষ্টা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যে অধিকতর বাঞ্ছনীয় একথা কি আবার বলিতে হইবে?

"দেশনেতৃগণেব নিকট আমাদের প্রার্থনা, বোম্বাই-বাসীর মত বাংলা দেশেও সকল রাজনীতিক বন্দী যাহাতে মুক্তি পায়, তাহার বিপুল আয়োজন করা হউক। একথা খুব সত্য যে, বর্ত্তমান রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে সকল জটিল কর্ম্ম উপস্থিত উহয়াছে, তাহার সমাধানে নেতৃগণ যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত আছেন। কিন্তু ইহাওতো একটি গুরুতব সমস্যা। * * * "পত্রিকায়" প্রকাশ ময়মনসিংহ গীলা বোস জনৈক যুবকের দ্বারা নিহত হইয়াছে। গীলা বোসেব মৃত্যু অন্য কারণেও ঘটিতে পারে; * * কেননা উক্ত গুপ্তচর নিরুদ্দেশ হইবার পূর্ব্বে অন্তরীণমুক্ত শ্রীমান শ্যামানন্দ সেনগুপ্তের সহিত ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, এই নবহত্যার অন্য কোন কারণ আছে, কেননা শ্রীমান শ্যামানন্দের নিকট হইতে তাহার বক্তব্য শুনিয়া পুলিস নিরস্ত হইয়াছে? * * * ।

"প্রবর্ত্তকের পাঠকসংখ্যা যুবকগণের মধ্যেই অধিক। আমরা আমূল চরিত্র গঠনের ব্রত লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। একজন "প্রবর্ত্তক-এর হিতাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী পাঠক লিখিয়াছেন, "তোমাদের প্রেমের সাধনা যুবকদল গ্রহণ করিতে তত ইচ্ছুক নয়, তাহারা চাহে একটা হিপ্ হিপ্ হুরেব ভাব।" ইহার সবখানি সত্য নহে—তাহা আমরা জানি। আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি, যুবকগণেব মধ্যে প্রেমের রাজ্য বিস্তারলাভ করিতেছে, তবে মনে হয় অনেক অপরিণত বয়স্ক যুবক এখনও পুরাতন বিপ্লববাদেরই পক্ষপাতী, এবং তাহাদিগকে আমবা বলি—এই বিপ্লববাদ তো পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবাব জন্য। পরাধীন জাতির যতই জ্ঞান প্রকাশ হয় ততই তাহাবা মুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে, ইহাও সত্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোন্ পথটি ইহাদের জন্য শ্রেয়ঃ ও মঙ্গলজনক তাহাই গভীর চিন্তাসাপেক্ষ। দেশের যে সকল কর্ম্ম, রাজনীতিক চর্চ্চা, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি অনুষ্ঠাননিচয় সৃষ্টি হইতেছে, ইহার সবই তো জাতিকে মানুষ করিয়া তোলার জন্য। * * * * রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য উদ্ভাবিত এই সকল পন্থা সম্বন্ধেই আমরা দেশকে সাবধান হইতে বলি, কেননা উহাই ভারতের সবখানি নয়, আত্মমুক্তির সাধনাই এক্ষণে আমাদেব করিতে হইবে, রাজনৈতিক মুক্তির জন্য অরাজকতার রক্তলীলা ভারতের চরিত্রে স্থান নাও পাইতে পারে।

"এই আত্মমুক্তিব জন্য, আইস সর্ব্বাগ্রে আমাদের অন্তরতম পুরুষকে জাগ্রত করিয়া তুলি, তাঁহার ইচ্ছাকে প্রকট করিয়া তাঁহারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই * * * *। এই সাধনার ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা আপনাকে জানিবার ও পাইবার তপস্যা করিব। আপনাকে যে পরিমাণে পাইব ও জানিব সেই পরিমাণে আমরা ভাগবত ভাবে বিভোর হইতে পাবিব এবং এইরূপে পূর্ণ দেবচরিত্র লাভের উপযোগী হইয়া উঠিব।

"দ্বিতীয়—এই দেবচরিত্র ব্যষ্টি লইয়া এক বিরাট সমষ্টির সৃষ্টি করিব। এই অসংখ্য ব্যষ্টি, একই কেন্দ্র-চক্রের বজ্রসঙ্কেতে, একটি আত্মার মত অথচ বহুভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র কর্ম্মে রত থাকিবেন।

"তৃতীয়—এই দেবচরিত্রের পুণ্যপ্রভায় ভারতে নব সূর্য্যের অভ্যুদয় ঘটাইয়া তুলিব ও বিশ্বের বুকে যে জমাট আঁধাব পুঞ্জীভূত থাকিয়া, জগতে বিষম দ্বন্দ্ব ও অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এই পবিত্র স্বর্গীয় আলোকে অপসারিত করিয়া স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিব।" * *

(ক্রমশঃ)

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

ভারতবর্ষ পণ্ডিত নেহেরুকে হারাইয়া শ্রীলাল-বাহাদুরকে পাইয়াছিল। নেহেরু-উত্তর ভারতের উত্তাল তরঙ্গে এই ছোট্ট শান্ত মানুষটী উনিশ মাস প্রধান-মন্ত্রীরূপে থাকিয়া রাষ্ট্রতরণীকে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপথে পরিচালনা করিয়াছেন। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে শাস্ত্রীজী যখন প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন জাতির মনে কিছু সংশয় ও দ্বিধা ছিল। তারপর যতই দিন গিয়াছে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা বাড়িয়াছে, সংশয় দূর হইয়াছে, প্রত্যয় দৃঢ় হইয়াছে। এই ধীর স্থির ছোট্ট মানুষটী একের পর এক করিয়া জাতীয় ইতিহাসের নূতন অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।

উত্তর প্রদেশের বারাণসী জেলার মোগলসরাইয়ে ১৯০৪ সালে শ্রীশাস্ত্রীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সারদা-প্রসাদ ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। লালবাহাদুরের দেড় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাতামহের তত্ত্বাবধানে তিনি ও তাঁহার দুই ভগ্নী পালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। বারাণসীর হিন্দু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে গান্ধীজী ছাত্রদের বিদ্যালয় বর্জ্জন করার আবেদন জানান। লালবাহাদুর এই আবেদনে সাড়া দেন এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন। ১৯২১ সালে মুক্তিলাভ করিয়া কাশী বিদ্যাপীঠে তিনি পুনরায় পাঠ্যজীবন সুরু করেন এবং বিদ্যাপীঠ হইতে শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ইহার পর তিনি পুনরায় রাজনীতিতে যোগদান করেন।

২৭ বৎসর বয়সে ললিতা দেবীর সঙ্গে শ্রীশাস্ত্রীজির বিবাহ হয়। বর্ত্তমানে তাঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা বিদ্যমান। ১৯২৬ সালে তিনি সার্ভেন্টস অফ দি পিপল সোসাইটীর আজীবন সদস্য হন এবং এলাহাবাদের পৌর-পর্ষতের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি এলাহাবাদ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টেরও চারি বৎসর সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি এলাহাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও পরে সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সাল হইতে তিন বৎসর তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে লালবাহাদুর যুক্তপ্রদেশ পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯২১ সাল হইতে ১৯৪২ সালের মধ্যে যে সমস্ত জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার সবগুলি আন্দোলনে লালবাহাদুর যোগদান করেন। এই সময়ের মধ্যে মোট তিনবার তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ সালে যুক্ত প্রদেশে আইন সভায় পুনরায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পাঁচ বৎসরকাল তিনি এই দপ্তর পরিচালনা করেন।

১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য শ্রীশাস্ত্রী কংগ্রেস নির্ব্বাচনী কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস যে বিপুল সাফল্য লাভ করে তাহার মূলে ছিল শ্রীশাস্ত্রীজির অনন্যসাধারণ সংগঠনী শক্তি। ১৯৫২ সালে শ্রীশাস্ত্রী রাজ্যসভার সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর মে মাসে রেলওয়ে ও পরিবহন দপ্তরের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করা হয়। চার বৎসর পর ১৯৫৬ সালের নবেম্বর মাসে আরিয়ালপুরের ভয়াবহ ট্রেণ দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালের মার্চ্চ মাসে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে গোবিন্দবল্লভ পন্থের মৃত্যুর পর ৪ঠা এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন।

আসামের ভাষাবিরোধে তিনি মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবন করেন। ১৯৬০ সালে নেপালে শুভেচ্ছা সফরেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় নেপাল ও ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াছিল। শ্রীশাস্ত্রীজির চেষ্টায় পুনরায় সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। ১৯৬৩ সালে আগষ্ট মাসে কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে কংগ্রেস সংগঠনের জন্য তিনি মন্ত্রীসভা পরিত্যাগ করেন।

দুই আর দুই-এ

ইন্দু গুপ্ত

দুই আর দুই-এ চার হয়। যোগ বা গুণ যাই করুন এর ব্যতিক্রম কোন মতেই হবে না। কিন্তু এই সহজ সত্যটাও যখন মাথায় ঢোকে না, তখন বুঝতে হবে মাথাটা সত্যিই বিগড়েছে।

গাণিতিক নিয়মই যে জীবনের নিয়ম সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তবু মতভেদ হয়ই। কেন হয় সে প্রশ্ন অবান্তর। আমার কাছে ছেলেবেলায় সবচেয়ে জটিল এবং দুর্বোধ্য ছিল অংক। দুই আর দুই-এ চার সেদিন কিছুতেই হোত না। শংকিত হতেন মাষ্টারমশায়। এ ছেলের হবে কি? ভবিষ্যৎ ভেবে হয়তোবা ভয়ও পেতেন। ভাবনার শেষে ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে সস্নেহে কাছে ডেকে বলতেন হবে, তোর হবে।

কি হবে সেদিন জিজ্ঞাসা কবতে পারতাম না। ভয় পেতাম।

ভাবতাম দুই আর দুই-এ চার না হয়ে যদি পাঁচ বা ছয় হয়, বেদ অশুদ্ধ হয় কিসে?

আজ আর সে কথা ভাবি না। ভাবতেও নেই। নিয়মেরও নীতি আছে। আছে নামতা। যা তা করে তাকে বরবাদ্ কবা তো যায়ই না, বেসামাল হলে সামাল সামাল ডাক ছাড়তে হয় চারদিক দিয়েই। এই সব কথাই ভাবছিলাম। এলাহাবাদে গাড়ীটা এসে থামলো। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

এখানে নেমে গাড়ী বদল করতে হবে। তাড়া নেই। ধীরে-সুস্থে নেমে এক কাপ চায়েব সন্ধানে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু কোথায চা? চায়ের টিকিটিও দেখা যায় না।

প্রতাপগড়েব গাড়ী আটটায় ছাড়বে। এখন চারটে পনর। কাজেই পা চালিযে দিলাম ষ্টেশন সংলগ্ন চায়ের দোকানের দিকে। একজন এসে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবেন?

বললাম, আপাততঃ প্রতাপগড়। সেখান থেকে রায়বেরিলী। সেখান থেকে লালগঞ্জ।

আমার বলার ধরণ দেখে সে বেশ খানিকটা হেসে

পরে ১৯৬৪ সালেব ২৪শে জানুয়ারী তারিখে দপ্তরহীন মন্ত্রী হিসাবে পুনরায় মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। এই সময় কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ হইতে পবিত্র কেশ অপহবণের ঘটনায় যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেই সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে শ্রীশাস্ত্রীর দ্বারা সম্ভব হয়।

১৯৬৪ সালে জুন মাসে নেহেরুর স্থানে সংসদে কংগ্রেসের নূতন নেতা নিযুক্ত হন এবং অক্টোবর মাসে কায়বোয় বিশেষ সম্মেলনে যোগদান করেন। ঐ বৎসর তিনি লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে সারা বৎসর শাস্ত্রীজী বিভিন্ন প্রয়োজনে সোভিয়েট রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইংলণ্ড, কানাডা, ব্রহ্মদেশ সফর করেন। লণ্ডনে আয়ুবের সঙ্গে কচ্ছের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তারপরই আগষ্ট মাসে ভারত-পাক যুদ্ধে শাস্ত্রীজির তেজোদৃপ্ত নেতৃত্ব, পাক-ভারত লড়াইয়ে ভারতের মর্য্যাদা রক্ষায় শ্রীশাস্ত্রীজির মধ্যে যে দৃঢ় সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি দেখা যায় তাহা শুধু অনন্যসাধারণ বলিলেই সবটুকু বলা হয় না। তাঁহার ১৯ মাস মন্ত্রীত্বের আমলে সর্ব্বাপেক্ষা তাঁর বড় পরীক্ষাই হইয়াছিল গত সেপ্টেম্বব মাসে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যুগপৎ চীনেব আক্রমণ, হুমকি ও পাকিস্তানের আক্রমণে। শাস্ত্রীজী এই সঙ্কট সময়ে যে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নেহেরুর আমলেও দেখা যায় নাই।

১৯৬৬ সালে ১০ই জানুয়ারী তারিখে তাসখন্দে সপ্তাহব্যাপী আলাপ-আলোচনার সফল উপসংহাব পাক-ভারত শান্তি চুক্তিতে আয়ুবের সঙ্গে স্বাক্ষরদান করেন শাস্ত্রীজী। তারপর ১১ই জানুয়াবী রাত্রি ১-৩২ মিঃ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

উঠলো। বল্লে, ভালই হোল। চলুন আমিও আপনার খানিকটা সঙ্গী হতে পারবো।

আপনি···

হ্যাঁ, আমি, আমি লক্ষ্ণৌ যাব।

লক্ষ্ণৌ তো আপনি থাকেন?

না।

তবে?

স্রেফ ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে।

আপনি?

আমি লালগঞ্জে চাকরী করি।

চাকরী করেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার দেশ কোথায়?

কলকাতা।

তা এদিকে? আপনি তো অনায়াসেই মোগল-সরাই থেকে লক্ষ্ণৌ লাইনে যেতে পারতেন।

তা পারতাম কিন্তু এলাহাবাদটা দেখা হোত না। দেখা হোত না প্রয়াগ-তীর্থের ব্রিজটা।

তা বটে।

আর কোন কথা হোল না। দু'জনাতে গিয়ে চায়ের দোকানে দু' পেয়ালা চা পান করলাম।

গাড়ী ছাড়লো যথাসময়েই। ইতিমধ্যে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি, অনর্গল বকে চলেছি দু'জনেই। বেশ লাগছে। ভ্রমণটা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ফাপামোতে এসে কিন্তু বিভ্রাট ঘটলো।

টিকিট?

বের করে দেখালাম। চেকার অনেকক্ষণ ধরে টিকিটটা দেখলেন। বল্লেন, আপনাকে এ রুটে এলাউ করা হবে না তো। আপনার দেখছি রিটার্ণ টিকিট। আপনার রুট ছিল বেনারস হয়ে। আপনাকে এখন মোগলসরাই থেকে এলাহাবাদ এবং এলাহাবাদ থেকে প্রতাপগড় পর্যন্ত অতিরিক্ত মাশুল দিতে হবে। জরিমানাও।

যদি না দিই—

প্রতাপগড়ে গিয়ে আপনাকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করিয়ে দেব।

চিন্তায় পড়লাম। যে টাকা আছে তা যথেষ্ট নয়। অথচ যে ভদ্রলোক এতক্ষণ আমার সঙ্গী হয়ে এসেছেন তিনি চেকারকে জিজ্ঞাসা করলেন কত লাগবে?

বত্রিশ টাকা ছ' আনা।

বেশ আপনি রসিদ দিন। আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি দেখে সে বল্লে, কেন এত ভাবছেন? টাকাটা আমি ধার হিসাবে দিচ্ছি। আপনি আমাকে পরে দিয়ে দেবেন।

লালগঞ্জে পৌঁছেই ভদ্রলোককে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছি। দুই আর দুই-এ চার হয়েছে ঠিকই। কিন্তু গণিতের সূত্র ধরে যে জীবনের সূত্র সেখানে আর চার হোল না। একটা জিনিষ কিছুতেই শোধ দিতে পারলাম না—যা সূত্রের সীমানার বাইরে।

দ্বার খোলো

কবি পার্থসারথি

দ্বার খোলো, দ্বার খোলো, খোলো খোলো দ্বার,
আর্ত এ মানব কণ্ঠে বাজে হাহাকার।
দুঃখদৈন্য ব্যথা সহে নিখিল মানব
অন্তর মথিত করি লুটিছে বৈভব।
শান্তি নেই, স্বস্তি নেই—শুধু কোলাহল
করাঘাত নিবেদিত। পশুসম বল
মানবে করিছে ক্ষত শয়তানী প্রেমে
সভ্যতার ঘোড়া ছাড়ি' ধ্বংস-বহ্নি হেনে।

সভ্যতার একি গ্লানি! মুখর চঞ্চল
দ্বন্দ্বের কুজ্ঝটি ক্ষুব্ধ জীবন-কমল।
দ্বার খোলো, দ্বার খোলো মুছে যাক গ্লানি
স্বর্গ হোক এ পৃথিবী সত্যরূপ হানি।
তবু দ্বার খোলে নাই—বিবর্ণ আঁধার
দাউ দাউ গ্রাসে আসি' করি ছারখার।

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীর ধ্যান

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র

[বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের লেখক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র D. R. A. P., নক্ষত্ররত্ন, একদা জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদেরও সে-যুগে একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রবর্ত্তকে তাঁর বিজ্ঞান, বিশেষ নক্ষত্রবিষয়ক প্রবন্ধও এক সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানবিদ্ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া লক্ষ্মী ধ্যান সম্বন্ধে যে দীর্ঘ গবেষণা করিয়াছেন তাহারই ফলশ্রুতি এই প্রবন্ধ। রচনাটি আমরা সানন্দে পত্রস্থ করিলাম এবং তিনি যে পত্র দিয়াছেন তাহাও হুবহু এখানে উদ্ধৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন : "সবিনয় নিবেদন, ছয় বৎসরের গবেষণার ফল ও আমার ৮৮ বৎসর বয়সের এই লেখাটি প্রবর্ত্তকে মুদ্রিত হইলে বাধিত হইব। ইহা আমার অনুরোধ বলিয়াও জানিবেন। আমার ঠিকানা মুদ্রিত করিবেন যাহাতে পাঠকগণ মতামত জানাইতে পারেন। আপনাদের মতামতও সম্পাদকীয় মন্তব্যে করিবেন। প্রাপ্তি সংবাদ জানাইবার জন্য একখানা পোষ্টকার্ড পাঠান হইল। ইতি—বিনীত, শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, শ্রীদুর্গাপল্লী, পো: বারাসত, ২৪ পরগণা।"—প্র: স:]

পাশাঙ্কমালিকাম্ভোজ স্বণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাং।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

প্রচলিত ব্যাখ্যা—

শ্যামাচরণ কবিরত্ন কৃত আহ্নিক কৃত্যম্ ১ম খণ্ড নামে একখানি গ্রন্থ আছে, তাহার ১১৫ পৃষ্ঠায় ধ্যানটির নিম্নে লেখা আছে—

"পাশেতি-দক্ষিণে পাশাক্ষমালাভ্যাং,
বামে পদ্মাঙ্কুশাভ্যাং ভূষিতাম্।
বামকরে হেমপদ্ম দক্ষিণ করে বরং দধতি
মাতার্দ্বিভুজামিত্যলঃ।" —রঘুনন্দন।

লক্ষ্মীকে এই রূপে ধ্যান করিবে—"তাঁহার দক্ষিণ ভাগে পাশ অস্ত্র ও জপমালা এবং বামভাগে পদ্ম ও অঙ্কুশ। তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্টা, ত্রিভুবনের মাতা, গৌরবর্ণা সুরূপা ও সকল অলঙ্কারে ভূষিতা; তাঁহার বাম হস্তে স্বর্ণপদ্ম আছে এবং তিনি দক্ষিণ হস্তে বর দান করিতেছেন, সুতরাং দ্বিভুজা।

এই গ্রন্থের অনুসরণে ধ্যানটির প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে। শ্রীগোলকোবিহারী স্মৃতি জ্যোতিঃসাগর, শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্মীর পাঁচালি লেখকগণ সকলেই এই ব্যাখ্যা সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ধ্যানের প্রথম চরণটি অসমাপ্ত, যাম্য সৌম্যয়ো পদের দ্বারা বাক্য শেষ হয় নাই। ইহার পরে দৃশ্যতে, শোভতে, বিদ্যতে, এইরূপ কোন পদ না থাকিলে অর্থ হয় না। বুঝিলাম সকলেই ইহা ধরিয়া লইয়াছেন।

যাম্য পৃথিবীর দক্ষিণ ও সৌম্য উত্তর দিক; যদি বলা হইত তোমার দক্ষিণে ও উত্তরে শোভা পাইতেছে, তাহা হইলে এক প্রকার চলিত। কিন্তু দক্ষিণে ও বামে বলাতেই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। দিক হিসাবে সাম্য দিক বা মেরু অপকৃষ্ট, এখানে দানবগণ বাস করে, সৌম্য দিক বা মেরু উৎকৃষ্ট, এখানে দেবগণ বাস করেন। এ কথাও বলা যায় যে, যম হইতে যাম্য ও সোম হইতে সৌম্যগণের উৎপত্তি। সাধারণ কথাতেও আমরা দক্ষিণ বা যাম্য মেরুকে বলি কুমেরু এবং উত্তর বা সৌম্য মেরুকে বলি সুমেরু। দেহেরও এই প্রকার উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। দেহেরও বাম ভাগ বা হস্ত অপকৃষ্ট, দক্ষিণ ভাগ বা হস্ত উৎকৃষ্ট। অতএব দেবী দেহের যাম্য দিক বা ভাগকে দক্ষিণ ও সৌম্য দিক বা ভাগকে বাম বলা যায় না।

প্রথম চরণে যখন বাক্য শেষ হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে অন্য কোন চরণের পদের সহিত ইহার অন্বয় হইবে, সংস্কৃত কাব্যে ইহা বিরল নহে, রঘুবংশের প্রসিদ্ধ শ্লোক :—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

পাশ, অক্ষমালিকা, অম্ভোজ, স্থণি প্রভৃতি দ্রব্যগুলি হস্তেই থাকে, অন্যান্য দেবদেবীর ধ্যান হইতে ইহা জানা যায়। বিমলার ধ্যানের শেষ চরণ :

"অম্বাং পাশাঙ্কুশেষ্টাভয়বরদকরাং
—চন্দ্রচূড়ং নমামি ॥"

ব্রহ্মার প্রণামমন্ত্রের শেষ চরণ :

"কমণ্ডল্বক্ষমালাস্রুক্-স্রুবহস্তায় তে নমঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান—

৩। শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণপাশাঙ্কুশধরোঽরুণঃ।
বেণুংধামন্ ধৃতদোর্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণঃ দিবাকরে ॥
[অঙ্কুশ ও স্থণি একই প্রকার তাড়নাস্ত্র]

যাম্যসৌম্যয়ো পদটিকে সপ্তমীর দ্বিবচন মনে করিয়া অস্ত্রগুলিকে দেবীর দক্ষিণ ও বামে স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু কোন স্থানে ? স্বতন্ত্র আধারে, দেবীর অঙ্গে অথবা মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে, এ কথা স্বতঃই মনে আসে। পরন্তু যাম্যসৌম্যয়ো পদটি সপ্তমীর দ্বিবচন নহে, ইহা ষষ্ঠীর দ্বিবচন। ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচন একই পদ প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করিতে হয়। সম্বন্ধ কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ হয়। এখানে যাম্যসৌম্যয়ো পদটি করাং পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, করাং পদটি দ্বিতীয়ার বহুবচন, কর্ম্মকারক।

একটি ক্রিয়াপদের দ্বারা অনেকগুলি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যথা :—

"সম্মার্জ্জনীরজোবাতং নিগুস্তি ; নকুলো তথা
রাত্রৌ শাকঞ্চ বিল্বঞ্চ কপিত্থ, বর্জ্জেঽদধি ॥"

তেমনই একটি কর্ম্মপদের দ্বারা অনেকগুলি কর্ম্মপদের দ্বারা অনেকগুলি কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, যথা পূর্ব্বোক্ত বিমলার পদের শেষ চরণ :—

"অম্বাং পাশাঙ্কুশেষ্টাভয়বরদকরাং চন্দ্রচূড়ং নমামি ॥"

'দক্ষিণেন' পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণেন যদি একটি পদ হয় তবে ব্যাখ্যায় দ্বিরুক্তিদোষ ঘটে। কেন না, যাম্যসৌম্যহয়া করাং বলিলে দক্ষিণ হস্তেই বরদান বুঝায়। শুধু তাই নয়, 'দক্ষিণেন' পদের অর্থ যদি দক্ষিণ হস্তে বরদান বুঝায়, অর্থাৎ 'দক্ষিণ করে ন (তৃতীয়ার এক বচন) বরং দধতি' হয় তবে ধ্যানের শেষ চরণে ব্যগ্র পদের পরবর্ত্তী করাং (দ্বিতীয়ার বহুবচন) পদটির কোন স্বার্থকতা থাকে না। এই স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন 'রৌক্মপদ্মব্যগ্র করাং', একটি সমাসবদ্ধ পদ, ইহার অর্থ দেবী স্বর্ণকমলটি হস্তে লইয়া ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছেন, যেমন হাতপাখায় বাতাস করে, কিন্তু ব্যগ্র পদের অর্থ যে ঈষৎ আন্দোলিত করা ইহা আমি কোথাও পাই নাই।

আমার বিশ্বাস 'দক্ষিণেন' পদের শেষ বর্ণ 'ন'-এর পরে একটি ' : ' ছিল, তাহা হইলে পদটি দাঁড়ায় 'দক্ষিণে নঃ'। দক্ষিণে সপ্তমীর এক বচন ও নঃ চতুর্থীর বহুবচন। 'রৌক্মপদ্ম' ঐশ্বর্য্যের প্রতীক, পরন্তু পদ্ম একটি সংখ্যাবাচক পদ, ইহার অর্থ পদ্ম পরিমাণ স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা। কুবেরের ধ্যানে পাই "ধনদায় নমস্তুভং নিধিপদ্মাধিনায় চ"। ধনদায় অর্থে ধনরক্ষক বা ধনাধ্যক্ষ, নিধিপদ্মাধিনায় চ, অর্থে 'পদ্মপরিমাণ ঐশ্বর্য্যের অধিপতিকে। সুতরাং রৌক্মপদ্মও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। পূজার নিয়ম দেবী-প্রতিমা বামে ও দেবপ্রতিমা দক্ষিণে রাখিয়া পূজা করিতে হয়। পরন্তু দানের নিয়ম দাতা পূর্ব্বাস্যে দান করিলে গ্রহীতা উত্তরাস্যে গ্রহণ করিবেন। যথা,—

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা, গ্রহীতাচ উদঙ্মুখঃ
এষ এব বিধির্দ্দানে বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ।"

দেবীকে পূজা-ধ্যান করিবার পরে প্রার্থনা করিয়াছি "দেহি পুত্রং ধনং দেহি, পাহি দেবি নমোস্তুতে" ; তাই তিনি আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যও পুত্রাতে বরদানে আজ্ঞান্বিতা। তিনি দিতেছেন আমরা লইতেছি, সুতরাং তাঁহার দক্ষিণ ভাগেই আমাদের অবস্থান হয়।

পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, একের নিকট হইতে অন্যে হাতে লিখিয়া লইতেন। এই প্রকারে কোন সময়ে 'টি'র লোপ পাইয়াছে। পরে অর্থ করিতে বেগ পাইতে হয় এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া বর্ত্তমান ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে।

ধ্যানের শেষ বর্ণ 'তু'র প্রতি কেহই নজর দেন নাই, অথবা পাদপূরণে মনে করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে, এই তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তু পদটি প্রথম চরণের সহিত শেষ চরণের অন্বয় সূচিত করিতেছে। তু আধিক্যে

প্রয়োগ হয়। ইহার অর্থ অবিবপ্ত, আরও। সকলেই ব্যগ্র, করা, তু পদগুলি এড়াইয়া গিয়াছেন, অথবা ছন্দ মিলের জন্য প্রযুক্ত মনে করিয়াছেন। সকলে আবার 'বামে, ভূষিতাম্, দক্ষিণকরে, প্রভৃতি পদগুলি ধার করিয়াছেন। কিন্তু যে কয়টি পদের দ্বারা ধ্যানটি বিরচিত ঠিক সেই কয়টি পদের দ্বারায় ইহার অন্বয় ও অর্থ হইবে, একটি পদ বাদ যাইবে না, একটি পদ ধার করিতে হইবে না। যথা অন্বয় ;—পাশ অক্ষমালিকা অম্ভোজ স্থণিভিঃ তু দক্ষিণে নঃ রৌক্মপদ্ম চ বরদাং ব্যগ্র যাম্য সৌম্যয়ো করাং গৌরবর্ণাং স্বরূপাং চ সর্ব্বলঙ্কার ভূষিতাং পদ্মাসনস্থাং ত্রৈলোক্য মাতরং শ্রিয়ং ধ্যায়েৎ।

ব্যাখ্যা—বন্ধনরজ্জু জপমালা কমল স্থণি সমূহ আরও দক্ষিণে আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য ও বরদানে উৎসুক বাম ও দক্ষিণ হস্তা গৌববর্ণা স্বরূপা সকল প্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা পদ্মাসনে উপবিষ্টা ত্রিভুবনের জননী লক্ষ্মীকে ধ্যান করিবে। এই ধ্যান অনুসারে দেবী ষড়ভূজা।

ধ্যানের ২য় ও ৩য় চরণে ১টি করিয়া ২টি চ আছে। আমি ২য় চরণের চ টি রৌক্মপদ্মের পরে আনিয়াছি, অপরটি যথাস্থানেই আছে। পদের এই প্রকার স্থান পরিবর্ত্তন সংস্কৃত কাব্যে বিরল নহে।

আলোচনা :—আমাদের দেবদেবী দ্বিভুজা হইতে দশভুজা ও তাঁহাদের বর্ণ বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। শিবের ধ্যানে তিনি চতুর্ভুজ, কিন্তু প্রণাম মন্ত্রে ষড়ভুজ। তাঁহার বর্ণ শুভ্র, রজত গিরির ন্যায়, কিন্তু সিন্দূর বর্ণ ও নীলবর্ণ শিবের ধ্যানও আছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলী ধারী, কিন্তু তিনি অষ্টভুজ। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ বা নব জলধর রূপ, কিন্তু যখন অষ্টভুজ তখন অরুণবর্ণ। যখন তিনি নারায়ণ তখন শঙ্খচক্রধারী দ্বিভুজ এবং হিরন্ময় বপু। যখন বিষ্ণু তখন শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ, বর্ণ নীলিম।

চতুর্ভুজ ও দশভুজা দুর্গার ধ্যান জানা আছে। অষ্টভুজা দুর্গার পূজাও কোন স্থানে দেখিয়াছি ঠিক মনে নাই। তাঁহার বর্ণ কখনও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, কখনও অতসী পুষ্পের ন্যায়। অতসী পুষ্পকে কেহ বলেন নীলাভ স্বর্ণবর্ণ; কেহ বলেন, অতসী কুসুম শ্যামা। অতসী কুসুমকে কেহ বলেন শোন ফুল, কেহ বলেন অপরাজিতা। সরস্বতী দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা; বর্ণ শুভ্র। কিন্তু তন্ত্রে নীল সরস্বতীর উল্লেখ আছে। লক্ষ্মী দ্বিভুজা হইতে ষড়ভুজা সাধারণতঃ চিত্র পটে দেখা যায়। সঙ্গীতে আছে, "এস সোনার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে।" আর একটি সঙ্গীতে আছে "এক হাতে তব সোনার কমল অন্য হাতে শোভে ধান্য।" চিত্রপটের লক্ষ্মীর বাম কক্ষে ঐশ্বর্য্যের ঝাঁপি বামভূজে আবেষ্টিত, দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ ধানের শীষ।

পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে যে মহানবীর মন্দির আছে, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা। উপরের দুই হাতে দুইটী কমল ও নীচের বাম হাতে অভয় মুদ্রা ও দক্ষিণ হাতে বর মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন।

আলোচ্য ধ্যানের দেবী যদি ষড়ভুজা হন তাহাতে আপত্য কি? কোন কোন পদ বাদ দিয়া ও কোন কোন পদ ধার করিয়া কষ্ট কল্পনা দ্বারা যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তদপেক্ষা যে কয়টি পদের দ্বারা ধ্যানটি বিরচিত ঠিক সেই কয়টি পদের দ্বারা সহজ ও সরল ব্যাখ্যা ভাল নয় কি? কেবল একটি ':' বিসর্গের বিতর্ক মাত্র।

নিম্নের শ্লোকটির ৩য় ও ৪র্থ চরণের পদবিন্যাস লক্ষণীয় :—

ধন্বন্তরি—ক্ষপণকামর সিংহশঙ্কু-
বেতালভট্ট—ঘটকর্পর—কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

আমি আমার এই লেখাটি পণ্ডিতজন সমক্ষে উত্থাপিত করিতে চাই। তাঁহাদের বিচারে যাহা সাব্যস্ত হইবে তাহা আমাকে জানাইলে আমি বাধিত হইব।

অক্ষয়-স্মৃতি

শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত

বহুল প্রচারিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার গত ৫ই জানুয়ারী সংখ্যায় শোক-সংবাদ স্তম্ভের সর্ব্বনিম্ন স্থানে অতীব ক্ষুদ্রাক্ষরে লিখিত ৬½ লাইনের একটি সংবাদ :

"পরম ভাগবৎ শ্রীমৎ অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গোরক্ষপুর গুরুধামে ১লা জানুয়ারী সকালে ৭৬ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মহারাণা প্রতাপ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বহু হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী বইয়ের রচয়িতা।"

সংবাদ প্রকাশের এই কার্পণ্য-কুণ্ঠার উপর তীব্র বিক্ষুব্ধতা জাগ্রত হইলেও, সংবাদটির প্রভাব অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। এই মহতের সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর প্রায় প্রতিদিনই সাক্ষাৎ সান্নিধ্য হইয়াছে। স্নেহের পবিত্র পরশ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। জীবনের গতি পথে সুনির্দ্দেশ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। হতাশায় নিরাশায় যোগীসুলভ সৎ ও অব্যর্থ পথনির্দ্দেশক উপদেশ পাইয়া কর্ম্মপন্থা নির্ণয়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি। মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদটি চোখে পড়িবামাত্র অতীতের সেই বিলীয়মান মধুর স্মৃতি চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিল।

মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন উত্তেজনায় তখন দেশের আবহাওয়া সরগরম। সংগঠনব্রতী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই ভাঙ্গার ডামাডোলের মধ্যে সৃজনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ময়মনসিংহ-মেলান্দহ গ্রামে সঙ্ঘকেন্দ্র স্থাপনের গুরু দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত। শ্রীগুরুর প্রাণপ্রিয় গৃহী শিষ্য যোগেন্দ্রকিশোর লোহের সহযোগিতায় মেলান্দহ আশ্রম ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাবলম্বনের উপায়স্বরূপ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ক্ষেত্রও গড়িয়া উঠিতেছে। এমনি সময়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ (২৫-এ জুন, ১৯২৫) সংবাদ। যথাবিধি জাতীয় শোক পালনান্তে আশ্রমে স্মৃতিসভার আয়োজন হইল। যোগ্য সভানায়কের সন্ধানে ময়মনসিংহ সহরে 'বার লাইব্রেরী'তে উপস্থিত হইলাম। একবাক্যে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল আচার্য্য অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম—মহাযোগী গম্ভীরনাথের যোগ্য শিষ্য ও আনন্দমোহন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের সিনিয়র অধ্যাপক।

পরদিন প্রভাতেই এই মহতের বাসস্থানে গিয়া হাজির হইলাম। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এক বিধবা মহিলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। বলিলেন, "আসুন, দাদা পূজা করিয়া এখনই আসিবেন, আপনি এই চেয়ারটাতে অপেক্ষা করুন।"

চেয়ার আগাইয়া দিলেন। আমিও বসিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষার পর যিনি বাহির হইয়া আসিলেন তাঁহাকে মনে হইল মর্ত্ত্যের লোক নহেন। সুগোল সুঠাম দেহ, শ্যামসুন্দর কান্তি, স্বল্পাবরণে নিম্ন দেহভাগ আবৃত। অনাবৃত দেহ। দক্ষিণ বাহু বেষ্টন করিয়া প্রলম্বিত যজ্ঞসূত্র। কপালে, উভয় স্কন্ধে, বুকে চন্দন তিলক সুশোভিত, মস্তকোপরি প্রসাদী পুষ্প বিরাজিত, মুক্তা ফলকের ন্যায় বিকশিত দন্তরাজি, মৃদুমধুর হাস্য ওষ্ঠপুটে। ধীর মন্থর গতিপরায়ণ এক দীপ্তিমান শ্যামকান্তি পুরুষ।

এই প্রথম দর্শন। দর্শনমাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলাম। কি করিব, কি বলিব বুঝিতে পারিলাম না। নিজেই অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিলেন। আপনাপনি মাথা নত হইয়া আসিল। চরণ ছুঁইতে চেষ্টা করিতেই পশ্চাতে সরিয়া হাত নামাইয়া আমাকে ধরিলেন। বলিলেন, করেন কি? আপনি যে ব্রহ্মচারী—শ্রীমতিলালের মন্ত্রপূত শিষ্য। মেলেন্দা আশ্রমের সম্পাদক নির্ম্মলবাবুই তো আপনি? বসুন, আগে ঠাকুরের প্রসাদ নিন, তারপর কথা হবে। আমি নির্ব্বাক, হতভম্ব, কেবল অনুভূত হইতেছে কোন্ অজানা দেশের সংবাদ নিয়াই এই মহাপুরুষ যেন আমাকে প্রেমামৃত আস্বাদনে ধন্য করিতেছেন।

ক্ষণপরেই দুইটি রেখাবিভরা প্রসাদ আসিল। বলিলেন, গ্রহণ করুন।

প্রসাদ নিবার অবসরে আমার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাকে বলিলাম। তিনি তাঁহার সিদ্ধসম্পদ মধুর হাস্যে বলিলেন, এতো আমার সৌভাগ্য। সভার সভাপতি হওয়ার চেয়ে বড় সুযোগ এবং সৌভাগ্য হইতেছে বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী শ্রীমতিলালেব দেশগঠনেব একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাধনপীঠ দেখাব সুযোগ পাইব। আমি অবশ্যই যাইব—কিন্তু আপনি নিজেই আসিবেন। এক সঙ্গেই যাইব।

এক নবানুভূতির স্পর্শ নিয়া আশ্রমে ফিরিলাম।

নিরূপিত দিনে সভার সুসজ্জিত আয়োজন হইয়াছে। ময়মনসিংহ, জামালপুর এবং আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী দশ মাইল হইতে এই মহতের গুণমুগ্ধ, প্রীতিধন্য প্রাক্তন ছাত্র ও সুধী সমাগমে আশ্রম প্রাঙ্গণে ও মণ্ডপে তিল ধাবণের স্থান রহিল না। অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু সভাপতি দেশবন্ধুকে রাষ্ট্রনেতাব শ্রেষ্ঠ আসনে না বসাইয়া স্থান দিলেন কর্ম্মযোগীর গৌরবোজ্জ্বল আসনে।

এই সুযোগে তিনি পরিবেশন করিলেন "ত্রয়ী কৃষ্ণের" মধুর লীলাব অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। দিব্য ভাবের আবেশ সভাক্ষেত্রে নামিল। প্রায় দুই ঘণ্টা একটানা ভাষণের পব এই দেবপুরুষ থামিলেন। সভা সমাপ্ত হইল। প্রায় দুই সহস্র লোক ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে সভক্তি বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাইল।

১৯২৫ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত একাদশ বর্ষ বহু সন্ধ্যায়ই তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে। তাঁর যোগতত্ত্বালোচনায় অনুভূত হইত যেন কোন ঋষি ভগবানের কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধির জন্য মর্ত্ত্য-দেহ ধারণ করিয়াছেন।

তারপর ১৯৩৭ সালের কথা। ময়মনসিংহ সহরে ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্র স্থাপন করার আদেশ আসিল সঙ্ঘ-গুরুর নিকট হইতে। প্রমাদ গণিলাম। গুরুর আদেশ, উপায় নাই। এক খণ্ড বস্ত্র ও এক টাকা সম্বল কবিয়া মেলান্দহের সাজানো আশ্রম ত্যাগ করিলাম।

ময়মনসিংহ সহবে পৌঁছিলাম—নিরাশ্রয়, রিক্ত, সম্বলহীন। একটি ভগ্ন পরিত্যক্ত টিনের দোচালায় রাত্রি যাপন করিলাম। সঙ্গে শ্রীমান সুধাংশু ব্যানার্জ্জি। তাকে গ্র্যাজুয়েট করিয়া ভবিষ্যতে নূতন আশ্রমে শিক্ষা-ক্ষেত্র রচনার ইচ্ছা। পরের দিন ভোরেই আচার্য্য অক্ষয়কুমারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মাত্র পূজা সাবিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়াছেন। আমাদিগকে দূব হইতে দেখিয়াই বাহির হইয়া আসিলেন। অপার্থিব হাসিতে আহ্বান করিলেন, 'আসুন নির্ম্মলবাবু, আসুন—আজ আমার সৌভাগ্য—প্রথম প্রভাতেই একজন ব্রহ্মচারীর দর্শন পাইলাম।' প্রণাম করিলাম। কুশলাদি প্রশ্নের পর প্রসাদ গ্রহণ। তারপব স্থিরভাবে সব শুনিলেন। খানিকটা নীরব রহিলেন। তারপর প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'বেশ ভালই হইয়াছে। ভগবদ্ ইচ্ছা। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ঢাকা বিভাগীয় প্রধান কেন্দ্র এই নগবেই হওয়া উচিৎ। সঙ্ঘগুরুর দর্শন অমোঘ অব্যর্থ। তবে আপাততঃ একটু আশ্রয় ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা চাই। আজ আমাব এখানেই আহার ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। তারপব দেখা যাক, ঠাকুরেব কি ইচ্ছা।'

পরম ভক্তের কথা ঠাকুর শুনিলেন। শ্রীমান সুধাংশুর বিনা বেতনে কলেজে পড়ার এবং এক জমিদার বাড়ী থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমাবও ময়মনসিংহে স্থিতির ব্যবস্থা তাঁরই আগ্রহ-উদ্যোগে হইল। ঐদিন তাঁর ক্লাশ ছিল না। সারা দিন কত কথা! আশ্রমেব পবিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মের ছক। নিজের কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, ফরিদপুরে জন্ম, মাষ্টার হইয়া চট্টগ্রাম, তাবপর গত ১৫।১৬ বৎসর ময়মনসিংহে। বলিলেন, চট্টলের বঙ্কিমচন্দ্র (বর্ত্তমান চট্টল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকেন্দ্রের সভাপতি) আমার প্রিয় ছাত্র।

মুক্তাগাছা প্রভৃতি বহু জমিদারদের সঙ্গে আচার্য্যদেব ময়মনসিংহে সঙ্ঘকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় আলাপ আলোচনা কবেন এবং আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেন্দ্র কলেজেও মাঝে মাঝে যাবার জন্য আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন।

ইহাব দুই বৎসব পরে সঙ্ঘগুরুজীর পদার্পণ হয় ময়মনসিংহ সহবে। আচার্য্য অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যাযেব সভাপতিত্বে ও রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-সমন্বয় সভায় সঙ্ঘগুরুজী ও আচার্য্যদেবের মধ্যে

প্রথম পরিচয় ঘটে। তৎপর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই দুই মহতের অন্তর্লোকে ভাব বিনিময় ফল্গুধারার মত প্রবাহিত থাকে। এই সময় হইতে মাসিক প্রবর্ত্তকেও আচার্য্যদেবের সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে।

সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর লেখকের ময়মনসিংহ কর্ম্ম-জীবনের কাল। তন্মধ্যে ত্রিশ বৎসর বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষা, ধর্ম্ম, অর্থ, জনসেবামূলক বিভিন্ন ক্ষেত্র রচনার বিভিন্ন পর্য্যায়ে, সুখে দুঃখে, সংঘাতে এবং স্থিতিতে, উৎসবে, জয়ে ও পরাজয়ে, রাজদ্বারে, শ্মশানে এই মহতের যে আন্তরিক সাহচর্য্য পাইয়াছি তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। রাজদ্বারে-শ্মশানে উল্লেখও উচ্ছ্বাস নহে। একবার আশ্রমের বিরুদ্ধে জনৈক প্রতাপশালী জমিদারের অন্যায় মামলায় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে সঙ্ঘের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠা করেন নাই। আর একবার সঙ্ঘের স্বামী নির্ম্মলানন্দের অবাঞ্ছিত মৃত্যুতে আচার্য্যদেব শ্মশানে শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করেন।

ময়মনসিংহ বাসের সময় আর একটি পরম সৌভাগ্য হয় ব্রহ্মবাদী বেদান্তসিদ্ধ সাধক শান্তিনাথের সহিত পরিচয়। ইনি আচার্য্যদেবের গুরুভ্রাতা ছিলেন এবং আচার্য্যদেবই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দেন সম্ভবতঃ শক্তি সঞ্চার উদ্দেশ্যে। শান্তিনাথ গোরক্ষ সম্প্রদায়ের একজন নামকরা চিন্তাশীল সাধক। শান্তি-নাথের রচিত (বাংলায়) 'Sadhana' ও 'Analytical criticism of the philosophy of Religion' বইয়ের জটিল তত্ত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া যখন উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইত তখন আমি প্রায়ই উপস্থিত থাকিতাম ও উপকৃত হইতাম। আচার্য্যদেব পরে এই দুইখানি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

সঙ্ঘগুরুজী বিভিন্ন ব্যাপারে নয়বার ময়মনসিং কেন্দ্র ও মেলেন্দা শাখা পরিদর্শনে গিয়াছেন। তাঁহার তথায় স্থিতিকালে আচার্য্যদেব কলেজের কাজে ছুটি নিয়া প্রায়ই কেবল রাত্রি নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্ব্বদা সঙ্ঘ-গুরুজীর সান্নিধ্যেই থাকিতেন। উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া যখন উপস্থিত আভিজাত্যপূর্ণ জনতার সঙ্গে আলোচনা করিতেন তখন সকলেই অনুভব করিত হরি-হরের আবির্ভাব হইয়াছে। অধম লেখকের স্মৃতিপটে যখন এইসব ছবি ফুটিয়া উঠে তখন আত্মহারা হইয়া যাই।

১৯৫৪ সালে ময়মনসিং সহরে আচার্য্য অক্ষয়কুমারের বিদায় সম্বর্দ্ধনা এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। অগণিত সর্ব্ব পর্য্যায়ের জনসমাবেশ। দুর্গাবাড়ীতে সমবেত সকলেই বিচ্ছেদবিরহে আকুল। আমি আচার্য্যদেবের পাশেই বসিয়াছি—তিনিই সস্নেহে ডাকিয়া কাছে বসাইয়াছেন। বিদায় সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিতে উঠিয়া তিনি যে ভাষণ দিলেন তাহাতে জনতা সশব্দে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। জনপ্রিয়তার নিদর্শনরূপে এখনও ময়মনসিংহ সহরে আচার্য্যদেবের কীর্ত্তি জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। ভাষণ সমাপ্তিতে বলিলেন—(আমাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া) "আপনাদের নিকট আমার শেষ অনুরোধ—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের এই সুযোগ্য সন্তানের জীবন-মন্থন করিয়াই সম্পূর্ণ শূন্য হইতে সঙ্ঘের মন্দির, শিক্ষা-কেন্দ্র, অর্থক্ষেত্র ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। আপনারা যাহা দেখিতেছেন তাহা সঙ্ঘেরই আদর্শপূত সিদ্ধ ক্ষেত্র। প্রত্যক্ষ সহায়তা করিতে সক্ষম যদি নাও হন, আপনারা বর্ত্তমান পাকিস্তান পারিপার্শ্বিকতায় কোনও হিন্দু ইহার বিরোধিতা করিয়া হিন্দুর এই ভরসাস্থলটির ক্রমোন্নতির ব্যাহত করিবেন না।

সভান্তে বাসায় গেলাম তাঁহার সঙ্গে—অশ্রুজলে বিদায় নিলাম। বুকে টানিয়া বলিলেন, 'গোরক্ষপুর থাকিব। ওদিকে গেলে দেখা করিবেন।' প্রাণের ব্যথা ও মর্ম্মপীড়া নিয়া তাঁহার স্ত্রী, ভগ্নী ও আচার্য্যদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল যেন এক দুর্লভপ্রাপ্তধন হারাইলাম।

১৯৬৩ সালে পাকিস্তান ছাড়িয়া (তাঁহারই সমর্থনে) মূল সঙ্ঘকেন্দ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছি। ইতিমধ্যে সঙ্ঘগুরুও দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬৩ সালে

একবার এবং ১৯৬৪ সালে শেষবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ব্যারাকপুর 'রামগোপালপুর লজে'। শেষবার সঙ্গে ছিলেন রমণভাই (প্রবর্ত্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী)।

শেষ সাক্ষাতের সময় বলিলেন—পাকিস্তান ছাড়িয়া ভালই করিয়াছেন। পাকিস্তানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই অমূল্য জীবন অপচয় করার কোনই অর্থ হয় না।

সেই অমৃতময় মধুর হাসি, কম্বুকণ্ঠ-নিঃসৃত অমিয় বাণী।

প্রশ্ন করিলেন, এখন এখানে কি করিবেন?

বলিলাম আমার বক্তব্য।

একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আপনারা কয়েকজন প্রধান সাধক এখন শ্রীগুরুর অভিপ্রেতে যোগ-প্রতিষ্ঠ হইয়া শান্ত হন, নতুবা অর্থক্ষেত্রও বিপন্ন হইতে পারে। যোগসত্তাকে ধারণ করিতে না পারিলে সঙ্ঘের স্রষ্টাপুরুষের কল্পস্বপ্ন রক্ষা হবে না।"

আচার্য্যদেব আরও বলিলেন, "আমরা যে সঙ্ঘ-গুরুজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি তাহা তাঁহার অর্থসিদ্ধির জন্য নহে, দেশকর্ম্মের বিভূতির আকর্ষণেও নহে, আকৃষ্ট হইয়াছি এই বিরাট পুরুষের যোগসিদ্ধ জীবনের চুম্বক আকর্ষণে। সেই সিদ্ধির পারম্পর্য্য যদি পরবর্ত্তীরা রক্ষা করে না যেতে পারেন, সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ বিঘ্নিত হতে পারে।"

নীরবেই মর্ম্ম দিয়া তাঁর দরদপূর্ণ সতর্ক বাণী শুনিলাম। তারপর প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

কালের করাল হস্ত এই যোগিরাজকেও রেহাই দেয় নাই। মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্ব সুনিশ্চিত একজন সত্যদর্শী আলোকদিশারীকে হারাইল।

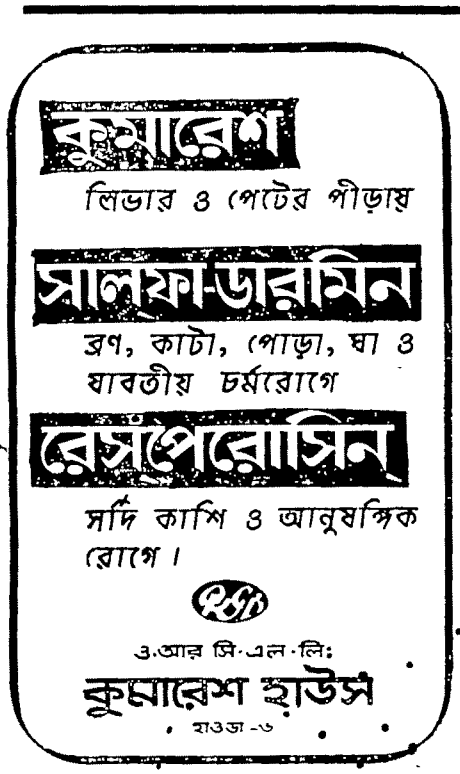

অন্তঃস্রোত

শ্রীঅজিত দাশ

বান্ধবী সুজাতার চিঠি এসেছে নীল খামে। অনেক ইঙ্গিতময় কথাবার্তাই লিখেছে সে তার চিঠিতে। অনুকূল আবহাওয়ার পত্র বলা যায়।

এর জবাব দিতে স্বভাবতঃই তৎপর হয়ে উঠল সম্বিৎ। এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে তার বাবা-মার কাছে ফিরে এসেছে সে মফস্বলে। পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় আছে। এবং বলা বাহুল্য, অনেক সুদূর প্রসারী স্বপ্নের পথেই পাড়ি দিচ্ছে দিন রাত্রি। তার ভিতর সুজাতার চিন্তা একটি।

সুজাতাও এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। এইবার পরস্পরের ভালোবাসার পরিণতি দেখা দেবে। আব্-হাওয়া নিশ্চয়ই অনুকূল।

সুজাতাকে তার চিঠির একটি সুদীর্ঘ জবাব দিতে হবে।

চিঠিটা সারা দুপুর বসে লিখে ফেলল সম্বিৎ। তারপর বিকাল হবার একটু আগেই পাজামার ওপর পাঞ্জাবীটা চাপিয়ে দিয়ে, চটিটা পরে পথে নেমে এলো। পকেটে পনরটা পয়সা। উদ্দেশ্য ডাকঘরে গিয়ে একখানা ডাক-টিকিট কিনবে তারপর সাদা খামের ওপর টিকিটটা লাগিয়ে টুপ করে ফেলে দেবে ডাকবাক্সে। সাদা খামেই বরাবর চিঠি দিয়ে থাকে সম্বিৎ। নীল খামে চিঠি দেবে মেয়েরা। পুরুষ দেবে সাদা খামে তার জবাব। সম্বিৎ-এর এই মত। এই মানসিকতা নিয়েই সে কাজ করে এসেছে এতাবৎ।

সাদা খামখানা হাতে নিয়ে সে ডাকঘরের সীমানার মাঝখানে এসে পৌঁছল। কিছু অন্যমনস্ক ভাব। হাঁটতে হাঁটতে ডাকবাক্সটার কাছে এসে পৌঁচেছে তখন, বুঝি ডাকবাক্সর দিকে তাকিয়ে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ঠিক সেই সময় পাশ থেকে একজন বললে, জানেন, এসব দেখলেও মন খারাপ হয়ে যায়। তাকানই ঠিক নয়।

সম্বিৎ তখনও অন্যমনস্ক।

লোকটি আবার বলল, তাই না বলুন?

এ্যাঁ—হঠাৎ যেন খেয়াল হোল সম্বিৎ-এর। তাকাল পাশের দিকে। এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। ডাকঘরের কর্মচারী। খাকী থলি নিয়ে ডাকবাক্স থেকে চিঠি বার করতে এসেছে বোধহয়। সম্বিৎকে তাকাতে দেখে আবার বলল, আমি ওইটার কথা বলছিলাম। লোকটি আঙুল দিয়ে পিছন দিকে একটি সাময়িক তোলা চালা দেখাল।

রথের মেলা উপলক্ষে কোন এক নার্সারী থেকে ফুল ফলের গাছের চারা বিক্রীর ব্যবস্থা হয়েছে ওখানে।

লোকটি বলল, ওটা দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে খুব। এদিকে আসতেই ইচ্ছে করছে না। ওসব দেখে কি করে? জমি জমা থাকলে ত ওসব কিনব, দেখর? আর কি ভিটে মাটি হবে? যা ছিল, সব—জমি জমা—কতো ফলন্ত গাছপালা—সব রেখে, ফেলে পালিয়ে এসে এখন এই হাল। ভাড়াটে বাড়ি। দশ-বিশ টাকায় কি বাড়িই বা হবে বলুন! একখানা ঘর—ছাপরা—তার না আছে উঠোন, না একচিলতে মাটি, কোন মতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা—দিনের বেলা সেদিকে তাকালেও কান্না পায়—কি যে হোল—কি হিন্দুস্থান পাকিস্তানই হোল, মরতে মরলাম আমরা! এখন জানেন—ওই গাছপালা বিক্রীর টোঙটার দিকে তাকালেই কেমন করে উঠছে বুকের মধ্যটা। গাছ বিক্রী করছে, কিন্তু আমরা ফেলে এলাম সেগুলো—

লোকটির কথাগুলোর মধ্যেই যেন বেদনা, কান্না ঝরে পড়ছিল। তার চেয়েও বেশি করে প্রকাশ পেয়েছিল বোধহয় বঞ্চনার সত্য।

সম্বিৎও তখন চলে গেছে তার শৈশবে। তার ফেলে আসা পিতৃগৃহে। এবং তার চিন্তাও কয়েকবার আছড়ে পড়ল তার পিতার ওই ভাড়াটে বাড়িটায়। সেখানে শুধুই সিমেন্ট বাঁধান চত্বর আর ইমারত। এখনও কোন জমি বা বসত বাড়ি নিজস্ব বলতে কিছুই করে উঠতে পারেনি তারাও।

লোকটির দিকে তাকিয়ে একবার হাসল সম্বিৎ।

বলুন, কোথায় বাড়ি ছিল ?

ফরিদপুর। আপনার দেশ এইখানেই নাকি বাবু ?

না। আমার বাড়ি ছিল কুষ্টিয়া।

ও। তাহলে আপনারও গিয়েছে। তাহলে আপনিও বুঝবেন। বলুন, আমি সত্যি বলছি কিনা ? সেকথা কি ভোলা যায় ? সেই সুখ, সেই সব গাছপালা, বাড়ি, সেই নদীনালা-খালবিল—দেদার মাঠ, যা খুশী কর।

সম্বিৎ আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না। সেই ছোট্ট শিশু জীবনে ফিরে গেছে আবার। সেই অতীত জীবনে।

পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বার করে এগিয়ে দিল লোকটির দিকে। চলে ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ,—তা—

কিন্তু দেশলাই—

দাঁড়ান, দেখছি—ওই তো ওই দোকানটা থেকে—লোকটি তার কাজ ফেলে খাকী ব্যাগ হাতে ছুটল ডাকঘরের সীমানার বাইরের এক পান বিড়ির দোকানের দিকে। সম্বিৎও কেমন যেন যন্ত্রচালিতের মত চলল তার পিছনে। সেখানে গিয়ে সিগ্রেট ধরাল দুজনে। ধোঁয়া ছেড়ে লোকটি বলল, যাই বলুন বাবু, আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে দেশের কথা। গাছপালা দেখলেই মনটা কেমন হয়ে যায়—

সম্বিৎ বলল, আসুন একটু চা খাই।

আবার চা !

তা হোক।

আমাকে আবার চিঠি নিতে হবে বাক্স থেকে।

নেবেন 'খন।

ডানপাশেই একটি ঝাঁকড়া চারা বকুল গাছতলায় চা-এর দোকান। সামনে বেঞ্চি পাতা। সেই বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসল সম্বিৎ। তার পাশে গিয়ে বসল লোকটি। সম্বিৎ বলল, দুটো চা দেখি—

লোকটি এবার আর কোন কথা বলল না। চুপচাপ বসে থাকল সম্বিৎ-এর পাশে। বসে বসে সিগ্রেট টানতে লাগল। তারপর চা এলে হাত পেতে নিল। চা-এ চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল, আপনি এখানে কোথায় থাকেন ? সম্বিৎ বলল।

আপনি চাকরী করেন ?

না।

পড়েন ?

এবার পরীক্ষা দিয়েছি।

কি পরীক্ষা ?

এম. এ.।

লোকটি এবার কেমন সঙ্কুচিত হোল।

দেখুন দিকি, এতো খুব অন্যায় হোল। সিগ্রেট, আবার চা—মানে, আমাকে কেন খামকা—

খেয়ে নিন।

সম্বিৎ হাসল একটু।

তারপর পকেট থেকে সেই পনরটা পয়সা দোকানদারের হাতে তুলে দিয়ে চায়ের দাম চুকিয়ে দিল। এবং তারপরই চায়ের শূন্য ভাঁড়টা মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আচ্ছা চলি।

আবার বাড়ির দিকে ফিরে চলল সম্বিৎ।

ডাকঘরের লোকটি অবাক হয়ে তাকাল একবার। ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা।

বাড়ি ফেরার পথে সম্বিৎও ভেবে পায় না। কি হোল ব্যাপারটা ! সে কী পাগল হোয়েছিল।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহারের
সদ্য প্রকাশিত
কর্ণ-কুন্তী
বাংলা কাব্যসাহিত্যে
অভিনব সংযোজন।
মূল্য ২·৭৫ পঃ
পুরাণ-কাহিনীর বলিষ্ঠ উপস্থাপন।
নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। উপহারযোগ্য।
পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী : কলিঃ-৭

POLYTHENE PIPES
• Light Flexible
• Non-Corrosive
• Acid Proof
P.V.C. PIPES.
"SANKHA" COMBS
• Durable
• Comfortable
• Econamic
Purnima TOOTH BRUSH
JESSORE COMB INDUSTRY CO.
ESTD.1930 • CALCUTTA-9 • POST BOX NO-10813

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

ছোট কথা :

সাধনার পথে অনেকগুলি বিঘ্ন আছে। সংসারে দুঃখ অনেক। এই দুঃখকে অতিক্রম করার সহস্র চেষ্টার ব্যর্থতায় আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াই বলীবর্দ্দের মত সংসারের গুরুভার বহন করিয়া বিচরণ করি। এক বিপদ অতিক্রান্ত হইলেই অন্য বিপদ আসিয়া পড়ে, ফলে এ সংসারে দুঃখের অভাব হয় না। সাধক দুঃখের আক্রমণে বিচলিত হয় না—তাহাকে মাথায় করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হয়। জ্ঞানের যাদুমন্ত্রে উহাকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলে। দুঃখ তখন সাধকের পদতলে পড়িয়া থাকে।

চিত্ত অবিমল বলিয়া জীবের অহংকার আছে। সে নিজের সুখে যতটা সুখী, নিজের দুঃখে যতটা দুঃখী অপরের সুখে দুঃখে সেইরূপ বোধ করিতে পারে না। সাধক জ্ঞানচক্ষে দেখেন 'মা বিরাজে সর্ব্বঘটে'। সেইজন্য জীবের সুখদুঃখ নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রতিবাসী ধনবান হইলে ঈর্ষানলে জ্বলিয়া মরেন না। আবার দেশবাসীর কষ্ট লাঞ্ছনা নির্য্যাতন দেখিয়া তিনি আপনার বুকেই আঘাত পড়িতেছে অনুভব করেন—নিজের সুখে নিরাপদে আছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত উদাসীন চিত্তে কালযাপন করিতে পারেন না।

বদ্ধ জীব সহস্র পাপে লিপ্ত তত্রাচ অন্য কোনও নামজাদা পাপীকে দেখিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে। সাধক পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে না—পুণ্যকর্ম্ম করিবার যাহার প্রবৃত্তি আছে তাহার প্রতি অবিচলিত প্রেমপ্রদর্শনপূর্ব্বক বরং তাহার কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

দেশের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইলেই বুঝিবে চিত্ত নির্ম্মল হইতেছে—ভগবানের প্রিয় সন্তান হইতে তোমার আর বিলম্ব নাই। দেশ যখন অন্নকষ্ট, রোগযন্ত্রণায় বিপদের দারুণ বোঝা বহিয়া ক্লিষ্ট বিপর্য্যস্ত তাহার জন্য নীরবে অশ্রুপাত করিও—তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও—তাহার সহায়তা করিতে প্রাণপণ করিয়া ছুটিয়া যাইও। আবার দেশ যখন ধনে-জনে-গৌরবে হাস্যময়ী, আনন্দময়ী, উৎসাহময়ী হইবেন—তখন হাস্যে, আনন্দে, উৎসাহে নিজের অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিও। এযুগে ইহাই ধর্ম্মসাধনার সহজ পথ। এইরূপ চরিত্রের মানুষই যোগসাধনার অধিকারী। বঙ্গের ইহারাই সুসন্তান। আমরা ইহাদিগকেই আহ্বান করিতেছি।

"অয়ি ভুবনমনমোহিনী"

রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী'র মধ্যে কুরুচির সন্ধান পাইয়া প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীঅমরেন্দ্র রায় সাহিত্য পত্রিকায় এক সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেন। ইহারই প্রতিবাদে "রুচি" নাম দিয়া প্রবর্ত্তকে এক ক্ষুদ্র লেখা বাহির হয়। প্রবর্ত্তকের লেখাটির প্রতিবাদে "অর্ঘ্য" পত্রিকায় শ্রীঅমরেন্দ্র রায়কে সমর্থন করিয়া স্বয়ং সম্পাদক, এক প্রবন্ধে প্রবর্ত্তকের লেখককে অবুঝ, অনার্য্য মূর্খ প্রভৃতি বিশেষণে সম্মানিত করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই প্রকার অতিমাত্র পক্ষপাতিত্ব মঙ্গলজনক নহে। প্রতিবাদমূলক ('আর্য্য' পত্রিকার) প্রবন্ধটির নাম "অয়ি ভুবনমনমোহিনী"।

লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনে এমন একটি উৎকট অহঙ্কার খাড়া হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ তাহার দুইটি চক্ষের দর্শন ভিন্ন আর কিছু দেখতে চায় না—দীর্ঘ. দীর্ঘ প্রবন্ধের নিম্নে নামজাদা সাহিত্যিকের নাম দেখিয়াই আজকাল লেখার আদর হইয়া থাকে। বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের মধ্যে দূরদৃষ্টির অভাব দেখিয়া আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

জগন্মাতাকে যদিও ভুবনমনমোহিনী বলা যায়, দেশমাতাকে কিছুতেই তাহা বলা যায় না—এ কথা স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের। তিনি এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। "যাহারা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া অজ্ঞান হয় তাদের মস্তিষ্ক বলিয়া জিনিষই নাই"—তা আমরা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া অজ্ঞান হই আর না হই ইহাই সম্পাদক মহাশয়ের ধারণা। কিন্তু তিনি যে উদাহরণ দিয়াছেন উহা বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী—চৌধুরাণী" হইতে উদ্ধৃত।

সাময়িকী

বীর ভি. ডি. সাভারকরজী :

ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শুধু অন্যতম নয় দুরন্ত সাহসিকতার অগ্রদূত, হিন্দু জাতীয়তাবাদের জ্বলন্ত প্রতীক, বীর ভি. ডি. সাভারকরজী ৮৩ বৎসর বয়সে বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ২৬ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করার পর মুক্তি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু মহাসভার পতাকাতলে ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীকে সংহত করিবার যে অন্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় তাহার সত্যতা ভবিষ্যৎ প্রমাণ করিবে।

সাভারকার বাল্যকাল হইতেই বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া পরিণত বয়সে বিপ্লবাত্মক সমিতি গঠন করিয়া দেশ-স্বাধীনতার যজ্ঞে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার জীবনের রোমাঞ্চকর বিভিন্ন ঘটনাবলী ইহার সাক্ষ্য দান করে। লণ্ডনে আইনের ছাত্র হিসাবে থাকাকালীন তিনি রাশিয়া, আয়র্লণ্ড, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী নেতাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া ভারতের বিপ্লব কার্যে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেন। তিনি আন্দামানে পোর্টব্লেয়ার কুখ্যাত কারাগারে দীর্ঘদিন অন্তরীন থাকার পর ১৯২৪ সালে ৬ই জানুয়ারী মুক্তি লাভ করেন। বৃটিশ রাজের নিকট একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি ছিলেন বীর সাভারকর।

বীর বিপ্লবী সাভারকরের রোমাঞ্চকর শৌর্য্যবীর্য্যের অমর কাহিনী ভারত-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিয়া আগামীকালের প্রেরণা উৎস হইবে। এ জীবনকাহিনী প্রতিটি স্কুলে পাঠ্য হইবার উপযোগী ক্ষাত্রবীর্য্য ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার সমুজ্জ্বল বিগ্রহ ছিলেন বীর সাভারকার।

প্রবাসী কবি ও সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র :

ভাগলপুর নিবাসী প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের ৭৮তম জন্মবার্ষিকী নিবিড় নিষ্ঠার সহিত গত পৌষ সংক্রান্তিতে তাঁর শক্তি কুটীর বাসভবনে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে অপরাহ্নে প্রার্থনা সভার অধিবেশন হয়। কবির ১০ বৎসর বয়স্কা পৌত্রী কুমারী ছায়া সুরেশচন্দ্রের রচিত 'রক্ত জবার পুষ্পিত চরণ' ও 'নমো নমো জন্মভূমি' শীর্ষক কবিতা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে। ডঃ কমলকৃষ্ণ বসু কবির বিখ্যাত 'ভারতজননী' কবিতা ও শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উহার ইংরাজী অনুবাদ আবৃত্তি করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই কবির নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। ঐ দিন রাঁচিতেও স্থানীয় দেবভাষা অনুরাগীদের উদ্যোগে ও অধ্যাপক রামাশীষ উপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় সুরেশচন্দ্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হয়।

রিষড়া প্রেমমন্দির :

বিগত ২১শে পৌষ শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত রিষড়ার প্রেমমন্দিরে শ্রীশ্রী৺অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে

প্রবর্ত্তকের আনাড়ী লেখক দেখাইতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং জগন্মাতাকে নয়, বঙ্গভূমিকে, দেশ-মাতৃকাকে বিশ্ববিমোহিনী বলিয়াছেন। কমলাকান্ত আফিম চড়াইয়া সপ্তমীপূজার দিন প্রতিমা দর্শনে বাহির হইয়া মৃন্ময়ী প্রতিমার মধ্যে দেশমাতৃকার সন্ধান পাইলেন, বলিতেছেন—"আমি সেই কালস্রোতের মধ্যে দেখিলাম ঐ সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা" আর ভক্তিগদগদ চিত্তে বলিতেছেন; "তুমি এই অনন্ত জলদমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর।" এখন জিজ্ঞাসা করি ভুবনমোহিনী এবং বিশ্ববিমোহিনীর মধ্যে পার্থক্য আছে নাকি?

এই সব অসার আলোচনায় প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে আমরা বেদনা অনুভব করি, কিন্তু বাধ্য হইয়া এইটুকু লিখিতে হইল।

"ভুবনমনমোহিনী" এই নামের 'অয়ি ভুবনমন-মোহিনী' গানটি এই পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর প্রাণে ভক্তি রসেরই উদ্রেক করে আনছিল কিন্তু হঠাৎ শোনা যাচ্ছে কোন কোন সমালোচকের অন্তঃকরণে ইহা দুষ্ট রসের সঞ্চার করেছে—মাকে নাকি ভুবনমনমোহিনী বলা চলে না।

ইহাতে কবির অশ্লীলতা আদৌ নাই—এখানে পাঠকেরই হৃদয় নরক। কেবল রবীন্দ্রনাথই দেশ-জননীকে ভুবনমনমোহিনী বলেছেন তা নয়, আধুনিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নীচের লাইনটি লেখার সময়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ তাঁর মনে আসে নাই—"জয় মা, জগন্মোহিনী, জগজ্জননী ভারতবর্ষ।" বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গা, তারা, অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে জগন্মাতাকে সম্বোধন করে সেই সকল রূপের মধ্যেই দেশমাতৃকার রূপ দেখেছিলেন। ধর্ম্মসাধকের হৃদয়ে শ্যামার যে আসন স্বদেশসাধকের কাছেও জন্মভূমির সেই আসন। দু'জনেই প্রাণের আবেগে বিভোর হয়ে বলেছেন—"আমার মায়ের রূপে ভুবন ভোলা।" এমন স্বর্গের আলোয় যে মনের কালো যায় না, সে মন অতি ভয়ঙ্কর মন বলতেই হবে।

শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত

উদ্‌ঘাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় এক ধর্ম্ম-সভায় পৌরোহিত্য করেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ত্রিপাঠী মহাশয়। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক শ্রীহরিদাস দত্ত মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। আশ্রম ঋত্বিক অতিথিবৃন্দকে কয়েকখানি রামনামখচিত রজত পদক প্রদানে সম্মানিত করেন। সন্ধ্যায় দেওঘর রাম নিবাস আশ্রমের শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের পুণ্য উপস্থিতিতে উৎসবের আকর্ষণীয় সমাপ্তি ঘটে।

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

গত ডিসেম্বর মাস হইতে প্রবর্ত্তক প্রেসে দীর্ঘ শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্য পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল। এজন্য আমরা দুঃখিত। পত্রিকার পুনরায় নিয়মিত প্রকাশের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

প্রবর্ত্তক প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং ৯ ও ১০ তারিখে ডাকযোগে প্রেরিত হয়।

বর্ত্তমান চৈত্রে (১৩৭২) প্রবর্ত্তকের সুবর্ণ জয়ন্তী (৫০ বর্ষ) শেষ হইবে। আমরা আশা করিব, প্রবর্ত্তকের সহৃদয় গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহাদের দক্ষিণা এখনও অনাদায়ী আছে তাঁহারা উহা যথাশীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া পত্রিকা-পরিচালন কার্য্যে আনুকূল্য করিবেন। স্বতন্ত্র তাগাদাপত্র দেওয়া হইবে না। যে-সব গ্রাহকের একাধিক বর্ষের চাঁদা বাকী পড়িবে তাঁহাদের নিকট দুঃখের সহিতই আগামী বর্ষে পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হইব। ইতি—

পরিচালক : **প্রবর্ত্তক**

সর্বজন প্রশংসিত বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : [ফোন ৩৩-২৩০৩]

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি]

বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি রুচিসম্মত কাপড়ের বিপুল সম্ভার। আধুনিক ডিজাইনের দেশী তাঁতের শাড়ী। গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার বিপুল আয়োজন।

An Important Announcement

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR ★ DOUBLE ENDED-GRINDER
★ POLISHING & BUFFING ★ FLEXIBLE SHAFT GRINDER etc. etc.

MANUFACTURED BY :

KSHAMA ELECTRO WORKS

146, SHYMNAGAR ROAD, DUM DUM, CALCUTTA-28. Phone : 57-2799

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

হোসিয়ারী জগতে যুগান্তর : সর্ব্বাধুনিক প্রণালী ও যন্ত্রপাতিতে তৈরী

বিচিত্র গেঞ্জী সম্ভার

সন্তোষ : পরিতোষ : প্রফুল্ল : নির্মল : পিরামিড : অমল

প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

রামলক্ষ্মী হোসিয়ারী

৭৭, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৬১৮৬

২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা-১

॥ কয়েকখানি সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থ ॥

॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু ॥
কর্ম্মবীর রাসবিহারী বসু—৫-০০
॥ বিপ্লবী নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ॥
বিপ্লবীবীর রাসবিহারী—৫-০০
॥ শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ॥
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—৫-০০
॥ ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী ॥
অমৃতের সন্ধান ৬॥০
॥ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক ॥
মহাভারত কথামৃত—১০-০০
শঙ্করাচার্য্য ৫৲ **সাঁওতালী কথা** ২৲
॥ মনীষী পণ্ডিত গুণদাচরণ সেন ॥
শ্রীমদ্ভাগবত (২য় সং) ৫-০০
বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—১-৫০
॥ ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥
তন্ত্রের আলো ৪৲ **প্রজ্ঞার আলো** ১।০
॥ শ্রীমৎ স্বামী উপানন্দ মহারাজ ॥
আত্মার আলো ১-২৫
॥ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী ॥
গীতার আলো ১॥০ **মহামায়া** ১॥০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা১২

সুধীরকুমার দত্তের সদ্য প্রকাশিত **সঙ্গীত ও সাধনা**—৪-০০। **'প্রভাকর'** ও **'বিশারদ'** পরীক্ষার পাঠ্যক্রমানুসারে লিখিত। সঙ্গীতশিক্ষার্থী মাত্রেরই উপযোগী। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের ভূমিকা সম্বলিত।

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

॥ স্বামী যোগানন্দ প্রণীত ॥
স্বরূপ সিদ্ধি (৩য় সং) ২ ৫০
জীবতত্ত্ববিবেক (২য় সং) ৪-০০
॥ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্র গুহরায় প্রণীত ॥
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল—১৲
(সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়)
॥ শুভঙ্করের ॥
মন্দা-নন্দা'র দেশে ৪-০০
(উপন্যাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)
॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রবীন সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত ॥
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলি-১২

"নিমল"

আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অম্লজনিত দন্তের ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সুরভিত হয়।

আর্য্য ঔষধালয় : কলিকাতা ১৭

মিষ্টান্ন জগতে বিশেষ আকর্ষণ

ইন্দ্র'র

● উৎকৃষ্ট দধি ● বিশুদ্ধ ঘৃতের নোন্‌তা খাবার

● মুগ-নারিকেলের সন্দেশ

● সরেস দরবেশ ও মিহিদানা

বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে।

সকল অনুষ্ঠানেই সযত্নে অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-১৩৮৩

৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-২৫৩৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিলতৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিস্রুত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
ভারতীয় শিরঃরোগ অধিতীয়

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
স্মৃতি-আলেখ্য ৫-০০
গ্রন্থখানি বাংলার জীবনী-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। অর্দ্ধ শতাব্দীর পটভূমিকায় লিখিত। বহু চিত্র সম্বলিত।
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স কলি:-১২

●

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা
মূল্য ৬৲ টাকা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংকলিত ও দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।
ক্যালকাটা বুক হাউস কলি-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী কলি:-৬

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক; সম্পূর্ণাঙ্গ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইণ্ডিং কারখানা।
পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয় বাঁধাই কাজ সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি:৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সূচীপত্র · প্রবর্তক : চৈত্র, ১৩৭২

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল	৪৮৩
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ	৪৮৪
ঋক্-প্রার্থনা	কবিতা	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	৪৮৪
সম্পাদকীয়	...	...	৪৮৫
জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবের ভূমিকা	প্রবন্ধ	হরিদাস মুখোপাধ্যায়	৪৯৩
মানসী	কবিতা	শ্রীবংশী মণ্ডল	৪৯৬
সমুদ্র শাসন	উপন্যাস	অজিত সরকার	৪৯৭
সমারসেট্ মম	জীবন-চিত্র	শ্রীহংস	৫০১
স্বামী হরানন্দ সরস্বতী	জীবনী	শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য	৫০৪
গ্রাম্য গবেষণা	গল্প	শ্রীপ্রমোদারঞ্জন আচার্য্য	৫০৭
প্রবর্ত্তকের পঞ্চাশ বছর	ইতিবৃত্ত	ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার	৫১০
একখানি পত্র	পত্র	শ্রীপ্রবুদ্ধনাথ চ্যাটার্জ্জি	৫১৪
রাধামাধব	গল্প	শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার	৫১৫
পঞ্চাশ বছর আগে	সঙ্কলন	শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত	৫১৭
মহাপ্রয়াণ	নিবন্ধ	শ্রীরমণ	৫১৮
সাময়িকী	...	... ...	৫২০

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াল পাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

১২

৫০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ | চৈত্র, ১৩৭২

জীবনের আলো

চাই সেই একদল মানুষ—যাহারা মনঃকল্পিত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে আত্মপ্রাধান্য সংস্থাপনের দায় হইতে মুক্ত হইয়া ভারতের সার্ব্বজনীন বেদধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে আত্মদান করিবে। তাহাদের মনে রাখিতে হইবে ব্যক্তিগত কোন ধর্ম্মই তাহাদের গ্রহণীয় হইবে না। যাহা শাস্ত্র, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইবে। তাহা উপলব্ধিগম্য করিয়া ভারতের মৌলিক সংস্কৃতিকেই আবিষ্কার কবিতে হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিগত যুক্তির জন্য ভারতের ন্যায়শাস্ত্র আশ্রয় করিতে হইবে। তাই প্রস্থানত্রয়ের কথা আমরা সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছি। যাঁহারা বলেন, সে যুগ বহু দূরে পড়িয়া আছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা নিরর্থক ; প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের বলিব—কালপ্রভাবে যাহা আমরা হারাইয়াছি, তাহা পুনরধিকার করার জন্যই তো আমাদের জন্ম। বসন্তের কোকিল বর্ষার আকাশ দেখিয়া যুগোপযোগী জীবনের আনুগত্য কখনই স্বীকার করে না। কণ্ঠ সে রুদ্ধ করিয়া রাখে—বসন্তের পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। দক্ষিণা বাতাসে শুষ্ক তরুর শিরে শিহরণ জাগে—মুকুলিত হয় তরুরাজি। পিকের বুকে আনন্দের সীমা থাকে না, কুহুরবে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। সেইরূপ সনাতন যুগের মানুষ কালপ্রবাহে যত আড়ষ্ট হইয়াই থাকুক, তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে অতীতের সুখস্মৃতি বুকে লইয়া। আসিবে সেদিন আসিবে, যেদিন উঠিবে তাহাদের কণ্ঠে বেদের উদ্গান। বেদের মর্ম্ম অন্য কিছু নয়, আছে তার মধ্যে মন্ত্র, স্তব, আচার ও ছন্দঃ। এই মন্ত্রবীজ জাগাইয়া রাখে অধ্যাত্মচেতনা ; তাই কাণের মধ্য দিয়া যে মন্ত্র যখন মর্ম্ম স্পর্শ করে, কণ্ঠে তখন ফুকারিয়া উঠে স্তুতিগীতি। কবির কণ্ঠে সে মধুর আবৃত্তি মানুষকে নূতন করিয়া ভাষা দেয়। তাহা অনবদ্য দিব্য। তাহাই অমৃত ঋক। তাহাই দেবভাষারূপে প্রকাশিত হয় ভারতের আশ্রমে আশ্রমে, শিক্ষা-নিকেতনে। আর এই সঙ্গীতের নব নব প্রেরণায় জাতি লাভ করে সদাচার। আচারই অভিব্যক্তি দেয় দিব্য-জীবনের। জীবনবাদী ভারত, তাহার সর্ব্ব কর্ম্মই হয় যজ্ঞস্বরূপ—ঈশ্বরোদ্দেশ্যে পবিত্র অর্ঘ্য।

[১৩৫৩ সালের 'প্রবর্ত্তক' হইতে]

—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং। উনচত্বারিংশৎ সূক্তং।) **সপ্তমী ঋক**

(সদ্গুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

আ বো মক্ষু তনায় কং রুদ্রা অবো বৃণীমহে।

গন্তা নূনং নোঽবনা যথা পুরেত্থা কণ্বায় বিভ্যুষে ॥ ৭ ॥

অন্বয়—"হে রুদ্রাঃ" (হে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ) "আ" (সর্ব্বতোভাবে) "মক্ষু" (শীঘ্র) "ব" (আপনাদের) "তনায়" (বিস্তারের জন্য) "কং" (কি প্রকার) "অবঃ" (রক্ষণ) "বৃণীমহে" (প্রার্থনা করিব) "যথা" (যে প্রকারের) "পুরা" (পূর্ব্বে) বিভ্যুষে" (ভয় ব্যাকুল) "কণ্বায়" (মেধাবী যজমানের নিমিত্ত) "ইত্থা" (এই প্রকার) "নঃ" (আমাদের) "অবসা" (রক্ষার নিমিত্ত) "নূনং" (শীঘ্র) "গন্তা" (গমন করুন) ॥ ৭ ॥

সরলার্থ—হে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ! সর্ব্বতোভাবে শীঘ্র আপনাদের বিস্তারের জন্য কি প্রকার রক্ষা প্রার্থনা করিব? যে ভাবে পূর্ব্বে ভয়ব্যাকুল মেধাবী যজমানদের রক্ষা করিয়াছেন—সেইভাবে আমাদেরও রক্ষার নিমিত্ত আপনারা শীঘ্র গমন করুন ॥ ৭ ॥

বিশদর্থ—পূর্ব্বোক্ত দুই ঋকে ঋষি মরুদ্দেবগণের তাণ্ডব-মূর্ত্তির অভিনন্দন জানাইয়া স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। এই ঋকে তিনি রুদ্রপুত্রগণের প্রশান্তি কামনা করিতেছেন। কেননা, তাঁহাদের দাপটে মানুষ অত্যন্ত ভীত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রলয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্তে মানুষের দেহ, গেহ, গবাদি পশু, বনজ সম্পদ, স্থাবর-অস্থাবর প্রভৃতি সব কিছুই বুঝি আর রক্ষা করা যায় না—সেই অবস্থায় ঋষি কি করেন, মরুদ্দেবগণের নিকটই রক্ষার জন্য তিনি প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

ঋক্-প্রার্থনা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

রুদ্রতনয় মরুদ্দেবতাগণ!
ত্বরা বিস্তারে কি কামনা মোরা করি?
পূর্ব্বে যেমন মেধাবী যাজকগণে
রক্ষা করেছ ত্বরিত পন্থা ধরি,
সেইভাবে মোদের রক্ষণ লাগি'
সত্বর সবে গতির পন্থা ধর
ভীত শঙ্কিত মেধাবী যাজকগণে
রক্ষা করিতে ত্বরিতে গমন কর।

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের পথে 'প্রবর্ত্তক'-এর 'জীবনবোধ' ও 'জাতীয়তা' :

বর্ত্তমান চৈত্র সংখ্যায় 'প্রবর্ত্তক'-এর ৫০তম অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ শেষ হইল। সারাটি বছর 'প্রবর্ত্তক'-এর আবির্ভাব ও অস্তিত্বের তাৎপর্য্যটি কি, অন্য কথায় ইহার বিশিষ্ট 'মিশন' কি, ইহাই আমরা সম্পাদকীয় স্তম্ভে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আরও দেখানো হইয়াছে যে, ইহা আকস্মিক নহে, ইতিহাসের পথেই সমুপস্থিত হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক-এর 'মিশন' অর্থাৎ অনন্য ব্রত বা সাধ্য এক কথায় বলা যায় অখণ্ড ভারতে 'ভাগবত জীবন' ও 'অধ্যাত্ম জাতীয়তা'র প্রতিষ্ঠা। স্মরণাতীত কাল হইতে অগণিত অবতার, দেবমানব, ঋষি, মুনি, মনীষী সেবিত এই ভারতবর্ষে এই লক্ষ্যটিই লালিত পালিত পরিপোষিত হইয়া আসিতেছে। ইহাই ভারত সভ্যতার অন্তর্লীন বিলক্ষণতা বলা যায়। ইহা ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বিশাল বনস্পতি অশ্বত্থের মত—কালের ঘাত-প্রতিঘাতে নানা জাতি, নানা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যে ইহার প্রাণরস সাময়িক স্তিমিত স্তম্ভিত হইলেও আবার উচ্ছল স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বমানবতার পূর্ণ পরিণতির প্রত্যাদিষ্ট লক্ষ্য এই অধ্যাত্ম জাতীয়তা যাহাই অনাদি কাল হইতে এই পুণ্য ভারতভূমিতে অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে কালের পথ বাহিয়া। "সমগ্র মানবজাতির ইহা চিরন্তন সম্পৎ—শাশ্বত প্রেরণার উৎস। মহাদেশের শীর্ষে বিরাজিত হিমাচলশ্রেণী যাহার সাক্ষাৎ প্রতীক সেই ভূমা বা বিরাটের অনুভূতি ইহার ধ্রুবতারা, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের স্বীকার ইহার প্রাণচ্ছন্দ, সকল অভ্যাগতে মুক্তদ্বার ইহার সমাজ নীতি।"

আমরা এই অধ্যাত্ম জীবন ও জাতীয়তার ক্রমাভিব্যক্তির রেখাচিত্রটিই আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং ইহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, যুগে-যুগে নানা বাহ্য ঘাত-প্রতিঘাতে, পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জনের মাঝেও এই জাতি-পুরুষ কখনও আপন অন্তরাত্মাকে হারায় নাই। বাংলা ও বাঙালীর সাধনার ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এই জাতি-পুরুষের যত অস্পষ্টই হোক, একটা অবয়ব ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। মরমী বাঙালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, তার জাতীয়তাবোধ ও চিন্তা-ভাবনার মূলে যে সার্ব্বজনীনতার বীজধর্ম্ম নিহিত আছে তাহাই বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া অভিব্যক্ত হইতে চাহিতেছে এই অধ্যাত্ম জাতীয়তা রূপে বিচিত্র আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া।

অধ্যাত্ম জাতীয়তার ভিত্তি অধ্যাত্ম বা দিব্য জীবনবাদ—ঋতময় সত্যের বস্তুতন্ত্র সঙ্গতি, শাশ্বত আস্তিক্যের অখণ্ড বাস্তববোধ। 'প্রবর্ত্তক'-এর জীবনবাদ ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষেরই জীবনদর্শন। বর্ষারম্ভে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, 'প্রবর্ত্তক' কথাটি মন্ত্রের তাৎপর্য্য বহন করে। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল যে জীবন-মন্ত্রের উদ্‌গান তুলেন তাহাই রূপায়িত হইয়া প্রবর্ত্তক প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে। 'প্রবর্ত্তক'-ই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। মনীষী এমার্সনের কথায়—"Institution is the projection of a personality." প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রবর্ত্তক মন্ত্রের তথা মন্ত্র-বিগ্রহের চিন্ময় ভাব ও ভাবনার প্রলম্বিত কায়মূর্ত্তি। প্রবর্ত্তক পত্রিকা ইহারই পতাকা। সনাতন ভারতবর্ষ—বাঙালীর মর্ম্মসত্তা যুগভূমিকায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে সঙ্ঘগুরুজীর আধার আশ্রয়ে।

●

সঙ্ঘগুরুজী শ্রীমতিলালের জীবনবোধ ও জাতিদর্শন আকস্মিক ভুইফোঁড় কিছু নহে। ভারতীয় তথা বাংলার জীবনতত্ত্বের অভিব্যক্তি-ধারারই ইহা যুগ-পরিণতি। তাঁর জীবন-ধারণার উৎস বেদের অবারিত জীবনবোধ ও আদি বেদান্তের প্রাণবাদে। এই জীবন-প্রমুল্য ও জাতীয়তা বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও সাধনার অন্তর্নিহিত মূল প্রেরণা, বলা যায়।

'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে মনীষী মোহিতলাল বাঙালীর

বিশিষ্ট প্রতিভা-স্বাতন্ত্র্যের দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন : "বাঙালীই ধর্ম্মের আদর্শ বিষয়ে ভারতের অন্য সকল জাতি হইতে চিরদিনই কিছু স্বতন্ত্র। আধ্যাত্মিক আদর্শকে আধিভৌতিকের সহিত মিশাইয়া একটা পূর্ণতর জীবনবাদকে ধরিয়া রাখাই তাহার প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ। * * বাঙালীই পুনরায় সেই আধ্যাত্মিকতাকে, নবযুগের প্রয়োজনে, একটি নূতন রূপে, মানুষের দেহ মনের বাস্তব ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিয়াছে। এই ধর্ম্মের নাম দেশ ও জাতিপ্রেম। ইহার সাধনায় শক্তিই মুখ্য। এই ধর্ম্ম বিশেষভাবে বাঙালী জাতির জাতীয় সংস্কারে নিহিত থাকিলেও ইহাতে সার্ব্বজনীন মানব প্রকৃতির এমন একটি চিরন্তন সত্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে যে, তাহাকেও ভারতীয় আদি হিন্দুধর্ম্ম বা 'সনাতন' মানব ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, সেই মধ্যযুগীয় আবরণ ভেদ করিয়া এই ধর্ম্মই তাহাকে (বাঙালীকে) স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। এইরূপে বাঙালীই, যে ধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম—যাহা ব্যাসের সঙ্কলিত 'মহাভারতে' একটি সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে, সেই ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করিয়াছে। সেই ধর্ম্ম হইতেই বাঙালী খুব বড় একটা 'nationalism'-এর অনুপ্রেরণা পাইয়াছে।"

বাংলার যুগধর্ম্ম তথা শ্রীমতিলালের মত ও পথকে বুঝিবার জন্য এই বিস্তৃত উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল এই নবযুগের ধর্ম্ম ও জাতীয়তার বস্তুতন্ত্র রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন একটা সংহত সমষ্টি—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মাধ্যমে। ধর্ম্মের মধ্যযুগীয় আবরণকে বিদীর্ণ করিয়া নব জাতীয়তামূলক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় যে বলিষ্ঠতা তিনি দেখাইয়াছেন তাহা আজও সাধারণ্যে তেমন অবধারিত হয় নাই। শ্রীমতিলালের এই জীবন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য মনীষী মোহিতলালের কথায় বলা যায় "একদিকে আর্য্যের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মতত্ত্ব—মহাভারতের সারমর্ম্ম—গীতার জীবনমুক্তিবাদকে এবং অপরদিকে অনার্য্যের ভোগবাদ বা জীবন-সত্যবাদকে মিলাইয়া একটি অপূর্ব্ব সমন্বয়মূলক জীবনবাদের প্রতিষ্ঠা।"

বিগত শতকে বাঙালীর জাতি-সাধনা দুইটি—অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী ধারায় প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এই অন্তর্ম্মুখী জাতীয় চেতনার প্রতি সেকালে বিভ্রান্ত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিপ্লবী আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ। তাঁর অকুণ্ঠ ঘোষণা—'ঋষি ও মহাজন-প্রবর্ত্তিত পন্থা, শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন সত্যোপলব্ধির দ্বিতীয় পন্থা নাই'। কিন্তু সুপরিস্ফুট দেশাত্মবোধের আদি মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরে অদ্বৈত-বৈদান্তিক বিবেকানন্দ।

বর্ত্তমান বিংশ শতকে এই মন্ত্রেরই বৈষ্ণবীয় রসসান্দ্র কাব্যময় ব্যঞ্জনাকার রবীন্দ্রনাথ আর তান্ত্রিক শক্তি-ভিত্তিক রূপকার শ্রীঅরবিন্দ। বিজয়কৃষ্ণ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ - অরবিন্দ - রবীন্দ্রক্রমের বহু উত্তরসাধক বাঙালীর এই জীবনধর্ম্ম ও জাতীয়তারই যুগ-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল এই ক্রম-শৃঙ্খলেরই এক বিশিষ্ট যুগ-প্রকাশ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দজীর 'মুক্তি-মোক্ষ-আত্মজ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি সাধনা তপস্যার লক্ষ্য ছিল না'—লক্ষ্য ছিল তাঁরই বিশিষ্ট মত ও পথে বাংলার এই যুগধর্ম্ম ও জাতীয়তার সাধনা ও সিদ্ধি। আচার্য্যদেবেরই কথা : "লোকে জপ করে কাঠের মালায়, আমি আজীবন জপ করেছি জাতি-গঠনের মালায়।"

বাংলার বহু ধর্ম্মগুরু ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে আচার্য্য প্রণবানন্দ অথবা সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের মত বাঙালীর প্রকৃতিগত এই নব যুগধর্ম্ম ও জাতীয়তার চেতনা এখনও তেমন ব্যাপক বিস্তার লাভ করে নাই, এখনও মধ্যযুগীয় জীবনবিমুখ ধর্ম্মের ক্লীবত্ব ও রহস্যময়তার মোহ-মুক্তি জনমনে ঘটে নাই। বাঙালীর ভারত তথা বিশ্বের গুরু হইবার সম্ভাবনা কিন্তু এই অধ্যাত্ম জীবনবোধ ও ধার্ম্মিক জাতীয়তার সিদ্ধির উপরই নির্ভর করিতেছে। ইহাই বাঙালীর বিধিনির্দ্দিষ্ট মিশন। তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য এই লক্ষ্যেই প্রগতিশীল। বাঙালীর জীবন-দর্শনের স্বরূপ ও প্রকৃতি-বিচারে এই সত্যই নির্ণীত হইবে।

●

বিগত শতকে বাংলার জাতীয় সাধনার বহির্ম্মুখী ধারায় ভাসিয়া আসিয়াছিল জাতীয় কংগ্রেস। ইহা ছিল পশ্চিমের অনুরোপ ও অনুকরণ। বাংলার এই

আদি কংগ্রেসের মূলে ভারতীয় স্বধর্ম্মের কোন সমর্থন ছিল না—না ছিল ভারতীয় স্ব-ভাবের সুস্থ ও প্রাণময় প্রেরণা। এই হেতুই বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সমসাময়িক হইলেও, তাঁহারা উহাতে আকৃষ্ট হইতে পারেন নাই। স্বামীজী তখনকার কংগ্রেসকে লক্ষ্য করিয়া বরং মন্তব্য করিয়াছিলেন, "কংগ্রেস জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক। শুধু মাগীদের মতন বসে কাঁদুনি গাইলে কি হবে।"

এই শতকের প্রথম দশকে শ্রীঅরবিন্দও এই কংগ্রেসকে আপন আদর্শের অনুকূলে আনার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হন, সুরাটে দক্ষযজ্ঞ সংঘটিত হয়, তারপর তিনি অনুকূল কালের অপেক্ষায় আত্মসাধনায় নিমগ্ন হন। তথাপি একথা বিনা বিতর্কে বলা চলে যে, বঙ্কিম-বিজয়-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেরণা ও বাণীর ফলশ্রুতিস্বরূপ পরবর্ত্তীকালে যে রাজনৈতিক আন্দোল-বিক্ষোভ সুরু হয় তাহাই সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিক চেতনার উদ্বোধনেরও কারণ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের দেশ-সাধনার ক্ষেত্রে যে অবসন্ন দিশেহারা অবস্থার উদ্ভব হয় "সেই লগ্নে গান্ধীজী তাঁহার নূতন ধর্ম্ম ও নূতন কর্ম্মনীতি লইয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। সেই দারুণ অবসাদ ও নিরাশা তাঁহার নেতৃত্বের বড়ই অনুকূল হইয়াছিল, তিনি হইয়াছিলেন 'The man of the moment.'। সেই স্বাজাত্যবাদ ও শক্তিবাদকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী করিয়া তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যে পথে প্রবর্তিত করিলেন তাহাতে বাঙালীর স্থান আর রহিল না—সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবনবাদ, সেই শক্তিবাদ, সেই মহাভারতীয় হিন্দুধর্ম্মও পুনরায় মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিকতা বা ক্লীববৈরাগ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন বা নিরাকৃত হইয়া গেল। গান্ধী-ধর্ম্ম স্বাভাবিক মনুষ্যধর্ম্ম নহে বলিয়া তাহা প্রকৃতি সম্বন্ধে নাস্তিক এবং একটা মিষ্টিক (mystic) অধ্যাত্মবাদে অন্ধ বিশ্বাসী বলিয়া, হিন্দু-মুসলমান কাহারও ধর্ম্ম হইতে পারে না; সেই ধর্ম্ম যেমন যুগোচিত নয়, তেমনি তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সমন্বয় বিমুখ বলিয়া সত্যও নহে।"

এই মহাত্মা-প্রবর্ত্তিত অহিংস ধর্ম্ম ও সাধনা পরবর্ত্তী কালে গান্ধী ব্যক্তিত্বের অভাবে বীর্য্য হারাইলেও, আজও পর্য্যন্ত ইহার জের ভারত রাষ্ট্রকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বরাবর বলিয়াছি ইহা একটি চলমান পর্য্যায় মাত্র। গত সংখ্যা প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয় 'অধ্যাত্ম জাতীয়তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ' নিবন্ধের উপসংহারে আমরা মন্তব্য করিয়াছি যে, ভারতের এই পূর্ব্ব প্রান্তে একটা বিধ্বংসী বিপ্লবের মধ্য দিয়া এই অ-ভারতীয় রাষ্ট্র-সাধনার অবসান ঘটিবে এবং বাঙালীর কল্পস্বপ্নের বিশ্বমানবগ্রাহ্য সর্ব্বোদয়মূলক জীবনবাদী অধ্যাত্ম জাতীয়তার অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হইবে—যাহারই জয়গান এই বিংশ শতকের মধ্যাহ্নে সঙ্ঘগুরুজী গাহিয়া গিয়াছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক বিদ্রোহের পরে এই গান্ধীযুগের, গান্ধী-ধর্ম্ম, জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রসাধনার মূর্ত্ত প্রতিবাদ ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। নেতাজী ছিলেন বাংলার জাতি-সাধনার অন্তর্মুখী ধারার বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রের উত্তর সাধক। তাঁর মধ্যে বাঙালী ধর্ম্ম ও বাঙালী প্রতিভার সর্ব্বোতোমুখী বস্তুতন্ত্র প্রকাশ দৃষ্ট হয়। যুগ-কোলাহলের মধ্যেও তিনি চিরকালের ভারতবর্ষ, তার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সুভাষচন্দ্রেরই কথা: "India of the past lives in the present and will live on in the future." তাই সুভাষচন্দ্র চাহিয়াছিলেন "we want to build up a new and modern nation on the basis of our old culture and civiliatisons." নেতাজী ছিলেন সর্ব্বাঙ্গীন সমন্বয়বাদী। তিনি সকল বাদের আতিশয্যকে বর্জ্জন করিয়া তার সার সত্যটুকু গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যুগ-প্রয়োজনে গান্ধীজির কুশলী সংগ্রামনেতৃত্বকে স্বীকার করিয়াও গান্ধীবাদের একরোখা জীবনতত্ত্বকে নেতাজী অস্বীকার করিয়াছিলেন।

নেহেরু আর সুভাষ এদেশে সমাজতন্ত্রের উদ্‌গাতা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সমাজ দর্শনের মূল ছিল এই ভারতের মাটি। নেতাজীরই কথা: "That socialism did not derive its birth from the books of Karl

Marx. It has its origin in the thought and culture of India." গান্ধী-উত্তর নেহেরুর সমাজতন্ত্র যে জড়বাদী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা আজ আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সতর্কবাণী ছিল, "But we should not surrender to the dictates of Amsterdam or Moscow. India will have to work out her own methods and adopt herself to her environment and to her special needs-" ইতিহাসের সমসাময়িক কালে এই ভারত-ভাগ্যনির্ণায়ক আর একজন নেতা পণ্ডিত নেহেরুর কথা : "There is no middle road between the two (Fascism and communism) and I choose the communist ideal. ...I think that the basic ideology of communism and its scientific interpretation of history is sound." সুভাষচন্দ্র তাঁর 'Indian struggle' গ্রন্থে পণ্ডিত নেহেরুর এই অভিমতের প্রতিবাদ করিয়াছেন : "As a student of philosophy, you will admit that human progress can never stop and out of the past experience of the world we have to produce a new system. Therefore we India will try to work out a synthesis of the rival systems and try to embody the goods of both."

সুভাষচন্দ্রের প্রতিভা ছিল মূলত: ভারতীয়, তাই তিনি স্বকীয়তার সঙ্গেই সঙ্গতি রাখিয়া সমসাময়িক সব বাদের নবায়ণ চাহিয়াছেন। তাঁরই কথা : "What we in India would like to have a progressive system which will fulfil the social needs of the people and will be based on the national sentiment. In other words, it will be a synthesis of nationalism and socialism."

এখানে লক্ষ্য করিবার এই যে, পশ্চিমের সমাজতন্ত্রে জাতীয়তা অস্বীকৃত। সুভাষচন্দ্রই সম্ভবত: সর্ব্বপ্রথম যিনি জাতীয়তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের যুগসঙ্গতি-সূত্রের উদ্ভাবক। বাঙ্গালীর সমন্বয়ী প্রতিভার দৃষ্টান্ত ছিলেন নেতাজী।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুইজন সংগ্রামী জননায়কের মতাদর্শের বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, ইঁহারা অখণ্ড ভারতে অধ্যাত্ম জাতীয়তার অভিব্যক্তি-ক্রমের দুইটি—অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী—ধারার বলিষ্ঠ যুগ-প্রতীক। নেহেরুর সমাজতন্ত্র ছিল বহিরাগত। আর বিবেকানন্দের মানস-বিগ্রহ নেতাজীর সমাজতন্ত্র ছিল ভারতীয়—বিবেকানন্দ-প্রভাবিত। নেতাজী বিবেকানন্দকে "The spiritual father of modern nationalist movement" বলিয়া গণ্য করিতেন। ইতিহাসের পথে অন্তর্ম্মুখী অধ্যাত্ম জাতীয়তার প্রগতিস্রোত রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে নেতাজীর অপসারণে। বহির্ম্মুখী নেহেরুর রাষ্ট্র-দর্শন সাফল্যের মুখেই ব্যর্থকাম হইয়াছে ভারতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের স্বীকৃতিতে। অখণ্ড ভারতে এক-জাতীয়তার স্বপ্ন দূরে মিলাইয়া গিয়াছে আজিকার দ্বি-খণ্ডিত ভারতে। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যে মর্ম্মবাণী—বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য—রাষ্ট্র ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে তাহার বাস্তব প্রযুক্তি সম্ভবপর হয় নাই।

আজকের কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতি জীবনতত্ত্বের সামগ্রিক দিক না দেখিয়া একদেশদর্শী হওয়ায় ইহাও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। মার্কসবাদের অনুসরণে অর্থনীতিকে মূল মন্ত্র করিয়া নেহেরুর উত্তরাধিকারী আজকের ভারত রাষ্ট্র ভারতের ঐক্য সংহতি বজায় রাখিতে প্রযত্নপর। কিন্তু নেতাজী চাহিয়াছিলেন "To strike the golden mean between the demands of spirit and matter, of the soul and of the body—thereby progress simulteneously on both fronts." ইহাই অধ্যাত্মজীবন ও জাতীয়তার সত্য অভিসন্ধি। জড়বাদী জীবনবাদ তথা সমাজদর্শনে দেহ ও ভোগই সব—আত্মা অস্বীকৃত। মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেলিনের দৃষ্টিতে ধর্ম্ম আফিঙের নেশা, কিন্তু অধ্যাত্ম জাতীয়তা-বাদীর কাছে ধর্ম্ম জীবনের ধারক, বাঁচা-বাড়ার প্রেরণা। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার ফলেই আজকের মার্কস্-মার্কা সমাজতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্র ভারত-সত্তার মৌলিক অভিসন্ধি হইতে ক্রমশ: দূরে সরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু নেতাজীর জীবনদর্শন ছিল অখণ্ড।

তাঁরই কথা : "Life is one whole···Human life can not be split up into Compartments. All the aspects or phases of national life are interrelated and all the problems are, as it were, interoven." নেতাজীর এই দৃষ্টিই অখণ্ড জাতীয়তার সত্য দৃষ্টি। এই জীবন ও জাতিদর্শনের ফলেই সুভাষচন্দ্র এই বিচিত্র বিশাল ভারতে এক জাতি, এক রাষ্ট্র গড়ার পক্ষে কোন বাধা দেখিতে পান নাই : "There is absolutely no reason why India which has much more homogenity than Soviet union, could not be united as one nation."

ভারতে এক জাতি, এক রাষ্ট্র গড়িবার স্বপ্ন ছিল সুভাষচন্দ্রের। ইহাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরও সাধ্য—যার ভিত্তি অধ্যাত্মজীবনবাদ ও অধ্যাত্ম-জাতীয়তা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন এ যুগে ইহারই মূর্ত্ত জীবন্ত বিগ্রহ। ইতিহাসের পথে অধ্যাত্ম-জাতীয়তার পূর্ব্বগামী পথিকৃৎদের ভাব ও ভাবনাকে রাষ্ট্রে, অর্থে, শিক্ষায়, সমাজে বাস্তবায়িত করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে নেতাজী আজ পর্য্যন্তও অতুলনীয়—অদ্বিতীয়।

●

রাষ্ট্রদর্শনে নেতাজী ও নেহেরু দু'জনেই ছিলেন সমাজতান্ত্রিক—যাহাই মানবেতিহাসের অভিব্যক্তিক্রমে যুগচিন্তায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্ক, সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় মহাদেশেই হাজার হাজার বছর ধরিয়া পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। বরং বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতবর্ষে ইহার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল অধ্যাত্ম ভাবনায় এবং সমাজের দর্শন ও বর্ণাশ্রম বিন্যাসে—যাহারই ফলে ভারতীয় সভ্যতা এত দীর্ঘ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব গ্রীক-দার্শনিক প্লেটো (রিপাবলিক্ গ্রন্থ) প্রভৃতির মধ্যে সমাজতন্ত্রের চিন্তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও আদর্শসম্মত ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিন্তাবিদ্দের মধ্যে টমাস মোর, রুসো, হবস্, লক প্রভৃতি এই সমষ্টিবাদমূলক চিন্তার পথিকৃৎ। সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভাষ্যকার হিসাবে ফিখ্‌তে, ফয়েরবাক্, প্রধোঁ, ব্লাঁকি, টমাসপেন, ফুরিয়ে প্রভৃতি বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও চিন্তায় জড়বাদের আতিশয্য দেখা যায় না। পরবর্ত্তীকালে ইতিহাসের একান্ত আদিভৌতিক জড়বাদী ব্যাখ্যাকার মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেলিন প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তীদের অবাস্তব আদর্শবাদী বলিয়া উড়াইয়া দিয়া সমাজ-বিবর্ত্তনের অর্থনীতিসর্ব্বস্ব বৈজ্ঞানিক ভাষ্য প্রচার করেন যাহা আজকের কমিউ-নিষ্টদের চিত্ত ও ভাবনা আফিঙের নেশার মত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সামগ্রিক জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে মার্কসীয় সমাজ ও সাম্যবাদের ধারণা শুধু একদেশদর্শীই নয়, ভ্রান্তও। ইহা সত্য যে, ইতিহাসের সূচনা মানব সমাজকে লইয়া। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথ অনিবার্য্যভাবে অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের চরম ও পরম সত্তা চিরগতিশীল পদার্থপুঞ্জ—মার্কস্ ও তাঁর অন্ধ অনুবর্ত্তীদের এই জীবন ও জগৎ দর্শন অত্যন্ত অগভীর, উপরিচর চিন্তার ফল ও প্রতিক্রিয়া-প্রসূত। আধুনিক বিশ্বের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদ্ মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'New Humanism' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন : "মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দ্দেশ্যবাদ বস্তুবাদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত। এই মতবাদে যখন বলা হয়, আর্থিক বিধিব্যবস্থা মনকে নির্দ্দেশিত করে তখন আর্থিক ব্যবস্থা ও মন দুইটি ভিন্ন বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে মার্কসীয় মতবাদে বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বস্তুবাদে মনকেও সমস্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই ধরে নেওয়া হয় বলে বস্তুবাদ এক অদ্বৈতবাদী দর্শন। ইতিহাস বিনা চেষ্টায় রচিত হয় না, তাকে গড়ে তোলা হয়। এই গড়ে তোলার পেছনে নানা করণ থাকে। মানুষের ইচ্ছা এই করণসমূহের অন্যতম এবং আর্থিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকেই যে এই ইচ্ছার উদ্ভব তা সব সময় সত্য নয় (স্বদেশরঞ্জন রায়ের অনুবাদ হইতে)।"

●

এখানে সমাজতন্ত্রের এই বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে ভারতীয় সামগ্রিক গোটা জীবনদর্শনকে আমল না দিয়া বিকৃত

মার্কস্-মার্কা সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রনীতিতে আমদানী করা হইয়াছে। এবং পণ্ডিত নেহেরু ইহার প্রবর্ত্তক। মনে করা হইয়াছে যে, এই অর্থনীতি ও দেহভোগসর্ব্বস্ব সমাজতন্ত্রবাদ এই বিচিত্র বর্ণ ধর্ম্ম ভাষাভাষী বিশাল ভারতে এক রাষ্ট্র, এক জাতি গঠনের সহায়ক হইবে। মাত্র দেড়যুগের স্বাধীনতাকালে শাসকের তথা সর্ব্বস্তরের নীতিভ্রষ্টতা, প্রশাসনের অব্যবস্থা, সমাজ-মানুষের ব্যাপক দুর্গতিই ইহার ব্যর্থ পরিণতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইতিহাসের পথেই ইহা আসিয়াছে আবার ইতিহাসের পথেই ইহা বিদূরিতও হইবে। যেহেতু ভারতের প্রতিভা ও ধাতু, তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ইহার কোন সঙ্গতি নাই। ঋষিকবির কথা—"অধৈর্য্য বা অজ্ঞানবশতঃ স্বাভাবিক প্রথাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য একটা কিছুকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশী প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি নষ্ট হয়। তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ ও সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়।" বস্তুতঃ ভারত-সত্তা একটা শাশ্বত অবিচল সত্যকেই প্রকাশে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহে। এই সত্যের আপোষ করিতে গেলেই ভারত আত্মঘাতী হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন, "সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক ক্ষতি নাই। সত্য কখনও সমাজের মত আপনাকে গঠিত করিবে না।" মার্কসীয়-লেলিনবাদী সমাজতন্ত্রকে হুবহু স্বীকৃতি দিয়া ভারত-রাষ্ট্র ভারতের চিরকালের সত্যকেই বিকৃত করিতে বসিয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্ক, এক কথায় সমাজতন্ত্রের গোড়ার কথাটির দিগ্‌দর্শনও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন : "মানুষ অহঙ্কারকেই যখন একান্ত বিশেষ করে জানে তখন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্ম্মই করতে পারে। মানুষের ধর্ম্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে তোমার আমিই একান্ত নয়; তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতি বিশেষের মধ্যে নিয়ে চলো।"

আজকের ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যে দুষ্কর্ম্ম তাহা এই আত্মকেন্দ্রিকতারই বিষময় ফল। অর্থনীতিসর্ব্বস্ব সমাজতন্ত্র এই আত্মকেন্দ্রিক অহংকেই প্রশ্রয় দেয়। আইন, পুলিশ ও সামরিক শাসন শ্লথ হইলেই এই সমাজতন্ত্রের কুৎসিৎ স্বরূপ নগ্ন হইয়া পড়িতে বাধ্য। অনতিদূর আগামীকালে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পরিণাম ইতিহাসই প্রমাণ করিবে। লেলিনেরই সতর্ক বাণী "Those who are not rooted to the soil must perish." দেশের ভূগোল, প্রকৃতি, মানুষ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিয়া বাহির হইতে বিদেশাগত কোন ব্যবস্থাকে জোর করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপর চাপাইলে উহার বিনষ্টি সুনিশ্চিত এবং ইহার ফলে সেই দেশবাসীরও আত্মবীর্য্য প্রকাশ হইতে পারে না। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি, এই পুণ্যভূমি ভারতে স্বকীয়তাপুষ্ট অধ্যাত্ম-জাতীয়তার রুদ্ধ স্রোত অচিরে মুক্ত হইয়া স্ব-খাতে পুনশ্চ প্রবাহিত হইবে।

●

কাল পূর্ণ না হইলে কিছু হইবার নয়। বর্ত্তমান শতকের তৃতীয় দশকে অসহযোগ আন্দোলনকালে দেশের কর্ণধারত্ব গ্রহণে রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর আহ্বানে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যুত্তর ছিল : "I have still to remain in retirement for I am determined not to work in the external field till I have the sure and complete possession of this new power of action not to build except on a perfect foundation." শ্রীঅরবিন্দ সেই সময়েই 'গান্ধীযুগ' এখন চলিতেছে এবং চলিবে বলিয়াও ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন।

সমসাময়িক কালেই বিপ্লব হইতে মুখ ফিরাইয়া এবং অসহযোগ আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া একদা শ্রীঅরবিন্দের অনুগামী শ্রীমতিলালও ফরাসী চন্দননগরের ভাগীরথী তীরে নির্ভেজাল ভারতের এই নব কল্প আনয়নের নীরব তপস্যাই করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শুধু খাওয়া-পরার সমস্যার সমাধান তথা অর্থসর্ব্বস্ব সমাজতন্ত্রই মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়, পৃথিবীতে নূতন সমাজ রচনা করিতে হইলে নূতন জীবন ও জগৎবোধ, নূতন মানুষ,

নূতন সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন। এবং এই লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ শ্রীমতিলাল একটা সংহত জীবনসমষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর জীবন ও জাতি-দর্শনের বস্তুতন্ত্র রূপ দিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। ভাব ও ভাবনা, জীবনবোধ ও কর্মময় গতিশীল জীবন সাধনার ক্রমে শ্রীবিবেকানন্দ ও তাঁর ভাববিগ্রহ নেতাজীর ধারাই শ্রীমতিলালের জীবন সাধনায় অনুস্যূত হইতে দেখা যায় বলিলে বোধ হয় ঐতিহাসিক ক্রমের দিক দিয়া ঠিকই বলা হইবে।

জীবন ও জগৎ দর্শনে বিবেকানন্দ হইতে অরবিন্দ পর্য্যন্ত বাস্তব জীবনে বেদান্তের অনুশীলনের একটা বিচিত্র ক্রম দৃষ্ট হয়—যাহা আধুনিক পরিভাষায় বলা যায় practical vedanta বা অদ্বৈত বেদান্তের জীবন-প্রযুক্তি। শ্রীঅনির্ব্বাণ 'বেদান্ত জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের (অনির্ব্বাণ-সত্য প্রণীত) প্রাক্-কথনে ইহারই একটা সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়াছেন: "এ যুগে বেদান্তের সমন্বয় বার্ত্তা নতুন করে প্রথম ঘোষণা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। * * শ্রীরামকৃষ্ণের পর বেদান্তের সমন্বয়ী বাণী ছড়িয়ে পড়ল এবং পড়ছে বিশ্বময়—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আর অরবিন্দ, বাংলার এই তিন বৈদান্তিকের মাধ্যমে। এঁদের উপস্থাপনায় পরস্পরের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও, তার মূল সুর এক। সে হল আদি বেদান্তের প্রাণবাদকে আবার ফিরিয়ে আনা এক প্রবল জিজীবিষার উদাত্ত ঘোষণায়। এ ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের মুখ্য সাধন হল এক প্রভাস্বর মনীষা, রবীন্দ্রনাথের এক রসসান্দ্র 'হৃদয়', আর অরবিন্দের 'দৈবং চক্ষুঃরূপী' এক মানসোত্তর 'মন' বা অতিমানস।"

বাংলার জীবন-সাধনার ত্রয়ী ধারা—জ্ঞান (বেদান্ত), শক্তি (তন্ত্র), প্রেম (বৈষ্ণবীয়) মূর্ত্ত বিগ্রহান্বিত হইতে দেখা যায় বাংলার এই তিন যুগন্ধর পুরুষে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবীয় প্রেম-ভক্তি ছিল বেদান্ত-ঘেঁষা—উপনিষদের 'শান্তম্' ঈশ্বরমুখী। কবির আকুতি ছিল, 'দাও ভক্তি শান্তিরস'। ইঁহাদেরই উত্তরসাধক ছিলেন সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সাধন-ঐতিহ্য তাঁর মধ্যে নূতন সংবেগ পায়; আদি বেদান্তের শান্তম্ অদ্বৈতম্ প্রাণসত্তা শক্তিময় গতিধর্ম্মে মুক্ত হইতে দেখা যায়। বৈষ্ণবীয় চিন্ময়ী ভক্তি শক্তির সৃজন-চঞ্চল অনন্ত গতিশীল বাস্তব বিশ্ব-জীবনে এক নূতন মহিমায় অন্বিত হয়। এখানেই সঙ্ঘগুরুজীর জীবনবাদের যুগ-বৈশিষ্ট্য—ভক্তি গতিতে অন্বিত। ভারত-শ্রুতির পুরুষ-সূক্তের নব যুগায়ন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়: "এই বিশ্ব-সৃষ্টি ব্যাপারটাই একটা যজ্ঞ; স্বয়ং বিরাট্ পুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। * * তাঁহার এই যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাহা একদিনের অনুষ্ঠান নহে—মহাকাল ব্যাপিয়া চলিতেছে। এই যজ্ঞের প্রয়াণও নাই, উদয়নও নাই; আরম্ভও নাই সমাপ্তিও নাই, কেননা এই যজ্ঞই তো বিশ্বব্যাপার।"

রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এই পুরুষ যজ্ঞের কথাই একটু ঘুরাইয়া লিখিয়াছেন, "প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোন প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করছেন, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়াই নিয়ত আমাদের ভিতর দিয়া উৎসর্জন করছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ।"

প্রবর্ত্তক তথা সঙ্ঘগুরুজীর জীবনবোধ ও জাতি-দর্শনের মূল সূত্র শ্রুতির এই পুরুষ-যজ্ঞের মধ্যেই নিহিত। বেদের সেই অবারিত অবাধ অনন্ত জীবনপ্রবাহের পূজারী ছিলেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ জীবনসাধনার ফলশ্রুতি বহু যুগ-চিন্তা ও ভাবনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত এই পুরুষ-যজ্ঞের জীবনবোধেই পরিণতি পায়। এ জীবন আত্মার অনাবিল অহেতুক অন্তহীন আত্মোৎসর্গের মধ্যে পরিপুষ্ট আর চরিতার্থ। জ্ঞানে, ধ্যানে ভক্তিতে নয়, জীবনের নিঃশ্বাসবায়ুরূপে তিনি এই অনন্ত জন্ম-মৃত্যুহীন জীবনবোধ লাভ করিয়াছিলেন এবং সৃজনের কর্ম্মযজ্ঞে নিজেকে অবিরাম আহুতি দিয়া বিশ্বকর্ম্মার আনন্দলীলার অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন। এই যে যজ্ঞময় চিরপ্রবাহময় জীবন ইহা "প্রীতি-মন্দাকিনী নিষ্কলুষ কর্ম্মধারায় অহরহ বেগবান; ইহা আপনার মধ্যে আপনি আত্মমুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না—শক্তির জগতে

নিজেকে প্রসারিত করিয়া, জীবনের অগ্নিক্ষেত্রে পুরুষ-যজ্ঞের বলিরূপে আপনাকে আহুতি দিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চায়।"

এই অবিরাম অনন্ত গতিশীল, এই নিষ্কাম নিষ্কলুষ অম্লান জীবন-চেতন প্রতিষ্ঠ একটা সমষ্টি তিনি চাহিয়াছিলেন নব ভাবতের অভ্যুত্থানকল্পে। এইরূপ জীবন-বোধসম্পন্ন গোষ্ঠীই হইবে ভারতের অধ্যাত্ম জাতীয়তার বনীয়াদ। এই জাতি-সংগঠনকল্পে তিনি ছিলেন উদ্বুদ্ধ উন্মাদ—তাঁর ছিল নীরব তপস্যা। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-বর্জ্জিত সর্ব্বসংস্কারমুক্ত নিত্যচৈতন্যযুক্ত নগ্ন উলঙ্গ মহা-জীবনযজ্ঞে বিশ্বমানব মিলনের স্বপ্ন সঙ্ঘগুরুজী দেখিয়াছিলেন। এই জীবন-সাধনা সম্পর্কে শ্রীমতিলালের কথা: "বড় শক্ত সাধনা। প্রতিদিন জন্মান্তর নূতন নূতন ভাবে ও ছন্দে। এ জীবনবাদ আমি আশা করি না একটা জাতির হবে। তবে একটা জাতিকে বর্ত্তমান স্তর থেকে উন্নত স্তরে তুলে ধরার শক্তি এই নূতনের আছে। আমি নূতনকে পেয়েছি আর এই নূতনকে বরণ করে নেওয়ার বীরদের ডেকেছি—ভীরুদের নয়, রক্তমাংসের ক্ষুধাকাতর পতঙ্গদের নয়। তাদের চিন্তা আমার পরে। আজ এস উলঙ্গ ঈশ্বরপ্রাণ, সর্ব্ব-কামনামুক্ত জীবনযজ্ঞের উৎসর্গে দীক্ষিত নারী-পুরুষ; তোমাদের চাওয়া সিদ্ধ করি।"

সঙ্ঘগুরুজীর এই দিব্য জীবন অবাস্তব কল্পনা নহে। তাঁরই দিব্য দর্শন: "আমার সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময় জগৎ, দিব্য চেতনায় পূর্ণ, দিব্য যুগের অসংখ্য নরনারী এই অভিনবকে বরণ করতে প্রধাবিত হচ্ছে। একটা মহা যুগধর্ম্মে ভারত দীক্ষা চায়। সে সঙ্কেত আমি দিয়েছি। ওঠ, উদ্বুদ্ধ হও।"

ভারতের প্রত্যাদিষ্ট মানব মুক্তির এই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুধু শ্রীমতিলালেরই ভরসা নয়, স্বামী বিবেকানন্দেরও কথা ছিল, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেত ছিল, 'ভারতের হৃদ্‌পিণ্ড এই বাংলা দেশ'। ঋষিকবির ভবিষ্যৎ বাণী হইতেছে, 'এই পূর্ব্বপ্রান্ত হইতেই নব সূর্য্যোদয় হইবে'।

বাংলার তথা ভারতের এই মহাজীবন ও জাতীয়তার যে আদর্শ ও স্বপ্ন যুগপুরুষেরা দেখিয়াছেন তাহা নিষ্ফল হইবার নহে—বাণী মূর্ত্তিরূপেই শুধু বিরাজ করিবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রেরণার উৎস হইবে। নেতাজীর আশ্বাস বাণী: "In this mortal world everything perishes and will perish—but ideas, ideals and dreams do not. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives."

প্রবর্ত্তক তথা যুগপুরুষ সঙ্ঘগুরুজীর নীরব স্বপ্ন ও তপস্যা তাঁর অজস্র বাণীর মধ্যে অগ্রবহ হইয়া আগামী কালে একদিন না একদিন অনাগতের প্রাণে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিয়া ব্যষ্টি ও জাতির জীবনে বিগ্রহান্বিত হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। ইহাই প্রবর্ত্তক তথা প্রবর্ত্তক পত্রিকার প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলালের 'মিশন'—জন্ম ও জীবনের অনন্ত ব্রত। এই নিত্য যজ্ঞময় বৈদিক জীবনবাদই তাঁর যুগবাণী। সঙ্ঘগুরুজীরই ভরসা: "আসিবে সেদিন আসিবে। কালপ্রভাবে যাহা আমরা হারাইয়াছি তাহা পুনরধিকার করার জন্যই তো আমাদের জন্ম। বসন্তের কোকিল বর্ষার আকাশ দেখিয়া যুগোপযোগী আনুগত্য কখনই স্বীকার করে না। কণ্ঠ সে রুদ্ধ করিয়া রাখে—বসন্তের পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। সেইরূপ সনাতন যুগের মানুষ" প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে সেই দিনের যেদিন তার কণ্ঠে এই যজ্ঞময় দিব্য জীবনের জয়গান ফুকারিয়া উঠিবে (এবারকার প্রবর্ত্তকের 'জীবনের আলো' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবের ভূমিকা

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবের অবদানের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে গেলে জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে প্রথমেই কিঞ্চিৎ ধারণা আবশ্যক। জন্মভূমিকে জননী জ্ঞানে কল্পনা করা ভারতীয় ইতিহাসে সুপ্রাচীন। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষকে জননী জন্মভূমি জ্ঞানে কল্পনা করা আধুনিক কালের ক্রমবিকাশ। ঐক্য-গ্রথিত কেন্দ্রীয় শাসিত ভারতের যে রাষ্ট্রিক মূর্তি আমরা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে অবলোকন করতে থাকি তা ইংরেজ শাসনের পরিণতি। ঐক্যগ্রথিত, কেন্দ্রীয় শাসিত ভারতের রাষ্ট্রিক পরিবেশে আমরা ঐক্যবদ্ধ বা অখণ্ড ভারতের মূর্তি কল্পনা করতে আরম্ভ করি। এই চেতনাই ভারতীয় চেতনাবাদ বিবর্তনের অত্যাবশ্যক প্রাথমিক সোপান। স্বাজাত্যবোধ ও স্বজাতিপ্রীতি না থাকলে দেশপ্রেম জাগ্রত হয় না। অপরের অস্তিত্বের সম্মুখীন হয়েই আমরা নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করি। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার অনুকরণের যে মোহ একদা আমাদের পেয়ে বসেছিল, শতাব্দীর শেষদিকে সেই মোহ থেকে ভারতীয় মন ও বুদ্ধি ক্রমশঃই মুক্ত হতে থাকে এবং সেই মোহমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন ক্রমশ স্বদেশমুখী হতে আরম্ভ করে। সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহ্য, নীলকর আন্দোলনের স্মৃতি, পাশ্চাত্য জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ স্বাধিকার-সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুত্থান, জাতীয় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ব্রাহ্মসমাজে সংগঠিত স্বাধীনতার আদর্শ, ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা ও সুরেন্দ্রনাথের ভারত-জোড়া প্রচার-সফর, লালমোহন ঘোষের বিলাত ভ্রমণ, ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ, এবং সর্বোপরি নব্য হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা—এই সমস্ত বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে এদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই নব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য বিগত জীর্ণ অতীতকে ফিরে পাওয়া ছিল না, অতীতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বা ঐশ্বর্য তা গ্রহণ করে নূতন-পুরাতনের সংমিশ্রণে জাতীয় চিত্তভূমিকে নবজীবন রসায়নে অভিসিঞ্চিত করাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম স্ফুরণ ধর্মক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রে হলেও, তা ধীরে ধীরে রাজনীতি ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিণতি, অন্যদিকে আবার এর কারণস্বরূপ। জাতীয় আন্দোলনে উভয়েরই প্রভাব অসামান্য।

॥ ২ ॥

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের স্থান কতটা উচ্চে তা মনে হয় আজও যথাযথভাবে নির্ণীত হয় নি। বিবেকানন্দ একজন খাঁটি সন্ন্যাসী বা সিদ্ধযোগী ছিলেন শুধু এ কথা বললে তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা হলো না। ভারতবর্ষে কোনদিনই সাধু-সন্ন্যাসীর ও বৈরাগীর অভাব হয় নি। শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ আজও এদেশে বিরল নয়। শুধু সন্ন্যাসধর্মের গৌরবে বিবেকানন্দ জাতীয় চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হন নি। জাতীয় জীবনে তাঁর অসামান্য প্রভাবের সব থেকে বড় কারণ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আধুনিক ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বদেশপ্রেমের আদর্শের সঙ্গে সন্ন্যাসবাদের আদর্শ স্বীয় জীবনে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠের" যা স্বপ্ন তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটলো বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে। নির্জন সাধনার দ্বারা নিছক আত্মমুক্তি তিনি কামনা করেন নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি। যতদিন পর্যন্ত ভারতের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন আমার মুক্তি নেই—এ কথা যে সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সে সন্ন্যাসী যে মামুলি সন্ন্যাসী নন সে কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ভগবানের অস্তিত্ব খুঁজবার জন্য পাহাড়ে-পর্বতে জঙ্গলে যাবার দরকার নেই—তার বিরাট প্রকাশ রয়েছে মানুষের মধ্যে। নরকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনবেদের গোড়ার কথা।

যাঁরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত, যাঁরা দুর্বল, ক্ষুধার্ত ও অধিকার বঞ্চিত তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, "So long as the millions live in hunger and ignorance I hold every man a traitor, who having been educated at their expense, pay not the least heed to them,"—অর্থাৎ যারা লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ও নিরক্ষর মানুষকে বঞ্চিত করে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করলো অথচ পরপর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করে না, তাদের প্রত্যেককে আমি বিশ্বাসঘাতক বলে বিবেচনা করি। বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক সমাজ-চিন্তা কতদূর এগিয়েছিল তার আর একটি প্রমাণ তাঁর এই উক্তির মধ্যে: "I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread."

বিবেকানন্দ সারা জীবন বেদান্ত প্রচার করেছেন। এই প্রচারের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক কি বা কতটুকু তা বুঝা দরকার। বেদান্তের মূলমন্ত্র জীবননিষ্ঠা। এর প্রতিষ্ঠা জীবনবাদে—জীবন অস্বীকারে নয়। জাতীয় জাগরণের অমোঘ হাতিয়ার হিসাবে বিবেকানন্দ ব্যবহার করলেন বেদান্তকে। বেদান্তের মৃত্যুহীন বাণী উচ্চারণ করে তিনি দেশের ভীরু, দুর্বল ও আত্মবিশ্বাসহীন জাতির জীবনে সঞ্চার করলেন অমিত যৌবনশক্তি ও কর্মোন্মাদনা। এই উন্মাদনাই দ্বিধাগ্রস্ত জাতিকে অল্পদিনের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গেলো ভয়হীন, শঙ্কাহীন ও বিরামহীন স্বরাজ সাধনার দুর্গম পথে। বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে ভারতবর্ষ সন্ধান পেলো স্বীয় আত্মার মর্মবাণী। বিবেকানন্দ বললেন, অন্যান্য সমস্ত দেবদেবী আজ নিদ্রিত। একমাত্র জাগ্রত রয়েছেন দেশমাতৃকা। আগামী পঞ্চাশ বছর এই দেশজননীর আরাধনাই তোমাদের হোক একমাত্র সাধনা।

বিবেকানন্দ জানতেন যে, জাতীয় মুক্তি শুধু আমাদের জাতিগত সংগঠন ও শক্তির মধ্য দিয়েই সম্ভব হবে না। তার জন্য চাই বিরামহীন আন্তর্জাতিক প্রচার কার্য। ১৮৯৩ সনে শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলনে তাঁর দিগ্বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুবক ভারতের দিগ্বিজয় সমগ্র দুনিয়ায় ঘোষিত হলো। বিবেকানন্দের শক্তিযোগের সাধনায়ও "মা আমায় মানুষ কর"-র অগ্নিগর্ভ বাণীতে আমরা বহুদিন পর আবার ফিরে পেলাম আমাদের হারানো আত্ম-সংবিৎ। এই শক্তিযোগী সন্ন্যাসীর উদাত্ত আহ্বানে ঘুমন্ত ভারতবর্ষ জেগে উঠলো, ১৯০৫ সনে বাংলায় দেখা দিল নবজীবনের জোয়ার। যুবক ভারত দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো স্বরাজ-সাধনার পথে। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রঁ্যলা বিবেকানন্দের জীবনালেখ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "বিবেকানন্দের পর যারা এল তারা দেখল, তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পর বৎসর বাংলায় এল বিপ্লব। বাংলার এই বিপ্লব তিলক ও গান্ধীর বিরাট আন্দোলনের ভূমিকা। বাংলার বিপ্লব যে সম্ভব হলো, আজ যে ভারতবর্ষ সংঘবদ্ধভাবে জনসাধারণকে নিয়ে একযোগে কাজ করতে পারছে তার মূলে রয়েছে স্বামীজির মাদ্রাজে উচ্চারিত সেই বাণী—ঘুমন্ত ভারতবর্ষ জাগো।"

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করলেন ১৯০২ সালে। তাঁর চিতাগ্নি থেকে যে দুটি জলন্ত শিখা বেরিয়ে এলো—তার একটি নিবেদিতা, আর একটি ব্রহ্মবান্ধব। বিবেকানন্দের আরব্ধ সাধনা—ফিরিঙ্গিজয়ব্রত-উদ্‌যাপনের সাধনাকে সফল করবার সঙ্কল্পে ব্রহ্মবান্ধব শেষ জীবনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। যে নির্ভীক যোদ্ধা সন্ন্যাসী অর্ধ-শতাব্দীরও পূর্বে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাবলী প্রদান করে ভারতবাসীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যে ত্যাগী ও ধীশক্তিমান পুরুষসিংহ তাঁর কার্যকলাপ ও রচনার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে একদা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ও স্বরাজ-সাধনার বেদীমূলে যিনি অকৃপণভাবে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় নির্ভীক পুরুষসিংহকেও আজ বাঙালী ভুলতে বসেছে।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বাশ্রমের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ধর্মজীবনের অভিব্যক্তি বিস্ময়কর। প্রথমে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী ও সনাতনী, তৎপর কেশব-পন্থী ব্রাহ্ম, তারপর প্রোটেস্টান খৃষ্টান, তারপর ক্যাথলিকপন্থী এবং সর্বশেষে বৈদান্তিক ও ন্যাশনালিস্ট

১৮৯৪-১৯০০ সনের সময় তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল সিন্ধুদেশ। নবহিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের আন্দোলনকে তখন তিনি সুনজরে দেখতে পারেন নি। তখন তিনি ছিলেন পুরাপুরি বিবেকানন্দ-বিরোধী। সে সময় বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জাগরণকে সম্ভব করে তোলা, ঠিক সে সময় উপাধ্যায় চাইলেন ভারতকে খৃষ্টধর্মের প্রাণশক্তি দিয়ে নবীন ও বলীয়ান করে তোলা। দু'জনেই স্বদেশপ্রেমিক ও কট্টর জাতীয়তাবাদী, কিন্তু উভয়ের স্বদেশসেবার প্রণালী স্বতন্ত্র।

কিন্তু কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই বিবেকানন্দ-বিরোধী ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তায় ও দর্শনে এলো নব রূপান্তর। বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পূর্বেই উপাধ্যায় "বঙ্গদর্শনে" লিখলেন: "হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাদের ইহপরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অপ্রতিষ্ঠিত হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও।"

আত্মপ্রতিষ্ঠিত ও স্বধর্মে স্থিত না হলে জাতীয় মনীষার সম্যক্ ও পরিপূর্ণ বিকাশ কখনও সম্ভব নয়। বিংশ শতকের সূচনায় যে স্বপ্ন উপাধ্যায়ের কল্পনা ও মননকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা হলো হিন্দু সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি হবে ভারতের জাতীয় শিক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতি। স্বদেশী যুগের প্রাক্কালে তিনি দেশবাসীর সামনে এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার অগ্নিমন্ত্র প্রচার করলেন। বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় সংগঠনের পশ্চাতেও প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল এই আদর্শের প্রেরণা। স্বদেশী শিক্ষা প্রচার করে দেশের যুবসম্প্রদায়কে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় আত্ম-বিকাশের পথ প্রশস্ত করাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। "যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও"—এই ছিল তাঁর বাণী।

স্বদেশী আন্দোলনের উষালগ্নে ব্রহ্মবান্ধব প্রতিষ্ঠা করলেন "সন্ধ্যা" পত্রিকা। ফিরিঙ্গি ও সাহেবি ঔদ্ধত্য ও নকলপনার বিরুদ্ধে তিনি এই দৈনিক পত্রিকার মারফৎ জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাঁর ফিরিঙ্গিবিদ্রূপের উদ্দেশ্য ছিল ফিরিঙ্গির সম্বন্ধে ভারতবাসীর যে প্রকৃতিগত ভয় সেই ভয় ভাঙা। তাঁর রচিত ও "সন্ধ্যা" পত্রে প্রকাশিত "গোদা পা'র ভোঁথা লাথি" আজও স্মরণীয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শক্তির স্ফীতিকে তিনি ঐ প্রবন্ধে গোদা পার শক্তির সঙ্গেই তুলনা করেছিলেন। তিনি একদিকে যেমন শক্তিমদোন্মত্ত ফিরিঙ্গিদের উপর কশাঘাত করলেন, তেমনি আবার প্রচণ্ড আঘাত হানলেন জাতির জন্মগত ভয় দ্বিধা, দুর্বলতা ও ক্লৈব্যের উপর। বিবেকানন্দের মতই তিনি স্পষ্টভাবে অবলোকন করলেন যে, সারা দেশটা ধর্মের নামে সাত্ত্বিকতার আবরণে এক কুৎসিত ও ঘৃণ্য ক্লৈব্য ও তামসিকতায় আচ্ছন্ন। ব্রহ্মবান্ধব বহুদিনের সেই অভ্যস্ত নিরাপদ তমোভাবকে নিষ্করুণভাবে আঘাত করেছিলেন, এবং জাতির নিস্তেজ ও রুগ্ন মনের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন নতুন আবেগ ও উন্মাদনা, তাঁব কণ্ঠে দিয়েছিলেন স্বরাজের অগ্নিগর্ভ মন্ত্র। তিনি লিখলেন:

"তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোগুণটা স্বভাবত: কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নরম প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের ঐ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাবকাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না। ...দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকর-ধ্বজেরও উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। দেশে চারিদিকে তমোভাব—অসারতা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না...রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।"

উপাধ্যায়ের যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কাজ। তাঁর "সন্ধ্যা" পত্রিকার চাবুক খেয়ে সেদিন মোহমগ্ন বাঙালী জাতির মোহভঙ্গ হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:

"উপাধ্যায়ের কৃতকার্য আমাদের রাজনীতির বেলায় সাগুরোর্মির আঘাতমাত্র নহে। আজ যে বাঙ্গলা

দৈনিকপত্র হাজারে হাজারে দশ হাজারে দশ হাজারে বিকাইতেছে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহার মূল। ব্রহ্মবান্ধব এদেশে জনসাধারণের মনে জাতীয় ভাব প্রচারের পথ প্রস্তুত করেন। তিনি বয়কটের প্রধান পুরোহিত। সেই নির্ভীক—নিঃস্বার্থ ত্যাগীর আদর্শ একদিন দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে অসীম শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল।"

ব্রহ্মবান্ধবের দেহাবসানের মাত্র ছয় মাস পরে শ্রীঅরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রে জাতীয় আন্দোলনের উপাধ্যায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন আজও তা প্রনিধাবনযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করলেন যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক স্বরাজ লাভ নয়, সেই রাজনৈতিক স্বরাজলাভের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনাকে স্বদেশী ভাবে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করে জাতীয় আত্মবিকাশকে সম্ভব করে তোলা। তাই তিনি লিখলেন: "It is for this reason that the movement for swaraj found its first expression in an outburst of swadeshi sentiment which directed itself not merely against foreign goods, but against foreign habits, foreign dress and manners, foreign education, and sought to bring the people back to their own civilization. The late Upadhayaya was the type and champion of this feature of the National movememt. He was never weary of harping on the necessity of stripping from ourselves every rag of borrowed European thought and habits and becoming intensely, uncompromisingly Indian. When we put aside all the mannerisms of that strong personality and seek its kernel, we find that this was his message and the meaning of his life. After himself going through all the phases of Europeanised thought and religion, he returned like his country with a violent rebound to the religion, the thoughts, the habits and the speech of his forefathers. It is the spirit of old Bengal which incarnated itself in him, with the strength, courage, passionate adherence to conviction which was the temperament of old Bengal and which modern Bengal had for a period lost. His declaration in court and his death put a seal upon the meaning of his life and left his name stamped indelibly on the pages of history, as a saint and martyr of the new faith."

মানসী

শ্রীবংশী মণ্ডল

শ্রাবণের ভরা মেঘে সঞ্চারিত পাহাড়ী আলোয়
রামধনু ছায়া কাঁপে দিগন্তের আনে সম্ভাষণ,
প্রাণের বসন্তে রচে হিমানীর শুধু সম্মোহন
আজ প্রিয় মুখোমুখি চোখ রেখে তবু চেয়ে রই।
আশ্বিনের পাতা কাঁপা যত ঝড় হিমাদ্রি তুষার
পাইন ঝর্ণার স্রোতে নিয়ে আসে বিস্মৃত মহিমা
অবণ্যের পথপাশে পলাতকা হারায়েছে সীমা
আজি তাই বন-বীণা তুলিয়াছে স্মৃতির ঝঙ্কার

অস্ত গোধূলির তীরে প্রদোষের আরক্ত লগন
সুষুপ্তির স্বর্ণ রঙে ঘনায় কি আরণ্য শিশির
শুষ্ক যত ফুলদলে—হৃদয়ের আসন্ন আবির
ছড়ায় পথের প্রান্তে ছন্নছাড়া শেষ আয়োজন।
নিমেষ বেদনাহত বাণীশূন্য অব্যক্তের ভাষা
খুঁজে ফেরে চিত্ততল প্রিয়তম ফেল দীর্ঘশ্বাস
হতাশার শূন্য নীলে দাবদগ্ধ বিষাক্ত আকাশ
মরে যাবে একদিন মৃতছন্দে কুহকিনী আশা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি : ফাল্গুন সংখ্যার পর]

সমুদ্রতটে একটা নাতিবৃহৎ পর্বতশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হোয়ে গ্রহবর্মা রোষকষায়িত নয়নে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সমুদ্রের দিকে। ভীষণ জলযুদ্ধে পরাজিত হোয়ে মাত্র খানকয়েক ছিন্নভিন্ন ভগ্নপ্রায় অর্ধনিমজ্জিত রণতরী ফিরে আসছিল কূলের দিকে। পেছনে ছুটে আসছিল ইন্দ্রনীলের অসংখ্য রণতরী। তাদের সৈন্যদের রণহুঙ্কার ও রণদামামার নিনাদ গ্রহবর্মার কর্ণে প্রবেশ কোরে তার রক্তচলাচল চঞ্চল কোরে তুলছিল। নিজের স্থলসৈন্যদের উপকূলব্যাপী ব্যূহ রচনা কোরতে আদেশ দিল গ্রহবর্মা। কিন্তু তার সৈন্যবল ইন্দ্রনীলের তুলনায় পর্যাপ্ত মনে কোরলো না। নিরুপায় হোয়ে সেনাপতিকে আদেশ দিলো আরো সৈন্য সমাবেশ কোরতে। কিন্তু সেনাপতি অক্ষমতা জানালো রাজধানী ও প্রাসাদ রক্ষার্থে যে সৈন্য আছে, উপস্থিত তা সরিয়ে আনা যুক্তিযুক্ত নয়। এতদিন রাজ্যব্যাপী যে অসন্তোষ ধূমায়িত হোচ্ছিল তা এখন বিদ্রোহের রূপ ধারণ কোরেছে, সুতরাং···

গ্রহবর্মা স্বয়ং সৈন্যদের উৎসাহিত কোরতে তড়িৎবেগে পর্বত হোতে নামতে লাগলো। ইন্দ্রনীল!—হস্তের তরবারি দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করে গ্রহবর্মা। আজ শেষ কোরবে সে নিজ হস্তে ইন্দ্রনীলকে। সহসা পায়ে এক খণ্ড প্রস্তর লাগায় পদস্খলন হোলো তার। পশ্চাৎ হোতে সেনাপতি অতো দ্রুত না নামার জন্য অনুরোধ জানালো। গ্রহবর্মা নিজেকে সামলে নিলো। কিন্তু গতিবেগ কমালে না।

সৈন্যমধ্যে গ্রহবর্মাকে দেখে তারা রাজার নাম উচ্চারণ কোরে জয়ধ্বনি করে। গ্রহবর্মা সৈন্যদের প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত কোরলো। যুদ্ধ সুরু হোলো। উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত শরে আকাশ ছেয়ে গেল। শেষ শরজালের মধ্য দিয়ে ছোট রণতরী কোরে ইন্দ্রনীলের সৈন্যদল পিঁপড়ের সারির ন্যায় এগিয়ে আসতে লাগলো। সমুদ্রের নীল জল রাঙা হোয়ে গেল গৌড়বঙ্গের সেনার রক্তে। সেই রক্তের ওপর সাঁতার দিয়েই দন্তে মুক্ত তরবারি চেপে ধ'রে কাতারে কাতারে আসে বীর সেনাদল। তারা তীরে উপনীত হোয়ে অমিত বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রহবর্মার বাহিনীর ওপর। স্থানে স্থানে গ্রহবর্মার ব্যূহ ভেদ হোয়ে যায়। গ্রহবর্মা অশ্বপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রের একস্থান হোতে অন্য স্থানে ছুটে যায়। ঠিক এমনি সময়ে তার কাছে সংবাদ আসে রাজধানীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হোয়েছে। তাদের লক্ষ্য রাজপ্রাসাদ। সেনাপতিকে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়ে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সে রাজধানীর উদ্দেশে উল্কাবেগে ছুটলো; পথিমধ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়—গ্রহবর্মা নির্মমহস্তে তা দমন করে।

প্রাসাদ-দুর্গে উপনীত হোয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা কোরলো গ্রহবর্মা।—না, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে বর্তমান যুদ্ধে সে কোনক্রমেই জয়লাভ কোরতে পারবে না। তাছাড়া চতুর্দিকে বিদ্রোহের বেড়া আগুন; বিদ্রোহীরা খানিকটা ছত্রভঙ্গ হোয়ে গেছে বটে, তবে তারা যে

পুনরায় শক্তি সংগ্রহ কোরবে, তা নিশ্চিত। এ যুদ্ধে যদি ইন্দ্রনীলের পরাজয়ও হয় তা হোলেও অচিরে ইন্দ্রনীলের সাহায্যার্থে আসবে শৈলেন্দ্রের বিপুল বাহিনী। শৈলেন্দ্রের সঙ্গে যে ইন্দ্রনীলের প্রগাঢ় সখ্য হোয়েছে তা গ্রহবর্মার অজ্ঞাত নয়।

তবে?

রাজকোষের সমস্ত অর্থ ও সম্পদ তখনি চম্পানগরীতে প্রেরণ করার আদেশ দিলো গ্রহবর্মা; আর সেই সঙ্গে পুত্র ও অন্তঃপুরচারিণীদের চম্পানগরীতে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরলো। প্রাসাদের রক্ষিপ্রধানের সঙ্গে প্রাসাদরক্ষার পরামর্শ কোরলো সে। হঠাৎ তার মনে পড়লো শর্মিষ্ঠার কথা। সে তো কারাগারে বন্দী। শেষ কোরে দেবে তার জীবন? না তার দরকার নেই?

ঘর্মাক্ত কলেবরে এক সৈনিক এসে কম্পিত স্বরে বোললো, আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হোয়েছি···সৈনিক! গ্রহবর্মা ধমক দিয়ে ওঠে। সৈনিক কি বোলতে যায়—পারে না! সে সশব্দে মাটিতে প'ড়ে যায়। পৃষ্ঠে তার তখনো শর বিদ্ধ হোয়ে রয়েছে।

হাঁ, পালাতে হবে, আর দেরী করা সমীচীন নয়। কিন্তু তার আগে শর্মিষ্ঠার ব্যবস্থা কোরতে হবে। হাঁ, ব্যবস্থা আপাততঃ সে নিয়ে যাবে শর্মিষ্ঠাকে চম্পানগরীতে।

গ্রহবর্মা দ্রুতগতিতে কারাগারে উপস্থিত হোয়ে শর্মিষ্ঠাকে মুক্ত কোরে নিয়ে আসে। শর্মিষ্ঠা বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে, কোথায় নিয়ে চ'লেছ?

গ্রহবর্মা উত্তর না দিয়ে দৃঢ় হস্তে শর্মিষ্ঠাকে আকর্ষণ কোরে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে বায়ুবেগে অদৃশ্য হয়।

ইন্দ্রনীল কম্বোজের দুর্গপ্রাসাদে সসৈন্য এসে উপনীত হোলো। গ্রহবর্মার অবশিষ্ট যা সৈন্য ছিল সমূহ বিপদ্ বুঝে পশ্চাতের গুপ্তদ্বার দিয়ে পলায়ন কোরলো; প্রায় বিনা বাধায় প্রাসাদ ইন্দ্রনীলের অধিকৃত হোলো। রাজধানীর আবালবৃদ্ধবণিতা এসে যুবরাজের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত কোরে তুললো। ইন্দ্রনীল রণক্লান্ত বাহিনীকে বিশ্রামের আদেশ দিলো। সেনাপতি কোদণ্ড প্রতিবাদ কোরে বোলে উঠলো, না।

বিস্মিত ইন্দ্রনীল প্রশ্ন করে, সে কি কোদণ্ড?

যুবরাজ, কাজের যেমন শেষ রাখতে নেই, তেমনি শত্রুরও শেষ রাখতে নেই। আর এখনই সসৈন্য চম্পা অভিযান কোরতে চাই পাষণ্ড গ্রহবর্মার ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্রাম কোরতে পারবো না।

বেশ কথা। কিন্তু ক্ষণেকের তরে বিশ্রামের ক্ষতি কি?

বিশেষ ক্ষতি আছে। ইন্দ্রনীল! তুমি তোমার হৃত রাজ্য, হৃত সিংহাসন পুনরধিকার কোরেছ, কিন্তু কাম্বোজনন্দিনীকে যে গ্রহবর্মা বন্দী কোরে নিয়ে গেছে, তা তুমি ভুলে যাচ্ছো কেমন কোরে?

ভুলিনি বন্ধু, আমি আমার প্রিয় সহোদরা শর্মিষ্ঠার কথা ভুলিনি, তাকে রক্ষা কোরতে না পারার অব্যক্ত বেদনাভরা লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আছে। কিন্তু আর তো উপায় নেই, বন্ধু, শর্মিষ্ঠা যে গ্রহবর্মার পত্নী।

আমি তা স্বীকার করি না। কোদণ্ড দৃঢ়স্বরে বোলতে থাকে,—ইন্দ্রনীল, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন হোয়েছে, করো। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যাত্রা কোরছি—গ্রহবর্মাকে বধ কোরে শর্মিষ্ঠাকে উদ্ধার কোরতে। দেবী শর্মিষ্ঠা আমার অপেক্ষায় ক্ষণ গণনা কোরছে।

কোদণ্ড এক লাফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কোরলো।

কোদণ্ড! ইন্দ্রনীল জড়িত কণ্ঠে বোললো, তুমি—তুমি শর্মিষ্ঠাকে ভা-লো-বা-সো?

হাঁ, সে আমার। বহু বিলম্ব হোয়ে গেছে—আর না।

পলক মধ্যে কোদণ্ডের অশ্ব দৃষ্টিবহির্ভূত হোলো, সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে অবলোকন কোরে সমগ্র বাহিনী হর্ষধ্বনি কোরে উঠলো।

কি ভাবছ?

চার্বীর প্রশ্নে ইন্দ্রনীলের চকম ভাঙলো।

চার্বী! ইন্দ্রনীল বোললো, কোদণ্ড একাই চলে গেলো।

দীর্ঘদিন ধরে যে আগুন সে বুকের মধ্যে বহু আয়াসে চেপে রেখেছিল, আজ তা দাবাগ্নির মতন সহসা প্রকাশ

পেয়েছে। শ্রীরামের ন্যায় কোদণ্ড এক নারীর প্রেমেই ধন্য। এ যুগে এ অতি দুর্লভ ঘটনা। যুবরাজ, তোমার সৈন্যদের এখনি আদেশ দাও, সেনাপতি কোদণ্ডকে অনুসরণ কোরতে।

আর আমি? ইন্দ্রনীল বলে, নিশ্চিন্ত আরামে এখানে সুখভোগ কোরবো?

আপাততঃ তাই। চম্পা অভিযানে কোদণ্ডকে নেতৃত্ব কোরতে দাও।

চম্পানগরীর পথে কোদণ্ডর বিপুল বাহিনী পর পর কয়েকটি যুদ্ধের সম্মুখীন হোলো। অমিতবিক্রমে কোদণ্ড সবকিছু ছিন্ন ভিন্ন কোরে সকল যুদ্ধে জয়লাভ কোরে রণপটু গৌড়বঙ্গবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হোলো চম্পা-নগরীর প্রধান দুর্গের পাদদেশে। রণোন্মাদ তুরঙ্গের গতি সংযত কোরে কোদণ্ড সসৈন্য দুর্গ আক্রমণ কোরলো।—এইটি গ্রহবর্মার শেষ সুরক্ষিত ঘাঁটি। এই দুর্গেই গ্রহবর্মা স্বয়ং আশ্রয় নিয়েছে, এইখানেই আছে কোদণ্ডর আবাল্য ঈপ্সিত ধন—লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা বন্দী শর্মিষ্ঠা। কোদণ্ডর সৈন্যদল প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় দুর্গদ্বারে আছড়ে পড়ে……আবার প্রতিহত হোয়ে ফিরে ফিরে যায়। দুর্গরক্ষীরা দুর্গপ্রাকারের ওপর থেকে রাশি রাশি বাণ, প্রস্তর খণ্ড, অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে অবিশ্রান্ত কোদণ্ড-বাহিনীর ওপর। আর প্রবল ধারায় বর্ষিত হোতে থাকে অত্যুষ্ণ জল উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায়। তথাপি মৃত্যু তুচ্ছ কোরে চলে এই প্রাণ-কাড়াকাড়ির বোঝাপড়া!

দুর্গের সুদৃঢ় অর্গলবদ্ধ ভীমকায় দ্বার উদ্ঘাটন করার জন্য কয়েকটি হাতী নিয়োগ করা হয়; কিন্তু সেই ভীমদ্বার সুতীক্ষ্ণ প্রোথিত লৌহশলাকা দ্বারা সর্বস্থানে সুরক্ষিত থাকায় হস্তিযূথের উর্ধ্বোত্থিত লৌহদণ্ডের ন্যায় কুলিশ কঠোর শুণ্ড সকল যেন অকৃতকার্যতায় অবনত হোয়ে পড়ে। বিরাট্ বিরাট্ কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বহু-লোকের যুগপৎ প্রবল আঘাতও বিফল হয়। সময় ব'য়ে যায়—কোদণ্ড অধৈর্য হোয়ে ওঠে। চিন্তায় তার সারা মন ভ'রে যায়। এত বিলম্বে পাষণ্ড গ্রহবর্মার কোপদৃষ্টি থেকে কি শর্মিষ্ঠা রক্ষা পাবে? যেমন কোরে হোক চূর্ণ করো দ্বার! কোদণ্ড এই আদেশের সঙ্গে প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা কোরে অশ্বপৃষ্ঠে গমন কোরলে—দুর্গপ্রবেশের অন্য কোন উপায় আছে কিনা অন্বেষণ কোরতে।

অবশেষে একজন সৈন্যাধ্যক্ষের মাথায় ঢোকে এক উপায়। কদলীবৃক্ষ দ্বারের নিম্ন হোতে ঊর্ধ্ব পর্যন্ত খাড়া ভাবে রক্ষিত হোলো। হস্তিযূথ অক্লেশে তার ওপর শুঁড় দিয়ে বলপ্রয়োগ কোরতে পারে। এই উপায় অবলম্বনে দুর্গদ্বার অনায়াসে ধ্বংস হবে। উপায় তো উদ্ভাবিত হোলো, কিন্তু কদলীবৃক্ষ তো নিকটে কোথাও নেই।

দ্রুত সৈন্যক্ষয়ের সঙ্গে কালক্ষয় হোতে থাকে। দুর্গদ্বার আক্রমণে নিযুক্ত অধ্যক্ষের নিকট দেবদত্ত এসে বলে, কলাগাছের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পাওয়া গেছে! অধ্যক্ষ বলে, তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। শীঘ্র আনবার ব্যবস্থা করো।

আসুন আমার সঙ্গে।

উভয়ে দ্রুতপদে দুর্গদ্বারে উপনীত হয়। অধ্যক্ষ আশ্চর্য হোয়ে বলে, কোথায় তোমার কলাগাছ! এই ভীষণ রণক্ষেত্রে তুমি বালক পরিহাস কোরছ!

না—দেবদত্ত অবিকম্পিত স্বরে বলে, আমিই কলাগাছ।

দেবদত্ত তড়িৎ গতিতে কবাটের সুতীক্ষ্ণ শলাগুলোর ওপর নিজের পিঠ 'ন্যস্ত' কোরে খাড়া হোয়ে দাঁড়ায়—মুখে তার দিব্য জ্যোতি খেলতে থাকে।

অধ্যক্ষ চীৎকার কোরে ওঠে, দেবদত্ত। তুমি কি উন্মাদ!

দেবদত্ত শান্ত কণ্ঠে বলে, অধ্যক্ষ আমার সর্বাঙ্গের উপর হস্তী চালনা কোরতে আদেশ দিন। জয় সেনাপতি কোদণ্ডের জয়!

কেমন কোরে, কেমন কোরে এই নারকীয় নৃশংস আদেশ দেবো! আমার কি হৃদয় নেই! আমি কি সন্তানের জনক নই!

দেবদত্ত তীব্রকণ্ঠে বোলে ওঠে, সেনাপতি কোদণ্ডের

অধীনে যে এমন ভীরু, কাপুরুষ সৈন্যাধ্যক্ষ আছে, তা আমার জানা ছিল না। হস্তিচালকগণ, আমার দেহের ওপর তোমাদের হস্তী চালনা করো —সৈন্যাধ্যক্ষ! রণক্ষেত্র হোতে ফিরে যাও অন্তঃপুরে নারীমণ্ডলে!

দেবদত্ত! তোমার মত সৈনিক পেয়ে আমি ধন্য। তোমার এই অসাধারণ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পুরাণেও দুর্লভ! চলো বালক! তোমার এই গৌরবময় আত্মত্যাগের বিবরণ কোথায় কোন্ ভাগ্যবান্ জনকের কাছে পাঠাবো। কি দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করবো?

কিশোর দেবদত্ত নিষ্কম্প স্বরে ধীরে ধীরে বলে, সেনাপতি কোদণ্ডদেবের নিকট আমার শেষ প্রণতি জানাবেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত খ্যাতির জন্য এই মৃত্যুই আমার পরম পুরস্কার।—তিনিই আমার সবার বড়ো আপন জন। কোদণ্ডদেব! কোদণ্ডদের! দেব··· দেব·····

তারপর? তারপর সংহার মূর্তিতে প্রচণ্ড বলে হস্তিযূথ তাদের কর্তব্য সম্পাদন কোরলো, দেবদত্তর কমনীয় কোমল দেহ কবাটে নিশ্চিহ্ন হোলো, কেবল রুধির-পিপাসু ধরণী দেবদত্তের রক্তধারা ছিন্নমস্তার ন্যায় পান কোরতে লাগলো। দেবদত্ত দাতার চরণে স্থান পেলো।

দুর্গদ্বার সশব্দে ভেঙে প'ড়লে বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের ন্যায় সৈন্যগণ দুর্গে প্রবেশ কোরলো। যুদ্ধরত সেনাপতি কোদণ্ড দুর্গপ্রবেশের সময় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট শুনলো, রোমাঞ্চকর ভীতিভয়প্রদ অপূর্ব প্রাণদানের অমর কাহিনী। সেই বারেকের তরে অশ্ববল্গা সংহরণ কোরে ভগ্ন রুধিরাক্ত দ্বারের প্রতি তাকালো, পর মুহূর্তেই দ্রুতবেগে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ কোরলো।

বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! যে কোদণ্ডের জন্য কিশোর দেবদত্ত তার কোমল, পেলব দেহ উৎসর্গ কোরলো, তার যথার্থ পরিচয় কেউ জানতে পারলো না। চেষ্টা কোরলে কি সেনাপতি কোদণ্ডও জানতে পারতো না! দেবদত্ত এই অভিযানে কোদণ্ডের সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ কোরেছে—দিবারাত্র কোরেছে··· জলে, স্থলে, রণক্ষেত্রে, অশ্বপৃষ্ঠে। তবু···হাঁ, কোদণ্ড অন্ধ—শর্মিষ্ঠার প্রেমে সে অন্ধ। তাই সে আজও—এই চরম পরিণতির পরেও তাকে চিনতে পারলো না। কোদণ্ড একবার ভেবেও দেখলো না, ঐ কিশোর কেন, কিসের জন্য এইভাবে প্রাণ দিলো? কিন্তু অনাগত কালেও কি কোদণ্ড জানতে পারবে না? রণশেষে শান্তির সময়ও কি তার অনুসন্ধিৎসু মন খুঁজবে না মহৎ এই ত্যাগের কারণ?

সকলের অলক্ষ্যে·····মহাবীর সেনাপতি কোদণ্ডের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঝ'রে গেল একটি দিব্য উজ্জ্বল নক্ষত্র —পৃথিবীর লোকে বলে উল্কাপাত! হাঁ। সেই শান্ত-শীলা, আয়তনয়না, গৌড়কন্যা কোদণ্ডপ্রেমিকা, ক্রীতদাসী উল্কার সংক্ষিপ্ত জীবননাটিকার ওপর যবনিকাপাত হোলো—শান্ত জলন্ত উল্কা নির্বাপিত হোয়ে অনন্তে বিলীন হোলো!

শেষ

সমারসেট্ মম্

শ্রীহংস

…যৌবনের বছরগুলি বড় দীর্ঘ মনে হয়, বুঝি শেষই হবে না। মধ্য বয়সেও যে কাজটা প্রয়োজনীয় অথচ অপ্রিয়, তাকে হচ্ছে হবে করে দূরে সরিয়ে রাখার একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করা যায়। কিন্তু অবশেষে একটা সময় আসে যখন মৃত্যুকে আর অস্বীকার করা যায় না। এখানে ওখানে একটী একটী করে সমসাময়িকেরা খসে পড়তে থাকে।…টাইমস্-এর জন্মমৃত্যু কলামে নজর পড়তে মনে হল ষাটের কোঠার বয়সটা বড় অস্বাস্থ্যকর। অথচ এ বইটা শেষ করার আগেই যদি শেষদিন এসে পড়ে আমার, ভয়ঙ্কর বিরক্ত হব আমি। অতএব অবিলম্বে সুরু করা যাক।…

তাঁর অন্যতম বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'দি সামিং আপ' লিখবার কৈফিয়ৎ হিসেবে এই কথাগুলি বলেছিলেন অপরাজেয় ব্রিটিশ কথাসাহিত্যিক উইলিয়াম সমারসেট মম্। বয়স তখন তাঁর ষাটের কোঠায়। যদিও 'সামিং আপ' তাঁর শেষ গ্রন্থ হবে না এ কথা মনে হয়েছিল মমেরও, কিন্তু শেষ দিনও আর বেশী দূরে নয়, এ দুশ্চিন্তা তাঁকে পীড়িত করেছে ষাটের ঘরের বয়সেই। উইল করেই অবশ্য মানুষ মরে যায় না, এ কথা বলেছেন মমই। বলেছেন, উইল একটা ভবিষ্যতে নিরুদ্বেগ দিন কাটাবার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। 'সামিং আপ' তাঁর সাহিত্য-জীবনের উইল। উইলের পর তিনি অবিশ্বাস্যরূপে দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন। সম্প্রতি একানব্বই বছর বয়সে সেই দিনটী এল মমের। ১৯৪৮-এ তাঁর শেষ উপন্যাস 'ক্যাটালিনা' প্রকাশের পর কলম ছেড়েছেন মম। তারপর নিরুদ্বেগ চিত্তে দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। তাঁর বিশ্বপরিক্রমার প্রোগ্রামে ভারতবর্ষও বাদ যায় নি। দু বার এসেছেন এদেশে। একবার ১৯৩৬-এ, আর একবার শেষ বয়সে দীর্ঘ পাঁচ মাসের সফরে।• ভারতীয় দর্শনের প্রতি মমের গভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'রেজর্স এজ'-এ।

জন্ম আইনজীবী পরিবারে (২৫শে জানুয়ারী ১৮৭৪), ভবিষ্যতের পেশা হিসেবে পড়লেন ডাক্তারী, আর পৃথিবীর কাছে পরিচিত হলেন লেখক হিসেবে। উইলিয়াম সমারসেট মম্ এ-শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম।

পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা লেখকের জীবনেই দেখা যায় সূচনাটা হয় অন্য পেশা দিয়ে (অন্য উপমা অশ্বরক্ষক সেক্সপীয়র)। মমের সুরুটা যদিও চিকিৎসাবৃত্তিতে, কিন্তু ডাক্তারি পড়েছিলেন তিনি মনের তাগিদে নয়, মানের দায়ে। কারণ তাঁর পরিবারে—শুধু মম-পরিবারই বা বলি কেন, দুনিয়ার কোন পরিবারেই বা জীবিকা হিসেবে লেখনীবৃত্তিকে অতি নগণ্য মর্যাদাহীন না ভাবা হয়! মমের আত্মীয়স্বজনদের মতে লেখক মমের চেয়ে ডক্টর মমের কৌলীন্য অনেক বেশী। মমের কিন্তু নিজের আসল পথ খুঁজে নিতে বেশী দেরি হল না। ঐ ডাক্তারী করতে বসেই তিনি অকস্মাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন লেখক মমকে। আর আবিষ্কার যেদিন করলেন সেদিন আর কোন আপস রফা নয়; মুহূর্তে ষ্টেথস্কোপ ছেড়ে শক্ত হাতে চেপে ধরলেন কলম সেই তেইশ বছরের যুবা। তারপর অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল সে কলম আর ছাড়েন নি।

আট বছর বয়সে মমের মাতৃবিয়োগ হয়, পিতারও মৃত্যু হল দশ বছর বয়সে। সেই দশ বছুরে ছেলেই হয়ে বসল নিজের অভিভাবক। এ অবস্থায় পরামর্শ-দাতার অভাব হয় না। তাদের (আত্মীয় স্বজনদের) পরামর্শেই ডাক্তারী পড়লেন মম। পাশও করলেন। এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি ডক্টর মম ১৮৯২ সালে চিকিৎসক হিসেবে প্রবেশ করলেন লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হস্পিটালে। ১৮ বছরের এক তরুণ ডাক্তার। তার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৯৭-তে প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লিজা অব্ ল্যামবেথ'। ডাক্তারী ছাত্র হিসেবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই লেখা এ উপন্যাস। কুড়ি পাউণ্ড সম্মান মূল্য পেলেন মম। উৎসাহে উত্তেজনায় ময়ূরের মত নেচে উঠল

ডাক্তারের বুকে ঘুমোনো এক লেখক। হাসপাতালকে শেষ বিদায় জানিয়ে প্যারিসে এসে লেখক হয়ে বসলেন তেইশ বছরের এক তেজস্বী তরুণ।

কিন্তু ঘরের কোণে শান্ত হয়ে বসে সাহিত্যচর্চা করবার ছেলে নয় মম। ভ্রমণ করেছেন তিনি প্রায় সারাটা বিশ্বই। এই বহু ভ্রমণের ফলেই একটা বিশ্ব-জনীন দৃষ্টিভঙ্গীও লাভ করেছিলেন তিনি। ভ্রমণের পথে পথে মুঠো মুঠো সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, আর লেখনীর যাদুস্পর্শে সেই ধূলিমুঠিকে সোনামুঠি করে পরিবেশন করেছেন পাঠকদের কাছে। ভ্রমণের নেশাটা ছিল তাঁর অসাধারণ। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে ভ্রমণ অপরিহার্য মমের মতে। তরুণ ব্রিটিশ সাহিত্যিকদের ভ্রমণে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি ইনকর্‌পোরেটেড্‌ সোসাইটি অব্‌ অথরস্‌, প্লেরাইটস্‌ এণ্ড কম্‌পোজার্স-এর অধীনে একটি ট্রাষ্ট গঠন করেন। এই ট্রাষ্ট থেকে তরুণ লেখকদের পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়। এবং সে পুরস্কারের টাকা কেবল ভ্রমণেই ব্যয় করতে হবে।

প্রথম উপন্যাস 'লিজা অব্‌ ল্যামবেথ্‌' সাফল্য লাভ করলেও মমের সাহিত্যজীবনের প্রথম কয়েক বছর কেটেছে কঠোর সংগ্রাম করে। সুরুতে নাটক লিখে-ছিলেন অনেকগুলি। একে একে নাট্যপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্তূপীকৃত হল বাক্সের তলায়। না, ও নাটক চলবে না,—সকলেরই এক কথা। নৈরাশ্যে, অপরিসীম অর্থকষ্টে সাহিত্যপেশা প্রায় ছেড়েই দিতে যাচ্ছিলেন মম। লিখেছিলেন উপন্যাসও। সে ক্ষেত্রেও প্রকাশক বিরূপ। ভাগ্য তথৈবচ। এমনি সংগ্রাম চল্‌ল প্রায় দশ বৎসর। অকস্মাৎ সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে গেল ১৯০৭-এ 'লেডি ফ্রেড্‌রিক' নাটকে। এই সময়ে লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে একটি নাটক ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। কর্তৃপক্ষ উদ্বেগে দিশেহারা। হাতের কাছে একখানাও মনমত নাটক নেই। মাত্র দুই সপ্তাহের চুক্তিতে পরীক্ষামূলক ভাবে নেওয়া হল মমের 'লেডি ফ্রেড্‌রিক'। নাটকটি বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করে। নাট্যকার মম বিখ্যাত হয়ে পড়েন রাতারাতি। বয়স তখন চৌত্রিশ। সুরু হ'ল সাফল্য। এর পর থেকে আর অর্থকষ্ট পেতে হয়নি মমকে। বাক্সের তলা থেকে সেই সব পুরানো নাটক একে একে আসতে সুরু করল মঞ্চে। শুধু লণ্ডন নয়, প্যারিসেও, এমন কি সুদূর আমেরিকাতেও মমের নাটকের দুর্দান্ত চাহিদা। বস্তুতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স আর আমেরিকা তিনটি দেশকেই মমের স্বদেশ বলা চলে। মমের নাটকের দর্শক, মমের উপন্যাসের পাঠকের অভাব হয়নি আর কোনদিন, সমালোচকগণ যদিও খুব উদার ছিলেন না মমের প্রতি।

সাফল্য লেখকের সর্বনাশ করে, এ কথা বলেছেন মম। এই সর্বনাশ থেকে মমকে রক্ষা করেছেন তাঁর সমালোচকেরাই। মম বড় নয়, মমের আঙ্গিক বৈচিত্র্য-বিহীন, মমের উপন্যাস স্রেফ গল্প, ওতে মহৎ সাহিত্যের মসলা নেই,—এমনি নানা বিরূপ সমালোচনা মমকে অবিমিশ্র সাফল্য-সুখ উপভোগ করতে দেয়নি। দেয়নি বলেই হয়তো হয়নি মমের সাফল্যজনিত সর্বনাশ। বিরূপ সমালোচনায় মমও মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করে বলেছেন, ওটা ওদের হিংসা, আমার অসামান্য সাফল্য দেখে ঈর্ষা।

বস্তুতঃ সাহিত্য পেশায় মমের আর্থিক সাফল্য ঈর্ষা করবার মতই। তাঁর ব্যয়বহুল বিলাসিতা, তাঁর বিলাসী ভ্রমণ, তাঁর প্রাসাদোপম বাসভবন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিপুল দান দেখে অনেক বিত্তশালী ব্যক্তিই বিস্মিত হয়েছেন, ঈর্ষিত বোধ করেছেন। মহামান্য আগা খান, ডিউক অব্‌ উইণ্ডসর, সার উইন্‌ষ্টন চার্চিল প্রভৃতি মমের প্রাসাদে ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়ে গর্ববোধ করেছেন।

অর্থের কথা থাক। আর্থিক সাফল্য দিয়ে সব সময় সাহিত্যের মূল্যায়ন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন হাল্কা চটকদার বই বাজার মাৎ করে বসে অথচ যথার্থ মহৎ সাহিত্য মার্কেটে মার খেয়ে যায়। দৃষ্টান্ত খুঁজতে দূরে যেতে হবে না। মমের 'অব্‌ হিউম্যান বণ্ডেজ' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজ যে বই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশখানা উপন্যাসের অন্যতম বলে অনেকের মত, প্রথম প্রকাশের চল্লিশ বছর পরেও আজ যে বইএর প্রায় চব্বিশ হাজার কপি বিক্রী হয় বছরে, সে বই যখন

১৯১৫-তে প্রথম প্রকাশিত হল, কোন সমালোচক ভাল-মন্দ একটা কথাও বলল না। উইপোকার খাদ্য হয়ে পড়ে রইল ধূলোচাপা হয়ে বিশটি বছর। পুরোনো বইএর আলমারী ঘেঁটে জনৈক আমেরিকান সমালোচক ১৯৩৫-এ বইটির প্রশংসা করতেই বৃটিশ সমালোচকদের চৈতন্যোদয় হল। মমের মতে তাঁর সমস্ত রচনা একদিন এ পৃথিবী বিস্মৃত হলেও 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ'কে ভুলতে একটু বেশী সময় নেবে।

নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং শেষজীবনে প্রবন্ধও লিখেছেন মম। লিখেছেন অসংখ্য। মমের লেখা পড়ে তিনি একজন মস্ত পণ্ডিত এ কথা হয়তো অনেকেই বলবেন না, কিন্তু তিনি যে এ দুনিয়াটাকে দেখেছেন খুব খোলা চোখে, দেখেছেন বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্রতর মানুষের মন, এ কথা অস্বীকার করবার সাধ্য নেই কারও। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, গল্প বলার টেক্‌নিক তাঁর অপূর্ব। মম সুখপাঠ্য। গল্প বলার আকর্ষণ দুর্নিবার। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রই মমের সহিত তুলনীয়। তার গল্পে উঁচুদরের তত্ত্বকথা নেই বলে মমের আপশোষও নেই। তিনি সগর্বে বলেন,—হ্যাঁ, আমি একজন ষ্টোরী টেলার। মহৎ লেখক নই, আমি শুধু একজন গল্প লেখক।

'কেকস্ এণ্ড এল্' একাধারে মমের বিখ্যাত ও কুখ্যাত উপন্যাস। অনেকের মতে 'কেকস্ এণ্ড এল্' মমের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। অনেকের মতে এই উপন্যাসের একটি চরিত্র ড্রিফিল্ড হলেন টমাস্ হার্ডি। মম অবশ্য তা অস্বীকার করেন। মতান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে হিউ ওয়ালপোলের জীবনী নিয়ে এটি রচিত। বহু বিচিত্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে মমকে এই উপন্যাসের জন্য। মমের আর একখানি আশ্চর্য উপন্যাস 'দি মুন এণ্ড সিক্‌স্ পেন্স'। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পল্ গগাঁর জীবন-কাহিনী এ উপন্যাসের ভিত্তি।

ভারতীয় পাঠকের কাছে মমের 'রেজর্স এজ' সমধিক প্রিয়। এ উপন্যাসে মমের ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও ব্রহ্মবাদ-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। 'রেজর্স এজ'-এর নায়ক থ্যারী ভারতবর্ষে এসেছে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজতে। সম্পদ, সম্মান সেকস্ সবকিছুর প্রতি বিতৃষ্ণ নায়ক শান্তির সন্ধানে এসেছেন ভারতবর্ষের এক ঋষির আশ্রমে। নচিকেতার মত থ্যারির মনেও জেগেছে তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষের ঋষিরাই।

১৯৩৬ সালে মম এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তিরুভান্নামালয়ে রমণ মহর্ষির সহিত দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল ধর্মতত্ত্ব, বেদ, উপনিষদ ও ভারতীয় অপরাপর ধর্মগ্রন্থাদি নিয়ে। সেই আলোচনার ফসল 'রেজর্স এজ'। শেষ বয়সেও আর একবার এসেছিলেন মম ভারতবর্ষে। জীবনব্যাপী ভ্রমণবিলাসী মম। যৌবনে ভ্রমণ করেছেন সাহিত্যের মশলা সংগ্রহের জন্য, আর বার্ধক্যে সাহিত্য থেকে অবসর নিয়ে ভ্রমণ করেছেন বিশ্রামের জন্য। "I am travelling for rest"—বলেছিলেন তখন জনৈক ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে।

"No one can tell the whole truth about himself···I have no desire to lay bare my heart to my readers."

জীবনের সব কথা কেউ বলতে পারে না কাউকে। আমার হৃদয়কেও সম্পূর্ণ নগ্ন করবার বাসনা নেই আমার পাঠকের কাছে।·····আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'সামিং আপ'-এ এ কথা বলেছেন মম। এ কথা কার্যকরীও করেছেন হাতে-কলমে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা-কিছু কাগজপত্র, নোটবুক সব নষ্ট করে গেছেন নিজ হাতে। অপ্রকাশিত চিঠিপত্রও যাতে আর ভবিষ্যতে প্রকাশিত না হয় সে সম্বন্ধেও আইনগত ব্যবস্থা করে গেছেন। 'Whole truth'-এর যেটুকু পাঠককে জানতে দিতে চাননি মম, সেটুকু আর জানা যাবে না কোনদিন। নাট্যকার মম নিজের জীবনেও রেখে গেলেন একটা নাটকীয় সাস্‌পেন্স।

তাঁর বহু গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, অনূদিত হয়েছে বহু ভাষায়। লেখক জীবনের এক দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী মম। তিনি বেঁচে থাকতেই দেখে যেতে পারলেন তাঁর সাহিত্যের সমাদর সারা বিশ্ব জুড়ে। টাকার আণ্ডিলে সিন্দুক ভরে উঠল টইটুম্বুর হয়ে। তাইতো সমালোচকের বক্রোক্তিকে তুড়ি মেরে মম বলতে পেরেছেন,—বেঁচে থাক আমার পাঠক বন্ধুরা, আর জাহান্নমে যাক ছিঁচকে সমালোচকের দল!

স্বামী হরানন্দ সরস্বতী

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য

১৩০৭ বাংলা আশ্বিন মাসের কথা। শ্রীভুলুয়া বাবা শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব দর্শনমানসে যাত্রা করিয়াছেন কামাখ্যা-ধামের পথে। সংগী তাঁহার ধীরানন্দ। গোয়ালনন্দ পৌঁছিবার পরে তাঁহাদের সংকল্পের পরিবর্তন হইল। ধীরানন্দের নূতন সংকল্প, কামাখ্যাধামে না গিয়া সিরাজগঞ্জের ভবানীপুরে স্বামী হরানন্দ সরস্বতীকে দর্শনাভিলাষে। সিরাজগঞ্জে পৌঁছিয়া তাঁহারা অতিথি হইলেন—শ্রীঅন্নদা করের ভবনে। তিনি সুদাশয় ব্যক্তি। রামদাস নামক জনৈক ব্যক্তির সংগে শ্রীভুলুয়া বাবার দেখা অন্নদাবাবুর বাসায়। রামদাস স্বামী হরানন্দের প্রিয় শিষ্য। রামদাস সর্বত্র ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন যে, আগামী ২৭শে আশ্বিন তাঁহার গুরুদেব স্বামী হরানন্দ দেহত্যাগ করিবেন। রামদাসের নিকট হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনিয়া সকলেই মর্মাহত। রামদাস ভাবী শোকের জন্য উন্মত্ত। এ বিষয়ে শ্রীভুলুয়া বাবার মনে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইই উপস্থিত হইল। তিনি রামদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ হে, যদি স্বামীজী ২৭শে আশ্বিন দেহত্যাগ না করিয়া ইহার পূর্বে বা পরে দেহত্যাগ করেন তবে তোমাকে মারিয়া এ মিথ্যা প্রচারের পরিশোধ লইব।"

ভবানীপুর সিরাজগঞ্জ হইতে হাঁটাপথে ষোল মাইল। ২৩শে আশ্বিন শ্রীভুলুয়া বাবা ভবানীপুরে উপস্থিত হইয়া স্বামী হরানন্দ সরস্বতীর অন্যতম শিষ্য যোগেশবাবুর সংগে সাক্ষাৎকার করিলেন। স্বামীজির অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যোগেশবাবু বলিলেন, তাঁহার ত কোন প্রকার অসুখ হয় নাই। তবে তিনি ২৭শে আশ্বিন দেহত্যাগ করিবেন এ কথা আমাকে বলিয়াছেন, পরন্তু অনেক ভক্ত শিষ্যকেও লিখিয়াছেন। অনেকেই স্বামীজিকে দেখিতে আসিয়াছেন—আরো আসিতেছেন। এ কথা শুনিয়া স্থানীয় নিত্যানন্দবাবু বলিয়া উঠিলেন: "আরে মশায়, এই উপলক্ষে তফীল কিছু মোটা হবে যে।" শুনে যোগেশবাবু নীরবে সব শুনিলেন। শ্রীভুলুয়া বাবা ও তাঁহার সংগী ধীরানন্দ খুবই ক্ষুধিত। তাঁহারা নায়েব মহাশয়ের নিকট কিছু খাবার চাহিলে—নায়েব মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, আপনারা স্বামীজির আশ্রমে চলুন। আপনারা যে আসিতেছেন তাহা স্বামীজী অদ্য প্রাতে আমাকে বলিয়াছেন। ভৈরবী মা সকালে স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া আপনাদের জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। আপনাদিগকে নিয়া যাওয়ার ভার আমার উপর। নায়েববাবুর কথা শুনিয়া শ্রীভুলুয়া বাবা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন: "আমরা ত পূর্বে জানাইয়া আসি নাই। আমরা যে আসিতেছি তাহা আপনারা কিরূপে জানিলেন?" যোগেশবাবু অমনি উত্তর দিলেন, "আপনারা চলুন, ক্ষুধায় কাতর, প্রসাদ গ্রহণ করুন আগে—এরূপ জানাজানির কথা আমরা অনেক দেখিয়াছি। এসব রহস্য সকলে কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে?"

স্বামী হরানন্দ সরস্বতী তখন একাকী আশ্রমের পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীভুলুয়া বাবাকে দেখিয়াই স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদান্তে বলিলেন, "বাবা, আহারান্তে কথা বলিব, অনেক কিছু বলিবার আছে।" স্বামীজির শিষ্য ভক্ত প্রায় শতেক উপস্থিত। প্রিয় গুরুদেবের দেহত্যাগের বিষয়ে নানাজনে নানাকথা বলাবলি করিতেছে। প্রসাদ গ্রহণান্তে শ্রীভুলুয়া বাবা স্বামীজী সমীপে উপস্থিত হইলে স্বামীজী বলিলেন: "বাবা, তোমার নিকট ভবানীপুরের ইতিহাস বলিবার জন্য আমি আর তিনদিন মাত্র বাঁচিয়া থাকিব, তোমার অপেক্ষায়ই এতদিন রহিয়াছি।"

শ্রীভুলুয়া বাবা বলিলেন, "আমি যদি আজ না আসিতাম তবে ত আমার জন্য আপনাকে আরো কিছু-দিন অপেক্ষা করিতে হইত?"

স্বামীজী একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাবা তোমাকে ত আমি আসিতে বলি নাই, তুমি ত কামাখ্যাধামের পথে রওয়ানা হইয়াছিলে, এখানে আসিবার ত তোমার ইচ্ছা ছিল না। কেন আসিলে বাবা, কে তোমাকে আনিল তা তুমি জানিতে না পার কিন্তু আমি জানি।"

স্বামীজির কথা শুনিয়া শ্রীভুলুয়া বাবা স্তম্ভিত। তাঁহার আর কিছু বলিবার রহিল না। তিনি কাগজ কলম নিয়া বসিলেন। তিনদিন ব্যাপী স্বামীজী অনেক কিছুই বলিলেন। যতটুকু সম্ভব শ্রীভুলুয়া বাবা লিখিয়া লইলেন। স্বামীজির দেহত্যাগের দিন আগত। তাঁহাব জন্য একখানি সিংহাসন প্রস্তুত হইল। দেহত্যাগের সময় স্বামীজী ইহার মধ্যে বসিবেন। গৃহের মধ্যে পূর্বেই সমাধিস্থান প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। পাঁচ হাত গর্ত করিয়া তাহা ইঁট দিয়া বাঁধানো হইয়াছে। তিনদিনে প্রায় ৫ শত শিষ্য শিষ্যা আশ্রমে তাঁহাদের প্রিয় গুরুদেবেব অন্তিম দর্শন পাইতে সমবেত। এত লোকসমাগম কিন্তু কাহারো মুখে কথা নাই। সকলেই বিষাদমগ্ন। শোকের ছায়া যেন সকলের উপর পড়িতেছে। আজ ২৭শে আশ্বিন। স্বামীজির মহা-প্রয়াণের দিন। স্বামীজী আজ ভৈরবী মায়ের সংগে প্রাতঃস্নান করিলেন। পূর্বে কেহ তাঁহাকে কখনো প্রাতঃস্নান করিতে দেখে নাই। ভৈরবী মা গামছা দিয়া আস্তে আস্তে স্বামীজির গা মুছাইতে মুছাইতে অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। তাঁহার মন কোনো প্রকারেই প্রবোধ মানিতেছে না। স্বামীজী ভৈরবী মার এরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, মা, তুমি অধীরা হইও না। ৪০ বৎসর যাবৎ তোমার সেবা গ্রহণ করিতেছি। তুমি ভাসিয়া যাইতেছিলে, তোমাকে টানিয়া আনিয়া কূলে স্থান দিয়াছি। সাধনার গুহ্যরহস্য ও মহামন্ত্র মাতৃনাম তোমাকে দিয়াছি। শোক সংবরণ কর। মহা-প্রস্থানকালে মহোল্লাসে বিদায় দাও মা—আসি।

স্বামীজির শিষ্য রায়বাহাদুর অশ্বিনীকুমার দত্ত সস্ত্রীক এ বিদায় বেলায় আশ্রমে উপস্থিত। অশ্বিনী-বাবুর স্ত্রী আর্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বাবা, সত্যিই আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, আমরা আপনার আশীর্বাদে নির্ভয়ে বাঁচিয়া আছি। আমাদিগকে এখন কে আশীর্বাদ করিবে? আমরা কাহার আশ্রয়ে থাকিব?

স্বামীজী স্নেহভরে বলিলেন, মা, অধীরা হইও না, আমিই তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিব। মানুষ যেমন কার্যবশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায় আমিও সেইরূপ মায়ের কাছে যাইতেছি।

২৭শে আশ্বিনের প্রাতঃকাল এভাবে অতিবাহিত হইল। মহাপ্রস্থানের সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। বিদায় বেলায় শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ-আরতির বিশেষ আয়োজন করা হইল। আড়াইমণী এক বস্তা ময়দার লুচি। প্রায় পাঁচ মণ চাউলের ভাত ইত্যাদি। মায়ের ভোগ-আরতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। স্বামীজির আশ্রমের বারান্দায় শ্রীভুলুয়া বাবা, ধীরানন্দ প্রায় আড়াইশত ভক্তের সংগে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। নীচে কত লোক যে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছিল তা বলা কঠিন। স্বামীজী মহারাজ প্রত্যেক ভক্তের নিকট যাইয়া তৃপ্তি সহকারে খাওয়াইলেন। প্রসাদ গ্রহণ প্রায় শেষ হইলে স্বামীজী কবজোড়ে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, বাবা সকল, তোমাদের সংগে আমার এই শেষ সম্ভাষণ! এবারকার মত এই শেষ দেখা। আমার অপরাধ সকলে মার্জনা করিও। আমি তোমাদের প্রিয় সন্তান। এ কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের প্রসাদ গ্রহণ শেষ হয় নাই তাঁহারা আর প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সকলের উচ্চৈস্বরে হৃদয়বিদারক ক্রন্দনরোল আশ্রমের আকাশ পাতালকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সে মর্মভেদী আর্তনাদ কেবল তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিলেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। আশ্রমে লোকে লোকারণ্য। তিলধারণের স্থান নাই। মায়ের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। একপাশে শ্রীভৈরবী মা, অন্য পাশে শ্রীভুলুয়া বাবা। এমন সময় হঠাৎ ভবানীপুরের শ্রীশ্রীভবানী ঠাকুর উপস্থিত। শ্রীভুলুয়া বাবার কথায় এখানে শ্রীভবানী ঠাকুরের পরিচয় প্রদান করিতেছি। শ্রীভবানী ঠাকুর ব্রাহ্মণ। আকৃতি প্রকৃতিতে জগৎ ছাড়া। অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি ও স্থূলকায়। উদরটী মাদ্রাজী কলসের মত, পুরোভাগ বর্ধিত। হস্তে শঙ্খের

জপমালা। বর্ণ সুন্দর কিন্তু দেহ ধূলামাটি মিশ্রিত। মুখের ভাব অস্বাভাবিক, নির্বাত তড়াগের মত সদা স্থির গম্ভীর। যেন কোন অরূপের রূপসাগরে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায় সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না জয়-পরাজয় মান-অপমান সমস্ত একত্রে চূর্ণ করিয়া স্বভাব গঠন করিলে যেমন হয়—শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বভাবও সেইরূপ। জাগতিক কোন বিষয়বস্তুর সংগে তাঁহার কোনো সম্বন্ধ নাই। নিজের হাতে খাইতে পারেন না। কেহ খাওয়াইয়া দিতে গেলে ভাত তরকারী কাপড়ে গায়ে পড়িয়া যাইত। ভালোভাবে তিনি কাপড় পরিতে পারেন না। প্রায়ই কাপড় খুলিয়া পড়ে," কেহ তাঁহাকে "আশীর্বাদ করুন" বলিলে তিনি উত্তর দেন "হাঁ, আশীর্বাদ করুন"। জাগতিক ষড়্ রস্ত্ব জ্ঞান নাই তাঁহার। তিনি বিধি-নিষেধের অতীত। দিবানিশি বিশ্বজননীর চরণকমলের সুধাপানে তিনি বিভোর। শ্রীশ্রীভবানী ঠাকুরই স্বামী হরানন্দ সরস্বতীর গুরুদেব। গুরুদেব আসামাত্র আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীভবানীঠাকুর একটু দাঁড়াইয়া কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেলে—স্বামীজী বলিলেন, "উনি সাক্ষাৎ শিব, আমাকে কত স্নেহ করেন, তাই মহাপ্রস্থানের সময় শেষবার দর্শন দিয়া গেলেন।"

স্বামীজী সিংহাসনে উপবিষ্ট। সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বাবা সকল, আমি বারোটার সময় মায়ের ধামে গমন করিব। এখন আমাকে একটু ধ্যান করিতে দাও।"

আশ্রমে ভক্তবৃন্দের স্থান ধরে না। কিন্তু—কাহারও মুখে টুঁ শব্দ নাই। রাত্রি তখন এগারটা হঠাৎ এক পাগলী বিকট চীৎকার করিয়া সকলের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। ভৈরবী মা স্বামীজির গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—শরীর তাপহীন—শীতল। শ্রীভুলুয়া বাবাও স্বামীজির গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন শরীর নিস্পন্দ, শীতল, প্রাণহীন। উপযুক্ত সন্তানহারা হইলে মাতা পিতা যেমন আর্তনাদ করিতে থাকেন সেইরূপ আর্তনাদে ভবানীপুরের মায়ের আশ্রমের নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা দূরীভূত করিল। দুঃখের রাত্রির আর অবসান হয় না। স্বামীজী ঠিক একভাবেই উপবিষ্ট। সোনার বরণ অংগখানি। দেহ হইতে অবর্ণনীয় জ্যোতিঃ বিস্ফারিত হইতেছিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণোদয়ে তাঁহার মুখচ্ছবি আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাজারে হাজারে লোক স্বামীজিকে শেষ দর্শন করিতে আসিল। বেলা ৩টায় তাঁহার জড় দেহ উপবিষ্ট অবস্থায় সমাহিত করা হইল। সকলের মুখে একবাক্য—এ যুগের ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইল আমাদের স্বামী হরানন্দ সরস্বতী দেখাইলেন কলি-কালেও ইচ্ছামৃত্যু সম্ভব। যতদিন মাতৃভাবের সাধক থাকিবে যতদিন মহামন্ত্র কালীনাম থাকিবে, যতদিন সাধনা থাকিবে ততদিন এইরূপ অলৌকিক ব্যাপারও ঘটিবে।

স্বামীজির মহাপ্রস্থানের তিনদিন পরে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার উদ্দেশ্যে মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। মহোৎসবের দিন তারাচাঁদ ঘোষ নামে সিরাজগঞ্জ হইতে এক ভক্ত আসিয়া বলিলেন যে, ২৮শে আশ্বিন প্রাতে স্বামীজী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি কাশীধামে যাইতেছি, তুমি কিছুদিন আশ্রমে গিয়া থাকিও, ভৈরবী মা একা আছেন।"*

* শ্রীভুলুয়া বাবা প্রণীত ও শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হেড মাষ্টার, বনোয়ারীনগর হাইস্কুল পাবনা হইতে প্রকাশিত। শ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিণী গ্রন্থ হইতে তথা সংগৃহীত।

গ্রাম্য গবেষণা

শ্রীপ্রমদাকান্ত আচার্য্য

কুমারখালি একটা প্রকাণ্ড গ্রাম। নিকটেই নদী। বহু লোকের বাস। নামটা শুনলে মনে হয় যেন খালি বা কেবল কুমার অর্থাৎ কুম্ভকারেরই বাস, কিন্তু তা নয়। সর্ব্বজাতির বাস। বর্দ্ধিষ্ঠ শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দু বেশী না হ'লেও বেশ কিছু আছেন, আবার হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রায় সমস্ত বর্ণের কৃষকও আছেন।

সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই কিছু কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষায়ও শিক্ষিত হ'য়ে উঠেছেন। গ্রামে নূতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হ য়েছে। গ্রামের পাশেই জলাজমি, তাতে চাষ কারকিত হয়। ধানই এখানকার প্রধান ফসল। একবার কৃষকরা মাঠে চাষ করাব সময় একটা অদ্ভুত জিনিষ মাটির তলে পেয়ে গেল। তারা জিনিষটা চিনল না। মাঠ শুদ্ধ কৃষক একত্রিত হ'য়ে জিনিষটী নিয়ে গবেষণা আরম্ভ ক'রে দিল। সেদিন চাষের কাজ প্রায় সকলেরই বন্ধ হ'য়ে গেল।

দ্রব্যটির গঠন গোল কিন্তু সর্ব্বাংশে সমান গোল নয়। অতীব মসৃণ কালো বর্ণ। আকৃতিতে খুব বড় নয়। একটা পাথরেব বড় নুড়ির মতই দেখতে কিন্তু তত ভারী নয়। জিনিষটী কি তা যখন চিনতে পারলো না তখন গয়েজদ্দি ব্যাপারী সেটী হাতে ক'রে নিয়ে বাড়ীতে এল। সেদিন আবার তাদের একটা মিলাত-সরিফ ছিল—সেখানে হাজির ক'বে দিল। সবাই একে একে দেখলেন কিন্তু বস্তুটী যে কি তা কেহই চিনতে পারলেন না। মূল মিটিংএর কাজ প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায় দেখে বিদেশী যে মওলানা সাহেব ছিলেন তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সবাই বল্‌লে, হুজুর একটা কি পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। তা কেউ চিন্‌তে পারলো না। মওলানা মওলবী মোল্লা আকুঞ্জি সেখানে যাঁরা পণ্ডিতপ্রবরেরা ছিলেন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন। একজন বল্‌লেন, নিয়ে এসতো আমরা একটু দেখি। তামাম দুনিয়ায় কত অদ্ভুত জিনিষ আছে চিনতে আবার কোনটা বাকী রইলো। সবাই মিলে বস্তুটি মঞ্চে পাঠিয়ে দিল। অনেক সময় ধ'রে বিশেষ গবেষণা করলো। কিন্তু মূল সভা পণ্ড হয় দেখে মওলানা সাহেব জিনিষটী যিনি পেয়েছিলেন তাঁকে বললেন, দেখ বাবা—আমাদের ধর্ম্মে কিন্তু বড নিষেধ, তুমি কার কি জিনিস নিয়ে এসেছ ওটা আনা ঠিক হয়নি। এটা হালাল নয়। হয় তুমি যেখানে পেয়েছ সেখানে রেখে এস, না হয় হিন্দুপাড়ায় দিয়ে এস। তাঁরা এটা নিয়ে যে গবেষণা করতে হয় করুন। আমরা যা হালাল নয় তাকে হারাম বলি। হারামের আবার গবেষণা কি।

তখন গয়েজদ্দি ব্যাপারী আর কি করে, সে হন্তদন্ত হ'য়ে গিয়ে গ্রামের বড়লোক মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে নিয়ে রেখে এল। বল্‌লে, বাবু জিনিসটী কি তা যদি জান্‌তে পাবেন আমাদের একটু বলবেন। আমরা তো মাঠে ঘাটে কাজ করে বেড়াই, কোন্‌টায় কি বিপদ তাতো জানা দরকার।

মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে প্রকাণ্ড ভীড় জ'মে গেল। উৎসাহী শিক্ষিত যুবক কিশোরেরাই গবেষণার কেন্দ্রটী গ'ড়ে তুললেন। সবাই জিনিসটী হাতে নিয়ে দেখে শুনে পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মন্তব্য করতে লাগলো।

ইতিহাসের ছাত্র গৌরদাস বললে, মৌর্য্যযুগের বা গুপ্তযুগের নিদর্শন বস্তুটিতে বিলক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন আপনারা, এর গায়ে অজ্ঞাত ভাষায় লুপ্তপ্রায় কিছু লিপিও আছে। সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে অবলোকন করতে লাগলো। লিপির মত অস্পষ্ট দাগও কোন কোন ছাত্র দেখিয়ে দিতে থাকলো। বল্‌লে 'ব্রাহ্মীলিপি'। তারা সবাই গৌরীশঙ্করের বড ধরণের স্তাবক বন্ধু। গৌরীশঙ্কর এই বৎসর ইতিহাসের এম. এ. দিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসটা পেয়েই রিসার্চে ভর্ত্তি হয়ে প'ড়বে। তার বিদ্যা-বুদ্ধির সকলে তারিফ করতে লাগলো। সে আরও বললে, এটা বরং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

এর ভিতর এলো নগেন। সে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি. এস্‌সি. পড়ছে। সে বললে, ওটা কিছু নয়।

আপনারা জিনিসটী ধরতে পারছেন না, তার ব্রাহ্মীলিপি দিয়ে কি হ'বে। এ দু' একটা দাগ কিসের লেগেছে। এটা কোন লিপি নয়। এ জিনিসটা কি জানেন—আমাদের এই সব নিয়েই ত কাজ-কারবার। একে বলে গুলী—তবে এটী একটু বড় ধরণের। এর উপরে আর একটু অংশ ছিল সেটুকু ভেঙ্গে গিয়েছে; সেটা থাকলে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। যেখানে বড় রকমের ছিদ্র ছিল তার ভিতরে মোটা তার একটা ডাবার উপর দিয়ে গড়ায়। ভারী জিনিস তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়। জিনিসটা একটা বড় গুলীর নিচের অংশ।

এর ভিতর বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোহরবাবু বললেন, নগেন যা ব'লেছ তাই হবে। তবে বস্তুটী কি? নগেন ব'লে উঠলো, স্যার ওটা কাষ্ট আয়রণ। অন্যান্য ছেলেরা কোলাহল ক'রে উঠলো। সে কি স্যার, আয়রণ হ'তে পারে! এটা কি তত ভারী? সর্ব্বদলীয় চীৎকারে গবেষণা পণ্ড হ'য়ে গেল। সব স'রে পড়লো: আবার কেউ কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

ইতিমধ্যে আসলেন যতীন দাস। তিনি বিগত যুদ্ধের সময় কিছুদিন মিলিটারীর রসদ বিভাগে কাজ করেছিলেন। তিনি এসেই বল্লেন, কি ক'রছ তোমরা, প্রাণে একটু ভয় নেই। জিনিসটী নিয়ে এত নাড়াচাড়া ক'রছো—এটা কি ভাল। গত যুদ্ধের সময় জার্ম্মানরা এই রকম কত ছোট ছোট বোমা যে ছেড়েছিল তার অন্ত নেই। দেখতে ক্ষুদ্র হ'লে কি হয়। ইস্পাতে মোড়া। এর ভিতর যত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত ধাতুখণ্ড থাকে। হয়ত বহুদিন মাটির তলে থাকায় এখন আর হঠাৎ ফেটে উঠবে না। কিন্তু ভিতরে যা আছে, যদি ফাটে তবে সব ছারখার ক'রে দেবে। সব বিষাক্ত জিনিস কিনা। এ কথা শুনে ছেলেরা ওটা যতীনের হাতে দিয়ে স'রে প'ড়লো। যতীন ভাল ক'রে দেখে বললে, দেখ এই উপরের দিকে একটা ছিদ্র ছিল মনে হয়, কাঁকরে মুখটা বন্ধ হ'য়ে আছে। সকলে বস্তুটী দূরে সরিয়ে রাখলো। পাড়ার বউঝিরা মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে দৌড় দিল। প্রাচীনরা কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে ছেলেদের তিরস্কার ক'রতে থাকলো—বললে ড্যাকুরারা আজ একটা ঘটাবে। ওটা মুসলমান-পাড়া থেকে দিয়ে গিয়েছে। তেমন একটা না হলে কি দিত!

যাই হোক যতীনবাবুর পরামর্শে বিভিন্ন পাড়া থেকে বালি এনে বস্তায় সাজিয়ে দূরে বাগানে রাখা হলো। যতীনবাবু ব'লে গেলেন তিনদিনের মধ্যে যদি না ফাটে তবে আবার দেখতে হ'বে। কখনো আর ওখানে কেউ যেয়ো না। সবাই বাড়ী চলে গেল।

রাত্রিতে সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন পাড়ার অনেকে এল। বিশ্বম্ভর নৌবিভাগে কাজ করে। ছুটিতে বাড়ী এসেছে, বললে, আমরা ওরকম অনেক জিনিস দেখে থাকি—সামুদ্রিক জীবজন্তুর ওরকম ডিমও হয়। শম্ভুনাথ বোটানীর ছাত্র, ব'ল্‌লে তা নয়। আমাদের দেশে সে গাছ জন্মায় না। তবে আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় এমন অনেক নাট আছে যে তাদের চেহারা ঐ রকম। এরা কিন্তু জিনিসটী কেউ দেখে নি। শুধু বিবরণ শুনেই মন্তব্য প্রকাশ করছেন। আবার তা সর্ব্ববাদীসম্মত হচ্ছে না বল্‌লেই সে মন্তব্য গ্রহণ করা হ'চ্ছে না। যাই হোক প্রাপ্ত কৃষ্ণকায় বার ইঞ্চি লম্বা আট ইঞ্চি পরিধির শক্ত আবরণের বস্তুটী নিয়ে বড় আলোচনা হ'তে লাগলো। রসিক সিকদার এসেছিল ত্রিনাথের মেলা থেকে। সে সেখানে ঠাকুরের সিদ্ধি প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হ'য়ে এসেছে। সে বললে, কর্ত্তা, আগেকার নবাবী আমলে বড় বড় গড়গড়া বা আলবোলা ব্যবহার হ'তো। তার নীচের গোড়ার দিকে কত কারুকার্য্য থাকতো। এ বোধহয় সেই নীচের একটা অংশ। আর একজন বল্‌লেন, কবে ছিল নবাব আর তার ভাঙ্গা ন'লচে। সেতো কাঠের—তা কি এতদিন থাকে নাকি?

জগবন্ধুবাবু প্রাচীন, তিনি বল্‌লেন, শুনেছি বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন ছিল। সেই যে বত্রিশটী পরী—তাতো একে একে উড়ে গেল। তাদের পাগুলো যে ন্যস্ত ছিল তাতো এই রকম সমস্ত বস্তুর পরে। তারা তো আর উড়তে পারে না।

এবার সবাই হেসে দিল। বল্‌লে, তুমি তো গৌরদাস যা ব'লেছে সেই কথাই বল্‌লে। এঁরা কিন্তু জিনিষটী

এখনও দেখেননি, বিস্তারিত বিবরণ বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের কাছে ও প্রতিবেশীর কাছে শুনে একবার জানতে এসেছেন। উঠানে বহু লোকের সমাগম হ'য়েছে।

এমন সময় বাড়ীর দরজায় শোনা গেল কে যেন বলছে—বাবা জনার্দ্দন, তুমি কি মহিমাময়, তোমার অপার করুণা। সবাই পথের দিকে চেয়ে প'ড়লো। দেখা গেল গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আস্‌ছেন। আর সঙ্গে তাঁর ব্রাহ্মণী, হাতে হ্যারিকেন। এসেই মজুমদার মহাশয়কে ডেকে বল্‌লেন, ওহে বিধুভূষণ, আরে তোমরা নাকি আমার বাবা জনার্দ্দনকে পেয়েছ। তাঁর ভক্তিতে গলাটা একটু কেঁপে উঠলো। সবাই কথাটা জানতো না। কেহ কেহ একটু উদ্‌গ্রীব হ'লো। বিধুভূষণ বল্‌লেন, ঠাকুরমশায় আপনার সেই শালগ্রামের কথা বল্‌ছেন?

হাঁ হাঁ, সবই তো তোমরা জানো।

বিধুভূষণ বল্‌লেন, তা হ'তেও পারে, দেখুন একবার। কথাটা শোনবার জন্য সকলে কৌতূহলী হ'লো। ঠাকুর-মহাশয় বল্‌লেন, সেবার যে জল ঝড় হ'লো না, তাতে তো আমার ঠাকুরঘর প'ড়ে গেল। ঘরে যা কিছু ছিল প্রায় জলে ভেসে গেল। গৃহদেবতা শালগ্রাম জনার্দ্দন আমার চৌদ্দপুরুষের দেবতা সিংহাসনে ছিলেন। আর পেলুম না। আজ দু' তিন বৎসর বাবা জনার্দ্দন অন্তর্হিত হয়েছেন। তাই আজ পাড়ার সকলে ব'লছে ঠিক তোমার সেই জনার্দ্দন, গিয়ে নিয়ে এস।

বিধুভূষণ বললেন, সে যে বস্তুটী কি তাতো এখনও ঠিক হয়নি। তবে আপনি দেখে আসুন। কেউ বলে কাল দেখ্‌বেন, কেউ বলে হাত দেবেন না যেন। তিনি আর শুনলেন না। তিনি ও তাঁর ব্রাহ্মণী জনার্দ্দনকে আনতে গেলেন। অনেক পরে ফিরে এলেন হতাশ হ'য়ে। ব'লে গেলেন আমার জনার্দ্দনের বা কি আকৃতি আর এ কি! আমার তো মনে হয় বিধুভূষণ, যে এটা কচ্ছপের মৃত বাচ্ছা। তোমরা তো একে দেখ্‌লাম বোমা বানিয়ে রেখেছ।

পরদিন সকালে নমঃশূদ্র ও কাপালীপাড়া থেকে যুবকরা এসে ধরলো, আজ্ঞে আমাদের পাড়ার মোড়ল অতি প্রাচীন। তিনি তো আসতে পারেন না, তাঁকে বস্তুটী আমরা দেখাবো। সকলে সম্মত হ'লো। বিপদ কি হ'তে পারে তা বুঝিয়েও দিল। পরে যথাসম্ভব সাবধান হ'য়ে বস্তুটীকে পীতাম্বরের বাড়ীতে বালির বস্তায় পুরে একজন মাথায় ক'রে নিয়ে গেল।

অশীতিপর বৃদ্ধ মোড়ল মহাশয় চৌকির উপর ব'সে আছেন। বস্তুটী তাঁর হাতে দেওয়া হ'লো। গ্রামের বালক-যুবক একত্রে দু-একশত ঘিরে দাঁড়ালো। পীতাম্বর জিনিসটী হাতে নিয়েই কেঁদে ফেললে—বললে আমি মরে গেলে তোদের উপায় কি হ'বে তাই ভাবি। এই সামান্য জিনিস চিন্‌লি না। পরে গম্ভীর হ'য়ে বহু সময় ধ'রে পরীক্ষা ক'রে প্রাচীন একটু হেসে ফেললে। সবাই জিজ্ঞেস ক'রলে, কি কর্ত্তা হাসলেন কেন? প্রাচীন বল্‌লে—এ অখণ্ডিম্ব তো আমিও চিন্‌লাম না। যাই হোক এটাকে কেটে দেখা যাক্।

সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠলো—সর্ব্বনাশ হবে, অমন কাজ করবেন না। সবাই স'রে দাঁড়ালো।

মোড়ল সেটী একটী কাঠের পরে রেখে কুড়ুল দিয়ে দু'ভাগ ক'রলো। আর উপস্থিত জনতার মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ছোট তারা হাতে তালি দিয়ে নেচে ব'লে উঠলো—ওরে তালের আঁটিরে, তালের আঁটি।

পণ্ডিতের দল মুখ নীচু ক'রে সরে গেল।

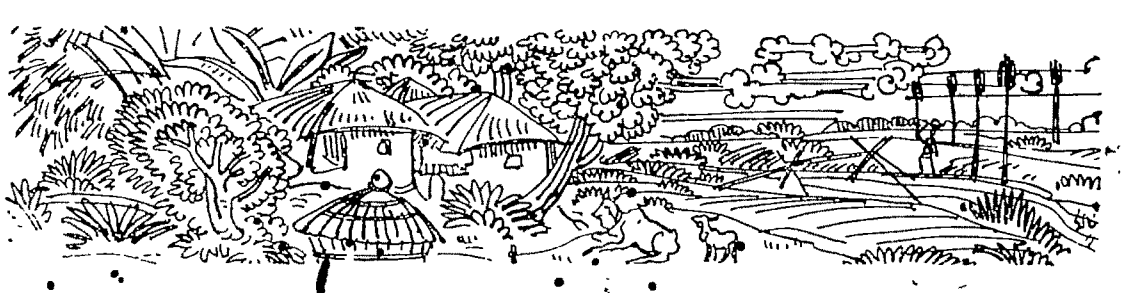

'প্রবর্ত্তক'-এর পঞ্চাশ বছর

অঃ প্রফুল্লকুমার সরকার

॥ ১-৬ বর্ষ : ১৯১৫—১৯২১ ॥

॥ ১১ ॥

বাংলার বিপ্লব যুগের শেষাশেষি অন্তরীণ রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলনে প্রবর্ত্তকের দান অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ২য় বর্ষের প্রবর্ত্তকে শচীন্দ্রের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে লেখনী চলে তাহা প্রবর্ত্তকের ৪র্থ বর্ষে ২৪ সংখ্যায় (১৫ই পৌষ ১৩২৬) 'মুক্তি সংবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে স্তব্ধ হয়। এই দীর্ঘ কয়েক বৎসর রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য শ্রীমতিলাল প্রবর্ত্তক পত্রিকার মাধ্যমে যে বিরামহীন সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বাংলার বিপ্লবী মুক্তির আন্দোলনে বিরল। প্রবর্ত্তকের ৪র্থ বর্ষ ২১শ সংখ্যায় "অবরুদ্ধের মুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই শ্রীমতিলাল লিখিয়াছেন : "যে কাহিনী বিস্মৃতির গহ্বরে আত্মগোপন করিতেছে, তাহাকে টানিয়া টানিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত করিবার উদ্দাম প্রচেষ্টা কেন করিতেছি ? যে কথা মানুষ শুনিতে চাহে না, দেশনেতৃগণের কর্ণে যে বাণী আর তেমন বেদনার রাগিণী বলিয়া শ্রুত হয় না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ভবিষ্যতের আশাচিত্রে বিমোহিত বাংলাদেশকে এ দুঃখের সঙ্গীতে অতিষ্ঠ করিয়া তুলি কেন ? কেন রাজশক্তির অপ্রিয় প্রসঙ্গ বার বার উত্থাপন করিয়া তাঁহাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হই ? এ বুকের পুঞ্জীভূত বেদনা-গাথা সমব্যথী ভিন্ন অপরে বুঝিবে কি ?"

শ্রীমতিলালের মর্ম্মব্যথারই ইহা এক করুণ চিত্র। এই প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্য আজকের দিনে স্মরণযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

"আজ মনে পড়ে শচীন্দ্রের আত্মহত্যার কথা, জ্যোতিষচন্দ্রের শোচনীয় মস্তিষ্ক বিকৃতির কাহিনী, তারপর কত যুবক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বদেশের কল্যাণ কামনায় রাজবিধির কঠোর শাসনে যে নির্য্যাতিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই ইংরেজ শাসনের নিদারুণ যন্ত্রে, কেবল বাংলা নয়, ভারতের সর্ব্বত্রই হাহাকার উঠিয়াছে। পঞ্চনদের লোমহর্ষণ ঘটনা বিংশ শতাব্দীর এই উন্নতির যুগে ইংরেজরাজের অধীনে যে ঘটিতে পারে, জগতের কোন সভ্যজাতিই ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না। প্রজাবৎসল ইংরাজ নিরস্ত্র প্রজার উপর যে নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছেন, তাহা ক্রুরহৃদয় জার্ম্মানীর পক্ষেও বুঝি অসম্ভব। যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আর শোক করি না, কেননা এই সকল অপ্রিয় কথা পর পর উল্লেখে আমাদের বিশেষ ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

"ভারতবর্ষ মুক্তি চাহে। সে মুক্তি অন্তরের। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ইহার বিকৃত রূপের প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত তপস্বী ভারতের পক্ষে উহা অতি কঠোর না হইলেও, শাসক জাতির ইহাতে যথেষ্ট মর্য্যাদা হানি হইয়াছে। নিউ ইয়র্ক সহরে আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনীতে লালা লাজপৎ রায় ইংরেজের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির বিষময় ফলের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন, পাঞ্জাবের বীভৎস ঘটনা শ্রবণে, শ্রোতৃবর্গ যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসী জেনারেল ডায়ার সাহেবের নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়াছেন ; পঞ্চনদের বুকের রক্ত ইংরেজ শাসনের দুরপনেয় কলঙ্ক। এ কলঙ্ক যেমন করিয়াই হউক মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এমন কথা চতুর্দ্দিক হইতেই পরিশ্রুত হইতেছে।

"ঠিক যে সময়ে ভারতের জাতীয় মহাসভায় পাঞ্জাবের হৃদয়বিদারক মর্ম্মান্তিক কাহিনীর কথা বিনাইয়া বিনাইয়া দেশের নেতৃবর্গ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মহামতি ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সান্ত্বনা বাণী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষিত হইল। শাসন সংস্কারের কথাগুলি ভারতবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিত না। রাজনীতিক কথার ফাঁকে আমরা তাহা শুনিতে চাহি নাই, কিন্তু সম্রাটের এই কথাগুলি আমাদের হৃদয় শীতল করিয়াছে

—"It is my earnest desire at this time that so far as possible, any trace of bitterness between my people and those who are responsible for my Government should be obliterated, let those who in their eagerness for political progress have broken the law in the past, respect it in future. Let it become possible for those, who are charged with the maintenance of peaceful and orderly Government forget extravagances they have had to curb. A new era is opening. Let it begin with a common determination among my people and my officers to work together for a common purpose. I therefore direct my Viceroy to exercise in my name and on my behalf my Royal clemency to political offenders in the fullest measure which in his judgment is compatible with public safety. I desire him to extend it on this condition to persons, who for offences against the state or under my special or emergency legislation are suffering from imprisonment or restrictions upon their liberty, I trust that this leniency will be justified by the future conduct of those whom it benefits and that all my subjects will so demean themselves as to render it unnecessary to enforce the laws for such offences hereafter."

অতঃপর এই প্রবন্ধে শ্রীমতিলাল সম্রাটের ঘোষণা বাণীর উপর মন্তব্য করিয়াছেন :

"রাজশক্তির এই অনুগ্রহটুকুর জন্য "প্রবর্ত্তক" শচীন্দ্রের আত্মহত্যার পর হইতে ধারাবাহিক লেখনী চালনা করিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গালীর সন্দিগ্ধ চরিত্রের উপর কালপ্রভাবে যে মসীলেপ হইয়াছিল তাহা মুছিয়া সুন্দর সত্য রূপটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য জন্মাবধি প্রচেষ্টা করিয়াছে; আজ তাহা সফল হইবার দিন। অতঃপর আমরা সকল রাজনীতিক অপরাধীরই মুক্তির আশা নিঃসংশয়ে করিতে পারি।

"সম্রাট মহোদয়ের ঘোষণা বাণীর মধ্যে আমরা আশার আলো যথেষ্ট পাইয়াছি। চন্দ্রে কলঙ্কের মত এই কয়েকটা কথা আমাদের প্রাণে এখনও অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছে, তিনি রাজ-করুণা বিতরণে কুণ্ঠাহীন হইয়াও বলিয়াছেন "……My. Royal clemency to political offenders in the fullest measure which in his (Viceroy's) judgment is compatible with public safety." খুব সম্ভব এই কথার মধ্যে এমন কথা কিছু নাই যাহাতে সকল রাজবন্দী মুক্তি না পাইতে পারে, তবে রাজনীতির কূটমন্ত্রণায় আমরা একাধিকবার বড় আশা পাইয়া আবার নিরাশ হইয়াছি। সেইজন্য কথার মারপ্যাঁচে আতঙ্কের সঞ্চার হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস, সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিবার এমন সুযোগ বৃথা যাইবে না, বড়লাট বাহাদুর ও প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাগণ, বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা দেখিয়া যোগ্য ব্যবস্থাই করিবেন। ফল না দেখিলে এতদ্‌সম্বন্ধে অধিক বলা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

"এক্ষণে আমরা দেখিতেছি ভারত সম্রাটের আদেশ অনুসারে ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সুবিবেচনার ফলে ভারতের সকল রাজনীতিক বন্দীই মুক্তি পাইবে, আন্দামানে অবরুদ্ধ স্বদেশবাসীর মর্ম্মান্তিক কাহিনীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, সেদিন ভাই পরমানন্দের মর্ম্মস্পর্শী পত্রখানি পড়িয়া অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারি নাই। প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা আজ অবসানপ্রায়, অচিরেই আবার আমরা কর্ম্মবীর বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, শচীন সান্যাল প্রভৃতিকে কর্ম্মক্ষেত্রে নতুনভাবে কর্ম্মোদ্যত দেখিব, আবার আমরা ভারতের কারাগার হইতে শত শত স্বদেশ-সেবককে মুক্ত দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিব। রাজ্য-রক্ষা আইন ও ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে যাঁহারা আবদ্ধ আছেন তাঁহাদিগকেও স্বাধীনভাবে বিবরণ করিতে দেখিব। এ আনন্দ সত্যই তুলনাহীন। রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের অতীত আচরণ যতই কঠোর হউক মুক্তির পুলকোচ্ছ্বাসে তাহা মন হইতে অপসারিত হইবেই।"

উপরি-উদ্ধৃত প্রবন্ধে রাজবন্দী মুক্তির যে আকুল

আকুতি তাহার পশ্চাতে শ্রীমতিলালের যে অলক্ষ্য মানস-ক্রিয়া চলিয়াছে তাহা সংগঠনের। প্রবন্ধের উপসংহারে সেই গঠনের আহ্বানই দিয়াছেন শ্রীমতিলাল :

"কর্ম্মপ্রেরণা বিশুদ্ধ আকারে প্রকাশ হইবার ইহা শুভ সূচনা মাত্র। সম্মুখে কঠোর কর্ম্ম স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। একটির পর একটি এমন অসংখ্য কর্ম্ম দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিলে, ভারতের ভাগ্যে দিব্য সূর্য্য উদিত হইবে। বাঙ্গালী আজ আনন্দে আত্মহারা হইও না। হৃদয়ের সমতা নষ্ট করিও না। যে যেমন আছ তেমনিই আছ, সকলেই স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া আরও প্রচুর তপঃশক্তি অর্জ্জন কর। আনন্দের স্রোত মাথার উপর দিয়া প্রবাহিত হউক, তোমরা অটল থাকিও, উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতীক্ষায় সমানভাবেই তপোমগ্ন থাকিও। অচিরেই ভারতের কানন প্রান্তর বিধৌত করিয়া এক নূতন কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইবে। সে প্রবল তরঙ্গে তোমরা যেন ভাসিয়া না যাও। সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিও, মনে রাখিও পথের মাঝে মনোহর নৃত্য গীতে গতি বন্ধ করিলে নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিতে পারে।"

বাঙ্গালার অন্তরীণ রাজবন্দীগণের করুণ কাহিনী, কাহিনী মাত্র নহে; ইহা জাতির মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস। তৎকালীন ভারত সরকারের নির্ম্মম অত্যাচারের হৃদয় বিদারক তথ্যসমূহ প্রবর্ত্তক পত্রিকায় অসঙ্কোচে পরিবেশিত হইয়াছিল। পরাধীন ভারতে কতশত স্ফুটনোন্মুখ শতদল যে অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে, সে ইতিহাস আজও অসম্পূর্ণ। পাক্ষিক প্রবর্ত্তক পত্রিকায় ইহা লইয়া যে আলোচনা-আন্দোলন হইয়াছে তাহাও অতুলনীয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ভারতবাসী ইংরাজের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের প্রতীক্ষায় আছে। এমন সময়ে রাউলাট আইনের কথা ঘোষিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠে। প্রবর্ত্তকও এই প্রতিবাদে অগ্রণী হয়। বস্তুতঃ এই সময়কার প্রবর্ত্তকে রাজনীতিরই প্রাধান্য ছিল।

প্রবর্ত্তকের ৪র্থ বর্ষের ২য় সংখ্যায় "রাউলাট্ বিল" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—এইস্থলে প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রাউলাট বিলের প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। নরম গরম রাজভক্ত, এমন কি রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্তও গভর্ণমেণ্টের এই কঠোর আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। দিল্লীর লাটসভায় নির্ব্বাচিত এবং রাজকর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মনোনীত সকল ভারতীয় সভ্যই একবাক্যে এই আইনে অসম্মতি জানাইয়াছেন। এমনকি ইংরেজ পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পর্য্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :

"Another blunder that is coming home to roost in the composition of the Rowlatt commission. It was objected to by the Indian Press, but instead of listening to the objection it was overruled. The main object ostensibly of the enquiry was to convince the public of the justice of the internments. And one would have thought it desirable under the circumstances to have consulted the opinion of the Indian objectors. But the commission was appointed in the spirit of pontius pilate, when he said—What I have written I have written, a spirit which has brought all governments to grief sooner or later. It was Lord Ronaldshay's first bad blunder. Rowlatt Bill is Lord Chelmsford's fiftieth blunder. It only means upsetting this country quite unnecessarily considering how the rest of the world is upset already'.

"ভারতীয় কাগজে ইহা অপেক্ষা অধিক তীব্রভাবে যে প্রতিবাদ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? গভর্ণমেণ্ট যে শাসননীতি প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন প্রজাসাধারণের তাহাতে মত নাই। এ ক্ষেত্রে এই নূতন আইন যদি দেশে প্রচলিত হয়, তাহা নিতান্ত জোর করিয়াই চালাইতে হইবে। রাজশক্তি প্রবল, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পারেন। অমৃত-বাজার পত্রিকার নিম্নের কথা কয়েকটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে, ...'of courpe, the Government is powerful enough to force these down our

throats, let them do it, we can not prevent this. But though they may subjugate our bodies. Let our souls remain free, let our will power resist the wrong, so far as it can do so, without provoking any physical conflict with the authorities or overstepping the limits of the accepted methods of constitutional resistance. This is our one only weapon against an all powerful Bureaucracy. Almost every political leadar is seriously thinking of having recourse to passive resistance if these bills are passed in the teeth of the unanimous opposition to it, both inside and outside the Legislative council'. রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট চতুরতা সহকারে এই আইন অস্থায়ীভাবে প্রচলন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কর্ম্মবীর গান্ধী মাদ্রাজে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, যে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা কম শাসন করেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৃটিশ সাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শাসন প্রতিষ্ঠিত, ইহা আমি দেখিতেছি—এইজন্যই আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষপাতী। আজ সহসা জগতের বর্ব্বরজাতির মধ্যেও যে কঠোর শাসন প্রচলিত নাই, প্রতাপশালী ইংরেজ এরূপ বিধানের পক্ষপাতী হইলেন কেন?"

রাউলাট বিল সম্পর্কিত প্রবর্ত্তক-এর এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে সমসাময়িক সর্ব্বস্তরের মতই শুধু উদ্ধৃত হয় নাই, শাসক ও শাসিতের যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে দেশের সংগঠনের প্রতি যে প্রবর্ত্তক ঝুঁকিয়াছে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে দেশের যুবকগণের মতিগতির একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারী আজ পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্র ও বিপ্লববাদ সম্পর্কে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা জানেন না, ভিতর হইতে স্বাভাবিক আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটিলে কঠোর দণ্ডে অন্যায়কারীর সংখ্যা কমান যায় না। রাজশক্তির লৌহ কারাগার, নির্ম্মম ফাঁসীকাষ্ঠ কি মানুষকে চৌর্য্যবৃত্তি বা জিঘাংসাপরায়ণতা হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে? বাংলার যুবকগণের অন্তরে যদি এক নূতন ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ না করিত, তাহা হইলে শাসনের দৃঢ়তায় দেশে হত্যা ও ডাকাতির সংখ্যাবৃদ্ধি হ্রাস হইত না। আমরা মানব মনের সন্ধান জানি বলিয়াই, অতঃপর দেশের নবীনদের মধ্যে শিব ও সুন্দরের খেলাই লক্ষ্য করিতেছি।

"কিন্তু রাজশক্তি ভিতরের খবর না জানিয়া আজ যে কঠোর আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে নির্ব্বাপিত প্রায় শেষ বহ্নিটুকু আবার জ্বলিয়া উঠিতে পারে। এখনও বাংলার বহু সংখ্যক শিক্ষিত রাজনীতিক পলাতক যুবক যথাতথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, রাজশক্তি কোনদিনই ইহাদের অস্বাভাবিক জীবনযাত্রাটিকে সরল ও সত্য পথে পরিচালিত করিবার জন্য কোন করুণা প্রকাশ করিবে না বুঝিয়াই, আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির জন্য নূতন নূতন দল সৃষ্টি ইহাদের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশের পক্ষে আজ যাহারা সন্দেহভাজন, এমন ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ইহারা একেবারেই নূতন আশ্রয় সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এই আইনের ফলে, গোপনে গোপনে এই দল অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে, তখন দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্য যাঁহারা নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের কর্ম্মে অযথা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। শান্তির পরিবর্ত্তে ভিতরে ভিতরে খুব বড় অশান্তি সৃষ্টিরই আয়োজন চলিতে থাকিবে।"

রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। সেই সময়ে প্রবর্ত্তক পত্রিকা উক্ত আইন সম্বন্ধে কিরূপ আন্দোলন করিয়াছিল এবং আইনের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া আইনের বিপক্ষে জনমত গঠন করিয়াছিল, তৎকালীন প্রবর্ত্তক পাঠ করিলে তাহার এক নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

একখানি পত্র

[পত্রলেখক শ্রীপ্রবুদ্ধনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., এ্যাড্‌ভোকেট্‌]

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

পৌষের প্রবর্ত্তকে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে অধ্যাত্ম-জাতীয়তার প্রস্তাবনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা আমার খুব ভাল লেগেছে।

অধ্যাত্মবাদ হিন্দুদের অতিরিক্ত অন্তর্মুখী (introvert) করে তোলার দরুণ পার্থিব অস্তিত্ব ও প্রয়োজনের বিষয়ে যতটা উচিত ছিল হিন্দুরা ততটা মাথা খাটায়নি—প্রচলিত এই বিশ্বাসের মধ্যে অনেক সত্য আছে বলেই মনে হয়। মায়াবাদ দর্শনশাস্ত্রে যত উঁচু স্থানই পাক্‌—সাধারণ মানুষকে মায়াবাদ বিভ্রান্ত করে। সবই যদি মায়া তাহলে কিসের জন্য আর খেটে মরি! আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মায়াবাদে যে কাজের দিকটা আছে,—কর্তব্য যতই কঠোর হোক, নিষ্ঠার সঙ্গে তা করে যাবার যে নির্দেশ আছে, সেটা জনমানসকে ততটা গভীরভাবে প্রভাবিত করে না,—মায়াবাদে যে ত্যাগের দিকটা···নির্লিপ্ত থাকার যে পরামর্শ—শ্রমবিমুখ মানুষ আপনার অজান্তেই খানিকটা, শুধু তাতেই আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে অধ্যাত্মবাদের সার্বিক প্রভাব জনসাধারণের উপর যথাযথ পড়েনি। নির্লিপ্ততার উপদেশের জন্য তাই আমাদের দেশের মানুষ তার পার্থিব জীবনে যা এবং যতটা করতে পারত তা না করে দুর্বল হয়ে গেছে, বাইরের থেকে আগত বাস্তববাদী মানুষের কাছে ঐহিক ব্যাপারে পরাজিত হয়ে গেছে, স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে।

শুধু ভাবতে নয়, চীনেও অধ্যাত্মচর্চার একটা বিকৃত-রূপ সারা দেশকে নির্জীব করে রেখেছিল এই সেদিন অবধি। পার্থিব প্রয়োজন যতটা কমাতে পারা যায় কমাতে হবে, কমিয়ে তত্ত্বচিন্তায় গভীরভাবে নিযুক্ত থাকতে হবে, এই ছিল আদর্শ। চীন অবশ্য এখন একেবারে উল্টোদিকে ঝুঁকেছে—একেবারে অবিমিশ্র বস্তুবাদ তথা বস্তুতান্ত্রিকতা ছাড়া আর কিছুর পাত্তা নেই সেখানে এখন।

সবই বাড়াবাড়ি! এ যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা। যে চেতনশীল সে আপনা থেকেই মাঝের পথকে বেছে নেবে—সে অধ্যাত্মবাদী বলেই বাস্তবজীবনকে অগ্রাহ্য করবে না, বরং তাকে আরও ঋজু, আরও সুশৃঙ্খল করে তুলবে কারণ সে বোঝে পার্থিব জীবনধারাকে উপেক্ষা করা মানে অসতর্ক হওয়া, দুর্বল হওয়া—জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাসত্ব বরণ করা। সে জানে গোলামীতে আত্মার অপমান—আত্মাবমাননায় অধ্যাত্মবাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি নেই। অপরদিকে নিছক বস্তুবাদে চেতনশীল মনে তৃপ্তি নেই—সমস্তটাই ওর কাছে "of earth, earthly" ঠেকে—শেষ পর্যন্ত জীবনটা দাঁড়িয়ে যায় শুধু 'দিন যাপনের, প্রাণ ধারণের গ্লানি' মাত্র।

তাই এ দুয়ের মাঝপথই ঠিক পথ—অধ্যাত্মবাদ আর বস্তুবাদের সমন্বয় না হলে আখেরে আমাদের কোন-দিকেই লাভ হবে না। প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয়তে ক্রমান্বয় আপনি এই পথের কথাই উচ্ছ্বসিতভাবে বলছেন, ৺মতিলাল রায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, বিবেকানন্দের বাণীর উল্লেখ করে কেবল বলছেন যে, এই সমন্বয়ের পথই ঋষি-নির্দেশিত পথ, যা ভারতের একান্ত আদর্শ, যার থেকে বিচ্যুতি হলে বেঁচে থেকে লাভ নেই। আত্মা কিংবা বস্তু, এর কোনটিকেই উপেক্ষা করা যায় না—আত্মার খাতিরেই বস্তুর দিকে মন দিতে হবে। তাই মতিলাল ভারতীয় দর্শন ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের কারখানা খুলেছিলেন, তাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন আত্মার উৎকর্ষসাধন গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলায় কম হয় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"।

অতএব প্রবর্ত্তক যে তার সম্পাদকীয় মারফৎ অধ্যাত্ম-জাতীয়তার প্রচার করছে, জীবনচৈতন্যের প্রয়োজনীয়তার যে সওয়াল জনসমাজে উপস্থিত করছে, তা প্রবর্ত্তকেরই উপযুক্ত হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় নোঙরছেঁড়া নৌকার মত উদ্দেশ্যহীনভাবে জাতীয় জীবন না ভেসে যায় তাই বাস্তব বোধের ভিতর অধ্যাত্মচেতনার পুনঃপ্রবর্ত্তনের দরকার এবং এদিক দিয়ে প্রবর্ত্তকের সম্পাদকীয় তাৎপর্যপূর্ণ।

রাধা-মাধব

শ্রীঅনিলকুমার সমাজদ্বার, সাহিত্য-শ্রী

রাধা-মাধব বিগ্রহের দিকে চেয়ে নববধূ নন্দরাণীকে বলেছিলো গোপাল, এই আমাদের বিখ্যাত রাধা-মাধব। এঁর সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে; হয়তো শুনে থাকবে যে, আমাদের বংশের এক ধর্মপ্রাণা বধূ গভীর রাতে এই মন্দিরে বাঁশীর সুমধুর ধ্বনি শুনতে পেতেন। তখন থেকেই আমাদের বংশের সাথে রাধা-মাধবের সম্বন্ধ একটু গভীর। আজ আমাদের জীবনের এই শুভ-দিনে এই রাধা-মাধবকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে সম্বন্ধটা আরও একটু গভীরতম করে নিতে চাই রাণী। নববধূ নন্দরাণীর সঙ্গে ঠাকুর-মন্দিরে প্রণাম করতে এসেছিল গোপাল।

কোন কথা না বলে নীরবে শুধু বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ছিলো নন্দরাণী। গোপাল নন্দরাণীর হাতে একটু চাপ দিয়ে বলেছিলো—কই গো? উত্তর দাও! মন্দিরের সব কাজের দায়িত্ব নেবে তো?

লজ্জা-রাঙা আনত মুখে ধীরে ধীরে নন্দরাণী বলেছিলো—

: আমি পারবো কি?

: কেন পারবে না? তোমাদের বাড়ীতে তো শুনেছি শিবের পূজো আর পূজোর ঘরের সব কাজ তুমিই করতে।

: কিন্তু ইনি তো শিব নন! ইনি কি শিবের মত অল্পে সন্তুষ্ট হবেন!

: অল্পে সন্তুষ্ট না হন, বেশীতেই হবেন—হেসে বলেছিল গোপাল।

অল্প নয়, অনেকখানিই দিয়েছিলো নন্দরাণী। মন্দিরের সমস্ত কাজই নিজের হাতে করতো নন্দ।

সেদিন স্নান সেরে মন্দিরে যাচ্ছিলো নন্দরাণী। গোপালের ডাকে ফিরে এলো। হেসে বললো—দিলে তো পিছু ডেকে সব পণ্ড করে! চট্ করে বলো তোমার জন্য কি করতে হবে?

অনেক কিছুই। কিন্তু ঠাকুরের পূজোর কাজ ছাড়া তোমার কি কিছুই করবার ইচ্ছা নেই?

হাসলো নন্দরাণী। ভিজে চুলগুলো সযত্নে গোছাতে গোছাতে বললো—তোমার ইচ্ছেটা বলবে তো?

: ইচ্ছা আর কিছুই না, তাড়াতাড়ি মন্দির থেকে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি রান্না করলে—খেয়েদেয়ে একটু বেরুতাম।

: ওঃ! এই কথা, যাই আগে রাধা-মাধবকে তো খাইয়ে আসি—হাসতে হাসতে নন্দরাণী চলে গেলো।

অনেক চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলো না নন্দরাণী। দেরীই নয়, বেশী রকমের দেরী হয়ে গেলো। ঘরে ঢুকে গোপালকে গম্ভীরভাবে বসে থাকতে দেখে হেসে বললো—আজ কি তোমার আর বেরুনো চলবে গো?

গোপাল উত্তর দিল না সে কথার। শুকনো হাসি হেসে বললো—লোকে ঠিকই বলে, তোমার ঠাকুর-পুজোর হাত আছে কথাটা একেবারে হাড়ে হাড়ে সত্যি। নামটা তোমার নন্দরাণী না হয়ে রাধারাণী হলেই ভালো হতো।

—তাই নাকি? খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠলো নন্দ। তা হ'লে তোমার নামটা আয়ান হলেও কিন্তু বেশ মানাতো।

চমকে উঠলো গোপাল। আয়ানের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে ভেবে দেখেনি কোনওদিন—কিন্তু···

দু-চার দিন পর—সন্ধ্যাবেলায় গোপাল নন্দরাণীকে বললো—আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে, একটু টিপে দেবে নন্দ?

: তা-তো নিশ্চয়ই দেবো—তবে একটু পরে। এখন যে রাধা-মাধবের শীতল দিতে হবে।

: তা হোক। তুমি একটু পরে মন্দিরে যাবে'খন।

: তা কি করে হবে? আমি তোমার বিছানা ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বরংচ খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম করো। আমি এলাম বলে। রেগে উঠলো গোপাল। গম্ভীর স্বরে বললো—না, তুমি কিছুতেই মন্দিরে যেতে পাবে না।

: এসব তুমি ছেলেমানুষের মতন কি বলছো গো ? ঠাকুরের আরতি হবে না ?

: না না, হবে না ! একদিন পাথরের ঠাকুরের আরতি হতে দেরী হ'লে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

মর্মাহত নন্দরাণী অভিমানাহত হয়ে কিছু উত্তর না দিয়েই মন্দিরের দিকে চলে গেলো।

রাতে গোপালের ভাল ঘুম হলো না। নানা চিন্তাগ্রস্ত মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছিলো না।

রাত তখন ক'টা কে জানে—হয়তো একটারও বেশীই। দেখতে পেলো যেন নন্দরাণী রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলো। আশ্চর্য্য হলো গোপাল। শক্ত করে নিজের কাপড় কোমরে জড়িয়ে নিয়ে নন্দরাণীকে অনুসরণ করলো। দেখলো রাধা-মাধবের মন্দিরের ভেতরে—নন্দরাণী বিগ্রহের দিকে চেয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে···।

অসহ্য হিংস্র জ্বালায় জ্বলে উঠলো গোপালের অন্তর। বললো, এত রাতে তুমি এখানে ?

: আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমাদের রাধা-মাধবকে কেউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

: এখন বুঝলে তো স্বপ্ন স্বপ্নই, সত্য নয়।

: হ্যাঁ, চলো।

স্বপ্ন সত্য হলেই যেন গোপাল খুশী হতো। আর ভাল লাগে না—রাধা-মাধব যেন তার নন্দরাণীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃই যেন পর হয়ে যাচ্ছে সে—আর সহ্য হয় না। বিছানায় শুয়ে গোপাল ডাকলো—নন্দরাণী।

: কী বলো ?

: তুমি আমাকে কখনো স্বপ্নে দেখেছো ?

: উঁহু ! কই ? নাতো !

কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকলো,—নন্দ !

কোনই সাড়া এলো না। ঘুমিয়ে পড়েছে নন্দরাণী।

উঠে পড়লো গোপাল। ধীরে ধীরে মন্থর পায়ে এগিয়ে চললো মন্দিরের দিকে। মন্দিরের স্তিমিত প্রদীপ শিখায় রাধামাধব মৃদু মৃদু হাসছেন !

"ব্যাটা মিটমিটে শয়তান"—দাঁতে দাঁত চেপে বললো গোপাল। পাথরের গড়া পুতুলকে তুলে নিলো তুমি পাথর হয়ে আমার প্রাণের প্রতিমা ছিনিয়ে নেবে ;—আর আমি রক্ত মাংসে গড়া মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে তা সহ্য করবো ?

রাধা-মাধব চুপই রইলেন। পাষাণ প্রতিমা নীরবে হাসলেন। গঙ্গার দিকে চোরের মতন চুপি চুপি চললো গোপাল—ডুবিয়ে দিলো সাত পুরুষের জাগ্রত দেবতা বিগ্রহ রাধা-মাধবকে।

এক ঝাঁক রাতজাগা পাখী রাতের আকাশে সোঁ সোঁ শব্দ করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো—খানিকটা শীতল জ'লো-হাওয়া গোপালের সারা দেহে—আঁধারের বুকে আছড়ে পড়লো। রিক্ততার বেদনায় গোপালের অন্তর হু-হু করে কেঁদে উঠলো—বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো সাত পুরুষের রক্ত দিয়ে গড়া তৈরী অন্তরটা। গঙ্গার অজস্র জলের ধারা দিয়েও চোখের জল ধুয়ে শেষ করতে পারলো না।

জলে নেমে হাতড়ে পুনরায় তুলে নিলো বুকে রাধা-মাধবের বিগ্রহটি। দুষ্টু বিগ্রহ তেমনি দুষ্টুমী ভরা মিটি মিটি হাসছেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহারের
সদ্য প্রকাশিত
কর্ণ-কুন্তী
বাংলা কাব্যসাহিত্যে
অভিনব সংযোজন।
মূল্য ২·৭৫ পঃ
পুরাণ-কাহিনীর বলিষ্ঠ উপস্থাপন।
নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। উপহারযোগ্য।
পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী : কলিঃ-৭

POLYTHENE PIPES
• Light Flexible
• Non-Corrosive
• Acid Proof
P.V.C. PIPES.
"SANKHA" COMBS
• Durable
• Comfortable
• Economic
Purnima TOOTH BRUSH
JESSORE COMB INDUSTRY CO.
ESTD.1930 • CALCUTTA-9 • • POST BOX NO.-10813

পঞ্চাশ বছর আগে

(১ম বর্ষ 'প্রবর্ত্তক' হইতে সঙ্কলিত)

ষ :

ি গিরিশ্চন্দ্র পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন,
ষ কি পাওয়া যায়, মনের মানুষ করে নিতে
ন্তু আমরা জানি খুঁজিলেই মনের মানুষ
, যার ভাগ্যে মনের মানুষ মিলে না সে
।

নের মানুষের লোভে আমরা অনেক সময়
া পড়ি ; লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, এ কথা
ই সংসারে প্রাণের কথা খুলিয়া বলার জন্য
ষ সে আমার মনের মানুষ কিনা উহা পরীক্ষা
তার মুখে মধু, হৃদে বিষ, তাহা দেখি না—
াব ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হই, তারপর যখন দেখি
ণ স্বার্থপর, বড় ব্যবসায়ী তখন কেমন হয় বল
কন্তু মনের মানুষ চাই, তা না হলে প্রাণ
। এই মনের মানুষের একটা সঙ্কেত আছে,
কে তাহা বলিয়া দিব, তাহা হইলে আর
ও প্রতারিত হইতে হইবে না।

সারে মনের মানুষের হাট আছে, সে হাটে মনের
র বেচাকেনা হইয়া থাকে। ভাবনগরে প্রেমের
র এই হাট বসে। ঝাঁকা ঝাঁকা মনের মানুষ
ল্য বিকাইয়া যায়। অলস যাহারা তাহারা
আসিতে পারে না। ঘরে বসিয়া নকল জিনিষ
য়া নাস্তানাবুদ হয়।

চাড়া করিয়াও এ খাঁটি জিনিষ পরখ করা
নয়ন দুটী দেখিয়া ইহাকে চিনিতে হয়।
খিতে যদি বিভোর হইয়া যাও বুঝিবে এই
মনের মানুষ, বিনামূল্যে ইহাকে খরিদ করিবে
ন্তু সর্ব্বস্ব দিলেও প্রাণের মধ্যে দরদ লাগিবে
াকে দিয়াই যেন সুখ—কিন্তু কিছু চায় না।

মাভৈঃ :

প্রকৃতি যখন উদাসীন হয়, তখন তার প্রত্যেক যন্ত্রই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে ; ফলে দেহ, প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি সমস্ত বিকৃত দশা প্রাপ্ত হয়। এই মূঢ় ভাবই জীবের বর্ত্তমান অবস্থা। এই অবস্থায় আমাদের সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খলাময় এবং জগতের প্রভূত অমঙ্গল-কারক।

সেই লোকই মনুষ্যজাতিকে উচ্চপথে আনয়ন করে যার ভিতরে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়াছেন। এই শক্তি পুরুষের আহ্বানে জাগিয়া উঠেন—পুরুষ ত্রিলোক ছাড়িয়া সহস্রদলে অবস্থান করেন, প্রকৃতি মূলাধারে সুপ্তা অবসাদগ্রস্তা, তাই দেহ, প্রাণ, মন যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবকে জন্ম-জন্ম, জন্মমরণের মধ্যে পরিক্রমণ করাইতেছে।

পুরুষ নির্ব্বিকার সদানন্দময় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। প্রকৃতি পুরুষের সেবিকা। এই পুরুষের ইচ্ছামাত্র প্রকৃতি তৎপরা। আজ ভাবময় ভগবান বাস্তব হইবার জন্য ভাবরাজ্য হইতে মূর্ত্তিমান হইয়া জগতে অবতরণ করিবেন। ইহা তাঁহার ইচ্ছা, ইহা তাঁহার লীলা। তাই জগতের এত পরিবর্ত্তন। যে কুসংস্কারে, যে বিকৃতিতে ধরাতল অপরিচ্ছন্ন, প্রকৃতি সম্মার্জ্জনী দিয়া সে সমস্তই দূর করিয়া পুরুষের আগমন বাস্তব করিয়া তুলিবেন। হে মানব! তোমার ত্রিলোক দেহ প্রাণ মনে ভগবান আগমন করিবেন, তাই এ সকলের উপর প্রকৃতির আঘাত পড়িয়াছে। এই আঘাতে তোমার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবে না বরং তোমাকে নির্ম্মল ও অমৃতময় করিয়া তুলিবে। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হও। মাভৈঃ!

শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত

মহাপ্রয়াণ

শ্রীরমণ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শান্ত জীবনপ্রবাহ আলোড়িত করিয়া মাত্র বাইশ দিনের ব্যবধানে দুই যুগের—বিপ্লব ও অসহযোগ—দুই দিকপাল—খগেন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রনাথ পাল নিত্যানন্দময় ইষ্টধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই দু'জন সাধকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

খগেন্দ্রনাথ বসু :

গত ৩০-এ ফাল্গুন ১৩৭২ (ইং ১৪ই মার্চ্চ ১৯৬৬) সোমবার বেলা ১০-৪২ মিঃ প্রবর্ত্তকের প্রবীণ অন্তরঙ্গ সভ্য শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু দেহ সম্বরণ করিয়া ইষ্টপদে লীন হন। সঙ্ঘবিহিত দশাহ স্মরণান্তে একাদশ দিবসে শ্রদ্ধানুষ্ঠান ও তিলতর্পণাদি পালিত হয় ১০ই চৈত্র প্রাতঃ ৬॥টায় প্রবর্ত্তক আশ্রমস্থ মাতৃমন্দিরে। সমসাময়িক কালের প্রবীণ সভ্যদের মধ্যে শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিদেহীর জীবনকথা ব্যক্ত করেন। এই দিনই বেলা ৯টায় মুখাগ্নি প্রদানকারিণী ৺খগেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী অমিয়বালা বসু কর্ত্তৃক সঙ্ঘাচার্য্যের পৌরোহিত্যে পিণ্ডদান ও আদ্যশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। খগেন্দ্রনাথ চন্দননগর পালপাড়ার বসু বংশের সন্তান। ম্যাট্রিক পাশ করার পরে সঙ্ঘ-সংগঠনের প্রথম বিপ্লব যুগেই তরুণ খগেন্দ্রনাথ সঙ্ঘগুরুর আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁরই দেওয়া 'আর-ডি জি' কাষ্ঠ ব্যবসায়ের ভার সনিষ্ঠায় আমৃত্যু বহন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে খগেন্দ্রনাথের বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭৩ বৎসর।

খগেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়টুকু সঙ্ঘের মুখপত্র 'নবসঙ্ঘ' হইতে উদ্ধৃত হইল :

"বিপ্লবযুগের অগ্নিতরঙ্গে ভেসে এসেছিলেন খগেন্দ্রনাথ চন্দননগরের পালপাড়া-পল্লীর পিতৃগৃহ ত্যাগ করে'। সঙ্ঘগুরুর প্রবর্ত্তিত প্রথম কর্ম্মচক্র তথা অর্থপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মভার তিনি তুলে' নেন গুরুনির্দ্দেশেই নিজ স্কন্ধে—সেই ম্যাট্রিক পাশ-করা কিশোর বয়স থেকেই তিনি আর-ডি-জি কোম্পানীর কর্ণধার—জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্য্যন্ত সে কর্ম্মভার প্রভুদত্ত ব্রতরূপে তিনি পালন করে' গেছেন—কর্ম্ম ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের উৎস করতেই বুঝি প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁর জীব সে ব্রতোদ্‌যাপন। খগেন্দ্রনাথের কর্ম্মশিক্ষা, কর্ম্ম সংসার, সাধনা—এই গুরুতীর্থেই। গুরুকে জীবে রূপে তিনি দেখেছিলেন, পেয়েছিলেন তাঁর সর্ব্ব অতুল স্নেহ নিজ একনিষ্ঠারই উপচারে, উহারই প্রশ্রয়ে। খগেন্দ্রনাথের কর্ত্তৃত্ব-স্বাতন্ত্র্য, সঙ্ঘকে রেখেই তাঁর এই জীবনব্যাপী আমরণ ভক্তি যোগের সাধনা। মরণের আহুতি দিয়েই দীর্ঘ উৎসর্গযোগ আত্মসমর্পণের পূর্ণতার অবগ সিদ্ধ হল,—পূর্ণ হল!"

যোগেন্দ্রনাথ পাল :

গত ৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ২-২০ মিঃ সঙ্ঘাশ্রমে সঙ্ঘের প্রবীণ অন্তরঙ্গ সভ্য অ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ পাল সম্পূর্ণ সজ্ঞানে প্রায় ৬৮ বৎ ইষ্টপদে লীন হন। বোড়াইচণ্ডীতলা শ্মশানে নাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং সঙ্ঘসভাপতি করেন। সঙ্ঘাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সঙ্ঘসভাপতি শ্রীঅরু সঙ্ঘবিধান অনুসারে তৃতীয় দিবসে পিণ্ডোৎসর্গ করেন। সঙ্ঘবিহিত দশাহ স্মরণবাসর অনুষ্ঠি ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার প্রাতঃ ৬॥০ ঘটিকায় আশ্রম মন্দিরে। নিখিল সঙ্ঘের সভ্য-সভ্যা, ছাত্রছাত্রী হইয়া তিলতর্পণে বিগতাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান এই উপলক্ষে সঙ্গীত, গীতা, কঠোপনিষদ পাঠ এবং প্রবীণ সভ্যদের মধ্যে অনেকেই এই মাতৃপূজারীর পুণ্য জীবনের মহিমার কথা ব্যক্ত ক

চট্টলের সুসন্তান যোগেন্দ্রনাথের পূর্ব্বাশ্রমে ছিল চট্টগ্রাম-শ্রীপুর গ্রামে। পিতার নাম নীলক সাত ভাই ও তিন ভগ্নির মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ চতুর্থ সন্তান। ১৯১৯-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তী কলিকাতা রিপণ কলেজে পাঠারম্ভ করেন এবং

অসমাপ্ত রাখিয়া ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কালে কলেজ ত্যাগ করেন। তাবপর বঙ্গের বন্যাত্রাণে অংশগ্রহণ, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পরিচালিত জাতীয় বিদ্যাপীঠে যোগদান, আড়াই বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ। অতঃপর সঙ্ঘগুরুর নির্দ্দেশিত বিবাহ ও সংসার-সংস্কার-ক্ষয় পত্নী নীহারবালার অকাল মৃত্যুতে।

যোগেন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল স্নিগ্ধ মধুর, প্রকৃতি ছিল অমায়িক, আচরণ ছিল স্নেহরসসিক্ত। সহজ স্বাভাবিক ছিল তাঁর অনন্য গুরুমুখীনতা ও মাতৃনিষ্ঠা। যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন হৃদয়বান প্রেমিক অথচ তেজস্বী—কর্ম্ম নিরভিমান অনাড়ম্বর অথচ প্রচণ্ড অভিমানী। মানবিকাতর চিত্ত ও জাতীয়তা-সচেতন মন ছিল যোগেন্দ্রনাথের। আপনাব রসে ও সেবার মনোভাবে তিনি কাজ-কারবার করিতেন, রাখিতেন গোয়াল ভবা গরু, কিন্তু ব্যবসায়ীর লাভ-লোকসানী মানস তাঁর ছিল না। বেহিসাবী দেওয়ার মধ্যেই ছিল তাঁর পাওয়ার পূর্ণতা আর সুখের চরিতার্থতা।

যোগেন্দ্রনাথেব অনাবিল নির্ব্বিচার হৃদয়মাধুর্য্যে জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে কেউ, যত ক্ষণিকের জন্যই হোক, তাঁর সাহচর্য্যে আসিয়াছে সে-ই বিমুগ্ধ হইয়াছে—বিগলিত হয় নাই যোগেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সঙ্ঘজীবনে এমন একটি দৃষ্টান্তও দৃষ্ট হয় না। এই মানবিক প্রেম-প্রীতি-দাক্ষিণ্যই ছিল যোগেন্দ্রনাথের মর্ত্ত্য জীবনের বড় পরিচয়। এই সহজ সরল মহাপ্রাণ মানুষটির মাতৃনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ মাধুর্য্য-চরিতার্থতাও বুঝিবা এ-যুগে বিরল।

●

"সঙ্ঘের এই দুই যুগের তপঃপ্রতীক—খগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ—মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মসমর্পণযোগী ও সঙ্ঘযোগী রূপে, সঙ্ঘের উৎসর্গময় ঐতিহ্যে অম্লান ঔজ্জ্বল্যে চির ভাস্বর, জ্যোতির্ম্ময় হয়ে বিরাজ করবেন—উদ্দীপনা দিবেন সঙ্ঘের ভবিষ্যৎকে—ইহা অবধারিত। সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘজননী তাঁদের অন্তরের কামনা ও সাধনা পরিপূর্ণ করুন। ওঁ শান্তিঃ!"

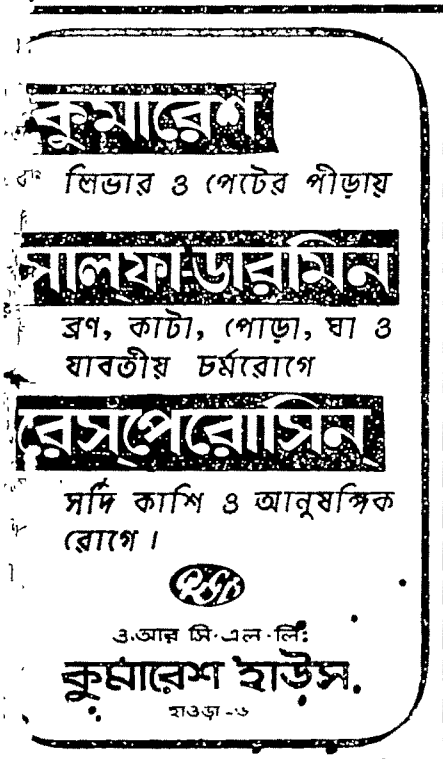

সাময়িকী

বিদ্রোহী নাগা :

বিদ্রোহী নাগা নেতারা শান্তি মিশনের সহিত দিল্লী আসিয়াছিলেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত আলোচনার জন্য। আলোচনার ফলাফল লিখিত বিষয় নয়। আলোচনার শেষে বিদ্রোহী নাগা সরকারের প্রধান মন্ত্রী অভিযোগ করিয়াছেন "ভারতীয় বাহিনী দুইটি নাগা গ্রাম পুড়াইয়া দিয়াছে। ইহা অত্যন্ত অন্যায়।" বিদ্রোহী নাগা সরকারের প্রধান মন্ত্রীর কথার সুরে সুর মিলাইয়া শান্তি মিশনের অন্যতম সদস্য বেভারেণ্ড স্কট সাহেব বলিয়াছেন "ইহা অত্যন্ত অন্যায় কাজ।" মনে প্রশ্ন জাগে বিদ্রোহী নাগারা যখন ভারতীয় রেলপথের উপর আক্রমণ করে, চলন্ত ট্রেণে গুলী বর্ষণ করে, যাত্রীদের হত্যা করে, সীমান্ত প্রহরীদের আক্রমণ করে তখন বিদ্রোহী নাগা প্রধান মন্ত্রী কথাও বলেন না, আর মিশনারী স্কট সাহেব মুখ বন্ধ করেন। এই না হইলে শান্তি মিশনের সদস্য ?

কাশীধামে সারস্বত সম্মেলন :

কাশীধামস্থ মীরাবাঈ প্রচার মন্দিরের উদ্যোগে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী কাশীর অন্যতম প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যান প্রায় শত বৎসর বয়স্ক কাশীরাজের সভাপণ্ডিত বহু সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলা গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বাসভবনে কাশীর বিদ্বজ্জন সমবেত হইয়া শাস্ত্রালোচনান্তে পণ্ডিতপ্রবরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মীরাবাণী প্রচার মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্যামকেশ ভট্টাচার্য্য মীরাবাণী প্রচার মন্দিরের কর্ম্মধারা ও সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ, আর্য্যঋষির মর্ম্মবাণী ব্যক্ত করিয়া স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া পুষ্প-ফল দ্বারা পণ্ডিতপ্রবরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। পণ্ডিতপ্রবরের পুত্র অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র ঠাকুর এক দীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁহার পিতৃদেবের জীবনসাধনার বহু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ঘাটন করেন। সভায় শ্রীকৃষ্ণ লাহিড়ী ও কল্যাণী চ্যাটার্জ্জী ভজন গানে সকলকে মুগ্ধ করেন। সভান্তে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

ছন্দগীতিকার সমাবর্ত্তন উৎসব :

বিগত ২২শে ডিসেম্বর বুধবার সাড়ম্বরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে প্রখ্যাত সংগীত ও নৃত্য শিক্ষায়তন ছন্দগীতিকার পঞ্চদশ বার্ষিক সমাবর্ত্তন ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুলিসের ইনস্পেক্টার জেনারেল শ্রীউপানন্দ মুখার্জ্জি, ডক্টর রমা চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা বিভাবতী মুখার্জ্জি যথাক্রমে প্রধান অতিথি, সভানেত্রী ও উদ্বোধিকার আসন গ্রহণ করেন। কৃতি ছাত্রীদের "সঙ্গীতশ্রী" ও "রবিদীপ্তি" ডিপ্লোমা বিতরণ করেন শ্রীযুক্তা বিভা মুখার্জ্জি; শিক্ষায়তন হইতে এ বৎসর আকাশবাণী কলিকাতার সহকারী সংগীত প্রযোজক শ্রীগোপাল গুপ্তকে "গীতগুণাকর" উপাধি ও মানপত্র প্রদান করা হয়। ছন্দ অধ্যক্ষ ননীগোপাল মিত্র রচিত ও পরিচালিত "শকুন্তলা" নৃত্য সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে, এতদ্ব্যতীত নৃত্যগীতবহুল "রবীন্দ্র সং ছন্দ" ও সুস্মিতা বসুর পরিচালনায় "গীটারের ঐকতান" এবং শে মুখার্জ্জির "মৃদঙ্গ চলন" নৃত্য অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। বিভিন্ন বি কৃতিত্বের জন্য কৃতি শিল্পীদের পদক প্রদত্ত হয়।

কোথায় আদর্শ ?

অনেক সময় আমরা বলিতে শুনি আজকাল ছেলেমে নীতি বিবর্জিত, রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেবল নিছক আলোচনা, কোন গঠনমূলক কাজ। কথাটা একেবারে ফেলিয়া দিবার কিন্তু আমরা যে সমাজে বাস করিতেছি, ছেলেমেয়েরা তো তাহা মধ্যে চলাফিরা করে। সেই সমাজের পরিবেশ কি তাহারা কাটাইয়া উঠিতে পারে ? যে সমাজে দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়াছে স্তরে স্তরে, যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের কথায় ও কাজে রহিয়াছে অনেক তফাৎ। ফলে ছেলেমেয়েরা কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ ইহার বিচার করিতে পারিতেছে না। যে কয়জন মহাপুরুষগণের আত্মত্যাগ সাম্য রাখিয়া ইংরাজ আমলে দেশবাসী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, আ তাহা গল্পে পরিণত হইয়াছে। চোখের সামনে আদর্শ না দেখি কখনও কাহাকেও অনুপ্রাণিত করা যায় না। আজ সেইটার অভাব। ছেলেমেয়েদের দোষ দিবার পূর্বে সমাজ-পরিচালকগ আত্মসমালোচনা করিলে ভাল হয়।

ভারত-রুশীয় সংস্কৃতি সভা :

দক্ষিণ টালীগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাবে ভারত-রুশীয় সংস্কৃতি সং গত ৮ই জানুয়ারী বেলা ৪টায় শ্রী বি. বি. ঘোষের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠি হয়। সোভিয়েট্ রুশিয়ার কলিকাতাস্থ ভাইস্ কন্সাল্ এফ্ ইওরল মহোদয় ভারত-রুশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন সভায় কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৪২ বৎসর পূর্ব্বে স্বরচিত সর্ব্বপ্রথ ভারতে তথা বঙ্গদেশে মুদ্রিত, সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক "লেলিন্" কবি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিমোহিত করেন। সুপণ্ডিত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য রাশিয়ার বিদগ্ধ সমাজ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পারস্পরিক নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

বাঙালী লেখকের কৃতিত্ব :

সদ্য সাক্ষরদের উপযোগী বই লেখাবার জন্য প্রতি বৎসর ভা সরকারের শিক্ষামন্ত্রক(Ministry of Education) একটি প্রতিযো আহ্বান করেন (Competition for Books for Neo-literates তার ৮ম প্রতিযোগিতায় শ্রীবিমলেন্দু সেনের 'টাকা পয়সার ২ ৯মটিতে তাঁর 'নতুন হিন্দু আইন' এবং ১১শটিতে শ্রীসেনের 'ভারত শ আইন' প্রতিবার ৫০০৲ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছে।

১ বৎসর ৩৫-৩৬টি এরকম পুরস্কার দেওয়া হয় নানা ভারতীয় রইকে। বাংলা বই প্রতিবারই ৩-৪ খানা পুংস্কৃত হব। বই তার মধ্যে ৩ বার স্থান পাইয়াছে। শ্রীসেন শ্রীমদ্ভাগত গ্রন্থপ্রণেতা ও অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী ৺ স্বর্গত মনীষী গুণদাচরণ সেনের কৃতি জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ী দেশসেবক কালিকেশব ঘোষ :

৩রা ফেব্রুয়ারী প্রাক্তন বিপ্লবী ও নীরব দেশসেবক শ্রীকালিকেশব ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বর্দ্ধমান জেলার ুর পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে বিপ্লব গনে যোগ দিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং নোয়াখালির সন্দীপ তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯১৮ সালে মুক্তি লাভের পর শ্রীঘোষ সন্দীপে কবিরাজী চিকিৎসার মাধ্যমে জনসেবার ব্রতী ১৯২১, ১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৪২ সালে দেশমুক্তি সংগ্রামে দিয়া তিনি কারাবরণ করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ তিনি বর্দ্ধমান সহরে বসবাস করিয়া চিকিৎসার মধ্য দিয়া আর্ত্ত আত্মনিয়োগ করেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় ণ ছিল। ১৯৬৪ সালে অসমর্থ হইয়া পড়ায় তিনি আত্মার ন্তী তুণ্ডলায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাসায় থাকেন এবং ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রীঘোষ অকৃতদার ছিলেন। শ্রীঘোষের মত এমন নীরব জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত জীবন শুধু একালে নয়, সর্ব্বকালেই বিরল।

পরলোকে কামিনীকুমার মিত্র :

গত ১৪ই মার্চ্চ চট্টলের পটিয়া-হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের বিখ্যাত মিত্র বংশীয় শ্রীকামিনীকুমার মিত্র ৮২ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের গাঙ্গুলীপাড়া লেনস্থ (কলিকাতা-২) বাসায় পরলোকগমন করেন। শ্রীমিত্র ছিলেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারী, অমায়িক ও পরোপকারী। নাট্য এবং সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলিকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিক্ষায়তন ছন্দগীতিকার প্রতিষ্ঠাতৃ অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল মিত্র তাঁর কৃতি জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাসাতেই গত ১৩ই এপ্রিল বিদেহীর ঊর্দ্ধদৈহিক আত্মকৃত্য শ্রাদ্ধকার্য্য বহু গুণী-সজ্জনের সমুপস্থিতে সুসম্পন্ন হয়।

হালিসহরে ভক্ত সম্মিলনীতে মার্কিন অধ্যাপিকা :

বিগত ১১ই পৌষ সোমবার হইতে ১৩ই পৌষ বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় হালিসহর দক্ষিণ বাংলা সারস্বত আশ্রমে পরমহংস শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব প্রবর্ত্তিত সারস্বত মঠানুষ্ঠিত সার্ব্বভৌম ভক্তসম্মিলনীর ৫১শ বার্ষিক অধিবেশন-এর অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনের

বর্ষশেষের নিবেদন

বর্ত্তমান চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে প্রবর্ত্তক-এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ শেষ হইল। আগামী বৈশাখ '৭৩ সংখ্যা হইতে ৫১তম বর্ষ সুরু হইবে। প্রেসের অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্য পত্রিকা-প্রকাশে শুধু বিলম্বই হয় নাই, সঙ্কল্পিত পরিকল্পনাও কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি আমরা সুদিনের অপেক্ষায় রহিলাম। প্রবর্ত্তক ঠিক ব্যবসায়মূলক পত্রিকা নহে। প্রবর্ত্তক-এর মিশন আছে—আছে সুমহান্ লক্ষ্যসিদ্ধির অনন্য ব্রত। এই লক্ষ্যের অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা প্রবর্ত্তকের পথ-চলার সম্পদ্।

গ্রাহকগণ প্রবর্ত্তকের বকেয়া ও নববর্ষের দক্ষিণা যথাশীঘ্র পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। অন্যথায় আদায়ের ময়টি জানাইয়া দিলে ভাল হয়। অপরিহার্য্য কারণে পত্রিকা বন্ধ করিলে তাহাও চৈত্র সংখ্যা পত্রিকা প্তির সঙ্গে সঙ্গেই জানাইয়া দিবেন।

বকেয়া চাঁদার জন্য কোন স্বতন্ত্র তাগাদাপত্র দেওয়া হইবে না। যে সব গ্রাহকের নিকট একাধিক বর্ষের চাঁদা বাকী তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইলে দুঃখের সহিতই আগামী বর্ষের পত্রিকা প্রেরণ ন্ধ করিতে বাধ্য হইব।

পত্রিকার কম্‌প্লিমেণ্টারি প্রাপকগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা সম্বন্ধে পত্রদ্বারা নিশ্চিত করিবেন।

পত্রিকার উন্নতিকল্পে সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকা, অনুরাগী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের পরামর্শ ও হযোগিতা প্রার্থনীয়।

াকিস্তানে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা : শ্রীবীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চট্টগ্রাম।

পরিচালক : প্রবর্ত্তক।

তৃতীয় দিবসে সাধারণ সভার অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব করেন শ্রীযুক্ত শ্রীমোহন তর্ক বেদান্ততীর্থ। বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। মার্কিন মহিলা প্রফেসার সিষ্টার শান্তি ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দান করিয়া বলেন "আমি ভারতে আসিয়াছি সরকারী বৃত্তি লইয়া প্রাচ্য দর্শন সম্পর্কে গবেষণা ও ভারতীয় যোগবিদ্যা আয়ত্ত করিতে। এই বিষয়ে স্বামী শিবানন্দ সংস্বতী মহারাজ (যোগবলে রোগারোগ্য গ্রন্থ প্রণেতা) আমার সহায়তা করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব তাঁহার গুরু সুতরাং আমারও গুরু। আপনারা ধন্য, আপনাদের জন্ম এই পুণ্যভূমিতে। এই পুণ্যভূমি ধর্ম্মের দেশ। এই দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এইরূপ অধ্যাত্ম পরিবেশ পাওয়া যায় না। অন্য দেশ আমাদিগকে বহু পার্থিব বিষয় দিতে পারে, কিন্তু ভারত দিতেছে জগৎকে পারমার্থিক জ্ঞান। আমি আশার দেশে এই দেশের ধর্ম্মের বার্ত্তাই বহন করিয়া লইয়া যাইব। এই দেশের আতিথেয়তা এবং হৃদ্যতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫।৪।৬৬

প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রিকার কার্য্যবিবরণী :

১। প্রকাশের স্থান : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিক
২। প্রকাশকাল : মাসিক
৩। মুদ্রাকর : শ্রীফণিভূষণ রায়
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, ক
৪। প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
৫। সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর, হুগলী
৬। স্বত্বাধিকারী : প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি
আমি শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত
আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য।

শ্রীরাধারমণ চৌ
প্রকাশক :

সর্বজন প্রশংসিত বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : [ফোন ৩৩-২৩০৩]

॥ বিভাগীয় বিপণি ॥

[কটন : সিল্ক : উলের জিনিষ : বেনারসী শাড়ী, সকল রকম প্রস্তুত জামা ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি
বাঙ্গালোর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, ডেকরণ, ওয়াশেনওয়ার প্রভৃতি রুচিসম্মত কাপড়ের বিপুল সম্ভার
আধুনিক ডিজাইনের দেশী তাঁতের শাড়ী। গরদ, তসর এবং সকল রকম জামার বিপুল আয়োজন

An Important Announcement

A BOON TO THE INDUSTRY

★ ELECTRICAL MOTOR ★ DOUBLE ENDED-GRINDER
★ POLISHING & BUFFING ★ FLEXIBLE SHAFT GRINDER etc. etc.

MANUFACTURED BY :

KSHAMA ELECTRO WORKS

146, SHYMNAGAR ROAD, DUM DUM, CALCUTTA-28. Phone : 57-2799

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।